:—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

র্ষ] শনিবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 14th November, 1942. [১ম সংখ্যা
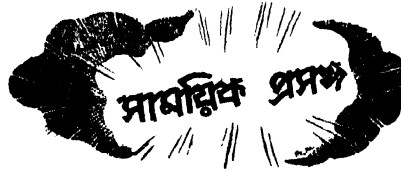
নববর্ষ

' নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ১০ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আমরা দেশবাসীকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভি-ন করিতেছি। পরাধীন এদেশে সাংবাদিক হিসাবে হ করা অত্যন্তই সংকটপূর্ণ। বিধিবিধানের খাঁড়া াথার উপর ঝুলিতেছে। এই সব প্রতিকূলতার মধ্যেও াসাধ্য তাহার কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে এবং যতই গুরুতর হউক না কেন অবিচলিতভাবে দেশ কর্তব্য প্রতিপালনে সে পরাঙ্মুখ হইবে না; হৃদয়ের ন্দু পর্যন্ত দিয়া সে অভীষ্ট সাধনার পথে অগ্রসর া করিবে। অন্য কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই, দেশ ও জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং আমরা ইহা য়াছি যে, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কোন পথেই আমাদের দুর্গতি দূর হইবে না। স্বাধীনতার প্রেরণাপূর্ণ ন্ত্র দুঃখ-দুর্দশার এই শ্মশানের বুকে আমরা মায়ের রিতে চাই। মাতৃপূজার এই বাণীই 'দেশ' প্রচার র। আমাদের কর্তব্যের গুরুত্ব আমরা প্রতিপদেই রিতেছি। এপক্ষে দেশবাসীর প্রীতিপূর্ণ সহ-আমাদের প্রধান সম্বল। দেশবাসীর প্রীতিই অন্ধকারে কীর্ণ করিয়া আমাদিগকে পথের সন্ধান দিতেছে। াদের এই সঙ্কট যাত্রায় সর্বতোভাবে দেশবাসীর াঢ় প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিতেছি, তাহা র্তব্য সম্পাদনে ভীতি এবং শ্রান্তি সমভাবেই রিতেছ। 'দেশ' এজন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের সম্মুখে হয়ত অধিকতর সংকটপূর্ণ দিন আসিতেছে; কিন্তু দেশবাসীর সহযোগিতায় সে সংকটে আমাদের গতি প্রতিহত হইবে না; আমরা আজ এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া নববর্ষের কর্মভার উদ্‌যাপনে ব্রতী হইতেছি।

দুর্যোগ-পীড়িতের সেবা

মেদিনীপুর জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে'—

"গত ১৬ই অক্টোবর সমুদ্রবক্ষ হইতে উত্থিত একটি প্রবল ঝটিকা তমলুক মহকুমা এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া যায়। ১৬ই অক্টোবর সকাল হইতেই প্রবল বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ করে এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়িতে সুরু করে এবং নদীর জল ভীষণ বৃদ্ধি পাইয়া নদীতীরবর্তী সমস্ত গ্রাম প্লাবিত করে। এমন দ্রুতগতিতে এই জলোচ্ছ্বাস ঘটে যে, জনসাধারণ আত্মরক্ষার জন্য কোনপ্রকার সুযোগ বা সময় পায় নাই। মানুষ এবং গৃহপালিত পশু নদীর প্রবল স্রোতে বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে থাকে। সন্ধ্যাসমাগমে বৃষ্টি এবং ঝড়ের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিতে ইহা চরম সীমায় উপনীত হয়। মূলোৎপাটিত হইয়া অসংখ্য বৃক্ষ রাস্তা এবং বাড়ীঘরের উপর পড়িয়াছিল, ইহাতে বহু লোকজন ঘর এবং দেওয়াল চাপা পড়িয়া জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হয়। ঝড়ের বেগে খড়ের এবং টীনের চালাগুলি বহুদূরে উড়িয়া যায়। নদীর জলোচ্ছ্বাস ও বাতাসের বিকট গর্জনে মরণোন্মুখ নরনারীর প্রচণ্ড আর্তনাদও

... মারা গিয়াছে, এখনও নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারা গেলেও, মানুষ এবং পশুর মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন নদীবক্ষ এবং উন্মুক্ত প্রান্তরসমূহ লোক-হানির ভীষণতার পরিচয় যথেষ্টরূপেই প্রদান করিতেছে। সে দৃশ্য ভয়াবহ। পচনশীল মৃতদেহের পূতিগন্ধে বাতাস চারি-দিকে এমন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, শ্বাস গ্রহণ করিতেও কষ্ট হয়। সর্বত্র গবাদি পশু এত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এতদঞ্চলে কৃষি-কার্যের জন্য গবাদি পশু আর পাওয়া যাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। লবণাক্ত বন্যার জল পুষ্করিণীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে পুষ্করিণীর জল পানের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্লাবিত অঞ্চলের কোন কোন অংশে ইতিমধ্যেই কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণের আহার্য নাই, আশ্রয় নাই, পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত নাই। সমস্ত বীজ, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হয় জলে ভাসিয়া গিয়াছে, না হয়, অন্য কোনভাবে নষ্ট হইয়াছে। শস্যের গোলাসমূহ জল এবং কাদার নীচে চাপা পড়িয়াছে। অধিকাংশ হাট বাজার এবং দোকানপাটের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।"

এই তো অবস্থা। এযাবৎ কয়েকটি সেবাপ্রতিষ্ঠান সাহায্য-কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি, হিন্দুসভার সেবাসমিতি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইঁহারা প্রধান। সেবাকার্য পরিচালনার জন্য জেলার এবং মহকুমার সরকারী পরিচালনাধীনে কমিটি গঠিত হইয়াছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদানে তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বাঙলা সরকার একজন স্পেশাল কমিশনার এবং তিনজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে যাঁহারা সেবাকার্য পরিচালনা করিবেন, তাঁহারা ত্যাগী কর্মী এবং এই শ্রেণীর সেবাকার্যে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে। দুর্গত নরনারীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রণোদিত সহানুভূতিই তাঁহাদের সেবাকার্যে একান্ত হইয়া উঠিবে; কিন্তু সরকারের পরিচালনাধীনে সেবাকার্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কর্মচারিদের গালভরা নামেই এ সেবাকার্য সার্থক হইবে না। এই কার্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের প্রধান প্রয়োজন লোকের দুঃখের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং দুঃস্থজনের প্রতি মমত্ববোধ। সরকারী রিলিফের ব্যবস্থা এযাবৎ যেভাবে চালানো হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা নানারূপ অভিযোগ পাইয়াছি। জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্মচারীদের সহানুভূতির অভাবই এই সব অভিযোগের মধ্যে প্রধান। জনসেবায় যাঁহাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি নাই, তেমন আরামী আয়েসী লোকেরা এ কার্যে অযোগ্য, একথা আমরা স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি। সেই সঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য এই যে, সরকারী কর্মচারী যাঁহারা এই কার্যে ভার পাইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই বাহিরের লোক; তাহা ছাড়া দরিদ্র, নিরক্ষর এই সব দুঃস্থ জনসাধারণ ও তাঁহাদের মধ্যে পদমর্যাদাগত একটা পার্থক্য রহিয়াছে। সে সংস্কার সহজে তাঁহারা ভাঙ্গিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এরূপ অবস্থায় সেবা-কার্যকে সর্বাংশে সার্থক করিতে হইলে তাঁহাদের সহিত স্থানীয় কর্মীদের সহযোগিতা বিধান একান্ত আবশ্যক হইবে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিসমূহের এই কার্যে বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ঠিক এই দুর্বিপাকের সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস কমিটিসমূহকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা না করিয়া অন্তত কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়াও দুর্গত নরনারীর সেবাকার্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্মীদিগের সহযোগিতা আহ্বান করাই সরকারের এক্ষেত্রে কর্তব্য ছিল। আর একটি কথা এই সাময়িক সাহায্যদানেই এক্ষেত্রে কর্তব্য শেষ হইবে না। বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পুনর্গঠন করিতে হইবে; এজন্য বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্তব্য এবং কোন প্রতিষ্ঠাবান দেশসেবকের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এখনও গভর্নমেণ্টকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বন্যাপীড়িত ও বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পাইকারী জরিমানা আদায়ের নীতি তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। যাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আজ দেশব্যাপী অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, তাহাদের উপর এমন ব্যবস্থা চাপাইবার কোন সঙ্গত যুক্তিই আছে বলিয়া মনে করি না। ঐ সব অঞ্চলের জনসাধারণের আস্থাভাজন যেসব নেতা এবং কর্মী কারাগারে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে সরকার অবিলম্বে মুক্তিদান করুন। সেবাকার্যকে সার্থক করিতে হইলে প্রাণপাতী যে আন্তরিকতার প্রয়োজন, তাঁহাদের মধ্যেই সে বস্তু আছে।

মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা

গত ২২শে কার্তিক, রবিবার উত্তর কলিকাতার হালসী বাগানে আনন্দ আশ্রমের কালীপূজার মণ্ডপে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরাইয়া উঠে। অপরাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষ তথাকার পূজামণ্ডপে ব্যায়ামক্রীড়া দেখাইতেছিলেন। এই সময় মণ্ডপে আগুন ধরিয়া যায় এবং ১১৯ জন নরনারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আহতদের মধ্যে পরে কয়েকজন মারা গিয়াছে এবং মৃত্যুসংখ্যা এ পর্যন্ত ১৪৩ জন। ইহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক এবং শিশু। অগ্নিকাণ্ডের ফলে এইরূপ প্রাণহানির কথা, আমরা ইতিপূর্বে আর কোনদিন শুনি নাই। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এই অগ্নি-কাণ্ড ঘটে এবং এত লোকের প্রাণহানির প্রধান কারণ এই যে, মণ্ডপটির তিন দিকে দেওয়াল ছিল, সম্মুখে টিন দিয়া ঘিরিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য একটি এবং পুরুষদের জন্য অপর একটি গেট করা হয়। ঘটনার সময় একমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট গেটটিই উন্মুক্ত ছিল। লোকের ভিড় কমাইবার জন্যই বোধ হয় নারীদের গেটটি তালাবন্ধ ছিল। ইহা ছাড়া বাহিরে ছিল ট্যাক্সি এবং অন্যান্য গাড়ির ভিড়। হোগলা পাতার প্যাণ্ডেল, দেখিতে দেখিতে দাউ দাউ করিয়া আগুন ধরিয়া যায় এবং মণ্ডপটি

নীচে ভাঙিগয়া পড়ে। হুড়াহুড়ির মধ্যে পায়ে চাপা পড়িয়াও বহু লোকের, বিশেষভাবে শিশুদের প্রাণহানি ঘটে। মেয়েদের গেটটি খোলা থাকিলে কিম্বা আগুন দেখিবামাত্র তাহা খুলিয়া দিতে পারিলে, সম্ভবত একগুলি প্রাণহানি ঘটিত না। কলিকাতার মত শহরে এমন মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটিবার পূর্বে অগ্নিনির্বাপণের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না; কিম্বা তৎক্ষণাৎ মণ্ডপ খালি করিয়া দিবার মত সতর্কতা অবলম্বন করা যায় নাই, ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। জনসাধারণের সম্পর্কিত এই সব ব্যাপারে হাত দিতে গেলে সকল দিক বিবেচনা করিয়া গুরুতর দায়িত্বের সঙ্গেই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। হালসী বাগানের এই দুর্ঘটনা সমস্ত দেশে একটা গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় যাঁহারা আত্মীয়-স্বজনকে হারাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আমাদের নাই এবং আমরা নিজেরাই এই সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। সমস্ত দেশ এবং জাতি আজ সমভাবে তাঁহাদের শোকে অভিভূত, এই মাত্র সান্ত্বনা। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিপদের শিক্ষা—

হালসীবাগানের এত বড় এই যে দুর্ঘটনা, ইহা হইতেও আমাদের শিক্ষা করিবার বিষয় কিছু রহিয়াছে। মানুষের জীবনে দৈবদুর্বিপাক আছে, আকস্মিকতা আছে এবং যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও সময় সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটে; কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা মনুষ্যোচিত কার্য নয়। বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনুষ্যত্ব। হালসীবাগানের এই দুর্ঘটনা হইতে মনে হয়, আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইলে যে স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন, আমরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। রক্ষাকার্যের পক্ষে সময় অবশ্য খুবই অল্প ছিল; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেও বুদ্ধির স্থৈর্য থাকিলে দুর্ঘটনার শোচনীয়তা হয়ত এতটা গুরুতর আকার ধারণ করিত না। সংবাদে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় হালসীবাগানের উৎসব-মণ্ডপে এক হাজারের অধিক লোক জমা ছিল। ইহাদের মধ্যে বয়স্ক পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না; অন্তত অর্ধেক যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হতাহতের তালিকায় দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে নারী এবং শিশুর সংখ্যাই বেশী। বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা শতকরা তিনজনও হইবে না। নিহত পুরুষ যাহারা, তাহারা প্রায় সবই শিশু বা বালক তের হইতে চৌদ্দ বৎসরের বেশী ইহাদের বয়স নয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বয়স্ক পুরুষেরা অসহায়া নারী এবং শিশুদের রক্ষার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেন নাই বা নিজের প্রাণের দায়ই তাঁহাদের কাছে বড় হইয়াছে। ইহা ভীরুতা। কোন সভ্যদেশে এমনটা ঘটে না। আকস্মিক বিপদকালে প্রথমে নারী এবং শিশুদিগকে রক্ষা করিবার প্রশ্নই সে সব দেশের লোকের মনে স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। সে মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য মানুষ কেমনভাবে জীবন দান করে, টাইটানিক প্রভৃতি জাহাজডুবির বর্ণনা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। এই ধরণের দুর্ঘটনার মধ্যে মানবধর্মের এই যে মহোচ্চ প্রকাশ, ইহাতে মানুষের চিত্তকে সমুন্নত করে। কিন্তু হালসীবাগানের এই দুর্ঘটনার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে নারী এবং শিশুরক্ষার জন্য মানুষের তেমন আত্মোৎসর্গের কণামাত্র আলোকও দেখা গেল না, এজন্য লজ্জায় আমাদের মাথা নত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের বাহিরে চাউল প্রেরণ

সিংহলে চাউলের অভাব ঘটিয়াছে। এই অভাব মিটাইবার জন্য সিংহলের মন্ত্রী স্যার ব্যারণ জয়াতিলক ভারত সরকারের দ্বারস্থ হন। এই সম্পর্কে তিনি বাঙলা দেশেও আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্যার ব্যারণ সিংহলের রাষ্ট্রসভায় একটি বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে অন্তত ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে যাইবে, এমন ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। এই পরিমাণ চাউল ভারত হইতে সিংহলে পাঠাইবার বরাদ্দ ত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছেই, ইহা ছাড়া এমন বন্দোবস্তও নাকি হইয়াছে যে, ভারতের যে চাউল উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাও সিংহলে যাইবে। ভারত হইতে সিংহলে চাউল পাঠাইবার কথা শুনিয়া আমাদের আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের চাউল উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙলাকে প্রধান বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে যাইবার এই ব্যবস্থায় বাঙলা দেশের উৎপন্ন চাউলের উপর হাত পড়িবে না ত? সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে, বাঙলাদেশে হৈমন্তিক ধান্য গত বৎসরের অপেক্ষা কম হইবে। গত বৎসর হৈমন্তিক ধান্য স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৯৬ ভাগ জন্মিয়াছিল, সে স্থলে এবার জন্মিবে ৭৮ ভাগ। সম্প্রতি ঘূর্ণিবাত্যার ফলে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার খাদ্য-সমস্যার অভাবনীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। এই ঝড়ে হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেও শস্যের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। পাকা ধান সব ক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িয়াছে এবং জল-কাদায় নষ্ট হইয়াছে। কাটিয়া তুলিতে হইতেছে অধিকাংশ স্থলেই শুধু খড়। চাউলের অভাব দেশের সর্বত্রই। কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের চাউলের অভাবের কথা ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি ময়মনসিংহের সদর এবং টাঙ্গাইল মহকুমার গোপালপুর অঞ্চল হইতে আমরা এই মর্মে খবর পাইয়াছি যে, ময়মনসিংহ শহরে চাউল বার-তের টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে; কিন্তু মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে ১৯, টাকা মণ পর্যন্ত দরে চাউল বিকাইতেছে। খাদ্যের অভাবে বহুলোক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ময়মনসিংহের কতকটা অঞ্চলে রীতিমত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অন্নাভাবে দেশের লোকের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে; এমন অবস্থায় ভারত সরকার সিংহলবাসীদের জন্য অন্নের ব্যবস্থা-কার্যে ব্যাপৃত থাকুন, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু বাঙলা দেশকে বাঁচাইয়া সে কাজ করিতে হইবে। বাঙলা দেশের বর্তমান অন্নকষ্ট যেরূপ নিদারুণ, তাহাতে অপরকে অন্নদান করিবার

[illegible] প্রদান করা আবশ্যক।

মার্কিন সম্পাদকের প্রশ্ন

আমেরিকার "লাইফ" পত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ইংলণ্ডের জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া একখানি খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে তাঁহারা বলিতেছেন,—"কথার চেয়ে আমরা কাজ বড় বুঝি। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের কাছে আমাদের আদর্শের স্থান কত উঁচুতে তাহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে, আপনারা আমাদের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝিবেন না। আপনারা এই কথা বলিতে পারেন যে, আমরা আমাদের নীতি বা আদর্শের কথা এ পর্যন্ত ভাল করিয়া বলি নাই। এ আপত্তি যুক্তিসংগত। কিন্তু কেন যে আমরা তাহা করি নাই, সে কথাটা এই প্রসঙ্গে বলা আমরা কর্তব্য মনে করিতেছি। একটি কারণ এই যে, আমাদের দেশের অন্ততপক্ষে অর্ধেক লোক এইরূপ মনে করে যে, আমরা আদর্শ নির্দেশ করিলেও আপনারা সেই আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিবেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ভারতবর্ষের কথা বলা যাইতে পারে। আমরা বুঝি যে, ভারতের সমস্যা আপনাদের পক্ষে গুরুতর। কিন্তু এ পর্যন্ত আপনারা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনরূপ নীতি বা আদর্শ ধরিয়া যে আপনারা চলিতেছেন, এমন কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। আপনারা ভারতে যাহা করিতেছেন, তাহাতে কেমন করিয়া নীতি বা আদর্শের কথা আমাদের মুখে শুনিবেন বলিয়া আশা রাখেন? আমাদের নীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা এই যে, আমরা আমেরিকাবাসীরা ইহাই বুঝি যে, কেহ যদি স্বাধীন হইতে চায়, একা সে স্বাধীন হইতে পারে না, অপর জাতির সঙ্গে তাহাকে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। আমরা যদি নিজেরা স্বাধীন থাকিতে চাই, তবে আমাদের ইহা উপলব্ধি করা দরকার যে, অপর জাতিকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে।" 'লাইফ' পত্রের সম্পাদকমণ্ডলী মার্কিন জাতির সমরাদর্শ এই-ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—"আমেরিকা টাকা, সৈন্য, ট্যাঙ্ক বা যুদ্ধজাহাজ ইংলণ্ডের কাছে চাহিতেছে না, সে সকল আমেরিকাই সরবরাহ করিবে। কিন্তু আজ আমেরিকা জানিতে চায় যে, ইংরেজ কি সাম্রাজ্যনীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?" 'লাইফে'র সম্পাদকবর্গ মার্কিনের সমরাদর্শের সম্পর্কে ভারতবাসীদের স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করিয়াছেন, ভারতবাসীরা এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের এই খোলা চিঠি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে সাম্রাজ্যমোহ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। সেদিনও এডেন সাহেবের মুখে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রভুত্ব স্পর্ধার কথাই আমরা শুনিয়াছি। চার্চিল-আমেরী ভারতবর্ষের সম্পর্কে সেই সাম্রাজ্য-বাদমূলক নীতিতেই দৃঢ় রহিয়াছেন; কিন্তু এজন্য ভারত-বাসীদের স্বাধীনতার পিপাসা দমিত হইবে না বরং প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সে পিপাসা দুর্জয় হইয়াই উঠিবে।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের মোট ৬০জন সদস্যের মধ্যে ৩১জন কংগ্রেসী সদস্য কেহ কারারুদ্ধ কেহ বা অন্য কোন কারণে পরিষদ গৃহে অনুপস্থিত থাকেন। সরকার পক্ষীয় সদস্য সংখ্যা মাত্র পনেরো। তাঁহারা এবং বিরোধী পক্ষীয় মাত্র ৪জন অ-কংগ্রেসী সদস্য পরিষদে উপস্থিত থাকেন। বিরোধী পক্ষের নেতা খলিকোটের মহারাজা সেদিন পরিষদে এই প্রশ্ন তুলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল যেখানে অনুপস্থিত, সরকার পক্ষের সদস্যসংখ্যাও মোট সংখ্যার সিকি মাত্র, সেখানে উড়িষ্যা পরিষদকে প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে কিনা এবং এই প্রকার পরিষদের কোন আইন পাশ করিবার অধিকার আছে কিনা। উড়িষ্যা পরিষদের স্পীকার এই প্রশ্নের সম্পর্কে যে বিধান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত শাসন আইনে পরিষদকে যেরূপ প্রতি-নিধিত্বমূলক করিবার ব্যবস্থা ছিল, সেই অর্থে বর্তমান পরিষদকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যাইতে পারে না। বর্তমানে এই পরিষদ একটা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিতেছে। এরূপ অবস্থা বর্তমানে অবস্থার সুযোগে ক্ষমতা-শীল এমন কোন একটি দলকে এক তরফা এবং গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক আইন তাড়াতাড়ি পাশ করাইয়া লওয়ার অনুমতি দেওয়া অসঙ্গত হইবে।"

স্পীকার মহাশয় বলেন যে, তিনি গভর্নমেণ্টকে এই পরামর্শই দিবেন। গভর্নমেণ্ট যদি তাহা সত্ত্বেও জিদ করেন, তাহা হইলে তিনি পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য অথবা বাজেট আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত মুলতুবী রাখিতে বাধ্য হইবেন। ভারতীয় শাসন সংস্কার বিধিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন মূল্য আছে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে উড়িষ্যা পরি-ষদের স্পীকারের এই সিদ্ধান্ত যে সর্বতোভাবে সংগত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই গণতান্ত্রিক মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপ কি, উড়িষ্যার ব্যবস্থা পরি-ষদেই শুধু নয়, আসামের ব্যবস্থা পরিষদেও সমভাবেই তাহা উন্মুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স এই শাসনতন্ত্রের জনসাধারণের মতের মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হইতেছে, একটি বিবৃতিতে তাহা স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক সাংবাদিকের নিকট তিনি বলেন,—"আমি মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহিয়াছিলাম, ইহা সত্য; কিন্তু গভর্নর স্যার হিউ ডউ কিংবা ভারত সচিব মিঃ আমেরীর ইচ্ছায় বা করুণায় নয়, আমার নির্বাচকমণ্ডলী এবং সিন্ধু প্রদেশের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ইচ্ছায়। গভর্নরের আস্থা যদি আমি হারাইয়া থাকি, তাহার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। আমি জানি যে, জনসাধারণের সেবাতেই আমি নিযুক্ত ছিলাম এবং আমি তাহাদের আস্থা হারাই নাই।" গণ-তান্ত্রিকতার এই প্রহসনে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা লাভের লালসা তৃপ্ত হইবে বলিয়া যাহারা মনে করেন, অচিরেই তাহাদের সে ভ্রান্তি ভাঙ্গিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

[বাবুরহাট হাইস্কুলের (ত্রিপুরা) ভূতপূর্ব হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দত্ত মহাশয়ের নিকট কবির চিঠি]

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার পত্রখানি অনেক ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কারণ, কিছুদিন আমি পোস্ট আপিসের স্বায়ত্তের বাহিরে জলপথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কাল রাত্রে এখানে আসিয়া আপনার পত্র পাইয়াছি।

কেবলমাত্র আমার লেখা পড়িয়া আমার 'পরে আপনি যে ভক্তি স্থাপিত করিয়াছেন ঈশ্বর করুন জীবনে সুদীর্ঘকালেও যেন তাহার যোগ্য হইয়া উঠি। আপনাদের ভক্তি প্রতিদিনই আমার অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া আমাকে লজ্জিত করে, এই তাহার একটি বিশেষ উপকার—আর কিছু নহে—আমি তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

কালীমোহনের* কাছে অনেকবার আপনার কথা শুনিয়াছি—আপনি আমার অপরিচিত নহেন—আশা করিতেছি কোনো না কোনো সুযোগে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এই পরিচয় সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

আপনি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে কায়স্থ ও বৈশ্যগণ নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন আমি তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়াই মনে করি। যে সমাজের অধিকাংশ লোকই বিনা সংকোচে নিজেকে হীন ও কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া সর্বপ্রকার অপমান অকাতরে বহন করে তাহার কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। সেই অন্যায় অপমান পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সমাজের মধ্যে একটা উদ্বোধন দেখা যাইতেছে—সর্বপ্রকার পলিটিক্যাল উত্তেজনা অপেক্ষা ইহা গভীরতররূপে সত্য ও মংগলকর। কারণ, আমাদের সমস্ত দুর্গতি ও দাসত্বের মূল এইখানেই। এই সামাজিক জাঁতার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া পিস্ট হইয়া আমরা একেবারে বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমাদের মধ্যে নবজীবনের অংকুর উঠিবার সামর্থ ক্রমেই দূরপরাহত হইতেছে—আমরা কেবলই একান্ত নিরুপায়ভাবে পরের ভোজ্য হইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছি—এজন্য নিজের সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দেওয়া আমি অন্যায় বোধ করি। আমাদের ধর্ম ও সমাজবিধি দ্বারা আমরা কেবলই জোর করিয়া বিনা কারণে পরের অধিকার সংকোচ করিয়াছি—এমন নিদারুণভাবে করিয়াছি যে যাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সাধারণ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাদের অগৌরবের লজ্জা বোধ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সমাজে যে বীজ বপন করিয়াছি, ধনে জ্ঞানে রাস্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বত্রই তাহার ফল ফলিতে বাধ্য। কারণ কে মমত্ববশত প্রশ্রয় এবং তাহার পরিণামের প্রতি রাগ করিব ইহা মূঢ়তা, যাহাই হউক, আমাদের সমাজে যাঁহারা নিম্নস্তরে পড়িয়াছেন তাঁহারা নিজের হীনতা অস্বীকার করিয়া মাথা তুলিবার এই চেষ্টা করিতেছেন—এমন আশাজনক সুলক্ষণ অনেকদিন এদেশে দেখা যায় নাই। সমাজকে যে

* ৺কালীমোহন ঘোষ

মূল হইতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে কোনো এক জায়গায় এই বোধের সঞ্চার মাত্র হইলে তাহা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিয়া এমন অভাবনীয়রূপে আপন কাজ করিবে যে, এখন অনুমানমাত্র করিতেও ভীরু যাহারা তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

যদি আমাকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করেন, তবে কলিকাতার ঠিকানাতেই লিখিবেন—কারণ এখন আমার স্থির ঠিকানা নাই। ইতি ৭ই ভাদ্র, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর
পোস্ট মার্ক ৮ই অক্টোবর
১৯১০

বিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার পত্র যখন পাইয়াছিলাম, তখন জ্বরে পড়িয়াছিলাম—তাহার পর কিছুকাল শরীর অসুস্থ থাকাতে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

আপনি যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন, সেই আঘাত বেদনায় সান্ত্বনা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। বস্তুত এই বেদনা মানুষকে গ্রহণ করিতেই হইবে—না করিলে শোকের সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বৃহৎ শোকের মধ্য দিয়া মানুষকে নবজন্মলাভ করিতে হয়। এই নবজন্মের বেদনাকে এড়াইতে চেষ্টা করাও অস্বাস্থ্যকর।

আপনি এই অবস্থায় বাহির হইতে একটা কিছু অবলম্বন খুঁজিতেছেন—সেরূপ অবলম্বন কিছু আছে বলিয়া আমি জানি না। অন্তত আমি ত জানি কোনো বই পড়িয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। নিজের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখুন—দেখিবেন, যিনি হরণ করিতেছেন তিনিই ভিতরে থাকিয়া পূরণ করিতে-ছেন—তাঁহাকে দেখিলেই তবে জানিতে পারিবেন জগতে জন্মমৃত্যুর তাৎপর্য কি।

কার্তিক মাসের প্রবাসীতে 'মাতৃশ্রাদ্ধ' নামক একটি লেখা বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে এ সম্বন্ধে বক্তব্য অনেকটা লিখিয়াছি—পড়িয়া দেখিবেন। মৃত্যুকে আমি সত্য বলিয়া জানি না। মৃত্যু যে কি তাহা আমি বারম্বার আঘাতে সুস্পষ্ট জানিয়াছি—ঈশ্বর আপনাকেও তাহা জানাইয়া দিন এই আমি প্রার্থনা করি। আপনার চিত্ত যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই অবকাশে আপনার অন্তর্যামীর কাছে আপনার বেদনা নিবেদন করিয়া দিন—তাঁহার নিকট হইতে আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। তিনি দুঃখবেদনার মধ্য দিয়া আপনার নিকট তাঁহার দক্ষিণ মুখের প্রসন্ন জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দিন।

সমব্যথিত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

ছুটি উপলক্ষ্যে কিছুদিন হইতে শিলাইদহে আছি। আপনার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর কল্যাণ কামনায় শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। শোকের অগ্নি আপনার অন্তরকে জ্যোতির্ময় করুক, জীবনকে পবিত্র করুক এবং জননীর দেহমুক্ত মাতৃসত্তা আপনার চিত্তক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া গভীরভাবে আপনাকে মঙ্গল বিতরণ করুক। ইতি ২৯শে কার্তিক, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

য় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

কুষ্টিয়া

কায়স্থদের উপবীত গ্রহণ লইয়া যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে আরম্ভে যে কিছু অনিষ্ট করিবে না হা আমার মনে হয় না। প্রথম বিপ্লবের মুখে ভালমন্দ দুই-ই আলোড়িত হইয়া উঠে, এখনো তাহাই দেখা ইতেছে, কিন্তু ভয় করিবেন না। ইহার মন্দটা স্থায়ী হইবে না। চিরন্তন লোকাচারকে একদিকে আঘাত রিয়া অন্যদিকে ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যদি মনে করি ইমারতের ভিত্তি ভাঙিয়া ফেলিয়া উপরের তলা-লো রক্ষা করিব, তবে সেই চেষ্টা কেবল সেই কয়দিন মাত্র টেকে যে কয়দিন ভিত্তি ভাল করিয়া ভাংগা না য়। কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের চেষ্টা লোকাচারকে অস্বীকার করা—ইহা যদি এক জায়গায় সম্ভব হয়, বে অন্যত্রও হইবে। তবে আজ লোকাচারের শাসন আমাদিগকে যেরূপ পীড়িত করিতেছে, কাল আর সেরূপ রিতে পারিবে না। ক্রমে নিঃসন্দেহেই ব্রাহ্মণেতর প্রায় সকল বর্ণই উপবীত গ্রহণের অধিকার লাভ করিবে। মনি করিয়াই উপবীতের বন্ধনে যে জাতিভেদ আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সে বন্ধন শিথিল হইয়া ইবেই। কায়স্থেরা উপবীত গ্রহণের দ্বারা নিজেকে অন্য ব্রাহ্মণেতর জাতির চেয়ে উচ্চ করিবার চেষ্টা রিতেছেন, কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারাই তাঁহারা সকল বর্ণকে সমান করিবার পথ উদ্ঘাটিত করিতেছেন। তহাসের প্রথম অধ্যায়েই তাহার প্রকৃত মর্ম পাওয়া যায় না। কায়স্থের উপবীত গ্রহণের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়েই তাহার তাৎপর্য পরিস্ফুটরূপে পাইবেন না—উপসংহারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যতই সংঘাত সংঘর্ষ বিপ্লব বিরোধ হইবে সমস্তই আমাদের সামাজিক চেতনাকে উদ্বোধিত করিয়া মঙ্গল পরিণামের দিকেই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবেন না। বাড়াবাড়ির যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছেন তাহাই শুভলক্ষণ। যদি মৃদুভাবে ব্যাপারটা চলিত তবেই সংশয়ের কারণ থাকিত। ইতি, ২৩শে পৌষ, ১৩১৭।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুসি হইলাম।

শিশুদেরজন্য একখানি কাগজ বাহির করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ইহার প্রয়োজন আছে জানি এবং এ সম্বন্ধে চিন্তাও করিতেছি। কিন্তু ভয় হয়, পাছে ইহার অধিকাংশ ভার আমার উপরেই চাপিয়া পড়ে। কাজের বোঝা অনেক ভারী হইয়াছে—তাহাতে আমার ক্ষতিও করে; দায় আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি আপনার এ প্রস্তাবটি মনে রহিল।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
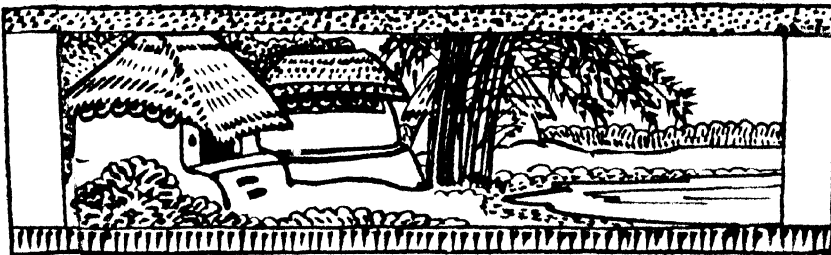
গাঁয়ের লোকে জানে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক; ইচ্ছা করলে সারা গাঁয়ের অভাব ঘুচাতে পারেন; ইচ্ছা করেই করেন না। লোকে সকালে নাম নেয় না, কোন দিন নাকি কার হাঁড়ি ফেটে গিয়েছিল, আবার পাছে কারও হাঁড়ি ফাটে সেই ভয়।

লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, অথচ কেউ দেখে বিশ্বাস করতে পারে না—কথা শুনে তো নয়ই।

কালো, লম্বা শুষ্ক চেহারা, মাথায় ছোট ছোট আধ পাকা আধ কাঁচা চুল, পরনে নয় হাতি মোটা থান, পায়ে একজোড়া কটকি চটি, গায়ে হাতকাটা একটা বেনিয়ান। হাতে থাকে একটা তেল লাগানো প্রকাণ্ড বড় বাঁশের লাঠি, যেটা সোজা করে দাঁড়ালে তার পরে মুখসহ মাথার ভারটা অনায়াসে দেওয়া চলে।

অত্যন্ত সহজ মানুষ, অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করে থাকেন।

অথচ এই লোকটিই কয়েক লক্ষ টাকার মালিক।

গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই আনন্দ দত্তকে বেশ চেনে আশ পাশ গাঁয়ের লোকেরাও যে চেনে না তা নয়। প্রতিদিন ভোর হতে গাঁয়ের লোক পথে হুঙ্কার শুনতে পায়—যাতে তারা বেশ বুঝতে পারে আনন্দ দত্ত বার হয়েছেন।

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম, বেলা বারোটা হতে বৈকাল চারটে পর্যন্ত, আবার রাত এগারোটা হতে ভোর হওয়া পর্যন্ত। সংসারের কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নাই,—এখন তাঁর পেনসনের অবস্থা। উপীন মুদির দোকানের সামনে যে বাতা দিয়ে বসবার জায়গাটি আছে, সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে হুঙ্কার ছেড়ে বলেন "আর কেন উপনে—জীবন ভোর খেটে এসেছি, এখন একটু বিশ্রামের দরকার—বুঝলে কিনা।"

উপীন সবিনয়ে বলে, "তা হলেও মা ঠাকরুণ পাগল মান, কিনা, একটু আধটু সংসার দেখতে হয় বই কি।"

আনন্দ দত্ত কেবল হুঙ্কার ছাড়েন—।

বেলা বারোটা পর্যন্ত পাড়ায় ঘুরে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন, তখন বাড়িতে কাংস্যকণ্ঠ খনখনিয়ে ওঠে—"বলি, ও কালামানি...—বাড়ি না ফিরলেই হতো—ভাতটা না হয় দোকানেই বয়ে দিয়ে আসতুম।"

পাড়ার লোকে শুনতে পায় কেবল একটা হুঙ্কার—

অর্থাৎ রাগারাগির বেলায় লোকটির কণ্ঠ চিরনীরব, বেশী উৎপীড়নে লাঠিটি মাত্র সম্বল করে পথে বার হয়ে পড়েন।

সকল সময়ই তাঁকে দেখা যায় উপীনের বারাণ্ডায়—মাঝে মাঝে পথের লোকদের ডেকে আলাপ করতে দেখা যায়—"বলি, এবার ধান হল কেমন? পটল কত করে সের, জমির খাজনা জমিদার বাড়িয়েছেন নাকি—ইত্যাদি।

বাড়িতে একমাত্র হুঙ্কার ছাড়া আর কোন শব্দ নাই।

আনন্দ দত্তের মস্ত বড় ত্রিতল অট্টালিকা আজ যেখানে দেখা যায়, পঞ্চাশ বৎসর আগে সেখানে ছিল পিতৃ-পুরুষের আমলের একখানা অতিজীর্ণ ভাঙ্গা ঘর, তার বয়স অন্ততপক্ষে দুই শত বৎসরের কম নয়, দুঃখিনী মা বহুকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন, পিতৃহীন শিশুটিকে মানুষ করতেন। দশ এগারো বৎসরের ছেলে আনন্দ দত্তকে তিনি প্রতিবেশী ব্যবসায়ী নারায়ণ পালের কলিকাতার দোকানে কাজ করতে পাঠিয়ে দেন।

দুই বৎসর পেট ভাতায় কাজ করে প্রথম বেতন হয় তিন টাকা, পরে মাসিক পাঁচ টাকায় দাঁড়ায়। আজকালকার দিনে এ বেতন তুচ্ছ মনে হলেও সেদিনে এই ছিল প্রচুর এবং এরই পরে নির্ভর করে আনন্দ দত্ত আজ বড়বাজারের বিখ্যাত বড় ব্যবসায়ী, লক্ষ লক্ষ টাকার অধিপতি, দেশেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

স্ত্রীর নাম পতিতপাবনী—

নেহাৎ সেকেলে মানুষ। গ্রামেরই মেয়ে এবং গ্রামেরই বধূ। কলিকাতায় প্রকাণ্ড বড় বড় দু'তিনখানা বাড়ি, মস্ত বড় কারবার ইত্যাদির কর্ত্রী হলেও তিনি তাঁর সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন নি।

জামা ব্লাউজ সেমিজের বালাই কোনকালে নেই, লালপাড়টা শাড়িতেই তাঁর সৌন্দর্য, লজ্জা নিবারণ জন্য বড় জোর একখানা গায়ের কাপড়ই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়। মুখের ঘোমটা এ বয়সেও খোলেন নি, বধূরা অথচ ঘোমটা কোনদিনই দেয় না। সংসারের কাজ করে পাড়ায় পাড়ায় লোকের বাড়ি ঘোরেন, কার অভাব আছে তা যথা-

"বলি, ও কালামানিষ্যি—ও সব আর চলবে না বলছি"

সাধ্য দূর করেন। বাড়ির ঝি-চাকরের সমস্ত কাজ যথাসাধ্য নিজে টেনে করেন, কারও মুখ শুষ্ক দেখলে তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না।

কর্মে তিনি বরাবরই অনলস, উপর্যুপরি উপযুক্ত দুটি তিনটি সন্তান মারা যাওয়ার পর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা যায়, সারাদিন নির্বাকে কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন, কাজ না পেলে যত রোখ পড়ে বেচারা আনন্দ দত্তের পর।

তবু অনেক শুভ অদৃষ্টের জোর যে আনন্দ দত্তও খুব কম কথা কানে নেন, অর্থাৎ কানে তিনি বরাবরই কম শুনতেন, আজকাল আরও কম শোনেন—অর্থাৎ চীৎকার করে না বললে তিনি শুনতেও পান না। পতিতপাবনী তাঁর নাম রেখেছেন "কালা মনিষ্যি", তিনি হেসে জবাব দেন—"পাগলী এই নামে ডেকে যদি শান্তি পাস্—পাক—চিরটা কাল "ওগো-হ্যাগো" শুনতে আর ভালো লাগে না।"

বড়বাজারের কারবার দিন দিন ফাঁপছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সে সব দেখাশুনা করেন, পিতা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে গাঁয়েই থাকেন, শহরের সঙ্গে প্রায় আট দশ বৎসর একেবারেই সম্পর্ক নাই বললেও চলে।

জগন্নাথ ঘাটের কাছে গঙ্গার উপরে বিরাট অট্টালিকা; লোকে বলে গঙ্গার নির্মল পবিত্র বাতাসে দেহ মনের ময়লা দূরে হয়ে যায়; কিন্তু সে বাড়িতে গেলে আনন্দ দত্তের হাঁপানি ধরে, তিনি কলকাতায় টিঁকতে পারেন না। গাঁয়ের বুকে তিনি মোটামুটি ভালোই থাকেন, গাঁয়ের সবুজ বাতাসে তাঁর হাঁফ ধরে না।

লোকে বোঝে না, তারা বলে—"বয়েস হয়েছে দত্ত মশাই, তিনকাল তো কেটে গেল, এখন ভগবানের নামটাম করুন, ধর্মকর্মে মন দিন—"

আনন্দ দত্ত হাতের মস্ত বড় লাঠিটার উপর চিবুক ন্যস্ত করে অর্ধনিমিলিত নেত্রে হুঙ্কার ছাড়েন—"হুম"—

দেশরক্ষা সমিতির লোকেরা এসে ধরে—"কিছু টাকা চাঁদা দিন, দেশের নানা অভাব—"

আনন্দ দত্ত হুঙ্কার ছাড়েন—"হুম"—

ব্রাহ্মণেরা পৈতা তুলে আশীর্বাদ করেন—"ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক দত্ত মশাই, আমাদের আশীর্বাদেই আপনার জয় জয়াকার হবে। ব্রাহ্মণদের দান করে স্বর্গের পথ মুক্ত করুন—"

আনন্দ দত্ত দুই চক্ষু মুদিত করেন—বোধ হয় দেখতে চেষ্টা করেন স্বর্গপথ কতদূর।

স্কুল কমিটির মেম্বর ও সেক্রেটারী এসে ধরেন,—"স্কুল—যেখানে ছেলেপুলেরা শিক্ষালাভ করে মানুষ হবে—সেখানে কিছু দান করুন দত্ত মশাই, আপনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—"

আনন্দ দত্ত মাথা নাড়েন—

ক্রীড়া সমিতি, থিয়েটার পার্টি প্রভৃতি সকলেই আসে, ব্যর্থ হয়ে ফেরে।

লোকে সকালে নাম করে না, বলে—"হাড়কঞ্জুস—মরলে চিল শকুনেও ছোঁবে না, স্বর্গ তো অনেক দূরের কথা।"

স্বর্গ যত দূরেই থাক, তার ভাবনা আনন্দ দত্ত করেন না, ঔৎসুক্যও তাঁর নাই। তিনি ততক্ষণ উপিনের দোকানে তাঁর শিশু-সঙ্গীগণ পরিবৃত হয়ে গল্প শুনতে এবং বলতে ব্যস্ত থাকেন। বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে গ্রামের শিশুদেরই তাঁর পরম ভক্তরূপে আশ-পাশে ঘিরে থাকতে দেখা যায়।

কুলপুরোহিত গোবিন্দ চক্রবর্তী সেদিন এসে ধরে বসলেন—আপনাদের পুরোহিত আমি যা হোক কিছু যা করে খাচ্ছি তা আপনার দৌলতেই। আমার ছেলেটাও আপনার দয়ায় গাঁয়ের ইস্কুলে পড়ছে, এবার ভাবছি—একটু বেশি লেখাপড়া শিখতে ওকে কলকাতার কোন ইস্কুলে দেব। যদি ওর পড়ার খরচটা দেন আর আপনার দোকানে খাওয়া থাকার ব্যবস্থাটা করেন, তা হলে—"

মাঝখানেই থেমে যেতে হল,—"হুম" শব্দ ছেড়ে আনন্দ দত্ত বোমার মত ফেটে পড়লেন, "পুরুতের ছেলেকে পুরুতের কাজই করতে দাও চক্কোত্তি, ওকে আর বাঁদর সাজিয়ো না। জাত ব্যবসা ছাড়া আর কিছু করতে যেয়ো না, আজকের দিনে অন্ন জুটবে না—এরপর পথের ধারে পানের দোকান, কি জুতো সেলাই করতে হবে দেখে নিয়ো।"

তারপরই যেন স্বগতভাবে বললেন, "ওই জন্যেই তো সব মরেছো, অধঃপাতে যেতে বসেছো। রামহরি মোড়লের ছেলে দুপাতা ইংরেজি পড়ে পাশ দিয়ে এসে চাষবাসকে তুচ্ছ করে যায় চাকরী করতে, ফলে যায় তার জমিজমা, দেশের বাড়িঘর; হরে ধোবার ছেলে লেখাপড়া শিখে ঢুকলো চাকরীতে, গেল তার পৈতৃক ব্যবসা, বাপের ভিটে। তারপর যদি চাকরী গেল—তারা দাঁড়াবে কোথায়—ছেলেপুলেদের খাওয়াবে কি? এমনি করে তোমরাও যে জাত-ব্যবসা ছেড়ে মরছো—এরপর ফিরে আর কি জায়গা পাবে দাঁড়াবার, দু মুঠো খেতে পাবার?"

চক্রবর্তী মুখ কালো করে চলে গেলেন, পথে নেমে প্রত্যেককে ডেকে বললেন, "পয়সার অহঙ্কারে দত্ত ধরাকে সরাখানা দেখছে কিনা তাই যাকে যা না বলবার তাকে তাই বলে যাচ্ছে। দেখো তোমরা এ তেজ, এ দর্প থাকবে না—থাকবে না, এই পৈতে ছুঁয়ে শাপ দিচ্ছি।"

কোন হিতৈষী চক্রবর্তীর পৈতে হাতে নিয়ে অভিশাপের কথাটা আনন্দ দত্তের কানে তুলে দিলে—কিন্তু আনন্দ দত্ত নির্বিকার, এত বড় অভিশাপ শুনেও তাঁর মুখের ভাব পর্যন্ত অটুট রইলো।

বৈবাহিক একদিন এই কালাপাহাড় লোকটিকে কিছু ধর্মতত্ত্ব শুনাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, "টাকা জমিয়ে রেখে ফল নেই বেহাই, পরের জন্যে কিছু খরচ করতে হয় বই কি?"

আনন্দ দত্ত নির্বাকে বৈবাহিকের ধর্মোপদেশ শুনে বললেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে—আগে নিজের ঘর বাঁচিয়ে প্রতিবেশী, তারপর গাঁয়ের লোক—তারপর ভিন্ন দেশে নজর দেবে। ধর্মের নাম করে যে যে-কোন কাজ করুক, আমি জানি সে সব ভণ্ডামী, কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া তাতে আর কিছু নেই। আমার যেখানে মন কাঁদে আমি সেখানে কাজ করি, আমি দেই দুস্থা বিধবাদের—যাদের কেউ দেখে না, যাদের বাপ ভাই রাজা হলেও তাদের থাকতে হয় দাসীর মত, স্বামীর সম্পর্কে কারও সঙ্গে সম্বন্ধ যায় ফুরিয়ে,—আমি দেখি তাদের। আমি দেই অনাথ শিশুদের—যারা একদিন মানুষ হবে—গড়ে তুলবে সংসার, সমাজ, জাতিকে করবে শক্তিশালী। অন্যায় আমি কোনদিন করি নি, কোনদিন করবও না—সেটা আমার অন্তে বুঝতে পারবেন বেহাই, এখন বুঝবেন না, আমি বুঝাতেও চাই নে।"

বৈবাহিক চুপ করে গিয়েছিলেন।

পথের ধারে প্রকাণ্ড বড় পুষ্করিণী কাটা হয়, শত শত পুরুষ মেয়ে সেখানে মাটি কাটে।

একটা নারিকেল গাছ তুলে অন্যত্র সেটা পুঁততেই লাগলো কয়েকটা দিন—একেবারে মারা গেল না, কারণ হিন্দু শাস্ত্রে নারিকেল গাছ ব্রাহ্মণ, সেইহেতু সে অবধ্য।

গাঁয়ের লোকের গাত্রদাহ হয়—প্রতিদিন শত শত লোক দিন-মজুরীতে বড় কম পায় না—অথচ তারা কেউ কিছু পায় না।

জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ রাগ করে বলে, "এই দুঃসময়ে যুদ্ধের দরুণ লোকের আয় কমে গেছে, আর আপনি কিনা এই সময় অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করছেন বাবা?—"

আনন্দ দত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর রাখেন, গোঁ গোঁ করে জিজ্ঞাসা করেন—"টাকা আমার না তোমার?

উদ্যত ফণা ফণীর মাথা অকস্মাৎ নুইয়ে পড়ে—

আনন্দ দত্ত সামনের দিকে হাতখানা প্রসারিত করে কেবলমাত্র বলেন—"যাও"—

পুত্র তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বাঁচে।

পুত্রবধূ দু'দিনের জন্য গাঁয়ে বেড়াতে এসেছিল,—শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়াবাড়ি সে সহ্য করতে পারে না—শাশুড়ীকে সম্বোধন করে বলে—"ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা। একটা পুকুর কাটাতে এই যে শত শত লোক রোজ খাটছে, হাজার হাজার টাকা এই যুদ্ধের বাজারে খরচ করা হচ্ছে, এর কি দরকার আছে শুনি? যে টাকাটা অনর্থক খরচ করা হচ্ছে, সে টাকা কি উঠবে?"

পতিতপাবনী অবাক্ হয়ে পুত্রবধূর মুখের পানে চেয়ে থাকেন, কতকটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন, "গরীবলোকগুলো এই যুদ্ধের বাজারে যে না খেয়ে মরে যাচ্ছে মা, ওদের এ বাজারে কাজ দেবে কে? একটা পুকুর কাটানো উপলক্ষ্য করে তোমার শ্বশুর এক ঢিলে দুই পাখী মারছেন। গাঁয়ে একটা ভালো পুকুর নেই,—এই পুকুরটা হলে গাঁয়ের লোকেরই উপকার হবে, এদিকে গরীব লোকগুলোও এই যুদ্ধের বাজারে দিনমজুরী করে যা পাচ্ছে তাতে খেয়ে বাঁচবে।

পুত্রবধূ অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেল।

সে হাসি পতিতপাবনীর বুকে বেঁধে শানিত ছুরির মতই। খানিকক্ষণ তিনি তার পানে চেয়ে থাকেন। সেদিন দাসীর শরীর অসুস্থ থাকায় তার প্রাত্যহিক উঠান ঝাঁট দেওয়া কাজটা তিনিই করছিলেন, যে ঝাঁটাগাছটি দিয়ে তিনি ঝাঁট দিচ্ছিলেন, সেইটি হাতে নিয়েই তিনি কর্তার সন্ধানে পথে বার হয়ে পড়লেন।

চৌমাথার মোড়ে তখন শিশুবাহিনী পরিবৃত আনন্দ দত্ত মহানন্দে গল্প জুড়েছিলেন। গাঁয়ের সকল শিশুর দাদু পদবীতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন; এই অতি সরল ও শিশুপ্রকৃতির লোকটিকে শিশুরা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়েছিল এবং অসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে মিশতো।

মাঝে মাঝে এদের কল্যাণে তাঁর খরচও হতো মন্দ নয়। আজও এরা চড়িভাতির জন্য দাদুর আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে এবং এর মধ্যেই দলের সর্দার বলাই পাঁচটা টাকা ট্যাঁকেও গুজেছে। আনন্দ দত্ত বলছিলেন—এই টাকা দেওয়ার কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না হয়। সেবার তাদের টাকা দেওয়ার কথা দলের কোন বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা প্রকাশ হওয়ায় তাঁকে প্রত্যেকের কাছ হতে অযাচিত প্রশংসা শুনতে হয়েছিল, যাতে করে তিনি প্রায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কোনদিন এদের কোন কাজে তিনি হাত দিবেন না।

ইতিমধ্যে ঝাঁটা হস্তে পতিতপাবনী গিয়ে পড়লেন—"বলি ও কালামানিষ্যি, পুকুর কাটানোর নাম করে এই যুদ্ধের বাজারে এমনি করে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিচ্ছো, পাঁচভূতে যে সব লুটে নিলে। এখনও বলছি, পুকুর খোঁড়া বন্ধ কর ওসব আর চলবে না বলছি।"

আনন্দ দত্তের মুখে মৃদু হাসি—যা প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না।

খানিকটা এগিয়ে এসে চাপা সুরে বললেন—"এখানে আর চেঁচামেচি করো না পাগলি, বাড়ি যাও। পুকুর খোঁড়ার কথা আমি বুঝবো, তোমার তা নিয়ে মাথা গরম করতে হবে না।"

স্ত্রী দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন, "বলি ওদিকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারো, আর আমি কিনা পাঁচটা টাকার বেশি পাইনে,—কেন, আমার কোন দাবি নেই, আমি কি বাণের জলে ভেসে এসেছি?"

'কালামানিষ্যি' লাঠির পরে চিবুক ন্যস্ত করে গম্ভীর সুরে কেবল হুংকার ছাড়লেন, "হুম্—"

এতক্ষণে বুঝি মনে পড়লো মাথায় কাপড় নাই, পতিতপাবনী সলজ্জে ঝাঁটাটা বাঁ হাতে ধরে অপর হাতে মাথায় কাপড় টেনে চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন, "আজই আমায় পাঁচটা টাকা দিয়ো বাপু, ও পাড়ার সন্তু বিছানায় পড়ে আছে,—বলেছি কিছু দেব তাকে, টাকাটা পেলে আজই দিয়ে আসব, কথা রক্ষে হবে।"

ট্যাঁক হতে পাঁচটা টাকা বার করে স্ত্রীর হাতে দিয়ে আনন্দ দত্ত গম্ভীর মুখে বললেন, "এ রকম হাত আলগা করো না পাগলী, বুঝে সুঝে খরচ পত্তর কোর। তোমার মন আর মাথা দুই-ই খারাপ বলে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে কম লোকে তো তোমায় ঠকায় না। একটু বুঝে দান ধ্যান করো—"

অঞ্চলে টাকা কয়টি বেঁধে সেই চৌমাথার পরেই ঢিপ করে স্বামীর পায়ে ভক্তিভরে একটা প্রণাম করে পতিতপাবনী বাড়ি ফিরলেন।

আনন্দ দত্তের ব্যারাম—অবস্থা খারাপ।

মাথার কাছে বসে স্ত্রী; কয়দিন তিনি একেবারেই ওঠেন নি, আহার নিদ্রা তাঁর নাই। যে ঘুমের জন্য তিনি জীবনে বহুবার সকলের কাছে অপদস্থ হয়েছেন, সেই ঘুম তাঁকে একেবারেই ত্যাগ করেছে।

তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আনন্দ দত্ত বললেন, "আমায় এবার যেতে হবে পাগলি, তোমায় একা এদের মাঝে ফেলে রেখে যাব না, তুমিও এসো।"

গ্রামের সকল কাজে উদ্যোগী রতন রায় এসে বললেন "এই সময়ে যা করবার করে যান দত্ত মশাই, দেশের জন্যে কিছু দান করুন, ভগবানের নাম করুন।"

চোখ মুদে আনন্দ দত্ত মাথা নাড়লেন, অতি কষ্টে বললেন, "আমার কাজ আমি করেছি অনেকদিন আগে, উইল রইলো—সবাই দেখবে।"

গাঁয়ের লোক যার সামনে প্রশংসায় মুখর, পিছনে অজস্র নিন্দাই করেছে, সেই লোকটি একদিন নিঃশব্দে চোখ মুদলেন, স্ত্রী তাঁর বুকের উপর সেই যে আছাড় খেয়ে পড়লেন, জীবন্ত অবস্থায় কেউ তাঁকে তুলতে পারলে না। একই চিতায় স্বামী-স্ত্রীর দেহ দাহ হল।

মৃত্যুর পর প্রকাশ হল তাঁর অসম্ভব দানের কথা—যখন শুধু সেই গাঁয়েরই অনাথ আতুর নয়, আশপাশের শত শত গাঁ হ'তে দলে দলে লোক তাঁর শেষ-সময় জেনে ছুটে এসে অশ্রুপূর্ণ চোখে নির্বাকে সেই বাড়িখানার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কত আছে বিধবা,—কত অনাথ শিশু, কত পঙ্গু, অসহায় দুস্থ লোক; কেউ জানে না—এরা প্রত্যেকে আনন্দ দত্তের কাছ হতে নিয়মিত মাসহারা পেয়েছে, ভিতরে মায়ের কাছ হতে কাপড়, আহার্য পেয়েছে।

কেউ জানে না এই লোকটি কত বড় দাতা ছিলেন, তিনি কোনদিন নিজের প্রচার করেন নি, দক্ষিণ হাতে দান করেছেন, বাম হাতে তা জানতে পারে নি। গাঁয়ের প্রত্যেকে প্রত্যেকের অজ্ঞাতে তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছে, অথচ কেউ তাঁকে নিন্দা করতেও ভোলেনি।

মৃত্যুর পর তাঁর উইলের মর্ম প্রকাশিত হল।

তিনি জানিয়েছেন,—তাঁর বিশাল কারবার তাঁর পুত্রের জন্য রইলো, আর রইলো নগদ কুড়ি হাজার টাকা এবং কলকাতার বাড়িখানা। এখানকার এ বাড়ির সঙ্গে তাঁর পুত্রের কোন সম্পর্ক রইলো না, এটা তিনি একটা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান করলেন—এই শিক্ষালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবারই রইলো। এখানে কেবল লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হবে না, হাতে

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্তমান যুদ্ধে, যুদ্ধসংক্রান্ত নানা কথার মধ্যে আমরা 'কেমুফ্লাজ' (camouflage) কথাটির প্রয়োগ বহু ক্ষেত্রেই পাই। গত মহাযুদ্ধে কিন্তু এই কথাটির ব্যবহার খুব বেশী পাওয়া যায় না। 'কেমুফ্লাজ' কথাটির উৎপত্তি ফরাসী দেশীয় ভাষা 'কমুফ্লে' (camouflet) থেকে। ফরাসী দেশীয় ভাষায় এর অর্থ, এই যে —অপমানের উদ্দেশ্যে কোন লোকের মুখে একটা জলন্ত কাগজ ছুঁড়ে মারা। পরে এই ফরাসী শব্দ থেকেই ইংরেজীতে কেমুফ্লাজ কথার উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় 'কেমুফ্লাজ' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, কৌশল দ্বারা আত্মগোপন করা। এখন কোনরূপ সামরিক আত্মগোপনের কলা কৌশল সম্বন্ধে কিছু বোঝাতে গেলে এই 'কেমুফ্লাজ' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

এখন যুদ্ধে আত্মগোপনের কৌশল বলতে আমরা কি বুঝি, সেইটে দেখা যাক। যুদ্ধে দুপক্ষই চেষ্টা করে যে কোন রকম ফাঁকি অথবা কৌশলের দ্বারা অপর পক্ষকে কাবু করা যায় কি না। এজন্য দুপক্ষই, শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে সামরিক বস্তুগুলিকে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখে, অথবা কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গোপন রেখে অথবা ধূম্রজালের আবরণ সৃষ্টি করে, তার আড়াল থেকে হয় আক্রমণ করে অথবা আত্মরক্ষা করে। আর এই সব ধরণের সামরিক আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করাকেই 'কেমুফ্লাজ' বলা হয়।

পুরাণে মেঘের আড়াল থেকে লুকিয়ে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে বিমানপোতের ধোঁয়ার আড়াল থেকে যুদ্ধ দেখে, আমরা আর ইন্দ্রজিতের আকাশ-যুদ্ধের সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি না। এছাড়া এখনও বহু অসভ্য দেশের লোকেরা, যুদ্ধের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ শাখার দ্বারা নিজেদের আবৃত করে, আর না হয় নিজেদের শরীর বিচিত্র রংএ চিত্রিত করে' অল্প অল্প করে' অগ্রসর হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে। মধ্যযুগের ইউরোপে এবং আমাদের দেশে যুদ্ধের সময় এই বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অথবা অন্য উপায়ে আত্মগোপন করে' যুদ্ধ করার সম্বন্ধে বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

এর পর আমাদের জগৎ ছেড়ে আমরা যদি প্রাণিজগতের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে সেখানেও প্রাণীদের কেমুফ্লাজের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণিজগতে যুদ্ধ চলেছে অবিরাম— খাদ্য এবং খাদকের মধ্যে।

এখানে সবল প্রাণী, দুর্বল প্রাণীর ওপর " কারণে অকারণেই আক্রমণ করছে। শক্তিশালী পক্ষ, এর জন্য দুর্বল পক্ষকে কারণও দেখায় না, আর সাবধান হবারও সুযোগ দেয় না। দুর্বল পক্ষ, সবল পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, মানুষের মত সুবিচার প্রার্থনা করবার সুযোগ পায় না।

আমাদের মনে তাহলে এই প্রশ্নটাই এখন উঠতে পারে যে, সবল যদি সব ক্ষেত্রেই দুর্বলের ওপর কারণে অকারণে আক্রমণ করেই চলে, তবে দুর্বল প্রাণীদের অস্তিত্ব আজ জগতে আছে কি করে। প্রকৃতির নিয়মেই এটা সম্ভব হয়েছে। সেটা হচ্ছে প্রাণিজগতের আত্মগোপন কৌশল—যেটাকে এদের 'কেমুফ্লাজ' বলা যায়।

প্রাণীদের আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করতে হয় দু কারণে। হয় শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আর না হয় শত্রুকে আক্রমণের জন্য। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণীদের আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করতে হয়।

প্রকৃতি আত্মগোপনের জন্য, প্রাণীদের বিভিন্ন ধরণের দৈহিক বর্ণ, গঠন, আকৃতি ইত্যাদি দিয়েছে। এর দ্বারাই প্রাণীরা আত্মগোপন করবার সুবিধা পায়। এই আত্মগোপন দ্বারা অনেক সময় দুর্বল প্রাণীরা সবল প্রাণীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে। এই সময় এদের গায়ের রং অথবা আকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, অন্য পক্ষ এদের মোটেই লক্ষ্য করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই সব প্রাণীরা এমন একটা অদ্ভুত ধরণের আকৃতি ধারণ করে, কিংবা শরীরটা এমন একটা শক্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যে শত্রু এদের আক্রমণই করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব প্রাণীরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হ'বা মাত্র, শরীরের ভেতর থেকে, হয় দুর্গন্ধ আর না হয় বিষাক্ত রস এমনভাবে ছড়ায় যে, আক্রমণকারী আর এদের কাছে অগ্রসর হয় না। দ্রুতগতিও দুর্বল প্রাণীদের একটি আত্মরক্ষার সহায়।

প্রাণিজগতে এই আত্মগোপনের কৌশল বা কেমুফ্লাজের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বাঘ যখন জঙ্গলে, ঝোপের ভেতর অথবা প্যান্থার গাছের ওপর ডাল-পাতার ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সব স্থানে থেকে এরা শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। এদের এরূপভাবে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হয়,—এই কারণে যে, সূর্যের আলো ঘাস আর গাছের পাতার ফাঁকের ভেতর দিয়ে এদের গায়ে পড়ে—এদের রংএর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় বলে। এইজন্যই শিকারীরা বলে যে, বনের মধ্যে আলো অন্ধকারে হিংস্র বাঘ ইত্যাদি শিকার করা খুবই শক্ত।

হরিণ জাতীয় প্রাণীদের শত্রু অনেক। এদেরও আত্মরক্ষা করতে হয়, জঙ্গলের আলো অন্ধকারের মধ্যে নিজের দেহের রংএর সঙ্গে মিলিয়ে আর না হয় নিজেদের দ্রুতগতির সাহায্যে।

'অপোসাম' নামে এক জাতীয় জন্তু অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়, যারা শত্রুর সম্মুখীন হলেই মৃত্যুর ভান করে' পড়ে থাকে। খুব সম্ভব এদের এই ধারণা বোধ হয় যে—মৃতের মত পড়ে থাকলে, শত্রু মৃত মনে করে আর কোন অনিষ্ট করবে না। এই অপোসামের, মৃতের মত ভান করা থেকেই, বর্তমানে 'মৃত্যুর ভান করা' ভাবটি প্রকাশ করতে গেলে ইংরেজীতে 'অপোসাম' কথাটি প্রয়োগ করা হয়।

কীট পতঙ্গ, সরীসৃপ এবং সর্প ইত্যাদির মধ্যে বহু প্রাণী পাওয়া যায় যেগুলি মৃতের মত ভান করে' থেকে শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে।

এখানে কথামালার ভল্লুক এবং দুই বন্ধুর কথাই মনে পড়ে। অবশ্য সত্য সত্যই, ভল্লুক মৃত প্রাণীর দেহ খাদ্যরূপে স্পর্শ করে কিনা সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না।

অনেক সময় শোনা যায় যে, খরগোশ, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে, কোথাও আত্মগোপনের সুবিধা না করতে পারলে, সেই স্থানেই চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে। কারণ, খুব সম্ভব খরগোশের ধারণা,

এই যে, নিজের চোখ বন্ধ করে' থাকার দরুণ সে যেমন শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে না, শত্রুও আর তাকে দেখতে পাবে না। এটা যে কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদরাই বলতে পারেন।

'আর্মাডিলো' বা পিপীলিকাভূক্ একটি নিরীহ প্রাণী। এদের সমস্ত শরীর বর্মের মত শক্ত আবরণে ঢাকা। শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এরা লেজ এবং মাথা পেটের নীচে গুটিয়ে নিয়ে একটা গোলাকৃতি বস্তুর আকার ধারণ করে। এতে শত্রু হয় এদের ভাল

পিপিলীকা ভূক প্রাণী

করে লক্ষ্য করতে পারে না—আর না হয় সমস্ত শরীর বর্মের দ্বারা আবৃত থাকায়, এদের কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারে না।

সজারু হচ্ছে আর একটি নিরীহ গোবেচারা জন্তু। এদের সমস্ত শরীর লম্বা লম্বা শক্ত ছুঁচলো কাঁটার দ্বারা আবৃত। সাধারণ অবস্থায় এই কাঁটাগুলো শরীরের ওপর শায়িত অবস্থায় থাকে। কিন্তু শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই কাঁটা খাড়া হয়ে ওঠে এবং তখন এদের চেহারা দেখে আক্রমণকারী ভয় পায়। এর পরেও যদি শত্রু এদের আক্রমণ করে, তাহলে সজারু শত্রুকে কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। আর শত্রু এত বড় কাঁটার দরুণ বিশেষ সুবিধাও পায় না।

বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পাখীদের ডানার ওপরকার রং বেশ গাঢ় ধরণের হয় আর পেটের তলার রং ফিকে হয়। পাখীরা যখন ডানা বন্ধ করে' গাছের ওপর বা নীচে বসে থাকে তখন ওপর থেকে এদের ভাল করে লক্ষ্য করা যায় না। আবার যখন এগুলো ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায়, তখন নীচে থেকে এদের আকাশে খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশের রংএ মিশে যায়। অনেক পাখীর ডানার রং আবার এমন হয় যে, যে-সব স্থানে এরা বসবাস করে, সেখানে এরা মিশে থাকে।

সাপের মধ্যে 'কেমুফ্লাজের' বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে লাউডগা বা পুঁইডগা নামে একরকম সাপ পাওয়া যায়। এগুলো নির্বিষ সাপ। সবুজ লতা-পাতার মধ্যে এই সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং সম্পূর্ণরূপে সবুজ হওয়ার দরুণ, এগুলো সহজেই গাছের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারে। লাউডগা অথবা পুঁইডগা নাম হবার কারণ এই যে রং এবং চেহারায় এগুলো লাউ বা কুমড়োর ডগা অথবা পুঁই ডাঁটার মত দেখতে হয় বলে। খুব নিকটে গিয়েও এদের অনেক সময় অস্তিত্ব বোঝা যায় না। এজন্য মানুষ অজানিতে এর কাছে গেলে, এগুলো ভয়ে অনেক সময় মানুষের ওপর লাফিয়ে পড়ে। গাছের রংএর সঙ্গে মিশে থাকার দরুণ, এরা খুব কাছ থেকেই এদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

এক জাতের কেউটে সাপ আছে যে-গুলোর গায়ে পরিষ্কার কালো এবং হলদে রংএর দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এদিকে ঠিক এই জাতীয় দাগ আবার, এক জাতের নির্বিষ সাপের গায়েও পাওয়া যায়। এতে বোধ হয় দু পক্ষেরই সুবিধা হয়। নির্বিষ সাপ-গুলোর বিষাক্ত সাপের সঙ্গে রংএর মিল থাকায়, বিষাক্ত সাপ ভেবে শত্রু আর এদের আক্রমণ করে না।—এদিকে বিষাক্ত সাপের, নির্বিষ সাপের গায়ের রংএর সঙ্গে মিল থাকার দরুণ অজানা শত্রুকে আক্রমণ করার সুবিধা পায়।

অনেকেরই ধারণা আছে যে, পৃথিবীতে দু মুখো সাপ বলে একরকম সাপ আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দু মুখো সাপ বলে কোন সাপই মানুষের চোখে পড়ে নি। যাকে আমরা দু মুখো সাপ বলি, সেগুলো প্রকৃতির 'কেমুফ্লাজে'র উদাহরণ। এই সাপ বালিতে বাস করে। এরা মুখের দিক থেকে শরীরের প্রায় অর্ধেকটা বালির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। লেজের দিক থেকে শরীরের বাকি অংশটা বালির বাহিরে বের করে রাখে। বালির মধ্যে মুখ ঢোকান থাকার দরুণ এরা শত্রুর আক্রমণ লক্ষ্য করবার সুযোগ পায় না। কিন্তু প্রকৃতি এদের শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার উপায় করে দিয়েছে। এদের লেজের দিকটাও দেখতে ঠিক মুখের মতই। শত্রু এদের লেজের দিকে মুখের আকৃতি দেখে, আসল মুখ মনে করে' আর কাছে অগ্রসর হয় না। সত্যই খুব নিকটে গিয়ে লক্ষ্য করলেও এদের কোনটা মুখ, আর কোনটা লেজ, সেটা বোঝা যায় না।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাইথন এবং ময়াল জাতীয় সাপ বড় বড় গাছের মোটা ডাল কিংবা গুঁড়ির সঙ্গে নিজেদের শরীর জড়িয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোন প্রাণী এই সব গাছের তলায় আসা মাত্রই, এরা শিকারকে আক্রমণ করে। এই সব সাপ গাছের সঙ্গে এরূপভাবে জড়িয়ে থাকে যে, দেখলে মনে হয়, বুঝি কোনরূপে বন্য-লতা গাছটাকে জড়িয়ে রয়েছে অথবা গাছেরই মোটা শিকড় গাছের তলায় জড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শিকারীরাও ভুলে এদের হাতে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

মালয় দেশের জঙ্গলে এক ধরণের সাপ পাওয়া যায়, যারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রং বদলায়। শৈশবে এগুলো সবুজ ঘাস এবং পাতার মধ্যে গাছের তলায় বাস করে। ঘাস পাতার মধ্যে

গাছের পাতার মধ্যে লাউ ডগা বা পুঁই ডগা সাপ

বাস করার দরুণ এ সময় এদের গায়ের রং সবুজ হয়। পরে বড় হবার পর, এগুলো ঘাস পাতার আশ্রয় ছেড়ে গাছের ওপর এবং গাছের ডালে আশ্রয় নেয়। গাছের ওপর আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে এদের সবুজ রং সম্পূর্ণরূপে বদলে পিঙ্গল বর্ণ হয়ে ডালের সঙ্গে মিশে যায়।

এক ধরণের গিরগিটি আছে যেগুলোর গায়ের রং ঠিক গাছের বাকলের মত। এগুলো যখন গাছের বাকলের সঙ্গে গায়ের রং মিলিয়ে বসে থাকে, তখন এদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। অনেক সময় গির-গিটি শত্রুর সম্মুখীন হলেই গলার তলা এবং ঘাড়ের ওপর দিকটা

ফুলিয়ে তোলে। ঘাড়ের ওপরের দিকের কাঁটাগুলো দাঁড়িয়ে ওঠে। শত্রু এদের এই অবস্থা দেখে আর এগুতে সাহস পায় না।

আমরা সকলেই প্রায় বহুরূপী দেখেছি। এগুলোর শরীরের রং বদলাবার ক্ষমতা আছে। কিছুক্ষণ একটা বহুরূপীকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এগুলোর শরীরের সামনের অংশটা লাল, নীল, হল্‌দে ইত্যাদি বিভিন্ন রংএর হচ্ছে। এই ধরণের রং বদলাবার জন্যই এগুলোকে বহুরূপী বলা হয়। রং বদলে বহুরূপী আশে পাশের রংএর সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

ব্যাংএর মধ্যে 'ট্রী ফ্রগ' অথবা গেছো ব্যাং বলে এক জাতের ব্যাং পাওয়া যায়। এরা গাছের সবুজ পাতার মধ্যে বাস করে বলে এদের গায়ের রং সম্পূর্ণরূপে সবুজ। গাছের ডালে এবং পাতায় আটকে

সবুজ গেছো ব্যাং

থাকবার জন্য এদের পায়ের গঠনও সেইরূপভাবে তৈরী। গাছের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে লম্বা লাফ দেবার ক্ষমতাও এদের অসাধারণ। একবার লাফ দিয়ে গাছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে আর এদের খুঁজে বা'র করা যায় না।

এই প্রসংগে আমার এই গেছো ব্যাংএর সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলি।

শিলং এবং শ্রীহট্টের মোটর চলাচলের পথে 'পাইনউসলা' বলে একটা জায়গা আছে। কার্যবশত একবার পাইনউসলায় গিয়েছিলাম। এখানে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা সবুজ গেছো ব্যাং চোখে পড়ে। ওদেশীয় একটি লোকের সাহায্যে এই ব্যাংটি ধরি।

পরে যতদূর সম্ভব এর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে একটা বড় জালের খাঁচার ভেতর এই ধৃত ব্যাংটাকে রাখি। খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন পোকা মাকড় দিতে লাগলাম। প্রথম কয়েক দিন ব্যাংটা কোন খাদ্যই গ্রহণ করল না। পরে দেখলাম যে, ডানা শুদ্ধ পিঁপড়ে এবং উই পোকাই ব্যাংটি খাদ্য হিসাবে বেশী পছন্দ করে। প্রথম দিকে খাঁচার মধ্যে কিছু ভিজে খড় দিয়েছিলাম। কয়েকদিন বাদে দেখা গেল যে ব্যাংটার গায়ের সবুজ রং ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। তখন প্রত্যেকদিন খাঁচার ভেতর সবুজ ঘাস আর গাছের সবুজ পাতা শুদ্ধ ডাল রেখে দেওয়াতে ব্যাংটার ফিকে রং আবার সবুজ হতে লাগল। বলা যায় না, এই সব সবুজ ঘাস' পাতা দেওয়াতে এর রং আবার সবুজ হতে আরম্ভ করেছিল, না খাদ্য গ্রহণ করার দরুণ হয়েছিল।

'কাটেল ফিস্' একটি সামুদ্রিক প্রাণী। এই 'কাটেল ফিস' শরীরের ভেতর থেকে একরকম কালচে রস নির্গত করতে পারে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে এরা শরীরের ভেতর থেকে এই রস বার করে' আশে পাশের জল ঘোলা করে দিয়ে—ঘোলা জলের আবরণের আড়ালে থেকে এরা শত্রুর কাছ থেকে পালাতে সক্ষম হয়।

প্রাণিজগতের কেমুফ্লাজের সব চেয়ে বেশী দৃষ্টান্ত কীট-পতঙ্গের মধ্যেই পাওয়া যায়। কীট পতঙ্গের সব ক্ষেত্রেই আত্ম-গোপনের কৌশল অবলম্বন করতে হয় নিজের আত্মরক্ষার জন্যে। প্রায় সব প্রাণীই এদের শত্রু বলা যায়। একেতো নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই সবল দুর্বলের ওপর আক্রমণ করছে, তারপর অন্যান্য প্রাণীদের তো কথাই নেই।

প্রথমে 'স্টিক ইনসেক্ট' বা বাঙলায় যাকে কাঠীপোকা বলা যায় তার কথাই ধরা যাক। সত্যই 'স্টিক ইনসেক্ট' খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেও, একটা কাঠী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। এগুলো ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ। এগুলো হয় উড়ে, অথবা লাফ দিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যায়। 'স্টিক ইনসেক্ট' যখন গাছের ডালে বসে থাকে তখন অনেক সময় এদের সরু ডাল মনে করে' হাতে
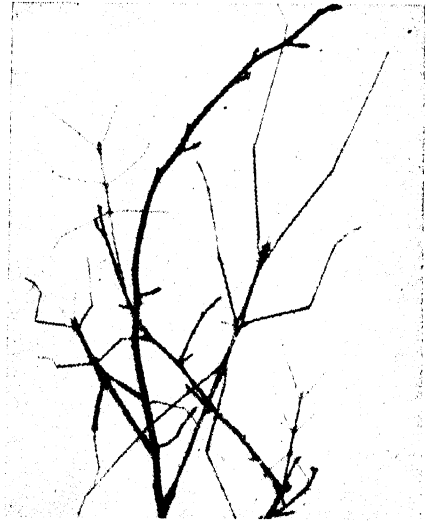
কাঠী পোকা গাছের ডালে বসে আছে

নিয়েও পোকা জাতীয় যে কিছু—তা না বুঝতে পেরে ফেলে দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের নয়।

'স্টিক ইনসেকটের' চেহারা হয় সবুজ গাছের ডালের মত, আর না হয় সরু শুকনো ডালের মত দেখতে। দু ক্ষেত্রেই এই সরু ডালের মত শরীরের পাশ থেকে ঠিক শরীরের রংএর মতই সরু সরু পা বের হয়ে থাকে। এদের এই পাগুলোকে তখন ডালের সরু সরু ডাল অথবা পাতার ডাঁটা বলে ভুল হয়।

'লিফ্ ইনসেকট' বা পাতা-পোকা দেখতে ঠিক পাতার মতই মনে হয়। এগুলোর ডানা থাকার দরুণ এক স্থান থেকে আর একস্থানে উড়ে যেতে পারে। এদের ডানার রং এবং শরীর পাতার গায়ের রংএর হয়। সমস্ত ডানাটা পাতার মতই শিরা এবং উপশিরায়

ভর্তি। এরা যখন সামনের পা দিয়ে ডালের ওপর আটকে থাকে, তখন একটা গাছের পাতা ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

সেখানটিতে থাকা কালীন একটি বাতাবী লেবুর গাছে একটা পাতা-পোকা পেয়েছিলাম। এই পাতা-পোকাটা অন্য পাতা-পোকাদের চেয়ে অন্য ধরণের। অন্য-ধরণের এই জন্য বলছি যে, বোধহয় এগুলো শুধু লেবু গাছের পাতার মধ্যেই আত্মগোপন করবার জন্য প্রকৃতি এদের আকৃতি অন্য ধরণের করেছে। লেবু গাছের পাতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পাতার সম্মুখের একটা বড় পাতার অংশ ছাড়া পাতার গোড়ার দিকে একটু আলাদা ভাবে আর একটা ছোট পাতার অংশ আছে। ঐ লেবু গাছের পাতা-পোকাটারও শরীরের আসল অংশ ছাড়া আর একটি ছোট অংশও ঠিক লেবু পাতারই মত ছিল। পোকাটার কোন ডানা ছিল না। সমস্ত শরীর পাতার মতই পাতলা। বলা বাহুল্য যে রংটা সবুজ, আর পোকার সমস্ত শরীরে পাতার মতই শিরা এবং উপশিরা ছিল।

'কৌলিমা' এক জাতের প্রজাপতি। কৌলিমার ডানার ওপর দিকটা দেখতে বেশ রংচংয়ে। কিন্তু ডানার তলার দিকটা দেখতে ঠিক গাছের শুকনো পাতার রংএর। 'কৌলিমা' যখন কোন গাছের ডালে বসে তখন এদের ডানা এমনভাবে বন্ধ থাকে যে, ডানার ওপর দিকটার রং দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ডানার তলার দিকটা দেখা যায়। বন্ধ ডানার আকৃতি ঠিক পাতার মতই। এতে এদের সুবিধা এই যে, ডানার ওপরকার সুন্দর রং দেখে শত্রু আক্রমণ করতে এলেই এরা হঠাৎ কোন গাছের ডালে বন্ধ করে ফেলে। তখন আর এদের শত্রু ডানার ওপরকার রং দেখতে পায় না—ডানার তলার রং এবং আকৃতি মিলে একটা সম্পূর্ণ শুকনো পাতার মত হয়।

শুককীটরা সাধারণত সবুজ রংএর অথবা এমন রংএর হয় যে, গাছের মধ্যে এদের চট করে খুঁজে বার করা যায় না। শুককীটরা যদি না এরূপভাবে আত্ম-গোপন করতে পারত তাহলে এদের এতদিন নির্মূল করে
এদের এতদিন নির্মূল করে
দিত। কিন্তু প্রকৃতি সেদিকে লক্ষ রাখায় এরা শত্রুর হাত থেকে বাঁচে।

গাছের পাতার মত কৌলিমা প্রজাপতি

অনেক ক্ষেত্রে আবার এক জাতের শুককীট গাছের ডালে শরীরের সম্মুখের পা দিয়ে শরীরটা আটকে রেখে শরীরের বাকী অংশটা ডালের বাইরে সোজা করে নিশ্চল হয়ে থাকে। এদের গায়ের রং অবশ্য ডালের রংএর মত হয়। এই অবস্থায় এদের দেখলে

এক জাতের প্রজাপতি পাতার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে

সেই গাছের ডালের ছোট অংশ ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবাই যায় না।

অনেক ফড়িং আছে যেগুলো ঋতুর সংগে গায়ের রং বদলায়। বর্ষায় যখন সর্বদিক সবুজ রঙে ভরে ওঠে তখন ফড়িংগুলো দেখতে সবুজ রংএর হয়। আবার শীতের সংগে যখন সব গাছপালার রং বদলে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে তখন এই ফড়িংগুলোর গায়ে এই বর্ণের ছোপ দেখা দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রজাপতির ডানার ওপর এমন সব অদ্ভুত ধরণের রং করা থাকে যে, এগুলোকে কোন বড় প্রাণীর মুখ বলে ভ্রম হয়।

গাছের ডালের মত শুক কীট

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জননীর জন্ম
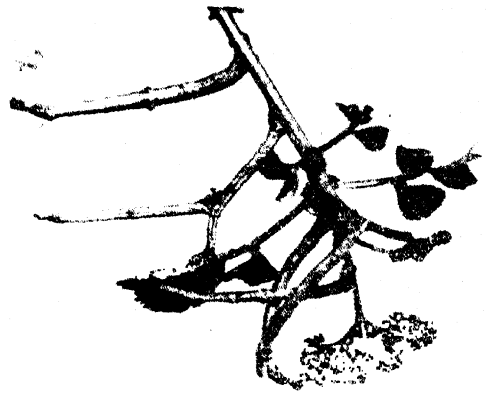
সুশীল জানা

গ্রামে ফিরে এলো রাধা—একা। এবং কথা মতো চৌধুরী বাড়িতে তার স্থানও হ'লো।

কিন্তু অতীতের জের তবু যেন শেষ হ'লো না। গরীব চাষীর বৌ সে। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই কবে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় স্বামীরই জ্ঞাতি ভাই বিপত্নীক নিবারণের আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর অসংখ্য অন্ধকার দিন। তার ঘোর যেন কাটতে চায় না জীবন থেকে।

কোথায় গেল রাধার সেই মেয়েটা—যার চেহারাটা হুবহু নিবারণের মতো!—কোথায় রেখে এলো তাকে রাধা!

গ্রামের মন্থর জীবনযাত্রার ধারায় হঠাৎ একটু চাঞ্চল্য জাগলো। সন্ধ্যার পর অটলের মুদি দোকানে বেচা-কেনা হয় না। তবু এসে ভিড় করে গ্রামের চাষী মজুরগুলি। গ্রাম-গ্রামান্তরের অনেক কথা হয় ঃ রাধার কথা ওঠে—তার মেয়েটির কথা ওঠে।

অটল অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বললো, সব বাজে কথা—বানানো কথা রাধার। এতদিন কেউ কোথাও ছিল না—আজ দরকার পড়তেই কোথায় সেই সুন্দরবন—সেখান থেকে মেয়ের মামা এসে হাজির। এলো আর নিয়ে চলে গেল মেয়েটাকে। অমনি বললেই হ'লো!

কথাগুলোর ধরণ ভালো লাগে না শিবনাথের : জোর গলায় প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই তার। এক কোণে চুপ করে বসে থাকে সে আর মনে মনে যুক্তি সঞ্চয় করেঃ তবে কি করবে রাধা! বাসব চৌধুরীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছেলে হওয়ার পর। তার পরিচর্যার জন্যে রাধার স্থান হতে পারে—কিন্তু গ্রামের ইতিহাস বিজড়িত তার মেয়েটার নয়। মেয়েটিকে তবে কোথায় রাখবে রাধা!

গ্রামের চৌকিদার গোপাল অনেক খোঁজ খবর রাখার গাম্ভীর্যে স্থির আর নিঃশব্দ। অটল ব'ললো তাকে, একটু ভালো ক'রে খোঁজ নে দিকিনি গোপাল। কে জানে—কোথাও নিয়ে গিয়ে হয়তো দিয়েছে শেষ ক'রে।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে শিবনাথেরঃ অটলের কথাই যদি সত্যি হয়! আর সরকারী চাকরী করে ওই গোপাল, কতো কিই তো করতে পারে! ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে যায় তার—বসতে আর ভালো লাগে না ওদের মধ্যে। নিঃশব্দে সে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো পথে। অন্যমনে চলতে চলতে ভাবেঃ এদের সব কথা রাধাকে জানাবে সে—সতর্ক করে দেবে। তারপর ঔদাসীন্যে ভ'রে যায় তার মন। গরীব চাষী আর একেবারে একা সে। রাধাকে অনুভব করে নিঃশব্দে—শাসনভীরু সামর্থহীন মনে। রাধা আমল দ্যায় না তাকে। তবু রাধাকে সব বলবে সেঃ যদি বিপদে পড়ে রাধা!

কিন্তু বিপদে পড়লো শিবনাথ নিজে। রাধা কটুকণ্ঠে গালা-গালি দিয়ে শাসিয়ে গেল, এর ব্যবস্থা ক'রবে সে।

তারপর বাসব চৌধুরীর অকরুণ শাসন। চৌধুরী বাড়ির আশ্রিত অনাথা একটি বিধবার কাছে কুপ্রস্তাব ক'রতে সাহস পায় শিবনাথ!

সন্ধ্যার পর আবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অটলের দোকানে। সবাই আসে—শুধু শিবনাথ আসে না।

—সত্যিই কিছু ব'লেছিল নাকি শিবনাথ! গোপালকে জিজ্ঞেস ক'রলো অটল, ভেতরের খপরটা ভালো ক'রে খোঁজ কর দিকিন গোপাল!

—ক'রেছি। শিবনাথ খারাপ কথা কিছু বলেনি। বুঝলে না—এখন চৌধুরীবাবু স্বয়ং।

হাসলো গোপাল। তারপর বললো, উঃ, সে কি মার! গোপালের চোখ মুখ কুঁচকে যায় প্রহারের তীব্রতার অভিব্যক্তিতে।

—এই, সব সাবধান।

অটল ভংগী ক'রে বলে—আর সবাই হাসে। ওদের তরল হাসির উচ্ছ্বাস বাইরের গভীর অন্ধকারে আর হাওয়ায় হঠাৎ একটা তরঙ্গ তুলে হুহু করে এগিয়ে গেল দূর মাঠের দিকে। একটি শেয়াল থমকে দাঁড়ালো মাঠের মাঝখানে, নিঃশব্দে গ্রামের দিকে তাকালো একবার—তারপর আবার আস্তে আস্তে মিশে গেল মাঠের সীমান্তের অন্ধকারে।

নতুন ধারায় আলোচনা হয় ওদের ঃ উদ্দাম জীবন—আর আদিম উত্তাপ। তার মাঝখানে রাধার সেই অপ্রত্যাশিত মেয়েটি নিঃশেষে হারিয়ে গেল।

গ্রামে ভালো লাগে না আর শিবনাথের। বর্ষার জন্যে উৎসুক হ'য়েছিল সে। বর্ষা নামলো—সেও চলে গেল গ্রাম ছেড়ে নতুন এক আবাদি চরে—চাষ আর বাস দুটোর উদ্দেশ্যেই। যাওয়ার সময় দেখা করে গেল সে রাধার সঙ্গে। অনেক কথা বলবে ভেবেছিল—কিন্তু বলা হলো না সব। রাধা উদ্যত চাবুকের মতো হেসে উঠলো তার মুখের ওপর।

শিবনাথ শুধু বললো, গরীব ব'লে আমারে ঘেন্না কর রাধা। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, কিন্তু আমি তোরে ভালোবাসতাম।

সে তো—গ্রামের সবাই ভালোবাসে রাধাকে। রাজা জানে। হি হি ক'রে হাসলো রাধা।

বললো, গরীবের আবার অতো সখ কেন! ছোটবাবুকে বলবো আবার?

শিবনাথ সভয়ে তাকালো চারদিকে—তারপর মুখ শুকনো করে চলে গেল দ্রুত পায়ে।

আবার সেই গ্রাম্য জীবনের নিরবচ্ছিন্ন মন্থর দিনের পর দিন—পুরাতন আর সহ। সন্ধ্যার পর অটলের দোকানে তেমনি ভিড় জমে। আগামী বর্ষা আর চাষের কথার মাঝখানে সবাই ডুবে যায় ওরা।

বর্ষা এসে পড়লো, দোকানের মাল-পত্রগুলো আনা হ'লো না। শিবনাথ—

হঠাৎ ভুল করে অটল—হঠাৎ মনে পড়ে, শিবনাথ নেই।

হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে অটলের।

—লোকটা বড়ো ভালো ছিল হে। এই মালপত্র আনার ব্যাপারে যখন যেখানে যেতে ব'লেছি—তক্ষুণি গিয়েছে। বুদ্ধিটা একটু মোটা ছিল বটে, কিন্তু স্বভাবটি বড়ো ভালো ছিল—ভারী অনুগত। ওই রাধাই তাড়ালো তাকে।

তারপর বর্ষা আর জীবন যুদ্ধ। শিবনাথ হারিয়ে গেল সেখানে। সন্ধ্যের পর অটলের দোকানে আর ভিড় জমে না। তার বন্ধ দোকানের সুমুখ দিয়ে গরু আর মানুষের পায়ের ছপ্ ছপ্ শব্দ বর্ষাভেজা অন্ধকারে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়—জল আর মাটির সঙ্গে সংগ্রামরত ওদের দুটি মাস।

আবার একদিন অলস সন্ধ্যায় অটলের দোকানের ম্লান আলোয় উত্তেজনায় লোকগুলি ভিড় ক'রে এলোঃ রাধা আর এ গ্রামে নেই। কোথায় গেল—কে জানে!

—গোপাল, ব্যাপারটা তো বুঝতে পারচি না! সাগ্রহে

জিজ্ঞেস ক'রলো অটল, হঠাৎ চলে গেল কেন!

—পালিয়েছে।

—শুধু শুধু পালালো!

—নষ্ট মেয়েমানুষ—তার আবার—হ্যা।

রহস্যের সব গভীরত্বটা ফু'য়ে উড়িয়ে দিতে চাইলো গোপাল।

—নাহে না, চৌধুরী বাড়ির তোয়াজ ছেড়ে শুধু শুধু পালাবার মেয়ে রাধা নয়।

তারপর হঠাৎ যেন আলো এসে পড়লো অটলের মুখে। বললো, আচ্ছা, খোঁজ নে দিকিন—বেদিনী বুড়ির কাছে গিয়েছিল কিনা! বিপদে-আপদে ছিল তো ওই বেদিনী বুড়ি—বুঝলি না, শেকড়, বড়ি-টড়ি অনেক রকম জানে বুড়ি। নিবারণ তবু মেয়ের মুখ দেখেছিল—হয়তো বাসব চৌধুরীর কপালে তা-ও জুটলো না।

অতুল বললে, খোঁজ নিয়েছিলুম—রাধা যায়নি সেখানে।

—সে তোকে জানিয়ে যাবে কি না! অটল খেঁকিয়ে উঠলো।

সকলে হাসে—সকলরবে হাসে।

আর রাধার কান্না পায়—অনেক দূরে গিয়ে রাধার কান্না পায়। নিরুদ্দেশ ভবিষ্যতে যতো দূর দৃষ্টি যায়—আবার সেই পুরোতন ভারবাহী ক্লিষ্ট দিন। কিছু টাকা দিয়েছে বাসব চৌধুরী—আর বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে বন্দুকের দিক মোটা মোটা আঙুল তুলেঃ অনেক দূরে চলে যাক্ রাধা—তার দূরবিসারী সম্ভ্রম সীমানার বাইরে—অনেক দূরে কোথাও।

রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছে রাধা। মৃত্যুকে ভয় করে সে। সে বাঁচতে চায়। কিন্তু কোথায় যে যাবে সে—ভেবে পায় না। শিবনাথের কথা মনে পড়ে। গ্রাম ছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত আকাশের মতো একটা নিরুদ্দেশ পৃথিবী আছে—আর সেখানে শুধু জানে সে শিবনাথকে।

—নদীচরের পথ কোন্ দিকে গো!

—সোজা সাগর কোণের দিকে।

কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকবার মতো ঘরটুকু, তার কোলেই ধান বন। দরজার সুমুখে বসে বসে অসংখ্য কল্পনার হাওয়ায় দোল খায় শিবনাথ কাঁচ ধানগাছগুলির মতো। আশৈশব সে পরের বাড়িতে খেটে খেটে মানুষ। দীর্ঘ দিন পরে আজ নিজের ছোট্ট অধিকারবোধটুক, প্রতিষ্ঠাটুকুর আনন্দ নিরুদ্দেশ অনাগতের মাঝখানে আত্মহারা করে দেয় তাকে। রাধার কথা মনে পড়ে—তাকে অনুভব করে সে সঙ্গীহীন জীবনে।

তারপর হঠাৎ একদিন চমকে উঠলো শিবনাথঃ রাধা।

হঠাৎ এখানে কেন রাধা—কোথায় যাবে সে!

এইখানেইতো এলো সে। আসার সময় কি বলে এসেছিল শিবনাথ—ভালোবাসার কথা না!

ক্ষণচঞ্চল একটি আনন্দের আবেগে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মতো হু হু করে রাধার ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল শিবনাথ। ঝড়—আর অরণ্যের আর্তনাদ।

ভালোবাসে বৈকি শিবনাথ—রাধাকে ভালোবাসে সে। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন রাধা—ঘরের ভিতরে আসুক সে।

আত্মীয়বন্ধুহীন একা মানুষ শিবনাথ—রাধাকে নিয়ে নূতন করে ঘর পাতবে সে। আগামী বছর বেশী করে চাষ করবে সে, আর একখানা ঘর তুলবে। ঘরের পেছনেই ডোবার মতো খুঁড়বে একটা—রাধার যাতে সুবিধে হয়। সব একা করবে সে—আর রাধাকে ভালোবাসবে। পেশীতে উল্লাস শিবনাথের। রাধা ছেড়ে যাবে না তো তাকে!

রাধা নিরুত্তর। শুধু নিঃশব্দে হাসলো সে—পুরাতন আর অভ্যস্ত হাসি। শিবনাথের মন ভরে না।

সকালে রোজ যেমন ঘুম থেকে ওঠে—তার অনেক আগে উঠলো শিবনাথ। দেখলো রাধা ঘরে নাই।

কোথায় গেল রাধা। হঠাৎ বুকে স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো। বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

ওইতো রাধা।—

রাধা বমি ক'রছে।

ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো শিবনাথ। রাধার অসুখ করেছে নাকি!

—হ্যাঁ, এই জন্যে চৌধুরীরা রাখলো না।

—তাইতো!—

এ অবস্থায় কি করা উচিৎ—ভেবে পায় না শিবনাথ।

শিবনাথ শুধু ব'ললে, শুয়ে পড় গিয়ে রাধা।

কোনো কাজ করতে হবে না রাধাকে—সব ক'রবে শিবনাথ। ভালো হ'য়ে উঠুক রাধা।

ঘরের সুমুখে কিছুটা জায়গা জুড়ে ফসলের ক্ষেত শিবনাথের। মাঠে চাষের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন ঘরের সুমুখের ওই জায়গাটুকুতে ব্যস্ত থাকে শিবনাথ। রাধা দরজার সুমুখে বসে বসে দেখেঃ শিবনাথের কাজ, তার শ্রমিক দেহের পেশীগুলির নৃত্য—আর হঠাৎ একটি নূতন জীবের। ভালো লাগে রাধার—শুধু দূর থেকে ভালো লাগা। কোথায় যেন নেশা লাগে।

গোরুতে বেড়াটা ভেঙে দিয়েছে এক জায়গায়। ভাঙা বেড়া জুড়তে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে শিবনাথ, একা পারছে না। এক-পাশ বাঁধতে গেলে আর একপাশ ঝুলে পড়ছে।

রাধা নিঃশব্দে উঠে এলো শিবনাথের পাশে—লোভ হয় তাকে সাহায্য করতে। হেসে বললো, আমি ধরছি—তুমি বাঁধো।

রাধার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো শিবনাথ—বললো, তোরে ডাকে কে! চুপ করে শুয়ে থাকগে যা। তোর অসুখ করেছে না! কদিন বমি করছিস্—

হঠাৎ রাধার মুখ শুকনো হয়ে যায়।

জোর করে হেসে বললো, এইটা বেঁধে নাও—যাচ্ছি।

—না, যা তুই।

—বেঁধে নাও না—

তারপর শিবনাথ শূন্যে তুলে নিয়ে এলো রাধাকে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো, ফের যদি উঠিস্।

রাধা হাসে—শিবনাথের দিকে চেয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করে।

শিবনাথও হাসে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে—ফিরে গিয়ে তার কাজের মধ্যে হারিয়ে যায়।

নতুন লাগে।

শিবনাথ যেন নূতন এক ধরণের পুরুষ। দিনের পর দিন ধরে তাকে যেন চিনতে হয় নতুন করে। বুঝতে পারে না সে—কি চায় শিবনাথ। শুধু এইটুকু বোঝে, অনেক কি যেন চায় শিবনাথ। সরল আর নির্বোধ লোকটা—তবু তাকে যেন বুঝতে কষ্ট হয় রাধার। আর ভালো লাগে তারঃ শিবনাথের অনেক কিছু চাওয়ার মাঝখানে নিজেকে যেন অনুভব করে সে। তারও কিছু যেন দেওয়ার আছে—যা সে জানতো না, যা তাকে জানতে দেওয়া হয়নি। নিশ্চিন্ত একটি নির্ভর, স্নেহ-সতর্ক একটি অন্তর, আর নির্বোধ শিবনাথ নতুন একটা জগতের পরিবেশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। এখানে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে রাধার। ভালো লাগে তার—ভালো লাগে না। নিজের ফাঁকিতে ছটফট করে সে। চারদিকে যেন তার প্রত্যক্ষ অপমান—তীব্র আর মর্মভেদী। ঘুমন্ত শিবনাথের বাহুবন্ধন, এই ছোট ঘরটুকু—এই এখানকার বিচ্ছিন্ন দিনের পর দিন শিথিল হয়ে পড়বে হয়তো একদিন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় শিবনাথের। অন্ধকারে উঠে বসলো সে। কি হলো রাধার—অমন ছটফট করছে কেন সে!

দুর্নিবার আবেগে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে নিজেকে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে হয় শিবনাথের ওপরে। মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় নিঃশেষে।

তবু সন্দেহ করে রাধা ঃ সব পুরুষকেই চিনেছে সে। সব শিথিল হয়ে পড়বে একদিন।

শিবনাথ বললো, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—ঘুমো তুই।

শিবনাথের একটা হাত চেপে ধরলো রাধা—বললো, বলো তুমি—আমাকে তাড়িয়ে দেবে না কোনো দিন।

রাধাকে তাড়িয়ে দেবে কেন শিবনাথ!

শিবনাথ তরল কণ্ঠে বললো, তুই-ই হয়তো তাড়িয়ে দিবি আমাকে কোনো দিন। —যেমন দিয়েছিলি—

পুরাতন কথা এসে পড়ে।

সমস্ত অতীতকে মুছে দেওয়া যায় না—অতীতের সমস্ত জেরকে! নতুন জীবন আর শিবনাথ।

—আমাকে একটু ওষুধ এনে দেবে! সেই বেদিনী বুড়িকে জানো তো! তার কাছে যাবে একবার!

—বেশ তো, কালই যাবো।

—খবরদার কিন্তু, গ্রামের কেউ যেন জানতে না পারে!

বাসব চৌধুরীর বন্দুকটা মনে পড়ে।

—বেশ তো, লুকিয়ে যাবো—লুকিয়ে চলে আসবো।

কিছুক্ষণ নীরবে ভাবলো রাধা। তারপর বললো, এক কাজ করো একেবারে বেদিনী বুড়িকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। কিছু টাকা দিয়ো—তাহলেই আসবে। আমার কাছে টাকা আছে কিছু—দেবো।

গোপন সঞ্চিত টাকার কথা এতদিনে বলে রাধা।

পরদিন শিবনাথ বেদিনী বুড়িকে আনতে চললো।

যাওয়ার সময় বললো, দুপুর বেলা আজ দুটি বৌ আলাপ করতে আসবে তোর সঙ্গে। একা থাকবি—তাই আসতে বলে এসেছি তাদের।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় করে রাধার। বললো কি বলেছ তাদের!

—কি আর বলবো! বলেছি, গাঁ থেকে আমার বৌ এসেছে।

শিবনাথ হাসলো। তারপর চলে গেল সে।

তারপর দিন দুপুর বেলা রাধার সঙ্গে আলাপ করতে এলো সেই দুটি বৌ—কিশোরী আর সরমা। একটি ছোট ছেলে সরমার কোলে।

মেয়ে দুটি তারই সমবয়সী, কুড়ির ভিতরে। দিব্যি হাসি-খুশি মুখ। সমাজ, সংসার, ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দুটি মেয়ে যেন পরিপূর্ণ। ওদের ভয় করে রাধার, ভালো করে কথা কইতে পারে না সে ওদের সঙ্গে। ভয়ানক অসহায় মনে হয় তার নিজেকে। শিবনাথ, ছোট এই ঘরটুকু হঠাৎ সুদূরে বলে মনে হয় তার।

সরমা সবিস্ময়ে বললো, ছেলেমেয়ে একটিও হয়নি! নষ্টও হয়নি একটিও?

রাধা নীরবে শুধু মাথা নেড়ে জানালো, না।

কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছা হয় রাধার।

সরমা সহানুভূতি জানালো।

কিশোরীর ছেলেমেয়ে হয়নি—হাতে তার অনেকগুলি মাদুলি বাঁধা। কৃত্রিম ক্রোধে সরমাকে বললো, বড় দেমাক হয়েছে তোর—ভাঙবো এবার। তোর ছেলের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে আমার মেয়ে। তারপর ফিক্ করে হেসে রাধার দিকে তাকিয়ে বললো আমার মেয়ে হলে ওর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো। আর আমার যদি ছেলে হয়! —তবে!—

ওদের অন্তরঙ্গ কথার মাঝখানে রাধা শুধু যেন নীরব দর্শক—কান্না পায় তার। শিবনাথ অপমানের দুটো পাহাড় যেন তার সম্মুখে খাড়া করে দিয়ে গিয়েছে।

কিশোরী রাধার দিকে চেয়ে বললো, আমার ছেলে হলে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো ভাই—সরমার তো মেয়ে নেই। কি বলো?

সমাজ—সংসার—ছেলেমেয়ে—স্বামী। রাধা আর যেন সোজা হয়ে বসে থাকতে পারে না।

সরমার ছেলেটি বড় দুষ্টু। মায়ের কথাবার্তার মাঝখানে ঘরময় ছুটোছুটি করে—আর এটা ওটা নাড়ে। বার বার ধমকে ধমকে শেষে একটা চড় কষিয়ে দিল সরমা। কেঁদে উঠলো ছেলেটা।

কিশোরী আদর করে কোলে তুলে নিল তাকে। সরমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, তোর ছেলেটা বড্ড ভারী সরমা। ওর বাপ কতো ভারী রে!

হেসে উঠলো তারপর ওরা দুজন—প্রাণপ্রাচুর্যের হাসি। নির্ভর আর সান্ত্বনায় ভরা।

যাওয়ার সময় কিশোরী বললো, তুমি ভাই একটা মাদুলি নাও—দুমাসের মধ্যেই আমি ফল পেয়েছি।

তারপর চলে গেল ওরা—বলে গেল, আবার একদিন আসবে।

ঘরটা হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

হঠাৎ তার মনে হয়, সে যেন ভুলে ঢুকে পড়েছে অন্য কারুর ঘরে। সব কিছু সাজানো রয়েছে তার চারিদিকে—তবু সব যেন তার স্পর্শের বাইরে। শিবনাথ—সরমা আর কিশোরী। সবল একটি পুরুষ আর তার ভালোবাসা। একটি দুষ্টু ছেলে আর ছোট সংসার একটি। গোধূলির অন্ধকার ঘন হয়ে আসে ক্রমশ। একা বসে বসে কতো কি যে ভাবে রাধা। সরমা আর কিশোরীর সখিত্ব তার সংকুচিত রুদ্ধ মনের দুয়ার খুলে দিলো আস্তে আস্তে আস্তে। একটি যদি ছেলেই হয় তার কি দোষ তাতে, কি ক্ষতি তাতে অন্যের! দিগন্তশায়ী আকাশে একটুকরো নিরুদ্দেশ মেঘের মতো ভেসে চললো সে ঃ তার কোনো অতীত নেই, সমাজ নেই—সংসার নেই, শিবনাথ নেই। সে কিশোরী, সে সরমা। সন্তান সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ সে, আর সরমার মতো অহংকারী। ছেলে বড়ো হবে, বিয়ে হবে তার—ঘর-সংসার করবে। কেন করবে না? কিশোরী ওরা তো তাই ভাবে।

—মা!—

চমকে উঠলো রাধা। হঠাৎ কাকে যেন মনে পড়ে।

একটি ছোট ছেলে। বললো, মা এসছিল না?

বোধ হয় সরমার ছেলে। রাধা ডাকলো, শোনো। তোমার মা কে?

ছুটে পালালো ছেলেটা।

সন্ধ্যার পর শিবনাথ এলো—সঙ্গে বেদিনী বুড়ি। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় রাধার।

তারপর হঠাৎ রাধার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শিবনাথের। চাপা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠলো রাধা। বাইরে তখন অনেক রাত আর নিঃশব্দ অন্ধকার।

কি হলো রাধার!

বিব্রত শিবনাথ রাধাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে।

—ওকে চলে যেতে বলো—চলে যেতে বলো—

—কে চলে যাবে!

ওই বেদিনী বুড়ি।

চলে যাবে কি! বরং কথা হয়েছে, বুড়িকে ভালো করে কাপড় দিতে হবে একখানি। সকালে উঠেই গঞ্জেরহাটে যাবে শিবনাথ—ফিরতে হবে সন্ধ্যে। বুড়ি বলেছে, কোনো ভয় নেই—ফিরে এসে দেখবে শিবনাথ, রাধা ভালো হয়ে গিয়েছে।

সব শুনলো রাধা—আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো ছেলে-

মানুষের সেবা। জীবনের সমস্ত কান্না যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে আজ পরম এক অন্তরঙ্গতার আকর্ষণে।

কম্পুকণ্ঠে শুধু বললো, না না—যেও না তুমি—ছেড়ে যেও না আমাকে।

হয়তো সে মরে যাবে—হয়তো দেখা হবে না আর। টাকা নিয়ে ভোর ভোর এখান থেকে চলে যাক বৌদিদি বাড়ি—তার দরকার নেই আর।

প্রাণিজগতের কেমুফ্লাজ

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

কীটপতঙ্গের মধ্যে এমন সব প্রাণী আছে যেগুলো এদের শত্রুদের কাছে খাদ্য হিসেবে সুস্বাদু হয় না। তার কারণ, হয় এই সব প্রাণী বিরক্ত কিম্বা বিস্বাদ হয়; আর না হয় এগুলো শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে এমন এক বিষাক্ত রস অথবা দুর্গন্ধ ছড়ায় যে, শত্রু আর এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না।

অনেক কীটপতঙ্গ আবার আত্মগোপন করে এই সব অখাদ্য বিস্বাদ প্রাণীদের চেহারার নকল করে। যদিও এই সব কীটপতঙ্গ খাদ্য হিসাবে শত্রুর কাছে সুস্বাদু হতে পারে, কিন্তু এদের চেহারার মিল অখাদ্য প্রাণীদের সঙ্গে থাকার দরুণ শত্রু আর এদের দিকে এগোয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাণীদের মধ্যে দুর্বল এবং ভীরু শ্রেণীর প্রাণীরা শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে—আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করে। হরিণ দৌড়িয়ে আত্মরক্ষা করে। অপোসাম মৃত্যুর ভান করে বাঁচতে চেষ্টা করে। বহুরূপী রং বদলায়—শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য। পতঙ্গ নিজেদের চেহারা অন্য এক ধরণের করে' শত্রুকে ধাঁধা লাগায়।

মানুষের ভেতরও এই দুর্বল এবং ভীরু শ্রেণীর প্রাণীর মত মানুষ দেখতে পাওয়া যায়।

হরিণের মত—'যঃ পলায়তি স জীবতি', এই উক্তি মানুষের বহু দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। বহু ব্যক্তি অপোসামের মত ধার্মিকতার ভান করে' জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। অনেকে আবার কাটেল ফিসের মত বড় বড় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা অন্যদের ধাঁধা লাগিয়ে নিজের অজ্ঞতা গোপন করে। অনেকে আবার পতঙ্গদের মত কপালে ফোটা চন্দনের তিলকের মুখোস এঁটে চেহারা এমন করে যে, সাধারণ সভয়ে দূর থেকেই সরে পড়ে।

খেয়ালী

(১০ পৃষ্ঠার পর)

ক্রমে কাজ শিখে মানুষকে মানুষ হতে হবে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে যাতে তারা দাঁড়াতে পারে। চাষার ছেলে এখানে চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা পাবে, ধোপা, মিস্ত্রী, নাপিত ব্যবসায়ী এমন কি সমাজের যাঁরা যজন যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাঁরাও এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপজীবিকার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করবেন। এখানে কতকগুলো লেখাপড়া শিখিয়ে চাকর তৈরী করা হবে না, মানুষ তৈরী হবে—এই হবে এর বৈশিষ্ট্য।

এই সব শিক্ষার জন্য তিনি দান করে গেছেন তাঁর যথাসর্বস্ব—যার পরিমাণ তিন লক্ষের উপর টাকা।

গাঁয়ের লোক এ ওর মুখের পানে চাইল—পুত্র পুত্র-বধূ নিঃশব্দে রইলো—

লোকে বললে—"মাথা পাগলা—" কেউ কেউ বললে—"খেয়ালী—"

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস (ভূপর্যটক)

আমাদের দেশে ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে খুব কম রচনাই চোখে পড়ে—কারণ ভ্রমণের স্পৃহা আছে এমন লোক আমাদের দেশে হাজারে একটি মেলে। বিদেশী লেখকদের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তাদের কোনো খবরই আমি রাখি না। অতএব আমার দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ কাহিনী আমার জীবনের সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তারই বর্ণনা। "অজানাই" যার জ্ঞানের সম্বল তার দিকে কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চোখ না ফেরালেই ভাল হবে, কারণ আমি ভাল করেই জানি আমাদের অবস্থা ভারতের বাইরে কিরূপ। অতএব এসব তত্ত্বকথা আমার কাছে অবান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের মতে যেমন পাপীর স্বর্গে প্রবেশ নিষেধ, মানুষের চামড়ার পার্থক্য নিয়ে যারা মানবত্বের হিসাব

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ভারতীয় স্কুল, মধ্যে উপবিষ্ট স্কুলের অধ্যক্ষ

নিকাশ করে তাদের মতে আমার মত একজন কৃষ্ণকায় পরাধীন ভারতীয়র প্রবেশ নিষেধ অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে! আমার মন এই অপমানের চিন্তায় যখন বিক্ষুব্ধ তখন আর শরীর চলত না, পথেরই পাশে বসে থাকতে হত।

এদিকে অরণ্যে নানা জাতীয় হিংস্র জীব রক্তাক্ত মাংস ভোজনের জন্য ছুটোছুটি করছে। চোখের সামনে সেই বীভৎস দৃশ্য আমি দেখেছি, কিন্তু দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত না থাকায় পালাতে পারিনি। আমি ইন্ডিয়ানের ছেলে, আমি কুলির ছেলে, আমার মনুষ্যত্বের দাবী জানাবার অধিকার নেই, বেঁচে থেকেই বা কি লাভ! একজন ইউরোপিয়ানের বাড়িতে গিয়ে একটা রাত কাটাইবার স্থান চেয়েছিলাম। সে লোকটি ছিল বুয়র, তাই সে বল্‌লঃ—"তোদের জাত আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, তাতে তোর মত লোকের স্থান আমার ঘরে নেই।" মহাত্মা গান্ধী বুয়র যুদ্ধে হাসপাতাল কোরে বৃটিশের সাহায্য করেছিলেন, সেই পাপে পাপী আমরা। তাই আমাদের মৃত্যু দেখলেও বুয়ররা খুশিই হয়। কেনেডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ডারও বৃটিশকে সাহায্য করেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় আগুন জ্বালিয়ে বুয়রদের হত্যা করেছিল, কিন্তু তাদের সে দোষ বুয়রগণ ভুলে গেছে, কিন্তু বৃটিশের প্রতি ভারতবাসীর অহিংসার সাহায্য বুয়রগণ ভুলে যেতে সক্ষম হয়নি, কারণ ভারতবাসী অসহায় এবং পরাধীন। যাক ভেবে আর লাভ কি? মরণ যদি আসে আসুক। সঙ্গে এক টুকরো খাবার ও এক বিন্দু জল নেই। শরীর আর চলে না। বাস্তবিকই আমি মানুষ নই। এদিকে দেশের এবং জাতের অসম্মানের কথা বার বার মনে হওয়া সত্ত্বেও প্রাণ যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যায় শ্বাপদ কুলের গর্জন কানে প্রবেশ করাতে ভয় হচ্ছিল। ভয়, ভয়, ভয়, প্রাণের ভয়, মানবদেহধারী কুকুরের প্রাণের ভয়। আর মনে নেই তারপর কি হয়েছিল।

ধর্মের ব্যবসায়ী পাদরী মহাশয়, তোমার দয়া কিরূপ তা আমি জানি। তুমি মানুষের মিত্র হতে পার না। তোমার মাঝে কোন বদ্‌মতলব আছে নিশ্চয়ই। তুমি আমাকে বেট ব্রীজ (Biet Bridge) নিয়ে যেতে চাও, আমাকে তোমার ঘরে স্থান দিতে চাও, খাবার দিতে চাও, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে। আমাকে হিংস্র জীব এখনও খায়নি, খাবেও না। গোলামের জাতের লোকের মাংস স্বাধীন পশুরও অখাদ্য। যদি জল এবং রুটি বিক্রি কর তবে আমি কিনতে পারি, কিন্তু তোমার বাড়িতে যাব না, আজ এই বনেই কাটাব। পাদরী স্কচম্যান। এক শিলিং নিয়ে সেন্ডউইচ এবং জল দিয়ে গেল। আমি তাই খেয়ে অন্ধকার রাত্রের আকাশের তারা গুণতে আরম্ভ করলাম। তারার সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হইনি! আমার গণনায় ভুল হতে লাগ্‌ল। চোখের জ্যোতি কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। ভাবলাম যার জন্মই হয়েছে অশুদ্ধভাবে তার এসবে ভুল হওয়াই সম্ভব। শুধু বংশ গৌরব, টাকার চিন্তা, ভবিষ্যতের চিন্তা, বাঁচবার চিন্তা এসব নিয়ে যার সময় কাটে তার ভুল

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় মিশনারী

হবে না ত কি হবে? ব্যবসা, বাণিজ্য, বিবাহ, বরপণ, কন্যাপণ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান এসব নিয়ে যার সমাজ তার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে প্রবেশ নিশ্চয়ই নিষেধ হওয়া উচিত। যারা দেশের কল্যাণে প্রাণ দিয়েছে, তাদের নাম উচ্চারণ করতে যার প্রাণ কাঁপে তার মরাই ভাল। কিন্তু মরতে প্রাণটা আজ যেন কেঁপে উঠছে। তারপর আবার নিদ্রা, মহানিদ্রা নয় রাত্রের নিদ্রা। জাগতে হবে, ভাবতে হবে, আবার এগিয়ে যেতে হবে।

বেট ব্রীজ রোডেসিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত শহর এবং শহরটি ছোটই। লোক সংখ্যা দু'শর বেশী নয়। লিভিং এবং হাই থিং কিং" করে তাই তাদের শহরে বাস আছে, হোটেল আছে, সুখ সাচ্ছন্দ আছে। আর নিগ্রোরা কোথায় থাকে খুঁজে বের করা মুস্কিল। নিগ্রোরা হয়ত "প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিং কিং" করে তাই তাদের শহরে বাস করবার অধিকার নেই, কিন্তু আমি যাই কোথায়?

লিম্‌ পো পো নদীর ওপার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু। সেখানে নিগ্রোরা ইউরোপীয়দের বাড়ির কাছেও থাকতে পারে না। ওপারে অবেলায় গিয়ে লাভ নেই, এপারেই থাকা ভাল। এপারে ইংলিশ, স্কচ, আইরিশ, জার্মান ডেনিশ আছে, ওরা অন্ততপক্ষে রুটি আর দুধ আমার কাছে বিক্রি করবে সেই ভরসায় এপারেই থেকে গেলাম। দাঁড়ালাম বাজারের পাশে গিয়ে। মারকেট অতি ছোট, পঞ্চাশজন লোকের মতই সওদা বিক্রির জন্য আসে। আমি কতকগুলি সালাড কিনে তাই চিবোতে লাগ্‌লাম। দুধ রাখবার উপযুক্ত পাত্র ছিল না, রুটি, ফল এবং মধু কিনে সাইকেলে বেঁধে নিয়েছি। পাইপ হতে কেত্‌লীতে জল ভরে নিয়েছি, এখন কোথাও কম্বলটা পেতে নিলেই হয় আর কি!

একটি দীর্ঘতনু সুন্দরী যুবতী এসে আমার কাছে দাঁড়াল। যুবতীকে দেখে আমার রাগ এবং ঘৃণা হলো; কারণ যুবতী শ্বেতাঙ্গিনী। আমি বল্‌লাম—"কি চাই?" কিন্তু কোন উত্তর পেলুম না। যুবতী বল্‌তে লাগলে, তার স্বামী নিকটস্থ স্বর্ণখনিতে কাজ করে। কাজে যাবার সময় বলে গেছে, যদি কোন ইণ্ডিয়ান বাইসাইকেলে করে এদিকে আসে তবে যেন ঘরে নিয়ে যায়। যুবতী কানে শোনে না, কিন্তু ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকদের কালা বলে প্রকাশ করা ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ, তাই কথা না বাড়িয়ে তারই বাড়িতে চল্লাম। স্নানের গরম জল, খাবারের জন্য রাইসকারী, শোবার জন্য বিছানা, সবই প্রস্তুত ছিল। যুবতী একটি একটি করে ব্যবহার্য দ্রব্য দিয়ে নিগ্রো চাকরকে আমার সেবায় নিযুক্ত করে আবার বাজারে চলে গেল। আমি স্নান আহার সমাপ্ত করে সংবাদপত্রে মন দিলাম। চোখ আপনা হতে বুজে গেল।

সূর্য অস্ত যায় যায়। নিগ্রো মজুরের দল সামান্য মজুরী অর্জন করে হাস্‌তে হাস্‌তে গান গাইতে গাইতে চলেছে তাদের আপন ঘরে। দৃশ্যটা দেখে মনে হলো সাঁওতালদের কথা। চার আনা মজুরী পেয়েই তারা সন্তুষ্ট। তাদের দরকারের অনুভূতি নেই বলেই চার আনায় সন্তুষ্ট। নিগ্রোদেরও অভাবের অনুভূতি নেই। কত পেছনে তারা পড়ে আছে। আমাদের সভ্যসমাজকে তেমনি করে পেছনে ফেলে রেখেছে ভাগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো সেপাই

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিগ্রোদের ঘরে ফিরে যাওয়া দেখ্‌ছিলাম আর ভাবছিলুম কেউ এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরছে তাদের নিজের দোষে, আর কেউ এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান দূরে থাক, এগিয়ে যে যেতে হবে তার অনুভবও করবার ক্ষমতা রাখে না।

পরদিন ওপারে গিয়ে বুয়র সরকারের কাস্টম অফিসারকে ভিসা এবং প্রবেশপত্র দেখালাম, ভাবছিলাম এসব দেখিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করব, কিন্তু তা হলো না। আমাকে অফিসারগণ জানালো যে, ফের তাঁরা প্রিটোরিয়ায় তার করবেন এবং তাঁর উত্তর পাবার পর আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেবেন। তারের খরচ আমাকেই বহন করতে হল! তারের খরচ দিয়ে চলে আস্‌লাম সাদা মজুরের ঘরে। ওদের বোধ হয় জানা ছিল আমি চটপট করে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে পারব না; সেজন্যই ওরা আমার জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়েছিল। মজুর চলে গেছে, তার স্ত্রী ঘরে আছে। মজুরের স্ত্রী আমাকে একখানা মস্কো নিউজ পড়তে দিলেন। আমি তার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত পাঠ করে কৃতার্থ হলাম। মজুরের স্ত্রী মাঝে মাঝে এসে আমাকে মস্কো নিউজে ব্যস্ত দেখে সুখী হলেন। দ্বিপ্রহরে ফের তিনি কতকগুলি বই দিলেন তাও মার্কসবাদের বই। বইগুলি মন দিয়ে পড়তে লাগ্‌লাম। বই-গুলির ভাষা কটমটে, কিন্তু বিষয়টা বেশ ভাল। সেই রাত্রি

আমাকে সেখানেই কাটাতে হোলো। মজুর দম্পতি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে প্রিটোরিয়া হতে তার আসে, আমি সেদিনও মজুর দম্পতির বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন প্রাতে রওনা হবার সময় মজুর বললে "কমিউনিস্টরা কখনও কালারবার, আভিজাত্যভাব এসব প্রশ্রয় দেয় না। কমরেড বিদায়।" শত ভগবানের নামের আশীর্বাদ হতে "কমরেড বিদায়" কথাটা কাজ করেছিল বেশি। কিরূপে শব্দ দুটি আমার উপকার করেছিল এখনই বলছি।

বেট ব্রিজ পার হয়ে নব্বই মাইলের মধ্যে কোনরূপ লোকালয় নেই। নব্বই মাইল পথ শুনতে অল্পই শোনায়। কিন্তু পথ উচুনীচু ত আছেই উপরন্তু পথের উপর ছোট বড় নানা রকমের পাথর রয়েছে। পথ দেখে না চললে সাইকেল থেকে পড়ে যাবার বিশেষ কারণ রয়েছে। মাঝে মাঝে দু' একটা মজা নদী রয়েছে, সে সব নদীতে নির্বিঘ্নে চলাও কঠিন। ছোট বড় নানারূপ জন্তু নদীর বুকে পাথরের মাঝে বাস করে। পথে লোকজন একাকী পেলেই হয় আক্রমণ করে নয় পালিয়ে যায়। সেজন্য আমাকে নানা চিন্তা করে সুযোগ এবং সুবিধা দেখে এসব শুকনো নদী পার হতে হতো। হাতী এঅঞ্চলে প্রচুর। রাত্রে হাতীর ভয়ে একেবারেই ঘুমুতে পারতাম না। অহংকার, ঘৃণা, রাগ এই তিনটের আওতায় এসে খাবার আনতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার সামনে নব্বই মাইল পথ যে আছে তার কথা মোটেই ভাবিনি। বার বার শৈলেন, মিঃ ওয়াং এবং অন্যান্য পথের সাথীদের কথা মনে হতে লাগল। কিন্তু ভাবলে আর চলবে না। আমাকে যেতে হবেই। বুয়েররা কখনো আমাকে সাহায্য করবে না, যদি সুযোগ পায় হয়ত মেরে ফেলবে। কালো লোককে মেরে ফেলা বুয়েরদের কেন—সাদা জাতের একটা আনন্দই ছিল একদিন। বর্তমানে অনেকটা কমেছে, কারণ বর্তমানে পৃথিবী অন্ধ কুসংস্কারের মোহ কাটিয়ে প্রগতির দিকে এগিয়ে চলছে।

আমার মনে আছে ব্রহ্ম প্রদেশের সীমান্ত টাঙ্গু থেকে পেলেন মাত্র ঊনত্রিশ মাইল। সেই রাস্তাটুকু অতিক্রম করতে আমাদের চারদিন লেগেছিল। টাঙ্গু-পেলেন পথের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার এই পথের পার্থক্য নেই। টাঙ্গু-পেলেন পথে শৈলেন সঙ্গে ছিল, খাদ্য ছিল, শরীরে প্রচুর শক্তি ছিল। আর আজ আমার সাথী কেউ নেই, খাদ্য কিছুই নেই অথচ কণ্টকর পথে চলতে হচ্ছে একাকী। আমার সঙ্গে যদিও কিছুই নেই, তবু চিন্তা করে দেখলাম, একটা জিনিস আমার মাঝে আছে, তা হলো মনের শক্তি। মনের শক্তিকে সহায় করে চলেছি পথে। ভরসা আছে উপোষ করতে হবে না, খাবার কিছু মিলবেই।

সূর্য ঠিক মাথার উপর এসেছে। কেতলীতে সামান্য জলটুকু পর্যন্ত নিশ্বেস হয়ে এলো। কোথাও দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ভয় পাছে সিংহ এসে থাবা দিয়ে ঘাড় মটকায়। সিংহের ভয় ততটা আমাকে কাবু করতে পারেনি। নূতন এক ভয় এসে মনকে আক্রমণ করেছে, সেই ভয় হলো বিষাক্ত বৃক্ষের কাছে না যাওয়া। এঅঞ্চলে নানা জাতীয় বিষাক্ত বৃক্ষ আছে। যদি কোন বিষাক্ত বৃক্ষের কাছে বসা যায় তবে শরীরের চামড়া বিকৃত হয়ে যায়। যদি গাছের স্পর্শ লাগে তাহলে মাংস পর্যন্ত পচে যায়। আমার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। একটা পরিস্কার জায়গায় গিয়ে বসলাম। প্রখর সূর্যের তেজ মাটি উত্তপ্ত করে রেখেছিল। উত্তপ্ত মাটির উপর বসাই পছন্দ করলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার জানা ছিল না যে এরকম গভীর জঙ্গলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা কেন পরিস্কার করে রাখা ছিল। কতক্ষণ বসার পরই মনে হলো

মিশনারীদের আওতায় নিগ্রো দম্পতী

অদূরে কি যেন শ্বাস ফেলছে। চটপট করে দাঁড়ালাম এবং সাইকেলটা তথাকথিত কাইরো কেপটাউন পথের উপর এনে রাখলাম। আমার জানা ছিল এরূপ স্থানেই বন্য খরগোস গর্তে বাস করে, তাই খরগোসের গর্ত হতে বের হবার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। কতক্ষণ পর খরগোস বের না হয়ে বের হলো একটা দুহাত লম্বা অজগর সাপ। এরূপ অজগর সাপ মোটেই বিপজ্জনক নয়। এদের মাংস সুখাদ্য। পথের উপর দাঁড়িয়েই অজগরটার মাথা লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলাম। অজগরটা কতক্ষণ একটু দ্রুত গতিতে চলাফেরা করল, এর মধ্যে আমি আরও কয়টা পাথর ওটার মাথা লক্ষ্য করে মারতেই সাপটা একদম শুয়ে পড়ল। আমি কাছে না গিয়ে আরও পাথর মারতে লাগলাম, শেষটায় একটা বড় পাথর দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলাম যে সাপটার মাথাটা থেতলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। পরিস্কার করে কেটে দেওয়া অজগর সাপের মাংস আমি খেয়েছি, কিন্তু স্বহস্তে সাপের চামড়া ছাড়িয়ে তার মাংস খেতে প্রবৃত্তি হলো না। আমার সাহস হলো, উপোস করে মরতে হবে না। যদি পথে কিছু না জোটে তবে এই অজগর সাপই হবে আমার আজকের আহার। দুঃখ হলো, আজ একটা অন্যায়

(শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(৩)

নবদ্বীপ মুখ ফিরাতেই সুবলের বুঝতে বাকি রইল না যে সে খুব আঘাত পেয়েছে। তবে কি সুবল ভুল বুঝেছিল? নবদ্বীপ করুণভাবে বলল, কায়দায় পেয়ে আজকাল তুইও আমার ওপর এক হাত নিতে শিখেছিস সুবল? এর চেয়ে নবদ্বীপ যদি ঝগড়া করত, ধমক দিত সুবলকে, সুবলের পক্ষে তা যেন সহ্য করা সম্ভব হ'ত; কিন্তু একটু আঘাত করলেই কেউ যদি এমন আতর অনুনয়ের সুর আরম্ভ করে, তাহ'লে আঘাতদাতার মনে খানিকটা অনুতাপ আর অনুকম্পা আসেই, বিশেষত আহত যদি বৃদ্ধ হয়।

সুবল আর নবদ্বীপের মধ্যে যে কী সম্পর্ক তা সুবলও বোঝে নবদ্বীপও বোঝে। এতদিন পাড়ার মোড়ল ছিল নবদ্বীপ। ছিল কেন আছে এখনও। কিন্তু সেই মোড়লী ক্রমেই খসে পড়ছে নবদ্বীপের হাত থেকে। আর পড়ছে এসে সুবলেরই হাতে। অথচ সঞ্চিত টাকার অঙ্ক নবদ্বীপের একটুও হ্রাস হয়নি বরং বেড়েই চলেছে। ব্যবসা চলছে ভালো, ফাঁক মত জমিজমা বাড়াবার দিকেও দৃষ্টি আছে নবদ্বীপের। তবু তার হাতে মোড়লী থাকছে না। অবশ্য ভয় আর সমীহ সামনে আগের মতই লোকে তাকে করে। কিন্তু নবদ্বীপের মনে হয়, পিছন ফিরে তারা তাকে ভেংচায়। তার সম্মান, তার প্রতিষ্ঠা আরো নষ্ট করে দিয়েছে মুরলী। নবদ্বীপের কাছে মুরলীর চরিত্র-দোষটাই বড় দোষ নয়। বয়সের সময় ও-রকম এক-আধটু অনেকেরই থাকে, তাতে কী এসে যায়? নবদ্বীপের নিজেরও তো ছিল একদিন। কিন্তু তাই বলে অমন বেহিসেবী সে কোনদিনও ছিল না। কাজ কর্ম বিষয় আশয়ের দিকে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হয়নি নবদ্বীপ। কাজকর্মের অবকাশে যেমন পাড়ার সমবয়সী পাঁচজনের সঙ্গে সে তাস খেলত, পলো নিয়ে মাছ ধরতে নামত নদীতে, তেমনি পাঁচজনের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করতে যেত। এ সবের পর কাজকর্মে আরো বেশী মন লাগত নবদ্বীপের। কাজ তার কোনদিন বাদ পড়ত না। কিন্তু মুরলী এই কাজকর্মটাকেই যেন সযত্নে বাদ দিয়ে চলতে চায়। কাজ তার ভালো লগে না, ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু সে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। কেবল যখন তার টাকার দরকার তখন টাকা পেলেই হোল। নবদ্বীপ যেন চিরকাল বেঁচে থেকে তার এই খরচের টাকা জুগিয়ে যাবে।

দশজনের কাছে নিজেকে মুরলী খাটো করেছে, খেলো করে ফেলেছে আর তার ফলে নবদ্বীপেরও মুখ হাসিয়েছে। নবদ্বীপের মনে হয় লোকে যে তাকে সত্যি সত্যিই মানে না, ভয় করে না, তার জন্য মুরলীই দায়ী।

কিসের অভাব ছিল মুরলীর? ইচ্ছা করলে অনায়াসে কারবারকে সে ফাঁপিয়ে তুলতে পারত। নবদ্বীপের সুনাম আর মূলধন সে খাটাতে পারত। এমন সুবিধা ক'জন পায়! কিন্তু মুরলী সেদিক দিয়েই গেল না। সমাজে যে বড় হতে হবে, মান্যগণ্য হতে হবে—এমন ইচ্ছাই যেন নেই মুরলীর মনে। চল্লিশের কাছাকাছি হতে তো চলল মুরলীর বয়স, কিন্তু প্রথম যৌবনের বদখেয়াল তার আজো গেল না। ও যেন তারপর আর বাড়েনি। বিপিনের যেমন তাস-খেলাটা নেশা, রসিকের যেমন মাছ ধরা, মেয়ে মানুষের মধ্যেও তেমনি কী যে নেশার জিনিস পেয়েছে মুরলী তা সেই জানে। কিন্তু যে বয়সে যা। একেক বয়সে একেক রকমের খেয়াল মানুষের থাকে, তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বয়স ছাড়িয়ে গেলেও খেয়াল যদি না ছাড়ে তা সহ্য করা যায় কী করে? মুরলীর বয়স যে বাড়ছে, এ কথা যেন সে অস্বীকারই করতে চায়। সমবয়সীদের সঙ্গে সে মেশে না। পাড়ার যত সব অল্প বয়সী বকাটে ছোঁড়ার সঙ্গে তার খাতির। তাদের সে দলপতি। আর তাতেই সে খুসী। তার ওপরে সে উঠতে চায় না। সমাজপতিত্বের প্রতি তার স্পৃহা নেই। মুরলী ভেবেছে তার দিন এমনি করেই যাবে। যত রাজ্যের ফ্যাসান, সখ আর সোখীনতায় সে টাকা উড়াতে থাকবে আর এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তার উড়াবার টাকা কুড়িয়ে বেড়াবে নবদ্বীপ। এর ঠিক বিপরীত ধাতুতে গড়া এই সুবল। নবদ্বীপ একেক সময় ভাবে, মুরলী না হয়ে সুবল যদি ছেলে হত তার, তা হলে কোন চিন্তাই থাকত না নবদ্বীপের। এই বয়সেও আর দশগুণ সে বেশি খাটতে পারত যদি জানত যে খেটে লাভ আছে। কিন্তু নবদ্বীপ দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে, তার চোখ বুজবার পর কিছু থাকবে না। কিছু যদি রেখেও যেতে পারে নবদ্বীপ, মুরলী তা কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না।

সুবল যে কেন এত অনুগত নবদ্বীপের, কেন সে এত পিছনে পিছনে ঘোরে তা নবদ্বীপের বুঝতে বাকি নেই। সাথে সাথে থেকে সুবল সব শিখে নিচ্ছে নবদ্বীপের কাছ থেকে। সব কায়দাকানুন ফিকির ফন্দি আয়ত্ত করে নিচ্ছে সুবল। সব তার নিজের স্বার্থের জন্য। সুবল ধনী হতে চায়, মোড়ল হতে চায় সমাজে, যে কোন প্রকারেই হোক। এমন কি যে নবদ্বীপ তাকে হাতে ধরে সব শেখাচ্ছে, যার কাছে তার আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবার কথা, তাকেও সুবল ঈর্ষা করে, সুবিধা পেলে নবদ্বীপের সঙ্গেই যে সে শত্রুতা আরম্ভ করবে এ কথাও নবদ্বীপ জানে। সুবল যত বড় হবে, যত ক্ষমতাবান হবে মুরলীর তত ক্ষতি, নবদ্বীপের তত ক্ষতি, কিন্তু এসব বুঝেও সুবলকে দূরে রাখতে পারে না নবদ্বীপ। বরং সুবলের ওপরই

সে বেশী রকম নির্ভর করে। বাইরের সামাজিক দরবার পরামর্শেই হোক, আর নিজের ঘরোয়া ব্যাপারেই হোক সুবলকে না হলে আজকাল আর চলে না নবদ্বীপের। নবদ্বীপের সাকরেদী করে করে, হুকুম তামিল করে করে সুবল নবদ্বীপকে এমনই খোঁড়া বানিয়ে ফেলেছে। নবদ্বীপ যত বোঝে যে এতে তার নিজেরই সর্বনাশের পথ তৈরী করছে সে, এবং এমন একজনের ওপর সে নির্ভর করছে যে তার শত্রু, তত মরিয়া হয়ে সুবলকে সে আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরে ; সুবলের সহানুভূতির জন্য নিজেকে সে আরো অসহায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। মনে মনে হয়ত নবদ্বীপ প্রতিজ্ঞা করে সুবলকে সে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না, একটুও গ্রাহ্য করবে না ; কিন্তু আসলে করে বসে ঠিক তার উল্টো। মুরলী এক কথা বললে দশ গুণ বাড়িয়ে তা সে সুবলের কাছে গিয়ে জানায়, সহানুভূতি চায়, আশ্রয় চায় সুবলের কাছে।

নবদ্বীপের সুপারির বাগান ছাড়ালেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে উত্তরে কুমারখালির বাজারে। পাড়ার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নবদ্বীপরা রাস্তায় পড়তে না পড়তেই দলটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল বলল, 'দেখেছেন কত বেলা হয়ে গেছে? আজ একেবারে সকলের পিছনে পড়েছি আমরা। একটু জোর পায়ে হেঁটে চলুন জেঠামশাই।'

নবদ্বীপ একটু হাসল, 'বলল, তোমার কি বাপু, তুমি তো বলেই খালাস। এই বয়সে এখনো যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছি এই তো তোমাদের ভাগ্য। একবার বয়সটা আমার মত হোক তখন দেখব কত জোরে চালাতে পার পা।'

নিজের বয়সকে নবদ্বীপ আজকাল দু'এক বছর বরং বাড়িয়েই বলে। বার্ধক্যের ভঙ্গিকে বাড়িয়ে দেখায় তার চেয়েও বেশী। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন লোকের কাছে নিজের বয়সকে আসল বয়সের চেয়ে দু তিন বছর কম বলে প্রমাণিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না নবদ্বীপের। কিন্তু এখন বয়স যখন বেড়েই গেছে, বার্ধক্যের চিহ্ন যখন দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গে তখন বয়সকে স্বীকার করাই ভালো। বয়সের কথা উল্লেখ করে যখন যা পাওয়া যায়, যেখানে যা পাওয়া যায়—কোথাও বা শ্রদ্ধা, কোথাও বা অনুকম্পা, আজকাল আদায় করতে চায় নবদ্বীপ। খানিকটা পথ এগুতেই ভ্রূকুঞ্চিত করে নবদ্বীপ একটু থমকে দাঁড়াল। সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার কি হোল জেঠামশাই।'

নবদ্বীপ বলল, 'দেখতো সুবল, কে আসছে, আমাদের বিনোদ না?'

সুবল বলল, 'তা ছাড়া আবার কে, দেখছেন না মাথায় রঙীন চাদর জড়ানো, কাঁধে খোল। গলায় ফুলের মালাটাও ভুলে ফেলে আসেনি। পিছনে আবার বোধ হয় একজন সাকরেদও জুটিয়ে এনেছে, এদিকে উনানে তো হাঁড়ি চড়ে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনোদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুবল আর নবদ্বীপের।

'ভালো আছেন রাঙা কাকা? ভালো তো সব পাড়ার?' বিনোদ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল নবদ্বীপকে।

নবদ্বীপ হেসে ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু বিনোদের এই ধরণ ধারণে রীতিমত রাগ হয় সুবলের। পাঁচ সাত দিন বিনোদ গ্রামে ছিল না। জেলা শহরের কাছাকাছি গোঁসাইগঞ্জে গিয়েছিল কীর্তন গাইতে। মাঝে মাঝে এমন প্রায়ই সে যায় এখানে ওখানে। কিন্তু ফিরে এসে এমন ভাব দেখায়, যেন সে বহুদূরে বহুকাল বাস ক'রে দেশে ফিরেছে। এমন দূর থেকে ওপর ওপর ভাবে কথা বলে বিনোদ, যেন সে এদের একজন নয়। খুব বড় রকমের চাকরী-বাকরী করে, খুব যেন একটা সম্মানী লোক, অন্য সকলের মত সে যেন একজন সাধারণ মানুষ নয় পাড়ার, যেন গোটা জেলার মধ্যেই বেশ একজন গণ্যমান্য লোক। ওর ভাবভঙ্গী দেখে হাসিও পায়, আবার একেক সময় চিত্তও জ্বলে যায় সুবলের। না হয় গলায় একটু মেয়েলি মিষ্টত্বই আছে, কিন্তু তাই বলে কি সব সময়েই অমন 'সখী ধর ধর' ভাবে থাকতে হবে?

বিনোদ বলে, 'আচ্ছা আমরা ভাই এগুই সুবল। তুমি তো যাচ্ছ দোকানে। সন্ধ্যার দিকে একটু তাড়াতাড়ি করে ফিরে এস কিন্তু।'

সুবল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

বিনোদ সলজ্জ হেসে বলে, 'এই একটু আসরের মত বসাবার ইচ্ছে আছে। এই যে আমার সঙ্গের লোকটিকে দেখছ; অমন চুপচাপ ভালো মানুষের মত থাকলে হবে কি, একটি খাঁটি জহরৎ। হাত ভারি মিঠে। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি, আসতে কি চায়।'

লোকটি লজ্জায় বিনয়ে একেবারে ভেঙে পড়বার মত হয়ে বলল, 'না না কিছু বিশ্বাস করবেন না দাদা, ভারি বাড়িয়ে বলবার অভ্যাস বিনোদদার।'

বিনোদ বলল, 'সত্যিই বাড়িয়ে বলছি কিনা, সন্ধ্যার সময়েই তার পরিচয় পাবে। একটু সকাল সকালই এসো সুবল, আসবেন কিন্তু রাঙা কাকা।'

নবদ্বীপ বলল, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা।'

খানিকটা এগিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'ছেলেটি কিন্তু বেশ, কথাবার্তায় ভারি বিনয়ী আর কী মিষ্টি স্বভাব, আমার বেশ লাগে, ওর বাবাও ছিল অমনি। বয়সে বড় হলে কি হবে, আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করত না। বিনোদও হয়েছে তেমনি। একটু সকাল সকালই ফেরা যাবে বরং, কি বল সুবল। অনেক দিন বাদে একটু নামগান শুনবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

সুবল কোন জবাব দিল না। ইদানীং নবদ্বীপের ধর্মে-কর্মে বড় মতি দেখা যাচ্ছে। সাতখোপ কবুতর খেয়ে বিড়ালের সাধ হয়েছে তপস্বী হতে।

ঘরে ফিরে বিনোদ যখনই আসে, তখনই খানিকটা মাতামাতি না করে ছাড়ে না। সুবলের মনে হয় এটা ওর নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা। পাড়ায় খোল বাজাতে, গান গাইতে সবাই কিছু না কিছু পারে। তার মধ্যে বিনোদের না হয় গলাটা একটু বেশী মিষ্টি, হাতটা একটু পরিষ্কার, কিন্তু তাই বলে সেটা কি

এমনভাবে যখন তখন ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালেই নয়? শুধু মিঠে হাত আর গলার জন্যই নয়, মিষ্টি স্বভাবের জন্যও বেশ খ্যাতি আছে বিনোদের। সে যে সচ্চরিত্র, ভালো মানুষ একথা সবাই বলে। ও বাড়ির বিষ্টু খুড়ো বিনোদের প্রশংসায় সব চেয়ে উচ্ছ্বসিত। পূর্বজন্মের সাধনা আর সুকৃতি না থাকলে নাকি এমন গুণী হওয়া যায় না। আর এসব গান বাজনা উঁচুদরের জিনিস। উঁচু মন, সৎস্বভাব, ভগবদ্ভক্তি এসব না থাকলে অমন নাকি হতে পারে না কেউ। ভিতরে ভিতরে সত্যিই নাকি একজন বড় রকমের সাধক এই বিনোদ। সুবল লক্ষ্য করেছে, বিনোদকে ছেলেবেলা থেকে সবাই যখন সাধু আর ভালো-মানুষ বলত তখনি খুব যে একটা ভয় আর শ্রদ্ধা করত বিনোদকে তা নয়। বরং খানিকটা ঠাট্টা, খানিকটা অনুকম্পার ভাবই মিশানো থাকত এইসব বিশেষণের মধ্যে। এমনকি বিনোদ নিজেই তাতে চটে উঠত অনেক সময়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই এখন সয়ে গেছে বিনোদের। এখন এসব তার প্রশংসা বলেই সে ভাবে। এবং নিতান্ত মিথ্যা ভাবে না। শুধু ঠাট্টাই নয়, আজকাল লোকে তাকে খানিকটা ভক্তিশ্রদ্ধাই করে। সজ্জন সচ্চরিত্র বলতে বিশেষ ভাবে আজকাল বিনোদকেই বোঝায়। পাড়ার ফচকে ছোঁড়ারা তাকে দেখলে একটু সংকুচিত হয়, এমন কি মুরলী পর্যন্ত বিনোদের সামনে কথাবার্তায় বেশ সংযত হয়ে ওঠে।

সুবল ভেবে পায় না, পাড়ার সবাই বিনোদের প্রশংসায় সত্যিই এমন পঞ্চমুখ হয় কেন? বিনোদের সাংসারিক কান্ডজ্ঞান-হীনতা, তার বিষয়বুদ্ধির অভাবটাও কি তার গুণ, তার ভালোমানুষিরই পরিচয়? সংসারে বোকা কি উদ্ভট পাগলাটে গোছের কিছু একটা না হলে কি ভালোমানুষ হওয়া যায় না? না হলে, বিনোদের স্বভাব চরিত্রের প্রশংসাই বিশেষভাবে এমন করে প্রচার করে কেন লোকে? পাড়ায় আরো তো পাঁচজন আছে যারা চোরও নয়, বদমাসও নয়, কিন্তু তারা যেন লোকের চোখেই পড়ে না। বৈষয়িক বুদ্ধি যদি এমন মন্দই হয় তা হলে যখন তখন সুবলের অত ডাক পড়ে কেন? কেন মামলা মোকদ্দমা, ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকে সুবলের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে আসে? বিনোদের কাছে গেলেই পারে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সুবলকে না হলে লোকের চলে না, আর প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেলেই সেটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিনোদের খোলের মিঠে আওয়াজ শুনতে লোকের মন আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

বৈষয়িকতায়, কূটবুদ্ধিতে সুবল যে দ্বিতীয় নবদ্বীপ সা হয়ে উঠছে এমন একটা ধারণা যে লোকের মনে আছে তা সুবলের টের পেতে বাকি নেই। কিন্তু সংসারে ঠকে যাওয়াই যদি ভালোমানুষ আর মহত্তের লক্ষণ হয়, তাহলে সবাই ঠকতে এত ভয় পায় কেন? ওরা যখন বিনোদ সম্বন্ধে এমন মুগ্ধভাবে প্রশংসা করে, তখন সুবল বলে যে, একটি লোক আছে, যার খোলে তেমন মিঠে হাত নেই, কিন্তু বিষয় বুদ্ধিতে পরিষ্কার মাথা যা তাদের বিপদে আপদে রক্ষা করে, একথা লোকের যেন খেয়ালই থাকে না। সুবলের কাছে যে তারা কত রকমে কত উপকার পায় সে কথা সবই যেন তারা ভুলে যেতে চায়। বিনোদের তুলনায় সুবল যেন একেবারেই তখন অকিঞ্চিৎ হয়ে পড়ে তাদের কাছে।

কিছু দূর থেকেই কুমারখালির বাজারের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়। দূর থেকে অবশ্য হট্টগোলকেও গুঞ্জনের মতই মনে হয়। কাছে গেলেই তার স্বরূপ ধরা পড়ে। মাছের বাজারটা সব চাইতে আগে হওয়ায় আরো বেশী করে কানে আসে। বাজারে ঢুকেই নবদ্বীপ আর সুবল দুটো আলাদা গলি দিয়ে যে যার দোকানের দিকে চলে যায়। পরস্পরের কাছে মৌখিকভাবে বিদায় নেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে না।

(ক্রমশ)

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

(২১ পৃষ্ঠার পর)

কাজ করে ফেলেছি, কারণ আমার কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা অভ্যাস ছিল। সেই অভ্যাসগুলির মাঝে জীব হত্যা না করাও একটা। সাপটা হত্যা করার জন্য নানারূপ যুক্তিতর্ক আমার মনে আসতে লাগলো বটে, কিন্তু মনটা একদম দমে গেল' এখানে আর বসতে ভাল লাগলো না; এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ এগিয়ে যাবার পর পথের উপর অগণিত গিনি ফাউল দেখতে পেলাম। সাইকেল হতে নেমে, ছোট ছোট ঢিল নিয়ে ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগলাম। গিনি ফাউলের ঝাঁক যখন আকাশে উঠল তখন এমন একটা শব্দ হতে লাগল যে এরূপ শব্দ কখনও শুনিনি। আকাশ যেন ভর্তি হয়ে গেছে গিনি ফাউলে। সে দৃশ্য দেখা যায় প্রায়ই, কিন্তু মামুলী ক্যামেরায় তার ছবি তোলা যায় না। ফিলিম ক্যামেরাতেই সে সব দৃশ্য তুলতে সুবিধা হয়।

অর্ধমৃতপ্রায় তিনটি গিনি ফাউল পথের উপরেই পড়ে ছিল। তিনটিকে কুড়িয়ে একত্রিত করলাম, তারপর একটির মাথা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার রক্ত পান করেই একটু আগুন জ্বালিয়ে তাতে পাখীর মাংস শেঁকে খেতে লাগলাম। কি সুস্বাদু সে মাংস। কিন্তু বেশি খেতে পারলাম না। বাকিটুকু সাইকেলের বাক্সে ভর্তি করে পথ ধরলাম।

ক্রমশ

হিমালয়ের পথে

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

এ বৎসর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হঠাৎ প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, কয়েকদিনের মত। শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসীন্দাদের মধ্যে আমিও এই গরমে এবার এখানেই নির্বিঘ্নে ছুটী ভোগ করব ঠিক করেছিলাম। মন সর্বদাই ছিল বর্তমান জগতের সর্বব্যাপী প্রলয়ের সংবাদে এবং ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তনের নিদারুণ করুণ কাহিনীর কথায় ভারাক্রান্ত, সেই সঙ্গে নিজেদের অসহায়তার ও অক্ষমতার বেদনা যেন আরো তীব্রতরভাবে অনুভব করছিলাম। গরমে ও এই মনোভাবের আবেষ্টনে পড়ে কেমন যেন আলস্যে দিনগুলি কাটছিল। এই রকম অবস্থার মধ্যে একদিন বিকালে আমাদের কলাভবনের শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু যিনি আমাদের সকলের "মাস্টার মশায়" নামে পরিচিত, জানালেন তিনি আলমোড়া যেতে ইচ্ছুক হয়েছেন, আমাকেও প্রস্তুত হতে। সঙ্গে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক মাসোজীও আছেন। মাস্টার মশায় আলমোড়া বা হিমালয়ের এই অঞ্চল পূর্বে দেখেন নি, আমিও ইতিপূর্বে উত্তর ভারতের হিমালয়ের কোন পাহাড় দেখিনি। কিন্তু শ্রীযুক্ত মাসোজী, একজন অতিশয় সুদক্ষ হিমালয় পর্বত পর্যটক, তিনি গত ২০ বৎসর যাবৎ কাশ্মীরের অমরনাথ থেকে সুরু করে পূর্বাঞ্চল আসামের সব বিখ্যাত পাহাড়ের সঙ্গেই পরিচিত। তিনি কেদার বদ্রী দেখেছেন দুবার। কৈলাস, মানস সরোবর দর্শনও তাঁর ভাগ্যে ঘটেছে। তাঁর এই সব বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী শোনবার মত। যাই হোক তিনিও সঙ্গে আছেন শুনে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মনের নির্জীবতাকে এই উপলক্ষে ঝেড়ে ফেলবার এই একটা সুবিধা পেয়ে আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। হিমালয়ে আলমোড়া ভ্রমণ এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কত শত ভ্রমণকারী, আজকালকার জগতের গর্ব মোটর গাড়ির সাহায্যে নির্ভাবনায় সেখানে যাচ্ছে আসছে, তবুও নতুন হিমালয় দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যে আনন্দ বোধ করেছিলাম তার কারণও কতগুলি আছে। কৈলাস ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যখন পড়তাম তখন তাতে আলমোড়ার কথা শুনেছি। স্বামী বিবেকানন্দের নির্জন আশ্রম মায়াবতীর নাম শুনেছি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পূর্বে ধারণাই করতে পারিনি—আলমোড়া শহর ও মায়াবতীর ব্যবধান কতদূরে। যাই হোক সেকথা পরে আসবে। তারপরে সম্প্রতি আলমোড়ায় আমার পক্ষে আরো বড় আকর্ষণের বস্তু ছিল উদয়শংকরের বিখ্যাত নৃত্যের আশ্রমটি।

আলমোড়ার পার্বত্য পথ ঃ শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

আমাদের যাত্রা শুরু হলো। মাস্টার মশায় সমেত আমরা তিনজন, বোলপুর থেকে বরাবর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসেবে ভারতবর্ষীয় রেল কোম্পানীর গাড়িতে যাতায়াতের যে আরাম তা ভারতবাসীকে লিখে বোঝাবার কিছুই প্রয়োজন করে না। মাস্টার মশায়ও আমাদের সহযাত্রী। তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে ; এই বয়সে এই শ্রেণীতে এতদূরের ভ্রমণ তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর কিন্তু তিনি তাতে নারাজ নন। বর্ধমান থেকেই আমাদের যাত্রার

কঠোর অভিজ্ঞতা শুরু হোলো। যে কামরায় আমরা বহুকষ্টে স্থান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, দুর্ভাগ্য বলি কিম্বা সৌভাগ্য বলি, সেই কামরাটি ব্রহ্মদেশ পলাতক দুঃস্থ ভারতবাসীতে পূর্ণ। কেবলমাত্র দুই প্রবেশ পথের মাঝে আমাদের মোট ইত্যাদির জন্যে কোনপ্রকারে স্থান জোগাড় করে আমি ও মাসোজী ঠেসান দিয়ে দাঁড়াবার স্থান পেলাম—মাস্টার মশায়কে বয়স্ক দেখে বোধ হয় তারা কোনরকমে একটু বসবার স্থান ছেড়ে দিল। বর্ধমান থেকে সমস্ত রাত্রি আমাদের এইভাবেই কাটাতে হয়েছিল। এই বয়সে মাস্টার মশায়ের তৃতীয় শ্রেণীর এই ভীড়ের কষ্টসহন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এই দলের মধ্যে কয়েকজনের ব্রহ্মদেশে নানাপ্রকার ছোটখাট ব্যবসা ছিল, অন্যরা সেখানে চাকর, দারোয়ান, মেথর ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতো। বহুদিন ধরে তারা হেঁটে এসেছে বহু দুঃখকষ্ট অনাহার অর্ধাহারের মধ্য দিয়ে। প্রায় সকলেরই শরীর শীর্ণ চক্ষু কোটরগত। দেহ ও দেহের বস্ত্র মলিন স্নান নেই। মাথার চুল ধূলায় ও যত্নের অভাবে উস্কোখুস্কো পাগলের মত হয়ে আছে। শরীরে বল নেই, তাই কয়েকজন বেঞ্চিতে শোবার জায়গার অভাবে ট্রেনের ধূলিমলিন মেঝের উপর নানাপ্রকার আবর্জনার মধ্যেই অধমরার মত শুয়ে আছে। দেখলাম উঠে বসবার মত মনের ও শরীরের শক্তি ক্ষীণ। মাঝে মাঝে স্টেশন থেকে খাদ্য আহরণ করবার আগ্রহে কোনপ্রকারে উঠে জল ও খাদ্যের দ্বারা নিজেকে ঠান্ডা করে' আবার শুয়ে পড়ছে। এই দলের সকলেই একই স্থানের বাসিন্দা না হলেও দেড় মাস দুমাস নানা দুঃখে সুখে একই পথের সাথী হিসেবে চ'লে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে একটা গভীর ভালবাসা জন্মেছিল সেইটি আমার কাছে ভাল লেগেছিল। এই দলে হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল, কিন্তু দুঃখের দিনে সকলেই বুঝেছিল যে দেশে যখন বিপদ আসে তখন এইভাবে নির্বিচারেই আসে, কোন ধর্ম বা জাতের দোহাই সে মানে না। একটি অতিবৃদ্ধ হিন্দু পাঞ্জাবী মাস্টার মশায়ের পাশেই তাঁর দিকেই পা রেখে বেঞ্চে শুয়েছিল। গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে, স্টেশনে মুসলমান পানিপাঁড়েকে দেখতে পেয়ে জল চাওয়া হোলো। মধ্যপ্রদেশের একজন যাত্রী বলে উঠলো "ও মুসলমান পানিপাঁড়ে", কিন্তু বৃদ্ধটি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে "ধেৎ তেরি মুসলমান" বলে সেই জল নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো। রাত্রে মাস্টার মশায় যখন বসে বসেই কোনপ্রকারে ঘুমের চেষ্টা করছেন, তখন দেখতে পাচ্ছি তাঁরই পাশের দুর্বল বৃদ্ধটির শীর্ণ পদদ্বয় মাঝে মাঝে তাঁর গায়ে ঠেকছে, কখনো সেই স্পর্শ সজোরে এসে উভয়কেই সচেতন ক'রে দিচ্ছে। তথাপি মাস্টার মশায় নির্বিকার। বরঞ্চ বৃদ্ধের ঘুমের সুবিধা করতে গিয়ে তিনি নিজে একটু এগিয়ে এসে বেঞ্চের ডগায় কোন রকমে বসে, বৃদ্ধের পাদুটি তার পিছন দিয়ে লম্বা ক'রে ছড়িয়ে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি বহুবার বৃদ্ধের পাদুটিকে সতর্ক করেও কৃতকার্য হতে পারিনি, দু' একবার বৃদ্ধকেও সাবধান করেছিলাম, কিন্তু ঘুমের অচেতন অবস্থায় এসব কথার কি মূল্য আছে। বৃদ্ধের এই অসাবধানতায় মনে মনে বেশ একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু মাস্টার মশায়ের মুখের ভাবে কোনপ্রকার বিরক্তির আভাস না পেয়ে নিজেই লজ্জিত হলাম। এই বৃদ্ধ দুর্গতের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ তিনি নিজে অনায়াসে সহ্য করে গেলেন, তার ঘুমের একটুও ব্যাঘাত করেন নি।

পাহাড়ী নদীর ধারে : শিল্পী—নন্দলাল বসু

এইভাবে রাত কাটিয়ে পরের দিন যখন একটু যায়গা পাওয়া গেল, তখন মাস্টার মশায়কে শোবার মত একটু জায়গা করে দিতে পেরেছিলাম। দুপুরে আমাদের গাড়ি মধ্যপ্রদেশে

প্রচণ্ড গরমের মধ্য দিয়ে গরম বাতাসকে আরো ঘুলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছিল, তখন সেই গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে ভিজে গামছায় মুখ চোখ ঢেকে বসে আছি। সে দেশবাসীদের মত এরকম লু ছোটা গরমে অভ্যস্ত নই বলে এই প্রথায় অনেকটা আরাম পেয়েছিলাম। দুপুরে হঠাৎ জানা গেল ব্রহ্ম প্রত্যাগতদের মধ্যে অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ রোগা এক ব্যক্তি উত্তর ভারতের কোন ভাষা জানে না এবং সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় তার বাড়ি, সেই গাড়ির অন্য কেউ তা বলতেও পারে না। ভাষা না বুঝতে পেরে অন্যান্য সকলে তাকে বাঙালী ভেবেছে। আমাদেরও মনে কৌতূহল হোলো, তাকে মাস্টার মশায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে যা উত্তর দিল, তার কোন অর্থ কারুরই বোধগম্য হোলো না। কারণ তার ভাষা আমাদের উত্তর ভারতীয় কোন ভাষার সঙ্গেই মিললো না। আন্দাজে ধরতে পারলাম, সে দক্ষিণ-ভারতীয়। তার চেহারার মধ্যেও সেই ছাপ ছিল। যাই হোক মানুষ তো—তাই আকারে ইঙ্গিতে ও অনুমানে প্রথমে ধরা গেল সে অন্ধ্রদেশবাসী। বহুদিন যাবৎ বর্মাদেশে মেথরের কাজ করতো, সে যাবে "নেলোর" শহরে। হাওড়া স্টেশনে যখন সে "নেলোর" যাবার কথা বলে, তখন তাকে এ গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। "নেলোর" ভুল করে "লাহোর" করা খুবই সম্ভব। সে ভাবছে এখন সে "নেল্লোর" যাচ্ছে। আমরা শুনে অবাক, কারণ নেল্লোর হোলো মাদ্রাজের পথে আর এ বেচারী নিশ্চিন্ত মনে ঠিক তার উল্টো পথে চলেছে। তার পকেট থেকে ভারত গভর্নমেন্টের প্রদত্ত বিনা পয়সায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পাশখানি দেখালো, তাতেও দেখলাম লেখা রয়েছে নেল্লোর। তাকে আবার বহু কষ্টে বোঝানো হোলো এ গাড়ি তার গন্তব্যপথে যাচ্ছে না—সে ভুল পথে এসেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে দেখা গেল সামনের লক্ষ্ণৌ স্টেশনে তাকে নাবিয়ে যদি কানপুর হয়ে ঝান্সি পাঠানো যায় তবে মাদ্রাজের গ্রাণ্টট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসযোগে সে নেল্লোর শহরে পৌঁছুতে পারে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি থেকে পথে খাবার জন্যে অনেক কিছু মিস্টি, ফল, পাউরুটী ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেগুলি এই অসহায় ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে বললেন। খাবারগুলি পেয়ে সে অত্যন্ত খুসী। একটি কার্ডে মাস্টার মশায় ইংরেজী ভাষায় লিখে দিলেন যে, এই ব্যক্তি কোন ভাষা বোঝে না, ভুলপথে এসে পড়েছে, যাবে নেল্লোর। কানপুর ও ঝান্সীতে একে যেন সাহায্য করা হয়; ও বর্মা ফেরৎ একটি দুর্গত। গাড়িতেই একটি কানপুর যাত্রীকে পেয়ে তার জিম্মায় একে দিয়ে দেওয়া হোলো এবং বলে দেওয়া হোলো—কানপুর পর্যন্ত যেন ওকে দেখেশুনে নিয়ে গিয়ে ঝাঁসির গাড়িতে চড়িয়ে দেয়।

বেরিলী জংশনে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন মধ্যরাত্রি।

আলমোড়া থেকে হিমালয় পর্বতমালার দৃশ্য : শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

আমাদের কাঠগুদামের গাড়ি আসবে ভোরে। গ্রীষ্মের রাত্রি স্টেশনের উন্মুক্ত আকাশের তলে কাঁকড়ের উপরেই হোল্ড-অল্ খুলে শোবার আয়োজন করলাম। সামান্য যা খাদ্য তখনকার মত পেলাম তাই খেয়ে গাড়ির ভীড়ের পরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোতে পেরে সকলেই বিশেষ আরাম বোধ করেছিলাম। কাঠগুদাম থেকে বাসে বেলা প্রায় দশটার পর রওনা হই আলমোড়ার উদ্দেশ্যে। আলমোড়ার পথটি বরাবরই বাঁধানো, রাস্তাটি নৈনিতালের ধার দিয়ে রাণীক্ষেতের বিদেশী সৈন্যদের সুখপ্রদ ছাউনী ঘুরে তারপর আলমোড়ায় পৌঁচেছে। সব সমেত প্রায় ৮০ মাইলের উপরে এই রাস্তাটি। কাঠগুদাম থেকে সরাসরি আর একটি পায়েহাঁটা রাস্তা আছে, সেটি খুব প্রাচীন, এই পথে বহু যুগ থেকে তীব্বত ও ভারতের ব্যবসা ও যাতায়াত চলে আসছে। আলমোড়া পায়ে হেঁটে গেলে ৩০ মাইল লম্বা

বহু যাত্রী পায়ে বা ঘোড়ার পিঠে এখনো এ পথে চলাচল করে।

পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা সহজ নয়, তবে এটুকু অনুভব করলাম যে হিমালয়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনায় আসামের পর্বতশ্রেণী বা দক্ষিণ ভারতের বা মধ্য-ভারতের বড় বড় পর্বতশ্রেণীর অনেক তফাৎ। হিমালয়ের মধ্যে আছে পুরুষোচিত সৌন্দর্য, যা শক্তির বিকাশের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে আর অন্যান্য পর্বতের শোভায় নারী-সুলভ মাধুর্য প্রচুর। হিমালয়ে গাছপালার বৈচিত্র্য বিশেষ নেই—অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর মত। তাই গরমের দিনে তাকে যেন অনেক শুকনো লাগলো। ক্রমশই ধীরে ধীরে যতই উপরের দিকে উঠতে লাগলাম, ততই কেবল দেখলাম পাইন, চীর বা দেওদারের গাছ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের মত ডোরা কাটা নানাপ্রকার ফসলের ক্ষেত—পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

মোটর বাসটি ছিল আলমোড়ার ডাকবাহী গাড়ি, সুতরাং এর গতি ছিল অন্যান্য গাড়ির চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। ডাকের ঝুলিগুলি সব নেওয়া হয়ে গেলেই কাঠগুদাম থেকে রওনা হলো। বাসটিতে সবসমেত যাত্রীর সংখ্যা ছিল আমাদের নিয়ে মোট ৮ জন। তাই এ পথে ভীড়ের হাতে কষ্ট পাইনি। কিন্তু কষ্ট পেতে হয়েছিল পথের আঁকাবাঁকা পাকের মধ্যে পড়ে। মোটর বাসে যারা পার্বত্য পথে যাতায়াত করেছেন তারা এ বিষয়ে নানারূপ অভিজ্ঞতার সুযোগ নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমাদের সহযাত্রী আলমোড়াবাসী একটি ডাক্তার ছিলেন সপরিবারে। প্রথম তাঁর স্ত্রী বমি করতে সুরু করলেন, কিছুক্ষণবাদে আরম্ভ করলেন তাঁর স্বামী, আমাদের মাস্টার মশায়ও এই লম্বা ট্রেন ভ্রমণের পর ক্লান্ত ছিলেন, তিনিও অসুস্থ বোধ করে নৈনিতালের বাঁক পেরিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সমস্ত রাস্তা তিনি আর নিজেকে সতেজ করে তুলতে পারেন নি। এই পার্বত্য পথটিতেই তিনি সবচেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়লেন এবং সেখানে পৌঁছে দু' তিন দিন লেগেছিল তার জের কাটতে।

আলমোড়ায় আমরা অতিথি হয়েছিলাম, মাস্টার মশায়ের পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত হিরেন ঘোষের বাসায়। বাসাটি সেখানকার প্রধান রাস্তা মল্ রোডের উপরেই এবং জায়গাটিও ভালো। সম্মুখের দৃশ্যটিও মন্দ ছিল না। তার স্ত্রী শ্রীমতী মণিকা-দেবীও এক সময় কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন। তাদের পূর্বে কোন চিঠি না দেওয়ায় এবং রওনা হবার পূর্বে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তা না পাওয়ায় তারা আমাদের সকলকে হঠাৎ দেখে অবাক। মাস্টার মশায়ের আর একটি পুরাতন ছাত্রীও এই গ্রীষ্মে এখানে বেড়াতে এসে এ বাড়িতে উঠেছিলেন। এই শহরেও কয়েকটি আলমোড়ার ছাত্রী ছিল। সুতরাং একজন পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাস্টার মশায় ও আমাদের দিন বেশ আনন্দেই কেটেছিল। আলমোড়া শহরটি অন্যান্য সরকারী গ্রীষ্মাবাসের মত বড় নয়। জিলার সদর হিসেবে এ শহরটির সরকারি গুরুত্ব আছে, তা ছাড়া এখানে একটি ছোটখাট দেশী সৈন্যের ছাউনিও আছে, কিন্তু সৈন্য নেই। শহরটি পাঁচ হাজার ফুটেরও উঁচু একটি পাহাড়ের মাথায় উত্তর থেকে দক্ষিণ লম্বালম্বিভাবে গঠিত। পূব ও পশ্চিম দুই দিকই ঢালু হয়ে নেবে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। মধ্যস্থলের ঘন বসতিটি এদেশীয় বাসিন্দায় পরিপূর্ণ ও অপরিষ্কার। শহরের শেষে দক্ষিণ দিকের নাম Briton Corner, জায়গাটি সুন্দর—এর অল্প নীচেই পাহাড়ের গায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাদের

শ্রীনন্দলাল বসু

সাধনার জন্য অনেকগুলি ছোটখাট বাড়ি করে বাস করেন। স্থানটিও খুব নির্জন। বাড়ির সামনে পশ্চিম দিকে নীচে ঢালু পাহাড় নেমে গিয়ে একটি নদীতে থেমেছে, তার পরেই আবার পাহাড় উঠতে লাগল। মিশনের খানিক আগে, বড় রাস্তার ধারেই জগদীশ বোসের কৃতি শিষ্য ও বৃক্ষতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বশী সেনের বাড়ি। তাঁর আমেরিকান পত্নীসহ তিনি সেখানে আছেন। সেই বাড়িতেই তিনি ছোটখাট গবেষণাগার গড়ে তুলে গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করেই চলেছেন। ভারত সরকার ও প্রদেশিক সরকার একাজে তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। পরীক্ষার সুবিধার জন্য তাঁর বাড়ির আশেপাশে অনেকখানি জমি তিনি সংগ্রহ করেছেন। বিখ্যাত Botanist বীরবল সাহানীও সেই গ্রীষ্মে আলমোড়ায় তাঁর নিজস্ব বাড়িতে সপরিবারে বাস করছিলেন।

সেখানে গিয়ে শুনলাম, এ বছর গ্রীষ্মে আলমোড়া খুব আরামের হবে না, কারণ জলকষ্টে সমস্ত শহরের অধিবাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে। যে ঝরণা থেকে শহরে জল সরবরাহ করা হয়, সে ঝরণার জল কমে আসায় আবশ্যক জল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মিউনিসিপ্যালিটি জল ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট মাপ ঠিক করেছেন বাড়ি পিছু। বর্তমান যুদ্ধের বাজারে কলকাতা শহরে চিনি বা কেরোসিন তেল সংগ্রহের মত সেখানে জল সংগ্রহের জন্য সার বেঁধে লোক টিন, ঘড়া, কলসী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকতো সে নিয়মকে সুসম্পন্ন করতে। কখনো দেখেছি, কোথাও একফোঁ

করে জল কলের মুখে পড়ছে দেখে আগ্রহের সঙ্গে কেউ না কেউ ঘটি-বাটি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে এক বাটি বা এক ঘটি খাবার জল পাবার আশায়। শহরের ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদেরই জলকষ্ট পোহাতে হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এতখানি জলকষ্ট এ বছর ভোগ করতে হয়েছে বর্ষা দেরিতে আসায়, যা সচরাচর অন্য বৎসর হয় না। আমাদের গৃহকর্তা একটু বেশী জল সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তবু কোন কোন দিন আমরা বিনা স্নানেই কাটিয়েছি বাধ্য হয়ে। জল যেদিন পেয়েছি, তা দিয়ে কেবল গা, হাত-পা ভেজানো চলতো।

এখানে আসার পর প্রথম কয়দিন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার ছিল বলে আমাদের মন্দ লাগছিল না। প্রতিদিনই সকালে বিকালে সকলে মিলে বেড়াতে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ। আমার ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে হোত, কিন্তু মাস্টার মশায় ও অন্যান্যদের তা হয়নি। শহরের দেশী পাড়ায়, বাজারে দূরে পাহাড়ের গায়ে নানা স্থান দেখে বেড়াতেন। কোন কোন দিন ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যেতো। মাস্টার মশায়ের বেড়ানো একটু অন্য রকমের। তিনি চলতে চলতে আশেপাশের গাছ পাতা, ফুল, ফল, পাথর, বাড়ি সব দেখতে দেখতে এবং ভাল করে তদারক করতে করতে চলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো সব সময়েই ব্রহ্মদেশীয় একটি থলি, তার ভিতরে ছুরি পেনসিল, ছবি আঁকবার সাদা কার্ড, চাইনিজ ইংকের একটি ছোট কৌটো, সঙ্গে একটি জাপানী তুলি, কিছু ওষুধ, টর্চ, ন্যাকড়া ইত্যাদি টুকিটাকি আরো কিছু। এবং হাতে তাঁর প্রধান সহায় পাঁচ ফুট লম্বা পাকা বাঁশের লাঠিটি। তিনি কখনো ইয়োরোপের আর্টিস্ট-দের মত ছবি আঁকবো বলে বা সেই মন নিয়ে বেড়াতে যান না, তিনি কেবল দেখতে যান। এই দেখাই হোলো তাঁর শিল্পমনের মূল কথা। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়তো নিরর্থক হবে না।

পূর্বেও মাস্টার মশায়ের সঙ্গে নানা উপলক্ষে বহু স্থানে বহুবার ভ্রমণে বেরিয়েছি। প্রতি বৎসরেই পৌষ মাসে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ও অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে তাঁবু ও রান্না-খাওয়ার সরঞ্জামসহ দশ-বার দিনের মত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই প্রকার ভ্রমণের ভিতর দিয়ে কতগুলি ভাল ফল দেখা গেছে। প্রথমত, এর দ্বারা শান্তিনিকেতনের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনে ; দ্বিতীয়ত, কর্মজীবনের দূষিত হাওয়া মাঝে মাঝে যদি কখনো পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাও পরিষ্কার হয়ে যায়। তার চেয়ে বড় কথা হোলো আমাদের আশেপাশের জগতকে ভালো করে শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখতে শেখানো। যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজে সর্বকিছু দেখে বেড়ান। এই রকম বেড়ানোর সময় তাই শহরে এমনকি, শহরের নিকটবর্তী স্থানেও তিনি তাঁবু ফেলতে নারাজ। কিন্তু পল্লী প্রাণের কাছে বাস করায় তিনি আপত্তি করেন না, বরঞ্চ ভালোই বাসেন। সেখানে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক সকলে মিলে অনাড়ম্বর পল্লীপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে লেগে যান। মাস্টারমশায়কে বলা চলে সত্যিকার Peoples Artist। ভারতবর্ষের ৯০ ভাগ প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হচ্ছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। তাই এ যুগের শিল্পীর মধ্যে যদি তার কোন ছাপই না পড়ে, তবে বলতে হবে তার মন সতেজ নয়, নির্জীব। এই শান্তিনিকেতনের জীবনে মাস্টারমশায়কে দেখেছি, গ্রাম্য-জীবনের সর্বকিছুর সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা দিনে দিনেই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। তাঁর অঙ্কিত ছোট অসংখ্য কার্ডে পেনসিলে বা তুলির ছবিতে দেখা যাবে গ্রাম্য-জীবনের প্রকাশ, কতভাবে কতরূপের মধ্য দিয়ে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের অতি সহজে আপনার করে নিতে পারার মত গুণ তাঁর মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পী-মহলে তা খুব কম দেখা যায়। শিল্পীদের লোকে দোষ দেয়, লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না বলে, শহুরেদের সঙ্গে চট করে না মিশতে পারায় মাস্টারমশায়কেও সে দোষে দোষী করা যায়। কারণ শহুরে জীবনের কৃত্রিমতাকে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি যখন গ্রামে যান, শিল্পী হিসেবে নয়, তাদের জীবনকে আঁকতে নয়, তাদের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। তাই সেখানে বড় বড় কাগজ, পেনসিল ও রঙের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনে তাক লাগাবার কোন চেষ্টা তাঁকে কখনো করতে দেখিনি। তিনি ছোট ছোট কার্ডে, চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গিয়ে হয়তো ফস করে একটা আঁচড় দিয়ে নিলেন। যে জানে, সে বুঝবে, তাঁর মনের উপরে কি আঁক হয়ে গেল। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলেন, স্কেচ করবার সময় বস্তু বা প্রাণীর মূল ছন্দটিকে বুঝতে পারা এবং তাকেই কাগজে আগে ধরে নেওয়াই হোলো স্কেচ করার প্রকৃত অর্থ। গতিশীল যা কিছু তার ভিতর থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে গতির মূল ভঙ্গিটিকে প্রথমে ধরতে পারলে স্কেচের সময় আর কিছু আঁকার প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার দ্রুত ধরবার ক্ষমতাতেই ধরা পড়ে শিল্পীর মন কতখানি সেই বস্তুর ভিতরে ঢুকতে পেরেছে। মূল ছন্দটি ধরা হয়ে গেলে পরে ধীরে সুস্থে বাকিটুকু বাড়ি বসে তৈরী করে নিলে কোন ক্ষতি নেই। এইভাবে শিল্পাচার্যের শিক্ষাদানের কাজ চলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাদের সঙ্গে তিনি আছেন ও নিজে আঁকছেন, সেই সঙ্গে তারা তাঁকে দেখছে ও নিজেরাও আঁকছে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাটি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই-ভাবে খুলে ধরেন, তাঁর কর্মের ভিতর দিয়ে, মুখে বক্তৃতা দেওয়ায় তিনি মোটেই পক্ষপাতী নন। প্রশ্ন এলে তার জবাব দেন মাত্র, তার বেশী নয়। মোট কথা তাঁর সমগ্র শিল্প-জীবনটিই হোলো ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি সুন্দর বক্তৃতা। তাঁর শিল্প দৃষ্টি কতখানি পরিষ্কার, তার একটি উদাহরণ দিই,—তিনি জীবনে কখনো নৃত্যের চর্চা করেছেন বলে শুনিনি, কিন্তু তিনি বহু প্রকার নাচ দেখেছেন। তাঁর হাতে আঁকা যাবতীয় নৃত্যের ছবির বা স্কেচগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে আপনা থেকেই মনে প্রশ্নের উদয় হবে যে, তিনি একজন নিপুণ নর্তকের অভিজ্ঞতাতে আঁকার মত এত নাচের ভঙ্গি পেলেন কোথা থেকে? অথচ একথা জোর করে বলতে পারি যে, কোনদিন তিনি কোন নাচিয়েকে ভঙ্গি করে দাঁড়াতে বলেন নি। গ্রামে যখন ঘুরে বেড়ান, তখন সেখানকার যাবতীয় কুটীরশিল্পকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখবেন ও তাদের কর্মপদ্ধতিকে বোঝবার চেষ্টা করবেন। ছেলেদের সেইদিকে উৎসাহিত করবার জন্যে কুটীর-শিল্পের আয়োজন করেছেন, গ্রাম্য শিল্পীদের সেখানে আনিয়ে।

[শেষাংশ ...]

[উপন্যাস]

১

বনবিহারী ভেবেছিল দিন তার এমনি করেই কেটে যাবে। পিতৃপিতামহের আমল থেকে ইমারতি গাঁথা ভিটে, বিপুল বিষয় সম্পত্তি, আর তেজারতি মহাজনির কারবার—যার হিসেব লেখা লাল শালু-বাঁধাই লম্বা বালিকাগজের খাতায় স্বরচিত ভুষোর কালি আর পেতলের মরচেধরা নিবের সাহায্যে আঁকাবাঁকা সংখ্যা ফুটিয়েও শেষ করা কঠিন হয় না, বরং তাতে খাতার পৃষ্ঠা ভরাট হ'য়ে খরচের চেয়ে জমার দিকটাতেই রাশির সংখ্যা এগিয়ে চলে বেশী,......সেই রকম দিন।

এ দিন দীর্ঘ হোক হ্রস্ব হোক তাতেও কিছু এসে যেত না,—কিন্তু এই একটানা, রুটিন ধরা জীবনের মধ্যে হঠাৎ ছন্দ পতনের মত এসে উপস্থিত হ'লো শৈলজা।

শৈলজা বনবিহারীর ছোট ভাই ত্রৈলক্যর ছেলে; অনেক দিন হ'লো শৈলজার বাপ আর মা, দুই-ই গত হ'য়েছিল একটি মাত্র মেয়ে আর ছেলে শৈলজাকে মামার জিম্মায় রেখে। মেয়ে মহামায়া শৈলজার চেয়ে অনেক ছোট, বিয়ে হ'য়েছিল এই পাশের গ্রামেই,—কিন্তু স্বামী তার কাজ করে বিদেশে; তাই বিয়ে হ'য়ে পর্যন্ত একবার কি বড় জোর দুবার ছাড়া সে মায়ের কাছে আসেনি, কাজেই তার সম্বন্ধে এ পর্যায়ে যবনিকা টেনে দিলেও ক্ষতি নেই, কথা হ'চ্ছে তার ভাই শৈলজাকে নিয়ে।......জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিতান্ত নিজের ব'লে শৈলজা যাকে জানতো সে তার ঐ মামা।

নিঃসন্তান মামা তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তর দিয়ে ভাগ্নেটিকে এত বড় ক'রে তুলেছিলেন সত্য, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোনও ব্যবস্থা না ক'রেই হঠাৎ যেদিন নিজেরও অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন সে এই পাড়াগাঁয়ে, পিতৃপিতামহের আমলের ভিটা আর বনবিহারীর আশ্রয়ে না এসে কোনও উপায় দেখলে না।

বনবিহারী তখন সবেমাত্র আটচালার নীচে জলচৌকীর ওপোরে আপন বিপুল দেহভার ন্যস্ত ক'রে তামাক টানা শুরু ক'রেছিল ; সম্মুখে সিন্দুর আর চন্দন-চর্চিত রং পালিশ চটা পুরাতন একটা কাঠের হাতবাক্স, তার ওপোরে লাল শালুতে সুতোলী জড়ানো সেই বালি কাগজের খাতা, পাশে সেই দোয়াত কলম।

কোথাও কোনও বেমানান নাই; এরই মধ্যে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সমেত শৈলজাকে নামতে দেখে একটু বিস্মিত হ'লো সে ; কিন্তু উঠলো না, প্রশ্নও ক'রলে না কাউকে।

শৈলজা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সামনে; পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে, চোখের সুতো বাঁধা চশমটা কপালের ওপোর তুলে প্রশ্ন ক'রলে......

"কে—ও ?"......

"আমি শৈলজা"—

"শৈলজা !"—

চোখ দুটো অপার বিস্ময়ে বিস্ফারিত ক'রে বনবিহারী বললে ঃ—"আমাদের ত্রৈলক্যর ছেলে শৈলজা ?"

সবিনয়ে শৈলজা জবাব দিলে ঃ—"আজ্ঞে হ্যাঁ !"—

পাশাপাশি আরও কতকগুলো কাঠের ছোট বড় চৌকী, জলচৌকী পাতা ছিল,—ওরই মধ্যে একটা অঙ্গুলী নির্দেশে দেখিয়ে বনবিহারী ব'ললে—

"বোসো।"

শৈলজা ব'সলো;—কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে। বনবিহারীর চাঞ্চল্যহীন মুখের ভাব, ক্ষুদ্র চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আরও তীক্ষ্ণ ব'লে মনে হচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল তার এই আসায় খুশী তো বনবিহারী হয়ই নি—বরং অখুশীর মাত্রাই যেন তার মনটাকে অধিকার ক'রেছিল একছত্র-ভাবে। বনবিহারী তামাক খাচ্ছিল, হাতের কড়ি বাঁধা থেলো হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিয়ে; হুঁকোর মাথায়,—ক'লকে থেকে দেখা যচ্ছে কাঠ কয়লার আগুনের লালচে আভা, আর তারই কড়া গন্ধের স্বল্প ধোঁয়ার রেশ বার হ'চ্ছে মুহুর্মুহু বনবিহারীর মুখ গহ্বর থেকে।

গোলাকার, বসন্তের দাগ আঁকা কৃষ্ণবর্ণ সে মুখ, স্থূল দেহ, লোমশ বক্ষ; মাথার মাঝখানে টাক,—কানের পাশের পাতলা চুলে সাদা রংএর ছোপ ধরেছে।

এক কথায় তাকে বর্ণনা ক'রতে গেলে এই মাত্র বলা চলে যে সে যেন কমা-সেমিকোলন-হীন সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের পরিপূর্ণ একটি লাইন;—সে লাইন সাধারণের পক্ষে বোঝা যেমন কঠিন, তেমনি অনুচ্চারিত।

শৈলজা বনবিহারীর নির্দেশিত আসনে ব'সলো, কিন্তু নিজে থেকে কোনও কথা তুলতে সাহস ক'রলো না, তুললে বনবিহারী ; বারকয়েক কেসে গলাটাকে যেন অনেকটা পরিষ্কা

করে নিয়ে বললেঃ "আমি কিন্তু ভেবেছিলুম অন্য রকম ; মনে ক'রেছিলাম—যে তুমি যেদিনই আস না কেন, আসবার আগেও অন্তত একখানা চিঠিপত্র কিছু দিয়েও জানাবে!"

ইতস্তত ক'রে শৈলজা জবাব দিলেঃ—"ভেবেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মামাবাবু হঠাৎ মারা গেলেন কিনা,—তাই আর..."

কথাটার সুরের খেই টেনে সে থামতেই বনবিহারী প্রশ্ন ক'রলেঃ—"কি ব'ললে? মামার কি হ'লো হঠাৎ?"

"হঠাৎ—হার্টফেল হ'য়ে মারা গেলেন কিনা, তাই ব'লছি।"

মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বনবিহারী একটু হাসলো; বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায় ভরা সে হাসি। ব'ললেঃ—"বটে! মুস্কিলের কথা তো! কিন্তু আজকাল হাটে ঘাটে, ঘরে বাইরে যেদিকে তাকাই সেদিক থেকেই কানে আসে শুধু হার্টফেলের খবর; রোগ নেই ভোগ নেই, ইয়া ইয়া ষণ্ডা মানুষগুলো সব পড়ছে আর মরছে। দেখে শুনে আমারই ভয় হয়, ভাবনা হয়,—হয়তো বা আমাকেও হার্টফেল হ'য়েই ম'রতে হবে!"

একটু দম নিয়ে পুনর্বার শুরু ক'রলেঃ—"আর বেঁচে থেকেও যখন আত্মীয়স্বজনে কেউ একবার মুখ ফিরিয়েও তাকায় না, তখন মলে! মলে, মড়াই উঠবে না হয়তো উঠোন থেকে।"

শৈলজা বসে বসে নির্বাকে শুনে যেতে লাগলেঃ—

"সবাই ভাবে এই বনবিহারীকে একবার বাগে পেলে হয়। তখন দেখা যাবে একহাত! কথায় আছে জ্যান্ত বাঘকে খাঁচায় পোরা কঠিন; কিন্তু মরা বাঘ! তাকে দু'দশটা লাথি-ঝাঁটা মারলেও তো আর টুঁ শব্দটি করবে না,—সুতরাং শেষেরটাই নিরাপদ।"

শৈলজা জবাব দিল না এ কথার। বনবিহারী আবার বলে চললো—"গাঁয়ে কানাঘুষো হয়, লোকেও আমাকে জিজ্ঞাসা করে নানা ছলে যে, আমার এত বিষয় সম্পত্তি খাবে কে, ভোগই বা করবে কোন্ ওয়ারিশ! কিন্তু এর জবাব তারা জানে না যে বসে খেলে রাজার রাজত্ব ফুরিয়ে যায়, তার বিষয় সম্পত্তি! এতো সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ! আমিই একে প্রাণপণ যত্নে সঞ্চয় করেছি, আবার আমিই একে খোয়াব নিজের দরকারে; কারো জন্যেই কিছু পড়ে থাকবে না; তবে দরকার মিটে অবশিষ্ট যদি কিছু পড়ে থাকে, সেটা পাবে সেই, যে আমার অসময়ে দেখবে, করবে, তা ছাড়া এতটুকুর আশাও যেন না কেউ করে আমার কাছে।"

বনবিহারী যে কথাটা স্পষ্ট করে হোক, ইঙ্গিতে হোক শৈলজাকে বুঝিয়ে দিলে, সেটা যে এত তাড়াতাড়ি বুঝবার আশা শৈলজা মোটেই করে নি, তা তার মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

একবার আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে—বনবিহারী হাতের হুঁকোটা আবার মুখের কাছে তুলে ধরলে।

শৈলজা বসে রইল নির্বাকে,—যেমন ছিল।

দু-চার টান তামাক টানার পর মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বনবিহারী জিজ্ঞাসা করলে,—"তা কি করা হয় এখন?"

"কিছু নয়।"

কুণ্ঠিত স্বরেই শৈলজা জবাব দিলে; কিন্তু এর উত্তরে বনবিহারীর চোখে মুখে প্রকাশ হলো অপার বিস্ময়ঃ—

"বল কি হে! এত বড় যোয়ান ছেলে, এখনও বেকার হয়ে ঘরে বসে আছো! কোনও জায়গায় একটা চাকরীবাকরী কিছু জুটলো না?"

"আজ্ঞে চেষ্টা করিনি।"

"চেষ্টাও করোনি? কেন?"

বনবিহারী ওর ছোট ছোট চোখ দুটো যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে তাকালো শৈলজার মুখের দিকেঃ—

"তাহলে কি একটা গুজব কথা শুনেছিলাম, তুমি নাকি ডাক্তারী-না-কি একটা পাশ দিয়েছ যেন...!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ...!"

"তবে?..."

"তবে আর কি, প্র্যাক্টিস করিনি বটে য়্যাদ্দিন, কিন্তু ক'রতে তো হবেই একটা কিছু......!"

"ও,—তাই বল!"

পরম আশ্বস্তভাবে কথাটা উচ্চারণ করেই বনবিহারী আবার হাতের হুঁকোয় মন দিল। শৈলজাও নিজে থেকে আর কোনও কথা কইলে না, যেন কইবার মত কোনও কথাই নেই তার।

সময় তবু কেটে চ'ললো।

বনবিহারী মুখ ফিরিয়ে তাকালো দূরের দিকে, যেখানে ঘন সবুজ পাতায় ঘেরা ঝাঁপলো আম কাঁঠালের বাগানের শেষ প্রান্তটা গিয়ে মিশেছে নদীর ধারে, একেবারে কিনারায়। ওরই ফাঁকে ফাঁকে এঁকা বেঁকা নদীর জল, রূপালী রেখার মত; আর তার ওপারে এসে প'ড়েছে বেলাশেষের আলোর আভা, ভাদ্রের সজল হাওয়া ওর একূল থেকে ওকূল পর্যন্ত ছুটোছুটি ক'রছে আমন ধানের ক্ষেতে নাড়া দিয়ে, মাথায় মাথায় ঢেউ তুলে।

মাথার ওপোরে মেঘমেদুর থমথমে আকাশ।

বনবিহারী সেইদিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ;

যেন সে এক গভীর ধ্যানমগ্ন ভাব!

শৈলজা তার সে একাগ্রচিন্তা ভাঙাতে সাহস ক'রলো না, উঠতেও পারলো না, চুপ ক'রে বসে রইল সেইখানে।

এক সময়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকে সেইখানে সেই অবস্থায় চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখেঃ—

"একি, তুমি এখনও এখানে ব'সে আছ যে! আমি মনে করেছিলাম তুমি চ'লে গেছ বুঝি!"

শৈলজার মুখে এর জবাব এলো পর পর, কিন্তু ব্যক্ত ক'রলে শুধু একটা, অসংলগ্ন অসমাপ্তভাবেঃ-

"আজ্ঞে না।"

"আহা-হা, হা, তা যাও না বাড়ির ভেতর, সোজা চলে যাও।"

শৈলজা উঠে দাঁড়ালো;

বনবিহারী আবার ডাকলো—

"বলি, শোনো।"

শৈলজা ফিরলো।

বনবিহারী বললে—

"বলছি, তোমার মামার বাড়ির দেশ তো আর এ মুলুকে নয়! গাড়িতেও চড়েছ তো সেই সকালে, কি বল!"

"আজ্ঞে।"

"এখনও নিশ্চয় আহারাদিও হয় নি?"

শৈলজা নির্বাকে মাথা নাড়লে শুধু।

বনবিহারী উঠে দাঁড়ালো—

"আরে, তা আগে বলতে হয়! দেখদিকি কান্ডখানা!"

নিজের মনে এমনি অনেক কথা আওড়াতে আওড়াতে বনবিহারী শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে মন্থরগতিতে প্রবেশ করলো অন্দরে। বহুদিনের অবহেলায় ব্যবহৃত ঘরবাড়ি চুণবালি খসা অবস্থায় অস্থি-পঞ্জর জর্জরিত দেহ নিয়ে শুধু আজও দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে, অন্তিমে শেষ নিঃশ্বাসের মত।

চারিদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করতে করতে বনবিহারীর পশ্চাদনুসরণ ক'রে শৈলজা যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো, এটা অপেক্ষাকৃত ভালো, রং না থাকলেও চুণবালি—এমন কি থামের কার্নিশগুলোও স্পষ্ট দেখা যায়।

ওদের সাড়া পেয়ে নিস্তব্ধ দুপুরের বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন দুটো পায়রা উড়ে গেল দরদালানের থামের কার্নিশ ছেড়ে। দুই একটা চড়াইও চঞ্চল হয়ে উঠলো বোধ হয়।

দুই একবার কেসে, গলাখাঁকারী দিয়ে বনবিহারী ডাকলে—

"ছোট বৌ ঘরে আছো? ছোট বৌ—"

ডাক শুনে ঘরের ভেতর থেকে, ভেজানো দরজা ঠেলে অর্ধ-অবগুন্ঠনবতী যে নারী মূর্তিটি বাইরে এসে দাঁড়ালো, শৈলজা দেখলে সে সুন্দরী, হয়তো তারই সমবয়সী।

কিন্তু এ বয়সে মেয়েদের মুখে, চোখে দেহেও যে বার্ধক্যের রেখাপাত হয়, তার তা নেই।

একখানি মিহি কালাপাড় কাপড় তার পরনে, গায়ে সেমিজ, বাঁ হাতে কয়েকগাছ সোনার গোখ্‌রী চুড়ি।

শৈলজাকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো; বনবিহারী ওর সে সংকুচিত ভাব লক্ষ্য করে বললে—

"ও আমার ছোট ভাই ত্রৈলক্যের ছেলে, লজ্জার কোনও কারণ নেই।"

অপর পক্ষ থেকে এ কথার কোনও জবাব না পেয়ে প্রশ্ন করলো—

"হাঁড়িতে ভাত আছে?"

মাথা নেড়ে ছোট বৌ তরঙ্গ জানালে—

"না। কিন্তু না থাকলেও দুটি গরম ভাত রাঁধতে বেশী দেরী হবে না তার, এখনি চড়িয়ে দিচ্ছি।"

বনবিহারী যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

একটু থেমে, একটু বা হেসে, বার কয়েক মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললে—

"ওর নিজের জেঠি যখন বেঁচে নেই, তখন ওর সব ভার তোমারই হাতে তুলে নিতে হবে বৈকি ছোট বৌ, আপন-পরের লজ্জা সঙ্কোচও ত্যাগ করতে হবে তোমাকে, তা নইলে"...কথাটার শেষ যেন আর মনের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে বনবিহারী মাথার টাকে নিজের লোমবহুল হাতখানার চেটো ঘসতে লাগলো ঘন ঘন।

তরঙ্গর কপালের কাপড় না উঠলেও মুখের ওপোর ভেসে উঠলো একটা অসঙ্কুচিত হাসির আভাষ। সেই দিকে তাকিয়ে বনবিহারী যেন একটু নিশ্চিন্ত সুরে বললে—

"আমি যাই তা হলে, আবার কাজকর্মও দেখতে শুনতে হবে তো!"

তরঙ্গ সে কথার উত্তর না দিয়ে শৈলজাকে লক্ষ্য করে বললে—"ঘরে এসো।"

(ক্রমশ)

৪ঠা নবেম্বর

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, সোমবার রাত্রে জাপানীর গুয়াদাল কানার দ্বীপে মার্কিন অবস্থানের উত্তর-পূর্বে আরও সৈন্য নামাইতে সমর্থ হয়।

নিউগিনিতে অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা কোকোদা ছাড়াইয়াও জাপানীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

৫ই নবেম্বর

মিশর রণাঙ্গন—কায়রোর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, এক্সিস পক্ষের সৈন্য বাহিনী এখন পুরাদমে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। জার্মান আফ্রিকান কোরের কম্যান্ডারসহ নয় সহস্রাধিক এক্সিস সৈন্য বন্দী হইয়াছে। জেনারেল রোমেলের স্থলাভিষিক্ত জার্মান আফ্রিকান বাহিনীর সেনাপতি নিহত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৬ই নবেম্বর

সোভিয়েট বিপ্লবের পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মস্কো সোভিয়েটের এক অধিবেশনে মঃ ষ্ট্যালিন এক বক্তৃতায় বলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম উদ্দেশ্য হইল—হিটলারবাদ প্রভাবিত রাষ্ট্রের এবং যাহারা উহাতে ইন্ধন জোগায় তাহাদের ধ্বংসসাধন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল হিটলারবাদ প্রভাবিত বাহিনীর ধ্বংসসাধন করা এবং উহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে নির্মূল করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল ইউরোপে জার্মানীর কল্পিত নববিধানের বিনাশ সাধন করা এবং উহার স্রষ্টাগণকে সাজা দান করা। মঃ ষ্ট্যালিন বলেন যে, এখনই হউক আর পরেই হউক ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবেই।

মিশর রণাঙ্গন—জেনারেল মণ্টগোমারী ঘোষণা করেন যে, এল আলামেন-এর যুদ্ধে অষ্টম আর্মি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সবমেরিনের আক্রমণে ছয়খানি এক্সিস জাহাজ জলমগ্ন এবং দুইখানি বৃহদাকার জোগানদার জাহাজ ঘায়েল হইয়াছে।

৭ই নবেম্বর

সোভিয়েট বিপ্লবের পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষে মঃ ষ্ট্যালিন এক আদেশপত্রে ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত ৮০ লক্ষাধিক এক্সিস সৈন্য ও অফিসার নিহত হইয়াছে।

৮ই নবেম্বর

হিটলার তাঁহার মিউনিক বক্তৃতায় বলেন, "কাইজার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি কখনও আত্মসমর্পণ করিব না।" হিটলার বলেন যে, দশ বৎসর পূর্বের জার্মানী বহু গুণে শক্তিশালী হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে ২০ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত হয়। বর্তমান সংগ্রামে তিন লক্ষ জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে, তন্মধ্যে নাৎসী পার্লামেণ্টের ৩৯জন সদস্যও আছেন। হিটলার বলেন, "ষ্ট্যালিন মনে করিয়াছিলেন যে, আমরা মধ্য রুশিয়া আক্রমণ করিব; কিন্তু আমরা একটিমাত্র শহরকে লক্ষ্য করিয়া আগাইয়াছি। আমি এই বিশেষ শহরটিই চাই। এ কথা বিশ্বাস করিবেন না যে, শহরটি ষ্ট্যালিনের নামে অভিহিত বলিয়া আমি উহা চাহিয়াছি। সংযোগস্থল রূপে ইহার গুরুত্ব বুঝিয়াই আমি ইহা চাহিয়াছি।"

মার্কিন অভিযানকারী বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিয়াছে। ফরাসী আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক উপকূল—এই উভয় স্থানেই সৈন্যাবতরণ আরম্ভ হইয়াছে। জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী ফরাসী আফ্রিকায় অভিযান আরম্ভ করিবে। এই আশঙ্কায় উহা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্যই মিত্রপক্ষ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ভিসি হইতে বেতারযোগে প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে, মার্কিন বাহিনী স্থানে স্থানে আলজিয়ার্স শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষীয় এক লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য অবতরণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মিত্রপক্ষীয় বহু সৈন্য মরক্কোর সাফিতে অবতরণ করিয়াছে এবং সেখানে যুদ্ধ চলিতেছে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদ এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করে। কারখানা অঞ্চলে সোভিয়েট রক্ষীবাহিনী কয়েকটি বাড়ি হইতে জার্মানদিগকে বিতাড়িত করে।

মিশর রণাঙ্গন—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, মর্সামাত্রু বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর

ভিসি বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, আলজিয়ার্সে এডমিরাল দারলার নির্দেশে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী প্রধান সেনাপতি ও মার্কিন বাহিনীর সেনাপতির মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন সৈন্যগণ অভ্যন্তরভাগে দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

কাসাব্লাঙ্কার এক সংবাদে প্রকাশ, কাসাব্লাঙ্কার সন্নিকটে ফরাসী ও মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের মধ্যে একটা বড় রকমের নৌযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ওয়াশিংটনের খবরে বলা হইয়াছে যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দরস্থিত সমস্ত ভিসি জাহাজ আটক করা হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে কামানের লড়াই হয়। ষ্ট্যালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চলে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত হয়।

মিশরের মরু রণাঙ্গনে বৃটিশ অষ্টম আর্মি কর্তৃক ছয় ডিভিসন ইতালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে। জেনারেল রোমেলের অবশিষ্ট সৈন্যের অধিকাংশ এখন লিবিয়া সীমান্ত পর্যন্ত বা লিবিয়া সীমান্ত ছাড়াইয়া হঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১০ই নভেম্বর

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের শেষ সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আলজিয়ার্স নগর দখল করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আরও মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। মার্কিন বাহিনী ওরান বন্দর দখল করিয়াছে। ভিসি নিউজ এজেন্সী বলেন যে, মরক্কোর লিওতে ও মেদিয়া বন্দর আমেরিকানরা দখল করিয়াছে।

অদ্য বুয়েনস এয়ার্স-এর বেতারে বলা হইয়াছে যে, এডমিরাল দারলা আলজিয়ার্সে মার্কিন বাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

রুশ রণাঙ্গন—কৃষ্ণসাগরীয় উপকূলভাগের জন্য সংগ্রামে তুয়াপসের নিকটে বিমান যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মানগণ এই অঞ্চলে তাহাদের বহুসংখ্যক বিমান নিয়োজিত করিয়াছে।

মিশর রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল সিদিবারানী এবং সোল্লুমে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত আছে।

৩রা নবেম্বর

বাজার ঘাটের সংবাদে প্রকাশ যে, দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বালুরঘাট শহরের অধিবাসীদের উপর ৭৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়াছেন। স্থানীয় সাব রেজিস্ট্রারের উপর এক হাজার টাকা এবং একজন মুসলিম অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দুইশত টাকা জরিমানা ধার্য হইয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সম্পর্কে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফেণীর খবরে প্রকাশ, গত রবিবার ফুলগাজী ইউনিয়ন বোর্ড এবং ঋণ-সালিশী বোর্ডের অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং অফিসের কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিস সমুদয় ভস্মীভূত হয়। উক্ত রাত্রে ফুলগাজীর আবগারী দোকানেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মেদিনীপুর জেলার যাবতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ বে-আইনী সমিতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর

পুণার সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য যারবেদা জেলে গোলযোগের ফলে ৬৭ জন রাজনৈতিক বন্দী এবং চারিজন পুলিশ আহত হইয়াছে। রাজবন্দীদের উপর লাঠি চালনা করা হইয়াছিল। তিনজন বন্দী কারাগার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

মুঙ্গেরের সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিশ মুঙ্গের শহরের উপকণ্ঠে জঙ্গলের মধ্যে এক গুহায় প্রায় দুইশত হাত বোমা বা মিল বোমা পাইয়াছে।

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ, গোয়ালপাড়ায় পাইকারী জরিমানা আদায় কালে একজন পল্লীবাসী জনৈক কনেস্টবলকে আক্রমণ করে। কনেস্টবল গুলী চালায়; পল্লীবাসী তৎক্ষণাৎ মারা যায়; কনেস্টবলটি গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস ডি উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে।

মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জ থানার এলাকায় এক চর লইয়া দুই দলের কৃষকের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

৫ই নবেম্বর

গোপালগঞ্জের খবরে প্রকাশ, কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি গোপালগঞ্জ থানার এলাকাধীন বাউলীতলা বাজারের নিকট টেলিগ্রাফের তার অপসারিত করিয়াছে।

৬ই নবেম্বর

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য অধ্যাপক এন জি রঙ্গকে গ্রেপ্তার করিয়া গুন্টুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৭ই নবেম্বর

বিহার সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ভাগলপুর জেলায় বাঙ্কা মহকুমার জঙ্গলে সশস্ত্র তিন শতাধিক লোকের সহিত সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হইয়াছে। এই লোকেরা দুইজন লোককে খুন করিয়াছে।

বাঙলার গভর্ণর ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী ছয় মাসের জন্য কাঁথি লোক্যাল বোর্ড, তমলুক লোক্যাল বোর্ড ও সদর লোক্যাল বোর্ড সহ ছয়টি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বাতিল করিয়াছে।

কলিকাতা ধর্মতলা স্ট্রীট ও ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে দুইটি ডাকবাক্সের চিঠি পোড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। গোয়েন্দা পুলিশ আজ উত্তর কলিকাতায় পাঁচ ছয়টি স্থানে খানাতল্লাসী করে।

৮ই নবেম্বর

অদ্য বেলা প্রায় পৌনে চারিটার সময় উত্তর কলিকাতার হালসীবাগান রোডের 'কালীপূজা প্যাণ্ডেলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৩৩ জন লোক মারা গিয়াছে এবং প্রায় ৫০জন আহত হইয়াছে। মহানগরীর ইতিহাসে এইরূপ মর্মন্তুদ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাসহ প্রায় সহস্রাধিক নরনারী ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষ ও তাঁহার দলবলের ব্যায়াম কৌশল দেখিবার জন্য জড় হইয়াছিল। প্যাণ্ডেলটি ছিল হোগলার তৈয়ারী। হঠাৎ প্যাণ্ডেলের এক কোণে আগুন লাগে। ১৫ মিনিটের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া সমস্ত প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়া যায় এবং জ্বলন্ত হোগলা স্তূপের নীচে পড়িয়া ১১৯ জন নরনারী তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ইহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও শিশু। আহতদের মধ্যে হাসপাতালে ১৪ জনের মৃত্যু হয়।

দিল্লীতে মিঃ আল্লাবক্সের সভাপতিত্বে নিঃ ভাঃ আজাদ মুসলিম সম্মেলনের বোর্ডের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর

কলিকাতা হালসীবাগান 'কালীপূজা প্যাণ্ডেলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট মৃত্যুসংখ্যা ১৪১ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১২০ জন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে বাকী ২১ জন কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মারা গিয়াছে। যে ১২০ জন ঘটনাস্থলে মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে ১০৭ জনের মৃতদের সনাক্ত করা হইয়াছে। বাকী ১৩টি মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার বৈঁচী ইউনিয়ন বোর্ড অফিস পোড়াইয়া দিবার খবর পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করায় ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচজন মহিলাও আছেন।

ঢাকার জনৈক স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট, কংগ্রেস জাতীয় দলের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও ডাঃ প্রশান্তকুমার সেনের প্রতি ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অপর দুইটি মামলা সম্পর্কে উভয় আসামীই ইতিমধ্যে ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

১০ই নভেম্বর

মুর্শিদাবাদের খবরে প্রকাশ, গত ৬ই নভেম্বর মালিহাটী ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে এবং ঐ অঞ্চলের একটি মদের দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বহরমপুরের খবরে প্রকাশ, ৭ই নভেম্বর খাগড়া পোস্ট অফিস সংলগ্ন চিঠির বাক্সে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

বোম্বাই ও আমেদাবাদে বিস্ফোরণ হয়। ফলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। করাচীতে দুই স্থানে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

হুবলী-পুণা লাইনের রায়বাগ রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে দালানের ক্ষতি হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 21st November, 1942. [২য় সংখ্যা

জনসেবার আবেদন—

ঝটিকা ও বন্যায় বিধ্বস্ত মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের সাহায্যে সকলকে অনুরোধ করিয়া বাঙলার গভর্নর ও বাঙলার রাজস্বসচিব আবেদন করিয়াছেন। ইঁহাদের বিবৃতিতে মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার লোকক্ষয়ের পরিমাণ এখনও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যাইতেছে না। রাজস্ব সচিবের বিবৃতিতে সরকারী পূর্ব বর্ণনার সমর্থন করা হইয়াছে এবং মেদিনীপুরে ১০ হাজার লোক মারা গিয়াছে, আর ২৪ পরগণায় এক হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এই উক্তিই সমর্থন করা হইয়াছে; কিন্তু লোকহানির সম্বন্ধে সরকারী এই খবর প্রাথমিক কতকটা আনুমানিক খবর বলিয়াই মনে হয়। মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাসুদেব থারাড মেদিনীপুরে লোকহানির সম্বন্ধে সরকারী এই হিসাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভবনে অনুষ্ঠিত সভাতেই তিনি বলেন যে, ঝটিকাজনিত দুর্বিপাকে মেদিনীপুরে অন্যূন ৪০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। সরকারী হিসাব অনুসারে ঝটিকার ফলে ২৪ পরগণার লোকহানির পরিমাণ এক হাজার। এই হিসাবও সমর্থিত হয় নাই। ডায়মণ্ডহারবারের খাদি মন্দিরের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, ২৪ পরগণার প্রাণহানির সংখ্যা ৮ সহস্র হইতে দশ সহস্র হইবে। সে যাহা হউক, লোক-ক্ষয়ের প্রশ্ন এখন আর বড় প্রশ্ন নয়। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রশ্নই এখন প্রধান প্রশ্ন। ১৬ই অক্টোবরের প্রলয়কাণ্ডের পর দুর্যোগপীড়িত অঞ্চলের নরনারী যে সদ্য সদ্য সাহায্য পায় নাই এবং সাহায্য পৌঁছিতে যে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছে, এই কথা ভাবিয়াই লোকে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করিতেছে। সরকার কর্তৃক যে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা হয়, তাহা যে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত সামান্য এবং সেই যৎসামান্য সাহায্যও যথাসময়ে পৌঁছায় নাই, একথা স্বয়ং রাজস্ব সচিবও স্বীকার করিয়াছেন! কিন্তু তিনি ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে লোকের ক্ষোভ মিটিবে না। তিনি বলিয়াছেন, "টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সমস্ত ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায়, ভূপাতিত বৃক্ষাদির দ্বারা প্রায় সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ থাকার দরুণ এবং শত্রুকে বঞ্চনা করার নীতি অনুসারে, যানবাহনের বিশেষত নৌকার অভাব হেতু যথাসম্ভব সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা যায় নাই। অন্য একটি কারণ এই যে, একটি জেলায় রাজনৈতিক অশান্তি থাকায় পুলিশের পাহারা ছাড়া কোন কোন এলাকায় রাজকর্মচারীদের নিরাপদে কাজ করা সম্ভবপর ছিল না।" বিধ্বস্ত অঞ্চলের নানাস্থানে রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সে সব জায়গায় যাওয়ার অসুবিধা ছিল,

রাজস্ব সচিব এই কথা বলিয়াছেন। আর্তসেবার ব্যাপারেও এই অসুবিধা অর্থাৎ ভয়ের কারণ কতটা ছিল, আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না; কিন্তু ভয়ের কারণ সত্যই ছিল, ইহা স্বীকার করিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে, দুর্যোগ ঘটিবার অব্যবহিত পরেই যদি গভর্নমেণ্ট বিধ্বস্ত স্থানসমূহে যাতায়াতের বাধা অপসারিত করিতেন এবং বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ করিবার সুযোগ দিতেন, তাহা হইলে দুর্যোগপীড়িত নরনারী সদা সদাই সাহায্য পাইত। রাজস্বসচিব বাঙলা দেশকে জানেন, দামোদরের বন্যা, উত্তরবঙ্গের বন্যার কথাও নিশ্চয়ই তাঁহার স্মরণ আছে। এ ব্যাপারে সরকারী লোকেরা যাহা অসম্ভব মনে করে, বাঙলার সেবাধর্মী কর্মীদের দ্বারা তাহা সম্ভব হয়। টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের তারই ছিঁড়ুক, গাছ পড়িয়া পথই বন্ধ হউক আর নৌকাই না থাকুক, তাহারা সেদিকে দৃকপাতও করিত না। জীবনের মায়া ছাড়িয়া আর্তকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিত। পায়ে হাঁটিয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, গাছ ডিঙাইয়া তাহারা সেবাকার্যে অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং সেজন্য এখন দুঃখ করিয়াও লাভ নাই। সাহায্যকার্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, এখন সেই ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী সাহায্য-দানের নীতি ও ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া রাজস্ব সচিব মহাশয় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক মতামতনির্বিশেষে সকলকে সাহায্যদান করা হইবে। এ ব্যাপারে রাজনীতির প্রশ্ন উঠিবার বা কারণ দেখা দেয় কেন, আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছে। আর্ত নরনারীর সাহায্যদানের ক্ষেত্রে একান্ত অবান্তর এই রাজনীতিক মতামতের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে কি পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিতই প্রকাশ পায় নাই যে, বিধ্বস্ত অঞ্চলের আর্ত নরনারী রাজনৈতিক মতামত সাহায্য পাইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ইহা ঘটিয়াছে কি না, গভর্নমেণ্টই জানেন। যদি ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যে সকল কর্মচারী তজ্জন্য দায়ী, তাঁহারা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন? যদি স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহের কারণ থাকে, অবিলম্বে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করাই প্রয়োজন। বর্তমানের আহ্বান—মানবতার আহ্বান। মানুষের জন্য যাহাদের দরদ আছে, জনসাধারণের দুঃখকষ্টে সত্যকার সহানুভূতি আছে, সাহায্যকার্যে তেমন লোকেরই প্রয়োজন। একথা আমরা পুনরায় বলিতেছি। অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয়। মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার একটা বৃহৎ অঞ্চলের অগণিত নরনারী আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কিন্তু অবস্থার শোচনীয়তা শুধু ইহা বলিলেই সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা হয় না। পান করিবার জলটুকু পর্যন্ত তাহাদের নাই। জল পাইবার জন্য পাত্র হাতে করিয়া সাহায্যকেন্দ্রে নরনারীরা আসিতেছে, এমন মর্মন্তুদ সংবাদ আমরা পাইতেছি। আর্তসেবার এ আহ্বান, দেবতারই আহ্বান, এ আহ্বানে সাড়া দিয়া আজ দেশবাসীদিগকে সেবাকার্যে অগ্রসর হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা—

দক্ষিণ ভারতের ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যুদ্ধের তিন বৎসর পরে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হইবে, এই মর্মে রাজকীয় ঘোষণা করা হউক, অথবা পার্লামেণ্ট হইতে উক্ত মর্মে একটি আইন পাশ করিয়া লওয়া হউক। ঐ ঘোষণা অথবা আইনে এইরূপ নির্দেশ থাকিবে যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের কোন প্রশ্ন সেক্ষেত্রে উত্থাপন করা হইবে না। যুদ্ধ শেষ হইবার তিন বৎসর পরে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইবে। ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের সমস্যা তখন যদি দেখা দেয়, আন্তর্জাতিক বিচারের সাহায্যে তার মীমাংসা করা হইবে। ভারতীয় খৃষ্টান নেতাদের এ প্রস্তাব মন্দ নয়। আমেরিকা হইতে এমন প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু যিনি যতই বলুন, ভবী ভুলিবার নয়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সম্পর্কে তাঁহাদের নীতিতে ঠিকই আছেন। এবার পার্লামেণ্ট উপসংহার উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিভাষণে ভারত সম্পর্কে যে নীতি নির্দেশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করাই ব্রিটিশের ভারত সম্পর্কিত নীতির মূল উদ্দেশ্য, এই কথা বলা হইয়াছে। ভারতের "পূর্ণ স্বাধীনতা" কথাটা খুবই গালভরা। ইংলণ্ডেশ্বরের কোন অভিভাষণে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অধিকার প্রদান সম্পর্কে ভাষার দিক হইতে এমন শব্দ ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীকে ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ভাষার দিক হইতে সে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ ভাবের ক্ষেত্রে দাঁড়ায় কি, পুরাপুরি বাক্যটির বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। যুদ্ধের পরে ভারতবাসীদিগকে এই যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, সে স্বাধীনতার প্রথম সর্ত থাকিবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বরূপ কি আমরা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতে পারি; সুতরাং সেজন্য আমাদের আগ্রহ জাগে না। ইহার পর ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের ভারত সম্পর্কিত নীতি নির্দেশের মধ্যে সুকৌশলে আর একটি সর্তেরও ইঙ্গিত আছে। অভিভাষণে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার সেই যে শাসনতন্ত্র, তাহা নির্ধারণ করিবে ভারতবাসীরা। উপরে উপরে দেখিতে গেলে খুবই ভাল কথা। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতার মধ্যে থাকিবার সর্তে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। ইংলণ্ডেশ্বরের অভিভাষণে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং সেজন্য সদিচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের কথা এই যে, স্বাধীনতার দাবীর ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের মধ্যে মতের কোন অনৈক্য নাই। এ সম্বন্ধে মতানৈক্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরই

মনঃকল্পিত এবং কি পরিমাণ মতানৈক্য দূর হইলে ভারত স্বাধীনতার যোগ্য হইবে, সে বিচারের ভার যতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উপর থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মতানৈক্যের প্রশ্নও থাকিবেই; সুতরাং সেই অজুহাতে ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করিবার কারণও থাকিবে। আমাদের মতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রয়োজন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা। এ সম্পর্কে তাঁহারা অবান্তর রকমে মতানৈক্য প্রভৃতি যত কথা টানিয়া আনেন, সকলেরই মূলে একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্য হইল প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান না করা। ভারতের শাসনতন্ত্র কেমন হইবে, চার্চিল-আমেরী প্রভৃতি ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সেজন্য ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না এবং কিরূপ-ভাবে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে, সে পরামর্শও ভারতবাসীরা ব্রিটিশ মন্ত্রীদের নিকট চাহে না। সে বিচারের ক্ষমতা তাঁহাদের নিজেদেরই আছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত কি না, তাঁহাদের কাছে ভারতবাসীদের প্রশ্ন, এই সোজা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কথার কারসাজীতে ভারতের সমস্যা মিটিবে না। কথার দিন কাটিয়া গিয়াছে, এখন দরকার কাজের।

রাজাজীর বিভ্রম—

জিন্নাসাহেবের কাছে দরবার করিবার পর শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বড়লাটের কাছে আবেদন করেন। সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। অগ্রাহ্য করিবার কৈফিয়ৎস্বরূপে এই কথা বলা হয় যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে তাঁহাদের যে মনোভাবের জন্য গ্রেপ্তার করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই মনোভাব অপরিবর্তিত আছে বলিয়াই মনে হয়' এমন অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সম্পর্কে যে সকল বাধানিষেধ আছে, তাহা কোনক্রমে শিথিল করা যাইতে পারে না। সরকারী কৈফিয়তের বিবৃতির প্রথমভাগেই কিন্তু বলা হইয়াছে যে, আপোষ-নিষ্পত্তির সকল রকম যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য বড়লাট আগ্রহান্বিত। প্রকৃতপক্ষে সেই আগ্রহের সঙ্গে রাজাজীর আবেদন অগ্রাহ্য করিবার কোন যুক্তিপূর্ণ সঙ্গতি দেখা যায় না। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মনোভাব অপরিবর্তিত আছে, একথা স্বীকার করিলেও আলোচনার ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তন করাই ছিল রাজাজীর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। রাজাজী বড়লাটের এই অস্বীকৃতিতে বিস্মিত হন। তাঁহার মনে এই সন্দেহ জাগে যে, গান্ধীজীর সম্বন্ধে তাঁহাকে সাক্ষাৎ না করিতে দিবার এই যে সিদ্ধান্ত, ইহা বড়লাটেরই নিজের সিদ্ধাত, না সপারিষদ বড়লাটের এই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্য জ্ঞানী ও গুণীগণও সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন কি না। রাজাজীর এই বিশ্বাস দাঁড়ায় যে, তাঁহার আবেদন নামঞ্জুর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো নিজের দায়ীত্বেই করিয়াছেন। তিনি শাসন পরিষদের পরামর্শ লইয়া করেন নাই। ইহার পর ভারত সরকার হইতে এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ইস্তাহার বাহির হয়। সে ইস্তাহারে ভিতরের কথা বিশেষ ভাঙ্গিয়া বলা হয় নাই; নিয়মতান্ত্রিক ভঙ্গীতে শুধু ইহাই জানান হয় যে, ঐ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা ভারত গভর্নমেণ্টের সুনিশ্চিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের পরবর্তী এই বিবৃতিতে এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, মহাত্মাজীর সঙ্গে রাজাজীকে সাক্ষাৎ করিতে না দিবার যে সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত বড়লাট বাহাদুর নিজে করিলেও, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ সপারিষদ বড়লাট যে নীতি স্থির করিয়াছেন, তদনুযায়ীই উহা করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় গান্ধীজীর সঙ্গে কাহাকেও দেখাসাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না,—বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের সমর্থনেই এই নীতি নির্ধারিত হইয়াছে ভারত গভর্নমেণ্টের বিবৃতি হইতে এ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে বেগ পাইতে হয় না। শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণ এক্ষেত্রে যে জ্ঞান এবং গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী চার্চিল-আমেরী দলের কাছে তজ্জন্য তাঁহারা সর্বাধিক গৌরব অর্জন করিবেন সন্দেহ নাই এবং ইহাতেই যে তাঁহাদের চতুর্বর্গ সিদ্ধি হইল, একথাও বলা বাহুল্য।

জীবনধারণের সমস্যা—

সব জিনিসের বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্যের দর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিন পরে দেখা যাইতেছে ভারত গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, খাদ্যদ্রব্যের এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তাঁহারা খাদ্য বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। এই বিভাগ সমগ্র ভারতের দিক হইতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ভার লইবেন। আমরা বহুদিন পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মহার্ঘতার এই যে সমস্যা শুধু প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় ইহা সমাধান হইবার নয়। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন মাল এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাহার যথোচিত সরবরাহের ব্যবস্থার দ্বারাই এই সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান হইতে পারে। এতদিন পরে ভারত সরকার যে তেমন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা আশার কথা। অবশ্য এ উদ্যোগের ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইবে এখনই বলা যাইতেছে না। কারণ সামরিক বৃহৎ ব্যাপার লইয়া ভারত সরকারের সব বিভাগ এতটা বার অবসর বোধ হয় তাঁহাদের খুব কমই আছে। এই প্রসঙ্গে আলু এবং কয়লার সমস্যার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি; কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছিল যে, কলিকাতা সহরে অবিলম্বে যথেষ্ট আলু যাহাতে আমদানী হয়, সেজন্য মালগাড়ির ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেছেন; সেকথা কতটা রক্ষিত হইয়াছে আমরা জানি না; তবে আলুর দর যে কমে নাই এ জ্ঞানই আমাদিগকে দৈনন্দিনই অর্জন করিতে হইতেছে। ইহার পর কয়লার কথা। কয়লার দর কিছুদিনের

মধ্যেই চড়িতে চড়িতে এখন প্রতি মণ ১৮৹ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। বাঙলা দেশের ইট-ব্যবসায়ীরা সেদিন তাঁহাদের ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক হইতে কয়লা আমদানীর দিকে দৃষ্টি দানের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন' কিন্তু সে বেলা গরীব খুচরা খরিদ্দারদের দুঃখের কথা তাঁহারা একটুও ব্যক্ত করেন নাই। আমরা জানি, এ পক্ষে ভারত সরকারের যে যুক্তি, মামুলী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মালগাড়ির অভাবের কথা শুনিতে পাইব; কিন্তু দেশের লোকের জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্যার গুরুত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদের সর্বাগ্রে তাহা উপলব্ধি করিয়া আন্তরিকতার সঙ্গে ইহা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যে আমরা তেমন আন্তরিকতার অভাবেরই পরিচয় পাইয়াছি।

হিন্দু সভ্যতার প্রভাব—

ভারতবর্ষে ঐক্য নাই, ভারতবাসীরা জাতি নয়, বিলাতের বিভিন্ন রাজনীতিকের মুখে আমরা এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি লর্ড মেস্টন ম্যাঞ্চেস্টার শহরের একটি সভায় হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজ জীবনের প্রভাবে কেমন করিয়া ভারতব্যাপী ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। লর্ড মেস্টনের অভিমত এই যে, ধর্ম-প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে অপূর্ব সমাজ-ব্যবস্থা হিন্দুরা রচনা করিয়াছিল, তাহা হইতেই ভারতীয় ঐক্য উদ্ভূত হইয়াছে। লর্ড মেস্টন বলেন,—এই ঐক্য সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; কিন্তু সেজন্য উৎকণ্ঠিত বিব্রত হইবার কারণ নাই। কারণ অন্যান্য সভ্যতা অপেক্ষা হিন্দু সভ্যতা অনেক দীর্ঘতরকাল মনুষ্য প্রবৃত্তি অনুধ্যান করিয়াছে এবং সহিষ্ণুতার দ্বারা উদারতার দ্বারা ও ব্যাপক দৃষ্টি দ্বারা যুগে যুগে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঐক্যের দিকে চলিয়াছে। হিন্দু সভ্যতার এই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির উপরই ভারতবর্ষের বাহির হইতে সমাগত বহু সমাজকে হিন্দু-সমাজ আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সভ্যতার মূলীভূত যে ব্যাপক দর্শনের কথা বিভিন্নভাবে বলিয়াছেন, দেখা যাইতেছে লর্ড মেস্টন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। হিন্দু সভ্যতার মধ্যে সকলকে আপনার করিয়া লইবার এই যে শক্তি আছে, ইহাকে ধর্ম প্রবৃত্তি বলিলে ঠিক বলা হয় না। পাশ্চাত্য জাতিরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝে, ইহা সে জিনিস তো নয়ই, আচার বিধি বিধানের ঊর্ধ্বে বিশ্বাত্মতার উপলব্ধিই ইহার মূলে রহিয়াছে। হিন্দু সভ্যতা তাহার এ সনাতন বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া অগ্রসর হইবে, এই বিশ্বাস আমরা রাখি; কিন্তু সমাজ জীবন রাষ্ট্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ বিনির্মুক্ত থাকিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদমূলক ভেদনীতির দ্বারা যদি ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত না হইত, তবে বিশ্ব-সভ্যতায় হিন্দু সংস্কৃতির এই অবদান অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইত এবং সেই সঙ্গে ভারতের ভেদ-বৈষম্যগত সমস্যারও সমাধান হইয়া ভারতবর্ষ সভ্যজাতি সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইত। শাসন-নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবই এ পথে অন্তরায় ঘটাইতেছে এবং ইহা সত্য যে সে নীতি পরিবর্তন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবী যে মুহূর্তে উত্থাপিত হইবে, সেই মুহূর্তে, যে মেস্টন সাহেব ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্যের মহিমা প্রচারের দ্বারা আজ ভারত হিতৈষণা ব্যক্ত করিতেছেন তিনিই ভারতবাসীদের ভেদ-বৈষম্য এবং অনৈক্যের যুক্তি উপস্থিত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা লাভে অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সকলের আগে আগাইয়া আসিবেন।

রাজনীতিক বাতুলতা—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাঁধন শক্ত রাখিতেই হইবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ইহাই হইল সঙ্কল্প। "সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বৃটিশকে দেউলিয়া করিবার জন্য আমি রাজার প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হই নাই।" সম্প্রতি এই উদ্ধত উক্তির ভিতর দিয়া চার্চিল সাহেব তাঁহার সে সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। চার্চিল সাহেব পুরাদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী; সুতরাং এরূপ মনোবৃত্তি তাঁহার পক্ষে নূতন কিছুই নয়। বিগত মহা-সমরের সময় এই চার্চিল সাহেবই মিশরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে পণ্ড করিবার জন্য তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; সেই সম্পর্কে নাঙ্গা ফকীর বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে তিনি যে অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি করেন, তাহাও সকলের স্মরণ আছে। ভারতীয় শাসন সংস্কার বিধি প্রতিবাদী ছিলেন এই চার্চিল। চার্চিল সাহেবের এমন গর্বোদ্ধত উক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর দেখিতেছি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাইয়াছেন। ভারত হইতে এখনও পান নাই, পাইয়াছেন মার্কিন দেশ হইতে। মার্কিন দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক এবং খ্যাতনামা গ্রন্থকার জন গান্থারের পত্নী মিসেস জন গান্থার চার্চিলের উক্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—প্রথমেই ভারতের স্বাধীনতাকে মানিয়া লইতে হইবে। এই যুদ্ধের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। মিসেস গান্থার বলেন,—মিঃ চার্চিল বাগাড়ম্বরপূর্ণ যতই বক্তৃতা করুন, যত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই তাঁহার প্রতি আস্থা বিজ্ঞাপিত হউক, আমরা আমাদের সমরোপকরণ উৎপাদনের পরিমাণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যতই বৃদ্ধি করি না, কিংবা আমাদের বাজেটের টাকার পরিমাণের পিছনে যতটা শূন্যই যোগ দেই না এবং যুদ্ধে পৃথিবীর লোকক্ষয়ের পরিমাণ হিসাব আরও যতই পরিমাণ বাড়াই না কেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দেওয়া পর্যন্ত বর্তমান যুদ্ধে বিজয়ের সূত্রপাত হইবে না।" এই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে হইলে সমগ্র ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মিসেস গান্থার ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন,—"বৃটেন ভারতের সম্বন্ধে যাহা করিতেছে, তাহা শুধু রাজনৈতিক দুর্নীতি নহে, তাহা রাজনীতিক বাতুলতা মাত্র।" নির্ভীকতার সঙ্গে এবং নিরপেক্ষভাবে সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে একটা পরম ঔদার্য রহিয়াছে। মিসেস গান্থারের উক্তির মধ্যে আমরা তেমন ঔদার্যের পরিচয় পাইয়াছি এবং এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

(২)

স্নান সেরে শৈলজা যখন এসে খেতে ব'সলো, তখন বেলা প'ড়ে এসেছে; দরদালানের একপাশে ঠাঁই ক'রে, আসনের সামনে তরী-তরকারী সমেৎ ভাতের থালা সাজিয়ে দেওয়া হ'য়েছে মাঝখানে; ওরই একপাশে জলের গ্লাশ, আর সামনে ব'সে পাখা হাতে তরঙ্গ। আতিথেয়তার ত্রুটি নাই কোথাও, কোনওখানে; বরঞ্চ যেন সামান্য এই খাওয়াটুকেই উপলক্ষ ক'রে, এই আসনপাতা, ঠাঁই করা থেকে আর ঐ নিজের হাতে রান্না ভাত তরকারী সাজিয়ে দেওয়ার মধ্যেও র'য়েছে একটা সযত্ন-পারিপাট্যের প্রকাশ।

এ প্রকাশ আন্তরিক বা বাহ্যিক হোক্, ক্ষতি নাই, কিন্তু তবু একেই কেন্দ্র ক'রে খেতে ব'সে শৈলজার মনে হ'লো এমন যত্ন সে যেন বহুদিন পায় নাই,—বহুদিন।......

যতদিন তার মা মারা গেছে।

মামার বাড়িতেও সে খেত' বটে, কিন্তু সে ঠাকুর চাকরের তত্ত্বাবধানে; রৌপ্যচন্দ্রিকার বিনিময়ে যতটুকু যত্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব, তার চেয়ে এতটুকু বেশীও শৈলজা পায় নি কোনওদিন, চায়ও নি; কিন্তু আজ না চাইতেই যেটুকু মমতার স্পর্শ সে অনুভব ক'রলে তাতেই তার মনে পড়ে গেল গত দিনের অনেক স্মৃতি, অনেক কথা।...

ঠাঁই ক'রে এইভাবে ঠাকুর চাকরেও খাবার ধ'রে দিয়ে গেছে সামনে, কিন্তু আজকের এই দেওয়া,—এর সঙ্গে তার পার্থক্য যে অনেকখানি এটা অনুভব ক'রলেও, এ প্রভেদের মূলে যে কোথায় ও কেন, তা যেন ধ'রতে চাইলেও পারলে না।

হাতখানেক তফাতে ব'সে তরঙ্গ পাখা নাড়ছিল আস্তে আস্তে; বাধা দিলে শৈলজাঃ—

"হাওয়া থাক্,—গরম লাগছে না।"

"তা'কি হয়! মাছি আছে যে।"

কথাটা মৃদুস্বরে উচ্চারণ ক'রলে তরঙ্গ; শৈলজা আর কিছু ব'ললে না, তাড়াতাড়ি খেয়ে যেতে লাগলো যেন কোনও রকমে।

কথা না কইলেও ওর মুখের ওপর যে ছায়াটা ভেসে উঠলো সে-দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রেই তরঙ্গ বুঝলে—তার ও তাড়াতাড়ির মূলে শুধু ক্ষুধার্ততাই নেই, কতকটা লজ্জা, সংকোচ এবং কতকটা বা তার সাহায্য এড়াবার জন্যই শৈলজার এই ক্ষীপ্রতা।

এই তরঙ্গর এবাড়িতে আসার একটু ইতিবৃত্ত আছে।

ইতিবৃত্তটা এই যে সে যখন বধূরূপে এসে এবাড়িতে প্রবেশ করে সে আজ অনেক দিনের কথা, তরঙ্গ তখন সবেমাত্র বাল্যের সীমা অতিক্রম ক'রছে।

বনবিহারীর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী তখনও এপারের সঙ্গে সমস্ত দেনাপাওনা চুকিয়ে দেয় নি,—বরঞ্চ এপারে থেকেই জাঁক জমকের মধ্যে ঠাকুর দেবতা হ'তে আরম্ভ ক'রে অপদেবতাদের পর্যন্ত স্মরণ নিতে কসুর করে নি, যাতে স্বামীর সংসারে পুত্র কন্যা নিয়ে দীর্ঘ-কাল সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত ক'রতে পারে—এই প্রার্থনায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেবতার সব আশীর্বাদ উল্টো হ'য়ে দেখা দিল তার কপালে, তাই মূর্তিমান উল্কার মত তার ভাগ্যাকাশে উদয় হ'লো রাজীবের।

রাজীব বিন্দুর কি রকম দূরসম্পর্কের ভাই; যাত্রা থিয়েটারে পাট ক'রে অর্ধেক জীবনটা কাটিয়ে এনেছে, বাকী অর্ধেকের সময় বিন্দুবাসিনী ভেবে দেখলে ভাইকে সংসারী করতে হ'লে তার বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

দিলেও, কিন্তু দ্বিতীয়বার, আর ঐ তরঙ্গর সঙ্গে।

রাজীবের প্রথমবারেও বিবাহ হ'য়েছিল,—কিন্তু এই বিবাহের মাসকতক আগে একটি মাত্র কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই সে বৌ মারা যায়,—এই কাছাকাছি কোন গ্রামে, তার বাপের বাড়ি।

কিন্তু মাসকলাইয়ে পোকা ধরে না—তাই সদ্যভূমিষ্ঠা কন্যা বেঁচেই রইল—এর ওর তার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হ'য়ে, তবু রাজীব চন্দ্র তার খোঁজও নিলে না, খবরও চাইলে না কারো কাছে; তার চেয়ে বরং নববিবাহিতা সুন্দরী বধূ তরঙ্গর প্রেম-তরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়াই স্থির ক'রে ফেললে এবং এরই ফলে একদিন ডুবতে ডুবতে যে কোথায় তলিয়ে গেল, কেউ তার হদিশ পেলে না।

দুষ্ট লোকে দুষ্ট কথার রটনা ক'রলেঃ—

"একাজ রাজীবেরই সঙ্গী সব মদো-মাতাল ছোকরাবাবুদের, ওরাই তাকে কোথাও লুকিয়ে চালান দিয়েছে, নয় খুন ক'রে ফেলেছে ঐ তরঙ্গর জন্যে।"

কথাটা বিন্দুর কানে আসতেই সে কাঁদলো আকুল হ'য়ে,—তারপরে বনবিহারীকে বোঝালেঃ—তার মায়ের পেটের ভাই না থাকলেও ঐ রাজীবকেই সে মানুষ ক'রেছে, এত বড় ক'রেছে কোলে পিঠে নিয়ে, আজ তার অভাবে বৌ-টা ভেসে যাবে? কুলে কালী প'ড়বে গাঙ্গুলী বংশের!

অন্তত বিন্দু বেঁচে থাকতে তা হয় না। রাজীবের বৌকে এখানে আনা হোক; এতে সে তাকে সদা সর্বদা চোখেও রাখতে পারবে, রীতি নীতিও শিক্ষা হবে তার।—

সেই থেকে তরঙ্গর জায়গা হ'লো এই বাড়িতে।

তরঙ্গ এলো—সঙ্গে নিয়ে এলো অটুট স্বাস্থ্য, অতুল রূপ, মুকুলিত যৌবন, আর অসাধারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধি!

যে বুদ্ধির প্রভাবে সে অচিরেই এ সংসারের এমন একটি জায়গা দখল ক'রে ব'সলো, যেখানে থেকেও বিন্দুবাসিনী বনবিহারীর প্রতি হ'য়ে উঠতে লাগলো সন্দিগ্ধ, বিচলিত।

তার এ সন্দিগ্ধতা বনবিহারীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি, —এবং চেষ্টারও সে ত্রুটি রাখলো না এ সন্দেহকে অপসারিত ক'র-বার,—কিন্তু বিন্দু তাতে ভুললো না; প্রকাশও ক'রতে পারলো না কারো কাছে কোনও কথা, কারণ প্রকাশের পথও সে নিজের হাতেই বন্ধ ক'রেছে। তাই স্থির বুঝেছিল, যে জলভাগ অপর জলভাগের

সঙ্গে সে নিজের হাতে সংযুক্ত ক'রেছে সে পথে যে কুম্ভীর একদিন আসবেই, একথা জানা উচিত ছিল তার অনেক আগেই,—আজ আর তার জন্যে আফশোষ ক'রে ফল নেই।

এর পরে,—বৎসরখানেক না যেতেই দেখা গেল সমস্ত ভয়-ভাবনার হাত এড়িয়ে বিন্দু একদিন গলায় দড়ি বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে;—

জীবনের মেয়াদ তার ফুরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তাই চোখ দুটো ঠিক্‌রে বার হ'য়ে আসছে অক্ষি কোটর থেকে, জিহ্বাটাও বার হ'য়ে প'ড়ে করেছে একটা ভয়ংকর দৃশ্যের সৃজন।

বনবিহারী সেই দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে একবার শিউরে উঠলো, তারপরে দিলে পুলিশের দারোগার হাতে খান কয়েক নোট গুঁজে; ফলে লোকে শুনলো বিন্দুবাসিনীর এ আত্মহত্যা মাথার গণ্ডগোলের ফল, এর জন্য দায়ী কেউ নয়।

বনবিহারী বুক চাপড়ে কাঁদলো, তরঙ্গও ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ র'গড়ে লাল ক'রতে কসুর ক'রলে না; কিন্তু লোকে যে যাই বলুক, এর প্রত্যেক জিনিসটুকু ফাঁকি দিতে পারলে না শুধু ত্রৈলকার স্ত্রী—এই শৈলজার মায়ের দৃষ্টিকে।

বিধবা সে; একটি মাত্র ভরসা স্থল—ঐ শৈলজা! তাকে তার মামার কাছে রেখেও সে পড়ে থাকতো এই শ্বশুরের ভিটায়; মৃত স্বামীর স্মৃতি মন্দিরে,—আর ঐ বিন্দুবাসিনীর মমতায় আবদ্ধ হ'য়ে। কিন্তু সেই বিন্দুই যখন এ সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেল, তখন এখানে থাকা তার পক্ষেও হ'য়ে উঠলো দুরূহ!—কেমন একটা বিষাক্ত হাওয়া যেন ওর দম বন্ধ ক'রে আনতে লাগলো দিনের পর দিন ধরে; তাই, এর স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে একদিন নিজের যা কিছু সামান্য জিনিস-ছিল গুছিয়ে নিয়ে বার হ'য়ে প'ড়লো ভাইয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে।...

সেও আজ অনেক দিনের কথা। তখন, ত্রৈলক্যের স্ত্রীর এই চ'লে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বনবিহারী চারিদিকে ব'লে বেড়িয়েছিলঃ

"কেউ যদি নিজের ইচ্ছেকে নিজের ছাগলের ল্যাজ কেটে বাদ দেয়,—তাতে কার কি বলার আছে?—নইলে এত বড় বাড়ি ঘরের এক কোণে বাস ক'রে,—আর এত বিষয় সম্পত্তির থেকে একবেলা এক-মুঠো খেয়েও কি ত্রৈলকার বিধবা স্ত্রীর জীবন কাটতো না? না ত্রৈলকার ছেলেকেই লেখা পড়া ছেড়ে বার হ'তে হ'তো গরু চরাতে—পেটের ধান্দায়! বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে এসব মিথ্যে ওজোর আপত্তি খাড়া করা,—লোকের কাছে আমার নামে কলঙ্ক দেওয়া! আসল কথা হ'চ্ছে, যে সে প্রকারে এই বনবেহারী চক্কোত্তিকে জব্দ করা আর ভাইয়ের সহায়ে বিষয় সম্পত্তি সব চুল চিরে বখ্‌রা ক'রে নেওয়ার মতলব! আর কিছু নয়। কিন্তু বনবেহারীও মানুষ,—ভগবান তাকে দুর্ভাগ্য দিয়ে শাস্তি দিলেও—ধড়িবাজী বুদ্ধি দিতে ছাড়ে নি, সেও—পঞ্চ চক্কোত্তির বেটা,—যার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সেও দেখবে ত্রৈলকার স্ত্রীর এই বুদ্ধির দৌড় কতদূর:—আস্পর্ধা কতখানি!"......

তারপরে অনেক দিন কেটে গেছে; গ্রামের অনেক জায়গায় অনেক অদল বদল হ'য়েছে, সংসারও ভেঙেছে গ'ড়েছে অনেকের।

এই ভাঙা গড়ার মধ্যেই কি একটা অসুখে ত্রৈলকার স্ত্রীও মারা গেছে ভাইয়ের বাড়িতে; এর মধ্যে শৈলজার মামা অনেকবার চেষ্টা ক'রেছে, অনেক পত্রও লিখেছে সবিনয়ে বনবিহারীর কাছে,—যাতে তার নিজের সঞ্চয় থেকে না হোক, পৈতৃক সম্পত্তিতে ত্রৈলকার বখ্‌রা থেকে শৈলজাকে একেবারে বঞ্চিত না করে।

কিন্তু বনবিহারী সে সব কথা তো কানে তোলেই নি,—উপরন্তু উত্তরও দেয় নি সে সব পত্রের।

শৈলজা এসব কথাই জানতো; মাঝে মাঝে বিদ্রোহীও হ'য়ে উঠতো বনবিহারীর ব্যবহারের বিরুদ্ধে, কিন্তু চুপ ক'রে থাকতে হতো শুধু নির্বিরোধী মামার মুখের দিকে তাকিয়ে।......চিরদিনের শান্ত-স্বভাব মামা হয়তো চাইতেন না যে সামান্য এই একটা ব্যাপার নিয়ে শৈলজা তার জেঠার সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করে; হয়তো মনের কোথায় তাঁর কোন আদর্শে আঘাত লাগতো ব'লেই উপদেশ দিতেনঃ —"মানুষের ওপরেও ভগবান আছেন শৈল,—কর্তব্য অকর্তব্যের বোঝা ব'য়ে মানুষ নিমিত্তের ভাগী হ'লেও বিচার ক'রবেন তিনি! আর সে বিচার বড় শক্ত, সাক্ষীসাবুদের ধার ধারে না,—লেখাপড়ারও কোনও দাম নেই সেখানে। তিনিই ক'রবেন এরও বিচার।"—

কিন্তু, আজ সে মামা বেঁচে নেই; নিজেও যে সে বিষয় সম্পত্তির বখ্‌রার চেষ্টাতেই এসেছিল,—তাও নয়; তবু আসামাত্রই যে উদ্দেশ্যে বনবিহারী বিষয় সম্পত্তির কথা তুললে, সে কথাগুলোও সে তুড়ি মেরে উড়াতে পারলে না, জবাবও দিতে পারলো না একটা; নিজের মনেই সে কথাগুলোর আদি অন্ত খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে উঠতে লাগলো; তাই বনবিহারীর পেছু পেছু তরঙ্গের ঘরের সামনে এসেও সে বনবিহারীর যে মুখভঙ্গি, যে কণ্ঠস্বর ভুলতে পারে নি, —খেতে এসেও হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল তারই কথা।

পাতের পাশে এই সময়ে তরঙ্গ এক বাটি গরম দুধ এনে নামিয়ে রাখতেই অধৈর্য স্বরে ব'লে উঠলোঃ—

"দুধ! দুধ তো আমি খাইনে!"—

কপালের ওপোরে টানা কাপড়ের এতটুকু অন্তরাল থেকে দেখা গেল তরঙ্গের টানাটানা চোখের উজ্জ্বলদৃষ্টি হাসিমাখা মুখ। সে মুখে হাসির সঙ্গে এমন একটা তীক্ষ্ণতা মাখানো, যার দিকে তাকালে হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মনে হয়, ও দৃষ্টি যেন শুধু মানুষের ওপোরটাই দেখে না, মনের ভেতরে অত্যন্ত গূঢ় রহস্যও তার আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগে না।

শৈলজার কথা শুনে তরঙ্গ একটু হাসলে; ব'ললে—

"এখানে থাকতে হলে কিন্তু অন্তত খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে নিজের মতামত খাটালে চলবে না, এটা জেনে রেখো।"

একটু থেমে আবার ব'ললে—

"রাজারাজড়ার রাজত্বে নিয়ম না মানলে শাস্তি পেতে হয় বলে শুনেছি; তেমনি এই রান্না আর খাওয়া দাওয়ার মত সামান্য হাঁড়ি কলসীর ব্যাপারে শাস্তি না হোক আমার মত একজনের তুচ্ছ অনুরোধ রাখলেই বা ক্ষতি কি?"

চাপা হাসির একটা মৃদু ঝঙ্কার শৈলজার কানে এলো, কিন্তু সে জবাব দিতে পারলো না তার; কেমন একটা সঙ্কোচে সে যেন ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল এই তরঙ্গর কাছে।

এর সম্বন্ধে সে যতটুকু মুখে মুখে আলোচনা শুনেছে, ভেবেছে,—একে চোখের সামনে দেখে, সেই কথাগুলোই যেন ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে নতুন ক'রে মনের মধ্যে সৃষ্টি করতে লাগলো কেমন একটা বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, আর সেটা শুধু তরঙ্গর ওপোরেও নয়, বনবিহারীর ওপোরেও।........

তরঙ্গ যে কথা ব'লে উত্তরের প্রত্যাশা করছিল হয়তো, শৈলজা তার উত্তর দিল না ইচ্ছে করেই, হাতও দিল না দুধের বাটিতে, নির্বাকে মুখ নত করে বসে রইল নীচের দিকে তাকিয়ে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল;

তরঙ্গ বোধ হয় শৈলজার এই মৌনতা লক্ষ্য করেই ওর মনোভাব বুঝে ফেললে এক নিমেষে। ব'ললে—

"থাক তবে; সত্যিই যদি দুধ খাবার অভ্যাস না থাকে তো আমি জোর করতে চাইনে তোমায়। কিন্তু—"

অসহিষ্ণু স্বরে শৈলজা বলে উঠলো—

"কিন্তু কি, বলুন আপনি!"

(শেষাংশ ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হিমালয়ের পথে

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

(২)

আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কাছে প্রায়ই যেতাম, একদিন সন্ধ্যায় বহুক্ষণ তাঁদের মন্দিরে গুরুদেবের বহু ধর্মসংগীত সেখানে তাঁদের গেয়ে শুনিয়ে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি এস্রাজ, মসোজী বাজালেন আমার গানের সঙ্গে। মাষ্টারমশায়ের যোগ এই মিশনের সঙ্গে বহু দিনের। তিনি নিজে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একজন বিশেষ ভক্ত। ভগিনী নিবেদিতার আমলে এই মিশনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা ছিল—এবং নিবেদিতাও ছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনঃপ্রচারের একজন প্রধান উৎসাহী। তখনকার অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে অজন্তার চিত্রাবলী চর্চার সুবিধার জন্যে নিবেদিতা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯১১ সালে যখন মাস্টারমশায়দের অজন্তা চিত্রাবলী আঁকবার জন্যে প্রস্তাব করা হয় তখন সেই দূর অজানা অচেনা দেশে যেতে হবে শুনে তাঁরা খুব উৎসাহ বোধ করেননি। আজকাল অজন্তা দর্শন যেমন সহজ হয়েছে তখন তা স্বপ্নবৎ ছিল—সেখানে যাতায়াত, থাকা খাওয়ার ছিল বিশেষ অসুবিধা। কিন্তু নিবেদিতাই নাকি একরকম জোর করে তাঁদের সেখানে পাঠান। সেখানে তাঁদের থাকা খাওয়া ও কাজের বিষয় স্বচক্ষে দেখবার জন্যে, জগদীশ বসু সহ একবার তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখেও এসেছিলেন। ফিরে আসবার সময় শিল্পীদের সুখসুবিধার তদারক করবার জন্যে তাঁর সেক্রেটারী গণেন মহারাজকে সেখানে রেখে আসেন। সেই থেকে গণেন মহারাজের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের পরিচয়।

আলমোড়ার শ্রীযুক্ত বশী সেন মাস্টার মশায়ের বিশেষ বন্ধু। তাঁদের উভয়ের বন্ধুসুলভ সহজ আলাপ আলোচনা, আমাদের মনে খুব কৌতুক উদ্রেক করতো। তাঁর বাড়িতে তিনি আমাদের প্রায়ই নিয়ে গেছেন, গাছপালা নিয়ে তাঁর পরীক্ষার নমুনা দেখাতে। কোন্ ধান বা গম বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাভাবিক ফলনের মাস দুই পূর্বেই ক্ষেত থেকে কেটে আনা যায়, কি করলে সাধারণ চাষের চেয়ে বহু পরিমাণে বেশী উৎপন্ন হয়, বিদেশী দূর্বাঘাস আমাদের দেশে চেষ্টা করলে গরুর খাদ্যের পক্ষে খুব উপকারী হতে পারে, এ রকম বহু পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন। ফল ফুলের গাছ নিয়েও নানা পরীক্ষা তিনি করছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি নিজেও একজন বিদুষী মহিলা। তাঁর চীন ও জাপানী ছবির সংগ্রহ আছে অনেক। সেদেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বহু চীনা ও জাপানী ছবি সংগ্রহ করে-ছিলেন। মাস্টার মশায়কে একদিন সব দেখালেন। সংগ্রহ সবই যে ভালো, তা বলা চলে না, তবে কিছু ভাল সংগ্রহ আছে। বাড়িতে স্থানাভাববশত সবই প্রায় বাক্সতে বন্ধ করা থাকে। শ্রীযুক্ত বশী সেন নিজে পরমহংস ও বিবেকানন্দের শিষ্য, তাঁর বাড়ির একটি পূজার গৃহে এই দুই মহাপুরুষের মূর্তি ও ছবি সযত্নে চৌকীতে সাজানো। মূর্তিপূজার প্রায় সব উপকরণ দেখলাম চৌকীটার চারি-দিকে।

উদয়শংকরের সংস্কৃতি কেন্দ্র

শংকরের culture centreটি প্রায় দু-মাইল উত্তরে, পূব ও পশ্চিমমুখো লম্বালম্বি একটি পাহাড়ের মাথায়। শহর থেকে দুটি রাস্তা সেখানে গেছে। প্রথমটি দিয়ে যানবাহন যেতে পারে। দ্বিতীয় রাস্তাটি দিয়ে গেলে পদচারীদের পক্ষে সময় সংক্ষেপ হয়। কাঠগুদাম থেকে যে রাস্তাটি আলমোড়া এসেছে, তার ঠিক পাশেই শংকরের culture centre লেখা, পথনির্দেশক একটি বোর্ড রয়েছে। সেইখান থেকেই centreএর রাস্তাটি উপর দিকে উঠে গেছে।

উদয়শংকর

আমরা সেখানে খবর দিয়ে যাবো ঠিক করেছিলাম। বাইরের দর্শকদের শনিবার ছাড়া অন্যদিন প্রবেশের অনুমতি প্রয়োজন হয়। শনিবারে বাইরের দর্শকরা সকালে এবং সন্ধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের নাচের ক্লাসে দর্শক হিসেবে বসবার অনুমতি পায়। পৌঁছুবার পরের দিনই শনিবার পড়লো। বিকালে শ্রীযুক্ত বশী সেন সপরিবারে এসে মাস্টারমশায়কে শংকরের নাচ দেখতে যাবার জন্যে বললেন। সূর্যাস্তের কিছু আগে হেঁটে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু যখন পৌঁছলাম, তার পূর্বেই শংকরের ক্লাসের কাজ সুরু হয়ে গেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যচর্চা দেখলাম। সেখানে দেশী-বিদেশী আরো অনেক দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন।

এখানকার প্রধান রঙ্গগৃহটি হুবহু য়ুরোপীয় Studioর অনুকরণে স্থাপিত। বেশ বড় ও প্রশস্ত। আগাগোড়া দেবদারু ও পাইন কাঠে তৈরী, লোহার কাঠামোর সাহায্যে। তার কাঠের মেঝেটিও মসৃণ। উত্তর-দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে একেবারে শেষে, অনেকগুলি যন্ত্র ও কিছু মুখোস সাজানো ছিল। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সুবিধার দিক লক্ষ্য করে সব ব্যবস্থাই তাতে করা হয়েছে, যেমন— Drop screen, wings, spot light, flood lightএর ব্যবস্থা। বিজলী বাতির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের নিজেদেরই। Drop screenএর সামনে মাথার উপরে স্বর্ণমণ্ডিত একটি নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি টাঙ্গানো। গৃহটির অর্ধেক জুড়ে stage করা হয়েছে। উত্তর দিকের বাকী অর্ধেক খালি, সেখানে নীচু চৌকী সাজানো। এ ঘরে জুতো পায়ে প্রবেশ নিষেধ। প্রত্যেক দর্শককে প্রবেশপথের ঘরটিতে জুতো খুলে রাখতে হয়। এই

নিয়মটি আমার খুবই ভালো লাগলো। শান্তিনিকেতনে জুতো খুলে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাজের ঘরে, বা মিউজিয়মে প্রবেশ করার প্রথা বহু বৎসর ধরে চলে আসছে। তাই জুতো খুলে প্রবেশের মধ্যে গৃহটির প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, সেইটি হোলো মূল কথা। এ ধরণের শিল্পচর্চার স্থানকে মন্দিরের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করার মত বড় কথা আর কি হতে পারে।

দেখলাম, শংকর তাঁর রামলীলা - বা মুখোস নৃত্যের একটি বৃদ্ধার মুখোস নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলছেন, মুখোসের ভাব অবলম্বনে নাচবার চেষ্টা করতে। একদল ছাত্রছাত্রী একে একে নিজেদের সাধ্যমত বাজনার তালে তালে সেই রকম ভঙ্গী ও ছন্দে নাচতে চেষ্টা করলো। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী ছিল সবসমেত প্রায় ৫০টি। এদের পাঁচটি দলে ভাগ করে একটি গল্প দিয়ে বল্লেন, এটি অবলম্বন করে প্রত্যেক দলকে নাচ তৈরী করতে। গল্পটি হোলো, বাঁশ পাতা, মাটির ঢেলার সঙ্গে ভাব করতে চেয়ে তার কাছে উড়তে উড়তে এসে পড়লো, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, তখনি ঝড় ও বৃষ্টি এসে তাদের এই মিলনে বাধা দিয়ে বাঁশ পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মাটির ঢেলাও বৃষ্টিতে গলে যায়। প্রত্যেক দলেই একজন বাঁশ-পাতা, একজন মাটির ঢেলা, কয়েকজন হাওয়া ও বৃষ্টির অভিনয় করলো। সঙ্গে বাজিয়েরা তাদের নাচে সাহায্য করলেন। এইনৃত্যেপরিকল্পনার মধ্যে কোথাও কোথাও ইয়ুরোপের Ballet নাচের রূপ ও ধরণ চোখে পড়লো। কি করে তারা এ ধরণটা পেল জানি না। শংকরের কাছে খবর পেঁৗছুলো মাস্টারমশায় এসেছেন। তিনি মাস্টার মশায়ের সংবাদ শুনে অবাক, কারণ তাঁর এসব সংবাদ জানা ছিল না।

আমি প্রায়ই সকালে সেণ্টারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তাম এবং সমস্ত দিনটা সেখানকার কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সংগে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম।

শংকরের কালচার সেণ্টার হোলো এই প্রতিষ্ঠানের নাম— কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় আমার বার বার মনে হয়েছিল, এই নাম না দিয়ে যদি তিনি শংকরের "নৃত্য আশ্রম" নাম দিতেন, তবে এই কেন্দ্রটির নামকরণ সঠিক হোতো। আমাদের দেশে সাধারণত জ্ঞান-সাধনার কেন্দ্রকেই আশ্রম বলার একটা প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। সংগীতের সাধনার জন্য নির্জন আশ্রমে কোন কোন সাধক জীবন কাটিয়েছেন, তাও শুনেছি। নৃত্যের সাধনাও কখনও কখনও এইরূপ আশ্রমকে জড়িয়ে বড় হয়েছিল বলে মনে হয়। সুতরাং শংকরের প্রতিষ্ঠানকে যদি আশ্রম বলা যায়, তবে আমাদের সাধারণ সংস্কারে ঘা লাগতে পারে, কিন্তু তা অশোভন হয় না। কারণ সেখানকার আবহাওয়া নাচের চর্চারই উপযুক্ত। সেখানে নাচ সকলের চিন্তা। সেই নিয়েই থাকে সকলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত। আলমোড়া শহরটি এত দূরে পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত বলে, স্বভাবতই সমতলভূমির শহুরে চঞ্চলতা থেকে অনেকখানি সে মুক্ত। এই আশ্রমটিও আলমোড়া শহর থেকে দুই মাইল দূরে হওয়াতে এখানকার অধিবাসীরা সেই শহরেরও বৈচিত্র্যময় চঞ্চল জীবনের ধরাছোঁয়ার একরকম বাইরেই আছেন বলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাও সপ্তাহে একদিন মাত্র শহরে যাবার অবসর পায়। সুতরাং এই নির্জনতার মধ্যে একাগ্রচিত্তে নৃত্যের ধ্যানে ও চর্চায় সেখানে শিল্পীদের জীবন কাটে, তাকে আশ্রম বল্লে অন্যায় হয় না।

ভারতের সব প্রদেশের ছাত্রছাত্রীই এখানে চোখে পড়লো

দেবদারু ও পাইক কাঠে তৈরী স্টুডিও

এবং সকলের মধ্যে একতা আছে, শংকরের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাও খুব। উপরোক্ত ৫০টি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫টি হোলো কেবল দুমাসের জন্য ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ সম্প্রতি সেখানে কেবলমাত্র দুমাসের নৃত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে গ্রীষ্মকালে। কিন্তু যে ছাত্র-ছাত্রীরা দু মাসের নাচ শিখবে বলে এসেছিল, তাদের অধিকাংশরই বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নৃত্যে অর্বাচীন। পূর্বে নৃত্যের কোনপ্রকার ভালো শিক্ষা তাদের অনেকেরই ছিল না। মনে হয়, শঙ্করের আশ্রমের একটা ছাপ কোনপ্রকারে নিয়ে যেতে পারে, এই মতলবেই তারা এসেছে। এ ধরণের শিক্ষা শঙ্করের আশ্রমের পক্ষে হয়তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৃথাই যাবে। এই দলে কিছু স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ছিল। তারা এসেছেন, সাধারণ-ভাবে নাচের একটা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে, হয়তো তাদের কর্ম-স্থানের ছাত্রছাত্রী মহলে তা কাজে লাগাবে, এই কথা তারা মনে করছেন। এদিক থেকে দু মাসের অভিজ্ঞতা তাদের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যে কাজে দেবে তা বলা চলে।

সকালে ৭॥টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শংকর ছাত্রছাত্রীদের নিজ পদ্ধতিতে নৃত্যশিক্ষা দেন। সকালে যে নাচের ভংগী শেখাচ্ছিলেন, দেখে মনে হোলো কোনপ্রকার পূজানৃত্যের অংশ বিশেষ। তখনো নাচটি সম্পূর্ণে শেখানো হয় নি। কয়েকটি stepsএর সংগে কয়েকটি ভংগী মাত্র শেষ হয়েছে। এই নাচটি শেখাবার পূর্বে হাতপায়ের স্বাভাবিক জড়তা ভাংগবার জন্যে সকলকে একসংগে, তালে তালে, হাত ও পায়ের গতির একটি সামঞ্জস্য রেখে, কেবল ধীর ও দ্রুত লয়ে চলতে বলা হয়। এই ক্লাসটি শেষ হলে ভাগে ভাগে ছাত্রছাত্রীরা মণিপুরী, কথাকলি ও অন্য নৃত্যভঙ্গি,—মণিপুরী শিক্ষক, কথা-

কলি শিক্ষক, অমলা দেবী, সিমকী দেবী ও জোহরা দেবীর কাছে শেখে। বেলা ১২টায় খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেল চারটা পর্যন্ত সকলে বিশ্রামের অবসর পায়। আবার ৫টা থেকে নৃত্যচর্চা চলে রাত ৭॥টা পর্যন্ত। ছাত্রছাত্রীরা সকলেই বয়সে বড় ও অধিকাংশই বর্তমান ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত—বাইরে থেকে কোন ভাল বক্তা বা পণ্ডিত গেলে তাদের সামনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা থাকতে কায়দায় কয়েকটি নাচ একবার তিনি করেছিলেন। তিনি শংকরের গুরুহিসেবে বিখ্যাত; কিন্তু তাঁর কথাকলি নৃত্যকলায় পারদর্শীতা যে কথাকলি নর্তকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একথা ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ আমি কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের অনেক বৃদ্ধ কথাকলি নর্তকদের নাচ দেখেছি—তাঁরা কেউ কেউ তুলনায় নম্বুদ্রী থেকে যে খারাপ নয়, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। মণিপুরী নর্তকটিও বৃদ্ধ।

সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে তুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য

থাকতে সিন্ধুদেশবাসী একটি যুবক প্রফেসর সাইকলজী বিষয়ে আশ্রমের সকলের কাছে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি একদিন সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম, শংকরকেও সেখানে দেখি। এখানকার কার্যপ্রণালী বা তার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিঃ বার্স নামে একটি আমেরিকান ভদ্রলোকের উপর। তাঁর বয়স ৫০এর উপর হবে বলে মনে হলো, আশ্রমের একটি বাড়িতে সপরিবারে বাস করেন। তিনি শংকরের পরামর্শমত নিজের কাজ করে যান, তাঁর ব্যবস্থায় কাউকেই অসন্তুষ্ট বলে মনে হোলো না। সংগীত ও বাদ্যের ব্যবস্থা নাচের মত সুচারুরূপে করা এখনো সম্ভব হয় নি। যন্ত্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ও হিন্দীভজন ইত্যাদির চর্চা সেখানে শুরু হয়েছে দেখলাম। শংকরের বাসগৃহের একটি ঘর হোলো, এখানকার পুস্তকাগার। ছোটখাট হলেও ভারতীয় নৃত্যগীত ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই এখানে আছে। শংকরের নৃত্যসহচরী সিমকী দেবীও এই বাড়ির অপর একটি ঘরে থাকেন।

সেখানকার কথাকলি নৃত্যগুরু নম্বুদ্রী, মালাবারী ব্রাহ্মণ, বয়সও মন্দ হয় নি। নিজে সব সময় উঠে নাচ শেখাতে পারেন না বয়সের দুর্বলতার জন্য। তাই বসে বসেই বেশী সময় নাচ শেখান। গোঁড়া ধার্মিক। ফোঁটা তিলক কেটে, জপতপ, পুজো নিয়েই সময় কাটান। তাঁর নাচের ক্লাসের আরম্ভে প্রত্যেক ছাত্র তাঁর সামনে হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বসে। তিনি তাদের মাথায় হাত দিয়ে প্রায় আধ মিনিট মনে মনে মন্ত্র বলেন। বোধ হয় সেগুলি শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্বাদ মন্ত্র। তাঁর নাচ আমি পূর্বে শান্তিনিকেতনে একবার দেখেছি। গুরুদেবের সামনে খাঁটি কথাকলি পূর্বে তাঁকে মণিপুরের রাজদরবারে দেখেছি। তাঁর নৃত্যজ্ঞান ভালই মনে হোলো। শেখানোর পদ্ধতিটিও ভাল। মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্যপদ্ধতি যে শংকরের নিজ নৃত্যপদ্ধতির মত ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, একথা বলছি তাদের সবপ্রকার নাচ দেখে। দুই পদ্ধতির নাচে তারা আশানুরূপ সফলতা লাভ করেনি।

শংকরের শিক্ষাদান পদ্ধতিটি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সব শিক্ষার যা গতি, তিনিও নাচের বেলা সে পথই ধরেছেন। গোড়া-থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনে কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করাই হোলো তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির মূলকথা। পূর্বেই বলেছি তিনি নিজে নানাপ্রকার গল্প বলে তখনি তাদের সকলকে সেটাকে নাচে রূপ দিতে বলেন। একদিন সমস্ত দলকে এক সঙ্গে যন্ত্রজগতের একটা রূপ নাচে ফুটিয়ে তুলতে বলেছিলেন। দেখলাম প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রী, কেউ বসে চরখা কাটছে, তাঁত বুনছে, লাঙ্গল চালাচ্ছে, ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করছে, কামার হাতুড়ী পেটাচ্ছে ধান ভাঙ্গছে হামানদিস্তায়, ধান ঝাড়ছে, মোটর গাড়ি চালাচ্ছে, ইঞ্জিনে কয়লা দিচ্ছে, ঘড়ি মেরামত করছে, এমন কিছুই প্রায় ছিল না যা নাচে সম্ভবপর করে তুলতে চেষ্টা না করেছে। আর একদিন দেখলাম, গ্রামে ডাইনীতে পাওয়ার ঘটনা নিয়ে গ্রামের একটি বাস্তব চিত্র।

শংকর ভবিষ্যতের জন্য যে নৃত্যপরিকল্পনা করেছেন, তারই অভ্যাস প্রতিদিনই স্বতন্ত্র সময়ে চলত। সেই সময়, কেবল যারা তাঁর ভবিষ্যত নাচের প্রোগ্রামে দরকার হবে তারাই উপস্থিত থাকেন। শংকরের অনুমতিক্রমে একদিন এই ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম।

দেখলাম সিমকী, জোহরা, লক্ষ্মী, শংকরের ভ্রাতা দেবেন্দ্র, প্রভাত (সম্প্রতি সিমকি যাকে বিয়ে করেছেন) আরো একটি পুরাতন ছাত্র একটি দলবদ্ধ নতুন নৃত্য অভ্যাস করছেন। নাচটি অভ্যাস হয়ে গেলে শংকর বললেন যে, ভবিষ্যতে তিনি যে নাচের পরিকল্পনা করেছেন, তার বিষয়বস্তু হোলো বর্তমান ভারতের সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদের বিষয়ও এখানে আছে। তিনি এসবের দোষগুণ নাচের মধ্য দিয়ে আলোচনা করবেন। কয়েক বৎসর থেকে শংকর নাচে যে এ ধরণের বিষয়বস্তু নিয়েই আলোচনা করছেন, আমরা তা দেখেছি তাঁর "জীবন ছন্দ" ও "যন্ত্রজীবন" নামক নাচের আসরে।

তাঁর কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারার গতি দেখে মনে হয়, তিনি বর্তমান বাস্তব জগতের কাছ থেকেই তাঁর নাচের বিষয়বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। সব শিল্পেরই গতি এই রকমই হওয়া উচিত। যেখানে শিল্পপ্রাণ জীবন্ত, সেখানে তাই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ভারতীয় মতে শিল্পকলা হোলো আনন্দের প্রকাশ। এর দ্বারা শিল্পীর মন চায় অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ হতে। এই রসলোকই ভারতীয় শিল্পজীবনে কাম্য। নৃত্যকলা এই রসলোকে মনকে পৌঁছে দেবার একটি পথমাত্র, এ ছাড়া নৃত্যকলার আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বলে মনে হয় না। সুতরাং বিষয়বস্তু যদি এমন হয় যে, তার সাহায্যে মনে কেবল আলোড়নই তোলে, অন্তরে সেই রসলোকের সন্ধান মেলে না, তবে বলবো নৃত্যকলা সেখানে তার ঠিক মর্যাদা পায়নি। সাময়িক বা চারিধারের জীবন থেকেই ভাব সংগ্রহ করেই ভারতীয় সংগীতজ্ঞ ও চারুকলাকারেরা বা তাঁদের সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন, কিন্তু যেখানে সে সব শিল্পকলা বড় স্থান পেয়েছে, সেখানে দেখা গেছে সেই রচনার ভিতর দিয়ে বহুদূরপ্রসারী এক কালকে। নাচের বিষয়বস্তুর প্রাণ নিজের কালকে যদি ছাড়িয়ে না যেতে পারে তবে তাকে বড় দরের শিল্পকলা কেউ বলবে না। আমাদের সামনে যন্ত্রজগৎ বর্তমান, কিন্তু তাকে কোন শিল্পকলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে আগে দেখতে হবে সেই যন্ত্রজীবন আমাদের মনে কি আনন্দ যোগাচ্ছে। সত্যি সেই যন্ত্রজীবন আমাদের মনে কোন রসলোকের সন্ধান দিয়েছে কি না। নাচটা এমন জিনিস যে প্রাণে অব্যক্ত আনন্দ না জাগলে নাচ আসে না, অত্যধিক আনন্দেই মন ও দেহ নেচে ওঠে। অত্যধিক দুঃখে কেবল শিবকেই নাচতে শোনা যায়, মানুষকে নয়। যন্ত্রজীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় এমনকিছু চিরস্থায়ী সত্য আছে কি, যা শিল্পীর মনকে নাচাতে পারে?

নাচের ক্লাসে দেখেছি—ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নাচের ভালমন্দ নিয়ে তর্ক করে। কখনো সে তর্ক হয়তো মীমাংসায় এসেছে, কখনো বহুক্ষণস্থায়ী হয়েও কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারে নি। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টায় মাসে একবার নৃত্যের আয়োজন করে। তখন কোন শিক্ষকের সাহায্য তারা নেয় না। প্রতিষ্ঠানের সাজের ও বাজনার সংগ্রহ প্রচুর, নিজেদের নাচের জন্য ইচ্ছামত ব্যবহার করবার অনুমতি তারা পায়। এইভাবে তাদের নৃত্যরচনার উৎসাহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেখানে গিয়ে সমর্থ বা অসমর্থ সব ছাত্রছাত্রীদের মনে নাচবার যে সাহস জন্মায় সেইটিই শংকরের শিক্ষার প্রধান গুণ।

শংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমার পরিচয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যখনি তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন তখনি তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছে। তাঁর অমায়িক ও নম্র ব্যবহারে তিনি সকলেরই সহজে মন আকর্ষণ করতে সক্ষম। আলমোড়ায় তাঁর সঙ্গে নাচের বিষয় নিয়ে একদিন নানাপ্রকার আলোচনা হোলো। আলোচনাকালে এইটুকু বুঝলাম তিনি মোটেই প্রাচীনপন্থী নন, এমনকি তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানে প্রাচীন পুরাণের গল্প অবলম্বনে যে সব নাচ হয়, সেগুলি দেখে অনেকে বলে থাকেন শংকর খাঁটি ভারতীয় ক্লাসিকেল নাচের টেকনিক এতে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিখুঁতভাবে ক্লাসিকেল টেকনিক ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি নিজে তা মনে করেন না—তিনি মনে করেন পুরাতনে যাই থাক তাকে আজকালের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে সাজাতেই হবে।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

আলমোড়া ত্যাগের দুইদিন আগে সৌভাগ্যবশত উত্তর ভারতীয় সংগীতের গৌরব ও বিখ্যাত সরোদীয়া আলাউদ্দিন আলমোড়া এসে উপস্থিত হলেন মাইহার থেকে। বছর কয়েক হোলো তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার সঙ্গে শংকরের কনিষ্ঠভ্রাতার বিবাহ হয়, সেই সূত্রে তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই মাঝে মাঝে মাইহার থেকে তিনি এখানে আসেন। তাঁর বয়স এখন ৭২ বৎসরের মত। অথচ চেহারা দেখে মনে হবে পঞ্চান্নর বেশী নয়।

আলাউদ্দিন খাঁ

শরীর তাঁর এখনও বেশ শক্ত। অতি অমায়িক ও বিনয়ী। চিরকালই ধর্মভীরু। সব সময়, ছোট বড় সকলের সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে কথা বলেন—তাঁর সরোদ বাজনা শুনতে চাইলে তিনি কখনো কাউকে মানা করেন না। একদিন সকালেই শংকরের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। সেদিন ছুটির দিন, তাই অন্য কাজ-কর্ম বন্ধ। সিমকী দেবীর পাশের ঘরেই তাঁর থাকবার জায়গা। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূর থেকে সরোদের মধুর টুংটাং ধ্বনি শুনে উল্লসিত হয়ে সেইদিকেই দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় একটি আসন পেতে সংগীত-সাধক আপন মনে একটি আলাপ করে চলেছেন। তাঁর সেই ধ্যানমগ্ন ভাব দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনতে লাগলাম এই ভেবে যে, যদি কাছে গেলে তাঁর সেই বাজনার ব্যাঘাত হয়। সামনে পাহাড়ের তরঙ্গ দূর থেকে দূরে চলে গেছে। মেঘ ও রৌদ্রে নানাপ্রকার তরঙ্গের খেলা চলেছে তার গায়ে। সামনের পাহাড়ের এই সুদূরব্যাপী বিস্তারের দিকে তাকিয়ে থেকেও সেই সংগে সাধকের বাজনায় গম্ভীর রাগিণীর আলাপে মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে বসালেন ও একটি তোড়ী রাগের আলাপ বাজাতে লাগলেন। সেটি শেষ করে বাজালেন একটি ভৈরবী। কথায় কথায় নিজের সংগীত জীবনের অনেক কিছুই বললেন। তাঁর জীবনে প্রথম ৩৫ বৎসর কি
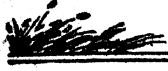
অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ঠের মধ্যে তিনি কাটিয়েছেন, সে সব শুনে মনে বেদনা বোধ করেছিলাম। তিনি যে আজ বাঁ হাতে সব যন্ত্র বাজিয়ে থাকেন এর পিছেন ভারতীয় এক বড় ওস্তাদের নির্মম ব্যবহারের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সেই ওস্তাদ চেয়েছিলো, যাতে আলাউদ্দিন বাজনা শেখা বন্ধ করে। তাই তাঁকে বলেছিলেন যদি সে ডান হাতে বাজনা না বাজিয়ে বাঁ হাতে বাজাতে পারে তবে তাকে বাজনা সেখাবেন। আলাউদ্দিনের অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হোলো, তিনি বাঁ হাতেই বাজাতে শুরু করলেন। কথায় কথায় নিজের মেয়েকে হিন্দুর সঙ্গে, হিন্দুমতে বিয়ে দিলেন কেন সেকথাও বললেন। শুনলাম এই কারণে দেশে তাঁর সমাজের অন্যান্যরা তাঁকে বিশেষভাবে তীরস্কার করেছে। কিন্তু তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর কন্যা যেখানে সুখে থাকবে ভেবেছে সেইখানেই বিয়ে দিয়েছেন। সরোদ বাজাতে বাজাতে হঠাৎ বললেন, "আজ এতদিন হোলো বাজাচ্ছি কিন্তু জীবনের শেষে এসে প্রথম অনুভব করছি যে সংগীতের মধ্যে এমন একটা রহস্য আছে যা পূর্বে টের পাই নি। তখন বাজিয়ে গেছি, কিন্তু আজ বাজনার ভিতর দিয়ে যে আনন্দলোকের আভাস মনে জাগে ঠিক সেটি পূর্বে জাগে নি। এক রাগিনীর কোন একটি শ্রুতি আর এক রাগিনীতে যে এক নয়, আজকাল মনের মধ্যে সে বোধও স্পষ্ট জাগে। বাজাবার সময় মনে যে রাগিনীর শ্রুতি বাজছে তার সঙ্গে যদি যন্ত্রের শ্রুতি এক হয়ে না মিলে যায় তবে রাগিনীর রূপটি মনে সে আনন্দ দেবে না। কিন্তু যেই মনের রাগিনীর সঙ্গে মিললো, তখন প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে।" এই কথা বলে তিনি বাজনাতেই ছোট ছোট শ্রুতির পরীক্ষার দ্বারা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। তারপর বললেন, এতদিন যে বাজনা বাজিয়েছি তা বড় কড়া ছিল, শ্রুতির এই তারতম্যটি বুঝিনি তার কারণ, এ হোলো অনুভবের বিষয়, একে ধরে কেউ শেখাতে পারে না, বোঝাতেও পারে না।

এ যুগের একজন সংগীত সাধকের জীবনের এই অভিজ্ঞতাটিতে আমার মনের একটা বড় অজ্ঞানতা দূর হয়েছিল একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি, এবং এমন কিছু নতুনত্বের সন্ধান পেলাম যার মূল্য লিখে বোঝানো যায় না। সেদিন সমস্ত সকালটি তাঁর কাছে কাটিয়ে নিজের মনে বেশ একটি তৃপ্তি নিয়ে ফিরেছিলাম। তখনই মনে বুঝতে পারলাম কেন প্রাচীন ঋষীরা ভগবানের নামে বলিয়াছেন,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

সিমাকী দেবী পাশের ঘরে থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, "ওস্তাদজী একটু অবসর পেলেই বাজনা নিয়ে বসে যান। বিশেষত রাত্রে তিনি কতটুকু যে ঘুমোন তা বুঝতে পারি না—যখনি ঘুম ভাঙ্গে তখনি তাঁর বাজনার শব্দ কানে আসে।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

চক্রবাল

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

তরঙ্গ সচকিতে মুখ তুলে তাকালো ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু তখনি সেভাব সামলে নিয়ে ক্ষুদ্ধস্বরে ব'ললে—

"না, বিশেষ কিছুই নয়, বলছিলাম যে একটা জায়গায় থাকতে গেলে যখন যেটা দরকার কি অদরকার, তখন সেটা যেমন চেয়ে নিতেও হবে, তেমনি আবার বারণও করতে হবে জোর করে, সঙ্কুচিত হয়ে দূরে সরে থাকলে চলে না।"

শৈলজা তবু নির্বাক।

তরঙ্গ ব'ললে—

"তাই বলছি শৈলজা, আমার কাছে কিছু লুকিও না; লুকোবার চেয়ে প্রকাশ করাটার পক্ষপাতিই আমি বেশী, আর এর জন্যে আমি কিছুই মনে করবো না কোনও দিন।"

শৈলজা নির্বাকেই উঠে দাঁড়ালো বাইরে যাবার জন্যে।

তরঙ্গ ব'ললে—

"আর একটা কথা—"

"বলুন—"

"বলুন নয়, বল; কথাটা এই যে, যারা ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেতেই হোক ঘটনাচক্রেও আমার বড় কাছে এসে পড়েছে, আর তা যতটুকু সময়ের জন্যেই আসুক—তাদের সকলকে ঐ আপনি আজ্ঞে বিধি নিষেধটা আমার সম্বন্ধে অন্তত বাদ দিতে হয়েছে একেবারে বাতিল করতে হয়েছে একদম; কারণ ওটা আমি কিছুতেই সইতে পারিনে। তাই বলছি তুমিও আমাকে তুমি সম্বোধনই করো শৈলজা; আর সম্পর্কের যখন একটা সূত্র আছে, তখন সেটা যত ক্ষীণই হোক, তার ব্যবহার করতে আপত্তি নেই নিশ্চয়!"

কঠিন স্বরে কি একটা জবাব দিতে গিয়ে শৈলজা চুপ করে গেল; ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলে আঁচলের সেই এতটুকু আবরণ, সে কখোন সরে গেছে তরঙ্গর মুখের ওপোর থেকে, সেখানে সেই আগে দেখা সকৌতুক চাপা হাসির পরিবর্তে ফুটে উঠেছে একটা অজানা বেদনাঘাতের থমথমে গম্ভীর ভাব। ক্রমশ

পাশাপাশি

মালবিকা রায়

বাঁদিকে খোলার বস্তী। তাহারি একটি ঘর লইয়া কদম বাস করে। ডানদিকে একটা উঁচু নীচু অসমতল মাঠ, তাহার মধ্যে খানিকটা জলাভূমি, কতদিন হইতে এইভাবে পড়িয়া আছে। সেদিকে কাহারো বাস নাই। একেবারে নির্জন। জানলার ধারে দাঁড়াইয়া কদম এই মাঠটার দিকে অনেক সময় নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। এই মাঠটা দেখিলেই কি জানি কেন তাহার ছেলেবেলার গ্রামের কথা মনে পড়িয়া যায়। স্টেশন হইতে তাহাদের বাড়ি যাইতে হইলে শিবপুকুর পার হইয়া এমনি একটা জলাভূমির পাশ দিয়া তবে বাড়ি যাইতে হইত। এই জলাভূমির ধারে রাত্রিবেলা যেন কি রকম একটা আলো দেখা যাইত, সকলে তাহাকে বলিত ভূতুড়ে আলো। সেই হইতে সেই মাঠটার নাম হইয়াছিল ভূতুড়ে মাঠ। এই ভূতুড়ে মাঠের পাশ দিয়া যাইতে দিনের বেলাও তাহাদের বুক ছম ছম করিত। কিন্তু আজ কলিকাতা শহরে এমনি একটা জলাভূমি দেখিতে তাহার কেন যে এত ভালো লাগে, একথা কদম বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা সে জানলার ধারে বসিয়া জলাভূমির দিকে চাহিয়া ছিল। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিআভা জলের উপর পড়িয়া চিক চিক করিতেছিল। ধূসর প্রান্তরের শেষে সুদূরে রক্তিম আকাশে উড়ন্ত পাখীর দল দিগন্ত মুখরিত করিয়া নীড়ে ফিরিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাসে জলাভূমির ওপাশের নারিকেল গাছের পাতাগুলি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কদম একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল।

হঠাৎ পিছন হইতে রাইচরণ বলিল, "এক মনে কি দেখা হচ্ছে শুনি?"

কদম চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও, তুমি; আমি হঠাৎ চমকে গেছলাম। কি আর দেখব, এই মাঠটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, না?"

রাইচরণ তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "হ্যাঁ মাঠ আবার সুন্দর কি। ওর উপর যখন বাড়ি ঘর হবে, সুন্দর অসুন্দর তখন বুঝবো।"

কদম হাসিয়া বলিল, "এই এবড়ো খেবড়ো মাঠের উপর আবার বাড়ি করবে কে?"

"কে করবে, তখন দেখো? কলকাতা শহরে অতখানি জায়গা কি অমনি পড়ে থাকতে পারে?"

রাইচরণের কথা যে সত্য তাহা কয়েকদিন পরেই বুঝা গেলো। দলে দলে কুলী লরী করিয়া মাটি আনিয়া এই জলাভূমি ও অসমতল মাঠকে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করিল, কদমের অনেকদিনের সঙ্গী জলাভূমির কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখিল না। তাহার পর লরী বোঝাই ইট, সুরকি, লোহা লক্কর আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটি প্রকাণ্ড ইমারতের ভিত গড়া হইল, বিস্মিতকণ্ঠে কদম বলিল, "হ্যাঁ গো, এত বড় বাড়িতে কারা থাকবে গো? এরা যে একেবারে আমাদের গায়ের উপর বাড়ি তুললে, আমাদের ঘরে আর আলো বাতাস আসবে না যে!"

"না আসে ত আর কি করবো," তামাক টানিতে টানিতে নির্বিকার চিত্তে রাইচরণ উত্তর করিল। রাইচরণ কমিউনিস্ট নয়। ধনী সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু কদম গজরাইতে লাগিল, "হ্যাঁ তাই বই কি! অত বড় মাঠটা বুজিয়ে দিলে, তা দিলে দিলে সে ত আর আমার জায়গা নয়; তা বলে আমাদের ঘরে একটুও আলো বাতাস আসতে দেবে না?"

রাইচরণ বলিল, "আমার কাছে বলে কি হবে, যারা বাড়ি করছে তাদের গিয়ে বলো।"

কিন্তু বাড়িটা যখন সর্বাঙ্গে রঙের প্রলেপ লইয়া জাখারী কাট জানলা অঙ্গে ধরিয়া জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করিল, সেদিন কদমের আর অভিযোগের কিছু রহিল না। মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবলি বকিতে লাগিল, "দেখলে, দেখতে দেখতে কেমন বাড়িটা করে ফেললো, দেখলে।"

বাড়ির কাজ শেষ হইয়া গেলো। এবার সাজানোর পালা। আবার লরী করিয়া মেহগনির খাট, গদি আঁটা থোকা, আয়না দেওয়া টেবিল ইত্যাদি বিলাস বাসনের নানাবিধ আসবাবে ঘর ভরিয়া গেলো। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিয়া উঠিল। আলোকমালায় সমস্ত বাড়িটা ইন্দ্রপুরীর মত ঝলমল করিতে লাগিল।

নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া কদম ভাবিল, এ নিশ্চয় কোন রাজার বাড়ী। তা না হইলে এত সাজ, এত সরঞ্জাম কি অন্য কাহারো থাকে!

ধুমধাম করিয়া বাড়ি সাজানো হইল। আর একদিন ততোধিক ধুমধাম করিয়া গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত হইয়া গেলো। নহবৎ বসিল, কাঙালী বিদায় হইল, বাজী পুড়িল, ধনীজনোচিত কোন আয়োজনই বাদ পড়িল না। কিন্তু আসল যাহারা বাড়ির মালিক তাহারা এখনো পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল না।

কদম দিনের পর দিন গুনিতে লাগিল। কবে সেই অদেখা রাজারাণীর নূতন বাড়িতে শুভাগমন হইবে এবং কেমন করিয়া হইবে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় কিংবা ময়ূরপঙ্খী নায়ে! রাজার কর্ণে থাকিবে হীরার কুণ্ডল, কণ্ঠে দুলিবে গজমোতির মালা, রাণীর পরনে গোধূলীর মেঘের মত লাল রত্নখচিত বসন, কণ্ঠে পদ্মরাগ মণি হার, প্রকোষ্ঠে রত্ন বলয়—কদমের কল্পনা পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত হাওয়ায় উড়িয়া চলে।

একদিন কল্পনা সত্যই বাস্তবে পরিণত হইল। বাড়ির মালিক বাড়িতে শুভ পদার্পণ করিলেন। ময়ূর পঙ্খীতে চড়িয়া নয়, পক্ষীরাজেও নয়, ক্যাডিলক মোটরে চড়িয়া, সঙ্গে রাণীও আসিলেন। সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার ভূষিতা হইয়াই বটে, কিন্তু রাজার কর্ণে কুণ্ডল নাই, কণ্ঠে গজমোতির মালাও নাই, ডান হাতে শুধু সোনার রিস্ট ওয়াচ। সঙ্গে পাত্র মিত্র সভাসদ আরো অনেকে আসিল। রাণী সঙ্গেও সহচরীর অভাব ছিল না।

সমস্ত দিনটা কদমের এই রাজা রাণীর কার্যকলাপ দেখিতে কাটিয়া গেলো। সন্ধ্যাবেলা সেই রাজবাড়ীর একটি দাসীর সঙ্গে কোন রকমে কদম আলাপ জমাইয়া ফেলিল। সঠিক সংবাদ সমস্ত মিলিল। ইহারা রাজা নয়, তবে বড় জমিদার; জমিদারবাবুর কন্যা অনেকগুলি, পুত্র একটি। কন্যাগুলির খুব বড় বড় ঘরেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুত্রটিরও ধনী কন্যার সহিতই বিবাহ হইয়াছে কিন্তু জমিদারবাবু এখন পর্যন্ত পৌত্র মুখ দর্শন করিতে পারে নাই। এজন্য কর্তা, গৃহিণী, দাস দাসী কাহারো আপশোষের অন্ত নাই। গৃহিণী ত এমন ঠাকুর নাই, যেখানে না মানসিক করিয়াছেন। উঁচু স্থান দেখিলেই মাথা খুঁড়িয়া রক্তপাত করিয়াছেন, তাবিজ মাদুলীতে বধূর সর্বাঙ্গ ভরাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন দেবতার প্রসাদ লাভ করিতে সফল হন নাই।

দাসীটি আরো অনেক কথা বলিল। জমিদার পুত্রটির স্বভাব ভালো নয়। বৌমাও অত্যন্ত মুখরা। দুটিতে যেন অষ্টপ্রহর কিচিকিচি লাগিয়াই আছে। এমন দিন নাই যে দিনটি এ বাড়ি কোনরূপ কলহ বিবাদ না হইয়া নিশ্চিন্তে কাটে! এমনি আ

অনেক ঘরোয়া কথা বলিয়া পেট হালকা করিয়া জমিদার বাড়ির দাসীটি বিদায় লইল।

সমস্ত কথা শুনিয়া কদমের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। জমিদার বাড়িতেও যে তাহাদের বাড়ির মত ঝগড়া বিবাদ হয় একথা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত বিস্ময় বোধ হইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গেলো। সেদিন বেলা প্রায় ১১টার সময় জমিদার বাড়িতে চেঁচামেচি গোলমাল শুনিয়া কদম বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোতালার ঢাকা বারান্দায় জমিদার বধূ জমিদার গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বলিতেছে, "দেখুন মা, রোজ রোজ এ সব গালাগালি আমার সহ্য হবে না।"

জমিদার গৃহিণী শান্ত স্বরে বলিলেন, "ওকি তোমাকে জ্ঞানে গালাগাল দিয়েছে মা! জ্ঞান থাকলে—"

"জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, রোজ রোজ ও গালাগাল দেবার কে!"

জমিদার পুত্র রঙ্গস্থলে টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইল। জড়িত কণ্ঠে হাত নাড়িয়া বলিল, "গালাগাল দেবার কে, সে তোর বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।"

ক্রুদ্ধ স্বরে বধূ বলিল, "খবরদার বলছি আমার বাপ তুলো না। আমার বাবা তোমার বাবার মত জোচ্চর নয়; মিথ্যে কথা বলে মাতাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয় না।"

ক্রুদ্ধ স্বরে গৃহিণী বলিলেন, "ও কি কথা, বৌমা? তোমার শ্বশুর জোচ্চর!"

"জোচ্চর নয় ত কি! একশোবার জোচ্চর? তা না হলে মাতাল ছেলের কেউ বিয়ে দেয় মিথ্যে কথা বলে?"

জমিদার পুত্র ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "আহা হা রে, তোমার বাবা বুঝি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল? নেকু ভায়া রে সব! বড়লোকের ছেলে মাতাল হবে না ত কি চাষার ছেলে মাতাল হয়! টাকার লোভে বিয়ে দিয়েছে, আবার মুখ নাড়া হচ্ছে!"

চোখ মুখ লাল করিয়া বধূ উত্তর করিল, "আমার বিয়ে দিয়ে তোমার বাবা টাকা পেয়েছে, না আমার বাবা? মাতাল কোথাকার!"

দুই পক্ষে তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিল। দাস দাসীর দল মাঝে মাঝে উঁকি মারিতে লাগিল। গৃহিণী দুই একবার দুইজন কে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সরিয়া পড়িলেন।

স্বামী স্ত্রীর এই ঝগড়া শুনিয়া কদম স্তব্ধ হইয়া গেলো। ঝগড়া, গালাগালি, মাতালের কটূক্তি সমস্তর সঙ্গেই তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু ভদ্র স্বামী-স্ত্রীর এই ব্যবহারে তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে বিস্মিত চিত্তে শুধু বার বার এই কথাই ভাবিতে লাগিল, এই হর্ম্যতলবাসিণী জমিদার বধূটি অবলীলাক্রমে যে সকল কথা তাহার বিবাহিত স্বামীকে বলিয়া গেলো, সে সেই সকল কথা রাইচরণকে বলিবার কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারে না। অথচ সে সামান্য খোলার ঘরের রূপোপোজিবিনী এবং রাইচরণ তাহার স্বামীও নয়।

মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা স্মরণ করিয়া কদম বিস্মিত হইল।

রূপোপোজিবিনী হইলেও কদমের জীবনের একটা ইতিহাস আছে, যদিও তাহা সুখপ্রদও নয় এবং চমকপ্রদও নয়, তথাপি ইতিহাস বই কি! ছেলেবেলায় সে যে গ্রামে বাস করিত, তাহার আবছা স্মৃতি এখনো তাহার মনের কোণে লেখা আছে। তাহার মা ছিল না। মাসীর কাছে মানুষ হইয়াছিল। তাহার পর কি কারণে কেন যে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইয়াছিল, সে কথা তাহার ভালো করিয়া মনে নাই। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল সে ও তাহার মাসী রূপোপোজিবিনী।

সমস্ত দিন গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করিতে হয়। সন্ধ্যে-বেলা গৃহস্থ বধূরা যখন মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করিয়া তুলসীপদমূলে প্রিয়তমের কল্যাণ কামনা করে, তাহারা সেই সময় হইতে অধরে কৃত্রিম রং লাগাইয়া গালে পাউডার ঘসিয়া চোখে সুরমা পরিয়া, গিল্টির গহনা ও রঙীন বসনে সজ্জিত হইয়া বাহিরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। সে কি দুঃসহ প্রতীক্ষা? প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া যে প্রতীক্ষা, সে প্রতীক্ষা আপনার প্রাণরসে প্রতীক্ষাকারিণীর প্রতীক্ষার ক্লেশ লাঘব করে। কিন্তু যাহাকে কোনদিন দেখে নাই, যাহাকে কোনদিন চেনে নাই, যে তাহার প্রিয়জন নয়, তাহার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনিভাবে সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার চেয়ে বেদনাদায়ক অপমানজনক আর কি আছে!

কিন্তু তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। কারণ, এ ত বিলাস নয়, হৃদয়ের আবেগও নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে নিদারুণ, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বর্বর ক্ষুধার তাগিদ—দৈহিক যন্ত্রণার অধিক, মানসিক বিলাসের অতীত; বাঁচিয়া থাকিবার, পৃথিবীর নিঃশ্বাস গ্রহণের মর্মান্তিক ব্যাকুল আবেদন। এবং এরই তাগিদে যখন দিনের পর দিন কদম পথের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিত, তখন ইহা ভালো কি মন্দ কোন কথাই তাহার মনে উদয় হয় নাই। যুক্তি দিয়া কোন কিছু বিচার করিবার তাহার বুদ্ধিও ছিল না, সংস্কারও নাই। সে জানে শুধু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তা সে যে করিয়াই হোক; কেন যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে সে প্রশ্নও তাহার মনের কোণে স্থান পায় নাই।

এমনি করিয়া কদমের জীবনের পথে কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেলো। কেহ একরাত্রির অতিথি কেহ বা দুই রাত্রির অতিথি হইয়া রহিল। তাহার পর কে কোথায় মিলাইয়া গেলো তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। তাহারা নিজেরাও কদমের কোন স্মৃতি লইয়া গেলো না, কদমের মনেও কোন স্মৃতি রাখিয়া গেলো না। দিনের পর দিন এমনি করিয়া নিত্য নূতন যাত্রীর আসা যাওয়ার পথের পানে কদম চাহিয়া রহিল।

কিন্তু একদিন সহসা ব্যতিক্রম ঘটিল। সাজিয়া গুজিয়া কদম আর পথের ধারে দাঁড়াইল না। দাঁড়াইতে পারিল না। নিদারুণ ব্যাধির যন্ত্রণায় কদম শয্যা গ্রহণ করিল।

দরজা খোলা ছিল। ভালবাসিয়া নয়, ভালবাসা পাইবার জন্যও নয়, আপনার প্রয়োজনে রাইচরণ দুয়ার ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

অন্ধকার রাত্রি, ততোধিক অন্ধকার ঘর। এক কোণে নির্বাপিত প্রায় দীপশিখা। রাইচরণ এদিক ওদিক তাকাইল, এই স্বল্প আলোকে কে কোথায় আছে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিল না। তাহার পর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতে জীর্ণ শয্যায় শায়িতা রুগ্না কদমকে চোখে পড়িল।

"এই যে এখানে ঢং করে পড়ে থাকা হয়েছে!" রাইচরণ কদমের নিকট অগ্রসর হইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল।

কদমের তখন চোখ খুলিবার সামর্থ নাই। তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে। কোন রকমে পিপাসিত দুই ওষ্ঠ ঈষৎ নড়িয়া শুধু বাহির হইল, "জল!"

রাইচরণ চমকাইয়া উঠিল। তাহার পর আর একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়া কদমের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। ভালো করিয়া মুখ দেখিয়া বলিল, "আ মরণ, এ যে মরতে বসেছে! ভালো আপদে পড়লাম ত!"

রাইচরণ আবার অগ্রসর হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া জানলার ওপরে রাখা কলসী হইতে এক গ্লাশ জল ঢালিয়া কদমের মুখের কাছে ধরিল। ঢক ঢক করিয়া সমস্ত জলটা পান করিয়া কদম একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। রাইচরণ আপন মনে বলিল, "মরণ! মরবে নাকি? ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে যে!"

অন্ধকারে কদমকে দেখা গেলো না। রাইচরণ কদমের মুখে

কপালে হাত বুলাইয়া অঙ্গের উত্তাপ অনুভব করিল। পুরুষ স্পর্শে কদমের শিহরিত হইবার কথা নয়, তথাপি কদম শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে রাইচরণ বুঝিতে পারিল, কদম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। রাইচরণের স্পর্শ ছাড়া কদমের আর কিছু মনে ছিল না। তিন দিন পরে যখন সে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল এক পাশে রাইচরণ ও এক পাশে একজন ডাক্তার দাঁড়াইয়া আছে। কদমের জ্ঞান ফিরিতে দেখিয়া রাইচরণকে কি সব বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলো।

রাইচরণ কদমের নিকট অগ্রসর হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ঢং করে ত অনেকদিন পড়ে থাকা হোল, এখন ওষুধটা খেয়ে নিলে যে আপদে শান্তি হয়!" রাইচরণ এক দাগ ওষুধ কদমের মুখের কাছে ধরিল।

রাইচরণের মূর্তি দেখিয়া কদম আপত্তি করিতে সাহস পাইল না। ওষুধটি ঢক করিয়া গিলিয়া অধর দংশন করিয়া বমি নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাইচরণ আবার বলিল, "বলি, জল নিয়ে কি দাঁড়িয়ে থাকবো?" কদম আবার জল খাইল।

দুই তিন দিন কদমের এইভাবেই কাটিল। রাইচরণ কাছেই রহিল। সময়মত ওষুধ, ফল ইত্যাদি আনিবারও ত্রুটি করিল না এবং প্রতিবার ওষুধপথ্য খাওয়াইবার সময় কদমকে নানাবিধ কটূক্তি করিতেও ছাড়িল না।

কদম অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সহ্য করিল। অবশেষে এক সময় হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি তোমার কি করেছি বলত! ওষুধ না দাও নাই দিলে, এমন করে কথা শোনাচ্ছ কেন?"

রাইচরণ কদমের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ঠোঁট টিপিয়া উত্তর করিল, "ইস! রাগটি ষোল আনা আছে দেখছি।"

কদম কথা বলিল না। মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাইচরণ সহসা বলিল, "মাথা টিপে দেবো?" কদম উত্তর করিল না। রাইচরণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বল না, মাথা টিপে দেবো?" কদম তথাপি কথা কহিল না।

"আ, মরণ আর কি! মর গে তবে ফোঁস ফোঁস করে, চললাম আমি," বলিয়া রাইচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা কদম ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্তে তাহার মনে পড়িল, রাইচরণের উপর রাগ অভিমান করিবার তাহার কি অধিকার আছে? সে যতদিন আপন ইচ্ছায় থাকে, ততদিনই। তাহার পর তাহাকে 'থাকো' পর্যন্ত বলিবার তাহার অধিকার নাই। এই ঘরে কত লোক আসিয়াছে, কত লোক চলিয়া গিয়াছে কদম নির্বিকার চিত্তে সকলকে আহ্বান করিয়াছে, সকলকে বিদায় দিয়াছে, কিন্তু আজ রাইচরণ চলিয়া যাইবে মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতর অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরাইয়া উঠিল।

সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর শীর্ণ হস্তে রাইচরণের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমাকে মারো, বকো, যাই করো, তুমি যেও না।"

রাইচরণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে দুই পায়ের উপর কদমের অশ্রুসিক্ত মুখের স্পর্শে তাহার শিরায় শিরায় কি এক উন্মাদনা জাগিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সহসা কদমের অশ্রুসিক্ত মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "আ, মর, কেঁদে ভাসিয়ে দিলে যে! আচ্ছা ছিঁচ কাদুনে ত? কেঁদে কেঁদে রোগ বাড়িয়ে ভেবেছো ভালো ভালো ফল খাবে, সে সব আর হচ্ছে না। এ শম্মার হাত থেকে আর একটি পয়সা বেরোবে না। যা শুতে যা।" কদমের হাত ধরিয়া রাইচরণ তাহাকে শুয়াইয়া দিল।

এ আজ দুমাস আগেকার ঘটনা। এই দুই মাস রাইচরণ কদমকে ছাড়িয়া কোথায়ও যায় নাই। দুপুরে কোথায় কোন মিলে কাজ করিতে যায়, আবার সন্ধ্যা না হইতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু কদমের মন সদা আশঙ্কিত। সে আগেকার মত সাজিয়া গুজিয়া আর রাস্তায় দাঁড়ায় না বটে, কিন্তু নিজের জানলায় বসিয়া রাইচরণের প্রতীক্ষা করে। একটু দেরী হইলে কদমের আর চিন্তার অবধি থাকে না। তাহার কেবলি মনে হয়, রাইচরণ আর ফিরিয়া আসিবে না। যদি রাইচরণ ফিরিয়া না আসে, তবে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে। রাইচরণহীন হইয়া তাহার এতদিন কাটিয়াছে, কিন্তু আজ রাইচরণ না হইলে তাহার একটা দিনও কাটিবে না। কদমের চোখে সমস্ত জগৎ শূন্য হইয়া যায়। কদম মনে মনে শত কোটি দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িতে থাকে, "হে মা কালী, হে মা জগদম্বা, সে যেন ঠিক ফিরে আসে।"

কদমের প্রার্থনার জোরেই বোধ হয় গলির মোড়ে রাইচরণকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কদম ভাবে, প্রেমাস্পদকে বাঁধিয়া রাখিবার যাহাদের কোন শক্তি কোন অধিকার নাই, ভগবান তাহাদের মনে ভালবাসা দেন কেন? মাঝে মাঝে কদমের মনে হয় চতুর্দিকে যেন তাহার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। রাইচরণ নিজে হইতেই হোক, অথবা মৃত্যু আসিয়াই হোক, রাইচরণকে তাহার নিকট হইতে পৃথক করিবেই। মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলে কদম উঠিয়া রাইচরণের নাকের কাছে হাত রাখিয়া নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে; তাহার পর তাহার পিঠে মুখ গুঁজিয়া গভীর তৃপ্তিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু সকালে উঠিয়াই আবার চিন্তা হয়, হয়তো রাইচরণ আজ কাজে যাইবে আর ফিরিয়া আসিবে না।

এমনি করিয়া শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে কদমের দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। নিজের চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে জমিদার বাড়ির খবর সংগ্রহ করে। নূতন খবর প্রায় বিশেষ কিছু মিলে না। যে খবর মিলে, দাসী না দিলেও সে খবর কদম আপনিই সংগ্রহ করিতে পারে—জমিদার পুত্রের সহিত জমিদার বধূর নিত্য কলহ। মাঝে কয়েক দিনের জন্য জমিদার বধূ রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। জমিদারবাবু সাধিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এমনি প্রায় মাঝে মাঝে ঘটে। দাসী আসিয়া খবর দেয়।

কদম মনে মনে ভাবে যাহারা পায়, তাহারা এমনি করিয়াই পায়। জমিদার বধূ তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে এক মুহূর্তের জন্যও ভয় করে না, জানে তাহার স্বামী তাহার থাকিবেই। ধর্ম, আইন, সমাজ তাহাকে যে অধিকার দিয়াছে, সে অধিকার কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা তাহাদেরও নাই। তাই সে সদা নিঃসঙ্ক, সদা নির্ভিক। আর কদম, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, 'হারাই' 'হারাই' চিন্তা তাহার নয়নের ঘুম পর্যন্ত হরণ করিয়াছে। কদম আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দিন কয়েক পরে নূতন খবর সত্যই পাওয়া যায়। দাসী আসিয়া এক মুখ হাসিয়া বলে জমিদার বধূ অন্তঃসত্ত্বা। কালী-ঘাটের কালী, বাগবাজারের মদনমোহন যেখানে যত ঠাকুর দেবতা ছিল গৃহিণী দুই হাত উজাড় করিয়া তাহাদের পূজা পাঠাইতেছেন। দাসীদের অঙ্গে নূতন বসন উঠিয়াছে। চতুর্দিকে সকলেরই হাসি মুখ। এমন কি চির অপ্রসন্না জমিদার বধূর মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

কদম চাহিয়া চাহিয়া দেখে আর অবাক হয়। যে সন্তান এখনো জন্মগ্রহণ করে নাই, শুধু তাহারই আগমন সম্ভাবনাতেই চতুর্দিকে এত আনন্দ এত আয়োজন, না জানি সে জন্মগ্রহণ করিলে কি হইবে। কিন্তু এ শুধু জমিদারের সন্তান বলিয়াই নয় কি! সে বংশের গৌরব রক্ষা করিবে, বংশকে অমর করিবে তাই।

(শেষাংশ—৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্ঞান-বিজ্ঞান

সুবসু

ব্ল্যাক আউটের পরীক্ষা

রাত্রির অন্ধকারে শত্রুপক্ষীয় বিমান যাতে এসে বোমা ফেলে শহর ধ্বংস করতে না পারে, তার জন্য শহরে শহরে ব্ল্যাক-আউট বা নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা হয়েছে—উদ্দেশ্য উপর থেকে কোনরূপ আলো না দেখে শহরের অবস্থান শত্রুপক্ষ ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। ফলে নগর ও নগরবাসীরা শত্রুর বিমান আক্রমণ থেকে হয়তো রক্ষা পেতে পারবে। কিন্তু নৈশ আক্রমণে লণ্ডন ও অন্যান্য অনেক শহরের যে অবস্থা দেখা গিয়েছে তাতে ব্ল্যাক-আউটের কার্যকারিতায় অনেকের মনেই এখন সন্দেহ জেগেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নিয়ে খুব আলোচনাও শুরু হয়েছে এবং ব্ল্যাক-আউটের প্রচলিত টেকনিক বদলে অন্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করে শহরগুলিকে নৈশ বিমানের আক্রমণ হতে রক্ষা করা সম্ভব কিনা তার গবেষণায় ইতিমধ্যেই বহু বিশেষজ্ঞ মনোনিবেশ করেছেন। শত্রু বিমান যখন রাত্রিবেলা কোন শহরের দিকে আসে, দেখা গিয়েছে, তারা রেডিও-রশ্মির সাহায্যে অনায়াসেই শহরের অবস্থান ঠিক করে নিতে পারে; তাছাড়া অগ্নিপ্রজ্জ্বলক বোমা নিক্ষেপ করে তারা এমন আলোকমালারও সৃষ্টি করে, যাতে ব্ল্যাক-আউটের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্ল্যাক-আউটের ফলে উল্টে আরও এই অসুবিধা হয় যে, এ-আর-পি বা নগররক্ষীর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্ব স্ব কর্তব্য পালনেও বহুতর ব্যাঘাত ঘটে। ব্ল্যাক-আউটের হিড়িকে ষণ্ডাগুণ্ডা ও বদমায়েসশ্রেণীর লোকদের উপদ্রব যেমন বেড়ে যায়, ক্রমাগত আঁধারের কীটাণুর মত বাস করে নগরবাসীদের 'মরালও' যেন ঠিক রাখা শক্ত হয়ে উঠে। মার্কিন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, নৈশ আক্রমণকারী শত্রুদের ভ্রান্তি উৎপাদনে ব্ল্যাক-আউটে তেমন সুফল হয় না; বরঞ্চ খুব শক্তিশালী কোন 'সার্চলাইট' বা ফ্লাড-লাইটের' আলো যদি আকাশপানে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাতেই শত্রু বিমানগুলির বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী। এতে শহর হতে বিমানধ্বংসী কামান দিয়ে শত্রু বিমান ভূপাতিত করার সুবিধাও অধিকতর বেশী পাওয়া যাবে। মার্কিন সৈন্য বিভাগ পরীক্ষা করে দেখেছেন, খুব জোর আলো ভেদ করে বিমান থেকে সামরিক লক্ষ্যবস্তু ঠিক করা সহজ নয়। ব্ল্যাক-আউটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে শত্রু বিমানকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা ব্ল্যাক-আউটের সঙ্গে সঙ্গে এমন কৌশল প্রবর্তনের পক্ষপাতী, যাতে শত্রু বিমান শহরের অবস্থান আদৌ ঠিক করতে অসমর্থ হয়। এ এক নূতন রকমের 'ক্যামোফ্লাজ'। শহর থেকে দূরে সামরিক লক্ষ্যবস্তুবিহীন স্থানে আলো ও আবছায়ার এমনি সমাবেশ করে রাখা, যেন রাত্রিবেলা শত্রু বিমানের কাছে সেটিই শহর বলে প্রতীত হয় এবং বিভ্রান্ত হয়ে সেই নকল শহরের উপরেই তারা বোমাবর্ষণ করে। এতে সত্যিকারের শহর ও তার সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি রক্ষা পাবে বেশী—মার্কিন বিজ্ঞানীদের এই অভিমত ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

রাশিয়ার "পুলকোভো মানমন্দির"

চারিদিকে ধ্বংস ও মৃত্যুর বিষ ছড়িয়ে মহাযুদ্ধের মহাচক্র অগ্রসর হচ্ছে। এতে যে শুধু লোকক্ষয় ও পারিবারিক বিপর্যয়ই ঘটছে তা নয়, আধুনিক সভ্যতার বনিয়াদ যেমন গড়ে উঠেছিল, তাদেরও অনেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া আলুগা হচ্ছে, বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিমান আক্রমণের ফলে ইতিমধ্যেই আমরা বহু মূল্যবান জিনিস হারিয়েছি, তবু এ রণোন্মাদনার যেন শেষ নেই!

ইংলণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু ইমারত জার্মান বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে—সে সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু রাশিয়ার "পুলকোভো মানমন্দির" বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ তেমন প্রচারলাভ করে নি। লেলিনগ্রাদের কাছে গত বৎসর (১৯৪১) যখন রুশ জার্মান সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানীদের সুপরিচিত উপরোক্ত মানমন্দিরটি সে সময়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই মানমন্দিরটি একশত বৎসরেরও অধিককাল (১৮—৩৯ সালে) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এফ জি. ডব্লিউ স্ট্রুভে (Struve) কর্তৃক রাশিয়ার তদানীন্তন জার প্রথম নিকোলসের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিশেষ সমাদর লাভ করে আসছে। স্ট্রুভের প্রচেষ্টায় এই মানমন্দিরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়, তা বহুদিন অন্যান্য দেশের মানমন্দিরে পরিলক্ষিত হয়নি। বৈজ্ঞানিক স্ট্রুভের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণের মধ্যে তিন তিনজন কৃতী বিজ্ঞানী এই মানমন্দিরের অধ্যক্ষতা করে গিয়েছেন। তন্মধ্যে অধ্যক্ষ জেরাসিমোভিকের (Gerasimovic) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাপ হতে তড়িৎকণার (Theory of Thermal Ionisation) উদ্ভব সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন, তা নক্ষত্রলোকের বায়ুমণ্ডল (Stellar atmosphere) সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে কিনা তা নিয়ে জেরাসিমোভিক সবিশেষ গবেষণা করেন। দুঃখের বিষয়, ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় ট্রটস্কীপন্থীদের যে বিতাড়ন পর্ব শুরু হয়, তারপর হতে জেরাসিমোভিক ও ঐ মানমন্দিরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মীর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। একশত বৎসরের স্মৃতি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের এই সৌধ বর্তমান যুদ্ধে জার্মান আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। ১৯৩৭ সালেও এর শতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হয়েছে, কিন্তু সর্বগ্রাসী যুদ্ধের হিড়িকে বিজ্ঞানীদের এই তীর্থ আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে।

মেক্সিকোর জাতীয় মানমন্দির

একদিকে ধ্বংস আর একদিকে সৃষ্টি—তাই ইউরোপের পুলকোভো মানমন্দির ধ্বংস কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই আতলান্তিকের অপর পাড় হতে সংবাদ এসেছে যে, মেক্সিকোতে এক নূতন জাতীয় মানমন্দির (National Astrophysical

Observatory) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধের দরুণ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সত্যিকারের পথ বহু দেশেই রুদ্ধ হয়েছে; আমেরিকা মহাদেশে যাতে তা অব্যাহত থাকে, মেক্সিকো সরকার এই মহদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মানমন্দির বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের উন্নতি কামনায় উৎসর্গ করেছেন।— প্রাচীন এজটেক ও মায়া সভ্যতার কেন্দ্রস্থল টোনানজিণ্টলা নামক ক্ষুদ্র শহরে এই মানমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মেক্সিকো শহর হতে মানমন্দিরটি প্রায় ৮০ মাইল দূরে রমণীয় স্থানে অবস্থিত ও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। অন্যান্য স্থানের মানন্দির অপেক্ষা এই মানমন্দির হতে দক্ষিণাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্যবেক্ষণ বেশ ভালভাবে করা যাবে বলে বিজ্ঞানিগণ মেক্সিকো সরকারের এই কার্যে বিশেষ সন্তোষলাভ করেছেন।

এই মানমন্দির উৎসর্গ উৎসবে মেক্সিকো সরকার আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু নামজাদা বৈজ্ঞানিক যোগদান করেন এবং বহু বিষয়ের আলোচনা করেন।

মেক্সিকোর এই জাতীয় মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ লুই এনরিকো এরো। এই মানমন্দিরে যেরূপ শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসান হয়েছে, ট্রপিক্যাল অঞ্চলে আর কোথাও কোন মানমন্দিরে সেরূপ যন্ত্র নেই; সুতরাং তিনি আশা করেন, এই মানমন্দির গবেষণার দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অচিরেই সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে।

কাঠ কয়লা হতে উৎপন্ন গ্যাস

যুদ্ধের বাজারে পেট্রোল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে; বিশেষতঃ এবিষয়ে কড়া সংরক্ষণনীতি প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে সাধারণ লরি, বাস বা মোটর গাড়ি পরিচালনা করা এক বিষম সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। পেট্রোলের পরিবর্তে 'গ্যাস' দ্বারা মোটর চালাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক লরি, বাস, মোটর গাড়িতে গ্যাস-তৈরীর যন্ত্র বসান হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কাঠকয়লা (Charcoal) হতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, মোটর গাড়ি পরিচালনা ব্যাপারে পেট্রোলের পরে উহাই বিশেষ উপযোগী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, সকল রকম কাঠ হতেই এরূপ ভাল কাঠ-কয়লা হয় না, যা হতে আবার এরূপ গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে।

দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ কাজের নিমিত্ত পাঁচ রকমের কাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি দেখা গিয়েছে, যে কাঠের গড়ন বেশ শক্ত ও তন্তুগুলি বেশ ঘন সন্নিবদ্ধ সে সব কাঠ হতে কাঠকয়লা প্রস্তুত হলে সে কাঠকয়লাই গ্যাস উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী। এরূপ কাঠকয়লার মধ্যে যাদের ভস্মাবশিষ্টের পরিমাণ (Ash content) যত কম, মোটর গাড়ি 'প্রডিউসার গ্যাস' উৎপাদনে তা ততবেশী উপযোগী।

শুধু বৃটিশ ভারতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে নিয়োজিত লরি ও বাসের সংখ্যা ৩২০০০এর উপরে হবে। যদি এদের অর্ধেক গাড়িকেও কাঠকয়লা হতে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে চালাতে হয়, তা হলেও মাসে আঠার হাজার টন পরিমাণ কাঠকয়লার প্রয়োজন। যে কাঠ-কয়লায় ভাল কাজ দিতে পারে তা প্রস্তুত ও সরবরাহের নিমিত্ত দস্তুরমত সুবন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের কথা এ বিষয়ে সুসংহতভাবে কোন কার্যপদ্ধতি এ পর্যন্ত অবলম্বিত হয়নি। ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে সময়োপযোগী একটা বড় কাজ হতে পারে। পেট্রোলের পরিবর্তে কিরূপ উপায়ে প্রস্তুত গ্যাস মোটর গাড়ি ইত্যাদি পরিচালনে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হতে পারে অথচ গাড়ির কলকব্জাও তেমন নষ্ট হবে না, এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করার এখনও বাকি আছে।

কুইনিনের অভাব

যবদ্বীপ জাপানীদের করতল হওয়ার ফলে একটি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ-ব্যাপারে চিকিৎসা-জগতে বিষম বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে। যে সিঙ্কোনা গাছের ছালে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের এই প্রতিষেধক ঔষধটি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এক যবদ্বীপেই সেই সিঙ্কোনার ৯০ ভাগ জন্মাত। দরিদ্র ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ প্রায় সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং কুইনিনের অভাব ভারতবর্ষে যতটা অনুভূত হচ্ছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ কিনা সন্দেহ। পরীক্ষায় যদিও দেখা গিয়েছে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ কুইনাইন হতে পারে এরূপ ছালযুক্ত সিঙ্কোনা গাছ যবদ্বীপের ন্যায় ভারতের মৃত্তিকাতে জন্মাবার তেমন উপযোগী নয়, তবু এদেশে এমন অনেক অঞ্চল আছে যাতে অন্য শ্রেণীর সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা অনায়াসেই হ'তে পারে সুতরাং কুইনাইনের চাহিদার নিমিত্ত ভারতকে এবার পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার সঙ্গত কারণ নেই। অতীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বনৌষধি জন্মাত; প্রাচীন আয়ুর্বেদ তাদের অনেকগুলিকে অধিকার করে কাজেও লাগিয়েছিল। রোগের চিকিৎসাকল্পে বর্তমানে যে সমস্ত ঔষধপত্র ব্যবহৃত হয়, তাদের অনেক যে এ দেশের গাছগাছড়া হতে প্রস্তুত করা অসম্ভব নয় যুদ্ধের হিড়িকে অসুবিধায় পড়ে, অনেকের দৃষ্টি এখন এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছে। পোডোফাইলাম, বেলেডোনা স্ট্যামোনিয়ম প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের গাছ হিমালয়ের ঢালু স্থানে বেশ ভালই জন্মাতে পারে; বিভিন্ন ঔষধের গুণাবলী পরীক্ষা করে কোন্ স্থান ও কিরূপ আবহাওয়া ঐ ঔষধের গাছগাছড়া জন্মাবার উপযোগী তা জেনে যদি উহা আবাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, তবে ভারত এ ব্যাপারে শুধু স্বাবলম্বীই হবে না, দেশবিদেশেও ঔষধপত্র রপ্তানি করতে পারবে। বিদেশ হতে বিভিন্ন ঔষধপত্রাদি যুদ্ধের গণ্ডগোলে বর্তমানে এদেশে খুব বেশী পৌঁছাতে পারে না, সুতরাং এ সময় যদি ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত ব্যাপারে এদেশের বিজ্ঞানিগণ মনোনিবেশ করেন, তবে দেশের মহা উপকার সাধিত হবে সন্দেহ নেই।

প্রসাদ

শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃষী কাসিতে লাগিল।

কী যে কাসিতে পাইয়াছে ভদ্রলোককে, জীবন অস্থির করিয়া ছাড়িল। শীতে যেন ইহার প্রকোপ আরও বাড়িয়া যায়। কাসিতে কাসিতে গাল-গলার রগ ফুলিয়া উঠিলেও কিছুতেই স্বস্তি নাই, অফুরন্ত কাসিবার ইচ্ছা গলার দুয়ারে আসিয়া সুর-সুর করিতে থাকিবে।

ঔষধ পত্র কতো হইল। মেজ ছেলে হরেনের পুরাতন বন্ধু শ্যামরতন ঢাকা মিটফোর্ডে তিন তিনটা বছর পড়িয়া ফেলিয়াছে। প্রধান ব্যবস্থা তাহার হইলেও তাবিজ মাদুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচন মালিস মায় ত্রিনাথের দুয়ারে সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি অবধি মানত হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবে না, এমনই অবাধ্য বেয়ারা ব্যাধি।

ছোট ছেলে গণেশ প্রেসের কম্পোজিটর, দশটা পাঁচটা তাহার ডিউটি। সময়ের সামান্য অপচয় তাহার চলিবে না। টালিগঞ্জ হইতে ভবানীপুর হাঁটিয়া যাইতে হয়, সাড়ে নয়টার এক মিনিট বিলম্ব তাহার সয় না। ক্যাম্বিসের পাম্প-সু আর ক্রেপের পাঞ্জাবী পরিয়া পান মুখে সে অফিসে যাত্রা করে, পানটি মুখে দিলেও বোঁটায় তুলিয়া চুণটি জিভে ঘষিতে ভুল হয় না কোন-দিন। একেবারে বাঁধাধরা রুটিন।

পিতার ব্যাধির দিকে তাহার তাকাইবার অবসর নাই, মাতাকে সে সোজাই সেদিন বলিয়া দিয়াছে। অফিসের চেয়ে তো আর বেশী কিছু নয়।

বড় ছেলে মধু ওষুধের ক্যানভাসার। দাঁতের মাজন, হজমিগুলি, দাদের ঔষধ, আরও টুকিটাকি কয়েকটা টোটকা ওষুধ জাপানী ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুরিয়া জীর্ণ মুমূর্ষু একটা সস্তা হারমোনিয়ম ঘাড়ে ঝুলাইয়া সেও ভোর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। চণ্ডিতলার সোমা বিশ্বাস তাহার সাকরেদ, ব্যবসায়ে দশ আনি ছ'আনি বখেরা। দুজনে রীতিমত সংগীতের কসরৎ করিবার ফাঁকে ফাঁকে সবিস্তারে সুলভ ওষুধগুলোর আশ্চর্য গুণপনার কথা প্রচার করে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অতএব পিতার প্রতি কর্তব্যের সাধ্যমত ত্রুটি নাই তার। নগদ ছ ছ'আনা দামের দাঁতের মাজন একটা বিনা-মূল্যে পিতাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছে সে। তা ছাড়া কয়েকটা মালিসও ইতিপূর্বে খরচ হইয়াছে, কোনদিন দামের জন্য বিল করে নাই। মাকে অবিশ্যি কথায় কথায় বলে এক আধ দিন, কিন্তু সে কি আর সত্য সত্যই দাম আদায় করিবে?

হ্যাঁ, মেজ ছেলে, বাপের প্রাণ ঐ মেজ ছেলে। পিতার জন্য প্রাণ দিয়াছে অতীতের এমন অনেক দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কলিতে এমনটি সত্যই বিরল। নাওয়া নাই খাওয়া নাই, কী দিন কী রাত্রি সমানে ঠাঁই বসিয়া আছে শিয়রে। পাখা সমেত হাতখানা সর্বদাই সক্রিয়, খালি মালিস করিবার বেলায় উবুড় হইয়া সযত্ন সতর্কতায় পুরা দুইটি ঘণ্টাকাল মালিস করিবে, পরে হ্যারিকেন জ্বালাইয়া পিঁয়াজের সেক দেওয়া। ইহাতে কোনদিন এতটুকু ভুলচুক নাই, এমনই সাগ্রহ একাগ্রতা, সজাগ কর্তব্যনিষ্ঠা।

কাসিতে কাসিতে হৃষী কহিল, তুই এবার শুতে যারে হরা, রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। শরীরটাতো একেবারে—খক্ খক্.........

থুথু ফেলিবার পাত্রটা ব্যস্তভাবে পিতার মুখের কাছে হরেন আগাইয়া দিল। তুমি থাক একটু বাবা, কথা বলার অনর্থক চেষ্টা করে এমন কষ্ট পেয়ো না। কীই বা হবে রাত্রে না ঘুমালে একদিন, দিনে একটু চোখ বুজে নেব'খন।

পাশের ঘরে চাটাইয়ের বেড়ার পার্টিশন, ওধারে মধুর শুইবার ব্যবস্থা। ছোট মেয়েটার গায় অসম্ভব খুজলির চুলকানি, সারারাত্র চ্যাঁচাইয়া সে বাড়ির ঘুম বিতাড়িত করে। বড় বৌ শ্বশুরের গলার সাড়া পাইয়া ক্রন্দনরতা মেয়েটাকে কষিয়া একটা চড় বসাইয়া দিল ঃ হতভাগী বজ্জাত! জ্বালিয়ে খেল আমাকে। দিনেও শত্তুর সকলের, রাতে যে একটু শান্তি পাব তাও উপায় নেই।

একটা বিরক্তির হাই ছাড়িয়া মধু পাশ ফিরিল ঃ বলি রাতেও কি ছাই—

বড় বৌ চাপাকণ্ঠে ঝংকার দিয়া উঠিল, তা বৈকি! সকলের শত্তুর জুটেছিলাম সংসারে একা আমিই। বেশ তো দাও খেদিয়ে, যে চুলোয় চোখ যায় চ'লে যাই। হাড় জুড়িয়ে বাঁচি।

—আহা-হা, মধুর কণ্ঠে শান্তির আপোষ ; মানে ঠ্যাঙাচ্ছ কেন মেয়েটাকে খালি খালি, তাই বলছিলাম।

—ঠ্যাঙাচ্ছ কেন? বড় বৌ বড় গলা করিয়া কহিল, ওদিকে সকলের রাতের ঘুম নেই, দিনে ঘুমুতে হবে বাধ্য হয়ে। আমার মেয়ে আর আমি সংসারের আপদ, মাগো আর শুনতে পারি নে—বলিতে বলিতে দুরন্ত কান্নার বেগ আসিয়া এমন বর্ণনাটা মাটি করিয়া দিল।

মধু ক্ষিপ্র হইয়া উঠিল। গর্জন করিয়া স্ত্রীকে যাহা কহিল, সংক্ষেপে বলিতে গেলে সে আত্মনির্ভরশীল। কাহারও খাইয়া তাহার দিন চলে না যে, সকলের তোয়াক্কা রাখিবে সে। ক্যানভাসারী করিয়া সে দস্তুরমতো নিজের ব্যবস্থা ভাল মতোই চালাইয়া নিতে পারে, জীবনে পরমুখাপেক্ষী আর যেই হউক, মধু সান্যাল হইবে না। বাড়িতে রীতিমত তাহার সমান অংশ আছে, তাহার মেয়েছেলে একযোগে তাহার ঘরে বসিয়া চেঁচাইলে কাঁধে মাথা রাখিয়া কে প্রতিবাদ করিতে সাহস করে?

কিন্তু প্রতিবাদ একজন করিয়া ফেলিল। বারান্দায় আর

একদিক ঘেরিয়া ঠিক ওপাশেই অনুরূপ একখানা ঘর। সেদিক হইতে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শোনা গেল: রাত দুপুরে ষাঁড়ের মতো শব্দ হয় কেন মা, বারণ করে দাও। রাতে যে ঘুমোবো, তাও উপায় নেই। সাড়ে ন'টায় অফিস সকলে ভুলে গেলে নাকি?

বিপন্ন মাতার সাড়া পাওয়া গেল না। খালি হরেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, দেখলে বাবা, বড় বৌ'র কাণ্ডটা। খালি খালি দাদাকে কেমন ক্ষেপিয়ে তুলল! ঐ মেয়ের কান্নায় নাকি আমার ঘুমের ব্যাঘাত হ'য়েছে, দেখ দেখিনি!

হৃষী কাসি থামাইয়া ফিরিয়া শুইল।

এমন করিয়াই দিন চলিতে থাকে। বৈচিত্র্যহীন তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া অনাবশ্যক ঝগড়া ইহাদের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, নিত্যকার জগতে খাওয়াদাওয়ার মতো ছুতানাতায় ঝগড়াটাও একটা বাঁচিবার অঙ্গ। হৃষীর জীবনে ইহা নূতন নয়। প্রথম যৌবনে সেও যখন দু'পয়সা উপার্জন করিত, নিজের গলানিরূমে তাহার স্ত্রীও তখন পরিবারে তাহার নিজস্ব প্রেস্টিজটি বজায় রাখিয়াছে। শাশুড়ী জা'য়ের অনাবশ্যক কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্বই তাহার সেদিন সব কিছু ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। হৃষী বুঝিলেও কেন যেন বলিতে পারিত না। আজ সে সামর্থহীনা, অন্তসারশূন্য পরের বোঝা মাত্র। ক্ষমতার কর্তৃত্ব যেমন সে অনধিকারী হইয়াও একদিন নিজে ছিনাইয়া লইয়াছিল, তেমনি একদিন হঠাৎ কেমন করিয়া তাহা হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে, সে যেন জানিতেও পারে নাই। ভালই হইল, হৃষী মনে মনে একবার হাসিতে চেষ্টা করিল, ট্রাডিসন সমানে বজায় রহিয়াছে। তাহার নাতি-বৌয়েরা আবার একদিন আসিয়া যখন তাহাদের শাশুড়ীর নাকের ডগায় তাচ্ছিল্যের আঙুল নাড়াইবে, ঐ অথর্ব মধু-গণশাকে শুনাইয়া শুনাইয়া স্পষ্ট কথা বলিতে থাকিবে, দৃশ্যটা যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্যে হৃষীর চোখের উপর বারংবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ইহাই চিরন্তন।

কিন্তু হৃষী অবিবেচক নয়। যেমন করিয়াই হউক, সংসারধর্মের এই সারতম তত্ত্বটি সে বিলক্ষণ জানিয়া ফেলিয়াছিল এবং পরের মুখাপেক্ষী হইবার মতো অবস্থায় আসিবার পূর্বেই সে রীতিমত দু'পয়সা গুছাইতে পারিয়াছিল। যতই হউক না কেন, নিজের ছেলে, কিন্তু স্বার্থের বেলা সকলেই সজাগ। ঐ তো সথানাথ দাস। পাটের অফিসের কেরাণীগিরি করিয়া যে একদিন পকেট বোঝাই করিয়া কাঁচা টাকা আনিয়া সন্ধ্যার পর ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজাইয়া সিন্দুকে তুলিত, সে আজ চুকা মুদির ঐ তক্তাপোষের একপাশে বসিয়া সারাদিন তামাক টানে। কেন, কিসের দুঃখ ছিল তাহার, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিতে ঘর ভরা। কই ছেলেরা তো কোথায় বড় বড় চাকরি করে, কখনও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাকি এই অনাবশ্যক কুশ্রী বৃদ্ধটাকে?

সবাই সমান। টাকা—আসলে ঐ রজতচক্রটির যা মূল্য! নইলে স্নেহ ভালবাসাই বল, পিতা আর সন্তানই বল, কেহ কাহারো নয়। হৃষী যেন চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়া এই মুহূর্তে বেশ তৃপ্তিবোধ করিতেছে। সত্যই, সেদিন দু'পয়সা তবু হাতে রাখিবার সুবুদ্ধি হইয়াছিল, নইলে আজ হয়তো অনাহারে বিনা চিকিৎসাতেই প্রাণ দিতে হইত! মধুটা হইয়াছে নির্লজ্জের একশেষ, ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণ কোথাকার। কে কোথায় কি করিল, সামান্য শুনিয়াই একেবারে মারমুখো। দিনের মধ্যে তিনবার আসিয়া, কবে দিয়াছিল এক দাঁতের মাজন আর গোটা দুই হাঁপানীর মালিস, বারংবার তাহারই খোঁটা দিবে। এক একবার দামটা ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, চুকিয়া যায় আপদ। কিন্তু তাই বা কেন? হৃষী যেন কিছুটা নড়িয়া চড়িয়া উসখুস করিতে থাকে, মনে মনে উত্তেজিত হইয়া বলে, কিছুতে নয়, কেন, তাহার ঋণ কি উহারা কিছুই শোধ করিবে না? কুড়িটা বছর এক একজনকে বসাইয়া বসাইয়া খাওয়াইয়াছে সে, তাহার কি কোনই মূল্য নাই? সেও তো কাগজে কলমে একটা মোটা অঙ্কের বিল দিতে পারিত?

উত্তেজনায় হৃষীর আবার কাসি পাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। পাশের জানালাটির মধ্য দিয়া ফিকা প্রভাতী সূচনা উঁকি দিয়া অগ্রসর হইতেছে। আকাশের কয়েকটা উজ্জ্বল তারা গভীর ক্লান্তিতে জাগিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। দু'একটা পাখি সভয় সংকোচে কেবল ডাকি ডাকি করিবে, একটা স্নিগ্ধ শির্‌শিরে হাওয়া আসিয়া মশারিটার গায়ে থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছে। পায়ের কাছের কাঁথাটা নিবিড়ভাবে গায়ে জড়াইয়া হৃষী অনড় শুইয়া রহিল, সম্মুখের দিকে অলস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া আজ তাহার চিন্তা করিতে কেমন অদ্ভুত ভাল লাগিতেছে।......

পঞ্চান্ন বছর। পঞ্চান্ন বছরের পুরাতন জীবনটা। কত দেখিল, কত জানিল, অভিজ্ঞতার বিপুল সঞ্চয় জীবন ভরিয়া আয়ত্ত করিল। মনে পড়ে তাহার চাকুরী জীবনের কথা। সরস্বতীর শুভ কৃপা না-ই বা পাইল কোনদিন, কিন্তু লক্ষ্মী-ঠাকরুণ বিমুখ হইয়াছেন, এমন সে বলিতে পারে না। সামান্য সাত টাকা মাহিনার মুহুরিগিরিতে জীবনের আরম্ভ, কিন্তু তাই বলিয়া নগদ এক'শটি টাকা সে মাসে রীতিমত ঘরে আনিয়াছে। একবার তামাকের ব্যবসা করিয়াই তো দু'হাজার থোকে সে ঘরে তুলিল। আর আজ রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাইয়া গলা ফাটাইয়া আনুক দেখি তিরিশ টাকা ঐ মধু!

হরেন শিয়রে মাথা টিপিতে টিপিতে কিছুক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেদিকে আড়চোখে চাহিয়া হৃষীর মনে যেন কিছুটা করুণার সঞ্চার হইল। হ্যাঁ, ছেলেটা পিতৃভক্ত, একমাত্র এই একটা ছেলেরই পরিচয় দিতে পারে সে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! ইহাকে সে একেবারে বঞ্চিত করিবে না। হৃষীর সংসারে আসক্তি নাই, আর এই কলহসংকুল গ্লানিপূর্ণ নীচতার মধ্যে কাহারই বা বাসের প্রলোভন থাকে? অনেকদিন হইতেই তাহার কাশীবাসের বাসনা, জীবনের শেষ দিনগুলা মিলিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বরের দুয়ারে পূজা অর্চনার মধ্যে কাটাইয়া দিবে। আর কাহারও প্রতি সামান্য মমতা নাই, হতভাগা নির্লজ্জ স্বার্থপরগুলা, খালি এই মেজ ছেলে হরাকে ছাড়া। হৃষীর ইচ্ছা আছে, নিজেদের বার্ধক্যের সম্বল, কাশীবাসের পুঁজিপাটা রাখিয়া বাকী কয়েক শত টাকা

সে হরাকে দান করিয়া যাইবে, পিতার শেষ আশীর্বাদ হিসাবে। হৃষী মনে মনে হিসাবের অংক কষিতে থাকে।

সকালে শ্যামরতন আসিয়া ঔষধটা বদলাইয়া দিল।

ব্রংকাইটিসের নমুনা দেখা গিয়াছে। জ্বর, সাথে সাথে বুকে সামান্য বেদনা, অ্যান্টিফ্লোজেসটিনের প্রলেপ বুকে বাঁধিতে হইবে। ওষুধটা এখনি আনা দরকার, আজ দশ দিনের উপর হইয়া চলিল আর কতো উপেক্ষা করা যায়? শ্যাম গম্ভীর মুখ করিয়া স্টেথেসকোপটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

পাশের ঘরে মধু গুণ গুণ করিয়া একটা সুর ভাঁজিতেছিল। এখনি সে বাহির হইবে জামা কাপড় পরিয়া, গলির মাথায় গিয়াই হারমোনিয়মে সুর সংযোগ করিবে। সসংকোচে মাতা তাহার নিকটে গেলেন, একবার উসখুস করিয়া বলিলেন, কর্তার ওষুধটা যদি একবার এনে দিতিস, একটু তাড়াতাড়ি দরকার কিনা!...

মধু অনাসক্ত কণ্ঠে কহিল, অসম্ভব। আর কাউকে দেখ, আমার এক্ষুণি বেরোন দরকার।

তবু তিনি মিনতি করিয়া জিদ করিতেছিলেন, কিন্তু অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করিয়া মধু সহজ হেলায় হারমনিয়মটা ঘাড়ে তুলিয়া লইল। শুধু বিদায়ের পূর্বে এমন একখানা দৃষ্টি করিয়া চাহিয়া গেল যেন মাজন আর মালিসের দামটা এখনি আদায় করিয়া লইবে!

হরেনকেই বাহির হইতে হইল। গণেশের অফিস সাড়ে নটায়, দুঃসাহস করিয়া কে বলিতে যাইবে? হৃষীর শয্যাপার্শ্বেই তাহার ক্যাসবাক্স, মুখ গম্ভীর করিয়া বালিসের তলা হইতে চাবিটা সে বাহির করিয়া দিল। একমাত্র এই হরাটার জন্যই বোধ করি তাহার এ সংসারে বন্ধন, নইলে এই শত্রুপুরীর মধ্য হইতে এখনি বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে। এমন কুপুত্রও পেটে ধরিয়াছিল উহাদের মা!

হৃষী বালিসের আড়ালে মুখ গোঁজ করিয়া রহিল।

কিন্তু বড় দেরী হইতেছে। ঘণ্টা দুই হরেনের অপেক্ষায় বসিয়া শ্যাম তাহার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। গেল যে গেলই লোকটা আর ফিরিতেছে না।

হরেন সত্যই ফিরিল না। বেলা একটা দুইটা তিনটা বাজিল......

ওদিকে কাসি ভুলিয়া হৃষী ললাটে অবিরাম করাঘাত করিতে লাগিল। জীবনে ভুল করিয়া মাত্র এই ছেলেটাকেই তাহার বাক্সে চাবি লাগাইতে দিয়াছে, আর তাহারই পরিণাম। অসহ্য আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সে ফোঁপাইতে লাগিল—সাত হাজার, কয়েক বছরের সঞ্চয় তাহার শেষ সম্বল নগদ সাত হাজার!

মাথার চুল আজ একটাও বুঝি সে রাখিবে না।

কিন্তু যাই বল, হরেন একেবারে অবিবেচক নয়।

মধুর মাজন আর মালিসের তাগিদ হইতে পিতাকে সে রেহাই দিয়াছে। মুল্যটা বাক্সে রাখিয়া এক টুকরা চিঠিতে জানাইয়াছে এ কথা। কঠিন জীবন সংগ্রামে পীড়িত বলিয়াই বাধ্য হইয়া তাহার এ প্রচেষ্টা, ক্ষমাশীল পিতা যেন ক্ষমা করেন।

ক্ষমা মিলিল কি না কে জানে? কেন না স্ত্রীর গাত্রালংকার বিক্রয় করিয়া হৃষী একদা সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইল। তাহার পর একদিন সত্যই কাসিতে কাসিতে সে কাশীতে মরিয়া গেল।

পাশাপাশি

(৫০ পৃষ্ঠার পর)

আজ যদি কদমের সন্তান হয়—কদম শিহরিয়া উঠিল—না, না তা যেন কখনো না হয়।

কিন্তু কদম যাহা চাহে নাই, তাহাই ঘটিল। একদিন সমস্ত সত্তা দিয়া কদম অনুভব করিল তাহার অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান আসিতেছে—নামহীন গোত্রহীন, পরিচয়হীন। কদম বার বার দেবতার দুয়ারে মাথা খুড়িল—হে ভগবান যে আসিতেছে সে যেন পৃথিবীর আলো না দেখিতে পায়! তাহাতে তাহার পক্ষে ও কদমের পক্ষে দুইপক্ষেরই মঙ্গল। কদম তাহাকে ভালবাসা দিতে পারিবে, বংশ দিতে পারিবে কি? গোত্র দিতে পারিবে কি? চিরদিন চিরলাঞ্ছিত জীবন সে বহন করিবে, আর কদমকে লাঞ্ছনা করিবে। সে রাইচরণকে যতই ভালবাসুক, রাইচরণের সন্তান কোনদিন পৃথিবীর ভালবাসা পাইবে না। অথচ ঐ জমিদারের অনাগত বংশধরটি অবলীলাক্রমেই মান সম্মান, ভালবাসা সমস্তই পাইবে।

কদম জমিদার বাড়ির দিকে একবার ঈর্ষাকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিল। যেন এই ভাবী বংশধরটিই তাহার ভাবী সন্তানের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করিয়াছে। উপরের ঢাকা বারান্দায় জমিদার পুত্র এবং জমিদার বধু বসিয়া হাসিতেছে। এমন অদ্ভুত দৃশ্য কোনদিন কদমের চোখে পড়ে নাই। তাহাদের ভাবী সন্তান তাহাদের মিলনের সেতু হইয়াছে। যে সম্পদে জমিদার বধু তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইল, সেই অভিশাপই কদমকে তাহার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূরে করিয়া দিবে। কদম জানে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে রাইচরণকে আর ধরিয়া রাখা যাইবে না। একটি মাংসপিণ্ডের বদলে রাইচরণকে চিরদিনের জন্য হারাইতে হইবে।

জমিদার বাড়িতে ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খধ্বনি নবজাতকের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। ডাক্তারের দল হাসিমুখে পূর্ণ পকেটে মোটরে আসিয়া উঠিয়া বসিল।

কদমের রুদ্ধ কক্ষে একবার শিশুর ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেলো।

বাহিরের ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে আর কিছু শোনা গেলো না।

পাঁচমিশেলী

—শ্রীপঞ্চক

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হচ্ছেন বিপ্লবী, বাগ্মী, দার্শনিক সৌখীন সাঁতারু। তাঁর Glimpses of World History হচ্ছে প্রথমত চিন্তাশক্তির অনন্যসাধারণ জিম্‌নাষ্টিক—এর বেশী অংশ লেখা গ্রীষ্মপ্রধান (১১২° ডিগ্রি) ভারতের জেলখানায়, যেখানে নেহরু বৃটিশবিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য আট বছর অতিবাহিত করেন; দ্বিতীয়ত পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা যে অংশ সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখে না, সেই এসিয়ার বিষয়ে পড়বার মত উচ্চস্তরের একখানি বই।

লেখক নেহরুর নায়ক হ'চ্ছেন পাঁচজন এবং তিনি তাঁদের সম্পর্কে যত না ব্যক্ত ক'রেছেন, তাঁদের চরিত্র তাঁর সম্পর্কে বরং বেশী ব'লেছেন। তাঁরা যা বলেছেন, তা অত্যন্ত প্রযোজ্য, কারণ নেহরু একজন মহান্ সমসাময়িক এসিয়াবাসী, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবেন তিনি। তাঁর নায়করা হচ্ছেন:

অশোক (ভগবানের বরপুত্র)—খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে তিনি ভারতকে এক সংযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

শঙ্করাচার্য—ধর্মসংস্কারক; খৃষ্টপর ৯ম শতাব্দীর এক মহাপণ্ডিত; মন এবং তর্কবিজেতা হিসাবে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করেন।

আকবর—সেক্সপীয়রের সমসাময়িক; তিনি ছিলেন অত্যন্ত autocratic এবং তাঁর হাতে ছিল অবাধ ক্ষমতা, যা তিনি রাষ্ট্রকে সংযুক্ত রাখায় নিয়োজিত করেন। "এক হিসেবে তাঁকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদিতার জনক বলা যায়।"

লেনিন মহামনীষী; এক চাপ বরফে ঢাকা ধক্‌ধকে আগুন।

গান্ধী—মত ও পথের বৈষম্য ঘটলেও তিনি তবুও নেহরুর নায়ক

তাঁর নায়কদের মত নেহরুও একজন মহামনীষী, দেশের লোকের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং ঠিক তাদের মত নন। কারণ যদিও Glimpses of World Historyতে এসিয়া বিষয়ে জোর দেওয়া আছে, কিন্তু সেই পুরাতন হ্যারোর পড়ুয়া নেহরু নিজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক অসম্পূর্ণ সংমিশ্রণ।

—টাইমস্ (যুক্তরাষ্ট্র)

* * *

ভারতের সঙ্গে অন্যান্য প্রগতিশীল জাতিসমূহের জনসংখ্যা পিছু কৃষি ও শিল্পে আয়ের তুলনা:

দেশ	আয়: শিল্প	কৃষি
আমেরিকা	৯৬৩	১৭৫
কানাডা	৫৪৫	৩৪৪
গ্রেট বৃটেন	৪৬৫	৬২
সুইডেন	৩৭৪	১২৯
জাপান	১৮৫	৮৫
ভারতবর্ষ	১২	৪৮

* * * *

১৯২০ সালের পৃথিবীর যুদ্ধবিশারদরা জাপানের যে অস্ত্রটির কথা শুনে চমকে উঠেছিল, সেই যুক্ত সাবমেরিন ও ট্যাঙ্ক কিন্তু আজও দেখা গেল না। তখন রটেছিল যে, ওদের একটা বিচিত্র দানবীয় যান আছে, জলে ডুবে থাকতে পারে এবং দরকারমত উঠে নিজের ধ্বংসকার্য সমাধা করে আবার জলের তলায় আশ্রয় নিতে পারে।

এমন লোকও আছেন, যাঁরা এই সাবমেরিন-ট্যাঙ্কটিকে সমুদ্র থেকে এক মাইলের দূরত্বে কাজ করতে দেখেছেন বলে হলপ্ করতে পারেন। কতকগুলি গোলা ছোঁড়ে, অবশ্য মহড়া কারণ তখন কোন যুদ্ধ ছিল না, তারপর জলে নেমে ডুবে পড়ে। এ ব্যাপার ঘটে জাপানের উপকূলে।

জুলস ভার্ন, এইচ জি ওয়েলস প্রভৃতির কল্পনায় এ অস্ত্র খাপ খায় বেশী; তবে সত্যিও হ'তে পারে। উড়োজাহাজ ও সাবমেরিন আবিষ্কার হবার বহু পূর্বেই তো জুলস ভার্ন তা কল্পনা ক'রতে পেরেছিলেন।

* * * *

পুরুষদের কাছে জীবনটা খুব মধুময় নয়। যখন জন্মাই, তখন মায়েরা অভিনন্দন পান। যখন বিবাহ করি, তখন বধূ পায় উপহার। যখন মৃত্যু হয়, তখন পত্নীরা পায় বীমার টাকা।

ক্যালগেরী এলবার্টান

* * * *

রাত বারোটা বেজে গেছে। এক মাতালের হাতে হঠাৎ সংবাদপত্রের এক টুক্‌রো এসে পড়লো। তার মধ্যেই ছিল কয়েকটি Wanted এর বিজ্ঞাপন। একটার দিকে বার বার দৃষ্টি বুলিয়ে সে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল এবং একটা ট্যাক্সী নিয়ে বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলো। মস্ত বড় বাড়ি সেটা। মাতাল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে 'কানুনগো মশাই ব'লে বিকট ডাক ছাড়তে লাগলো। তার চীৎকারে সমস্ত পাড়া জেগে উঠল। শেষে সেই বাড়ি থেকে একজন মুখ বাড়ালে।

"অত চেঁচাচ্ছেন কেন, কি চাই আপনার?"

"আপনি অধ্যাপক কানুনগো?"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে?"

আপনার সঙ্গে হিমালয় অভিযানে যাবার সঙ্গীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বলতে এসেছিলুম যে, আমি যেতে পারবো না।"

* * * *

"এ কাপড়ের কত ক'রে গজ?" এক বধির স্ত্রীলোক ফিরিয়ালাকে জিগ্যেস ক'রলে।

"তের আনা।" বললে ফিরিয়ালা।

"সতের আনা! আমি চোদ্দ আনার বেশী দিতে পারবো না।

"আজ্ঞে, আমার দর হচ্ছে তের আনা।"

ওঃ তের আনা! তাহ'লে দশ আনার বেশী দিতে পারবো না।

* * * *

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

শ্রীশিবানী সরকার বি এ

'Economic Planning'এর বাঙলা করা হয়েছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। কিন্তু কেবলমাত্র এই বললে কথাটির অর্থ পরিস্ফুট হয় না। Economic Planning বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়, তাই আমাদের জানা দরকার। সহজ কথায় বলতে গেলে Economic Planning হচ্ছে দেশে যে মাল (goods) ব্যবহারের (consumption) জন্য উৎপাদন করা হবে, কিভাবে তা দেশের লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে এবং কোন্ জিনিস কতটা উৎপাদন করা হবে, তারই একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অবশ্যই এমনভাবে করতে হবে যাতে মানুষের ও সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধন হয়।

এই কথা শুনে কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন এই পরিকল্পনার আবার কি প্রয়োজন। আমাদের যা দরকার, তা তো আমরা পয়সা দিয়ে বাজারেই কিনতে পারছি। আর আমাদের যা যা দরকার, তা ঠিকমত উৎপাদনও হচ্ছে। তবে সমস্ত দেশে কতটা জিনিস উৎপাদন করা হবে, আর কিভাবে তা দেশের লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে, তার এত পরিকল্পনার কি প্রয়োজন? কিন্তু প্রয়োজন আছে। কেবল আমি নিজে এবং আমার চারপাশের আবেষ্টনীর দুচারজন, অর্থাৎ আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি, এই নিয়ে আমার জগত একথা ভাবলে চলবে না। সমস্ত দেশকে এবং দেশের লোককে আমাদের একক (unit) ও সমগ্র (whole) ভাবে চিন্তা করতে হবে। ভাল করে বোঝবার জন্য সমস্ত দেশকে একটা পরিবার বলে ভাবা যাক। সমস্ত দেশের লোককে নিয়ে এই বিরাট পরিবার গঠিত হয়েছে। এখন এই বিরাট পরিবারের মোট আয় কত, তাই আমাদের দেখতে হবে, আর এই আয় পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে, যাতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল সাধন হয়। কিন্তু এই আয়কে শুধু টাকার হিসেবে ভাবলে চলবে না। এই ধাতুর চাকতি ও কাগজের টুকরোগুলোর নিজস্ব মূল্য আসলে কিছু নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের সুবিধার জন্যই এর সৃষ্টি এবং এই জন্যই এর প্রয়োজন। অতি প্রাচীনকালে টাকা নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তখন লোকে জিনিস দিয়ে তার বদলে জিনিস নিত। বেচাকেনা এইভাবেই চলত। এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা থাকায় বেচাকেনার সুবিধার জন্য টাকার আমদানী হ'ল। কিন্তু সমস্ত দেশের আয় এবং এই আয় সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে ভাগ করে দেবার কথা যখন আমরা বলছি, তখন টাকার কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেতে হবে। আমরা যখন আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন বাজারে যাই, টাকা ফেলি আর জিনিস ঘরে আনি। এইভাবেই একটি পরিবারের প্রয়োজন মেটে। সুতরাং একটা পরিবারের আয়ের কথা ভাবতে গেলে টাকার হিসেবে ভাবাই সহজ। কিন্তু সমস্ত দেশের কথা ভাবতে গেলে এভাবে ভাবলে চলবে না। তখন দেশের উৎপন্ন জিনিসের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু শুধু দেশের উৎপন্ন জিনিসের কথা ভাবলেও আবার চলবে না। বিদেশ থেকে আমদানী জিনিসের (imports) কথাও ভাবতে হবে। কারণ এমন অনেক জিনিস আছে, যা হয়তো দেশে তৈরী হতে পারে না, কিংবা দেশে তৈরী করার চেয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করলে লাভ বেশী। অবশ্য এই সমস্ত জিনিসের পরিবর্তে আমাদের দেশের উৎপন্ন জিনিস বিদেশে রপ্তানি করা হবে। এই বিদেশে রপ্তানি করা জিনিস বাদে দেশের উৎপন্ন সমস্ত জিনিস, আর বিদেশ থেকে আমদানী জিনিস নিয়ে দেশের মোট আয়। এই আয় আমাদের সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। এই পরিকল্পনা করবার সময় আমাদের আর একটি দরকারী কথা মনে রাখতে হবে। দেশের উৎপাদন ও বণ্টন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে কোনরকম অপচয় না ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে অপচয় নিবারণ। মানুষের ও সমাজের যতদূর সম্ভব বেশী কল্যাণ সাধন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে যাতে কোন অপচয় না ঘটে, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন কিন্তু খুব বেশী দিন অনুভূত হয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবাধনীতি অর্থাৎ Laisser-faire-এ বিশ্বাসী ছিলেন। এখনও পর্যন্ত অনেক দেশেই অবাধনীতি অন্ততঃপক্ষে আংশিকভাবেও অনুসৃত হয়। প্রয়োজন অনুভূত হলেও খুব কম দেশেই উৎপাদন ও বণ্টন সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা মাত্র তিনটি রাষ্ট্রের নাম করতে পারি, যেখানে অবাধনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে। এই তিনটি দেশ হচ্ছে—জার্মানি, রাশিয়া ও ইটালি। এই তিনটি রাষ্ট্রেই দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অবাধনীতির স্থান এখানে বিন্দুমাত্র নেই। রাষ্ট্রের দ্বারা দেশের উৎপাদন ও বণ্টন সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হয়।

যাই হোক, আমরা দেখেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবাধনীতিতে বিশ্বাস করতেন। অবাধনীতির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এই নীতিতে কোনরকম পরিকল্পনার স্থান নেই। দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্র কোনরকম হস্তক্ষেপ করে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে, নিরপেক্ষ থেকে 'ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার' (Private enterprise) দ্বারা দেশের উৎপাদন ও বণ্টনকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেওয়া। তখনকার দিনে রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ ও অর্থনীতিবিদ্গণ বিশ্বাস করতেন যে, অবাধনীতির অনুসরণের দ্বারাই রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধন হবে। তাঁরা মনে করতেন যে, রাষ্ট্র যদি দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ স্বার্থের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবে, আর এইভাবে আপনা হতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধন হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কি যুক্তি দিয়ে তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাস সমর্থন করতেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। অবাধনীতির সমর্থক যাঁরা, তাঁদের প্রায় সকলেই পুঁজি-তান্ত্রিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজেদের মতবাদ সমর্থন করেন। বস্তুত অবাধনীতি ও পুঁজি-তন্ত্রের স্থান পাশাপাশি। 'পুঁজি-তন্ত্রের' চেয়ে 'ধনিকতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করলেই হয়তো অনেকে বেশী ভাল বুঝতে পারবেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর 'বাঙলায় ধন-বিজ্ঞান' পুস্তকে "Capitalism" শব্দের বাঙলা অর্থ 'পুঁজি-তন্ত্র' দেওয়ায় ঐ শব্দটিই এখানে ব্যবহার করলাম। এখন এই রকম এক পুঁজি-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে, যেখানে অবাধনীতি অনুসৃত হয়, উৎপাদনের কাজ কিভাবে হয়?—উৎপন্ন দ্রব্যের কারবারগুলির কাজকর্মই বা কিরকমভাবে চলে? এই কারবারগুলির আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে অবশ্য পরিকল্পনার স্থান যথেষ্ট আছে। প্রত্যেক কারবারেই কতটা মাল উৎপাদন করা হবে, তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে ঠিক করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের ও সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ

সাধন নয়—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ। প্রতি কারবারের মালিক ও পরিচালকবর্গ পরিকল্পনা করে ঠিক করেন,—কতটা দ্রব্য উৎপন্ন হবে। আর তাঁরা ততটা জিনিসই উৎপাদন করবেন বলে ঠিক করেন এবং উৎপাদন করেনও, যতটা জিনিস উৎপাদন করে বিক্রী করলে তাঁদের হিসেবমত লাভ বা মুনাফা সবচেয়ে বেশী হবে। এই লাভ তাঁরা দু'রকমে করতে পারেন। প্রথমত তাঁরা দাম বাড়িয়ে লাভ করতে পারেন। কিন্তু অবাধনীতির সমর্থকগণের মতে এরকম ভাবে তাঁরা খুব বেশী লাভ করতে পারবেন না। কারণ, অবাধনীতি থাকলে বিভিন্ন কারবারের মধ্যে পরস্পর আড়াআড়ি বা টক্কর (Competition) দেওয়া চলবে, যার ফলে কোন কারবারই দাম বাড়িয়ে লাভ করবার সুবিধে পাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে যে কারবার দাম বাড়াবে, তারই ক্ষতি হবে। ক্রেতারা অন্য কারবারের উৎপন্ন জিনিস সস্তায় কিনে নিয়ে যাবে। তার জিনিস বিক্রী হবে না।

দ্বিতীয় যে উপায়ে কারবারের মালিকেরা লাভ বাড়াতে চেষ্টা করতে পারেন, তা হচ্ছে 'উৎপাদন-খরচা' (cost of production) কমানো। 'উৎপাদন-খরচা' কমানোর মানেই হচ্ছে, উৎপাদন-শক্তি বাড়ানো, অর্থাৎ একই খরচায় আগের চেয়ে বেশী মাল উৎপাদন হবে। কিন্তু উৎপাদন-শক্তি বাড়াতে গেলে উৎপাদনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি (method, process) উন্নততর করতে হবে। পুরানো ও অধুনা অপ্রচলিত কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিসমূহ বর্জন করে তার জায়গায় নূতন ও আধুনিক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আনতে হবে। কেনাবেচা, কারখানার কাজ ইত্যাদি যত দূর সম্ভব সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এর ফলে কি কি লাভ হবে দেখা যাক। প্রথমত, কম খরচায় প্রচুর মাল উৎপন্ন হবে। আর উৎপাদন-খরচা কমাবার সঙ্গে সঙ্গে দাম আরও বাড়িয়ে যে কারবারের মালিক ও অংশীদারেরা খুব লাভ করে নেবে, তাও হতে পারবে না। কারণ, আমরা আগেই দেখেছি যে, অবাধনীতি থাকলেই এক কারবারের সঙ্গে আর এক কারবারের আড়াআড়ি বা টক্কর দেওয়া চলবে, যার ফলে কোন কারবারই দাম বাড়িয়ে লাভ করতে পারবে না। ফলে ক্রেতারা সস্তায় জিনিস পাবে। এই উৎপন্ন জিনিসের প্রাচুর্য ও সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের হ্রাসের ফলে সমাজের ও দেশের একটা মস্ত লাভ হবে। আমরা জানি যে, উৎপাদকেরা ক্রেতার অনুপাতে উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণ ঠিক করেন। আর ক্রেতা বলে গণ্য হয় তারাই যারা নির্ধারিত মূল্যে এই উৎপন্ন জিনিস কিনতে পারে। এর ফলে যাদের উপযুক্ত অর্থবল নেই, (মনে রাখতে হবে তারাই সংখ্যায় বেশী) তারা তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। অনেকে আছে যারা একেবারেই বঞ্চিত হয়। প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হলে আর সঙ্গে সঙ্গে দাম কমলে উৎপাদকের হিসেব মত ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে যাবে। ফলে অনেক লোক যারা উপযুক্ত অর্থসামর্থ্যের অভাববশত আগে জীবনধারণের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে নিজেদের সামর্থানুযায়ী দাম দিয়েই পাবে। এইভাবে সমস্ত দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন হবে।

দ্বিতীয়ত কারবারগুলির পরস্পর আড়াআড়ি বা টক্কর দেওয়ার জন্য প্রত্যেক উৎপাদকই আপন আপন কারবারের উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নততর করতে চেষ্টা করবে। এর ফলে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হবে এবং নূতন নূতন ও উন্নততর শক্তিবিশিষ্ট কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সকল আবিষ্কৃত হবে।

এই হ'ল অবাধ নীতির সমর্থকগণের যুক্তি। এইভাবে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, অবাধনীতি এক সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করবে।

এই যুক্তি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারত। অবাধনীতির অনুসরণের ফলে তখন উপরোক্ত প্রকার ফলও সব পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হতে সুরু করল। কারখানার আয়তন ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিল। ব্যবসায়ীরা ক্রমশ বিপুলায়তন কারবারের সুবিধাগুলি ও তুলনায় বিভিন্ন ছোট ছোট কারবার বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তীব্র আড়াআড়ি বা টক্করের অসুবিধাগুলি সব বুঝতে সুরু করল। ফলে একটির পর একটি করে ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগী কারবারের মধ্যে আড়াআড়ি বা টক্করের তীব্রতা কমে যেতে লাগল।

আবার কতকগুলি নূতন ব্যবসায় ছিল, যাতে আড়াআড়ি বা টক্কর দেওয়া একেবারেই চলতে পারত না। রেলপথ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ডাক, জল ও গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবসায়ের এর মধ্যে পড়ে। ইংরেজিতে এদের বলে Public Utility Services. এই সমস্ত ব্যবসায়ে বিভিন্ন কারবার বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আড়াআড়ি বা টক্কর চললে শুধু অপচয় ছাড়া সমাজের আর কিছুই লাভ হয় না। এই সব ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর একচেটিয়া অধিকার থাকাই যুক্তিযুক্ত কারণ, একমাত্র তাহলেই এই সব ব্যবসায়ের পক্ষে নিম্নতম উৎপাদন খরচায় জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়।

যাই হোক্, কারবারের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমতে লাগল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয় ভাগে কোথাও আংশিক, কোথাও বা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয় ব্যবসায়ের দিকে প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

তখন হ'ল উভয় সংকট। আগের মত পুরাদমে যদি বিভিন্ন কারবারের মধ্যে আড়াআড়ি বা টক্কর চলতে দেওয়া হয়, তাহলে বিপুলায়তন কারবারের সুযোগ-সুবিধাগুলি আর লাভ হয় না আবার বড় কারবারের সুবিধাগুলি পাবার জন্য একচেটিয়া ব্যবসায়কে যদি যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রেতাদের হয় মুস্কিল। কারণ, তাহলে ক্রেতাদের প্রয়োজনের উপযোগী প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হবে না; উৎপন্ন দ্রব্যও আর সস্তায় পাওয়া যাবে না সুলভতা ও প্রাচুর্যের জায়গায় আসবে মহার্ঘতা ও অপ্রতুলতা কারণ, একচেটিয়া ব্যবসায়ে উৎপাদন-খরচা অনেক কমানো যায় এ কথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, কোন প্রতিযোগী না থাকার ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দাম বাড়িয়ে লাভ করবা সুবিধা অনেক বেশী। একচেটিয়া ব্যবসায়ী যে দাম তার ইচ্ছ ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে। কাজেই স্বভাবতই উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ কমিয়ে এমনভাবে দাম বাড়াবার চেষ্টা করে যাতে তার সবচেয়ে বেশী লাভ থাকে। অবশ্য এর অন্যথাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, সরবরাহ কমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে দা বাড়ানোর চেয়ে সরবরাহ বাড়িয়ে দাম কমালেই একচেটিয়া ব্যবসায়ী লাভ অধিকতম হবে। কিন্তু সাধারণত এরকম হয় না। এর ব্যতি ক্রমটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

যদি অল্প কয়েকজন, বড় বড় ব্যবসাদারের মধ্যে প্রতিযোগি চলতে থাকে, অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে প্রবণতাটা য পুরোপুরিভাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণতি লাভ না ক আংশিকভাবে একটা একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবস্থা সৃষ্টি কে তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। একচেটিয়া ব্যবসায় দের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা সাধারণতই একটু তীব্র হয় কারণ, সকলেই চায় সীমাবদ্ধ বাজারের (limited market) যত পারে নিজে অধিকার করতে। কিন্তু একজন ব্যবসায়ীর উৎপ দ্রব্যের সঙ্গে আর একজন ব্যবসায়ীর উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ হিসা প্রায়ই বিশেষ কিছু তফাৎ থাকে না। তখন এই প্রতিযোগিতা যেভা চলতে থাকে, অর্থাৎ যেভাবে প্রত্যেক একচেটিয়া ব্যবসায়ী নিজে নিজের ক্রেতার সংখ্যা বাড়াতে চায়, তা সমাজের পক্ষে অত্য ক্ষতিকর। উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে প্রত্যেকেই চ চটকদার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ক্রেতাদের ভোলাতে: তার ফলে সমাজে

য় কি ক্ষতি হয় দেখা যাক। প্রথমত, এই বিজ্ঞাপনের খরচার দরুণ উৎপাদন-খরচা অত্যন্ত বেশী বেড়ে যায়। আর বিজ্ঞাপনের দরুণ ই যে খরচা, যা উৎপাদন-খরচায় যোগ হয়, তাকে সমাজের মঙ্গলের দিক থেকে দেখলে অপচয় ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কারণ এইভাবে উৎপাদন-খরচা বাড়ার ফলে সমাজের কিছুই লাভ হয় না, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্য গুণ বা পরিমাণ, কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ করে না।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-খরচা এই রকম কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত বেশী বেড়ে যাওয়ার জন্য উৎপাদক তার উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নতর করে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না। কাজেই ক্রেতাদের প্রায়ই বেশী দাম দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হয়।

তৃতীয়ত, Patent Laws থাকার ফলে উৎপাদকেরা প্রায়ই এক-একজন উৎপাদনের এক-একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি, আইনের সাহায্যে নিজেদের একচেটিয়া করে নিয়ে বসে থাকে। সেই বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে তার প্রতিযোগীর কোন অধিকার আইনত থাকে না। এই কারণে সকলেরই উৎপাদন-পদ্ধতিতে এক-একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়; ফলে ক্রেতারা সবচেয়ে ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়।

এই সমস্ত ত্রুটি দূর করবার জন্য একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা যদি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হয়, অর্থাৎ একজোট হয়ে বহুল-উৎপাদন (large scale production)এর সুযোগ-সুবিধাগুলি সমস্ত পাবার চেষ্টা করে, তাহলে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবস্থা আংশিক থেকে সম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হলেও ক্রেতাদের সুবিধা না হওয়াই সম্ভব। কারণ, আমরা আগেই দেখেছি যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ী তার যে দাম ইচ্ছা ক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে; আর সাধারণত সে চেষ্টা করে সরবরাহ কমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে দাম বাড়িয়ে বেশী লাভ করে নিতে।

অবাধনীতির সবচেয়ে বড় ত্রুটির কথা কিন্তু এখনো বলা হয় নি। অবাধনীতিতে বেকার-সমস্যার কোন সমাধান ত নেই-ই, উপরন্তু এই নীতির অনুসরণকালে সমস্যা আরও বেশী প্রবল হয়ে ওঠে। বস্তুত, অবাধনীতি ও বেকার-সমস্যার স্থান পাশাপাশি বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবাধনীতির সমর্থকগণ অবশ্য অনেক যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, এ কথা সত্য নয়—অবাধনীতির অনুসরণের ফলে বরং বেকার সমস্যার সমাধানই হয়। তাঁরা বলেছেন যে, অবাধনীতি থাকলে মজুর বা শ্রমিকদের মধ্যেও পরস্পর তীব্র আড়াআড়ি বা টক্কর দেওয়া চলবে। পরস্পরের মধ্যে এই আড়াআড়ি বা টক্করের দরুণ মজুরেরা তাদের কাজের দাম কমাতে বাধ্য হবে, অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হবে। মজুরির হার এত বেশী কমে যাওয়ার ফলে নিয়োগকর্তার পক্ষেও সমস্ত কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছু মজুরকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে।

অবাধনীতির সমর্থকগণের এই যুক্তি কিন্তু কার্যত সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। মজুরির হার যতদূর সম্ভব নিম্ন হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগকর্তাদের পক্ষে সমস্ত কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছু মজুরকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ এমন কোন সাধারণ মজুরির হার (wage-level) নেই, যাতে নিয়োগকর্তার পক্ষে সমস্ত কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছু মজুরকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব। তাই কাজ করবার শক্তি ও ইচ্ছা দুই-ই থাকা সত্ত্বেও অনেকেই কাজ পায় না। এবং যদিও অবাধনীতির সমর্থকেরা এই বেকার অবস্থাকে 'স্বেচ্ছাকৃত' বলেই বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এই বেকার অবস্থা যে অনিচ্ছাকৃত, তাতে কোন ভুল নেই। কারণ দেখা গেছে যে, মজুরির যা প্রচলিত হার, সেই হারে, এমনকি, তার চেয়েও কম মজুরিতে কাজ করতে চেয়েও অনেকে কাজ পায় না।

এই সমস্ত কারণে অবাধনীতির অকার্যকারিতা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠায়, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির (planned economy) জন্য চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (planned economy) বলতে কি বোঝায়, তাই দেখাতে গিয়ে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ G. D. H. Cole বলেছেন,—

"The conception of a planned economy remains, however, so far vague and ambiguous. . . . . . . One set of planners regards planning as a means of so reorganising capitalism as to give it a new lease of life, while another looks to it as a means of replacing capitalism by social ownership and operation of industry."

অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির অর্থ এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক রয়ে গেছে। একদল পরিকল্পনাবিদের মতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রকেই নূতনভাবে ঢেলে সাজিয়ে নূতন রূপে প্রকাশ করা। আরেক দলের মতে আবার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি আর কিছু নয়,—পুঁজিতন্ত্রকে বাতিল করে রাষ্ট্রের হাতে ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পগুলির মালিকানা স্বত্ব ও পরিচালনাভার দেবার উপায় মাত্র।

পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার পক্ষে যাঁরা মত প্রকাশ করেন, তাঁদের মতে প্রত্যেক ব্যবসায় বা শ্রমশিল্পকে একটি সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে আনা উচিত। এই রকম প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, যার কর্তৃত্বাধীনে কোন একটি ব্যবসায় বা শ্রমশিল্প রয়েছে, সেই শ্রমশিল্প বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক কারবারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। এই প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নীতি অনুসারেই সেই ব্যবসায় বা শ্রমশিল্পকে চলতে হবে। কিন্তু ক্রেতাদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই জন্য রাষ্ট্রের হাতেও কিছুটা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু এই রকম ব্যবস্থায় ক্রেতাদের সুবিধা না হয়ে অসুবিধাই হবে বেশী। কারণ এইভাবে গঠিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ কমিয়ে দাম বাড়ানোর দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকবে। মনে রাখতে হবে, এই পরিকল্পনায় পুঁজিতন্ত্রকেই নূতনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা এখনও পুঁজিতান্ত্রিকের মনোভাব নিয়েই কাজ করবে। পুঁজিতন্ত্রে আমরা জানি ব্যবসায়ীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে লাভ। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আর যদি সরবরাহ কমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে দাম বাড়িয়েই ব্যবসায়ীর লাভ হয়, তবে রাষ্ট্রের এমন শক্তি নেই যে, তাকে জোর করে উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করে। সুতরাং এক্ষেত্রে বরং একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সুবিধাই হবে। পরস্পরের মধ্যে কোন রকম প্রতিযোগিতা না থাকার ফলে তারা এখন একজোট হয়ে একচেটিয়া ব্যবসায়কে আরো শক্তিশালী করে তুলবে—আর সেই সুযোগে ক্রেতাদের বঞ্চিত করে আরো বেশী লাভ করে নেবে। এর প্রতিকার করবার শক্তি রাষ্ট্রের নেই, কারণ, রাষ্ট্রই এই সব একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ীই রাষ্ট্রের কর্মনীতি নির্ধারিত হবে। এইভাবে দেশের শাসনতন্ত্রের (Government)এর পৃষ্ঠপোষকতায় একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে এবং জনসাধারণ আরো বেশী বঞ্চিত হবে।

পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার আর একটি মস্ত ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনরকম যোগ স্থাপন করা হয়নি। বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ের মধ্যে দেশের মোট জাতীয় সম্পদ (national resources) ভাগ করে দেবার সময় কোনরকম আন্তঃ-ব্যবসায় পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া হবে না। এর ফলে জাতীয় সম্পদ অনেক অপচয় হবে এবং রাষ্ট্রের

ও সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধন ও আর্থিক উন্নতি হ'তে পারবে না।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার যাঁরা সমর্থক, তাঁদের যুক্তির মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গেছে। অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাকে যথার্থ কার্যকরী করতে গেলে তার পরিচালনা-ভার এমন কোন কর্তৃপক্ষের হাতে দিতে হবে, যার মূলে লক্ষ্য লাভ করা নয়, যার লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজন উপযোগী প্রচুর জিনিস উৎপাদন করা। কারণ, যতদূর দেখা গেছে, বাহিরের কোন শক্তি কর্তৃক কোন ব্যবসায় বা শ্রমশিল্পের আভ্যন্তরীণ নীতি পরিচালিত হতে পারে না। যদি প্রাচুর্যই আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে ব্যবসায়ের যারা যথার্থ মালিক ও পরিচালক, তাদেরই নীতি হওয়া উচিত প্রচুর জিনিস উৎপাদন করা। কারণ, যদি এ নীতি তাদের না হয়, তবে বাহিরের কোন শক্তি জোর করে তাদের ঘাড়ে প্রাচুর্যের নীতি চাপাতে পারে না এবং চাপালেও ভাল ফল পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

তাহলে দেখা গেল যে, ব্যবসায় বা শ্রম-শিল্পের আভ্যন্তরীণ নীতি হওয়া উচিত প্রচুর জিনিস উৎপাদন করা। এর থেকে এই বোঝায় যে, শ্রমশিল্পগুলি অতঃপর নিঃস্বার্থভাবে পরিচালিত হবে; কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে পরিচালকদের স্বার্থ ক্রেতাদের স্বার্থেরই অনুরূপ হবে। কিন্তু তা হতে গেলে হয় রাষ্ট্রের নিজেরই হাতে শ্রমশিল্পগুলির পরিচালনার ভার নিতে হবে, নয়তো এমন-সব লোকের হাতে পরিচালনার ভার দিতে হবে যারা ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা না করে জনসাধারণের স্বার্থের উন্নতি যাতে হয়, সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু এর দ্বারা ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় একেবারে মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রকে একরকম উচ্ছেদই করা বোঝাবে।

এইখানেই আসছে Socialist বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কথা। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সমর্থনকারী যাঁরা, তাঁরা বলেন যে, অপচয় যতদূর সম্ভব কম করে উৎপাদনের কাজ যতদূর সম্ভব ভালভাবে করতে গেলে একটি 'আন্তঃ-ব্যবসায় পরিকল্পনার' বিশেষ প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক পৃথক পৃথক ব্যবসায়ের জন্য একটি করে এড-হক বোর্ড থাকবে। সমষ্টিগতভাবে সমস্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় শক্তি থাকবে, যার স্বার্থ হবে ক্রেতাদের স্বার্থের অনুরূপ।

এই নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্দেশ্য হবে জাতীয় সম্পদগুলি (national resources) বিভিন্ন ব্যবসায় বা শ্রম-শিল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে বণ্টন করে দেওয়া। সবচেয়ে ভালভাবে বণ্টন করে দেওয়া বলতে বোঝাচ্ছে—এমনভাবে বণ্টন করে দেওয়া যাতে অপচয় সবচেয়ে কম ও উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয় এবং জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা অধিক আর্থিক উন্নতি হবে। এই কেন্দ্রীয় শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত কার্যতালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক এড্‌হক্ বোর্ডকে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই রকম কোন ব্যবস্থা করতে গেলেই রাষ্ট্রের নিজেরই হাতে শ্রমশিল্পগুলির মালিকানাস্বত্ব ও পরিচালন ভার গ্রহণ করতে হবে। কারণ এই নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় শক্তির যা কাজ তা একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব। এই রকম এক কেন্দ্রীয় শক্তি, যার স্বার্থ হবে ক্রেতাদের স্বার্থেরই অনুরূপ, রাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

যখন রাষ্ট্রের হাতে শ্রমশিল্পগুলির মালিকানাস্বত্ব ও পরিচালন ভার দিয়ে ব্যাপকভাবে এক পরিকল্পনার আয়োজন আমরা করছি তখন অন্য কয়েকটি বিষয়ও আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। উৎপাদনের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যবহারেরও' (consumption) একটি পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বর্তমানে যে চাহিদা ক্রেতাদের পক্ষ থেকে আসছে তাকেই চরম বলে ধরে নেওয়া হয়। এই চাহিদা অনুযায়ীই ব্যবসয়ীরা উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই চাহিদা কখনই চরম হ'তে পারে না। কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে, ব্যবসায়ীর নির্ধারিত মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য কেনবার সামর্থ্য যাদের আছে তারাই ক্রেতা বলে গণ্য হয়। আর আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আয়ের বৈষম্য অত্যন্ত বেশী। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যে রাষ্ট্র শ্রমশিল্পগুলির পরিকল্পনা করছে, সে রাষ্ট্র কখনই বর্তমান আয়-বণ্টনকে (Distribution of income) ও এই আয়-বণ্টনের ফলে উৎপন্ন চাহিদাকে চরম এবং পরম বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাকে দেখতে হবে, আয়বণ্টন ও চাহিদার গঠন অন্য রকম করলে সমাজের অধিকতর মঙ্গলসাধন হবে কিনা এবং কি রকম পরিবর্তন করলে সমাজের সবচেয়ে বেশী মঙ্গলসাধন হবে। তাকে দেখতে হবে দেশের তথা জনসাধারণের কতটা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন অনুযায়ীই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ঠিক করতে হবে; বর্তমান বৈষম্যমূলক আয়-বণ্টন হ'তে উৎপন্ন চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ঠিক করলে চলবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। বর্তমান চাহিদার গঠনে পরিবর্তন আনতে গেলে বর্তমান আয়বণ্টনকেই সংশোধন করতে হয় এ আমরা দেখেছি। এখন কথা হচ্ছে এই যে বর্তমান বৈষম্যমূলক আয় বণ্টনের এই সংশোধনকে পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা। এক রকম যে উপায়ে রাষ্ট্রের পক্ষে এ রকম সম্ভব তা হচ্ছে বড়লোকদের ঘাড়ে বেশী করে করের বোঝা চাপানো। বড়লোকদের কাছ থেকে কর হিসাবে টাকা আদায় করে সেই টাকা সমাজহিতৈষী নানা কাজে ব্যয় করে ও প্রয়োজন অনুযায়ী গরীবদের বণ্টন করে দিয়ে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আয়বণ্টনের কতকটা প্রতীকার করতে পারে। কিন্তু এরও অনেক মুস্কিল আছে। বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বড়লোকেরাই ব্যবসায় বা শ্রমশিল্প-গুলির পুঁজিপাটা বা মূলধন জুগিয়ে থাকেন। ব্যবসায় বা শ্রমশিল্পগুলির মালিকানাস্বত্বও এই সমাজে তাঁদেরই হাতে। যা তাঁদের ঘাড়ে খুব বেশী করের বোঝা চাপানো হয় তাহ'লে স্বভাবত তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সংকুচিত হবে। কর হিসাবে তাঁদের পকেট থেকে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে। কাজেই পুঁজিপাটার পরিমাণও ক্রম হ্রাস পাবে। ফলে, উৎপাদনের পরিমাণ আগের চেয়ে কম হবে সুতরাং দেশের মোট আয় কমে যবে। এই ভাবে সমস্ত দেশে আর্থিক অবনতি ঘটবে। কিন্তু এই ত্রুটী দূর করতে গিয়ে যা আবার করের বোঝা কমিয়ে মধ্যম রকম করে দেওয়া হয় তবে বর্তমা বৈষম্যমূলক আয়বণ্টনের বিশেষ কিছুই প্রতীকার করা হয় না।

বড়লোকদের কাছ থেকে কর আদায় করা ছাড়াও আর এক রব যে উপায়ে এই বৈষম্যমূলক আয় বণ্টনের কতকটা প্রতীকার রাষ্ট্রে পক্ষে করা সম্ভব তা হচ্ছে মজুরির নিম্নতম হার নির্দিষ্ট ক দেওয়া। কিন্তু এরও অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, মজুরি হার বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক হওয়ায় যে জাতীয় ব্যবসাগুলিতে কলকা খানার চেয়ে মজুরদের কাজ বেশী তাদের উৎপাদন-খরচা অন্য ব্যবসাগুলির তুলনায় বেড়ে যাবে। তার ফলে যে সব ব্যবসা মজুরদের কাজ বেশী তাদের দিকে কর্মপ্রচেষ্টা (enterprise) হ্র পেয়ে যে সব ব্যবসায়ে কলকারখানার কাজ বেশী তাদের দিকে ক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, পুঁজিপতিরা (Capitalists) স্বভাব যেদিকে তাদের বেশী লাভ হবে সেইদিকে কর্মপ্রচেষ্টা বাড়া চেষ্টা করবে। এইভাবে সমস্ত দেশের বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পা দ্বিতীয়ত, যে সব দেশে এই প্রথা নেই তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগু তুলনায় দেশের ব্যবসায়গুলির উৎপাদম-খরচা স্বভাবতই বেশী হ ফলে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক গোলমাল হ'তে পা

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্প

সঙ্গে খাপ খাইয়ে বর্তমান বৈষম্যমূলক আয়বণ্টনের সংশোধন সম্ভব নয়। এখন দেখা যাক, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় 'ব্যবহারের' কি রকম পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং বৈষম্যমূলম আয়বণ্টনেরই বা কিভাবে প্রতিকার করা হয়েছে। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় 'অনুপার্জিত আয়ের' (unearned income) কোন স্থান নেই। বর্তমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই অনুপার্জিত আয়ের প্রাধান্যের জন্যই ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধনবৈষম্য দিনের পর দিন এত বেশী বেড়ে চলেছে। পিতা সম্পত্তি রেখে গেলেন পুত্রের জন্য—সেই পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির আয়ে পুত্র তার আলস্যপূর্ণ বিলাসের জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়ে দিল। কাজ কারবার তার প্রয়োজনই হ'ল না। তার ছেলেরও হয়তো সেই রকম ভাবেই দিন কাটল। এই রকম চলেছে পুরুষের পর পুরুষ। ওদিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের সমস্ত শক্তি সমাজের সেবায় ব্যয় করেও তারা একজন হয়তো দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছে না। তার ছেলেমেয়েরা অনাহারে অর্ধাহারে, দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছে; শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার সুযোগও তারা পাচ্ছে না। এই রকম চলেছে পুরুষের পর পুরুষ। ফলে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আয়বণ্টনের বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এর প্রতীকার সবার আগে করা হয়েছে অনুপার্জিত আয়কে রহিত করে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কিছু না কিছু এমন কাজ করতে হবে যা সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন। অবশ্য শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল, অকর্মণ্য ব্যক্তি যে কাজ করতে অপারগ, এদের বাদ দিয়ে বলছি। শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ, সমস্ত দেশের আশা ভরসা; সুতরাং তারা কাজ করতে না পারলেও তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সবার আগে মেটাতে হবে। বৃদ্ধেরাও অতীতে সমাজের সেবায় তাদের অনেক শক্তি ব্যয় করেছে; কাজেই বৃদ্ধ বয়সে কাজ করতে অপারগ হ'লেও তাদের সব প্রয়োজনই সমাজকে মেটাতে হবে। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ হ'লেও তাকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই তার জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় যা কিছু তাও সমাজকেই দিতে হবে।

এখন কিভাবে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত দেশের লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে দেখা যাক। জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য দ্রব্য যা কিছু—যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসের উপযুক্ত গৃহ ইত্যাদি সকলকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন শুধু জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য যা কিছু তা পেলেই মিটে যায় না। তার প্রয়োজন আরও বেশী। এর মধ্যেও আবার এমন কতকগুলি জিনিস থাকতে পারে যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য না হ'লেও যাদের সম্বন্ধে সকলের রুচি অভিন্ন তাদের বেলাতেও ঐ একই উপায় অবলম্বন করা চলবে। কিন্তু এমন জিনিস আছে যাদের বেলায় মানুষের রুচি পরস্পরের থেকে বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজনের রুচির সঙ্গে আর একজনের রুচি মেলে না। সেগুলি কিভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে? নিশ্চয়ই সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া চলবে না। ধরা যাক্ আমরা কয়েকজন মানুষ আছি। আমরা কেউ পছন্দ করি মোটর গাড়ি, কেউ বা গান ভালবাসি—কারু চাই একটা পিয়ানো, কারুর বা আছে ফুলের সখ, আবার কারুর গোটা কয়েক নভেল হ'লেই চলে যায়। আমাদের মধ্যে যে মোটর গাড়ির ভক্ত সে হয়তো গান বা ফুল দুচক্ষে দেখতে পারে না নভেলও পড়তে ভালবাসে না। যে গান ভালবাসে সে হয়তো মোটর গাড়ি চড়তে বা নভেল পড়তে ভালবাসে না, ফুলেরও সখ নেই। এই রকম অবস্থায় এই সব জিনিস দেশে যত লোক আছে, সেই হিসাবমত তৈরী করে' সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়াটা কি ঠিক হ'বে? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি—হবে না। কারণ এর ফলে অনেক অপচয় হবে। প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হবে অথচ কাজে লাগবে না। কারণ, যার যে জিনিস প্রয়োজন নেই বা যাতে তার রুচি নেই, সে সেই জিনিস নিয়ে করবে কি? সুতরাং এদের বেলায় অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সকলেই নিজ নিজ রুচি ও পছন্দমত জিনিস নির্বাচন করে' নিতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সমীচীন হবে এ সব জিনিসের মূল্যে নির্দ্ধারণ করে দেওয়া ও চাহিদা অনুযায়ী জিনিস উৎপন্ন করা। দেশের লোককে জিনিস না দিয়ে তার বদলে দেওয়া হবে টাকা; সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের রুচি ও পছন্দমত জিনিস নির্বাচন করে কিনবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাতেও টাকার প্রয়োজন একেবারে চলে যায় না। বরং যে সব রাষ্ট্র প্রগতিশীল ও দেশের লোকের মানসিক উন্নতি সাধনে তৎপর তারা এর সাহায্যে আরও একটু কাজ করতে পারে। যে সব জিনিস লোকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, যেমন মদ, তামাক ইত্যাদি, তাদের দাম খুব বেশী করে' দিয়ে রাষ্ট্র তাদের ব্যবহার কমাবার চেষ্টা করতে পারে। আবার যে সব জিনিস দেশের লোকের মানসিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে—যেমন ভাল ভাল বই, তাদের দাম খুব কম করে দিয়ে রাষ্ট্র তাদের ব্যবহার বাড়াবার চেষ্টা করতে পারে। এই রকম করে রাষ্ট্র দেশের লোকের রুচি ও চরিত্র গঠনেও সাহায্য করতে পারে। এইভাবে দেশের লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্ন জিনিস তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা সমাজের সেবায় উৎসৃষ্ট কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষের মাত্রার অনুপাতে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু কাউকেই এত বেশী পেতে দেওয়া হবে না, যাতে আবার নূতন করে একটা শ্রেণী-বিভাগের সৃষ্টি হতে পারে।

এই ত গেল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কথা। আগেই আমরা দেখেছি যে, মাত্র তিনটি রাষ্ট্রে অবাধনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিকে (planned economy) স্থান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়াতে চেষ্টা করা হয়েছে কতকটা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করবার। কিন্তু অন্য দুটি রাষ্ট্র যথা জার্মানী ও ইটালীর আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা মূলত বিভিন্ন। কোন কোন বিষয়ে অবশ্য ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনা, যা জার্মানী ও ইটালীতে অনুসৃত হয়েছে, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কতকটা মিল আছে। কোন কোন বিষয়ে আবার পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার সঙ্গেও ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার মিল আছে। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে হয়ত ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনাকে এই দু'য়ের মাঝামাঝি এক রকমের পরিকল্পনা বলে ধরা যায়। কিন্তু কয়েকটি মূল বিষয়ে উভয়ের সঙ্গেই ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার পার্থক্য বিদ্যমান। এইখানেই ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার বিশেষত্ব।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার মিল এইটুকু যে, উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সংগঠনা একটি কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এরকম হতে পারে না। পুঁজিতান্ত্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার মিল এই যে, উভয় প্রকার পরিকল্পনাতেই পুঁজিতন্ত্র ও শ্রেণী বিভাগের স্থান আছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাতে পুঁজিতন্ত্র ও শ্রেণী বিভাগকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু আসল যে জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয় প্রকার পরিকল্পনার সঙ্গেই ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার পার্থক্য, যার জন্য ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার উপর একটি বিশেষত্ব আরোপিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে প্রথমোক্ত উভয় প্রকার পরিকল্পনাই শান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের ভিত্তির উপরে। ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধন নয়, এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত জাতিকে যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলা, যাতে ভবিষ্যতে সেই জাতি সাম্রাজ্য বাড়িয়ে রাষ্ট্রের

দেশ

গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা রকম যুদ্ধের উপকরণ তৈরী হ'তে থাকে। দেশের লোকের পরিশ্রম ও দেশের সম্পদের বেশীর ভাগই অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণের কাজে ব্যয়িত হয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপকরণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস কাজেই স্বভাবতই আগের চেয়ে কম উৎপন্ন হয়। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণের কাজে অনেক মজুর লাগে, সুতরাং মজুরদের কাজের অভাব হয় না। ধনিক সম্প্রদায়ও বেশ সন্তুষ্টই থাকে। ধনিক ও শ্রমিক উভয় দলই রাষ্ট্রের কর্মচারী মাত্র—তাদের মধ্যে কোন রকম বিবাদ হ'লে রাষ্ট্রই তা মিটিয়ে দেয়। যতদিন পর্যন্ত এই রকম কাজ চলে ততদিন বেকার সমস্যা থাকে না অথবা থাকলেও এত কম যে ধর্তব্যর মধ্যে নয়। কিন্তু মুস্কিল হয় তখন যখন প্রচুর যুদ্ধের উপকরণ তৈরী হয়ে যায়। মজুরদের তখন আর কাজ থাকে না,—বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় তখন যুদ্ধ করা। আর আমরা আগেই দেখেছি যে এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। ফ্যাসিষ্ট পরিকল্পনাকে সুতরাং একটি সাময়িক (temporary) পরিকল্পনা বলা যেতে পারে—বিশেষভাবে যুদ্ধ ও তার আগের সময়ের উপযোগী। যে জাতি ও রাষ্ট্র জানে যে নিকট ভবিষ্যতে তাদের যুদ্ধ করতে হবে এবং যোদ্ধা জাতি হিসাবে নিজেদের অজেয় করে তুলে জাতি ও রাষ্ট্রের গৌরব বাড়াতে চায় তাদের পক্ষে এই পরিকল্পনা বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে এই পরিকল্পনারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তখন শান্তির সময়ের উপযোগী করে' নূতন রকম পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। অন্যথা ভবিষ্যতে তাকে আবার যুদ্ধ করতে হবে; কারণ আমরা এইমাত্র দেখেছি যে এই পরিকল্পনার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল যুদ্ধ।

কোন কোন জাতির ইতিহাসে এমন সময় আসতে পারে যখন যুদ্ধ করাটা তাদের পক্ষে একান্ত দরকার হয়ে পড়ে; পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ না করলেই তাদের চলে না। তখন সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য ফ্যাসিষ্ট পরিকল্পনার মত কোন পরিকল্পনার আশ্রয়ে তারা নিজেদের যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এক সময় না এক সময় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই,—চিরকাল কখনই যুদ্ধ চলতে পারে না। তখন আমাদের এমন পরিকল্পনা করতে হবে যাতে সকলের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। কারণ সমস্ত মানুষ যাতে বেশ ভালভাবে আরামে থাকতে পারে, এই আমরা শেষ পর্যন্ত সকলেই চাই। পৃথিবীতে যন্ত্রযুগের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা অনেক এসেছে। অল্প পরিশ্রমে যাতে প্রচুর জিনিস উৎপন্ন হতে পারে এমন অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরো নূতন নূতন যন্ত্র ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু মানুষের শ্রম লাঘব করবার এত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন সত্ত্বেও মানুষের পরিশ্রমের কিছুমাত্র লাঘব আজ পর্যন্ত হয়নি। উপরন্তু নূতন যে সমস্যা দিনের পর দিন তার বিশ্বগ্রাসী মূর্তি নিয়ে প্রকট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে বেকার সমস্যা। অতীতে, যখন মানুষ সভ্য ছিল না, বনে বনে শিকার করে যখন তাকে ক্ষুধার অন্ন জোটাতে হ'ত তখনও বোধ হয় তাকে এত অনাহারে থাকতে হ'ত না। আর আজ এই সভ্যতার চরমোৎকর্ষের দিনে আহার পাওয়াটাই মানুষের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের উপকরণ তৈরী করবার জন্য যতটা কাজ করা প্রয়োজন, সেই কাজ যদি সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, তবে প্রত্যেকেই অল্প সময় মাত্র কাজ করে' প্রচুর অবসর ভোগ করতে পারে। কেবলমাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম আর কাউকে করতে হবে না। আর এইভাবে উৎপন্ন সমস্ত জিনিস যদি সবাইকার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায়, তা হ'লে সকলেই বেশ আরামে ও ভালভাবে থাকতে পারে। খাওয়াপরার ভাবনা কারো থাকবে না অবসরও প্রত্যেকেরই থাকবে প্রচুর। এই অবসর সময় সে নানাভাবে কাজে লাগাতে পারে। কেউ শিল্প, কেউ ভাস্কর্য কেউ সাহিত্য কেউ বা সংগীতের চর্চা করতে পারে। কেউ বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মেতে বিজ্ঞানের নূতন নূতন উন্নতি সাধনে তৎপর হয়ে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধিকে আরো বাড়াতে এবং মানুষের সভ্যতাকে আরো অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে পারে। কত সেক্সপীয়র, কত রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের মধ্যে জন্মাবেন। কত বেঠোফেন, কত মোৎসার্ট তাঁদের সংগীতের সুধাধারায় সমস্ত জগত প্লাবিত করে দেবেন। কত অজন্তা, কত তাজমহলের নূতন নূতন শিল্পচাতুর্যে পৃথিবী অলংকৃত হবে। কত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের সভ্যতা তার অগ্রগতির পথে নব নব অভিযান চালাবে। মানুষের নৈতিক বোধ ও চারিত্রিক সবলতাও এখনকার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হবে। কারণ দারিদ্র্য ও অভাবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের নীতিবোধকে শিথিল করে। বর্তমানে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের যে ধ্বংসলীলা চলেছে, তার দিকে তাকালে চমকে উঠতে হয়। পৃথিবীর কত সম্পদ, মানুষের কত পরিশ্রমই না অযথা অপচয় হচ্ছে। কত মূল্যবান প্রাণই না অকালে নষ্ট হচ্ছে। এ না হলে মানুষের সভ্যতা আজ কত উন্নত হতে পারত! কে জানে এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়েই আমাদের নূতন পৃথিবী জন্ম নেবে কি না। মহাপ্রলয়ের অন্ধকারে ভেদ করে কবে নূতন সূর্যের আলোকরশ্মি দেখা দেবে কে জানে। সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় আমরা থাকব।
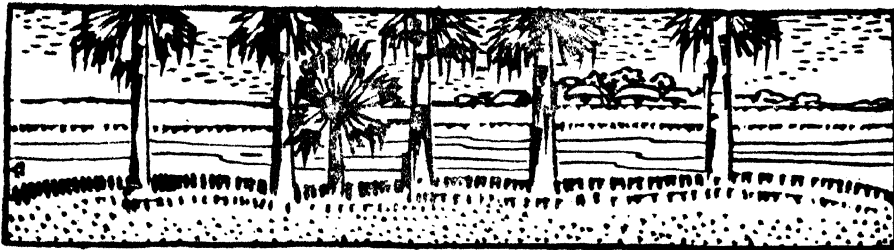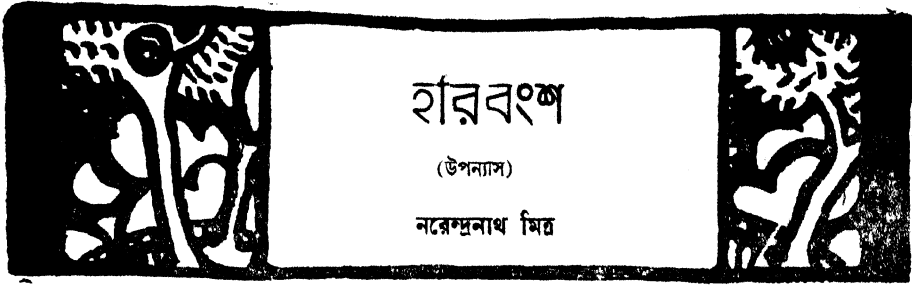
৪

পুরানো বাড়ির বড় পুকুরটার থাকার মধ্যে এখন শুধু কেবল পৌরাণিক কিংবদন্তীই আছে। বর্ষার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় জল খুব সামান্যই থাকে। আর জলের চেয়ে বেশী থাকে বড় বড় পানা। তাছাড়া মেয়েদের ব্যবহারের উপযোগিতাও আর এ পুকুরের নেই। বসতি সরে গেছে পশ্চিমের দিকে। পুবের দিকটা আজকাল একেবারেই ফাঁকা দেখায়। পুব-পারে গদাই সা'র বাড়ি তবু খানিকটা আরুর কাজ করত। কিন্তু ক' বছর হোল শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে সেও উঠে গেছে এখান থেকে. যাওয়ার সময় ঘরখানা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গেছে। শোনা যায়, আগেই ও পাড়ার হরেণ বোসের নামে ভিটা সে কওলা ক'রে দিয়ে টাকা নিয়ে রেখেছিল। এখন পুকুরঘাট থেকে সোজাসুজি একেবারে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নতুন রাস্তা চোখে পড়ে, আর তার পর দেখা যায় মাঠ।

পুকুরটা পাড়ার মধ্যে সুবলের স্ত্রী মঙ্গলারই বেশী কাজে লাগে। ময়লা কাপড়-চোপড় কাচবার জন্য পনের-কুড়িখানা বাড়ি ডিঙিয়ে তাকে আর খালের ঘাটে যেতে হয় না। অনেকদিন এই পুকুরে সে কোন রকমে স্নানটাও সেরে নেয়। মঙ্গলার এই সুবিধার জন্য আজকাল অনেকেরই চোখ টাটায়। তার দেখাদেখি বনবাদাড় বাঁশঝাড় ভেঙে নিধিরাম সা'র বাড়ির বউরাও ইদানীং এ পুকুরে আসতে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু যেটুকু জল আজকাল এ পুকুরে থাকে তা বলতে গেলে মঙ্গলার জন্যই। শুকনোর সময় মঙ্গলাই ঘরদোর নিকোবার জন্য এই পুকুর থেকে মাটি কেটে নেয় ঝাঁকা ভরে ভরে। সেই সব গর্তের মধ্যেই যা জল এক-আধটু থাকে। কিন্তু এই মাটি নেওয়ার জন্যও কি কম ঝগড়া ক'রতে হয় পুরান বাড়ির সোনাখুড়ির সঙ্গে! সোনাখুড়ির চাইতে তার মেয়ে 'আলতা' হয়েছে আরও এক কাঠি বাড়া। পুরান বাড়িতে এখন এই মা আর মেয়েই আছে. আর তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে এই পুকুর। পুকুরের অংশ আছে সুবলেরও। অথচ সোনাখুড়ি আর আলতার ভাবভঙ্গিতে মনে হয় পুকুরটা যেন একা তাদেরই। বহুদিন মঙ্গলা সুবলকে বলেছে—এ ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ফেলতে। এত মামলা মোকদ্দমা বোঝে সুবল, এতজনকে এত পরামর্শ দেয়, এটুকু কি আর পারে না; কিন্তু সুবলের যেন জেদ আছে একটা।—মঙ্গলা যা বলবে তা সে কিছুতেই শুনবে না। বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলে, 'এমন কুজরা মেয়ে মানুষ তো আর দেখিনি?—তোর পরামর্শ মত কি নিজের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে মামলা করতে যাব, না, ছাইটুকু নিয়ে গোবরটুকু নিয়ে কামড়া-কামড়ি করব মেয়ে মানুষের মত।—বড় ছোট প্রাণ তোদের এই মেয়েমানুষ জাতের।'

এদিকে সুবলের হৃদয়ও যে কত উদার, আঠার বছর একসঙ্গে ঘর করবার পর মঙ্গলার তা জানতে বাকি নেই। এ সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে সুবল যে তার বিধবা খুড়ির সঙ্গে তেমন ঝগড়াঝাটি করে না কিংবা মঙ্গলার সঙ্গে সোনা-খুড়ি কি আলতার ঝগড়া বাঁধলে সে যে অনেক সময় সোনাখুড়ির পক্ষেই উদারভাবে সায় দেয়, মঙ্গলা জানে, এ তাকে জব্দ করবার জন্যই। মঙ্গলা এও দেখেছে, ঝগড়ার জন্য অনেক সময় সুবলই তাকে উস্‌কিয়ে দিয়ে পরে দূরে সরে দাঁড়ায়। দশজনের সামনে তাকে ছোট ক'রে, খাট ক'রে দিয়ে নিজের মহত্ত্ব সুবল প্রমাণিত করে। কিন্তু মঙ্গলা এ সব করে কার জন্য? তার বাপ আছে না ভাই আছে, না ছেলেমেয়ে আছে দু চার গণ্ডা যে তাদের জন্য দিন রাত এমন খেটে মরে মঙ্গলা? সংসারে থাকবার মধ্যে তো সে আর সুবল। একটা ছেলেমেয়েও হয়নি, হবার বয়সও আর নেই। লোকের সঙ্গে এই যে খিটিমিটি বাধে মঙ্গলার সে তো সুবলের স্বার্থের জন্যই! না হ'লে তার আর কি, একটা মাত্র তো পেট, দুবেলা দু মুঠো ভাত আর পরবার জন্য দুখানা শাড়ী—এতেই তো দিন চলে যায়। সংসারে আসক্তি থাকবার মত আর কী আছে তার?

একটা ঝাঁকায় ক্ষারে দেওয়া কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাঁখে নিয়ে কাচবার জন্য বড় পুকুরে এসেছিল মঙ্গলা। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা তার সহ্য হয় না। ঘরদোর তার নিকানো, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকে সব সময়, আসবাবপত্রও থাকে বেশ মাজাঘষা সাজানো গুছানো, সুবলের স্বভাবই বরং নোংরা। এ সম্বন্ধে কিছু বললে সুবল জবাব দেয়, 'অমন ফিটফাট পটের বিবি সব সময় সেজে থাকা মেয়েমানুষদেরই পোষায়, পুরুষদের চলে না; কিংবা সেই সব পুরুষদের চলে 'যারা মেয়েমানুষ ঘেঁষা,—যারা প্রায় মেয়েমানুষেরই সামিল।'

ছেলেমেয়ে না থাকার জন্য ভিতরে ভিতরে যে ক্ষোভ না আছে মঙ্গলার তা নয়। এক সময় তাবিজ কবচ যে যা দিয়েছে

তাই সে ব্যবহার করেছে কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হোলনা তখন সে সব দূরে ক'রে ছুঁড়ে ফেলতেও তার দ্বিধা হয়নি। পাড়াপড়শীরা বলেছে, 'মেয়েমানুষের কি অমন অধীর হলে চলে?' কিন্তু মঙ্গলার স্বভাব ভারি একগুঁয়ে, তাছাড়া পরোক্ষে অহঙ্কারী, দেমাকী বলে যে যেমন সমালোচনাই করুক, সমনে তার রাশভারিত্ব সবাই স্বীকার করে। সন্তানহীনতার জন্য কারো কাছে দুঃখ জানাতে যায় না মঙ্গলা তবু যেচে যদি কেউ সমবেদনা জানাতে আসে মঙ্গলার কাছে সেও মোটেই আমল পায়না। এই জিনিসটাই পাড়ার অনেকের সহ্য হয় না। ছেলে-মেয়ে না থাকে না থাক্ কিন্তু তার জন্য হায় আপশোষও থাকবে না—এ কেমন মেয়েমানুষ! একদিন নিধিরাম সা'র মেজ মেয়ে সুশীলা এসেছিল, সঙ্গে ছিল তার তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের হুড়োহুড়ি দাপাদাপিতে মঙ্গলা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেছিল। এমন দুরন্ত আর চঞ্চল আজকালকার ছেলেমেয়ে, ক' মিনিটের মধ্যে মঙ্গলার ঘরের জিনিসপত্র একেবারে ছত্রখান করে ফেলল। মুখে হাসি টেনেই মঙ্গলা বলেছিল, 'এত ঝক্কি পেয়াও কি করে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা? আমি হোলে তো অস্থির হয়ে যেতাম।'

কিন্তু সুশীলা চালাক মেয়ে, মঙ্গলার মনের ভাব বুঝতে তার দেরী হয়নি। বড় ছেলেটাকে একটা চড়, ছোট ছেলেটাকে একটা ঠোনা মেরে শাসন করে গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'অস্থির তুমি এখনই হয়ে উঠেছ বউদি, আর ঝক্কির কথা বলছ,—ঝক্কি মনে করলেই ঝক্কি। ভগবান মানুষকে মন বুঝেই ধন দেন কিনা।'

ঘাটে পৈঠার বালাই নেই। খেজুর গাছের একটা খণ্ড লম্বা-লম্বিভাবে জল পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে। আলতার সাহায্যে মঙ্গলা নিজেই কিছুদিন আগে এটাকে ধরাধরি করে এনে এভাবে পৈঠার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। নানা কারণে আলতাদের সঙ্গে এজমালি ঘাটই রাখতে হয়েছে মঙ্গলাকে। পুকুরের উত্তর আর পশ্চিম দিকের পাড় অপেক্ষাকৃত খাড়াই আছে, কিন্তু তা এমন কাঁটা-জঙ্গলে ভর্তি যে ব্যবহার করা চলে না। পূব আর দক্ষিণ দিকের পাড় দুটো ধ্বসে ধ্বসে প্রায় একেবারে সমতল হয়ে গিয়েছে। আলতা আর মঙ্গলা দুজনেই এই দক্ষিণ দিকের ঘাটেই আসে। ক্ষারে দেওয়া কাপড়চোপড়ের ঝাঁকা কাঁকে নিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ রাস্তার দিকে খোলের ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরালে মঙ্গলা। বিনোদ যাচ্ছে খোল কাঁধে করে আর তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে কে আর একজন বিদেশী লোক। মঙ্গলার মনে হোল—ওরাও যেন এদিকে একবার চেয়ে এইমাত্র চোখ ফিরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা আরও খানিকটা টেনে দিল মঙ্গলা।

'এত লজ্জার বহর কাকে দেখে বউ দি।'

পিছন ফিরে মঙ্গলা দেখল একখানা এঁটো থালা হাতে নিয়ে আলতাও এসে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলা একটু যেন থতমত খেয়ে গেল, 'কাকে দেখে আবার।' আলতা একটু হাসল, 'বলকি অতবড় ঘোমটা কি তা হ'লে মিছামিছিই টানলে।'

মঙ্গলা ততক্ষণ সামলে নিয়েছে, বলল, 'একেবারে মিছা-মিছিই বা হবে কেন। ভেবেছিলাম—কালো বদন আর হেরব না।'

আলতার নামের সঙ্গে রঙের মিল নেই। তার ঠাকুরদা মাধব সা বোধহয় ঠাট্টা করেই এই নামটি রেখেছিল কিংবা আঁতুড় ঘরে প্রথম দিন নাতনির গায়ের রঙ লাল দেখে তার মনে হয়েছিল আলতার মত লাল টুকটুকেই হবে মেয়ের রঙ। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগল আলতার বদলে আলকাতারার রঙই ফুটে বেরুতে লাগল তার গায়ে। সমস্ত পাড়ায় এমন কালো আর কুশ্রী মেয়ে দুটি নেই। চোখ মুখ যাই হোক—সাহা পাড়ায় মেয়ে পুরুষ প্রায় সবার রঙই ফর্সা। কিন্তু আলতা এদের মধ্যে বড় রকমের ব্যতিক্রম। শুধু রঙই নয়, শরীরের গড়নটাও আলতার অসুন্দর। যেমন মোটা, তেমনি বেঁটে। বয়স বাইস তেইশের বেশী নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয়, তিরিশের ঘরে। পুরুষালি চেহারা, পুরুষালি গলা। আলতার শ্বশুরের যে পছন্দ হয়েছিল তা নিতান্তই মাধব সা'র সোনার ভরির লোভে। কিন্তু আলতার স্বামী সদানন্দ শুধু কাঞ্চনে ভুলল না। তাছাড়া সৌখীন সুপুরুষ বলে গ্রামে খুব খ্যাতি আছে সদানন্দের। যাত্রা থিয়েটারে রাণীর পার্ট তার জন্য বাঁধা। অতি কষ্টে সদানন্দ তার বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর একদিন রাত্রে সামান্য একটা অজুহাতে খাট থেকে লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দিল আলতাকে। শোনা যায়, আলতাও নাকি তার স্বামীর গায়ে হাত তুলেছিল। ফলে আরো একটা বিশ্রী কলঙ্ক দিয়ে সদানন্দ সেই যে তাকে এখানে ফেলে গেছে আর নিয়ে যায়নি। আলতাকেও কিছুতে আর পাঠান যায়নি স্বামীর ঘর করতে। কালো কুৎসিত বললে আজকালও আলতার মুখ অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে, আজকালও কথাটাকে সে সহজভাবে নিতে পারে না। কিন্তু সে যে সুন্দর নয়—একথা বুঝবার বয়স তার তো বহু আগেই হয়েছে। তবু কথাটা বলে ফেলে মঙ্গলা বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। ঝগড়ার সময় খুবই ঝগড়া করে মঙ্গলা আলতার সঙ্গে। সামান্য বিষয় নিয়েই ঝগড়া বাঁধে। রান্না করবার জন্য বাঁশের শুকনো পাতা নিয়ে, ঘর নিকাবার জন্য গোবর নিয়ে, পুকুরের মাটি নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-জামের ভাগ নিয়েও কম কেলেঙ্কারী হয় না। এমন মাস যায় না যে মাসে পাঁচ সাতদিন পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ না থাকে। কিন্তু যখন ভাব হয় তখন আলতাই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সখী মঙ্গলার। বছর পাঁচ-ছয় ছোট হবে আলতা তার চেয়ে, কিন্তু বয়সে আলতাকেই বড় বলে মনে হয়। শক্তিও রাখে সে পুরুষের মত। অসুখে বিসুখে আলতাই আসে পরিচর্যা করতে। মায়ের পেটের বোনের মতো সে তখন শুশ্রূষা করে, কিন্তু ঝগড়া যখন বাঁধে তখন সতীনের মত সে শত্রু হয়ে ওঠে। রাগ আর অনুরাগ দুইই আলতার প্রচণ্ড। আলতার মোটা রসিকতাগুলি আগে তেমন পছন্দ করত না মঙ্গলা। কিন্তু শুনতে শুনতে এমনই এখন অভ্যাস হয়ে গেছে মঙ্গলার যে আলতার মুখে ওসব না শুনলেই যেন আর তার ভালো লাগে না আজকাল। বরং অনেক সময় মঙ্গলাই এখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলতার মুখ থেকে এসব বার করে।

মঙ্গলার পরিহাসটা আলতার মনে এবারও যে না বিঁধে ছিল তা নয়, কিন্তু খোটাটা তার নিজের ঢঙে ফিরিয়ে দিতেও তার দেরি হোল না। মুখখানা গম্ভীর করেই আলতা জবাব দিল, 'সে তো ঠিকই বউদি, অমন সুন্দর পানা মুখ পেলে কালো বদন আর দেখতে চায় কে।'

বিনোদ সাধুকে নিয়ে এই ধরণের রসিকতা আলতার মুখ থেকে শোনা মঙ্গলার অভ্যাস হয়ে গেছে। আগে ভারি রাগ করত মঙ্গলা, গালাগালি করত আলতাকে, কিন্তু আজকাল অনেক সময় এসব কথায় মুচকি হাসে মঙ্গলা, বলে মরণ তোর,—নিজের সাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার ইচ্ছা বুঝি।

আলতা জবাব দেয়, 'মরণ আমার, আমি কি এমনই ক্ষেপেছি যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাব। চাঁদপানা যাদের মুখ তারাই চাঁদের খোঁজ করে।'

মঙ্গলা বলে, 'পোড়াকপালী, চাঁদ আমার ঘরেই আছে, তার জন্য খোঁজ করতে বেরুতে হয় না।'

বিনোদ দেখতে সত্যিই সবচেয়ে সুন্দর পাড়ার মধ্যে। বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। রঙ অবশ্য এ পাড়ার অনেকেরই ফর্সা তবু বিনোদের স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নাক-চোখের গড়নও একেবারে নিখুঁত। কিন্তু বিনোকে যে মঙ্গলার মনে মনে ভালো লাগে, তা তার রূপের জন্য নয়, তার মিষ্টি গলা আর মধুর ব্যবহারের জন্য। বিনোদের সঙ্গে কোনদিনই অবশ্য কথা বলে না মঙ্গলা, বিনোদেরও এ পর্যন্ত কোন উপলক্ষ্য হয়নি মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলবার, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বিনোদকে আলাপ করতে শুনেছে অনেকদিন সুবলের সঙ্গে। স্বামীর তুলনায় অনেক ভদ্র, অনেক মার্জিত বলে মনে হয়েছে মঙ্গলার। এমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, আর চমৎকার স্বভাব নিয়ে সুবলের মত খাঁটি ব্যবসায়ী বনে না গিয়ে বিনোদ যে অমন ভক্ত কীর্তনীয়া হয়ে উঠেছে, সে ভালোই হয়েছে। মঙ্গলার মনে হয়, এ ছাড়া অন্য কিছু যেন তাকে মানাত না। অমন নরম মিষ্টি কথায় বিনোদ কি পারত সুবলের মত পাড়ার মধ্যে অমন মোড়লি করতে, উকিল-মোক্তারদের মত অমন বৈষয়িক চাল চালতে, পাইকারদের সঙ্গে কখনও গরমে কখনও নরমে জিনিসপত্রের অমন দরদাম করতে। পাইকারদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে সুবল, কেউ কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতে এলে তার বোকামিতে সুবল কিভাবে রেগে গিয়ে তাকে গালাগালি করতে থাকে, তা ঘরে বসে মঙ্গলা প্রায়ই শুনতে পায়। একেক সময় মঙ্গলা ভাবে, আচ্ছা, সুবল যদি অমন পাকা ব্যবসায়ী না হয়ে বিনোদের মত নামকরা কীর্তনীয়া হোত কেমন হোত তাহলে! কিন্তু কল্পনাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয় মঙ্গলা একটুও তার পছন্দ হয় না। দূর, ও-ধরণের স্বামী নিয়ে কি উপায় হোত মঙ্গলার। স্বামী যে সুবলের মত ছাড়া অন্য কারো মত হোতে পারে, একথা কিছুতে যেন ভাবতেই পারে না মঙ্গলা। বিনোদের মত অমন নরম, 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না' গোছের মানুষ নিয়ে কেউ কি সংসারী করতে পারে। বিনোদের স্ত্রী হয়ে মালতীকে কিভাবে কষ্ট পেয়ে মরতে হয়েছে, তা কি চোখের ওপরই দেখেনি মঙ্গলা? দুদিন ধরে ঘরে খাবার নেই তো নেই-ই—বিনোদ কোথায় কীর্তনে মেতে রয়েছে, কোন খোঁজই নেই তার। আবার কীর্তন থেকে দু-চার টাকা হাতে নিয়ে যখন বিনোদ ফিরে এল, তখন তার স্ফূর্তি দেখে কে। তিন-চারজন ভক্ত সঙ্গে করে সে হয়তো রাত দুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতিথির উপযুক্ত সৎকারে আদরে-আপ্যায়নে দু-একদিনের মধ্যেই বিনোদের হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর অলক্ষ্যে একটু একটু করে শেষ হয়েছে মালতী। বিনোদ আবার বেরিয়ে পড়েছে—তার অন্নের কখনও অভাব হয়নি। কত ভক্ত কত গুণমুগ্ধ তার এখানে-ওখানে ছড়ানো। কিন্তু এমন দিনও গেছে শেষকালটায় যে, মালতী ধার চেয়ে পাড়ায় কারো কাছে একটা ক্ষুদও পায়নি। কে ধার দিতে যাবে তাকে, যে হাত পেতে নিয়ে ফের আর হাত উপুড় করে না। তারপর যখন গুরুতর অসুখে পড়ল, তখনো কি বিনোদ একবার খোঁজ নিয়েছে? সে তখন অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহরে মত্ত। শেষে অবশ্য একদিন জেলা শহর থেকে মোটরে করে একজন বড় ডাক্তারকে এনে হাজির করেছিল বিনোদ। বিনোদের কীর্তন শুনে এই ডাক্তারও নাকি বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন এসেছিলেন তখন আর তাঁর করবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। মালতীর মৃত্যুর পর তার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের অবশ্য কিছু বাকি রাখেনি বিনোদ। আশেপাশের ভক্তদের ডেকে নামসংকীর্তন করিয়েছিল; দীঘলকান্দীর নামকরা পাঠক নন্দকিশোর গোঁসাইকে দিয়ে ভাগবত পাঠ করিয়েছিল, বৈষ্ণব এবং কাঙালী ভোজনেও কম ব্যয় হয়নি। এর সব টাকাটাই নাকি জুগিয়েছিল বিনোদের ভক্ত বন্ধুরা।

কাপড় কেচে মঙ্গলা ফিরে এসে দেখে বাইরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে বিনোদের মা। কাপড়ের ধামাটা নামিয়ে রেখে মঙ্গলা বলল, 'কি ব্যাপার খুড়িমা, আপনি এসেছেন কতক্ষণ। আহা, অমন উটকো বসে রয়েছেন যে, পিঁড়িখানা টেনে বসলেই তো পারতেন।'

বিনোদের মা বলল, 'তাতে আর কি হয়েছে বউমা, অমন নিকানো পোঁছানো তোমার ঘরদোর, মাটিতে বসতেও সাধ যায়, আবার কারো বাড়িতে, তার বিছানায় বসতেও পরিবর্তি হয় না। এমন লক্ষ্মী বউ এ গাঁয়ে তো ভালো, দশখানা গাঁয়েও খুঁজে মিলবে না, একথা আমি ঢাক পিটিয়ে বলতে পারি।' তারপর একটু থেমে বিনোদের মা একবার এদিক-ওদিক চেয়ে খানিকটা সংকোচের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু বিনোদ আবার কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে দেখ। পাঁচ-সাতদিন ধরে বাড়িতে আসবার নাম নেই, খোঁজ নেই, বুড়ো মা রইল কি কি মরল, কিন্তু বেলা দুপুরের সময় যখন এলো, কোত্থেকে একটি লেজুড় জুটিয়ে এনেছে সঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই, এখন আমি এই দুপুরের সময় কি দিয়ে কি করি বলো তো।' এমন ঘটনা আজ নূতন নয়। বিনোদের মা যে এই জন্যই এসেছে, তা তাকে দেখেই মঙ্গলা বুঝতে পেরেছিল। তার মুখ শক্ত হয়ে এল। কথার কোন জবাব না দিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়েই ঘরের মধ্যে টাঙানো বাঁশের আড়টা থেকে একখানা শুকনো কাপড় হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নীরবে মঙ্গলা পিছারায় চলে গেল কাপড় ছাড়তে।

বিনোদের মা চিন্তিত হয়ে উঠল একটু, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'চলে গেলে নাকি বউমা ?'

মঙ্গলা কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই নীরসভাবে জবাব দিল, 'চলে আর যাবো কোথায়, দেখছেন না কাপড় ছাড়তে এলাম, বসুন, আসছি।'

একটু পরে মঙ্গলা ফিরে আসতে বিনোদের মা বলল, 'বিনোদই আমাকে পাঠিয়ে দিল তোমার কাছে, বলল, আর কারো কাছে গেলে তো কিছু হবে না মা, ও বাড়ির সোনাবউদির কাছ থেকে একবার ঘুরে এস, লক্ষ্মীর ভান্ডার কোন দিন বন্ধ থাকে না, এই বেলাটা কোন রকমে চালিয়ে দিতে পারলে রাত্রের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মঙ্গলার মুখ একটু বুঝি আরক্ত হয়ে উঠল, 'ছিঃ, আমার কথা বললেন তিনি ?'

বিনোদের মা একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো মঙ্গলার দিকে, তারপর মিশিরঞ্জিত দাঁত বার করে একটু হেসে বলল, 'তোমার কথাই বলল বউমা। ছেলেকে আমার অমন হাবাগোবা দেখলে কি হয়, সে মানুষ চেনে। কারো মুখের দিকে হয়তো সে তাকায় না। কিন্তু কার মনে কি আছে—তা তার জানতে বাকি থাকে না।'

মঙ্গলা ভিতরে ভিতরে কি একটু শিউরে উঠল ? তবু একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু খুড়িমা—'

বিনোদের মা বলল, 'ওঃ তোমাকে বুঝি বলিইনি কি দরকার, তা সে কথা কি তোমাকে বলবার দরকার হবে মা? দুজনের যোগ্য দুমুঠো দুমুঠো—। তোমার কাছে কোন লজ্জার বালাই আমার নেই। আপন জনের কাছে আবার লজ্জা। কিন্তু যা দেবে টুরিতে করে মেপে টেপেই দিয়ো বউমা। ওসব আন্দাজ-টান্দাজ আমার ভালো লাগে না, কালতো হাটবার। বিনোদ হাট থেকে ফিরে এলেই আমি আবার নিয়ে আসব। আন্দাজের দরকার নেই, সকলের আন্দাজ তো আর সমান নয় বউমা।'

মঙ্গলা ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় রান্না ঘরের ছাঁচের ধারের রয়না গাছটার গা ঘেঁষে বিনোদ একটু ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে এসে দাঁড়ালো, 'তুমি এখানে মা, আমি এদিকে পাড়া ভরে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।' ঘোমটা টানবার আগে মঙ্গলা একবার ঘাড় বাঁকিয়ে বিনোদের দিকে না তাকিয়ে পারল না, তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ক্রমশ

দেশ পূজা সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

৭ই নবেম্বর, ১৯৮২-এর 'দেশ'-এ দেখিলাম, বরানগর নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শারদীয়া সংখ্যা 'দেশ'-এ মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ লেখায় ভুল ধরিয়াছেন। আমি মূল চিঠির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম ভুলটি ঠিকই ধরিয়াছেন। চিঠিখানি ২রা নবেম্বর ১৯০৯-এ পোস্ট করা হইয়াছিল। সেই অনুসারে উহার ক্রমিক সংখ্যা '৭৪' হওয়া উচিত। ১৯১৩ সালের অন্যান্য চিঠিগুলিও দেখিয়াছি, সেগুলিতে কোন গোলমাল নাই। যতীন্দ্রবাবু যে এই-ভাবে ঐ চিঠির ও ৮০নং-এর চিঠির যথাযথ সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

এইসঙ্গে একটি বিষয় জানাই। ২০ ও ২১নং পত্রে 'বৌমা' সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, ইহা রথীন্দ্রনাথের পত্নীকে নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হেমলতা দেবীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা। ইতি—

১৬ই নভেম্বর, ১৯৮২

ভবদীয়—
গিরিজাপতি সান্যাল,
৪২, রামচরণ শেঠ রোড,
সাত্রাগাছি, হাওড়া।

এই গাছ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই বজ্রদগ্ধ গাছের শিরা বেয়ে
পৃথিবী একদিন ফুল হয়েছিল, কখনো ফল,
কখনো সবুজ, কখনো সৌরভ।
শীতের সায়াহ্নে সে আজ দূরের নদী দেখছে,
যেখানে মৃতদেহের দগ্ধ হাড়, গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি,
চাকার দাগ, যারা বেঁচে রইলো তাদের অশ্রু।

এই গাছ শুধু দেখছে ঃ
নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো,
নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে কালি,
প্রথমে লাল, পরে শাদা, জ্বলন্ত রূপোর মতো।

এই গাছ ভাবছে ঃ
একদিন চৈত্রের ঝড়ে তার দেহ মর্মরিত ছিলো,
একদিন ভ্রমরের ভিড় ঘিরে ছিলো স্তাবকের মতো।
একদিন পৃথিবী তাকে ছুঁয়েছিলো,
আজ সে-পৃথিবী ভুলে গেছে!

স্তব্ধ রাত্রির মধ্য আকাশে রূপোলি আগুনলাগা চাঁদ
শীতের শুকনো নদীতে কয়েকটা শেয়াল সন্তর্পণে ঘুরছে
আর একটি দগ্ধ গাছ ঃ আরো কী ভাবছে কে জানে।

চূড়ান্ত

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মিছে নৈরাশ!
আহবে ক্লৈব্য আত্মঘাতী ঃ
ভরসা আনো।
আরো দৃঢ় কর বল্গামুঠি;
দ্রুততর হোক ক্লান্ত উটের শ্লথ চরণ।
বালিপাহাড়ের ওপারে সবুজ
কী অভিনব!
হাতছানি দেয় শান্ত দিনেরা মেঘ-সুনীল।

এখানে আগুন ঃ
ধু ধু ওড়ে বালি উপরে নীচে;
চুঁয়ে চুঁয়ে গেল মাংসপেশী।
তবু বিহঙ্গ! ওরে বিহঙ্গ! মিনতি রাখো ঃ
পান্থ-পাদপ কুঞ্জে লুব্ধ হোয়োনা তুমি।

বালি-ঝড় আসে—
পার হ'য়ে চল মরু-সাগর;
বালি সমুদ্রে দ্বীপের আস্থা বৃথাই রাখো।
মরু-সিকতার বালুবীতংস
তৃষা উষর ঃ

যাযাবরী তনু গোরোচনা গোরী
গুল্‌বাহার।
স্তন-উচ্ছাসে আমন্ত্রণের মিনতি মাখা;
নীবিবন্ধনে বাঁধা আছে তবু
শাণিত ছুরি!
বালি-ঝড় আসে—
পার হ'য়ে চল মরু-সাগর।
বালিসমুদ্রে দ্বীপের আস্থা বৃথাই রাখা॥

বিশ্রাম নেবে।
এখানে ত' নয় অনেক দূরে—
অনেক পাহাড় পার হ'য়ে গিয়ে
নেমেছে মাটি,
অনেক সবুজ আহ্বানে ঘন উন্মুখর॥

আরো দৃঢ় কর বল্গামুঠি ঃ
দ্রুততর হোক ক্লান্ত উটের
শ্লথ চরণ।............

গণ দেবতা:—(চণ্ডীমণ্ডপ)। শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৩।

তারাশংকরবাবু শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিক। তাঁহার আলোচ্য উপন্যাসখানা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত লাভ করিয়াছি। উপন্যাসখানার পটভূমিকা খুব ব্যাপক। বাঙলার পল্লীর এই ব্যাপক পটভূমিকায় গ্রন্থকার আধুনিক সামাজিক অবস্থার আলোকে বাঙলার প্রাণধর্ম্মকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। বর্ত্তমানের সমস্যাসমূহের সংঘাতে সমগ্র জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব আলোচ্য গ্রন্থখানার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের দরদী দৃষ্টি বাঙলার অন্তরের অনেক রহস্য উন্মুক্ত করিয়াছে। একটা জাতির প্রাণধর্মের সঙ্গে এই যে পরিচয়, শুধু বিচার-বিবেচনা বা মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের বিশ্লেষণের সাহায্যে উহা সম্ভব নয়, আত্মীয়তার একটা অবিতর্ক এবং অখণ্ড অনুভূতি সেখানে থাকা দরকার। গ্রন্থকার সেই আত্মীয়তার সূত্র সংযোগে আধিব্যাধিক্লিষ্ট বাঙলার অনাহত ও অপাপবিদ্ধ স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন এবং পাঠকের চিত্তকে সেই উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিবার মত রসানুভূতির গাঢ়তা তাঁহার যে পর্যাপ্তরূপেই আছে, আলোচ্য উপন্যাসখানি অসংশায়িতভাবে তাহা প্রতিপন্ন করিবে। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের আলাপ-আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানত উপন্যাসখানি পরিকল্পিত হইয়াছে। অনিরুদ্ধ, দেবু ঘোষ, ডেটিনিউ যতীন, ন্যায়রত্ন মহাশয় এই চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া গ্রন্থকার গণদেবতার বাণী বিচিত্র সুরে বাজাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীহরি ঘোষ ওরফে ছিরু পালের চরিত্রে ধর্মধ্বজী শোষকের স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানার পুরুষ চরিত্রগুলির সঙ্গে নারী চরিত্রগুলির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। পুরুষ চরিত্রগুলির বিভিন্নতা আছে, অর্থাৎ এক একটি চরিত্রের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানার নারী চরিত্র সৃষ্টি অভিনব। গ্রন্থকারের কলানৈপুণ্য এক্ষেত্রে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার নারীর জাতিধর্ম এবং শিক্ষা প্রভৃতি উপাধিগত প্রতীয়মান বিভেদকে অতিক্রম করিয়া নিখিল নারীর স্বরূপকেই সর্বত্র উন্মুক্ত করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন নারীর স্নেহময়ী জননী মূর্তি। আলোচ্য উপন্যাসখানার পদ্ম, বিলু—পতির প্রতি নিষ্ঠানুস্নিগ্ধকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের মধ্যে মাতৃ-প্রেমের মাধুর্যরস যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; সে রস তেমনই অক্ষুণ্ণ মহিমায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে স্বৈরিণী দুর্গার হাস্য-লাস্য এবং কটাক্ষলীলাকে আচ্ছন্ন করিয়া। তারাশংকরবাবুর দেবু ঘোষ ত্যাগের মহিমায় প্রভাবিত আত্মভোলা কর্মীর আদর্শ সৃষ্টি। দুঃখ কষ্ট জানিয়া শুনিয়াও মানবতার উচ্ছ্বাসেও আবেগে সে আপনাকে স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে গুটাইয়া রাখিতে পারে না; মুহূর্তের একটা প্রেরণায় সে বৃহত্তের আহ্বানে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অবশেষে ন্যায়রত্নের নিষ্কাম কর্মসাধনার উপদেশেরই মধ্যে তাহার বিচার-বুদ্ধি সান্ত্বনার সূত্রকে আঁকড়াইয়া ধরে। কিন্তু রূপোপজীবিনী দুর্গা সে অপূর্ব—দৈহিক পাপের ঊর্দ্ধে মাতৃমহিমার মধ্যেই সে সত্য, যাহা-স্পর্শ যেন তার পক্ষে একান্তই অনিত্য। মানুষের এই অনাহত আত্মমহিমাকে ফুটাইয়া তোলা সহজ নয়। যেখানে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নাই, প্রেমময় অনুভূতি নাই, সেখানে কেবলমাত্র অপর দেশের লেখকদের অনুকৃতির সাহায্যে এমন উদ্যম করিতে গেলে বিপত্তিই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তারাশংকরবাবুর সৃষ্টি অনুকৃতি নয়, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রাণপূর্ণ অনুভূতি। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ আত্মনিবেদনের রসোপচয় রহিয়াছে, এই জন্য সৃষ্টির চরম আদর্শ তাহাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তারাশংকরের পদ্ম, তাঁহার বিলু—মধুর সৃষ্টি; কিন্তু তাঁহার বিভ্রমময়ী দুর্গা ততোধিক মধুর। বাঙলা দেশের কথাসাহিত্যে 'গণ দেবতা' স্থায়ী আসন লাভ করিবে, একথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি।

নিশীথের চাঁদ:—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। উপন্যাস। মূল্য এক টাকা বার আনা। প্রকাশক—শ্রীপুরুষোত্তম সেন, ৩৮ডি, দুর্গা-চরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬৮ পৃষ্ঠা।

পল্লীর সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়া উপন্যাসখানি লিখিত। বিলাত ফেরত জয়ন্তের চরিত্রের ভিতর দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকা দরিদ্র জীবনের প্রতি সমবেদনা এবং সহানুভূতির গভীরতা অপূর্ব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মন্দার চরিত্রের স্নিগ্ধ সরল মাধুর্য পাঠকদের মনকে স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট করে। স্বদেশ এবং স্বাজাত্যবোধের একটা উদার অনুভূতি উপন্যাসখানির রস পরিবেশন কৌশলে একান্তভাবে পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তে সত্য এবং মূর্ত হইয়া উঠিবে। লেখিকার এইখানেই সার্থকতা।

ইংরেজী সাহিত্যে সতীত্ব:—শ্রীবাসুদেব সুকুল, নাটোর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে সতীত্বর আদর্শ অভিন্ন, পুস্তকখানিতে লেখকের ইহাই বক্তব্য। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। লেখক সেক্সপীয়ারের লিউক্রিস এবং কুমারী মেরিনার চরিত্রের উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে কথাটা বলিয়াছেন। তাঁহার অভিব্যক্তিতে কৌশল আছে।

কোরক:—শ্রীরজতবরণ দত্ত রায়। প্রাপ্তিস্থান—দত্তের বাড়ি, বন-গ্রাম, ময়মনসিংহ। মূল্য আট আনা।

৯৪টি কবিতা আছে। লেখকের ভাষার জোর রহিয়াছে। কিন্তু হাত নূতন; এজন্য কবিতাগুলির ভিতর দিয়া রস দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। দুই একটি কবিতার কোন কোন জায়গায় আমাদের ভাল লাগিল। ছাপা এবং বাঁধাই খুব সুন্দর এবং নির্ভুল।

শ্রীবিশ্বরূপ—মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। কার্যালয়—সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী, ২৭নং আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা। শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস বি-এ, ভাগবতভূষণ, এম-আর এস-এল (লণ্ডন), সম্পাদক, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা। আশ্বিন সংখ্যা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্তৃক পরিচালিত এবং বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত সহযোগী 'শ্রীবিশ্বরূপ'কে আমরা আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বহুশ্রুত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদন-কৃতিত্বে 'শ্রীবিশ্বরূপ' প্রবন্ধ এবং কবিতা উভয় দিক হইতেই বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক আমাদিগকে বিশেষ একটি আশার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের সমাজে সংকীর্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার গতিরোধ পত্রিকাখানির অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে।" স্বাধীন চিন্তার সহিত ধর্মের নামে সমাজের সর্বত্র সংকীর্ণতার যে পাপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তার গতি রোধ করা কঠিন কাজ; শক্তিশালী এবং বহুদর্শী সুপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'শ্রীবিশ্বরূপ' সেই কঠিন কর্তব্য প্রতিপালনে সাফল্যলাভ করিবেন আমরা ইহাই কামনা করি। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ইঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ এবং কবিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সারগর্ভ প্রবন্ধ এবং সুলিখিত কবিতার সুযোগ্য নির্বাচনে 'শ্রীবিশ্বরূপে'র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল এমন পত্রিকা পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

ছন্দা—(গল্পের বই) শ্রীমহেন্দ্রলাল সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট। মূল্য পাঁচ সিকা। পুস্তকখানায় সাতটি ছো গল্প আছে। গল্পগুলিতে ছোট গল্পের রসধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের বর্ণনার ভঙ্গীটি সুন্দর।

সাগরিকা—কবিতার বই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কমলা বুক ডিপো। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দুই টাকা

সাগরিকা, হিমলেখা ও ধূপশিখা, এই তিনটি অংশে গ্রন্থখা বিভক্ত। পুরীর সমুদ্রতটে সাগরিকার ছন্দ কবির চিত্তে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে হিমলেখার জন্ম দার্জিলিংয়ে আর ধূপশিখার জন্ম হইয়াছে কবি নিজের পল্লীনিকেতনে। কবি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলে 'সাগরিকা'র লেখায় কবির চিত্তের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের পরি পাওয়া যায়। ভূমিকায় কবি নরেন্দ্র দেব মহাশয় লিখিয়াছেন—'যে ক এনে দেয় 'পারফেকশন', যার গুণে গীতিকবিতা সকল দিক দিয়ে হ'য়ে ও সার্থক মাধুর্যে মণ্ডিত—সে পরিপূর্ণ রস একজন নবীন কবির রচন মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, এরূপ আশা করাটাই আমাদের পক্ষে ভুল হবে একথা স্বীকার করিয়াও এই নবীন লেখকের লেখায় আমরা কাব্যরে পরিচয় পাইয়াছি ইহা বলিতে পারি। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুদৃশ্য এ সুশোভন।
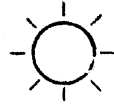
বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের কৃতিত্ব

পার্ক ষ্ট্রীটস্থ গ্যারিসন থিয়েটারে সম্প্রতি বাঙালী মুষ্টি-যোদ্ধাগণের সহিত গোরা বাছাই দলের এক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা সনুষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর কলিকাতা মুষ্টিযুদ্ধ এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙালী দল বিজয়ীর সম্মান লাভ না করিলেও যেরূপ দৃঢ়তা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। উপযুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে বাঙালী ব্যায়ামবীরবর্গ মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধাগণের সহিত সম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এই অনুষ্ঠানে তাহারই প্রমাণ দিয়াছে।

গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠান

গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠানে সাতটী বিভাগীয় প্রতিযোগিতা হয়। এই সাতটীর মধ্যে গোরা দল চারিটীতে ও বাঙালী দল তিনটীতে সাফল্যলাভ করিয়াছে। পয়েন্ট বা সংখ্যার দ্বারা প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণয় করা হয়। গোরা দল ১১—১০ পয়েণ্টে অর্থাৎ মাত্র এক পয়েণ্টে বাঙালী দলকে পরাজিত করিয়াছে। বাঙালী দলের বাবুলাল ফেদার ওয়েট বিভাগে গিডলোকে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই নক আউট বা ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হয়। এই বিষয় বাবুলালের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। গোরা দলের কেহই বাবুলালের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে পারে নাই। লাইট ওয়েট বিভাগে বি ঘোষ

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা ও পরিচালকগণ। গ্যারিসন থিয়েটারে ইহাদের সহিত গোরাদলের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে বলিতে হয় বাঙালী ব্যায়াম উৎসাহী অথবা ব্যায়াম পরিচালকগণ কোনদিনই মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়টীকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহাদের উপেক্ষার ঠিক কারণ যে কি তাঁহারাই জানেন। তবে আমাদের যতদূর মনে হয়, এই বিষয়টিকে সুপরিচালনা করিবার জন্য কোনদিনই চেষ্টা হয় নাই। শ্রীযুত পরেশলাল রায়, শ্রীযুত বলাইদাস চাটার্জি অথবা শ্রীযুত জগৎকান্ত শীল প্রভৃতি এই বিষয়টী যাহাতে বাঙলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার আমরা করি না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই অর্থাৎ বাঙলাদেশের ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে নাই। কেন হয় নাই তাহা না উল্লেখ করাই ভাল। তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই, গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠান তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠান বাঙালী ব্যায়াম পরিচালকগণের প্রাণে নব প্রেরণা জাগ্রত করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকবে অপেক্ষা ওজনে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও রীতিমত বেগ দিয়া পয়েণ্টে পরাজিত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ়তা পূর্ণ লড়িবার কৌশল সকলকেই চমৎকৃত করে। একরূপ দুর্ভাগ্য-বশত তিনি পরাজিত হইয়াছেন ইহাই সাধারণ দর্শকগণের ধারণা। শচীন বসু একজন খ্যাতনামা মল্লবীর। তিনি মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, ইহা সকলের কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লাইট হেভী ওয়েট বিভাগে রবার্টসনকে অনায়াসে পরাজিত করিতে সক্ষম হওয়ায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, "শচীন বসু শীঘ্রই মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন।" নিয়মিত অনুশীলন ও উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা লাভ করিলে তিনি বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের সুনাম বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ফ্লাই ওয়েট বিভাগে সন্তোষ আইচ রায় সহজে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি কুলসনকে পরাজিত করিয়া নিজ অর্জ্জিত গৌরব বজায় রাখিয়াছেন। ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগের প্রতিযোগিতাটি সর্ব্বাপেক্ষা

দর্শনযোগ্য হয়। কারণ এই প্রতিযোগিতা শেষ সময় হয়। এখনও পর্যন্ত বাঙালী ও গোরা দলের পয়েণ্ট সমান সমান ছিল। সুতরাং এই প্রতিযোগিতাটীর ফলাফলের উপরই উভয় দলের জয়পরাজয় নির্ভর করিতেছিল। বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা পি কে দে ইহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় তাঁহার লড়িবার কৌশলের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি প্রাণপণ লড়িয়াছেন, কিন্তু মন্দভাগ্য তাঁহার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে নাই। তিনি পরাজিত হইয়াছেন সত্য এবং তাঁহার পরাজয়ই বাঙালী দলের পরাজয়ের কারণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সময় বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছেন, এইজন্যই তিনি প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

বিজয়ী		বিজিত
	ফেদার ওয়েট	
বি লাল		**গিডলো**
	লাইট ওয়েট	
ম্যাককেব		**বি ঘোষ**
	ফ্লাই ওয়েট	
সন্তোষ আইচ রায়		**কুলসন**
	ব্যাণ্টম ওয়েট	
ব্যালিচুও		**সি সেন**
	মিডল ওয়েট	
সার্জ্জেণ্ট ওয়াল		**বি এন রায়**
	লাইট হেভী ওয়েট	
শচীন বসু		**রবার্টস**
	ওয়েল্টার ওয়েট	
সার্জ্জেণ্ট হ্যারিস		**পি কে দে**

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এই বৎসর অনুষ্ঠিত হইবেই। বোম্বাই প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশন যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশন বোম্বাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন করায় অনুষ্ঠানটি বন্ধ হইয়া যাইবার মত যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়াছে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্যকারী সমিতির সভা হইলে দেখা যায় যে, ভারতের অধিকাংশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সঙ্গে কণ্ট্রোল বোর্ড, যে সকল এসোসিয়েশন যোগদান করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছিলেন তাঁহাদের পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ ঐ সকল এসোসিয়েশনের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সকলে এখনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তবে বোম্বাই এসোসিয়েশন ঐ অনুরোধমূলক প্রস্তাবের জবাব দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্তই বহাল রহিল।" রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এই বৎসর বোম্বাই দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যাইবে না, এই বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। মহীশূর, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি এসোসিয়েশনের অভিমত কি তাহা শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে।

বাঙলা বনাম বিহার দলের খেলা

বাঙলা বনাম বিহার দলের খেলা আগামী ২৮শে নভেম্বর হইতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইবে এই ব্যবস্থাই পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অনুষ্ঠানের স্থান অথবা দিন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। বাঙলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন সম্প্রতি বিহার এসোসিয়েশনের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী খেলাটি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ইডেন উদ্যানের "পিচ" অথবা খেলিবার মাঠ এখনও পর্যন্ত খেলিবার উপযুক্ত হয় নাই। ডিসেম্বরের পূর্বে খেলিবার উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ডিসেম্বর মাসে এই খেলার তারিখ পরিবর্তিত হইলে বাঙলা বিশেষ খুশী হইবে। বিহার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুত বিজয়বন্ধু তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পক্ষে এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। খেলার স্থান ও তারিখ যখন পূর্বেই স্থির হইয়াছে তখন বর্তমানে তাহার পরিবর্তন করা নিয়মবিরুদ্ধ কার্য হইবে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নিয়মানুযায়ী রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের সকল খেলা নভেম্বর মাসেই শেষ করিতে হইবে। যদি ইডেন উদ্যান পূর্ব ব্যবস্থামত খেলিবার উপযুক্ত না হয় বাঙলা দল অনায়াসে জামসেদপুরে তাঁহাদের সহিত খেলিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে বাঙলা ও বিহার দলের খেলা কলিকাতায় হইবে কি জামসেদপুরে হইবে, নভেম্বর মাসে হইবে কি ডিসেম্বর মাসে হইবে এখনও নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না।

ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালনায় নূতন নিয়মাবলী

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মনোনীত আইন প্রণয়ন সাব-কমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কতকগুলি নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল:—

(১) রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এতদিন আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা হিসাবে অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিচালনা করা হউক; খেলা যে যে কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই কেই কেন্দ্রের পরিচালকগণকে খরচ বহন করিতে হইবে। যদি এই সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ হয়, সাব-কমিটি তাহার সিদ্ধান্ত করিবেন। পূর্বে একটি দলকে তেরজন খেলোয়াড়ের যাতায়াত খরচ দেওয়া হইত, বর্তমানে সেই স্থানে ১৪ জনের দেওয়া হইবে। ১লা নভেম্বরের পূর্বে ছয় মাস ধরিয়া যদি কোন খেলোয়াড় একটি প্রদেশে বাস করে, তবে তাহার ঐ প্রদেশের দলে খেলিবার অধিকার থাকিবে;

বৈদেশিক সামরিক বিভাগের যে কোন খেলোয়াড় এক মাস কোন প্রদেশে অবস্থান করিলে তাহাকে ঐ প্রদেশের দলে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইবে;

(২) **মেজর ও মাইনর এসোসিয়েশন:**—যে এসোসিয়েশনের অধীনে পঞ্চাশটি ক্লাব থাকিবে ও বৎসরে ৩০০৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক চাঁদা কণ্ট্রোল বোর্ডকে দিতে পারিবে, তাহাকেই মেজর এসোসিয়েশন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে।

যে সকল এসোসিয়েশনের অধীনে অন্ততপক্ষে বারটি ক্লাব আছে ও বাৎসরিক চাঁদা হিসাবে কণ্ট্রোল বোর্ডকে ২০০৲ টাকা দিতে সক্ষম, তাহাকেই মাইনর এসোসিয়েশন বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী, সামরিক পরিচালকমণ্ডলী অথবা ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবকে বাৎসরিক ১৫০৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে;

(৩) **সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ:**—ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের মনোনীত সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। বাহিরের কোন সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কেবলমাত্র সভাপতি নির্বাচন বিষয় এই আইন প্রযুজ্য হইবে না। তিনি বাহির হইতে নির্বাচিত হইবেন ও তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে;

(৪) **প্রদর্শনী খেলা বা প্রতিযোগিতা:**—কোন এসোসিয়েশন যে কোন প্রদেশের খেলোয়াড় বা দল লইয়া প্রদর্শনী খেলা বা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।
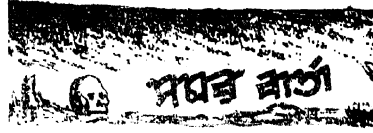
১ই নভেম্বর

হিটলার জার্মান সৈন্যগণকে অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী জার্মান সৈন্যেরা অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশ করে। রোম বেতারে প্রকাশ, জার্মান সেনার সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় সেনাও ফ্রান্সে প্রবেশ করে। জার্মান সৈন্যেরা যখন অনধিকৃত ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করে, তখন মার্শাল পেতাঁ জার্মান সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিটলারের আদেশের প্রতিবাদ জানান।

হিটলার নাৎসী সৈন্যদিগকে অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশের আদেশ দান ব্যাখা করিয়া যে বাণী দেন, তাহাতে বলেন যে, শত্রুপক্ষ ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা কর্সিকা এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। এই কারণে তিনি ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে অনধিকৃত এলাকাকে রক্ষা করিবার জন্য জার্মান বাহিনীকে ঐ এলাকায় প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

জার্মান জঙ্গী বিমান ও বিমানবাহিত সৈন্য টিউনিসিয়ায় অবতরণ করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার হইতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হইয়াছে। ভিশির সংবাদে প্রকাশ, এডমিরাল দারলাঁ দরক্লোসহ ফরাসী উত্তর আফ্রিকার সমস্ত সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিয়াছেন।

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল আইসেনহাওয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্কিন বাহিনী রাবাত অধিকার করিয়াছে।

মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, মিশরে এক্সিস পক্ষের মারাত্মক ক্ষতি হইয়াছে। মিশরের যুদ্ধে ইংরেজরা বিরাট জয়লাভ করিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে আগামী বৎসরের পূর্বে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা অসম্ভব।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান আক্রমণের ব্যাপকতা হ্রাস পাইয়াছে।

১২ই নভেম্বর

মিশরের রণাঙ্গনে অস্টম আর্মির সহগামী রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে, মিশর সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয় এবং লিবিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটিশ সাঁজোয়া বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এবং রোমেলের হতাবশিষ্ট সৈন্যদল (অনুমান কুড়ি সহস্র) হালফায়া গিরিসঙ্কট অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ অনুমিত হইতেছে যে ব্রিটিশ বাহিনী এক বিরাট সাঁড়াশির আকারে আক্রমণ চালাইয়াছে। এই সাঁড়াশির একটি বাহু উপকূলবর্তী রাস্তা দিয়া বে-পরোয়াভাবে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবনে রত আছে। সাঁড়াশির অন্য বাহু উন্মুক্ত মরু-রণাঙ্গনে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

জার্মান সৈন্যেরা ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে উপনীত হইয়াছে।

ইতালিয়ান বাহিনী কর্সিকার বাস্টিয়াতে অবতরণ করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থানে সর্বত্র ফরাসী সৈন্যদের প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

১৩ই নভেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদ রণা-ঙ্গনে জার্মানরা নগর-রক্ষা ব্যূহের সর্বত্র নবোদ্যমে আক্রমণ চালায়। ককেশাস আক্রমণোদ্যম লালফৌজের হস্তগত আছে।

লিবিয়ায় মিত্রপক্ষের বাহিনী তব্রুক, বার্দিয়া ও সোল্লুম পুনরধিকার করিয়াছে।

১৪ই নভেম্বর

মিত্রপক্ষের উত্তর আফ্রিকাস্থ হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, তিউনিসিয়াস্থ ফরাসী সৈন্যগণ তথাকার জার্মানদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ট্যাঞ্জিয়ার হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ সৈন্যগণ তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকানরা কাসাব্লাঙ্কার পূর্বদিকে আলজিয়ার্স পর্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র উপকূল-ভাগে সৈন্য নামাইতেছে। আলজিয়ার্সের অদূরে এক নৌযুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া দৃঢ় ধারণা করা হইতেছে।

১৫ই নভেম্বর

উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষীয় ইস্তাহারে প্রকাশ, আলজিয়ার্স হইতে তিউনিসিয়া অভিমুখে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা তাহাদের নূতন ঘাটিগুলি দৃঢ়তর করিতেছে। মরক্কো রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী আলজিরিয়া হইতে তিউনিস অভিমুখে দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে। মিশর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অষ্টম আর্মি তব্রুকের অনুমান ৭৫ মাইল পশ্চিম দিকবর্তী মিমিতে পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ, গত রাত্রিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী তিউনিসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে।

১৬ই নভেম্বর

ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করার পর হইতে এ পর্যন্ত মোট ৪৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, এ পর্যন্ত এক্সিসের মোট ৭৫,০০০ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে। ব্রিটিশ অষ্টম আর্মি পশ্চিম লিবিয়া অভিযানে মিমির ২৫ মাইল পশ্চিমে মার্তুজা নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে।

তিউনিসিয়াতে মিত্রপক্ষের সৈন্য ও জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত মরক্কো বেতার এবং একজন সংবাদদাতা জানান যে, বিজের্তার নিকট জার্মান সৈন্যদের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদের সংঘর্ষ হইয়াছে। নূতন নূতন জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যদল বিমানবাহিত ট্যাঙ্কসহ তিউনিসিয়ায় আসিয়া পৌঁছিতেছে। একজন সমর-সংবাদদাতা বলেন যে, বর্তমান তিউনিসিয়াতে এক্সিস সৈন্যের মোট সংখ্যা হইবে প্রায় দশ হাজার। ফরাসীরা এই সৈন্যগণকে প্রতিরোধ করিতেছে।

১৭ই নভেম্বর

মার্কিন নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে জাপানীরা সলোমনের গুয়াদালকানার তুলাগি এলাকায় অভিযানের চেষ্টা করায় গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর প্রবল জলযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জাপানীদের একটি ব্যাটলশিপ, তিনটি ভারি ক্রুজার, পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার ও আটটি সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হয়; চারটি মালবাহী জাহাজ ধ্বংস হয়; একটি ব্যাটল-শিপ ও ছয়টি ডেস্ট্রয়ার জখম হয়। মার্কিন নৌবাহিনীর মাত্র দুইটি হালকা ক্রুজার ও ছয়টি ডেস্ট্রয়ার নিমজ্জিত হয়। ১৩ই নভেম্বরের যুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর রিয়ার এডমিরাল ড্যানিয়েল ক্যালাগান নিহত হন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, হিটলার তিউনিসিয়ায় জার্মান সৈন্যগণকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করিতে বলিয়াছেন। তিউনিসিয়াতে ফরাসী বাহিনী ও এক্সিস পক্ষীয় বাহিনীর মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়।

লিবিয়ায় মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা দার্ণা এবং মেখেলি দখল করিয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, স্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে কয়েকটি জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। মধ্য ককেশাসে রুশ সৈন্যেরা আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই নভেম্বর

হাজারীবাগের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আরও পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দী হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই নবেম্বর শ্রীহট্ট জেলার বিশ্বনাথ থানার বাড়ি ভস্মীভূত হইয়াছে। দুইজন পুলিশ কর্মচারীর বাসভবনও পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, আসাম ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত পূর্ত বিভাগের একখানি বাংলো সম্পূর্ণভাবে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পুণার সংবাদে প্রকাশ, সাতারা জেলায় ৭৫ জন ফেরার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কোলাপুরের এক খবরে প্রকাশ যে, প্রজা-পরিষদের পাঁচজন কর্মী পাইকারী জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। আমেদাবাদে এক উত্তেজিত জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলী চালায়। দিল্লীতে রেলওয়ে বুকিং অফিসে একটি দেশী বোমা বিস্ফোরণ হয়।

১২ই নভেম্বর

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে রাজস্ব সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জি মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার ঝঞ্ঝা ও বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ জনগণের সাহায্যের জন্য সরকার যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন—তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। বিবৃতিতে রাজস্ব সচিব বলেন যে, গত ১৬ই অক্টোবরের প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও বন্যার ফলে মেদিনীপুর জেলায় ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় এক হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে. মেদিনীপুরে প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, ১৫ লক্ষের অধিক লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং প্রায় ৭৫ হাজার দুগ্ধবতী ও চাষের গরু বিনষ্ট হইয়াছে।

মিঃ সি রাজাগোপালাচারী দিল্লীতে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন যে, বড়লাট গান্ধীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আজ সকালে মিঃ রাজাগোপালাচারী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীরামপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে অক্টোবর বালী হইতে আরামবাগ যাইবার পথে তালাবন্দীর নিকটে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ডাক হরকরার নিকট হইতে পাঁচটি মেলব্যাগ লুঠ করিয়াছে। শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চাতরা বাঞ্চ পোস্ট অফিস হইতে একটি ডাক-বাক্স অপহৃত হইয়াছে।

নাগপুরের খবরে প্রকাশ যে, গত ১৬ই আগস্ট তারিখে চান্দা জেলার চিমুর গ্রামে যে হাঙ্গামা হয়, ঐ সম্পর্কে স্পেশ্যাল জজ আজ দুইটি মামলার রায় দিয়াছেন। এই দুইটি মামলায় ২০ জন আসামীর প্রাণদণ্ড ও ২৬ জন আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মহকুমা হাকিম মিঃ টি ভি ডোঙ্গাজী, নায়েব তহশীলদার সুনাওয়ালী, সার্কেল ইন্সপেক্টর মিঃ জরাসন্ধ ও কনেস্টবল কামতাপ্রসাদকে হত্যা করা সম্পর্কে এই দুইটি মামলা আনীত হয়।

বাঙ্গালোরের খবরে প্রকাশ, বাঙ্গালোর হইতে ৬০ মাইল দূরে কোলাপুর সোনার খনিতে গোলাবর্ষণের মহড়ার সময় চারজন ভারতীয় অফিসার নিহত হইয়াছেন। আরও আটজন ভারতীয় অফিসার এবং দুইজন ব্রিটিশ অফিসার ঘটনাস্থলে আহত হন।

ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ও মনোনীত মহিলা সদস্যা মিসেস্ জুবেদা আতাউর রহমান আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর

বরিশালের খবরে প্রকাশ যে, ১০ই নবেম্বর রাত্রে বরিশাল হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী কীর্তিপাশা গ্রামের পোস্ট অফিস ভস্মীভূত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই পুলিশ 'কংগ্রেস রেডিও'র সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া দাবী করে। এই রেডিও হইতে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রচারকার্য চালান হইতেছিল। গতকল্য রাত্রে পুলিশ গিরগাঁও ব্যাক রোডে এক বাড়ীর পঞ্চম তলায় অবস্থিত একটি স্থানে হানা দেয় এবং একটি রেডিও ট্রান্সমিটার ও বেতারে সংবাদাদি প্রচারের অন্যান্য যন্ত্রপাতি হস্তগত করে।

কোলাপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, ৭৫ জন সশস্ত্র লোক কোলাপুর হইতে ৩৫ মাইল দূরে মেলভ্যান আক্রমণ করে, পোস্ট্যাল ব্যাগও লইয়া যায় ; কিন্তু কোন যাত্রীর কোন ক্ষতি করে নাই।

কটকের সংবাদে প্রকাশ, ঢেনকানলে মুসা মল্লিক, আনন্দ ওরফে কুমারী সেয়েল ও অনুকূল—এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইহারা সাম্প্রতিক মুরি থানার অগ্নিদাহ ও লুঠতরাজ সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে কর্পোরেশনের ৪নং ডিস্ট্রিক্টের হেলথ্ অফিসার ডাঃ এম ইউ আমেদকে কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার নিযুক্ত করা হয়।

সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তাঁহার বালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৪ই নভেম্বর

আমেদাবাদে প্রেসগেট পুলিশ চৌকীর নিকট এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

আজ প্রাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার ৫।৬ জায়গায় খানাতল্লাসী করিয়া কতকগুলি আপত্তিজনক ইস্তাহার ও কাগজপত্র হস্তগত করে।

১৫ই নভেম্বর

হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি ও হাওড়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির সভাপতি শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কংগ্রেস দলভুক্ত কমিশনার শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জিকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভবনে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুক্তাগাছায় পুলিশ ছাত্রদের এক জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বরিশালে কোতোয়ালী থানায় বিস্ফোরণ সম্পর্কে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকার বিশিষ্ট মহিলা কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্তা কিরণবালা রুদ্র নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার হন।

১৬ই নভেম্বর

আমেদাবাদে এক জনতা পুলিশের উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করে ; পুলিশ জনতা বিতাড়নের জন্য একটি গুলী ছোড়ে, কিন্তু কেহ আহত হয় নাই।

যুক্তপ্রদেশের বংশী তহশিলের ২২৯টি গ্রামের অধিবাসীদের উপর ৬ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

১৭ই নবেম্বর

গত ১৫ই নবেম্বর রাত্রে ফরিদপুর জেলা স্কুলের হেড-মাস্টারের অফিস ও লাইব্রেরী ঘরে আগুন দিবার চেষ্টা হয়। চট্টগ্রামে এক নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাবনা জেলার চাটমোহর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

৯ম বর্ষ ৫১ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার ৫৭৫ পৃষ্ঠায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'হিন্দু সমাজের কথা' প্রবন্ধের ২০ লাইনে 'বাঙ্গলার সাধারণ হিন্দু নিত্যানন্দ বীরভদ্রের নিকট বিশেষ ঘৃণী বলে আমার ধারণা' এই স্থলে 'ঘৃণীর' পরিবর্তে 'ঋণী' হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক 'দেশ'।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 28th November, 1942. [৩য় সংখ্যা
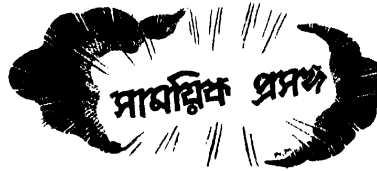
শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ—

বাঙলা সরকারের অর্থসচিব ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন। গত ২০শে নভেম্বর বৈকালে গভর্নর তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়, তাহাতে পদত্যাগের কোন কারণের উল্লেখ নাই। সুতরাং ঠিক কি কারণে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা নিশ্চিতভাবে বলিবার উপায় ছিল না। কিন্তু কারণটি ঠিক বুঝা না গেলেও বাঙলা দেশে বর্তমান অবস্থার আনুষঙ্গিকতার ভিতর দিয়া তাহা মোটামুটি রকমে আন্দাজ করিয়া লওয়া জনসাধারণের পক্ষে কঠিন হয় নাই। পরে এ সম্বন্ধে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে যে, জনসাধারণের সে অনুমান অনেকাংশেই সত্য। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় একজন জাতীয়বাদী পুরুষ। তাঁহার স্বদেশপ্রেম আন্তরিক এবং একান্ত। তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতায় তিনি তাঁহার পিতা পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষের গুণের উত্তরাধিকারী; এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপে মন্ত্রিত্বের কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বহুদিন হইতে বাঙলা দেশের জনস্বার্থ সম্পর্কিত কতকগুলি প্রশ্ন লইয়া বাঙলার গভর্নরের সঙ্গে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুরুতর রকমের মতভেদ ঘটে এবং তাঁহার পদত্যাগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নানা কথা বহুদিন হইতেই শুনা যাইতেছিল। গভর্নরের সহিত এবং বড়লাটের সহিত ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের এ বিষয়ে পত্র বিনিময়ের কথাও শোনা যায়। গভর্নরের সঙ্গে মতভেদের এই আবহাওয়ার মধ্যেই এতদিন পর্যন্ত কাজ কোন রকমে চলিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগে বুঝা যায় যে এই মতভেদ সম্প্রতি এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করে যে, তাঁহার পক্ষে অর্থসচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা আর সম্ভব হয় নাই। বাঙলা দেশে বর্তমান পরিস্থিতির যে সব প্রশ্ন লইয়া এইরূপ মতভেদ গুরুতর হইতে পারে তাহারও কতকটা অনুমান করা গিয়াছিল। প্রবল ঝটিকায় ও বন্যায় বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, কি উপায়ে ঐ সকল অঞ্চল পুনর্গঠন করা সম্ভব হয় এই প্রশ্নই বাঙলা দেশের সম্মুখে এখন প্রধান প্রশ্ন। সাধারণের এই ধারণা জন্মে যে, এইসব বিষয় লইয়াই মতভেদ চরম আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার গভর্নর ও কর্মচারীরা

মিলিয়াই সমগ্র শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন। মন্ত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে লোকসমাজের নিকট দায়ী হইলেও তাঁহাদের ক্ষমতা একান্তই সঙ্কুচিত হইয়াছে। বাঙলা দেশে পুরাদস্তুর সিভিলিয়ানী আমলাতান্ত্রিক শাসন আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন বাক্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ এ সত্যকেই সুস্পষ্ট করিয়া দিল। অবশ্য আমরা বর্তমান শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের কোন দিনই মূল্য দেই নাই; যাঁহারা সেদিক হইতে উহার মূল্য আছে মনে করিতেন, ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ তাঁহাদের সে ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় সেবানিষ্ঠ কর্মীপুরুষ; ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন কেহই ইহা বিশ্বাস করেন নাই। গভর্নরের সহিত তাঁহার এই মতভেদ নীতিগত বলিয়াই লোকে মনে করিয়াছিল। এক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার কর্তব্য বোধে পরিচালিত হইয়া যাঁহারা মন্ত্রিত্ব করিতেছেন অতঃপর তাঁহারা কি করিবেন ইহা বিচার্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে নীতিতে সায় দিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহাদের পক্ষেও সে নীতি সমর্থন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। নিখিল ভারতীয় কোন প্রশ্নেই ডাক্তার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন এমন কথাও কেহ কেহ বলিতেছিলেন, নিখিল ভারতীয় নীতি মূল কারণ রূপে থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা পরোক্ষ, প্রকৃতপক্ষে সে নীতি বাঙলা দেশের শাসনক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রাদেশিক প্রত্যক্ষ প্রশ্নেই ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মতভেদ গুরুতর হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন আমরা ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞপ্তি হইতে আমাদের সেই বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হইতেছে। নানা অশান্তি এবং উপদ্রবে বাঙলা দেশ আজ উৎপীড়িত। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তি মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে দেশের লোকের মনে বড় একটা আশ্বস্তি ছিল। বাঙলার এই একান্ত দুঃসময়ে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে অর্থসচিবের পদে ইস্তফা দিয়া সরিয়া আসিতে হইল ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বাঙলার গভর্নর যদি মনে করিয়া থাকেন তাঁহার এই পদত্যাগে অপরাপর মন্ত্রীদের কাজের পথ সুগম হইবে এবং দেশের সমস্যা সিভিলিয়ান প্রভাবিত নীতির জোরেই সমাধান হইয়া যাইবে, তবে তিনি একান্তই ভুল করিবেন। আপাতত এইটুকুই আমরা বলিতে পারি।

পদত্যাগের কারণ—

সরকারী ইস্তাহারে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের কোন কারণের উল্লেখ নাই। কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয় এ সম্বন্ধে নিজেই একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং সে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হইয়াছে যে, তাঁহার পদত্যাগের সঙ্গে শুধু নিখিল ভারতীয় প্রশ্নই জড়িত নাই, বাঙলা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত সরকারী নীতিও জড়িত রহিয়াছে। ডাক্তার মুখুজ্যে তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "গত এক বৎসর হইতে বাঙলা দেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। গভর্নর বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মন্ত্রীদের অভিমত উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে তিনি সরকারী কর্মচারীদের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিতেছেন।" এই সম্পর্কে ডাক্তার মুখুজ্যে দুইটি বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটি পাইকারী জরিমানার বিধান, অপরটি মেদিনীপুরে অবলম্বিত ব্যবস্থা। তিনি বলেন, "বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ না করিয়াও আমি অনায়াসে বলিতে পারি, বাঙলা দেশে অর্ডিন্যান্স বিরোধীভাবে পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে। দোষী কিনা, তাহা বিবেচনা না করিয়াই হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে। আমরা গভর্নরের নিকট পুনঃ পুনঃ দাবী উত্থাপন করিলেও আজ পর্যন্ত তিনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে বা এই বিষয়ে বর্তমান নীতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নাই। মেদিনীপুর সম্পর্কে আমি অবশ্য অস্বীকার করি না যে, এই জেলার কোথায়ও কোথায়ও রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা দমনকল্পে যে সকল বৈধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, গভর্নমেন্টের দিক হইতে বিচার করিলে তাহার ন্যায্যতা বুঝা যায়। কিন্তু তথায় যে দমন-নীতি চলিতেছে, তাহা অভূতপূর্ব। এই সম্পর্কে তদন্তের আদেশদানের বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা আমাদের নাই।"

মেদিনীপুরে শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট কোন কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগের কথা ডাক্তার মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রীরা বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমনই অসহায় যে, শাসন ব্যাপার সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের নিকট এবং আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়ী থাকিলেও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। অশান্তি দমন করিবার জন্য মেদিনীপুরের যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, ডাক্তার মুখুজ্যে মহাশয় তাহা অভূতপূর্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার উপর বাত্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুরের সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অভূতপূর্বের চেয়েও আর কিছু বেশী। তিনি বলেন, "মেদিনীপুরের শাসনব্যবস্থা কিরূপ হতবুদ্ধিকর ১৬ই অক্টোবর তারিখের ঘূর্ণাবর্ত ও বন্যার পরই তাহা সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। অবিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোন কোন সরকারী কর্মচারী যে ঘোর উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোনও কোনও কর্মচারীর দীর্ঘসূত্রতা ও সহানুভূতির অভাবের জন্য আমরা কোনও প্রতিকার করিতে পারি নাই। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, মেদিনীপুরের অবস্থার যদি আমূল পরিবর্তন না হয়, তবে সাহায্যদান ব্যবস্থা নিরর্থক হইয়া পড়িবে।"

অন্যকে দোষী করিতে আমরা চাহি না। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি পাঠ করিয়া আমাদের নিজেদের উপরই আমাদের ধিক্কার আসিতেছে। সভ্য জগতের কোথায়ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের যাহারা অধিকারী তাহাদের সঙ্গে এমন হীন পরিস্থিতির সঙ্গতি থাকিতে পারে কি? এ অবস্থায় সত্যকার প্রতীকার ব্যবস্থা রহিয়াছে আমাদের নিজেদের হাতে এবং তাহা আমাদের নিজেদেরই ব্যাপার। এ সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি, "আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সর্বপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনি তুলিতে পারি, তবেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পেঁীছিতে পারিব। যত দিন আমাদের সংকল্প সিদ্ধ না হয়, ততদিন এই প্রদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিনিচয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হউক।"

সেবাকার্যে অসুবিধা—

বাঙলার বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয় এবং তাহার প্রতিকারও সহজ নয়। এমন বিপদের একটা শুভ লক্ষণ এই যে, ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসাব-নিকাশ ইহাতে গৌণ হইয়া পড়ে এবং স্বার্থাশ্রিত সেই বুদ্ধি খর্ব হওয়াতে দেশে মহামানবতার একটা বৈপ্লবিক প্লাবন উচ্ছ্বসিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বর্তমানে অবস্থা খুব কম লোকের পক্ষেই স্বচ্ছল, তথাপি এই বিপদে দেশবাসী কেমন মহাপ্রাণতার সঙ্গে সাড়া দিয়াছেন আনন্দবাজার এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বাত্যা-পীড়িত সাহায্য ভাণ্ডারের প্রাপ্তি স্বীকৃতি হইতে আমরা তার পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। এই সাহায্য ভাণ্ডারে ১৭ দিনের মধ্যেই অর্ধ লক্ষ টাকার উপরে সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভারতের নানা স্থান হইতে উদারচেতা ব্যক্তিবর্গ অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। অন্যান্য বহু সেবা-প্রতিষ্ঠানও দুর্গতের সেবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বয়ং গভর্নরের এতৎসম্পর্কিত আবেদন সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের বাঁধা দস্তুরী মাফিক কার্যের নীতির পাঁকে পড়িয়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাকার্যে এখনও অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে, এমন অভিযোগ শুনিতেছি। আমাদের মতে মানুষের জন্যই নিয়ম-কানুন এবং সর্বাগ্রে মানুষের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন। কর্মচারীদের নীতি যাহাতে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়, বাঙলা সরকারের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতি পদমানে প্রতিষ্ঠিত যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক নয়। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার ইহা স্মরণ রাখিয়া এ সম্বন্ধে যাহাতে অভিযোগের কোন কারণ না ঘটে, তাঁহাদের নীতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

ভারত-বিরোধী ভারতসচিব—

বন্দী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাহাকেও দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না, ভারত গভর্নমেণ্টের ইহাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ভারতসচিব আমেরী পুনশ্চ সে কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কেন? দেখা করিতে দেওয়া হইবে না, এ সম্বন্ধে ভারত সচিবের উক্তির তাৎপর্য এই যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে হইলে কংগ্রেসকে স্বাধীনতার দাবী ছাড়িতে হইবে। কংগ্রেস যখন তাহাতে রাজী হইবে না, তখন তাহাদের সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মিল হইতেই পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতের অপর দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ না করিতে দেওয়ার সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের যে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত, তাহার মূলে আর একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহা হইল—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ন্যায় প্রবীণ উদারনীতিকও দেখিতেছি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছেন। সেদিন দিল্লী শহরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতসচিব আমেরী সম্প্রতি যে সব বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধের পরও বৃটিশ গভর্নমেট ভারত হইতে তাঁহাদের প্রভুত্ব অপসারিত করিতে প্রস্তুত আছেন কি না এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে। স্যার তেজবাহাদুর একথাও বলেন যে, 'এখন যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে না পারি, তবে পরে তাহা সুদূর পরাহত হইবে। স্যার তেজবাহাদুরের মতে ভারতের শাসনতন্ত্রের উপর হইতে ভারতসচিবের কর্তৃত্ব আগে লোপ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে স্যার তেজবাহাদুরের দাবী এবং কংগ্রেসের দাবীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কংগ্রেসও এখনই জাতীয় গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা চায়; কিন্তু কথা হইতেছে—স্যার তেজবাহাদুর সে পথে বৃটিশ গভর্নমেন্ট তথা ভারতসচিবের প্রতিবন্ধকতা এড়াইবেন কি করিয়া? বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্যার তেজবাহাদুর উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজাজীর মুখেও সেই কথা। কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে কি পরিমাণ ঐক্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের উপর হইতে কর্তৃত্ব অপসারিত করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৬ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়েকজনের মতভেদ থাকিতে পারে এবং এখন যেমন তাহা আছে, চিরদিনই তাহা তেমনি থাকিবে। ভারতের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সুখ-সুবিধা বণ্টন করিবার ক্ষমতা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের হাতে যতদিন আছে, ততদিন উহার অভাব ঘটিবে না। বৃটিশ মন্ত্রীদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া এই সমস্যা সমাধান সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না।

কলেরায় ভয় কি?—

বাঙলা দেশের কয়েকটি স্থানে, বিশেষভাবে ফরিদপুরে এবং ঢাকা ও সিরাজগঞ্জের কয়েকটি থানায় কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে। নূতন কিছুই নয় এবং অপ্রত্যাশিতও নয়; কারণ বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাব তো আছেই, এই সঙ্গেই এবার নিদারুণ অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। চাউলের দর চড়িতেছে ছাড়া কমিতেছে না। জিনিসপত্র সবই অগ্নিমূল্য। খাদ্যের অভাবে লোকে অখাদ্য এবং কুখাদ্যের দ্বারা উদরপূরণ করিতে বাধ্য হইতেছে; সুতরাং ব্যাধি-পীড়ার আর দোষ দেওয়া যায় কি? দেশের অন্নসংকট কিরূপ অসহনীয় অবস্থায় পেশীছিয়াছে; খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক কর্মী মিঃ হোরেস আলেকজান্ডারের একখানা চিঠি হইতে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। ২২শে নভেম্বর "স্টেটসম্যান" পত্রে এই পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ভদ্রলোক মেদিনীপুর হইতে লিখিয়াছেন,—"আমি রাজচকে পেশীছিলাম। চাউল বিতরণ হইতেছে এবং নার্সরা কলেরা ইনজেকসন দিতেছেন। একটি পরিবারের পক্ষে পনেরো দিনের জন্য চারি সের কিংবা পাঁচ সের চাউল মোটেই কিছু নয়। কিন্তু ইহাও মিলিতেছে না। সারাদিন অপেক্ষা করিয়া বহু রোগী ও নিরীহ ব্যক্তিকে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। চাউল লইবার পূর্বে লোকদিগকে নার্সদের সূচের ফোঁড় লইতে হইতেছে। একজন বৃদ্ধা নার্সকে বলিল, তুমি মা, আমাকে সূচের ফোঁড় না দিয়াই ছাড়িয়া দাও। আমাদের দলের লোকজন একটি গ্রামে কলেরার ইনজেকসন দেন। তথায় চাউল দেওয়া হয় না। লোকেরা তাঁহাদিগকে বলে, যদি অনাহারেই মরিতে হয়, তবে কলেরার ইনজেকসন দিয়া আমাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা কেন? ইহা সত্য কথাই।" দেশের এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদের লেখনী অচল হয় এবং নিজেদের নিদারুণ অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা মুহ্যমান হইয়া পড়ি।

উইলকীর নূতন সুর—

শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকদের ভারত সম্পর্কিত সদিচ্ছাপূর্ণ উক্তি-নিরুক্তিকে আমরা কোন দিনই গুরুত্ব প্রদান করি না। আমাদের পক্ষে সেগুলি হয় ষোল আনা নিজেদের স্বার্থমূলক অভিসন্ধিপূর্ণ অথবা রাজনীতিক ভাব-বিলাসিতার বুদ্বুদ বিকাশ মাত্র। আন্তরিকতা সেগুলির মধ্যে এক ছটাকও থাকে না। কিছুদিন হইল, মিঃ উইন্ডেল উইল্কী ব্রিটিশ নীতি, বিশেষভাবে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতির তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি তিনিই আবার নিউইয়র্কের যুদ্ধ সাহায্য সমিতির এক সভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতির উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ উইল্কীর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বাধীন জাতিসমূহের অপূর্ব সমবায় এবং এই সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহার অন্তরে পরম শ্রদ্ধা রহিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, মিঃ উইল্কী ব্রিটিশকে মানব স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শের শক্তিশালী রক্ষক বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ৩৬ কোটি লোক আজও পরাধীন অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছে এবং মানব-স্বাধীনতার প্রবল সমর্থকগণ যে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করিয়াই ঔদ্ধত্য সহকারে চলিতেছেন মিঃ উইল্কী এক্ষেত্রে সে কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। আশ্চর্য কিছুই নয়। পরানুগ্রহ-প্রত্যাশার মোহ হইতে মুক্ত হইয়াই ভারতকে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে, উইল্কীর উক্তি এই সত্য আমাদের অন্তরে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিবে।

কাগজের সমস্যা—

ভারতবর্ষের মিলগুলিতে যত কাগজ উৎপাদিত হয়, তাহার ৯০ ভাগ ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিবেন, অবশিষ্ট ১০ ভাগ থাকিবে সারা ভারতের জনসাধারণের জন্য। সম্প্রতি গভর্নমেণ্ট মিলগুলির উপর এই নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমান যুগে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রধান বাহনই হইল কাগজ। বলা বাহুল্য গভর্নমেণ্টের এই ব্যবস্থার ফলে কাগজের অভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ এবং বই ছাপান বন্ধ হইবে। ছাপাখানাগুলির কাজ আর চলিবে না। এইসব কারণে দেশের এই দুর্দিনে বহু লোক বেকার হইয়া পড়িবে। কলিকাতার পেপার ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সরকারের এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘও এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পূর্বেই কাগজের দাম অতিরিক্ত হারে চড়িয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পরে লাভখোর ব্যবসায়ীদের আরও সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা চড়া দর হাঁকিতেছেন এবং ক্রেতাদিগকেও নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া সেই বর্ধিত হারেই কাগজ ক্রয় করিতে হইতেছে। এক্ষেত্রে সরকারী প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না; বে-সরকারী প্রয়োজনও যাহাতে সমভাবেই সিদ্ধ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। গভর্নমেণ্টের অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

৩

মানুষ, মানুষকে বুঝতে ভুল করে তখনই বেশীরকম, যখন অপরের মনোভাবের উপর নির্ভর করে তাকে বিচার করতে চায়। শৈলজার মনে হলো—সেও হয়তো বনবিহারীর ওপর এতদিন অবিচার করে এসেছে সেইরকম ভাবেই, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায়, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত। তা যদি না হতো, তাহলে সেদিন তার অনাহারের খবর পেয়ে বনবিহারী অতটা ব্যস্ত হয়ে পড়তো না, হাঁড়িতে ভাত আছে কি না, দেখবার জন্যে অনুরোধও করতে আসতো না তরঙ্গকে।

ঠিক এই চিন্তাসূত্রেরই আর এক প্রান্ত গিয়ে যেন পেঁৗছেছিল বনবিহারীর অন্তরে; সেও ভাবছিল, এতদিন শুধু পরের ওপোর রাগ করেই শৈলজাকে মনে মনে বিচার করে এসেছে অন্য রকম, যার জন্য ঘর-বা-পর, সবাই এক কথায় দায়ী সাব্যস্ত করেছে তাকেই; অথচ সেই যে সব সময়ে সম্পূর্ণ মাথা ঠাণ্ডা করেই সব ব্যবহার করে এসেছে তাদের সঙ্গে, তাও ঠিক নয়। কতকটা উত্তেজনা আর কতকটা যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে ফেলে ঘসে মেজে সে যাদের এতদিন বিচার করে এসেছে, তাদের জন্যে স্নেহ, মায়া কি দয়া দেখাবার অবকাশ তার যে কোনওদিন হয়নি, এ-খবর সকলেই জানতো, কিন্তু তার পরেও যে কোনওদিন হবে না, এ জোর কেউ করতে পারতো না কখনো। তবু, কি জানি কেন, শৈলজার মুখের দিকে তাকিয়েই সে চমকে উঠলো; মনে পড়লো ওর মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে যেন সেই কোলে-পিঠে করা ছোট ভাই ত্রৈলোক্যর অনেক সাদৃশ, অনেক মিল ওর আচারে-ব্যবহারে জড়িয়ে, ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

বনবিহারীর মনের কোন্ শক্ত জায়গাটা যেন নরম হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে; মনে হয় এতদিন জেদ্ আর যুক্তি দিয়ে সে শৈলজাকে যতটুকু বিচার করে এসেছে মনে মনে, সে যেন বিচার নয়; অবিচার, অত্যাচার; এতটা অত্যাচার তার ওপোরে না করলেও চলতো।

কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্যের বোধ হয় এই মানুষের মনোবৃত্তি, তাই মন ওর যতটুকুই কোমল হোক, সামান্য একটা কারণ ধরে কঠিন হতেও দেরি হলো না সেইদিন যেদিন শৈলজা এসে বাইরের দিকের খান-দুয়েক ঘর প্রার্থনা করলে ডিস্‌পেন্সারী খুলবার জন্যে। হাতের হুঁকোয় টান দেওয়া বন্ধ রেখে বনবিহারী মুখ তুলে তাকালো শৈলজার দিকে; ছোট ছোট চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো বিস্ময়ে, বোধ হয় বিরক্তিতেও; ছোট গলাটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে,—"কি বললে?"

সে দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেও শৈলজা নিজের প্রার্থনা জানাতে ভুললো না; মাথা চুলকে—একটু ইতস্তত করে বললে,—"ঘর চাই, বেশীর দরকার নেই; ঐ বাইরের দিকের খান-দুয়েক হলেই হবে।"

"ঘর? কি করবে তুমি, ঘর নিয়ে?"

বনবিহারীর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো,—"ঘর কি হবে হে তোমার?—"

সসঙ্কোচে শৈলজা জানালে,—"আজ্ঞে, একটা ডাক্তারখানা খুলবো ভাবছি!"

"ডাক্তারখানা! এখানে? পাগল নাকি?... ...

মুখ ফিরিয়ে হাতের হুঁকোয় গোটাকয়েক টান দিয়ে বনবিহারী বললে,—"এখানে কত গণ্ডা ডাক্তার, কবরেজ, দুবেলা পথে পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানো? প্রায় এক গণ্ডা। তার সাক্ষী ঐ দেখনা আমাদের পাড়ারই নয়নচাঁদ! মণ্টু ডাক্তার, সোনা কম্পাউণ্ডার, ফণি কবরেজ। এগুলো তো আনাচে কানাচে ঘুরছে, দুগণ্ডা পয়সার লোভে; আবার তা ছাড়াও আছে শহরের পাশ-করা ডাক্তার বদ্যি; হাতে গাড়ি ভাড়া গুঁজে দিলে দুবেলা আসতে পথ পাবে না। সেই জায়গায় করবে ডাক্তারি? তুমি? হুঃ—'

একটা অস্পষ্ট ব্যঙ্গোক্তি করে বনবিহারী আবার তামাক টানায় মনোনিবেশ করলে; সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শৈলজা, বনবিহারীর ব্যঙ্গোক্তিতে ওর মুখের ওপোরে রাগ বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ হতে দেখা গেল না, বরঞ্চ তার বদলে ভেসে উঠলো সামান্য একটু হাসির আভাস, পরমুহূর্তে সেটুকুও মিলিয়ে গেল নিশ্চিহ্নে।

বনবিহারী একবার বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল শৈলজার দিকে, তারপরে আবার নিজেই প্রশ্ন করে বসলো,—"ভাবছো কি, শুনি?—"

"ভাবছি!"

ইতস্তত করে শৈলজা উত্তর দিল—"ভাবছি, তবু একবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল বনবিহারী, তারপরে বললে,—"ক্ষতিটা যে কি, তা তুমি এখন

বুঝবে না; কারণ বয়েস তোমার অল্প, রক্তও তাই গরম; কেমন করে মাথার ঘাম পায়ে ফেললে যে পয়সা জমাতে হয়, তা তুমি জানো না, বোঝোও না; বোঝ না বলেই এমনি খেয়ালের বশে টাকাগুলো নষ্ট করতে চাচ্ছ!"

বনবিহারী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পলক ফেলারও অবকাশ নেই যেন! যেন খেয়ালের খুশীতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিস টাকা নষ্ট করার ইচ্ছা সে দেখছে এই প্রথম; সম্পূর্ণ নূতন, তার পক্ষে অভাবিত।

শৈলজার মনে হলো, বলে,—"কিন্তু সে দান তো আপনার নয়, অপরের, তবে তার জন্যে এত মমতা কেন?"

কিন্তু মনে এলেও কথাটা সে মুখে উচ্চারণ করতে পারলো না; কেমন একটা কুণ্ঠায় জড়িয়ে পড়লো বনবিহারীর সামনে।

ক্রুদ্ধ স্বরে বনবিহারী বললে,—"বেশ, ইচ্ছে তোমার হয়ে থাকে করো, আমি বাধা দেব না, কিন্তু শেষে যেন দোষ দিও না আমার নামে; বলে বেড়িও না যে, আমি সব জেনে শুনেও তোমায় বাধা দেইনি, মিছে লোকসানের কথা বলে বারণ করিনি একাজে হাত দিতে; এইটুকু—শুধু এইটুকু স্বীকার করেই উপকার করো। আর কি উপকার করবে, তোমার কাছে আর কি আশা করিতে পারি আমি?—"

বনবিহারীর কল্কের আগুন বোধ হয় নিভে এসেছিল; পর পর সে জোরে, আরো জোরে তামাক টানতে সুরু করলে আটচালার সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়ে।

কিছু দূরে কতকগুলো ছাতারে পাখি এদিক-ওদিক ওড়াওড়ির সঙ্গে কলকূজন সৃষ্টি করছিল বিশ্রীরকম,—সেই দিকে তাকিয়ে ছিল শৈলজা।

খানিক পরে, অর্থাৎ বনবিহারী এর পরেও আর কিছু বলে কি না বলে, তারি অপেক্ষা করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলে,—"কিন্তু ঘর?—"

"আবার সেই ঘরের কথা!"

রাগে দুঃখে যেন ফেটে পড়তে পড়তে বনবিহারী সামলে নিলে নিজেকে; তবু কণ্ঠস্বরে মনের উষ্মা চাপা পড়লো না একেবারে। ঝাঁঝালো স্বরে বললে,—"এদিককার ব্যবহারের উপযোগী ঘর তো আর আমি তোমার নামে দানপত্তর লিখে দিতে পারিনে—ডাক্তারখানা খুলবার জন্যে! আমারও দরকার আছে, চারিদিকে আমারও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব! বছরে একদিন একবেলা এলেও একমুঠো খাওয়া আর থাকার চালাটা আমায় দিতেই হবে যেমন করেই হোক; সুতরাং ও-সব ঘরের আশা তুমি ছেড়ে দাও; তবে নেহাৎ যদি ডাক্তারখানা খুলে ব্যাগারখাটার ইচ্ছেই হয়ে থাকে তো ঐ পাশের পড়ো-ঘর কয়খানা মেরামত করে নিতে পারো।"

শৈলজা আর চুপ করে থাকতে পারলো না, বলে ফেললে,—"কিন্তু ও-ঘরের যে ইঁট-কাঠ ঝুলছে, ওতে ডাক্তারখানা তো দূরের কথা, ঠেঙ্গিয়ে মারবার ভয় দেখালেও ও-ঘরে মাথা গলাতে মানুষে ভয় পাবে যে!"

জবাব শুনে বনবিহারীর মুখ চোখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠলো,—"ভয় পেলেই হলো! একটা ঘর নতুন করে তুলতে কত খরচ পড়ে জানো? প্রায় হাজার টাকা; এই হাজার টাকা লোকসান দেওয়ার ক্ষমতা আমার কোনওদিনই ছিল না, আজও নেই, সেকথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি তোমায়। আর আমার এখানে থাকতে গেলে ও-সব উড়ুণ্ডেরোগিরি করাও চলবে না,—মোটেই চলবে না; ও-সব আদর-আব্দার যে পারে সহ্য করুক, আমি পারবো না, আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই ও কথা।"

দারুণ উত্তেজনায় বনবিহারী উঠে দাঁড়ালো চৌকী ছেড়ে; যেন শৈলজাকে চোখের আড়াল করবার জন্যেই অন্দরের পথে দ্রুত চলতে চলতে হাত নেড়ে বলে গেল,—"ঐ ঘরই খোঁটা নেড়ে চুণকাম করে নাওগে, দিব্যি হবে।"

বনবিহারীর বৃহৎ বপু হেলে দুলে ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

শৈলজা কিন্তু তখনই সেখান থেকে নড়তে পারলো না, তাকিয়ে দেখলো ঝাঁপালো জিউলি গাছটার পাতাগুলো হাওয়ায় শির শির করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থেকে শৈলজা ফিরে চললো নিজের ঘরে। ইচ্ছে হলেও সাহস করে বলতে পারলো না যে, এ-বাড়িতে শুধু একা বনবিহারীরই নয়, আইন অনুসারে তারও বখরা আছে আধাআধি। কিন্তু উচ্চারণ করতে বেধে গেল মুখে। কেমন একটা সঙ্কোচ আজন্মসঞ্চিত সংস্কারের সঙ্গে মুখ চেপে ধরলে, প্রকাশ হতে দিলে না মনের ইচ্ছাটাকে।

ক্রমশ

হিমালয়ের পথে

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

৩
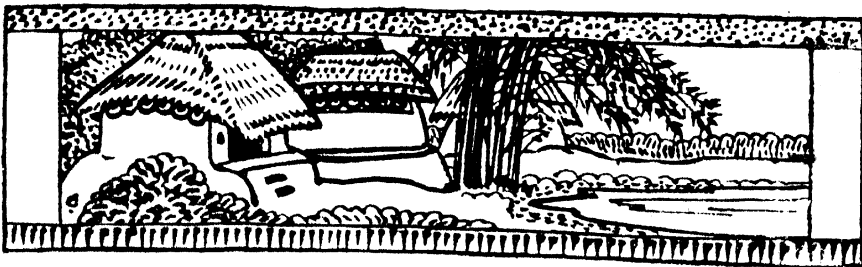
দশবারো দিন আলমোড়া বাসের পর, মায়াবতী আশ্রমের জন্য তৈরী হলাম। আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীরা মায়াবতীতে পূর্বের খবর পাঠিয়েছিলেন। আলমোড়া বাসের এই ক'দিনের মধ্যে হিমালয়ের বরফশৃঙ্গ দেখবার সুবিধা একদিনও আমাদের হয়নি। প্রথম কয়দিন যদিও আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল— কিন্তু শেষদিকে কুয়াসার মত একটা ধূলোর আবরণ চারিদিকে ছেয়ে গেল। কখনো কখনো তার গাঢ়তা এত বেশী হয়ে উঠতো যে, আধ মাইল দূরের গাছপালা, মানুষও ঢাকা পড়ে যেত। আলমোড়ার এই অবস্থা দেখে মন বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শুনলাম এই ধূলোর আবরণ মধ্য প্রদেশের সমতল দেশ থেকে উঠে এখানে আটকে আছে। বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত যাবে না এবং এর দ্বারা অবিলম্বে বৃষ্টির সূচনা করছে। আলমোড়া ত্যাগের আগের দিন রাত্রে

হিমালয়ের বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গ — শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

শংকরের বিদ্যালয়ে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। মাস্টারমশায় (শ্রীযুত নন্দলাল বসু) আমরা সকলে সেইদিন তা দেখতে গেলাম, শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই সেইদিন উপস্থিত ছিলেন। এই জলসার নৃত্য-পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, গান সবই ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টাতেই সম্পন্ন করেছিলো। তাদের কয়েকটি নাচ বেশ ভালো লেগেছিল। আলমোড়ার অনতিদূরবর্তী কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে আমাদের বেড়াতে যাবার কথা হয়, কিন্তু সময় সংক্ষেপ এবং আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল নয় দেখে সব পরিকল্পনাই ত্যাগ করতে হয়।

আলমোড়া ত্যাগ

আলমোড়া শহর থেকে, হাঁটা পথে মায়াবতী পঞ্চাশ মাইল পূবে অবস্থিত। ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটেই সকলে যাতায়াত করে। প্রতি আট দশ মাইল অন্তর সরকারী ডাকবাংলা কিম্বা দেশী সরাইখানা আছে। এইসব সরাইখানার পরিচয় হিমালয় যাত্রী মাত্রেই জানেন। মাস্টারমশায়ের জন্যে একটি ঘোড়া ও দুটি মালবাহী ঘোড়া ঠিক করে আমরা ১৫ই জুন দুপুর বেলা আলমোড়া ত্যাগ করি। আগের দিন রাত থেকে সমস্ত সকাল খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় অনেকটা ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল। আলমোড়া ত্যাগ করেই ২॥ মাইল রাস্তা সোজা নীচে নামতে হয়েছিল একটি নদী পর্যন্ত। সেটি পার হয়ে রাস্তাটি ৬ মাইল পর্যন্ত একটানা উপরে উঠে গিয়েছে। পাহাড়ের এই চড়াই ও উৎরাই ব্যাপারটাই সমতলবাসীদের পক্ষে প্রাণান্তকর হয়ে উঠে। এ ধরণের এতখানি ওঠানামা যেখানে নেই, এ দেশবাসীরা তাকে ময়দান বলতে কিছুমাত্র সংকোচ করে না। এই পথে প্রথম আমরা হিমালয়ের অতি উচ্চ বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়াগুলি দেখতে পেলাম। উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূব কোণ পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে আছে। মেঘের রাজ্য ভেদ করে যখন চকচকে রূপালী মাথা ভেসে ওঠে, তখন মনে হয় না ঐ পাহাড়গুলি এ জগতের, মনে হয় যেন আকাশেই আর এক জগতে তাদের বাসা। এই চূড়াগুলি দেখার পরেই হিমালয়ের একটা বড় রকমের বৈশিষ্ট্য আমার মনে ধাক্কা মারল। তখন বুঝলাম যে, কেন এই পাহাড়ের গায়ে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানীরা তপস্যা করে গেছে ও এখনো করছে। হিমালয়ের এই বিরাট চূড়ার তলায় বসে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির বিশালতার একটা অনুভূতি স্বভাবতই মনে না জেগে পারে না। তখনি অদৃশ্য সৃষ্টিকরের শক্তিকে অনুভব করে প্রাণ বিস্ময়ে ভরে ওঠে। প্রথম রাত্রি "জালনা" নামে একটি সরাইখানায় কাটালাম। পরের দিন দুপুরে "সুরফটক" নামে অপর এক সরাইয়ে খিচুড়ী খেয়ে রাত দশটায় "দেবীধূড়া" নামে একটি প্রায় সাত হাজার ফুট পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম; এ চূড়াটি শক্তি উপাসকদের একটি পীঠস্থান হিসেবে বিখ্যাত। বড় বড় পাথরের আড়ালে দেবীর ছোট মন্দির ও তান্ত্রিক

মায়াবতী দেখতে কেউ আসে না। তাই সাধুরা অযাচিত দর্শকের ভীড় থেকে শান্তিতে আছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই নির্জন পাহাড়ের কোলে ৭।৮টি সাধু তাঁদের সাধনায় দিনযাপন করছেন। আশ্রমের উত্তর দিকটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বহুদূর পর্যন্ত ছোট বড় নানা প্রকার পাহাড়ের মাথাগুলি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা যেত।

এই আশ্রমটির স্থাপিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ইংলণ্ড-বাসী শিষ্য মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর পত্নী দ্বারা। স্বামীজী যখন বিলেতে তখন তাঁর ধর্মোপদেশ শুনে এঁরা দুজনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে নির্জন সাধনায় দিন কাটাবেন, এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। পূর্বে এই স্থানটি অপর একটি সাহেবের চাবাগান ছিল। বোধহয় যাতায়াত কিম্বা এখানকার মাটি ও আবহাওয়া চাগাছের উপযোগী নয় দেখে তিনি যখন বিক্রয় করবেন মনস্থ করেন তখন বাড়ি সমেত সমস্ত বাগানটি মিঃ সেভিয়ার ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ক্রয় করেন। পরে নিজেদের সুবিধা মত বন্দোবস্তের নানা ব্যবস্থা করেছিলেন। এখনো আশ্রমের আশে পাশে প্রাচীন চা গাছের সারি দেখা যায়। সাধুদের বর্তমান বাস-স্থানটি পূর্বে ছিল চায়ের গুদাম ও কারখানা। আশ্রমের গোশালার নিকট অপর বাড়িটিতে চা বাগানের সাহেবরা থাকতেন। স্বামীজীর নাকি ইচ্ছা ছিল এই স্থানেই তাঁর বিশ্রাম ও সাধনার জীবনযাপন করবেন। কিন্তু মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি সেভিয়ার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে যেবার প্রথম আশ্রমে আসেন তার পরে আর আসতে পারেননি। এখানে ১৫ দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে, সেই বৎসরেই মারা যান। শোনা যায় সেভিয়ার পত্নী ও নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ইনি পাহাড়ীদের কাছে মার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন তাদের প্রতি তাঁর দয়া ও সেবার দ্বারা। তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখে একটি পাহাড়ী যুবক পরে আলমোড়া জেলার একজন সম্মানী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। এই আশ্রমটির বর্তমান চেহারার পিছনে এই সাহেব দম্পতীর অক্লান্ত পরিশ্রম সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখানে ইংরেজী "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার সম্পাদকীয় অফিস। তার বাড়িটি দোতলা। পূর্বে এখানে যে ছাপাখানা ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা অসুবিধায়। শোনা যায় এই কাগজটির জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে সেভিয়ার বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। এখন এই কাগজটির বয়স ৪৭ বৎসর। এই আশ্রমের নিজের ফুল ও ফলের বাগান ও ২০।২৫টি গরু সমেত একটি গোশালা দেখলাম। এর সব দেখা শোনা তদারক করেন একজন সন্যাসী, তাঁর হাতেই, আশ্রমের অন্যান্য সন্যাসীদের খাওয়া দাওয়া সুখ-সুবিধার তদারকের ভার। দ্বিতলে একটি অতিথিশালা আছে। তার উপরে দুটি ও নীচে দুটি ঘর। অতিথির সুখ-সুবিধার সব ব্যবস্থাই এতে আছে। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা এখানেই হয়েছিল। একটি আরোগ্য-শালা তৈরী হয়েছে এ অঞ্চলের দরিদ্রদের রোগ নিবারণের জন্যে। বাড়ি নির্মাণের টাকা দিয়েছিলেন ভারতের একজন সামন্ত নৃপতি, তাছাড়া অন্যান্য আরো দান এর

পাহাড়ের গায়ে মায়াবতী আশ্রম — শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

উদ্দেশে তাঁরা পেয়েছেন। সরকার থেকে তাঁরা দান নিতে ভয় পান, কারণ সরকার দশটাকা দিয়ে, তার বদলে যে দশগুণ নিয়ম ও সরকারী পরিদর্শকের রিপোর্টের গুঁতো পাঠাবেন, তাতে করে মানব সেবার আদর্শ মন থেকে দূরে হতে বেশী সময় লাগে না। এই হাসপাতালটি আলমোড়া জেলায় খুবই সুনাম অর্জন করেছে। বহুদূরে থেকে সন্যাসীদের সেবার উপর বিশ্বাস রেখে রোগীরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসে। পূর্বে সন্যাসীরা নিজেরাই ডাক্তারের কাজ করতেন, এখন কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায়, কলকাতার মেডিকেল কলেজের একজন পাশ করা যুবক ডাক্তারকে সেখানে তাঁরা নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের কাজের সহায়তার জন্যে। হাসপাতাল-টির নীচের তলায় রোগীদের থাকবার জন্যে ১২টি বেড করা হয়েছিল। কিন্তু রোগীর চাহিদা বেশী হওয়ায় এই সঙ্কীর্ণ স্থানেই কোন মতে ২২টি বিছানার ব্যবস্থা করেছেন। দোতলার একটি ঘরে অপারেশনের সম্ভবপর সব ব্যবস্থাই রয়েছে, অপর একটি ঘরে দেখলাম ছোটখাট একটি ল্যাবরেটোরী। দরকার মত রক্ত

আলমোড়ার পার্বত্য পথ

পরীক্ষার দ্বারা রোগ নিরূপণের সুবিধা সেখানে আছে। সে অঞ্চলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসার জন্যে এক বছরের মত ওষুধ ইত্যাদি তাঁদের হাসপাতালে মজুদ থাকে। গত বৎসর তাঁদের এই হাসপাতালে সব সমেত ১৩ হাজারের মত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল। সন্যাসীরা সেবার দ্বারা এ অঞ্চলের রোগীদের কাছ থেকে যেভাবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তা দেখবার মত। পাহাড়ীরা নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ না করে এখানেই চলে আসে। সরকারী হাসপাতালগুলি সেখানে নামেই হাসপাতাল। রোগীর রোগ সেখানে নিরাময় হয় না বটে, তবে রোগীকে চিরদিনের মত রোগ শোকের বাইরে পাঠাতে তারা বিশেষ পটু। আমরা থাকতে থাকতেই একদিন দুপুরে একটি পাহাড়ী যুবতীকে নিয়ে এলো মরণাপন্ন অবস্থায়। শোনা গেল আগের দিন বেলা তিনটায় একদল গ্রামের মেয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে ঘাস কাটতে। অসাবধানতাবশত একটি মেয়ে কিছু দূরে একলা চলে যায়। সেই সুযোগে একটি ভাল্লুক তাকে আক্রমণ করে। নানা অসুবিধায় সেই দিনই মেয়েটিকে হাসপাতালে আনা যায়নি। পরের দিন যখন আনা হোলো, তখন দেখা গেল মাথার খুলির উপরের চামড়াটি নাক থেকে শুরু করে আঁচড়ে তুলে নিয়েছে—চোখ দুটি কোন রকমে বেঁচে গেছে। ঘাড় ও পিঠের বহু স্থানের মাংস ক্ষতবিক্ষত। এতক্ষণ ধরে রক্তপাত হওয়ায় গায়ে একটা বীভৎস গন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাঁচবার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করিনি। কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম, সে মেয়েটি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেছে। যদিও হাসপাতালটি অতিথিশালার অনেক দূরে ছিল তবুও মেয়েটির যন্ত্রণাকাতর চীৎকার প্রথম কয়দিন আমাদের কানে প্রায়ই এসে পৌঁছতো।

শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর এখানেই প্রথম আমরা সর্বাঙ্গে প্রচুর জল ঢেলে স্নান করে আরাম পেলাম। আলমোড়ায় জলাভাবে সে সুযোগ হয়নি। মায়াবতীর পথে প্রথমদিন বৃষ্টি পেয়েছিলাম পরে আর পাইনি। প্রথম দুদিন আশ্রমে বেশ কাটলো, কিন্তু তার পরেই শুরু হোলো পাহাড়ে দেশের বৃষ্টি। আমাদের বাড়ির নিকটের পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে অনবরত কালো সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে উড়ে চলেছে, আর কখনো পাতলা ইলসেগুঁড়ির মত বা বড় বড় ফোঁটা ফেলে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের এত কাছে বসে মেঘ ও বৃষ্টির খেলা দেখতে বেশ লাগছিল। মাঝে মাঝে সামনের পাহাড়টাকে ঢেকে ফেলত এবং প্রায়ই পাতলা মেঘের ফাঁকে পাহাড়ের গায়ে গাছের দিকে তাকালে অনেক রকম জন্তু বা মানুষের আকার ভেসে উঠতো। অর্থাৎ গাছগুলির পিছনে ও সামনে মেঘ জমা হয়ে মাঝে মাঝে তার চেহারার বদল করে দিত। আশ্রমের জলের ব্যবস্থাটিও সুন্দর। উপরের একটি ঝরণা থেকে পাইপের সাহায্যে জল আনিয়ে সমস্ত আশ্রমটিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই জলের জন্য সন্যাসীদের কিছু ভাবতে হয় না। আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী বাঙলা সংস্কৃত বহু পুস্তক দেখলাম। বাছা বাছা বই তাতে আছে। এই নির্জন পাহাড়ে এই বইগুলি সন্যাসীদের জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সঙ্গী একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। প্রতিদিন খবরের কাগজ, চিঠি পত্রাদি পাওয়া যায়। এই নির্জনে বাস করেও তাঁরা যে বাইরের জগত থেকে একেবারে বিচ্যুত নন এ সব ব্যবস্থার দ্বারা তা বোঝা যায়। পাহাড়ী চাকরের সাহায্যে এখানকার রান্না তৈরী হয় এবং তার ব্যবস্থাও ভালো; সন্যাসীরা তাদের নানা-প্রদেশের বিশেষ বিশেষ রান্না শিখিয়ে নিয়েছেন। তাই আমরা যে কয়দিন ছিলাম প্রতিদিনই নতুন নতুন কিছু না কিছু মুখরোচক খাবার পেয়েছি। প্রতি সন্ধ্যায়ই সন্যাসীদের কাছে গুরুদেবের গীতাঞ্জলি বা নৈবেদ্য থেকে গান গেয়ে শোনাতাম ঘণ্টাখানেকের মত। ছোট একটি ভলিবল খেলবার মাঠে সাধুরা রোজ খেলতেন। আমি ও মাসোজী যে কয়দিন ছিলাম তাঁদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছি। একদিন সাধুরা মাস্টারমশায়কে শিল্পবিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তিনি সে আলোচনায় সম্মত হয়ে সন্যাসীদের বলেছিলেন তাঁদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন। সন্যাসীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন,—"আর্টের মূলকথা কি ও আর্টের সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার যোগ আছে কিনা?" পরে এ আলোচনাটি সন্যাসীরা সম্পূর্ণ লিখে এনে মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে নিয়ে ছিলেন। "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় প্রকাশ করবার অনুমতিও নিয়েছিলেন।

এই আলোচনা সন্যাসীদের উপযোগী হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ এ মিশনের সাধুরা যদিও কিছু সংগীত চর্চা করেন তবুও চিত্রকলার প্রতি তাঁরা চিরদিনই উদাসীন। তাঁরা ছবি দেখেন,

মায়াবতী আশ্রমগৃহ
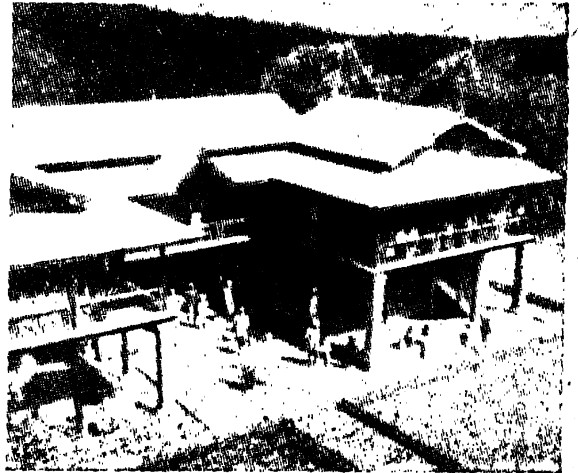
ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, কিন্তু কেউ আঁকেন বলে এখনো শুনিনি বা তার পরিচয় পাইনি। অথচ সন্যাসীরা সকলেই জানেন তাঁদের এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও তাঁর গুরু পরমহংসদেব কিভাবে আর্টকে দেখে গেছেন এবং কি উপদেশ তাঁদের জন্যে রেখে গেছেন। সেখানেই বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী থেকে আর্টের উপর একটি বক্তৃতা আমাদের তাঁরা দেখালেন, পড়ে দেখি তার শেষ কটি লাইনে স্বামীজী বলেছেন,—

The artistic faculty was highly developed in our Lord, Sri Ramkrisna, and he used to say that without this faculty none can be truly spiritual."

এই মূল্যবান উপদেশটি হয়তো এখনো কার্যকরীভাবে সন্যাসীদের কাছে প্রকাশ পায়নি, আশা করি ভবিষ্যতে নিশ্চয় এর প্রকাশ দেখা যাবে।

এখানে সন্যাসীদের যত্নে আমরা যে খুব আনন্দেই ছিলাম সেকথা বলাই বাহুল্য। আলমোড়া ও মায়াবতী আশ্রমে সন্যাসীদের

আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সহিত আমরা

সঙ্গে মেলামেশার পর তাঁদের শিশুসুলভ সরল মনোভাবটির পরিচয় পেয়ে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল। বয়স্কদের মধ্যে ছোট বড় মনোভাব নেই বললেই হয় এবং নিজেদের জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের অভিমানও যে আছে, অন্তত বাইরের পরিচয়ে আমি ধরতে পারিনি। সকলেই বর্তমানকালের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভারতীয় জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের অধিকারও এঁরা পেয়েছেন।

আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল তাই তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার জন্যে সেই পাহাড়ে-বৃষ্টি মাথায় করেই শেষকালে বেরিয়ে পড়তে হোলো। আশ্রম থেকে সন্যাসীরা বর্ষাতি, বিছানাপত্র ঢাকা দেবার জন্যে Oil cloth ইত্যাদি দিলেন। ফেরবার সময় ঘোড়াওয়ালারা সেগুলি নিয়ে আসবে। এখান থেকে হেঁটে গিয়ে আমাদের "তনকপুর" স্টেশনে গাড়ি ধরবার কথা। এই রাস্তাটি ৪৫ মাইলের মত লম্বা। আমাদের নতুন তিনটি ঘোড়া ও তার মালিকরা আশ্রমের বহুদিনের পরিচিত। তারা সর্বদাই সাধুজীদের মায়াবতী ও তনকপুর পারাপার করে। বাড়ি ফেরবার মুখে আমাদের চলার উৎসাহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, যে পথ আমাদের তিন দিনে শেষ করবার কথা, আমরা পাকা দুদিনেই শেষ করে ফেলেছিলাম। তার আরও কয়েকটি কারণ ছিল, প্রথম হোলো,—এ অঞ্চলের পায়ে হাঁটা রাস্তাটি অনেক ভালো। সরকার থেকে সর্বদাই রাস্তাটির তত্ত্বাবধান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এই পথটি দিয়ে তিব্বতের ব্যবসায়ীরা তনকপুরে যাতায়াত করে, তা ছাড়া ভারত সরকারের এক সৈন্যাবাসে যাতায়াতের এটি একমাত্র পথ। এখন বেশীরভাগ পথই উৎরাই। কেবল শেষদিকে একটি বড় পাহাড়ে নদী পার হয়ে চার মাইল চড়াইয়ে উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। পথ চলতে দেখলাম একদল বার্মা ফেরৎ যুবক গারোয়ালী সৈনিক, তিন চার বৎসর পরে একমাসের ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। চেহারা দেখে সৈন্যদলের উপযুক্তবলে একটিকেও মনে হোলো না। প্রত্যেকেই রোগা ও দুর্বল, ম্যালেরিয়া রোগীর মত। এ পথে বহু খাদ বা ঢাল পেয়েছি। রাস্তা থেকে নীচে ঢালের দিকে তাকিয়ে নিজেরই ভয় করে উঠতো, মনে হোতো কত উঁচুতে আমরা আছি। মাঝে মাঝে লোকালয় জন্তু বা মানুষের কোন সাড়া না পেলে উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে দিয়ে দেখতাম যে, সেই পাথরটি কেমন করে ক্রমশই বড় পাথর সংগ্রহ করে বিপুল বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে নীচের দিকে। অনেক জায়গায় বৃষ্টির জলে পাহাড় ধ্বসে গিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে ফেলেছে। কখনো উপর থেকে প্রকাণ্ড পাথরের চাপ এসে রাস্তা আটকিয়ে রেখেছে। আমাদের অনেক স্থানে খুবই সাবধানে চলতে হয়েছিল। এই সব দুর্যোগে সরকারি কুলি ও তদারকেরা সর্বদাই এই নষ্ট রাস্তা মেরামতে নিযুক্ত। প্রায় দুদিন বৃষ্টি কাদায় চলে হিমালয়ের পায়ের কাছে যখন এসে পৌঁছুলাম তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখান থেকে বহুদূরে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও বড় বড় নদীর একটি সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়লো। সমতলভূমির উপরে যে মেঘ জমে আছে—তার উপরের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্যটি দেখে মনে হয়েছিল যেন সামনে একটি বিশাল সমুদ্র। হিমালয় থেকে নেমে চার মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর "তনকপুর" স্টেশনটি পেলাম। এই বনপথে, দুপাশে অনেক রকম বড় ছোট হরিণের দল চোখে পড়লো। কখনো একশো গজ দূর দিয়ে তারা আমাদের দেখে নির্ভাবনায় চলে গেছে। বনের ভিতরে জঙ্গল বেশী নেই তাই এদের গতিবিধি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যেতো। বড় বড় সিংওয়ালা হরিণগুলো যখন ছোটে তখন তাদের মাথা সমেৎ সিং বাগিয়ে নেবার ভঙ্গিটি দেখতে মজার। পাছে গাছের ডালে আটকে গিয়ে চলার ব্যাঘাত করে এই জন্যেই বোধ হয় এই সতর্কতা। দাঁড়িয়ে গিয়ে সিং খাড়া করে আর এক মূর্তি ধরে। ফিরতি পথে আমরা ট্রেনে বিশেষ ভীড় পাইনি। সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় গরমও ভোগ করতে হয়নি। পাহাড়ে ভ্রমণে গায়ে ও হাত পায় যা ব্যাথা হয়েছিল, ট্রেনে একটি লোক দিয়ে ভালো করে গা টিপিয়ে নেওয়ায় বেশ আরাম বোধ করেছিলাম।

আলমোড়া-মায়াবতী ভ্রমণের মধ্যে মাস্টারমশায়কে একটিও বড় ছবি আঁকবার চেষ্টা করতে দেখিনি, কেবল চলতি স্কেচ ছাড়া। সঙ্গে বড় কাগজ রং ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তিনি তার কোনটি সেখানে কাজে লাগাতে পারেননি। আলমোড়ার শ্রীযুক্ত বশী সেন তাঁকে জোর করে আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর আঁকায় মন বসেনি। বলেছিলেন,—ভ্রমণের এই চঞ্চলতার মধ্যে স্থির হয়ে আঁকা চলে না। একটিও ছবি সেখানে আঁকবার চেষ্টা না করে,—শান্তিনিকেতনে ফিরে শারীরিক ক্লান্তি দূর করে তার পরে যে ছয়টি পাহাড়ের ছবি এঁকেছিলেন সেই কটিতে খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে তাঁর মনকে কিভাবে হিমালয়ের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল। হিমালয়ের রূপ তাঁর পূর্বে আঁকা কোন ছবিতে এত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছিল কিনা জানি না।

আহুতি

অমর সান্যাল

সেবার বর্ষাটা জেঁকে বসল আষাঢ়ের গোড়ার দিকেই। একটানা বৃষ্টির তোড়ে সারা শহরের সজীবতা যেন ভিজে ভারী হয়ে গেল। ছুতোর পাড়ার ঢালু রাস্তায় জমে গেল একহাঁটু কাদাগোলা জল। ছেলে মহলে কাগজের নৌকো ভাসানর উৎসব পড়ে গেল।

সকাল হতে না হতেই একদিন ব্রজবাসীকে দেখা গেল —চলেছে জল ভেঙ্গে নদীর দিকে। আবছা অন্ধকারে তখনও চারিদিক ঢাকা। ছুতোররা দোকানের ঝাঁপ তুলে এরি মধ্যে ঠুকঠাক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। শ্রীপদর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ব্রজবাসী ডাক দিল। কাশতে কাশতে বেরিয়ে এল শ্রীপদ। মুখে একটা আধপোড়া বিড়ি, ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর দিয়ে বুকের হাড় দেখা যাচ্ছে।

ব্রজবাসী বললো—ব্যাঙ্কের চেয়ার কখানা হয়ে গেল?

হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীপদ বললো—না। শরীরে জুত পাচ্ছি নে তেমন। আকাশের দেবতা যা ঢালছে দিনরাত, তার ঠেলায়ই অস্থির হয়ে গেলাম।

—বেশ, কত্তা আজ ডেকেছে তোমায়। দুপুরের দিকে গোলায় যেও একবার। (নিম্নস্বরে) জুতো না খেলে তোমার বজ্জাতি যাবে না।

—যাব বৈকি। দুপুরের আগেই যাব। মজুরিও কিছু আনতে হবে। ঘরে কাল থেকে একরত্তি চাল নেই।

মুচকি হেসে ব্রজবাসী আবার চলতে লাগল জল ঠেলে।

বিড়ি টানতে টানতে শ্রীপদ ছেলেদের নৌকো ভাসান দেখতে লাগল। ছেলেবেলায় তারাও ভাসাত,—তবে কাঠের খেলনার নৌকো, কাগজের নয়। শ্রীপদর মনে পড়ল, এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তার নৌকো হল সবচেয়ে ভাল। তার বাবা গর্ব করে বলেছিল—ছিরিপদ আমার নাম রাখবে।

শুকনো হাড়ের মত সাদা বালির ঢেউখেলান স্তর জুড়ে রয়েছে মহানদীর বুকে। শুধু শহর ঘেঁসে জলের একটা ক্ষীণ ধারা এঁকেবেঁকে চলেছে রেলের সাঁকো পর্যন্ত। পাহাড়ে ঢল নামলে নদীর চেহারা বদলে যায়। মহানদী ফুলে ফেঁপে তার নামকে সার্থক করে তোলে।

নদীর গায় গায় একটার পর একটা কাঠের গোলা। বর্ষার জলে জঙ্গল থেকে ভেসে আসে কাঠের গুঁড়ি—শাল, শিশু, পিয়াসাল। গোলার মালিকদের সারা বছরের পণ্য।

এক নম্বর গোলার মালিক শ্রীনাথ মহান্তি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হলেও চেহারায় ও পোষাকে পারিপাট্য আছে। মাথা জুড়ে সোজা সিঁথির ঢেউখেলান চুল, আদ্দির পাঞ্জাবীর ভিতর দিয়ে মেদবহুল দেহের চকচকে কালো রং যেন ফুটে বেরোয়। ঠোঁট দুটি সর্বক্ষণই অকারণে লাল টকটক করে।

মহান্তি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। যে জোর বৃষ্টি নেমেছে, 'বড়ি' (বন্যা) এল বলে। জঙ্গল থেকে কাঠ না এলে নূতন অর্ডারও আর নেয়া যাচ্ছে না। মহান্তি চণ্ডীতলায় মনে মনে মানত করল পাঁচ সিকে। যুদ্ধটাও কিন্তু খুব বেধেছে যা হোক্। তিন বছর ত হল, আর বছর পাঁচেক চললেই শর্মার কপাল যাবে ফিরে। লোহার বাজার ত আগুন, কাঠ না কিনে বাবুরা যাবে কোথায়? তা লাভও হচ্ছে মন্দ না। তিন টাকার চেয়ার ক'খানাই ত সেদিন সাড়ে সাত টাকা দরে বিকিয়ে গেল।

ব্রজবাসী ঘরে ঢুকতে মহান্তির ধ্যান ভঙ্গ হল। জলে জলে তার পা দুটো দেখাচ্ছে অ্যানিমিক রোগীর পায়ের মত। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ঠোঁট হয়েছে নীলাভ। স্ট্যাচুর মত দাঁড়াল সে প্রভুর সামনে।

—আগাম মজুরি না পেলে শ্রীপদ ব্যাঙ্কের অর্ডারটা শেষ করতে পারবে না, এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেললো ব্রজবাসী। সারাটা পথ এই কথা ক'টি সে আবৃত্তি করতে করতে এসেছে।

—কী! মহান্তি যেন ফেটে পড়লো। সে আর কথা বলতে পারল না। তার লাল ঠোঁট সাদা হয়ে গেল। ঠোঁটের রক্ত গিয়ে জমা হল চোখের কোণে।

ব্রজবাসী বুঝলো ওষুধ ধরেছে। সে নিঃশব্দে দোকানের খাতাপত্র নিয়ে বসে গেল। শ্রীপদর বড় বাড় বেড়েছে। খেতে পায় না, তার আবার তেজ দেখ! বলে কি না—মজুরির তাগাদায় যাব! গোলায় একবার এসেই দেখ না, কি রকম মজুরি পাও!

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শ্রীপদর স্ত্রী বসে আছে গালে হাত দিয়ে। খানিকটা মেটে আলুসিদ্ধ খেয়ে শ্রীপদর দুই ছেলে দাওয়ায় বসে কাগজের নৌকো বানাচ্ছে। শ্রীপদ আশ্বাস দিয়ে গেছে, দুপুরের আগেই চাল নিয়ে আসবে।

শ্রীপদ ফিরল। তবে চাল নিয়ে নয়, জলভরা চোখ আর রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে। চূড়ান্ত অপমানের আবেশে তার সারা দেহ তখনও থর থর করে কাঁপছে, ছেঁড়া গেঞ্জিটা ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে পিঠ ও বুক বেয়ে। স্বামীর অবস্থা দেখে হরিদাসী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

ভাঙা গলায় শ্রীপদ বললো—চুপ, কাঁদিসনে বৌ। মজুরি দিয়েচে, এই দ্যাখ। ভাঁজকরা এক টাকার নোট দুখানা হরিদাসীর দিকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শ্রীপদ বলতে লাগল—তা মহান্তি মজুরি ভালই দিয়েছে। দু'খানা চেয়ারের অর্ডার ছিল, চারখানা হয়েছে। লোক পাঠাবে বলেছে কাল সকালে। রাতের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে বাকী

চেয়ার দ্'খানা। এই বিশে, তার নৌকো রাখ্ এখন। বাটালী আর করাতখানা নিয়ে আয় ত একবার এদিকে।

কান্না থামিয়ে হরিদাসী বললো—মহান্তি একদিন তোমাকে মেরে ফেলবে, ওর কাজ ছেড়ে দাও।

গোঁপের ফালি ঠোঁটে চেপে ধরে শ্রীপদ বললো—কাজ ছেড়ে খাব কি শুনি? মেরে ফেললেই হল। থানা পুলিস নেই? যা, আর দেরী করিসনে। ধনী সাউএর দোকান খোলা দেখে এলাম। চল এনে ভাত চড়িয়ে দে তাড়াতাড়ি।

ছেলেদের নিয়ে হরিদাসী বেরিয়ে যেতেই শ্রীপদ এলিয়ে পড়ল দাওয়ার গায়ে। আজ দুপুরের নির্যাতনের স্মৃতি কোনদিনই সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। শ্রীপদর স্তিমিত চোখ দুটো আবার জলে ভরে এল।

—হাতের জোর আছে বটে মহান্তির। গোলায় গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই তার গালে কে যেন হাতুড়ি মারল সজোরে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়তে লাগল ঝর ঝর করে। বাপ-মা তুলে গালাগালি শ্রীপদ বড় একটা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সেদিন মহান্তির কটূক্তি তীক্ষ্ন লৌহশলাকার মত তার সর্বাঙ্গে বিঁধতে লাগল কাঁটার মত। যুধ্যমান ষণ্ডের মত মহান্তি তাকে ঘিরে দাপাদাপি করতে লাগল। শ্রীপদের পিঠের হাড়ে মহান্তির জুতোর তলা গেল খসে প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে পড়ে থাকল আকাশভাঙা বৃষ্টিধারার নীচে। অবশেষে মজুরি মিলল। পাঁচ হাত পরিমাণ নাকখত দিয়ে শ্রীপদ বললো, আর কখনো আগাম মজুরী সে চাইবে না। ব্রজবাসীর হাত থেকে নোট দুখানা নিয়ে সে চললো টলতে টলতে বাড়ির দিকে। নদীর ওপারে তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে।

আষাঢ়ের গোড়ার দিকে যেমন অবিরাম বৃষ্টি সকলকে পাগল করে দিয়েছিল, মাসের শেষাশেষি তেমনি আবার খরা চললো একটানা। পথেঘাটে জলকাদা গেল শুকিয়ে, মহানদীতে 'বড়ি' আসি আসি করেও আসতে পারল না। মহান্তি গোলায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নদীর ওপারে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের দিকে। ওই পাহাড়ে ঢল নামলে তবে মহানদীতে বান ডাকবে। ভাল কাঠ গেছে সব ফুরিয়ে। নতুন অর্ডারও আর নেয়া যাচ্ছে না। চণ্ডীতলার চণ্ডী বৃথাই পাঁচ সিকের পুজো খেয়েছে! আচ্ছা, এবার পাঁচ টাকা মানত করছি মা চণ্ডী; আর একবার দেখিয়ে দাও মা তোমার বৃষ্টির ভেলকী!

চিন্তামগ্ন মহান্তির সামনে দাঁড়াল ব্রজবাসী। বললো—পাঁচটা বেজে গেল যে কর্তা। মিটিংএ যাবেন কখন?

চমকে উঠে মহান্তি বললো—তাইত, বড্ড মনে করিয়ে দিয়েছ। চল, তুমিও চল আমার গাড়িতে।

* * * *

খেলা ময়দানে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের নীচে বসেছে বিশ্বসাহায্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন। লোক আসছে দুটো একটা করে। রাজনীতিকে যারা চিরকাল পরিহার করে এসেছে, তাদেরই দেখা যাচ্ছে প্যাণ্ডেলের নীচে ভিড় জমাতে। মহান্তি এসেছে। রায়সাহেব, রায়বাহাদুরও দুটো একটা এসে জনতার মধ্যে ডাক মারছে। আর এসেছে মক্কেলহীন ছোকরা উকীলের দল, সরকারী চাকুরেদের বাড়ির ছেলেরা ও সুবিধাবাদী বেকারের দল।

যথারীতি আরম্ভ হল সভার অধিবেশন। সভাপতি নিবেদন করলো—বর্তমান যুদ্ধক্লিষ্ট নরনারী কিরূপ অসহায়-ভাবে দিন যাপন করছে ভারতের বাইরে, তা আপনাদের অজানা নেই। আপনাদের ভাণ্ডার উজাড় করে দিন বিশ্বের অগণিত আর্ত জনসাধারণের জন্য।

মামুলী বক্তৃতা একে একে শেষ হয়ে গেলে পর সকলের শেষে উঠল মহান্তি। শহরের বিখ্যাত ধনী শ্রীনাথ মহান্তিকে দেখে দর্শকেরা সোল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল। বক্তা হিসাবে তার সুনামও ছিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনতে লাগল—ভাই সব, ঢেলে দাও তোমাদের সর্বস্ব ক্ষুধার্ত বিশ্বের জন্য। আজ সারা জগৎ তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, কখন ভারতমাতা তার উদার হস্ত প্রসারিত করবে দিকে দিকে। বন্ধুগণ, তোমাদের স্বার্থ আজ ডুবিয়ে দাও মহানদীর জলে, পরার্থে উৎসর্গ কর তোমাদের জীবন।

হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল মহান্তি। করতালিতে নিঃশব্দ সভাতল মুখর হয়ে উঠল। সভাশেষে ঘোষিত হল—মহান্তি দান করেছে একশ' এক টাকা বিশ্ব-সাহায্য সম্মিলনীতে।

* * * *

এবার এল অভিনন্দনের পালা। মৌখিক ভাষ্য আর চিঠির তোড়ে ঘরে বাইরে মহান্তির শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

গোলায় বসে সে সব ভুলে যায়। ব্রজবাসী খাতা লেখে, ধুঁকতে ধুঁকতে শ্রীপদ আসে মজুরী চাইতে। মহান্তির খেয়াল থাকে না। কাঠের অভাবে হাজার টাকার অর্ডারটা তার হাত-ছাড়া হতে বসেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার সে মনে মনে মুণ্ডপাত করে। দূরের পাহাড় তেমনই ধূসর, ধোঁয়ায় ঢাকা। আকাশ শরৎকালের মত শান্ত, মহানদীর জলে পড়েছে তার নীল ছায়া।

ব্রজবাসী বলে শ্রীপদকে—মজুরীর জন্যে আর বসে থেকো না বাপু। দেখছ ত, কর্তার মেজাজ ভাল নেই।

শ্রীপদর মনে জাগে সেদিনকার কথা, যেদিন তার সারা দেহের শিরা উপশিরা অপমানের ধাক্কায় রি রি করে উঠেছিল। তবুও মজুরী নিতে হবে। হরিদাসীর একটা শাড়ি আজ কিনতেই হবে, কাপড়ের অভাবে বাইরে যাতায়াত তার বন্ধ হয়েছে।

অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে বসে আছে হরিদাসী। ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়েছে জঙ্গলের দিকে মেটে আলুর খোঁজে। শ্রীপদ বলে গেছে কাপড় নিয়ে ফিরবে।

রান্না করবার কিই বা আছে। হরিদাসী ত কাল থেকে একরকম উপোস দিচ্ছে। শ্রীপদরা কালও এক মুঠো ভাত পেয়েছে। কাপড় না থাকায় হরিদাসীও যেতে পারছে না ধনী সাউএর দোকানে। সেখানে চাল ঝেড়ে, মসলা বেছে দৈনিক এক গণ্ডা পয়সা তার রোজগার হত।

শ্রীপদর কথা মনে হতেই হরিদাসীর চোখে জল এল। অত খাটে, তবু মজুরী পায় না। মহান্তির দাপটে বেচারার শরীরে কিছু নেই আর। তেত্রিশ বছরেই তার পিঠ গেছে বেঁকে, হাতের শিরাগুলি সব বেরিয়ে পড়েছে। সারারাত কাশে আর আবোল তাবোল বকে। তার নিজের বয়সই বা কত,—মোটে চব্বিশ বছর। এরি মধ্যে তাকে দেখাচ্ছে ষাট বছরের বুড়ির মত। তিন বছর ধরে কি যে হয়েছে দেশের, আধপেটা খেয়েও তারা খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

বাইরে কড়া নড়ার শব্দ হল। শ্রীপদ ফিরে এসেছে। হরিদাসী দরজা খুলে দিতেই মূর্তি দেখে চমকে উঠল। শ্রীপদর মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। রুক্ষ চুল সামনের দিকে অনেকখানি ঝুলে পড়েছে, ক্ষণে ক্ষণে পা টলছে, জবাফুলের মত লাল চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে শ্রীপদ বললো—টাকা দিল না হরিদাসী, মহান্তি টাকা দিল না। ব্রজবাসী ছুড়ে দিল একটা আধুলি। বললো—আজ যা এই নিয়ে। মহানদীতে 'বাঁড়' এলে আসিস্ আবার। কাপড় একখানা কিনতে গেলে লাগবে আরও দু টাকা। পথে পড়লো গুরুদাসের দোকান। ভাবলাম খাইনি অনেকদিন। ঢুকে পড়লাম সেখানে।

শ্রীপদ আর কথা বলতে পারল না। শুয়ে পড়লো কালো কালো ছায়া ঘেরা উঠোনের মাঝখানে। হাওয়া আজ হয়ে উঠেছে তার কাছে গভীর রহস্যময়। অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করে আলোকের ঝরণা ধারা বয়ে চলেছে তার চোখের সামনে। সকল পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করবার শক্তি আজ অর্জন করেছে শ্রীপদ সূত্রধর। হরিদাসী তাকিয়ে আছে ছল ছল চোখে তার দিকে। ছেলেরা অবাক হয়ে দেখছে তার এই নতুন রূপ। একটু পরে মহান্তির লোক আসবে তাগাদা দিতে। শ্রীপদ সব ভুলে গিয়ে পরম নির্ভয়ে চোখ বুজল।

অনেক রাতে শ্রীপদর ঘুম ভাঙল। আকাশে তারার মেলা বসেছে। তার চারিদিকে দপ্‌দপ্ করছে জোনাকীর ফুলকি। ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে একটা মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে। শব্দটা আসছে নদীর পারে জঙ্গলের দিক থেকে। বিষম ভয়ে শ্রীপদ শিউরে উঠল। পেন্নীর ডাক নয় ত? হঠাৎ সে অনুভব করলো, দারুণ পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গেছে। ঘরে জল নিশ্চয় নেই। ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে হরিদাসী বাইরে যায়নি। শ্রীপদ চেয়ে দেখলো ক্লান্তির অবসাদে তিনজনেরই দেহ উঠোনে পড়ে আছে মৃতের মত। এখন আর ডাকাডাকি করা ঠিক হবে না। কিন্তু জল তাকে খেতেই হবে। ভাত না খেয়ে সে এখনও একটা দিন কাটাতে পারে। জলের অভাবে এখনই সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

শ্রীপদ উঠে দাঁড়াল। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। সে আস্তে আস্তে পা বাড়াল নদীর দিকে। সেই শব্দটা এখনও শোনা যাচ্ছে। হোক্ পেন্নীর ডাক। শ্রীপদও কাপুরুষ নয়। ভীতি স্ফীত অন্ধকার তাচ্ছিল্য করে শ্রীপদ জোরে পা চালিয়ে দিল। বালির চর এগিয়ে আসছে। নদীর ওপারে পাহাড়ের সারি যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে। বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল শ্রীপদ। আজ আর কুঁজো হয়ে হাঁটা নয়। একটু এগিয়ে চরের বালিতে পা দিল সে। এক মুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় কে যেন তাকে ফেলে দিল চরের ওপর। ঘোলা জলের তীব্র স্রোত সবেগে ছুটে চলল তার ক্ষীণ দেহের অন্তিম উদ্ধার চেষ্টাকে উপেক্ষা করে।

মহান্তি খবর পেয়েছিল সেই রাতেই, মহানদীতে 'বাঁড়' এসেছে। উল্লাসে তার ঘুম আর হল না। যাক্, হাজার টাকার অর্ডারটা হাত ছাড়া হল না। কিছু মনে করো না মা চণ্ডী, রাগের মাথায় দু এক কথা বলে ফেলেছি। বিশ্বসাহায্য সম্মিলনীটা পয়মন্ত আছে দেখছি। লাভের অংশ থেকে ওদেরও কিছু দিতে হবে।

অন্ধকার কাটেনি তখনও ভাল করে। মহান্তি ফতুয়া গায়ে ছুটলো গোলার দিকে। বহু প্রত্যাশিত বন্যা এসেছে, তাকে অভিনন্দন জানাবে সে সর্বাগ্রে।

বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে মহান্তি আনন্দের নেশায় প্রায় নৃত্য করতে লাগল। এ রকম ঢল মহানদীর বুকে কোনবারই নামেনি। অল্প অন্ধকারে বেশ দেখা যাচ্ছে বালুচরের ওপর দিয়ে ফেনিল স্রোতধারা ছুটেছে সবেগে। মহান্তি তাকিয়ে আছে সম্মোহিতের মত জলের দিকে, কাঠ কবে ভেসে আসবে।

হঠাৎ সে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো। কি যেন একটা ভেসে আসছে দূর থেকে। লম্বা, কালো। শিশুর গুঁড়ি হতে পারে। কার কাঠ কে জানে। খুব সম্ভব দেওকীনন্দনের। তার বরাত ভাল ; অল্প মজুরিতেই খাটিয়ে লোক পায়।

পলকহীন চোখে দেখতে দেখতে মহান্তির মনে হল কাঠের গতি যেন তারই গোলার সামনে এসে থেমে গেল। বোধ হয় কোন রকমে আটকে গেছে। মহান্তি জামা খুলে ফেললো। বেশ করে এঁটে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে সন্তর্পণে জলে নামল। ও কাঠ তার চাই-ই। দেওকীনন্দন পারে তার নামে কেস করবে।

কাঠের গায়ে হাত ঠেকাল মহান্তি। বেশ শক্ত গুঁড়ি মনে হচ্ছে। হিড় হিড় করে দু হাত দিয়ে টেনে কাঠ তুলে রাখল সে জলের কিনারায়। ভোরের আলো তখন বেশ ফুটে উঠেছে। কাঠ দেখে মহান্তি চমকে উঠল। শক্ত কাঠের মত মৃতদেহ সে টেনে তুলেছে জল থেকে। মুখ দেখে সে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সেইখানে। সে মুখ শ্রীপদর। 'বাঁড়'র সঙ্গে সে এসেছে তার মজুরী চাইতে!

ট্রেড-সাইকল বা বাণিজ্য চক্র

শ্রীঅনিলকুমার বসু এম-এ

"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ"। এই পরিবর্তনশীল জগতে সুখ এবং দুঃখ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। আলোর পিছনে অন্ধকারের ন্যায়, মিলনের পশ্চাতে বিরহের ন্যায় দুঃখ সুখের অনুগামী। আর্থিক জগতেও উপরোক্ত রীতি বিশেষ করিয়া খাটে। কখনও দেখা যায়, ব্যবসায় ক্ষেত্রে কর্মের ও অর্থের প্রাচুর্য, বিপুল উৎসাহ, অসীম আশা ও উদ্দীপনা। আবার দেখা দেয় আর্থিক কাঠিন্য, কর্মের শিথিলতা, [illegible] নিরাশা ও নিরুৎসাহ, এই ভাবে বাণিজ্য চক্রের সাথে আমাদের ভাগ্যচক্রও নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও আমরা সুখে বাস করি, আবার কখনও বা আমাদের স্কন্ধে দুঃখ ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ইচ্ছা করিলেও দুঃখকে এড়ান যায় না। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই সুখ-দুঃখের চক্রবৎ গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইংরাজীতে ইহাকে Trade-Cycle বলা হয়।

"Trade-Cycle" বা বাণিজ্য-চক্র অর্থনীতি শাস্ত্রের একটি চিন্তনীয় বিষয়। এই সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্‌গণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন ও তাহার ফলে নানাপ্রকার সিদ্ধান্তের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই এ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেহ একদিক লক্ষ্য করিয়াছেন, কেহ অন্যদিক। অতএব বিষয়বস্তুটি সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে ঐ সকল মতের অল্পাধিক আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমেই ব্যবসায়-জগতের এই উঠানামাকে বিভিন্ন সময়ে ও ঋতুতে সূর্যালোকের গতি-পরিবর্তনের সাথে জুড়িয়া দেওয়া হইল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কতিপয় নির্দিষ্ট বৎসর অন্তে সূর্যালোকের তেজ বৃদ্ধির সাথে ফসলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার সূর্যালোকের অপ্রখরতার জন্য ফসলের পরিমাণও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এইভাবে ফসল বাড়া বা কমার সাথে ব্যবসায় জগতেও সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য চক্রাকারে দেখা দিয়াছে। Prof. Jevons প্রমুখ ব্যক্তিগণ সূর্যালোকের পরিবর্তনকেই ব্যবসায়িক জগতের উত্থান পতনের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে এই অভিমত কিছুতেই টিকিতে পারে না। কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে সূর্যালোক ছাড়াও ফসল বৃদ্ধির যথেষ্ট উপায় বাহির হইয়াছে। বস্তুত পক্ষে বাণিজ্য-চক্রের বিশেষ লক্ষণ হইল এই যে, বাণিজ্যোন্নতির সঙ্গে লোকের স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং বেকার সংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার বাণিজ্যাবনতির সাথে আর্থিক অস্বচ্ছন্দ্য, মূল্যাপকর্ষ ও বেকার সমস্যার পুনরুদয় হয়। একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই অপর লক্ষণটি অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবেই, প্রকৃতপক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেই অভাব অনটনের বীজ লুক্কায়িত। তাই দেখা গিয়াছে যে, স্বচ্ছলতার পরেই দুঃখ-দারিদ্র্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। আবার দুর্দিনের অবসানে সুদিনের সোনালী রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেলীর ভাষায় বলিতে গেলে "when winter comes can spring be far behind?" বাণিজ্যের উত্থান পতনের সাথে সকল ব্যবসায়ই অল্পাধিক্যতর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান মহাযুদ্ধে সামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতির সঙ্গে অপরাপর ব্যবসায়ও লাভবান হইতেছে। সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে অধিক মাত্রায় কাঁচামাল কিনিতে হয়, লোক খাটাইতে হয়। ফলে অপরাপর শিল্প ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অবশ্য এতদ্দ্বারা এই বোঝায় না যে, সকল ব্যবসায়ই সমানভাবে উপকৃত হয়। শিল্পানুসারে লাভের তারতম্য হয় বই কি। যেমন যুদ্ধকালে সামরিক শিল্পগুলিই বেসামরিক শিল্প ও প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক মাত্রায় কাজ বাড়ায় ও লাভ করে, তেমনি বাজার পড়িয়া গেলে এই সকল শিল্পগুলিকেই কাজ গুটাইতে হয়। এই বাণিজ্য-চক্রের প্রতিক্রিয়াও অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক।

১৯২৯ সালে আমেরিকাতে মন্দার যে প্রথম সূচনা হইয়াছিল, তাহাই ধূমায়িত হইয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় প্রত্যেক দেশকেই অভিভূত করে। সেই বিশ্বব্যাপী মন্দার জগদ্দল পাষাণ হইতে বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে পর্যন্তও কোন দেশ মুক্ত হয় নাই। আবার এই যুদ্ধে বাজার যে রকম চড়া হইয়াছে, তাহাতেও প্রত্যেক দেশ ও জাতি প্রভাবিত হইয়াছে। এইভাবে "পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর" পথেই বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে চলিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বাণিজ্য-চক্র সমুদ্র-তরঙ্গের মতই চঞ্চল ও বন্ধুর।

প্রত্যেকটি চক্রই এক গোষ্ঠীভুক্ত, যদিও পরস্পরের সহিত বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য আছে। এই জন্যই Prof. Pigou তাঁহার "Industrial Fluctuation" নামক বইতে লিখিয়াছেন—

"The rhythm is rough and imperfect. All the recorded cycles are members of the same family, but among there are no twins."

অনেকে মনে করেন, কেবল টাকা পয়সার গরমিলেই এই বাণিজ্য-চক্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক প্রভৃতির হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধার দিবার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইলে ব্যবসায়দার ও কারবারী সম্প্রদায়ের হাতে অনেক টাকা আসিয়া পড়ে। তাহারাও মনের সুখে যদৃচ্ছা-লব্ধ অর্থের সহায্যে তাহাদের ব্যবসায়ের জাল আরও বিস্তৃত করিয়া বসে। ফলে শ্রমিক, কারিকর প্রভৃতির রোজগারও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায়। বাজারও ক্রমশ ঊর্ধগামী হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের দরও সমতালে চড়িতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্কের কাছে

এইরূপে অল্প সুদে অবাধ ধার পাওয়াতে বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বর্ধিত হয় এবং ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলও ক্রমশ নিঃশেষিত হইতে থাকে। অতএব নিজেদের ঘর সামাল দিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে একটি অবস্থার পরে সুদের হার বাড়াইয়া লগ্নীকৃত টাকা ও ধার নিবার স্পৃহা সঙ্কুচিত করিতে হয়। অপর পক্ষে ব্যবসায়ীরাও আস্তে আস্তে তাহাদের কাজের পরিধিও সঙ্কীর্ণ করিতে আরম্ভ করে, লোকজন কম খাটায় এবং জিনিসপত্রের উৎপাদনও কমাইয়া আনে। এইভাবে বাজারে মন্দা আবার দেখা দেয়, জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া যায় এবং ব্যবসায়ীর প্রাণ নিরাশার সঞ্চার হয়। এইরূপে বাণিজ্য-চক্রও আবার ঘুরিতে থাকে। কাজেই বাণিজ্য-চক্র যে লেন-দেনের বাড়াকমার উপরই নির্ভর করে তাহাই এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রমাণ করিতে চাহেন। এই সিদ্ধান্তে অনেকখানি সত্য নিহিত থাকিলেও ইহা পুরোপুরি সত্য নয়। টাকা পয়সার কারবার কিংবা লেন-দেন ছাড়াও আরো অনেক কারণে বাণিজ্য-চক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোকে বলে অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু অর্থ ছাড়াও কি জগতে অন্য কারণে অনর্থের সৃষ্টি হয় না? বরফের পাহাড়ে উঠিতে হইলে বরফ-ভাঙ্গা কুঠারের প্রয়োজন। কিন্তু আইন-বলে বরফ-ভাঙ্গা কুঠার কেনা নিষিদ্ধ হইলেও কি পর্বতারোহণ চিরতরে বন্ধ থাকিবে?

আর এক মতে ব্যবসায় জগতে বিশ্বাস (confidence) প্রতিষ্ঠা ও হানির সাথে সাথে বাণিজ্য-চক্রের গতি ফিরে। বাজারে যখন ব্যবসায়-বিশ্বাস (Business confidence) সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজ কারবারের অবস্থাও ক্রমশ উন্নত হইতে থাকে, সকলেই লাভের আশা করে এবং ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখে। ফলে অধিক লাভের আশায় অবস্থাতিরিক্ত অর্থ নিয়োজিত করিয়া (over-trading) চাহিদানুপাতে জিনিসপত্রের জোগান এত বেশী বাড়াইয়া ফেলে যে, উহা লাভজনকভাবে বিক্রয় করিবার আর পন্থা থাকে না। তখন ব্যবসায়ীর অবস্থা হইল "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি," অর্থাৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মজুত মাল যে-কোন দরে বিক্রয় করিয়া ফেলা। এইভাবে আবার ব্যবসায়-বিশ্বাস লোপ পাইয়া নিরাশা ও নিরুৎসাহ ব্যবসায়ীকে আচ্ছন্ন করে। prof. pigou উপরোক্তভাবেই বাণিজ্য-চক্রের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যবসায়িক মনস্তত্ত্বের (Business psychology) সহিত বাণিজ্য-চক্রের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ব্যবসায় জগৎ কেনই বা হঠাৎ গরম হইয়া উঠে, আবার কেনই বা পড়িয়া যায় এবং ব্যবসায়-বিশ্বাস কেনই বা শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস ডাকিয়া আনে—এই প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত মতবাদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা আর একটি মতবাদের আলোচনা করিব। এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান সময়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই মতবাদটি Dr. Hayck প্রমুখ অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্‌গণ কর্তৃক প্রচারিত ও পরিবর্ধিত। তাঁহাদের মতে সঞ্চয় (Savings) ও সঞ্চিত অর্থবিনিয়োগে (Investments) অসমতার জন্যই বাণিজ্য-চক্র দেখা দেয়। Savings ও Investments যখন সমান সমান থাকে, তখন ব্যবসায় জগৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় না। সমান সমান না থাকিলেই যত গোলযোগের উৎপত্তি। সঞ্চয় করার অর্থ ব্যয় না করা। সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সাথে বাজারে চলতি টাকার পরিমাণও সেই অনুপাতে কমিয়া যায় এবং জিনিসের দরও পড়িতে থাকে কিন্তু সঞ্চিত অর্থের উদ্দেশ্য হইল সঞ্চয়ীর আয় বৃদ্ধি করা, অকেজো সঞ্চয় দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে না। কাজেই সঞ্চিত অর্থ লাভজনকভাবে খাটাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। এই অর্থ খাটানর ফলে বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া বাজার-দর উঠিতে থাকে। এইরূপে Savings ও Investments যখন সমান সমান হয়, তখন সঞ্চয়ের ফলে যতটুকু অর্থ অপসৃত হইয়া সাধারণ ভোগ্য জিনিসের দর নিম্নাভিমুখী হয়, ঠিক ততটুকু অর্থ নিয়োজিত (Invested) হইয়া বাজারে আবার চালু হয় এবং সাধারণভোগ্য জিনিস ছাড়া অন্য সকল জিনিসের (Producers goods) দর ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। এইভাবে বাণিজ্যক্ষেত্রে আর অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে না। যে হারে সুদ পাইলে Savings ও Investments সমানসংখ্যক হয়, তাহাই Dr. Hayck "Equilibrium rate" বলিয়াছেন। এই অবস্থাতেই চির-শান্তি বিরাজ করে।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানব-ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মিলে কই? শান্তির অবকাশে অশান্তি আসিয়া বাসা বাঁধে। Dr. Hayck বলেন, বর্তমান সমাজে বিনিয়োজিত অর্থ (Invested) সঞ্চিত অর্থের (Savings) পরিমাণকে অনেকক্ষেত্রে ছাপাইয়া যায়। এতাদৃশ Investment বৃদ্ধির ফলে চলতি টাকার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া বাজার গরম হইয়া যায় এবং জিনিসপত্রের দরও অস্বাভাবিকরূপে বাড়িতে থাকে। চড়াদরের জন্য জনসাধারণকে বাধ্য হইয়া জিনিসপত্র কেনা স্থগিত রাখিতে হয় ও নানাপ্রকারে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হয়। ইংরেজীতে এই অবস্থাকেই "forced saving" বা অনিচ্ছাকৃত সঞ্চয় বলা হয়। আমাদের দেশেও বর্তমানে পণ্য-মূল্যের বৃদ্ধিহেতু উপরোক্ত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। অনেকেই চড়াদরের জিনিস কেনা বন্ধ রাখিয়াছে। সাধারণভোগ্য জিনিসের (consumers' goods) মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়িগণও অধিকতর মূল্যের আশায় ঐ সকল ভোগ্য জিনিস উৎপাদনে সবিশেষ মনোযোগী হয় এবং অপরাপর ব্যবসায় হইতে লোকজন অধিক বেতন দিয়াও সংগ্রহ করে। ফলে, সাধারণ বেতনের হার বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন-ব্যয় (cost of production)ও বাড়িয়া যায়। ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অনেক ব্যবসায়ীকে কারবারের প্রসারতা অনেকটা গুটাইতে হয় ও বেতনের হার কমাইতে হয়। এইরূপে মন্দা আবার দেখা দেয়। ১৯৪১ সালে যুদ্ধ লাগিবার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কল-ওয়ালারা তাঁহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ে কিরূপ অজস্র অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। অধিক লাভের আশায় তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যথাসর্বস্ব কাপড়ের কলে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে ১৯১৭ সালে কাপড়ের বাজার অত্যধিক গরম হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০·৮৪ কোটি টাকা

(শেষাংশ ৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অভিশাপ

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

আকাশে মেঘ করিয়াছে, সন্ধ্যা হইবার আগেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গ্যাসের আলো তখনও জ্বালান হয় নাই। চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ুস্থিত একটি সার্ভিস স্টেশন হইতে পেট্রোল লইয়া গাড়ি রাস্তায় পড়িবার মুখেই বামনদাসবাবু শুনিতে পাইলেন, 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা।' চাহিয়া দেখিলেন, একজন কুষ্ঠরোগী ঠিক তাঁহার গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া একটি পয়সার আশায় গলিতপ্রায় ডান হাতখানি প্রসারিত করিয়াছে।

মুহূর্তের মধ্যে বামনদাসবাবুর অন্তরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া গেল। মনে হইল, এ কণ্ঠস্বর যেন খুবই পরিচিত, আর ভিখারীর কপালের নিকটা যেন অতিপরিচিত একজনের মত। হরিদাসের চেহারা কি এই রকমের ছিল না? কণ্ঠস্বরও যেন অবিকল তাহারই মত! ড্রাইভারকে 'রোখ' বলিয়া পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিলেন, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া একবারে যাহা হাতে আসিল, তাহাই ভিখারীটির বাম হাতে ঝুলান টিনের বড় গোল কৌটাটি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিলেন। নিক্ষিপ্ত অর্থের কিছু কৌটার ভিতরে পড়িল, আর কিছু ফুটপাথে পড়িয়া ঝন্ ঝন শব্দ করিয়া উঠিল। ড্রাইভার পিছনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল এবং পরমুহূর্তেই গাড়ি তীরবেগে চালাইয়া দিল।

তখন ঝড় উঠিয়াছে। উন্মত্ত বাতাসের সঙ্গে মহানগরীর সঞ্চিত ধূলি-আবর্জনারাশি তীব্রবেগে চোখে মুখে আসিয়া লাগিতেছে। 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা'—এই কয়টি কথা যেন ধাবমান গাড়ির পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। একটি অব্যক্ত বেদনায় বামনদাসবাবুর অন্তর অধীর হইয়া উঠিল।

বামনদাসবাবু নির্জন ঘরে শুইয়া সেদিনের ঘটনাটি নানাভাবে ভাবিতেছিলেন। অনুতাপ হইতেছিল, ভিখারীটিকে কেন ভাল করিয়া দেখিলেন না, তাহা হইলেই তো সকল গোলমাল মিটিয়া যাইত।

চাকর বিশ্বনাথের ডাকে তাঁহার চিন্তাধারা বাধা পাইল। বিশ্বনাথ আসিয়াছিল সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার কোথায় যাইবার কথা, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতে। বামনদাসবাবু গভীর বিরক্তির সঙ্গে বিশ্বনাথকে বিদায় করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অন্ধকার হইয়াছে, আলো জ্বালিবে কি না, সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেও বিশ্বনাথের সাহসে কুলাইল না। দুইদিন হইল সে বামনদাসবাবুর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু সে সকল ব্যাপারেই নীরব। কেবল একটি উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস কোনমতে চাপিয়া সে অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্জন অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুইয়া বামনদাসবাবুর মনে একটির পর একটি করিয়া বহুদিন আগেকার বহু দূরের ছবি ভাসিয়া উঠিতেছিল, মহানগরীর কলকোলাহলে ক্ষুদ্র গলিটি তখনও মুখরিত। পূর্বদিকের খোলা জানালা দিয়া পাশের বাড়ির দোতলার ঘরের আলো দেখা যাইতেছে। বামনদাসবাবু মনে মনে আর একবার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীটির চেহারার সহিত হরিদাসের চেহারার মিল খুঁজিবার চেষ্টা করিলেন।

হরিদাস বামনদাসবাবুর ছোট ছেলে। বড় ছেলে শ্যামাদাসের সহিত বামনদাসবাবুর বনিবনাও হয় নাই। শ্যামদাস লেখাপড়া শেখে নাই এবং বাল্য বয়স হইতেই পিতার সহিত নানাভাবে দুর্ব্যবহার করিয়াছে। শেষে বামনদাসবাবুর মোটা অর্থ চুরি করিবার অপরাধে বামনদাসবাবু তাহাকে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সেইদিন হইতেই শ্যামদাসের সহিত তাঁহার সকল সম্পর্ক একেবারে চুকিয়া গিয়াছে।

কিন্তু হরিদাস তাঁহার মনমত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া হরিদাসের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাহার মায়ের মৃত্যু হয়, সেজন্যও হরিদাসের প্রতি তাঁহার টান খানিকটা বেশিই হইয়াছিল। বামনদাসবাবু দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের পরিশ্রমে প্রচুর অর্থের অধিকারী হইয়াছেন। ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার কর্মতৎপরতার খ্যাতিও যথেষ্ট। কিন্তু লক্ষ্মীর সাধনা করিতে যাইয়া তিনি জীবনের অন্যান্য সাধনার দিকে মন দিতে পারেন নাই—স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সহসা ইহা উপলব্ধি করিলেন। তখন জীবন-সূর্য মধ্যাহ্ন গগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ইচ্ছা থাকিলেও নূতন করিয়া কিছু করিবার সময় আর নাই। তিনি আশা করিলেন, নিজের জীবনে যাহা অপূর্ণ রহিয়া গেল, হরিদাসের ভিতর দিয়া তাহাই একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

পাশের ঘরের দোতালার ঘরের আলো নিভিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ দরজার কাছে বার দুই আসিয়া ফিরিয়া গেল, ঘরে ঢুকিতে তাহার পা সরিল না। বাড়ির ভিতরে সবই নিস্তব্ধ। পূব জানালা দিয়া কাল আকাশের গায়ে তারাগুলি অদ্ভুত দেখাইতেছে। এই তো সেদিনের কথা, হরিদাসকে পাশে লইয়া তিনি এই বিছানায় শয়ন করিতেন। ঐ তারাগুলি তাহাদের অনন্তের যাত্রাপথে কতদিন এমনি করিয়া দেখা দিত।

হরিদাস বড় হইল, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিল। ইতিমধ্যে সে তাহার পিতার জীবনে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। হরিদাসের হাতে বামনদাসবাবু সমস্ত বিষয় অর্পণ করিবেন, হরিদাসের সংসার চারিদিক দিয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে—বামনদাসবাবু মনে মনে এমনি কত কি ছবি আঁকিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেও পারিলেন না, পুত্রের মন সরস্বতীর কমল বনের পরিবর্তে কুবেরের সুবর্ণ ভাণ্ডারের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল তাহার বি এ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় এবং বেতন লইয়া গৃহশিক্ষকের সহিত কলহে। বামনদাসবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

হরিদাসের ভবিষ্যতের যে ছবিখানি তিনি এতদিন ধরিয়া মনে মনে আঁকিয়াছিলেন, তাহার উপরে কে যেন এক বোতল কালি ঢালিয়া দিল। কিন্তু তবুও হরিদাস প্রিয়। একমাত্র হরিদাস ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন নাই। শ্যামাদাস—তাহার সহিত তো সম্পর্ক মিটিয়াই গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনের কাহাকেও কাছে ভিড়িতে দেন নাই। তিনি সমস্ত দুনিয়াকে যেন প্রাণপণে দুই হাতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন।

যথাসময়ে বামনদাসবাবু খুব ঘটা করিয়া হরিদাসের বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূকে ঘরে তুলিবার সময় হরিদাসের মায়ের কথা মনে করিয়া বৃদ্ধের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, অশ্রু গোপন করিবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি এই ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই তো সেদিনের সব কথা। আত্মীয়স্বজন অতিথি অভ্যাগতদের আনন্দ কোলাহলে বাড়ি মুখরিত, তিনি বিছানায় বসিয়া ঐ জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবিয়াছিলেন!

বিশ্বনাথ পুনরায় দরজার কাছে আসিয়া ফিরিয়া গেল। অবশেষে কর্তা কখন ডাকিবেন, এই মনে করিয়া দক্ষিণের খোলা

বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। পরে রাতের ঠান্ডা বাতাসে কোন এক সময় সে মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

বামনদাসবাবু ভাবিতেছিলেন, দোষ সবই হরিদাসের শ্বশুরের। তাঁহার পরামর্শেই তো হরিদাস পিতার সহিত এত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহস করিয়াছিল।

ব্যাপার খুব সাধারণ। হরিদাস লেখাপড়া ছাড়িয়া পিতার পাটের বাজারের কাজকর্ম দেখশুনো করিতে লাগিল। বিবাহের বছর দেড়েক পরে হরিদাসের স্ত্রী মনোরমা অসুস্থ পিতাকে দেখিবার জন্য লক্ষ্ণৌ যায়। তাহার যাত্রার কয়েকদিন পরে দুপুরে বাসায় ফিরিয়া বামনদাসবাবু শুনিলেন, হরিদাস সকালে বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনও বাসায় ফেরে নাই। প্রথমে ভাবিলেন, কাজকর্মের গোলমালে ফিরিতে দেরী হইতেছে। ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, সন্ধ্যা হইল; তবুও হরিদাসের দেখা নাই। বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাড়ির কেহই কিছু বলিতে পারিল না। রাতে হাসপাতালগুলিতে খবর লইলেন, কিন্তু হরিদাসের কোন সন্ধান মিলিল না।

প্রায় সমস্ত রাত ছটফট করিয়া কাটিল। ভোরের দিকে বারান্দায় কেদারায় বসিলেন। বসিতেই গভীর ক্লান্তিতে চোখ ধরিয়া আসিল। স্বপ্ন দেখিলেন, একটি রোগগ্রস্ত শীর্ণ কুকুর সারা গায়ে ঘা লইয়া তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যতই সরিতেছেন, কুকুরটিও ততই সরিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন, কুকুরের মুখটি যেন হরিদাসের শ্বশুরের মুখের মত। পরক্ষণেই দেখিলেন, শ্যামাদাস যেন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া খুব হাসিতেছে। এ হাসিতে বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা হইয়া টেবিলের উপর কাগজ চাপা দিবার একটি ভারি পাথর ছিল, তাহাই শ্যামাদাসের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। বামনদাসবাবুর তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তখন গলি দিয়া পাশের বাড়ির বৃদ্ধ উমানাথবাবু স্তব পাঠ করিতে করিতে গঙ্গায় চলিয়াছেন।

হরিদাসের খবর না পাইয়া বামনদাসবাবু আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিলেন। বাহিরের অনেকে সংবাদ লইতে আসে, সান্ত্বনা দিতে আসে, বামনদাসবাবুর এসব ভাল লাগে না। কেবলমাত্র বিশ্বনাথের নীরব সান্ত্বনা তাঁহার অস্থির প্রাণে খানিকটা শান্তি আনিয়া দেয়।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল, হরিদাসের কোন খবর পাওয়া গেল না। তাহার শ্বশুর বামনদাসবাবুর টেলিগ্রামের কোন জবাব দিলেন না। ব্যাপারটি বামনদাসবাবুর খুবই আশ্চর্য বোধ হইল।

চতুর্থদিন দুপুরে কি কাজে সিন্দুক খুলিয়া বামনদাসবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। হরিদাসের মায়ের সযত্নরক্ষিত গহনাগুলির একটিও নাই, এগুলি এতদিন তিনি স্মারক হিসাবে নিজের কাছেই রাখিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কে রাখিতেও ভরসা হয় নাই। কাগজপত্র হাতড়াইতে হাতড়াইতে ব্যাঙ্কের পাশ বহি বাহির হইল। পাতা উল্টাইতেই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। গত ছয় মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য তিনি হরিদাসকে যত টাকা দিয়াছিলেন, তাহার একটিও জমা পড়ে নাই। তাহা ছাড়া এদিক ওদিক দিয়া বহু অর্থ তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপহৃত হইয়াছে। এক মুহূর্তের মধ্যে গোটা পৃথিবী সেদিনের স্বপ্নে দেখা কুকুরটির মত কদর্য ও অপবিত্র বলিয়া বোধ হইল। কোথা হইতে শ্যামাদাসের বিদ্রূপের হাসি যেন তাঁহার কানে আসিতে লাগিল। মনে হইল, তিনি যেন একটি মহাশ্মশানে বসিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহাকে ঘেরিয়া লক্ষ লক্ষ প্রেত উল্লাসে নৃত্য করিতেছে।

হঠাৎ দুর্জয় রাগে তাঁহার সারা দেহ মন জ্বলিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকিতেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এর শাস্তি ভোগ করতে হবে, আমি বলচি—তুই দেখিস বিশ্বনাথ! গলিত কুষ্ঠে হাত পা খসে পড়বে, একটি পয়সার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে—' মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। ভয়ে বিশ্বনাথের দেহ অসাড় হইয়া আসিল।

নির্বাক হতবুদ্ধি বিশ্বনাথের পরনের মলিন কাপড়খানির দিকে বামনদাসবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, কাপড়খানির এক জায়গায় অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, ছেঁড়া কাপড় কোথা হইতে আসিল। পাশের বাড়ির ছাদে দুইটি ছেলে লাফালাফি করিতেছে, তাহারও কোন অর্থ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। একথাগুলিও বামনদাসবাবুর বেশ মনে পড়ে।

একটু একটু শীত করিতেছে, বামনদাসবাবু অন্ধকারে হাতড়াইয়া চাদরখানি গায়ে টানিয়া দিলেন। দূরের কোন ঘড়িতে দুইটা বাজিল, কালপুরুষের খানিকটা দেখা যাইতেছে।

সেদিনের ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে নিজের ছেলেকে এত বড় অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেজন্য বামনদাসবাবু প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন। তিনি কতবার ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, সকল ব্যাধি তাঁহাকে দিয়া ভগবান যেন হরিদাসকে ভাল রাখেন। কে জানিত, নিছক রাগের বশবর্তী হইয়া যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই একদিন তাঁহার আকাশবাতাস ও সমস্ত জীবনকে এমন ঘোরতর নিরানন্দময় করিয়া তুলিবে!

বামনদাসবাবুর রাগ অল্পদিনের মধ্যেই পড়িয়া আসিল এবং হরিদাসকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তিনি লালায়িত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তবুও কোথায় যেন বাধিল, যাহার ফলে নিজে খোঁজ করিয়া হরিদাসকে বাহির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার দরজা তো খোলাই রহিয়াছে, হরিদাস সহজভাবে প্রবেশ করিয়া নিজের স্থানটিতে বসিবে, ইহাতে আর বাধা কি? হরিদাস কেবল একবার তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা হইলেই তো সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

এক একদিন মনে হয়, হরিদাস আসিবে। সেসব দিন বামনদাসবাবু কোন কাজ করিতে পারেন না। সকাল হইতে বিশ্বনাথের বসিবার উপায় থাকে না। হরিদাসের ঘর দশবার করিয়া পরিষ্কার করা, টেবিলটি বারে বারে সাজান ইত্যাদিতে বেলা বহিয়া যায়। বামনদাসবাবুর দুপুরে বিশ্রাম করা ঘটিয়া উঠে না। যখন অধিক রাত্রে অন্ধকার বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসেন, নিজের তখন অলক্ষ্যেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের স্তরে স্তরে এমন কত দিনের কত দীর্ঘনিশ্বাস জমাট বাঁধিয়া আছে।

হরিদাস সম্বন্ধে তিনি অনেক গুজব শুনিতে পাইতেন। কখনও শুনিতেন, শ্বশুরের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া হরিদাস রাতারাতি লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছে। কখনও বা শুনিতেন, শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুই-চারিবার কলিকাতায়ও হরিদাসের আগমনবার্তা তাঁহার কাছে পৌঁছাইত। কিন্তু এসব খবরের সত্যাসত্য পরখ করিতে তাঁহার বাধিয়াছে। যখনই মনে করিয়াছেন, হরিদাসের সংবাদ লইবেন, তখনই কোথা হইতে একটি দুর্জয় অভিমান তাঁহাকে বাধা দিয়াছে। ক্রমে গুজব কমিয়া আসিল।

আরও কিছুদিন পরে বামনদাসবাবু লোকপরম্পরায় পুত্রবধূর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তখন হইতে অভিমান বিসর্জন দিয়া তিনি হরিদাসের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

বামনদাসবাবুর এক এক সময় ভয় হইত, হয়ত গলিত কুষ্ঠে হরিদাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়িবে! সঙ্গে সঙ্গে একখানি ছবি তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিত। হরিদাস রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হাতপায়ের আঙ্গুল শেষ হইয়া গিয়াছে, নাকের অর্ধেকটাও নাই। ডান হাতের ঘা লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দিয়া রসের মত কি যেন ঝরিতেছে। কয়েকটি লক্ষ মাছি বারে বারে তাহার উপর বসিবার

চেষ্টা করিতেছে। পরনের কাপড় এবং গায়ের শার্ট শতছিন্ন এবং তেলে ঘামে ময়লায় বিবর্ণ ও বীভৎস। বাম পায়ের আঙ্গুলহীন পাতা ছেঁড়া কাপড় দিয়া জড়ান। আবর্জনা স্তূপ হইতে কুড়ান একটি ছেঁড়া থলে, তাহারই মধ্যে তাহার যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ, বাহিরে দড়ি দিয়া বাঁধা, আর এক গাছি দড়ির সাহায্যে থলেটি বাম কাঁধে ঝুলান। বাম হাতে লাঠি এবং তার দিয়া বাঁধা একটি টিনের বড় গেলাস কৌটা। একটি পয়সার জন্য সে কি করুণ মিনতি, পথের ধারে সারাদিনের সে কি ক্লান্ত-প্রতীক্ষা! তাহার পাশ কাটাইয়া তাহার কলুষিত বাতাসের স্পর্শ এড়াইয়া চলিবার জন্য পথিকের সযত্ন প্রচেষ্টা। বামনদাসবাবু আর ভাবিতে পারিতেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিতে থাকিত।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। নিজ ব্যয়ে তিনি একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে রোগীদের যাহাতে চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ইহার জন্য তিনি অর্থব্যয় করিতে এতটুকু কার্পন্য করিতেন না। তাহা ছাড়া রাস্তায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভিখারী দেখিলেই তিনি এ সাহায্য করিতেন। এরূপ কোন ভিখারীরহাতে তিনি কখনও পয়সা দিতেন না, কেননা জানিতেন ইহাদের হাতের পয়সার মারফৎ রোগের বীজানু ছড়াইতে পারে। তাই ইহাদিগকে খাবার কিংবা জামা কাপড় কিনিয়া দিতেন। কেবলমাত্র সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

বামনদাসবাবুর সর্বদা ভয় ছিল হয়ত হঠাৎ হরিদাসকে দেখিতে পাইবেন সারা দেহময় এই সাংঘাতিক ব্যাধি লইয়া ভিক্ষা করিতেছে। কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শন করিতে যাইতেও তাঁহার ভয় করিত, যদি সেখানে হরিদাসকে দেখিতে পান!

এদিকে হরিদাসেরও যথেষ্ট ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যে শ্বশুরের পরামর্শে এতদিন সে পিতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহার নির্বুদ্ধিতা দোষেই সে সর্বস্বান্ত হইল। হরিদাসের শ্বশুরের একটি ব্যবসায় ছিল, তাহার পিছনেই তিনি নিজের এবং হরিদাসের যথাসর্বস্ব অর্থ ঢালেন। তাঁহার দুরদৃষ্টি এবং সতর্কতার অভাবে হঠাৎ ব্যবসায়টি নষ্ট হইয়া যায়। তখন নিদারুণ দারিদ্র্য শ্বশুর এবং জামাতার মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। ইহার কিছুদিন পরেই মনোরমার মৃত্যু হয়। নিঃস্ব হরিদাস রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পিতার নিকট ফিরিবার উপায় নাই। শ্যামাদাসকে তিনি কি ভাবে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন হরিদাস তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। অথচ এভাবে দিন কাটে না। এত দিনে সে বুঝিয়াছে অর্থই জীবনের একমাত্র সম্বল নয়, অর্থ ব্যতীত আরও অনেক কিছু আছে যাহা দ্বারা সমাজের বুকের উপর দিয়া বীর দর্পে চলা যায় না সত্য, কিন্তু যাহা জীবনে একটি সুশীতল সুনিশ্চিত ছায়া রচনা করে।

আর্থিক কষ্ট ও তজ্জনিত অর্ধাহার অনাহার সবই তাহার প্রায় গা-সওয়া হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পিতার মার্জনা না হইলে সে তো বাঁচিতে পারে না! পিতা তাহাকে গ্রহণ করুন বা না করুন তাহাতে কিছু যায় আসে না, তিনি ক্ষমা করিয়াছেন এইটুকু হইলেই সে অনায়াসে বাকি দিনগুলি কাটাইতে পারিবে।

হরিদাস ঠিক করিল সে পিতার পায়ে ধরিয়া বলিবে, তাহার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল তিনি যেন একবার তাহার মাথায় হাত দিয়া সকল অপরাধ মার্জনা করেন।

পিতার নিকট ক্ষমা চাহিবার উদ্দেশেই সে কলিকাতায় আসিল। এখানে আসিয়া সে একটি সস্তা হোটেলে আশ্রয় লইল। একথা সেকথা চিন্তা করিয়া প্রথম দিন সে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিল না। দূরে থাকিতে সে যে-কাজটি অতি সহজ মনে করিয়াছিল, কাছে আসিয়া দেখিল তাহা অত্যন্ত কঠিন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে সে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া বাড়ির গলি পর্যন্ত আসিল। ঠিক এই সময়ই ঝড় উঠিয়া আসিল। পাশ দিয়া সশব্দে একখানি মোটর গাড়ী যাইতেই সে চমকিয়া দেখিল গাড়ীতে বামনদাসবাবু উপবিষ্ট। হরিদাস তৎক্ষণাৎ ফিরিল। ভাবিল, আজ থাকুক, কাল না হয় দেখা যাইবে। দিনের বেলায় সে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকিতে পারিবে না, ভয় পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে। পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বাড়ি পর্যন্ত আসিল। দেখিল বাহিরের দরজা বন্ধ। কড়া নাড়িবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। হরিদাস আর কিছু না ভাবিয়া দ্রুত সরিয়া গেল। বড় রাস্তায় আসিয়া ভাবিল, আজ যখন বাধা পড়িয়াছে তখন কাল আসিলেই চলিবে।

পরদিন সকাল হইতেই সে বারে বারে দৃঢ় সংকল্প করিল, আজ পিতার কাছে যাইতেই হইবে। দুপুরে বিছানায় শুইয়া সে পিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতের ছবিখানি কল্পনা করিতে লাগিল। সে কি ভাবে দাঁড়াইবে, পিতা কি বলিবেন, উত্তরে সে কি বলিবে ইত্যাদি।

কিন্তু সেদিন দুপুরে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। হরিদাসের হোটেলে একজন ভদ্রবেশধারী চোর প্রবেশ করে এবং তাহার পাশের ঘরের তালা কি করিয়া খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে ঘরের ভদ্রলোকের খোলা সুট কেস হইতে সোনার বোতাম, ফাউন্টেন পেন, কিছু অর্থ প্রভৃতি লইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হয় তখনই ধরা পড়ে। চোরটি ভাবিয়াছিল, দুপুরে অধিকাংশ লোকই কাজকর্মে বাহিরে থাকে, বাকি যাহারা তাহারাও দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, এই সুযোগে কাজ সারিয়া অনায়াসে সরিয়া পড়া সম্ভব হইবে। কোন্ ঘরে ঢুকিবে এবং তথায় কি পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে বোধ হয় আগেই খোঁজ লইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপারটি দাঁড়াইল অন্যরূপ।

গোলমালে হরিদাসের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সমবেত ব্যক্তিদের হাতে চোরের প্রাথমিক বিচার হইল, পরে পাকা বিচারের জন্য তাহাকে লইয়া সকলে থানায় যাত্রা করিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিদাসকে সঙ্গে যাইতে হইল। কেননা সে নবাগত, থানায় যাইতে অসম্মত হইলে চোরের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, এরূপ সন্দেহ যদি কাহারও মনে জাগে, এজন্য সে আপত্তি করিতে পারিল না।

সেদিন থানায় কাজের চাপ খুব বেশি, কাজেই তথায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। হরিদাস ছটফট করিতে লাগিল। থানার কাজ সারিয়া সকলে যখন রাস্তায় আসিল, তখন রাত প্রায় নয়টা। হরিদাস দেখিল, বামনদাসবাবুর বাড়ি যাইতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত সময় লাগিবে। এত রাতে যাওয়া নিশ্চয়ই সমীচীন হইবে না।

হরিদাস মনে মনে স্থির করিল, সকাল হইলেই সে বামনদাসবাবুর নিকট উপস্থিত হইবে। সে যখন ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে, তখন কে দেখিল না দেখিল, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তবুও সারা রাত সে ছটফট করিয়া কাটাইল। এমন অস্বস্তি সে আগের দুই দিন বোধ করে নাই।

বামনদাসবাবুর একবার মনে হইল, কে যেন করুণকণ্ঠে বলিতেছে, 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা'। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রের আলো জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে. ঘরের মধ্যে একটি বাদুর ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। বামনদাসবাবু আবার বিছানায় শুইলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ।

বামনদাসবাবু দেখিলেন, কলিকাতার উপর সন্ধ্যার কাল ছায়া

নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। মাঠের ধারে যে-গাছতলায় তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পাশ দিয়া দুইজন ভদ্রলোক গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে, দুইজনেরই যেন কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। বামনদাস-বাবুর মনে হইল, তাঁহার সারাদিন খাওয়া হয় নাই। পার্শ্বস্থিত মলিন ঝুলির ভিতর হাতড়াইয়া দেখিলেন, খাওয়ার কিছু নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডান পায়ের একটি আঙ্গুলও নাই, লাঠির উপর ভর দিয়া কোনমতে চলিতে হয়। ডান হাতের আঙ্গুল-গুলি অর্ধেক হইয়া আসিয়াছে, হাতের ঘা দুই দিন হইল বাড়িয়াছে। উপরের ঠোঁট আর নাক কেমন যেন অসাড় হইয়া আসিয়াছে। বাম হাতের বিকৃত আঙ্গুলের সাহায্যে ঝুলিটি কোন মতে কাঁধে ফেলিলেন। তার দিয়া ঝুলান টিনের গোল কৌটাটি বাম হাতের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইলেন। কয়দিন হইল সারা দেহে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে। সারাদিন খাওয়া হয় নাই। কিছু খাইলে হয়ত একটু ভাল লাগিবে। রাস্তার ওপারেই একটি সার্ভিস স্টেশন। বামনদাসবাবু একপা দুইপা করিয়া কোন মতে রাস্তা পার হইলেন। সেই সময় একখানি গাড়ি পেট্রোল লইয়া রাস্তায় পড়িতেছিল। বামনদাসবাবু ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া করুণভাবে বলিলেন, 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা।' হঠাৎ গাড়ির ভিতর হইতে সাহেবী তাড়া খাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গাড়িখানি মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে দূরে মিলাইয়া গেল। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। আর একখানি গাড়ি তখন রাস্তায় পড়িতেছিল। গলা দিয়া স্বর বাহির হইতেছে না, তবু আবার বলিতে হইল, 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা।'

পরদিন সকালে হরিদাস বাড়িতে আসিয়া দেখিল বিরাট গোলমাল চলিতেছে। বামনদাসবাবু রাতে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন কেহই জানে না। তাঁহার পরিত্যক্ত কাপড়খানি বারান্দায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার অন্যান্য জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি সবই যথা স্থানে রহিয়াছে; কেবল এক কোণে তারের উপর ঝুলান বিশ্বনাথের মলিন ছিন্ন কাপড়খানি এবং নীচে সিঁড়ির নিকট দেয়ালে ঠেস দেওয়া বিশ্বনাথের লাঠিখানি নাই।

সারাদিন বামনদাসবাবুর কোন সন্ধান মিলিল না। সন্ধ্যার সময় গভীর ক্লান্তি ও অপরিসীম নৈরাশ্য লইয়া হরিদাস যখন বাড়ি ফিরিতেছিল তখন গ্যাসের আলোয় দেখিতে পাইল, একটি সার্ভিস স্টেশনের নিকটবর্তী ফুটপাথের উপর জনৈক বৃদ্ধ ভিখারী লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিখারীর বাম কাঁধে একটি ঝুলি, বাম হাতে তার দিয়া ঝুলান টিনের একটি বড় কৌটা। হরিদাসের কেমন যেন সন্দেহ হইল। সে ভিখারীটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় পেট্রোল লইয়া একখানি গাড়ি রাস্তায় পড়িতেছিল। হরিদাস চিনিতে পারিল। তাহার বৃদ্ধ পিতা তখন ডান হাত প্রসারিত করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন, 'সারাদিন খাওয়া হয়নি বাবু, একটি পয়সা।'

ট্রেড সাইকেল বা বাণিজ্যচক্র

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

তাহাই বর্ধিত হইয়া ১৯১৭—২২ সালের মধ্যে ৪০·৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। বোম্বাইর কলওয়ালারা এমন কি বার্ষিক শতকরা ৪০·১ টাকা হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরিণাম হইল ১৯২৩ সালে বস্ত্র-শিল্পের শোচনীয় দুর্দশা। এই দুর্দশা হইতে বস্ত্রশিল্প ১৯৩৬ সাল পর্যন্তও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাকেই বলে বাণিজ্য-চক্রের নিষ্ঠুর পরিহাস!

ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়াই এই জগৎকে চলিতে হয়। ব্যবসায় জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। উত্থান-পতন ব্যবসায় জগতেরও নিয়ম। পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং সেই নিয়মে বর্ষ-চক্রও চলিতেছে। কথায় বলে, "এক মাঘে শীত যায় না" অর্থাৎ মাঘ মাস প্রতিবর্ষেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। ব্যবসায়জগৎ সম্বন্ধেও ইহাই মূল কথা—"চিরদিন কভু না যায় সমান।"

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৫

বিনোদের কথায় মঙ্গলার বুকের মধ্যে ধাক করে উঠল। তা হলে এতক্ষণ বিনোদের মা যে সব কথা বলছিল তা সব মিথ্যা। বিনোদ তার মাকে বিশেষ করে মঙ্গলার কাছেই পাঠায়নি, সমস্ত পাড়া ভরেই তাকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে এবং অন্য কোথাও না পেয়েই এখানে এসেছে, পাড়ার অন্য কোন বাড়িতে ধার না পেয়ে বিনোদের মাকে যেমন আসতে হয়েছে এখানে। বুড়ি তা হ'লে এতক্ষণ ধরে সব মিথ্যা কথা বলছিল বানিয়ে বানিয়ে মঙ্গলার কাছে। বিনোদের মা মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর বলল, "কিন্তু বাবা, মিথ্যা হয়রাণ হতে তুই গেলিই বা কেন। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা-তো তুই জানিসই।"

ঘরের মধ্যে মঙ্গলার মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। ছলনাটা তাহ'লে বিনোদের মার নয়, বিনোদের নিজেরই। সে যে সোজা-সুজি তার মাকে মঙ্গলার কাছে পাঠিয়েছে ধারের জন্য একথা লজ্জায় সে স্বীকার করতে পারছে না। এত লজ্জা কেন বিনোদের? বিনোদের লজ্জার কথা ভেবে মঙ্গলার নিজেরই যেন লজ্জা করতে লাগল। বিনোদের মার দেরী দেখেই কি বিনোদ এখানে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে, না অন্য কোন কারণ আছে তার? বিনোদের ছলনায় সকৌতুক গর্ব অনুভব করে মনে মনে হাসল মঙ্গলা, তারপর গোঁসাই গোবিন্দকে যেমন সিধে দেয়, তেমনি করে বড় একখানা থালায় চাল ডাল, দুটো আনাজ সাজিয়ে মঙ্গলা বিনোদের মার সামনে এনে রাখল। বিনোদের মা ডালা থেকে সেগুলিকে আস্তে আস্তে আঁচলে ঢালতে ঢালতে বলল, "বাঁচালে বউমা, হাত পাতলে কোন দিন তুমি না করেছ যে আজ করবে? টাকা-পয়সা অনেকেরই থাকে বউমা, কিন্তু এমন কলজে থাকে কজনের?"

ধার পাওয়ার জন্য বিনোদ কিন্তু মুখে কোন রকম কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করল না, এ সব যেন চোখেই পড়ল না তার। শুধু যাওয়ার সময় বলে গেল, "সন্ধ্যার সময় দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দেবেন বউদি। নাম কীর্তনের আসর বসাবার ইচ্ছা আছে। একজন গুণীলোককে ধরে এনেছি। ভাবলাম আমরা তো তার গান কত জায়গাতেই শুনি, কিন্তু আপনারা তো আর শোনেন না। যাবেন কিন্তু অবশ্য, কোন অসুবিধা হবে না, আমারি ঘরের মধ্যেই বসবার জায়গা করে দেব মেয়েদের।"

বিনোদের মা বলল, "যাবে রে যাবে, তোর আর অত করে বলবার দরকার হবে না। মা আমার কীর্তনের ভারি ভক্ত। গানের সামান্য আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কান খাড়া করে থাকে।"

বিনোদের মার অত বেশী ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ভালো লাগে না মঙ্গলার। কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়, আর বিনোদই বা কি রকম মানুষ, তার মার সামনে মঙ্গলাকে কীর্তন শোনবার জন্য অমন করে নিমন্ত্রণ না করলেই কি হোত না? মনে মনে কী ভাবছে বিনোদের মা? তার মিষ্টি কথা, মুখ টিপে টিপে হাসা, গায়ে পড়ে অমন সোহাগ দেখান, মঙ্গলা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মানুষ বড় সহজ নয় বিনোদের মা, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে মঙ্গলাও ছেড়ে কথা বলবে না, তেমন বাপের ঝি সে নয়।

দুজনের সংসার, কাজকর্ম তেমন কিছু নেই, তবু রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া সারতে বেলা রোজই গড়িয়ে যায় মঙ্গলার। দুপুরে সুবল দোকানেই যায়। দোকানের কাজের জন্য মাণিক নামক যে ছোকরাটিকে সুবল রেখেছে সেই রেঁধে দেয়। সকাল থেকে উঠে মঙ্গলা এ কাজ ও কাজ করে, কাজ তত না থাকলেও হাত মঙ্গলার কামাই যায় না। কিন্তু যত আলস্য তার নিজের জন্য দুটি রেঁধে নিতে। আজও বেশ দেরি হয়ে গেল রান্না-খাওয়া করতে। দুপুরের পর শুয়ে কেবল একটু তন্দ্রার মত এসেছে, মঙ্গলার কানে গেল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে, 'ঘুমিয়েছেন নাকি জেঠিমা?'

বিরক্ত হয়ে চোখ মেলতেই ললিতা বলল, 'বাব্বা কী ঘুম, কতক্ষণ ধ'রে ডাকছি।'

মঙ্গলা বলল, 'ঘুম না হাতী, এই তো কেবল চোখ বুজেছি। আয় বস্ এসে।'

পাটির ওপর মঙ্গলার প্রায় গা ঘেঁসে ললিতা এসে বসল, তারপর মুখখানাকে বেশ একটু ভারিক্কি করে বলল, 'না জেঠিমা, বসব না, বসবার কি একদণ্ড জো আছে আমার।'

বছর এগার বার বয়স হবে ললিতার। অবশ্য গাঁয়ে বিশেষ করে মঙ্গলাদের সমাজে এ বয়সের মেয়েকে নিতান্ত ছোট বলা চলে না। এই বয়সেই তারা অনেক কিছু বুঝতে শেখে, ঘর সংসারের কাজকর্মও বেশ করতে হয়, মঙ্গলার তো এর চেয়েও ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তবু ললিতার অমন প্রবীণ গৃহিণীপনায় মঙ্গলার ভারি হাসি পেল, বলল, 'তাই নাকি, দিনরাত তোর মা বাবা বুঝি তোকে খাটিয়ে মারে?'

ললিতা অমনি সাবধান হয়ে গেল, 'বাঃ, তারা খাটাতে যাবে কেন, আমি নিজেই করি।'

মঙ্গলা একটু তাকিয়ে রইল। মায়ের মতই নাক চোখ বেশ সুন্দর হয়েছে ললিতার; কিন্তু রঙটা তার মায়ের মত অমন পরিষ্কার হয়নি, মুরলীর মত রঙ যেন একটু শ্যামবর্ণই হয়েছে। মঙ্গলাকে একটু চুপ করে থাকতে দেখে ললিতার কাজের কথা মনে পড়ল, 'আপনাদের পাশা জোড়া নিতে এলাম জেঠিমা। বাবা বলল যা তোর জেঠিমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আয়, আমার নাম করিস তা হলেই দেবে।'

মঙ্গলা বলল, 'ঈস, কোথাকার নবাব রে তোর বাবা, নাম করলেই দেবে, যদি না দিই।'

ললিতা কাতরভাবে বলল, 'না জেঠিমা, পায়ে পড়ি দিয়ে দিন পাশা জোড়া, খেলবার জন্য লোকজন এসে বসে রয়েছে যে আমাদের বারাণ্ডায়। অন্যদিন তাস খেলা হয়, আজ বাবা বললে পাশা খেলবে।'

মঙ্গলা বলল, 'দেব রে দেব। তুই তোর বাবাকে খুব ভালোবাসিস, না ললি, আচ্ছা, বাবাকে ভালোবাসিস বেশী না মাকে?'

ললিতা বলল, 'দুজনকেই।'

'আর তোর দাদুকে? তাকে ভালোবাসিস?'

ললিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'বাসিই তো।'

মঙ্গলা হাসল, 'না তুই তোর দাদুকে মোটেই ভালো-বাসিস না, আমি বলে দেব একদিন তোর দাদুকে। আচ্ছা তোর বাবার সঙ্গে আর দাদুর সঙ্গে রোজ রোজ খুব ঝগড়া হয় না?'

ললিতা বলল, 'না।'

'না? তুই ভারি মিথ্যুক মেয়ে হয়েছিস ললি, আজ সকালে তোর বাবা তোর দাদুকে মেরেছিল, না?'

ললিতা প্রতিবাদ করে উঠল, 'মিথ্যে কথা, দাদু এসে বুঝি লাগিয়েছে? দাদুর ওই রকমই স্বভাব! তিলকে তাল করে তুলবে। দাদু এসে সকাল থেকে কি নিয়ে বকাবকি করছিল, তখন বাবা কেবল তার হাতখানা ধরে বলেছিল, তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে, যাও ওঘরে সুস্থ হয়ে গিয়ে বস, তাতেই মারা হয়ে গেল?'

মঙ্গলা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কি নিয়ে বকাবকি হচ্ছিল রে?'

ললিতা চেপে গিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, 'আমি কি জানি তার।'

মঙ্গলা তার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল, 'কি চাপা মেয়ে, বাবারে বাবা, তুই-ই পারবি সংসার করতে। তুই আবার জানিস না এমন জিনিস আছে নাকি পৃথিবীতে?'

ললিতা মুখখানাকে করুণ করে বলল, 'না জেঠিমা, সত্যি বলছি, আমি কিছু জানিনে আমি ছেলে মানুষ, ওসব কথায় আমার থাকবার দরকার কি।'

মঙ্গলা বলল, 'আচ্ছা, তোর বাবা কি কেবল তাস পাশাই খেলে বাড়ি বসে? দোকানে যায় না কেন? আর বুড়ো বয়স পর্যন্ত তোর দাদুই কেবল খেটে খাওয়াবে তোদের?'

ললিতা বলল, 'তা বাবার কি দোষ বল? দাদুই তো বাবাকে দোকানে যেতে বারণ করে, দাদুই তো সন্দেহ করে যেদিনই বাবা দোকানে যায় সেদিনই নাকি তহবিলের টাকা কম পড়ে। এই নিয়েই তো আজ ঝগড়া হচ্ছিল—হঠাৎ ললিতা থেমে যায়, তারপর বলে, কিন্তু উঠুন না জেঠিমা, দিয়ে দিন পাশা জোড়া, ভারি দেরি হয়ে গেল, বাবা বকবে।

মঙ্গলা তবু উঠবার লক্ষণ দেখাল না, বলল, 'আবার মিথ্যা কথা বলছিস, তোর বাবা কোন দিন তোকে বকে না আমি জানি।'

ললিতা ততক্ষণে অধীর এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছে 'জানেন তো বেশ করেন। কথা না শুনলে কে আবার না বকে? পাশা জোড়া দিন না জেঠিমা, সত্যিই বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, না হয় কোথায় রেখেছেন বলুন, আমি নিয়ে নিচ্ছি।'

মঙ্গলা উঠে ছোট আলমারীটা খুলে নেকড়ার পুঁটুলিতে বাঁধা পাশা জোড়া বের করে দিয়ে বলল, 'খেলা হয়ে গেলে আজই আবার ফিরিয়ে দিতে বলিস, সাবধান, গুটি-টুটি যেন একটাও হারায় না; তাহ'লে আমার আর রক্ষা থাকবে না, বুঝলি?'

'আচ্ছা,' পাশা হাতে পেয়েই ললিতা চলতে আরম্ভ করল। মঙ্গলা তাকে পিছন থেকে ডেকে বলল, 'বেশ, আচ্ছা মেয়ে যা হোক, পেয়েই অমনি ছুটতে শুরু করে দিলি।'

ললিতাকে অগত্যা ফিরে আসতে হোল। এই এক দোষ এ বাড়ির জেঠিমার, মানুষকে পেলে জোঁকের মত আঁকড়ে ধরে। কথা তার ফুরোতে চায় না। সময় অসময় কিছু বোঝে না মানুষের। কাছে এসে ললিতা বলল, 'বাবা বসে আছে যে জেঠিমা, দেরি হয়ে গেলে ভারি রাগ করবে।'

মঙ্গলা বলল, 'না রাগ করবে না, বলবি জেঠিমা আটকে রেখেছিল, আমার কথা শুনলে আর রাগ করবে না, বুঝলি?

ললিতা মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা,' তারপর আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু মঙ্গলা পিছু পিছু গিয়ে আবার ডাকল ললিতাকে, 'এই শোন্। কথা বললে কথা শুনিস না, তুই যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিস দেখছি।'

ললিতা ফিরে দাঁড়াল, 'কি বলছেন?'

মঙ্গলা বলল, 'আমার কথা সত্যিই তোর বাবার কাছে বলিসনে যেন, বুঝেছিস?'

ললিতা হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

'হাসছিস যে!' হঠাৎ ভারি চটে উঠল মঙ্গলা, 'এই বয়সেই খুব পেকে গেছিস যা হোক, আর যে মানষের মেয়ে পাকবিই বা না কেন।'

ললিতা যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পাকেন নি কেবল আপনি।'

'কি, কি বললি?' মঙ্গলা পিছনে পিছনে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু ললিতা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

৬

মুরলীর সঙ্গে যারা তাস পাশা খেলে তারা প্রায় সবাই তার চেয়ে ছোট। সমবয়সীদের চেয়ে কম বয়সীদের মধ্যেই

মুরলীর বন্ধুসংখ্যা বেশী। এমনকি ষোল সতের বছরের স্কুলের ছেলেও আছে তাদের মধ্যে। অভিভাবকরা মোটেই পছন্দ করে না যে ছেলেপুলে তাদের সঙ্গে মেশে, গোপনে শাসন তিরস্কারও কম হয় না, তবু ছেলেদের ফিরানো যায় না, এমনি অদ্ভুত আকর্ষণ মুরলীর। এ নিয়ে নানা রকম বিশ্রী আলোচনা যত কানে আসে মুরলীর, তার জেদ তত বাড়ে, তত আরো বেশী করে মুরলী ছেলেদের কাছে ডাকে। গাঁয়ের বুড়োদের মধ্যে কেবল একটি লোকের সঙ্গে এক ধরণের বন্ধুত্ব আছে মুরলীর। সে বিপিন, নবদ্বীপেরই সমবয়সী বিপিন, তার সঙ্গে বয়সের সময় যথেষ্ট তাস পাশা খেলেছে এবং এখনও কোনদিন যদি নবদ্বীপের ফুরসৎ হয়, কি সখ হয় তাস খেলবার বিপিনকে ডাকলে সে খেলতে বসে তার সঙ্গে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে খেলে মুরলীদের দলেই। পাড়ায় তাস খেলবার আড্ডা আরও তিন চারটে আছে। কুমারখালির বাজার ভাঙে বারটা একটায়। যাদের ছোটখাট দোকান, বাজারের মধ্যেই যারা দোকান পেতে বসে পাড়ায় তাদের সংখ্যাই বেশী। গঞ্জের উপর দোকান ঘর আছে মাত্র দু চার জনের। বাজার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দোকান গুটিয়ে এই সব সাধারণ দোকানীরা বাড়ি ফিরে আসে। খেয়ে দেয়ে খানিকটা হয়তো বিশ্রাম করে, তারপর তাসের আড্ডায় গিয়ে যোগ দেয়। অন্য কোন উৎসব আনন্দ, কি জরুরী কোন কাজকর্ম কিছু না থাকলে তাসের আড্ডা চলে রাত দুপুর পর্যন্ত। সপ্তাহে হাট আছে দুদিন কুমারখালির। সেই দুদিন আড্ডা বন্ধ থাকে। কুমারখালির হাট ছাড়া পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে যে সব শহরগঞ্জে হাট বসে সে সব জায়গার হাটও এই শ্রীধরপুরের সাহাদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে করে। এরা দৈনন্দিন আড্ডায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকতে পারে না। কিন্তু এ ধরণের উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশী নয়। আর যে দু'চার ঘর বড় ব্যবসায়ী, কুমারখালি শহরের ওপরই যাদের গুদাম ঘর দোকান ঘর আছে তারা এ সব আড্ডায় যোগ দেয় না। বেচাকেনা করে ফিরে আসতে আসতে রাত প্রায় তাদের দুপুরই হয়ে যায়, তাসের আড্ডা তার আগে থাকতেই ভাঙতে আরম্ভ করে।

তাস খেলা ছাড়া চিত্তবিনোদনের আরও যে দু এক রকমের উপায় ইদানীং না বেরুচ্ছে তা নয়। মুরলীর নেতৃত্বে মাঝে মাঝে সখের থিয়েটার হয়, ছেলেদের নিয়ে সোল্লাসে রিহার্সেল চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর আবার সকলের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। বিনোদের উদ্যোগে মাঝে মাঝে অষ্টম প্রহর, কি চব্বিশ প্রহর নাম-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তার উদ্যোগ আয়োজনও বহুদিন পূর্বে থেকেই চলতে থাকে। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাড়া আবার ক্লান্ত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। ক্লান্তি আসেনা কেবল তাসের আড্ডাগুলিতে। বিশেস উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাময়িকভাবে দুচার দিনের জন্য হয়তো এ সব আড্ডা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আবার একটানা মন্থর-গতিতে সারা বছর ধরে চলতে আরম্ভ করে। এই আড্ডায় যোগ দেয় না কেবল বিনোদ সাধু। যখন সে বাড়ি থাকে নানারকম বৈষ্ণব গ্রন্থ সে পড়াশুনো করে, যদি শ্রোতা দু-একজন থাকে সুললিত কণ্ঠে পাঠকের ভঙ্গিতে তাদের বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ে শোনায়, কখনো বা নামকীর্তন করে। ইদানীং দু-একজন করে বিনোদের শ্রোতার সংখ্যাও বাড়ছে। তবে তাদের মধ্যে বুড়ো এবং প্রৌঢ়া বিধবারাই বেশী। মুরলীকেও বেশীর ভাগ সময় এ-সব আড্ডায় অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। বিশেষ করে রাত্রে সে থাকেই না বলতে গেলে।

খেলায় বিপিন উপস্থিত থাকলে মুরলী সাধারণত তার সঙ্গেই বসে খেলত। পাকা খেলোয়াড় বিপিন। খেলা তার কাছে মোটেই খেলা নয়, কাজের চেয়েও কঠিন। এত নিষ্ঠা নিয়ে এত হিসাব করে খেলে না কেউ বিপিনের মত। হারলে কেউ এমন চটে গিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করে না, জিতলেও কম লোকই আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে যায়। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় হলে হবে কি, বিপিনের ব্যবহারে কেউ তাকে নিয়ে খেলতে চায় না, কোন দলেই প্রায় স্থান হয় না তার। কেবল মুরলী তাকে নিয়ে খেলতে বসে। অবশ্য খেলায় ভুল করলে কি কিছুমাত্র অমনযোগিতা দেখালে মুরলীও বিপিনের গাল-গালাজ থেকে রক্ষা পায় না। কিন্তু তাতে কিছু মনে করে না মুরলী, মুচাক মুচকি হাসে। অবশ্য হাসি দেখলে বিপিনের রাগ আরও বেড়ে যায়। এই বুড়োর ওপর কেমন একটা অদ্ভুত টান আছে মুরলীর। নিজের আর বিপিনের মধ্যে খানিকটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বোধ হয় সে অনুভব করে। অবশ্য মুরলীর মত অমন রঙীন এবং ব্যয়সাধ্য নেশা বিপিন কোন দিন করেনি, অত টাকা সে পাবে কোথায়—স্ত্রীপুত্রের খোরাকই জোটাতে পারে না। কিন্তু মুরলীর মনে হয় টাকা থাকলেও বোধ হয় এসব দিকে সে ঘেঁষত না। মুরলী মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যায়, ছেলেবেলা থেকে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত কি করে লোকটা এক তাস খেলা নিয়ে এমন করে মেতে থাকতে পারল। আর কোন দিকে তার খেয়াল গেল না, লক্ষ্য গেল না, শুকনো কয়েকখানা তাসের মধ্যে এমন মাদকতা সে পেল কী করে। আরো একটা কারণে বিপিনকে ভারি পছন্দ হয় মুরলীর। বুড়ো হয়ে গেলেও কোন বিষয়ে কোন উপদেশ তাকে দিতে আসে না বিপিন। মুরলীর উচ্ছৃঙ্খলতা যে সে পছন্দ করে না তা বোঝা যায়। তবু এ নিয়ে কোন রকমের প্রতিবাদ বিপিনের মুখে সে শোনেনি। মুরলী যেমনই হোক, যেমন স্বভাব চরিত্র তার থাক না, সে যে বিপিনকে নিয়ে খেলতে রাজী হয়, নির্বিবাদে হজম করে যায় বিপিনের গালিগালাজ, এতেই সে খুসি, কিন্তু খেলতে বসে বিপিনের একথা মনে থাকে না। মুরলীর ও-ধরণের সহনশীল-তায় বিপিনের তখন রাগই হয়। খেলাটাকে যে নিতান্তই ছেলে-খেলা বলে মনে করে তার সঙ্গে খেলে রস পাওয়া যায় না।

তাসের বদলে আজ চলছিল পাশা। দু-এক বাজীর পর খেলা প্রায় জমে উঠছিল, এমন সময় মূর্তিমান রসভঙ্গের মত বিনোদ সাধু এসে উপস্থিত হোল। সকলে একবার এর ওর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু মুরলী তার পাশের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে বিনোদ, বস বস।'

ক্রমশ

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্রম-বিবর্তন

গোপাল ভৌমিক

ক্রম-বিবর্তন জীবজগতের অনতিক্রমণীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মানুসারে মানব-সভ্যতা নিরন্তর ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে; এই ক্রমোন্নতির পথে বাধা-বিপত্তির অবশ্য অন্ত নেই—যুদ্ধ আছে, মহামারী আছে, আছে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস। তবু এই বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলার মত প্রাণশক্তি মানব-সভ্যতার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানব-সভ্যতার বিচার যাঁরা করেন, তাঁরাই এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ইতিহাসে এমন দুর্দৈবের সন্ধান মেলে যার ফলে মানব-জীবনে একটা বিষম ওলট-পালট হয়ে গেছে; তবু মানব-সভ্যতার অগ্রগতি কখনও রুদ্ধ হয়নি। মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতিও তার সমাজ এবং সভ্যতার অনুগামী—ফলে সভ্যতার সংগে সংগে তার পরিচায়ক সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির যে ক্রমোন্নতি হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে মানব-সভ্যতা নীহারিকারই মত অস্পষ্ট; তার নিজস্ব কোন রূপ নেই। সভ্যতা সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির সমষ্টি ছাড়া আর কি? তাই এদের একটির উন্নতি অপরটির উন্নতি সূচিত ত করবেই।

ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলা কবিতায় যে প্রচুর বিবর্তন হয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এই আশী বছরের মধ্যে বাঙলা কবিতার এমন রূপান্তর হয়েছে যার ফলে বাঙলা কবিতা আজ ভৌগোলিক সংকীর্ণ সীমা রেখাকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কবিতার সমপর্যায়ে উঠেছে। এই অগ্রগতির মূলে বাঙালী বহু কবির কৃতিত্ব থাকলেও, একজন কবির কৃতিত্ব সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান বাঙলা কবিতার বহুধা বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাছে যে কত ভাবে ঋণী—সে কথা বলে শেষ করা যায় না। কোন্ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের নিয়মানুসারে বাঙলা কবিতায় এই বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেই কথাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা কারণে ঊনবিংশ শতাব্দী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই এই শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করেছিল : এ শতাব্দীকে বলা চলে ধনতান্ত্রিকতার স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে, যন্ত্র-শিল্পের প্রবর্তনের ফলে মানব-সমাজে এমন একটা আলোড়ন এসেছিল ইতিহাসে যার জুড়ি মেলে না। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের দাসত্বের উপর—এই দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন করে ধনতন্ত্র পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। মধ্যযুগের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সবই ছিল ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সামন্ততন্ত্র মানুষকে ধর্মের অহিফেন সেবন করিয়ে নিজের আসন কায়েমী করবার চেষ্টা করেছিল। মানুষকে তার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যও সজাগ হতে দেয়নি। তাই সে যুগের সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক গীতি কবিতার অভাব সুস্পষ্ট। তখনকার কবিতা হয় ধর্মমূলক—নয়ত মহাকাব্য। এদের একটিতে অলৌকিক দেবদেবীর গুণকীর্তন—অপরটিতে দেবদেবীরই মত শক্তিশালী সমাজের শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার প্রতিফলন। সামন্ততন্ত্রের অধীন সমাজ-ব্যবস্থায় কবিদের আর উপায়ান্তর ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে একটা জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়; সেটা এই—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক্—সাহিত্য প্রায় ক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর অনুবর্তন করে। শাসক শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষাই সমাজের বৃহত্তর অংশের আশা আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়ায় এবং সাধারণত এই শ্রেণীর জীবনযাত্রা এবং চিন্তা ধারাই সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের যে শ্রেণী বিভাগ আছে, সাহিত্য যে সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, সেকথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ক্রমে ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিকতার মৃত্যু হল; তার স্থানে দেখা দিল নতুন বিপ্লবী শক্তি ধনতন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের মত ধনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য শোষণ—তবু ধনতন্ত্রের অধীনে মানুষের স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেল। ক্ষেত্রদাস প্রথা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদ হল—মানুষের জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হল। এদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানব-জীবন থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে গেল—তার স্থানে দেখা দিল অপরিমেয় জ্ঞানস্পৃহা—অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার দুর্দম স্পৃহা। এই স্পৃহারই প্রতিফলন দেখি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখর রোমান্টিক কবিতায়। এই রোমান্টিসিজম ভিন্ন ভিন্ন কবির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছিল। তবে এক বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক কবিরই সাদৃশ্য ছিল—সেটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা। অনাসক্ত বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে এঁরা বস্তু-জগতের দিকে তাকান নি; এঁদের কাব্যে বস্তু-জগতের যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে বস্তুগত সত্যের চেয়ে কবির আত্মকামনারই ছাপ দেখা যায় বেশী। ইংলণ্ডের শেলী, কীটস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি সব রোমান্টিক কবির কবিতায়ই এ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে কোন কবির মধ্যে আবার সীমাহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল; ভাবী যুগের অগ্রগামী স্বপ্নে তাই এঁদের কবিতা অনেক সময় মুখর। শেলীর Prometheus Unbound নামক গীতি-নাটকে কবির মনের এই দিকটার সন্ধান মেলে। টেনিসনও ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে গেছেন; কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এঁদের এই স্বপ্ন নিছক কল্পনাই ছিল—কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তার ছিল না। রোমান্টিক কবির স্বাভাবিক আবেগ-প্রবণতার থেকেই এ স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন কবি আবার যন্ত্রযুগের নতুন জীবনযাত্রা প্রণালীর সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি; বাস্তবকে উপেক্ষা করে তাঁদের দৃষ্টি তাই অগ্রগামিতায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি—হয়েছে পশ্চাদগামী। তাঁদের অতীতাশ্রয়ী পলায়নবাদী কবি-কল্পনা বাস্তবকে উপেক্ষা করে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চেয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ উইলিয়াম মরিসের নাম করা যেতে পারে। কাব্যের অগ্রগতির পথে এঁদের প্রভাব যে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাক, এবার বাঙলা কবিতার আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যে রোমান্টিসিজমের যে যে লক্ষণ পরিস্ফুট, তার সবগুলো ধীরে ধীরে বাঙলা কাব্যে দেখা দিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। মানবসমাজের ভাংগা-গড়ার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সব দেশে মানব-সমাজ একই পথে বিবর্তিত হয়েছে। দেশগত ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক কারণে এই বিবর্তনের কোথাও সামান্য বিভিন্নতা দেখা গেলেও এর মূল সুর একই। ঐতিহাসিক জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে এই বিবর্তনের মধ্যে বিভিন্নতার চেয়ে সাদৃশ্যই দেখা যায় বেশী। সেই ক্ষেত্রদাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র; একই পথে সর্বত্র সমাজ-বিবর্তন হয়ে এসেছে। মানবসভ্যতার প্রথম দিকে বিচারের চেয়ে বিশ্বাসই প্রবল ছিল বেশী; তাই প্রাচীনকালে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ধর্মপ্রবণতা দেখা যায়। এই ধর্মপ্রবণতারই প্রতি-

ফলন দেখি আমরা সে জাতির সাহিত্য, সমাজ, দর্শন প্রভৃতিতে। মানব-সভ্যতা যতই অগ্রসর হয়, ততই ধর্মপ্রবণতার স্থানে দেখা দেয় যুক্তি ও বিচারবোধ। বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সাহিত্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে পর্যন্ত বাঙলা কবিতায় আমরা দেখি ধর্মের নিরবচ্ছিন্ন অপ্রতিহত প্রভাব। প্রাচীন বাঙলা কাব্য বলতে আমরা ধর্মমূলক কাব্যই বুঝি—সে মঙ্গল কাব্যই হোক আর বৈষ্ণব কবিতাই হোক। এদের মধ্যে ধর্মের প্রকার ভেদ হয়ত আছে কিন্তু মূল সুর ঠিক আছে। মানুষের চেয়ে দেব-দেবীর প্রাধান্যই প্রাচীন বাঙলা কাব্যে বেশী। সামন্ততান্ত্রিক চাপের অধীনে কবিদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ছিল না বলে তাঁদের কাব্যে মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় চিন্তা স্থান পায়নি। আর তা ছাড়া ধর্মই ছিল সে যুগের মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় সমস্যা। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-কাহিনীতেও দেব-দেবীর গুণ-কীর্তনের অভাব নেই। এই ধর্মাচ্ছন্নতা বহুদিন ধরে বাঙলা কবিতাকে মুহ্যমান করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক এসে আমাদের দেশে রাজ্যস্থাপন করেছিল বটে—তবে তার ফলে আমাদের রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থায় খুব বেশী পরিবর্তন আসেন নি; মধ্যযুগীয় সামন্ত-তন্ত্রের আসন পূর্বের মতই অটল ছিল। তবে ঊনিশ শতকের শেষ-ভাগে এই সামন্ততন্ত্রের গায়ে হঠাৎ এসে আঘাত দিল ধনতন্ত্র। পাশ্চাত্য-জগতে ধনতন্ত্রের শুরু হয়েছিল বহুদিন—তবে ধনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পরিণতি আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল এবং নানা প্রকার সামাজিক বিপ্লবও সেখানে দেখা গিয়েছিল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের আগমন কিন্তু বিলম্বিত এবং তার স্বাভাবিক বিপ্লবের মূর্তি নিয়েও এখানে সে দেখা দেয়নি। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসকের মধ্যস্থতায় ধনতন্ত্র আমাদের দেশে এসেছিল। তার স্তিমিত প্রকাশে আমাদের রক্ষণ-শীল সামাজিক জীবনে খুব বেশী একাকালীন উপপ্লব দেখা দেয়নি। স্থিতাবস্থাকে উপদ্রুত না করে ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র এখানে তার শক্তি বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে আমাদের সমাজ-জীবনে তার পরিপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কবিতাও তাই পরিবর্তনশীলতায় অস্থির। ইতিমধ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ফলে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী কবিতার সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে বাঙালী কবিরা ভাবছিলেন কি করে ধর্মের পথ থেকে কবিতার মোড় ফেরানো যায়। এই মোড় ফেরানোর প্রথম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। কিছু পরিমাণে ধর্মের প্রভাব মুক্ত হলেও বাঙলা কবিতাকে নিত্য নতুন সৃষ্টির পথে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত প্রতিভা ও শক্তি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। এঁর পরেই আবির্ভাব হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের। ইংরেজী ছাড়াও ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি আরও কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় হোমার, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁর "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্য রচনায় মিল্টনের Paradise Lost যে যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গীতি কবিতার দিকে মাইকেলের ততটা প্রবণতা না থাকলেও, তিনি চতুর্দশপদী প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী কাব্যরূপ বাঙলা ভাষায় আমদানী করেছিলেন। তাঁর এই বিপ্লবের ফলে বাঙলা কবিতা যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেকথা নিঃসন্দেহ। তবে প্রধানত মধুসূদনের "মেঘনাদ বধের" সাফল্যে এই সময় বাঙলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার একটা ধূম পড়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ এখানে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে গীতি-কবিতার দিকটা এ সময়ে অনাদৃত ছিল বললেই হয়। ইত্যবসরে ধীরে ধীরে আমাদের সামাজ-জীবনে ধনতন্ত্র তার শিকড় চালিয়েছিল—তার ফলে জন্ম হয়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজের এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সমাজ-জীবনে রূপান্তর নিয়ে আসছিল। সদ্যো-জাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজ আর মহাকাব্যে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার গীতি-কবিতার আদর দিন দিন বেড়ে চলেছিল। এই যুগের গীতি-কবিতাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যই জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিমধ্যেই কত গীতি-কবি যে জন্মেছিলেন তার সংখ্যা নেই। উদাহরণ স্বরূপ একই নিঃশ্বাসে শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, ব্রাউনিং, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি নাম করা যেতে পারে। সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছিলেন আমাদের সাহিত্যে মাত্র একা রবীন্দ্রনাথ; অবশ্য তাঁর অনন্যসাধারণ কবি প্রতিভা ও সৃষ্টি ক্ষমতার গুণে তিনি একাই একশ ছিলেন। প্রগতি-শীল ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল; তবে তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বলে ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপও তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শন ও জীবন-দর্শনের বিচার করলে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি যে প্রধানত আদর্শবাদী কবি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেইঃ প্রাচ্যের ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতেই তাঁর কবি-মানস গড়ে উঠেছিল। এই ভাববাদী দর্শনের উপর ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রলেপ। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ মনন-শীলতা ও কবি-কল্পনা যে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তারই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ দেখি আমরা তাঁর বিভিন্ন রকমের কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈচিত্র্য যথেষ্ট থাকলেও, তার মূল সুর একই। তিন মনে-প্রাণে আদর্শবাদী—আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তবে প্রাচ্য ভাববাদী দর্শনের সাথে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন—সেটা সত্যই বিস্ময়কর। বহু কবির বহু দার্শনিকের প্রভাবকে তিনি আয়ত্ত করে নিজস্ব প্রতিভার রঙে রাঙিয়ে নিতে পেরেছিলেন। প্রাচ্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে অটল বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কখনও অস্বীকার করেন নি। কৃষিজীবী যুগের কবি কালিদাসের প্রভাব তাঁর মধ্যে যেমন আছে, তেমনি আছে ধন-তান্ত্রিক যুগের ইংরেজ কবি ব্রাউনিংয়ের প্রভাব। বড় প্রতিভা মাত্রই যে সমন্বয়-ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের প্রকৃতি-পূজা, শেলীর নৈর্ব্যক্তিকতা, কীটসের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য-বোধ, ম্যাথু আর্নল্ডের শৈল্পিক সংযম, টেনিসনের কাব্যিক মধুরতা—এর সব কিছুরই স্পর্শ পাই রবীন্দ্র-কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর প্রথম ত্রিশ বৎসর বাঙলা কাব্য তাঁরই সর্বব্যাপী প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে রইল। তাঁর প্রদর্শিত পথে অনেক অনুবর্তী এগিয়ে এলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী বাঙলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। মধুসূদনের যুগের মিল্টন প্রভাবান্বিত বাঙলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যেন মায়ামন্ত্রের বলে সমসাময়িক ইংরেজী কবিতার পর্যায়ে টেনে তুললেন। রবীন্দ্র-কাব্যের আবেদন ও প্রসার তাই এত ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে দুই শ' বছরের মধ্যে বাঙলা কবিতার যে উন্নতি সম্ভব হয়নি, তাঁর আবির্ভাবের পরে মাত্র ত্রিশ বছরে সে উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাঙলা কবিতা তার স্বভাবসুলভ রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে ভৌগোলি-কতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের হাতে বাঙলা রোমান্টিক কবিতা চরম উন্নতি লাভ করেছিল; রোমান্টিসিজমের কোন দিকই এঁরা অনাবিস্কৃকত রাখেননি। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সংক্ষেপে এই হল বাঙলা কবিতার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। মহাসমরের পরেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর অজস্র দানে বাঙলা কবিতাকে পরিপুষ্ট

করেছিলেন। তবে প্রাক্-সামরিক রবীন্দ্রনাথ এবং সমরোত্তর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বেশ কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাঁর কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভ্রমণের ফলে তিনি যে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিলেন—তা রচিত পরবর্তী কবিতাগুলো পড়লেই বেশ বোঝা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় তিনি দেখে এসেছিলেন—দেখেছিলেন জনগণের অভূতপূর্ব জাগরণ, দেখেছিলেন মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক জড়বাদের আওতায় তাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শনে এক অভিনব বিপ্লব। তাই জীবনের শেষের দিকে জনগণের সঙ্গে একাত্মীভূত হবার বাসনা তাঁর অন্তরে প্রবলভাবে জেগেছিল—তাঁর শেষ জীবনে রচিত বহু কবিতায়ই আমরা এ মনোভাবের সন্ধান পাই। তবে মার্ক্সীয় জড়বাদী শিল্প-দর্শনকে তিনি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেননি—আর সেটা না পারাও স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচ্য দর্শনের আদর্শবাদ তাঁর রক্ত-মজ্জায় মিশে ছিল। তাঁর মনে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী নাস্তিক জড়বাদী দর্শনের স্থান হওয়া কি সম্ভব? তবে তিনি চিরকালই উদারনৈতিক ও স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন—রক্ষণশীলতা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই পরিবর্তনশীলতাকে তিনি কোনদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখতেন না—মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তিনি নিজে কত নিত্য নূতন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেছেন। স্থিতিশীলতার সঙ্গে গতিশীলতার এই অপূর্ব সংমিশ্রণই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-কাব্য শুধু অতীত বা বর্তমানের কাব্য নয়—ভবিষ্যতের দিকেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এইবার আমরা সমরোত্তর বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির যে প্রয়াস হ'য়েছে এবং এখনও হচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা করব। 'কল্লোলে'র যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক কবি নানাভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির প্রয়াস পেয়েছেন। এই দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর বিভাগ আছে—তবে মোটামুটি দুটো স্তরই প্রধান। এর প্রথম স্তর শুরু হ'য়েছিল 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে আর তার কয়েক বছর পরেই এ আন্দোলন নিঃশেষিত হ'য়েছিল। এ কাব্যিক আন্দোলনের সার্থকতা হয়ত ছিল, কিন্তু এর পিছনে কোন আদর্শ বোধ ও সংঘশক্তি না থাকায় অতি শীঘ্রই এর অকাল-মৃত্যু সম্ভব হ'য়েছিল। দ্বিতীয় স্তরের রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তির আন্দোলন এখনও চলছে—এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আধুনিক কবিদের চোখে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ পূর্ব পৃথিবীর প্রভেদ যে খুব ভাল ক'রে ধরা পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে যে গোঁজামিল ও শোষণ-পদ্ধতি লুকিয়ে ছিল—তার মুখোস খুলে গিয়ে ধনতন্ত্রের আসল রূপ ধরা প'ড়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিকতার সুযোগ নিয়ে সমাজ-তন্ত্র প্রত্যেক দেশেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল এবং অনাগত নতুন যুগের কথা শোনানোর চেষ্টা করছিল। এর ফলে সমাজ-দেহে একটা প্রবল বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ধন-তান্ত্রিকতার অসুস্থ আবহাওয়ায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আর স্বস্তির নিঃশ্বাস দিতে পারছিলেন না। ইংলণ্ডের সমাজদেহে যে বিক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল, তারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখি আমরা টি, এস্, এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড (Waste Land) নামক কাব্য গ্রন্থে। ক্ষয়িষ্ণু ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এমন চমৎকার চিত্র আর হয় না। মিঃ এলিয়ট্ যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাব্য-জগতে প্রবেশ করেছিলেন, তার পরিণতি কিন্তু হ'য়েছে শোচনীয়। ধীরে ধীরে তাঁর বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিবর্তন হ'য়েছে—বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল বললেই চলে। ধনতন্ত্রের সাময়িক উন্নতিতে আশান্বিত হ'য়ে তিনি কায়েমী সমাজ-স্বার্থের পরিপোষক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। ফলে তাঁর হাত থেকে আমরা পরে আর 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর মত প্রথম শ্রেণীর একখানি কাব্যও পাইনি। মহাযুদ্ধের পরে আমাদের সমাজে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রবলভাবে দেখা না দিলেও, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হ'য়েছিলেন। আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন আর পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি দিতে পারছিল না; তাই অনেক তরুণ কবিই রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। কাব্যের কোন একটা দিক যখন পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে তখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং হওয়া উচিতও। যুগে যুগে বিভিন্ন খাতে কাব্যের প্রবাহ প্রবাহিত না হ'লে—সে কাব্যকে জীবিত আখ্যা দেওয়া চলে না। পরিবর্তন জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রথম বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই। তবে তাঁদের এ আন্দোলন ভুল পথে পরিচালিত হ'য়েছিল ব'লেই, তাঁদের উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁরা অসমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের আন্দোলনের মূলে কোন আদর্শগত বিভিন্নতা ছিল না—ছিল শুধু নূতনত্বের মোহ। নূতনত্বের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না—তবে নিছক নূতনত্বের মোহ থেকে কখনও সাহিত্যে বিপ্লব আসতে পারে না। যুদ্ধোত্তর বাঙলা কাব্যে প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের আদর্শবাদী জীবন-দর্শন ও কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করতে পারেন নি; তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন রবীন্দ্র-রচনা-রীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের বিপ্লব তাই নিছক আঙ্গিক-সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছিল। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবগত অনৈক্য তাই বড় কম ছিল—ছিল শুধু আঙ্গিক আর ভাষার বৈষম্য। রবীন্দ্র জীবনাদর্শ ও কাব্যাদর্শের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব বললেই চলে। এই অসামর্থের দরুণ এঁদের মধ্যে অনেকেই সদ্যোজাত বিলেতি কবিতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আঙ্গিক এবং ভাষার দিক থেকে এঁরা এক একজন হয়ে উঠেছিলেন বাঙালী এলিয়ট এবং পাউন্ড্। দেশীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি এঁদের অপরিসীম ঘৃণা-বোধ এঁদের কাব্যে এবং বাক্যে সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। আবার কেউ কেউ বা রবীন্দ্র-কাব্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের আদর্শে দেহাত্মবাদের খাদ মিশিয়ে নিজেদের অন্তর্গূঢ় কামনা চরিতার্থ করতে লাগলেন এবং মৌলিকত্বের ছাপ মেরে তাকেই বাজারে চড়া দামে বিক্রীর চেষ্টা করতে লাগলেন। বোধ হয় এই সব ভঙ্গী-সর্বস্ব মৌলিকত্ব-প্রয়াসী কবিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জন্মদিনে' নামক কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় বলেছিলেন :

> "যে আছে মাটির কাছাকাছি
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
> সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
> নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
> সেটা সত্য হোক্
> শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নতুনত্ব-বিলাসীরা শুধু ভঙ্গী দিয়েই আমাদের ভোলানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুরানো ভাবকে ভাষার মারপ্যাঁচে এঁরা নতুন ব'লে বাজারে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই নিরঙ্কুশ কবিরা কিছুদিন বাঙলা ভাষার উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন, সে কথা পাঠক-সমাজের আজও মনে আছে। তবে পাঠক-সমাজের ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞার ফলে বাঙলার কাব্যজগত বর্তমানে অনেকটা পরিশুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। মৌলিকত্ব সম্বন্ধে মৌলিকত্বাভিমানী এই শ্রেণীর কবিদের গুরু এলিয়ট যা

বলেছেন, সে কথা উধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করি: "The poem which is absolutely original is absolutely bad; it is, in the bad sense, 'subjective' with no relation to the world to which it appeals. ...... I do not deny that true and spurious originality may hit the public with the same shock; indeed spurious originality ('spurious' when we use the word 'originality' properly, that is to say, within the limitations of life, and when we use the word absolutely and therefore improperly 'genuine') may give the greater shock."

আমাদের তথাকথিত বিপ্লবী কবিদের বেলায়ও তাই হয়েছিল। তাঁদের মেকী মৌলিকত্ব দেশে একটা আলোড়ন এনেছিল বটে, তবে সুখের বিষয় সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রবীন্দ্র-প্রভাব-অতিক্রমের নামে ভাষা এবং আঙ্গিকের অভিনবত্বে যাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁদের ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে।

সম্প্রতি বাঙলা কাব্যে এমন কয়েকজন তরুণ কবি দেখা দিয়েছেন, যাঁদের কাব্যাদর্শ সুস্থ অথচ যথেষ্ট বিপ্লবী। তাঁরা বুঝেছেন যে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে হলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও কাব্যাদর্শের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। বাঙলা কবিতায় নতুন ভাবধারা আনতে পারলে নতুন আঙ্গিক ও ভাষা আপনিই সৃষ্টি হবে। এঁরা তাই ঐতিহাসিক জড়বাদের ভিত্তিতে রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। জড়বাদী দর্শন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন—তাই নতুন কবিদের সামনে বিরোধিতাও আছে যথেষ্ট। তবে সে বিরোধিতাকে অতিক্রম করার মত প্রাণশক্তি জড়বাদী দর্শনের আছে বলেই মনে হয়। পৃথিবীর গতি যেমনভাবে মোড় ফিরছে তাতে মনে হয় যে শীঘ্রই পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক এই জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী হবেই—তখন এই নতুন সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি ব'লে জড়বাদী দর্শন আজও ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় অপাংক্তেয়। তবে এ ব্যবস্থা আর বেশী দিন থাকবে বলে মনে হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্কই জড়বাদী কবির প্রধান উপলব্ধির বিষয়। জীবনের সমস্ত দিকই তাঁকে অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নতুন ক'রে যাচাই ক'রে নিতে হবে। পূর্বগামী জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়বাদী দর্শনের যথেষ্ট বিরোধ থাকলেও, জড়বাদ কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে না। ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রকৃত বিপ্লবের সন্ধি একেবারে অসম্ভব নয়। ট্রট্স্কির মত বিপ্লবীও ব'লেছেন: "We Marxists live in traditions, and we have not stopped being revolutionists on account of it." সাম্প্রতিক কবিরা তাই নিরঙ্কুশ নন। তাঁরা ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। মানব-সভ্যতা ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে—এই অটল বিশ্বাস তাঁদের আছে। মানব-সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ ব'লে যে-পলায়নবাদী কবিরা নৈরাশ্যে মুহ্যমান হ'য়ে পড়েন—তাঁদের প্রতি সাম্প্রতিক কবিদের কোন সহানুভূতি নেই। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় আবার বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর ফিরে এসেছে—কবিরা আর বাস্তবকে এড়িয়ে চলতে চান না। তাঁদের কাব্যের বিষয়-বস্তু যত বেড়ে যাচ্ছে, আঙ্গিকেরও তত বিবর্তন হ'চ্ছে। এঁদের কবিতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ঐতিহাসিক বাস্তব-বোধ এবং মার্জিত মননশীলতা অতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ শতকীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থানে এঁদের কাব্যে দেখা দিয়েছে গোষ্ঠীগত সমাজ-চেতনা। এঁদের কবিতা মনের বিলাস নয়—সামাজিক প্রয়োজন। তবে বাঙলা কাব্যে বর্তমানে পরীক্ষার যুগ চলেছে—এর পরিণতি আসবে দেরীতে। তাই সমগ্রভাবে এখনই এ যুগের বিচার করা চলে না। তবে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন এই জড়বাদী দর্শনের ভিত্তিতেই কবিরা আদর্শবাদী রবীন্দ্র কাব্যাদর্শের হাত থেকে মুক্তি পাবেন—তখন নতুন সৃষ্টির প্রাচুর্যে বাঙলা কাব্যের আরেক গৌরবময় যুগের সূচনা হবে। মাত্র জনকয়েক তরুণ কবি এই নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছেন; সংখ্যাল্পতার দরুণ প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আদর্শ-ভ্রষ্ট না হলে এঁরাই যে একদিন বাঙলা কবিতাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
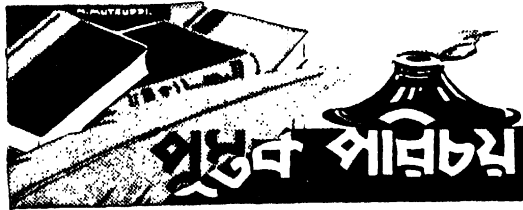
পেলাম যাদের দেখা—কবিতার বই। অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—কো-অপারেটিভ বুক ডিপো, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৩টি কবিতা আছে। বাঙলা দেশের কতকগুলি ফুলকে অবলম্বন করিয়া কবিতাগুলি লিখিত। লেখক বলেন, ফুলগুলিকে মাত্র ফুল ব'লে দেখিনি—দেখেছি তাদের মধ্যে human moralityর রূপ। উপাধিকে অতিক্রম করিয়া রসময় সত্তাকে উপলব্ধি করা সহজ নয়। দুই একটি কবিতায় লেখকের এমন উপলব্ধির আভাষ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে 'গন্ধরাজ' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পঞ্জিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্প্রতি "বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী" নামে বাঙলা দেশের সকলপ্রকার গ্রন্থাগারের তালিকা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ সম্বলিত এক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ এতগুলি লাইব্রেরী আছে এ সংবাদ অনেকের কাছে নূতন। তাহা ছাড়া যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা হইতে লাইব্রেরীগুলির অবস্থাও কতকটা ধারণা করা যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিরা ছাড়াও গ্রন্থকার, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রয়োজন জোর করিয়া বলা যায়। বইটির ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সত্য সত্যই একটি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন।

ষ্ট্র্যাটিজির ভুল?

ভানু গুপ্ত

এই মহাযুদ্ধে গত তিন বছরে জার্মানি একটার পর একটা বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে এক একটা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করলেও সমগ্রভাবে যুদ্ধকে সে গুটিয়ে আনতে পারে নি, বরং ক্রমাগতই রণাঙ্গন বিস্তৃত করে গেছে। বহু সাফল্য সত্ত্বেও তার যুদ্ধ জয়ের সমস্যাটা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছে, সমাধানের দিকে যায় নি। তাই নাৎসী সামরিক কৃতিত্বের বিদ্যুৎ ছটায় যাদের চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি, তারা নাৎসী রণকৌশলের আন্তরিক প্রশংসা করলেও নাৎসী সমর পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছে। তাদের সন্দেহ যে অমূলক নয়, সামরিক পরিস্থিতির বর্তমান পরিবর্তন তার প্রমাণ দেয়। সোভিয়েট ভূমি ও আফ্রিকা জার্মান স্ট্র্যাটিজির গলদ আজ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্সের যখন পতন হ'ল জার্মান শক্তি তখন মহিমার সর্বোচ্চ শিখরে। তখন কারো যদি এমন মনে হ'ত যে, হিটলারের তর্জনীর স্পর্শ মাত্রই ইংলন্ড চূর্ণ হয়ে সমুদ্র জলে মিলিয়ে যাবে, তাহলে সে ধারণা অস্বাভাবিক শোনাত না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটল কি? মাসের পর মাস অহোরাত্র বোমাবর্ষণ করা সত্ত্বেও ইংলন্ড আত্মসমর্পণ করল না। আর জার্মানরাও ইংলণ্ডে অভিযান করল না। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর পশ্চিম পাশে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের একটা সাংঘাতিক ঘাঁটি হিসেবে ইংলন্ড থেকে গেল। শুধু থেকে গেল নয়, আমেরিকার সাহায্যে ও নিজের ক্রমবর্ধমান চেষ্টায় তার সামরিক শক্তির সঞ্চয় বাড়তে লাগল। এর জন্যে জার্মানীকে ইউরোপের সমগ্র পশ্চিম উপকূলে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হল।

ইতিমধ্যে জার্মানী আবার আফ্রিকায় রণাঙ্গন সৃষ্টি করে বসেছিল। ফ্রান্সের পতন অনিবার্য জেনে এবং সম্ভবত ইংলণ্ডের আত্মসমর্পণ আসন্ন মনে করে হিটলার মুসোলিনীকে দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়ে দিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এতে অসুবিধে বেড়েছে। অল্পকালের মধ্যে ইতালীয়ান বাহিনী ইংরেজদের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে গেল এবং যুদ্ধে ইতালীয়ানরা অসার প্রতিপন্ন হল, তাদের সমগ্র পূর্ব আফ্রিকান সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হল এবং অবশিষ্ট ইতালীয়ান রাজ্য লিবিয়াও যায়-যায় হয়ে উঠল। তখন হিটলারকে আফ্রিকায় জার্মান সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার যুদ্ধের মোড় ফেরাতে হল। এর চেয়ে ইতালি নিরপেক্ষ থাকলে হয়তো জার্মানীর বেশী উপকার হত। কারণ নিরপেক্ষ ইতালি মারফৎ সে যেমন ইউরোপের বাইরে থেকে সরবরাহ আনার সুবিধে পেত, তেমন সব সময়ে ইতালীয়ান আক্রমণের সম্ভাবনায় বহু বৃটিশ সৈন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে আফ্রিকার নানা দিকে আটকে থাকত।

আফ্রিকায় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার পর সেখানে জার্মানরা শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ না করে পারল না; অথচ সর্বশক্তি নিয়োগে সেখানকার যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত মীমাংসাও করল না। এমন কি মল্টা পর্যন্ত তারা দখল করবার চেষ্টা করল না। গ্রীস থেকে প্যারাশুট সৈন্য দিয়ে তারা বৃটিশ সৈন্যরক্ষিত ক্রীট দ্বীপ কেড়ে নিল; কিন্তু ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রে বৃটিশ "বিমান-বাহী স্থানু রণতরী" মাল্টা তারা নিল না। ফ্রান্সের পতনের পর যে সময় স্পেন ও পর্তুগাল সহজে সামরিক আয়ত্তে এনে জিব্রল্টার চড়াও করা সম্ভব ছিল সে সময় তারা সে চেষ্টা করেনি। এ রকম না করার পক্ষে সামরিক যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধ যুক্তিই বেশী বড় হ'য়ে উঠেছে।

এর পরের অধ্যায়টা জার্মান স্ট্র্যাটিজির এক গলদের

অধ্যায়, বোধ হয় সবচেয়ে মারাত্মক অধ্যায়। আফ্রিকায় রণাঙ্গন পুরোপুরি জাইয়ে রেখে, সুয়েজ, জিব্রল্টার ও মল্টা প্রতিপক্ষের অটুট দখলে রেখে দিয়ে, হিটলার আক্রমণ করে বসলেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে—পূব দিকে জার্মানী দুই হাজার মাইল জোড়া এক নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি করে নিল। অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, আফ্রিকাকে আগে শেষ না করে রুশিয়াকে আক্রমণ করা জার্মান স্ট্র্যাটিজির জুয়াখেলার সব চেয়ে বিপজ্জনক চাল হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, নাৎসী হাই-কমান্ড রুশিয়া সম্বন্ধে ভুল হিসেব কর্বেছিলেন। তাঁরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইওরোপের শক্তি নিয়োজিত করেন এবং আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় যে, হিটলার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রুশিয়া জয় করবার বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু আজ সতেরো মাস যুদ্ধের পরেও রুশিয়া অপারজিত রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিস্তৃত স্থান অবশ্য জার্মানরা দখল করেছে। কিন্তু সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধে জমি দখল বড় কথা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের আয়তন পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ। শারীরিকভাবে জার্মান সৈন্য দিয়ে এই আয়তন ভূমি দখল করাবার কল্পনা হিটলারও করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করে' তার পরাজয় ঘটানো। গত বছর তিনি বার কয়েক প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেন যে, লাল-ফৌজ বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁর এ ঘোষণা যে অবাস্তব আত্ম-প্রসাদ বা মানসিক কামনার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, তা পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। সামরিক সংগঠন হিসেবে লালফৌজ যে মরে নি, বরং তার আপেক্ষিক শক্তি যুদ্ধের প্রথম দিকের তুলনায় ক্রমশ বেড়েছে, তার প্রমাণ গত বছরে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের প্রতিরোধ এবং গত বছর শীতকালীন পাল্টা অভিযান, আরো বড় প্রমাণ এ বছরে দুই হাজার মাইল রণাঙ্গনে এক সঙ্গে জার্মানীর আক্রমণ চালাবার অক্ষমতা, সবচেয়ে বড় প্রমাণ স্টালিনগ্রাড। হিটলার প্রকাশ্যভাবে জার্মান জনসাধারণকে স্টালিনগ্রাড দখলের নিশ্চয়তা দিয়ে তিন মাস সর্বস্ব পণে লড়াই করেও এই শহরটি দখল করতে পারলেন না; উপরন্তু বর্তমানে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে লালফৌজ স্টালিনগ্রাড এলাকায় এগিয়ে যাচ্ছে এবং ডনের পূর্বদিকে সমস্ত জার্মান সৈন্যকে বিপদগ্রস্ত করেছে।

যখন রুশিয়ায় জার্মানী জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন প্রাচ্যে জাপানীরা আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী জাপানের সঙ্গে একাত্মতা দেখিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। এতে অবশ্য জার্মানী নির্বিচারে মার্কিন জাহাজ ডুবিয়ে দেবার অধিকার পেল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে জার্মানীর অসুবিধের চেয়ে সুবিধে বেশী হ'ল কিনা সন্দেহ। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকার তাজা সৈন্যবল এবং বিপুল শিল্পবল জার্মানীর বিরুদ্ধে ইও-রোপ ও আফ্রিকায় অবাধে নিয়োজিত হবার সুযোগ পেল এবং আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে জার্মানীকে আক্রমণ করবার সুবিধে পেল। এ বিষয়ে জাপান কিন্তু অনেক বেশী স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। জার্মানী সোভিয়েট ইউনিয়নকে ফাশিজমের প্রধান শত্রু বলে' আঘাত করতে থাকলেও জাপান সমস্ত অবস্থা ভালোভাবে বিবেচনা করে' সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি।

নাৎসী-জার্মানীর এই রণনীতির ফল এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে? এক সঙ্গে ইওরোপে দুই দিকে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা জার্মান সমরবিদ্‌রা বরাবর পরিহার করবার চেষ্টা করেছেন; গত মহাযুদ্ধে তাঁরা পারেন নি, এবার মনে হয়েছিল পারবেন। কিন্তু যুদ্ধ কোথাও গুটিয়ে না আনায় এবং উপরোল্লিখিত নীতি অনুসরণ করায় তাঁরা আজ সেই সম্ভাবনারই সম্মুখীন হয়েছেন। সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মানীর প্রধান শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন আদৌ কমে নি, বরং আরো বেড়েছে। অথচ এ দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া রোমেল বাহিনীকে বৃটিশ সৈন্যেরা মার্কিন ট্যাঙ্ক ও বিমানের সাহায্যে বিপর্যস্ত করে' লিবিয়ার প্রায় মাঝামাঝি চলে গেছে; পশ্চিমে আলজিরিয়া ও মরক্কোয় মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী সমর সম্ভার নিয়ে অবতরণ করেছে। জার্মানীকে এখন মাঝখানে তিউনিসিয়া ও পশ্চিম লিবিয়া রক্ষার জন্যে প্রাণপণে লড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের সমগ্র দক্ষিণ উপকূল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এর অর্থ ফিনল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইউরোপ বেড় করে' একেবারে দক্ষিণ-পূব কোণে গ্রীস পর্যন্ত (মাঝে শুধু স্পেন ও পর্তুগাল বাদে) হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত উপকূল ভাগে মিত্রপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা নাৎসীদের করতে হবে। এতে জার্মানীর শক্তি কম বিক্ষিপ্ত হবে না। কিন্তু জার্মানদের বড় বিপদ দেখা দেবে যদি তারা শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত হয়। সে ক্ষেত্রে ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিপদ বাস্তব হ'য়ে উঠবে এবং ভূমধ্যসাগরীয় আধিপত্যের ফলে মিত্র-পক্ষের ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়ে যাবে।

এ কথা আমি বলছি না যে, জার্মানদের সহজে আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত করা যাবে কিংবা মিত্রপক্ষের জয় আসন্ন। এখনও হিংস্র যুদ্ধ সামনে রয়েছে এবং নানা জায়গায় মিত্রপক্ষের অসাফল্যও হয় তো দেখা যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, স্ট্র্যাটিজির দিক থেকে জার্মানীর সামরিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক খারাপ হ'য়ে পড়েছে এবং জার্মান শক্তি-প্রাচীরে কয়েকটা সাংঘাতিক ফাটল দেখা দিয়েছে।
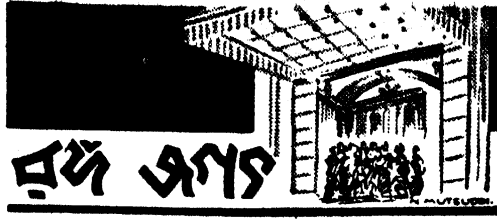
'সু'-এর সংগে বিবাদ দেখা যাচ্ছে আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল কিছু করতে পারা তো দূরের কথা ভালকে রক্ষা বা সহ্য করার ক্ষমতাও যেন নেই আমাদের। চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রের কথাই বলছি। কোন প্রতিষ্ঠান কৃতিত্বে ও খ্যাতিতে সেরা আসন লাভ করলে কি ধরে নেবেন তার ভাঙ্গনও আসন্ন হ'য়ে উঠেছে। নিউ থিয়েটার্সে'র কথাই ধরুন। প্রতিষ্ঠিত হবার দু'এক বছরের মধ্যে কী যশই না আহরণ করলে। সমগ্র ভারতে তখন যেন নিউ থিয়েটার্স ছাড়া আর প্রতিষ্ঠানই ছিল না। তারপর কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল, এখন নিউ থিয়েটার্স মামুলী প্রতিষ্ঠানদের পাশে গিয়ে সারি দিয়েছে। প্রভাত ফিল্মসের তাই হয়েছে--যে দল প্রভাতকে গৌরবের উচ্চ আসন এনে দিয়েছিল তা আর সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে পারলে না। এবারের পালা হচ্ছে বম্বে টকীজের। আর্থিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বম্বে টকীজ চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু ভারতের কেন, পৃথিবীর মধ্যে খুব কম চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়, যারা বম্বে টকীজের মত বছরের পর বছর অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়ে আসতে পেরেছে। সে-ই বম্বে টকীজেই আজ ভাঙ্গন ধরলো!

* * * *

বম্বে টকীজের গোলমাল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মাতব্বরী নিয়ে। হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর চিত্র-প্রযোজনা কাজে নিযুক্ত হন দেবীকারাণী এবং শশধর মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া, ষ্টুডিওর প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবেও নিযুক্ত হন দেবীকারাণী। একবার ইনি এবং পরের বার উনি এইভাবেই গত দু'বছর এ'রা ছবি তুলে আসছিলেন। কিন্তু শশধরবাবুকে নাকি নানা অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছিল। তাঁর নালিশ হচ্ছে, শ্রীমতী দেবীকারাণী নিজে প্রযোজক এবং তদোপরি ষ্টুডিওর প্রধানা ব্যবস্থাপিকা হওয়ায় তাঁর (শশধরবাবু) ছবির কাজে তেমন সহযোগিতা অর্পণ করেন না। এ'দের এই ঝগড়া গিয়ে পৌঁছয় বোর্ড অব ডিরেক্টরদের মাঝে এবং এই নিয়ে সেখানেও দলাদলি আরম্ভ হয়। এখন ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। কি ছেলেমানুষী ব্যাপার!

* * * * * * * * * *

রাজাজী রাজনীতি নিয়ে থাকলেও চলচ্চিত্র সম্পর্কে অবহিত কম নন। সম্প্রতি এক পত্রিকা প্রতিনিধির কাছে তিনি এ বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "লোকে যখন চলচ্চিত্রকে শিক্ষার বাহন ব'লে পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে, তখন তাদের সে দাবীটা যেন বাড়াবাড়ি। শিক্ষার ব্যাপারে চলচ্চিত্র বড় হড়বড়ে হ'য়ে পড়ে। আসল শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক। চলচ্চিত্র বড় জোর অনুপূরকের কাজ করতে পারে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা থেকে কিছু শেখা যায় না......সুতরাং চলচ্চিত্রও শিক্ষা দিতে পারে। এমন কি খারাপ ছবিও আপনাদের শেখাতে পারে ভাল ছবি কেমন হওয়া উচিত। লোককে প্রমোদ বিতরণ করেই চলচ্চিত্রের খুশী থাকা উচিত। তার লক্ষ্য থাকা উচিত কেবল পরিচ্ছন্ন প্রমোদের দিকেই। অভিনব ও বিচিত্র বস্তু দেখানোর নাম ক'রে কি বিশ্রী একঘেয়ে জিনিসই না আমাদের দেখানো হয়। ঘণ্টা দুই প্র উপভোগ করার জন্য কাউকে সিনেমায় যেতে অনুমোদন করা শক্ত। পুরাণের যে সব কাহিনী আমরা দিদিমাদের কাছ থেকে শুনেছি, সেগুলো এত চমৎকার আর এত রহস্যের জালে আচ্ছন্ন যে, ছবিতে রূপায়িত করা যায় না। কেউ রাম কি কৃষ্ণ অথবা নারদ সাজলে আমার বড় মনকষ্ট হয়। এমনি বিশ্রী ব্যাপার। এই সব চরিত্রের চিত্ররূপান্তর হয় জঘন্য। আর যা যৌন আবেদন চালানো হয়। সত্যিই এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এবং আমি এই সব পর্দায় রাম, কৃষ্ণ অথবা নারদদের বিষয়ে কোন প্রপাগাণ্ডায় সায় দিতে রাজী নই।" রাজাজী সবশুদ্ধ দেখেছেন মাত্র অর্ধ ডজন ভারতীয় ছবি। তার বেশী দেখলে আশংকা হয়, তিনি রাজনীতি ছেড়ে চলচ্চিত্র সংস্কার অথবা উচ্ছেদ এই ব্রত গ্রহণ করতেন নিশ্চয়ই।

'যোগাযোগ' চিত্রে শ্রীমতী কানন। পরিচালনা করছেন শ্রীসুশীল মজুমদার

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি **ক্রিকেট** প্রতিযোগিতা আরম্ভ **হইয়াছে। বোম্বাই**, মধ্যপ্রদেশ, **যুক্তপ্রদেশ**, মহীশূর রাজ্য প্রভৃতি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক এই সকল এসোসিয়েশনকে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ ও উপরোধের কোনই ফল হয় নাই। উক্ত এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ স্পষ্টই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা পূর্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্তন করা অসম্ভব। দেশ যেরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাতে কোন খেলা বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করায় অনেক অসুবিধা আছে। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে উক্ত সকল এসোসিয়েশনকে বাদ দিয়াই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিতে হইতেছে।

এই পর্যন্ত মাত্র একটি খেলাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ খেলায় রাজপুতানা দল ১৫০ রাণে দিল্লী দলকে পরাজিত করিয়াছে। খেলাটি বিশেষ উচ্চাঙ্গের হয় নাই। নিম্নে উক্ত খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

রাজপুতানা দল:—১ম ইনিংসে ১৮০ রাণ। **২য়** ইনিংসে ২০৭ রাণ।

দিল্লী দল:—১ম ইনিংসে ১২৪ রাণ। **২য়** ইনিংসে ১১৩ রাণ।

বাঙলা ও বিহার দলের খেলা

বাঙলা ও বিহার দলের খেলার দিন ও স্থান লইয়া একটু গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মধ্যস্থতায় উহার মীমাংসা হইয়াছে। ঐ খেলা আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই খেলার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙলার দলে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। খেলোয়াড় নির্বাচন উপলক্ষে কোন বাছাই খেলা বা ট্রায়াল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় নাই। কবে হইবে বলা কঠিন। তবে বিহার ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই বিষয়ে নীরব নহেন। তাঁহারা শক্তিশালী দল গঠন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। এই পর্যন্ত জামসেদপুরে তিনটি ট্রায়াল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ ট্রায়াল ম্যাচ শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। তাহার পরে বিহার দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রকাশিত হইবে। যে কয়েকজন খেলোয়াড় খেলিবেন বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

এস ব্যানার্জি (বড়), বিজয় সেন, এস ব্যানার্জি (ছোট), লেফটন্যান্ট এডমান্ড (ইংলণ্ডের খেলোয়াড়), এল ডান (ইংলণ্ডের খেলোয়াড়), টি মুখার্জি (হাজারীবাগ), বি বসু, মহেন্দর সিং, ই সাপ্তানা, লেফটন্যান্ট পতঙ্কর, পি ই পালিয়া। কালীঘাটের কল্যাণ বসু ও বিখ্যাত খেলোয়াড় ভেরিটির খেলিবার সম্ভাবনা আছে। বিহার দলটি যে শক্তিশালী হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দলের অধিনায়ক সম্ভবত এস ব্যানার্জিই হইবেন; আবার অনেকের মতে বিজয় সেন হইবেন। কিন্তু উক্ত দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে যোগ্যতা বিচার করিলে এস ব্যানার্জি যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ইহা জোর করিয়াই বলা চলে।

ইফতিকার আমেদের কৃতিত্ব

ইফতিকার আমেদ ভারতীয় টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকায় গত বৎসর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই বৎসর কোন ক্রমপর্যায় তালিকা গঠিত হয় নাই। পরবর্তী বৎসরও কোন তালিকা হইবে কি না ঠিক নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইফতিকার আমেদ ক্রমপর্যায় তালিকায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা হইতে সহজে কেহ যে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ তিনি করাচীতে অনুষ্ঠিত সিন্ধু লন টেনিস প্রতিযোগিতায় দিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগেই তিনি বিজয়ী হইয়াছেন। গউস মহম্মদ এই প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার একজন নামজাদা টেনিস খেলোয়াড় হল সার্ফেস এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তাঁহার নাম যখন প্রকাশিত হয়, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন—তিনিই এই প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিষয়ে বিজয়ীর সম্মানলাভ করিবেন। ফলত তাহা হয় নাই। তিনি কি সিঙ্গলস, কি ডাবলস কোন বিভাগেই সুবিধা করিতে পারেন নাই। বাঙলার উদীয়মান খেলোয়াড় দিলীপ বসু এই প্রতিযোগিতায় হল সার্ফেস অপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সেমিফাইনালে হল সার্ফেসকে পরাজিত করেন। তাঁহার অপূর্ব দৃঢ়তাই এই খেলায় সাফল্য আনয়ন করে। ফাইনালেও তিনি ইফতিকার আমেদের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিবেন বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত তিনি পায়ের আঙুলের ফোস্কার জন্য খেলায় সুবিধা করিতে পারেন নাই। ডাবলস খেলায় তিনি ইফতিকারের সহযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছেন।

এই প্রতিযোগিতার একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মহিলা বিভাগের খেলা উপযুক্ত খেলোয়াড়গণের অভাবের জন্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল

ইফতিকার আমেদ ৬-১, ৬-২, গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইনাল

ইফতিকার আমেদ ও দিলীপ বসু ৬-১, ৬-৪ গেমে সি ফ্রেজার ও হল সার্ফেসকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

ইফতিকার আমেদ ও মিস এম পি ডুবাস ৬-১, ৬-২ গেমে হ্যানা ও মিস দেলমাক পরাজিত করেন।

বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যকল্পে ফুটবল খেলা

মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যকল্পে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলা হইবে বলিয়া আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মিঃ কে নুরুদ্দিনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। তিনিই প্রথম এই বিষয় লইয়া একটি পত্র আই এফ এর সভাপতির নিকট লিখেন। সভাপতি মহাশয় এই পত্র পাইয়া কার্যকরী সমিতির সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই খেলা কিভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা কোন সময় হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কেহ বলিতেছেন একটি মাত্র খেলা হইবে। ঐ খেলায় একপক্ষে আই এফ এর দল ও অপর পক্ষে সৈনিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন পাঁচটি হইবে। এই পাঁচটি খেলা পেণ্টাঙ্গুলার নিয়মানুসারে হইবে। হিন্দু, মুসলিম, ইউরোপীয়, পার্শী ও অবশিষ্ট এই পাঁচটি দল এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই সকল দল বাহিরের খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, কোয়াড্রাঙ্গুলার নিয়মানুসারে খেলাটি অনুষ্ঠিত হইবে। ঠিক কোন্ নিয়মানুসারে খেলাটি পরিচালিত হইবে শীঘ্রই তাহা জানিতে পারা যাইবে। উক্ত খেলা পরিচালনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছেঃ—সভাপতি শ্রীযুত বি সি ঘোষ, সভ্যগণ—বি কে ঘোষ (মোহনবাগান), এ ডি ক্লার্ক (সি এফ সি), কে নুরুদ্দিন (মহমেডান স্পোর্টিং), জে চক্রবর্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পি গুপ্ত (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), জে সি গুহ (ইস্টবেঙ্গল ক্লাব) ও এন এন মিত্র (ভবানীপুর)।

আই এফ এর উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তবে অসময়ে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করিলে অর্থের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে ক্রিকেট মরসুম পড়িয়াছে। বাঙলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন যদি নিখিল ভারতীয় খেলোয়াড়গণ লইয়া একটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করিতেন, মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থা হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যাইত। বাঙলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা খুবই সন্তুষ্ট হইতাম।

জাতীয় খেলাধুলা

বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে অথবা বৈদেশিক শাসকবর্গের ব্যবস্থার জন্যই হউক—আমরা বৈদেশিক খেলাধুলায় যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। জাতীয় খেলাধুলাসমূহ যাহা পূর্বে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট সহায়তা করিত, বর্তমানে তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। এই জন্যই বর্তমানে জাতীয় খেলাধুলার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। জাতীয় আন্দোলন দেশের মধ্যে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই জাতীয় আন্দোলনকারিগণ পর্যন্ত দেশের খেলাধুলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। তাঁহাদেরও নিকট দেশের খেলাধুলার প্রচার ও প্রসারের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা—বৈদেশিক খেলাধুলা যেরূপভাবে ক্রীড়ামোদিগণের অন্তরে দৃঢ়মূল ধারণ করিয়াছে, তাহাতে দেশের খেলাধুলার স্থান আর হইতে পারে না। এই ধারণা যে কতদূর ভিত্তিহীন তাহা জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ প্রমাণিত করিতে চলিয়াছে। এই সঙ্ঘটি মাত্র দুই বৎসর গঠিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যেই বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় শতাধিক ক্লাব গঠনে সক্ষম হইয়াছে। এই ক্লাবসমূহ কেবল মাত্র জাতীয় বা দেশীয় খেলাধুলা পরিচালনা করিয়া থাকে। কয়েকটি জেলা-সঙ্ঘও গঠিত হইয়াছে। বালিকাগণও ইহাদের পরিচালিত খেলাধুলায় উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। গত বৎসর হইতে এই জন্যই উক্ত সঙ্ঘের পরিচালকগণ বালিকাদের জন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত বৎসর জাপান-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ইঁহাদের কার্যে অনেক বাধা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পরিচালকগণ হতাশ হন না। তাঁহারা তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোনরূপে পরিচালনা করেন। এই বৎসর পুনরায় তাঁহারা নব উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ধমান, কলিকাতা, ২৪-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি খেলাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু স্থান হইতে ইঁহাদের পরিচালিত খেলাধুলার নিয়মাবলী জানিবার জন্য পত্র আসিতেছে। অনুষ্ঠানের উৎসাহও অনেকে প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে মনে হয়, গত দুই বৎসরে ইঁহারা যেরূপ সংখ্যক সমর্থকারী লাভ করিয়াছিলেন, এই বৎসরে তাহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লাভ করিবেন।

১৮ই নভেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—ভিসি রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাদ হইতে ষ্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে রাশিয়ানরা সাতটি বিরাম আর্মি সন্নিবেশ করিয়াছে। ইহা রাশিয়ানদের শীতকালীন আক্রমণের পূর্বাভাস সূচনা করিতেছে। মস্কোর সংবাদে বলা হয় যে, গত পাঁচদিন ধরিয়া ষ্ট্যালিনগ্রাদের উপর জার্মানরা যে ব্যাপক আক্রমণ চালায় এখন তাহার গতিবেগ গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্মানদের তিন হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং বহু ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ—অদ্য নিউইয়র্ক বেতারে বলা হয় যে, তিউনিসিয়ায় বৃটিশ প্রথম আর্মির অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যদের সংঘর্ষ চলিতেছে। বিজের্তার ফরাসী সৈন্যেরা এখনও জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। উত্তর আফ্রিকায় অগ্রবর্তী ঘাঁটির ওয়াকিবহাল মহলের এক সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল রোমেল তিউনিসিয়াতে আছেন।

ভিসির সংবাদে বলা হয় যে, মঃ লাভালকে মার্শাল পেতাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। পেতাঁ তাঁহাকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯শে নভেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট প্রচার বিভাগের বিশেষ ইস্তাহারে প্রকাশ, মধ্য ককেশাসে আর্দং সোনিকিদ্‌সের-এ জার্মানরা পরাজিত হইয়াছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ—জার্মান নিয়ন্ত্রিত প্যারিস রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, তিউনিসিয়ার তিনটি এলাকায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সহিত এক্সিস সৈন্যদলের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। নিউইয়র্ক রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, তিউনিসিয়ার রণাঙ্গনে জেনারেল জিরো কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যসংখ্যা ৩০ হাজার, তন্মধ্যে বহু বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিক রহিয়াছে।

২০শে নভেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ চতুর্থ মাসে পড়িয়াছে। শীত, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকার মধ্যেও ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। গতকল্য কারখানা অঞ্চলে জার্মানরা পুনরায় চাপ দেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলে। নালচিকের দক্ষিণ-পূর্বে জার্মানরা পুরোদমে পলায়ন করিতেছে।

আফ্রিকায় যুদ্ধ—ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে, তিউনিসিয়ায় আমেরিকান ট্যাঙ্কসমূহ এক্সিস পক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীকে হটাইয়া দিয়াছে।

জার্মান বেতারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, এক্সিস বাহিনী বেনগাজী (লিবিয়া) ত্যাগ করিয়াছে।

মার্শাল পেতাঁ কর্তৃক পূর্ণ ক্ষমতা অর্পিত হইবার পর ফ্রান্সের নূতন ডিক্টেটর মঃ লাভাল তাঁহার বক্তৃতায় বলে যে, ফ্রান্সের স্বার্থের দিকে চাহিয়াই জার্মানীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্প্রীতি স্থাপন করা দরকার। উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা অপূরণীয়।

আলজিয়ার্সে বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে এডমিরাল দার্লা বলেন যে, জার্মানীর চাপে পড়িয়া মার্শাল পেতাঁ এখন লাভালের হস্তে তাঁহার ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন। মার্শালের প্রতি আমরা আমাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু লাভালের প্রতি নহে।

২১শে নভেম্বর

আফ্রিকার যুদ্ধ—আলজিয়ার্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী দলে দলে তিউনিসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিতেছে। গতকল্য রাত্রিতে ব্রাজাভিল রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ তিউনিসের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এক্সিস সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তিউনিস ও বিজের্তার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ব্যতীত সমগ্র তিউনিসিয়া রাজ্য এখন মিত্রপক্ষের হস্তগত। মরক্কো রেডিও ঘোষণা করে যে, বিজের্তায় আরও জার্মান সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষ বেনগাজী (লিবিয়া) দখল করিয়াছে।

২২শে নভেম্বর

অদ্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের বিষয় ঘোষিত হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ সমর মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিয়া বিমান উৎপাদন সচিবের পদ গ্রহণ করিবেন। মিঃ হার্বার্ট মরিসন স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের পদে বহাল হইবেন। মিঃ ইডেন কমন্স সভার লীডার হইবেন।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিতেছে।

২৩শে নভেম্বর

আফ্রিকার যুদ্ধ—ভিসি বেতারে বলা হইয়াছে যে, ত্রিপোলিতানিয়া হইতে আগত জার্মান বাহিনী তিউনিসিয়ার পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। নিউইয়র্ক বেতারে বলা হইয়াছে যে, তিউনিসের দুইশত মাইল দক্ষিণে গবেস পোতাশ্রয় জার্মানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। মরক্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত বাহিনী ও ফরাসী বাহিনীর সহযোগিতাপুষ্ট বৃটিশ ১ম বাহিনী বিজের্তা-তিউনিস সীমায় অবস্থিত জার্মান অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

২৪শে নভেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, তিনটি সোভিয়েট বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধকারী আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষ জার্মান সৈন্যের চারিদিকে দ্রুত আগাইয়া আসিয়া তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে। জার্মানগণ তাহাদের দূরবর্তী ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে ডন ও ভলগার মধ্যবর্তী ৪০ মাইলব্যাপী ষ্টেপভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

মস্কো হইতে নিম্নলিখিত মর্মে এক ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত ২৩শে নভেম্বর সোভিয়েট বাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে অগ্রসর হইয়া ১০ হইতে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং চেরনিসেভস্কায়া ও পেরেলাজোস্কী শহর এবং পোইদিন স্কীর বসতি অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে তাহারা ১৫ হইতে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং তুলুভোডো ও আকসে শহর দখল করিয়াছে। ২৩শে নভেম্বর দিবাশেষে আরও ১১ হাজার এক্সিস সৈন্য বন্দী হয়। বন্দী সংখ্যা এক্ষণে মোট ২৪ হাজার হইয়াছে। ঐ তারিখে এক্সিস পক্ষের মোট ১২ হাজার অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, এক জার্মান ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট বাহিনী জার্মান আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

১৮ই নভেম্বর

উড়িষ্যার বহরমপুরে (গঞ্জাম) এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে বহু মানুষ ও পশুর জীবনান্ত ঘটিয়াছে এবং বহু সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। বহু সংখ্যক কাঁচা বাড়ি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং শত শত লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ গিল্ডার, সর্দার প্যাটেলের পুত্র মিঃ দয়াভাই বল্লভভাই প্যাটেল এবং অপর চারিজনকে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধুবড়ীর খবরে প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা মিঃ গোগোইর বাড়ি হইতে কয়েকটি বন্দুক চুরি গিয়াছে। শিবসাগর জেলার কতকগুলি গ্রামের উপর ২২ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

পাইকারী জরিমানা ধার্যের ফলে বাঙলা দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক তৎসম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, গভর্নমেণ্ট ইহা ধরিয়া লন নাই যে, হিন্দু মাত্রই দোষী আর সমস্ত মুসলমান নির্দোষ। পাইকারী জরিমানা সম্বন্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার এবং নির্দোষকে অব্যাহতি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হইয়াছে। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, তাহাদিগকে পাইকারী জরিমানা হইতে অব্যাহতি দিতে গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় প্রধান মন্ত্রী সম্মতি সূচক উত্তর দেন।

ঢাকার খবরে প্রকাশ, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে হানা দেয়। প্রকাশ, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা কতকগুলি আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন করে এবং অনুমান সাত শত টাকা লুণ্ঠন করে।

১৯শে নভেম্বর

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার মিস জেন্সী সিপাহী মালানীকে করাচীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পেশোয়ারের খবরে প্রকাশ, অদ্য এক জনতা হাজরা জেলার বাকা এলাকায় জরীপের কার্যে বাধাদান করে। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। একজন পুলিশ আহত হইয়াছে। সীমান্ত পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য খান ফকির খান এবং অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা বলেন যে, বর্তমান আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে এ পর্যন্ত আসামে একশত পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। সরকারী, অর্ধ-সরকারী এবং ব্যক্তিগত অট্টালিকাদি এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে অপরাধীরা ধরা পড়িয়াছে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এম এল এ ফরিদপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

২০শে নভেম্বর

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, এ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় ৭৯ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

আসন্ন শত্রু আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ, বিশেষভাবে বাঙলা দেশ রক্ষা করিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষ বাঙালীকে সৈন্যদলভুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়া বাঙলার গভর্নরের নিকট স্লিপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ত্রিকমদাস গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিহার সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ৫ই, ৬ই নভেম্বর তারিখে তীর ধনুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র সহ এক জনতা সাঁওতাল পরগণা জেলায় দুইটি মদের দোকান আক্রমণ করে, একটি সাঁকোর ক্ষতি করে এবং একটি ডাক বাংলোয় আগুন লাগাইয়া দেয়। গ্রামের অধিবাসীরা জনতাকে বাধা দেয় এবং দুই পক্ষে সংঘর্ষের ফলে দুইজন নিহত হয়।

ভাগলপুরের জেলা ও দায়রা জজ গত ১৮ই নভেম্বর ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেল বিদ্রোহ মামলার রায় দিয়াছেন। তিনজন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ড, তিনজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং ২৫ জনের প্রতি ৩ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ১৫ জন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

২১শে নভেম্বর

বাঙলা গভর্নমেণ্টের অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। গত ২০শে নভেম্বর অপরাহ্ণে গভর্নর তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্নর মিঃ এ কে ফজলুল হককে অস্থায়ীভাবে অর্থ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বহরমপুর থানার অন্তর্গত খাগড়া দয়ানগরে গত ১৯শে নভেম্বর একটি দেশী মদের দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ পরলোকগমন করিয়াছেন।

২২শে নভেম্বর

বঙ্গীয় কংগ্রেস (এড হক) পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় কলিকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব সচিব জানান যে, বে-সামরিক নাগরিকগণকে কলিকাতা পরিত্যাগে বাধ্য করিবার অভিপ্রায় বর্তমানে গভর্নমেণ্টের নাই।

মেদিনীপুরে বাত্যা ও বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত সাহায্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জি এক বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, ঝটিকা ও বন্যার ফলে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ফসল ও ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। বর্তমান হিসাবানুযায়ী দেখা যায় ১০ হাজারের বেশী লোক মারা গিয়াছে এবং শতকরা প্রায় ৭৫টি গৃহপালিত পশু বিনষ্ট হইয়াছে। রাজস্বসচিব আরও বলেন যে, ২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে মোট ৮,৯৫২ মণ খাদ্যদ্রব্য খয়রাতী দান স্বরূপ বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে চাউল ছিল ৭,৩০০ মণ। তাহা ছাড়া কাপড়, পানীয় জল ইত্যাদিও ঐ সকল অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 5th December, 1942. [৪র্থ সংখ্যা
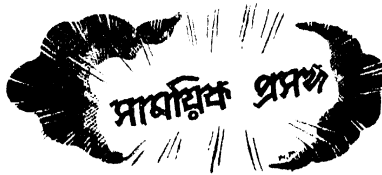
মেদিনীপুরের সাহায্য—

বাঙলার অর্থসচিবের পদ পরিত্যাগ করিবার পর ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার কলিকাতার জনসভায় সভাপতিস্বরূপে মেদিনীপুরের অবস্থা সম্পর্কে যেসব কথা বলেন, তৎপ্রতি বাঙলার জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাকে যেসব কারণে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে তন্মধ্যে মেদিনীপুর সম্পর্কিত সরকারী ব্যবস্থাও অন্যতম, দেশের লোকে তাহা জানিত এবং সেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য তাহারা আগ্রহান্বিত ছিল। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের পুরাপুরি বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার এ বক্তৃতা হইতে এটুকু বেশই পরিষ্কার হয় যে, বাত্যাপীড়িত মেদিনীপুরের জনগণকে সাহায্য প্রদানের কার্যে তথাকার কতিপয় কর্মচারী যথেষ্ট শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে, স্থানীয় কতিপয় কর্মচারীর মনোবৃত্তির মধ্যে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন বিশেষ কর্মচারীর নিকট আসন্ন ঝটিকার পূর্বাভাষের সংবাদ পৌঁছান সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বন্যার পরেও মেদিনীপুরে সাঁজবাতির আইন ও অন্যান্য বাধা নিষেধ পূর্ববৎ বলবৎ ছিল। ঝটিকার পর মেদিনীপুরে পানীয় জল সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ, এমন কি কেরোসিন তেলের কোন বন্দোবস্তই ছিল না। বিধ্বস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও মৃতদেহ সরাইবার কাজে কোন কোন কর্মচারী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসলীলার পর মেদিনীপুরের পরিস্থিতির সম্বন্ধে সমগ্রভাবে বিবেচনা করিবার ইচ্ছা কোন রাজকর্মচারীর ছিল না। উপসংহারে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এ কথাও বলেন যে, মেদিনীপুরের কোন কোন রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে মানবতার মহান কর্তব্য অনুসরণ করিয়া মানবসেবায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। মেদিনীপুরের ছাত্র সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস কে দাস বার-এট-ল সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি মেদিনীপুরের সাহায্য কার্যে স্থানীয় কর্মচারীদের শৈথিল্যের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘসূত্রতা এই জেলায় নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মন্ত্রীরা এবং কোন কোন পদস্থ রাজকর্মচারী এই দীর্ঘসূত্রতার প্রতিকার চেষ্টায় যত্নবান

আছেন; কিন্তু এতাবৎকাল বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।" মেদিনীপুরের দুর্গত জনসাধারণের সাহায্য কার্যে সেখানকার কোন কোন কর্মচারীর এই শৈথিল্যের প্রতীকার করিতে মন্ত্রীরা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা কেহ কেহ কেন অকৃতকার্য হইতেছেন, ইহা সাধারণের নিকট রহস্য বলিয়া মনে হইবে। সেদিন 'ওরিয়েণ্ট প্রেস' কর্তৃক প্রেরিত একটি সংবাদ লাহোরের লীগ দলের মুখপত্র 'ইস্টার্ণ টাইমসে' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই রহস্যের অবরণ একটু উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সংবাদে প্রকাশ, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুরের বর্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন এম খাঁকে তথা হইতে বদলী করিবার জন্য পরামর্শ দেন; কিন্তু সে পরামর্শ গ্রাহ্য করা হয় নাই। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি খাঁ সাহেবের অনুসৃত নীতি সাহায্যকার্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। 'ওরিয়েণ্ট প্রেসের' এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, গভর্নর ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদকে ছাড়িতে বরং প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি খাঁ সাহেবকে মেদিনীপুর হইতে সরাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ গভর্নরকে মেদিনীপুরের সাহায্যকার্য সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধান মন্ত্রীর নিকট একখানি অবেদন দাখিল করিয়াছেন। এই আবেদনে তাঁহারা মেদিনীপুরে পাইকারী জরিমানা প্রত্যাহার করিবার জন্য এবং তথাকার রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়া সাহায্যকার্যে উদারনীতি অনুসরণ করিবার নিমিত্ত দাবী করিয়াছেন। বাঙলার গভর্নর মেদিনীপুরের দুর্গত জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করি না। কিন্তু একদিকে আর্তত্রাণের আগ্রহ অপরদিকে সিভিলিয়ানী প্রেস্টিজ রক্ষা এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া গভর্নর বিব্রত বোধ করিতেছেন। সরকারী সেবা ব্যবস্থার সম্বন্ধে লোকের আস্থা আকর্ষণ করিবার একমাত্র উপায় মেদিনীপুরের যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা এবং বর্তমান শাসন-নীতি পরিবর্তন করিয়া লোকের মনে আস্থা-স্থির ভাবকে সুদৃঢ় করিয়া তোলা। ইহা না হইলে মানবতার দিক হইতে শুধু যে মেদিনীপুর সম্বন্ধে কর্তব্যের লঙ্ঘন হইবে তাহাই নয়, বাঙলা দেশের শাসনতন্ত্রগত সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করিবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকার্য—

বর্তমান শাসনতন্ত্রে মন্ত্রীদের হাতে দেশের কল্যাণসাধন করিবার প্রকৃত কোন ক্ষমতা আছে আমরা ইহা মনে করি না; সে ক্ষমতা যে নাই ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি হইতেই সে সত্য উন্মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপকার করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অপকার করিবার ক্ষমতা আছে। খাজা মন্ত্রিমণ্ডলের শাসন ব্যাপার সম্পর্কে সে অভিজ্ঞতা আমাদের ষোল আনাই রহিয়াছে। খাজা মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের পর প্রগতিশীল দলের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া বাঙলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। ইহাতে এ দেশের আবহাওয়ায় আস্বস্তির ভাব অনেকটা ফিরিয়া আসে। সাম্প্রদায়িকতামূলক ভেদ নীতির কূটচক্রজাল হইতে দেশের লোক রক্ষা পায়; কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী মহল নিজেদের ব্যবসায়ের পথ বন্ধ হওয়াতে হতাশ হইয়া পড়ে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই দল উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এইরূপ অপকৌশলপূর্ণ প্রচারকার্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী নীতি অবলম্বন করিবার জন্যই গভর্নরের উপর চাপ দিতেছিলেন। পাইকারী জরিমানার নীতি সংশোধন করিবার জন্য তাঁহার দাবীর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঘাড়েও পাইকারী জরিমানা চাপান এবং মেদিনীপুরের বর্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ডাক্তার মুখোপাধ্যায় পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন শুধু এই জন্য যে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মুসলমান। লীগওয়ালাদের এই শ্রেণীর প্রচারকার্য যে কিরূপ নির্লজ্জ মিথ্যাপূর্ণ ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দেশের স্বার্থ ও ব্যাপকভাবে জাতির স্বার্থ এবং মানবতার অনুভূতি যাঁহাদের কিছু মাত্র আছে, তাঁহারা সে প্রচারকার্যে বিচলিত হইবেন না। এসব জানিয়া শুনিয়াই চতুর প্রতিক্রিয়াপন্থীরা নিজেদের অনুকূলে সাম্প্রদায়িকতার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলে নিজেদের প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ফিকিরে আছে। তাহারা মনে করিতেছে, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন, এখন তাঁহার দাবীর মূলীভূত নীতি যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হয়ত পদত্যাগ করিতে হইবে এবং সেই অবসরে তাহাদের সুযোগ মিলিবে। ইঁহাদের দুইজনের পদত্যাগ করা না করা বর্তমানে গভর্নরের মতিগতির উপরই নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। তিনি কি করিবেন, আমরা জানি না। আমরা শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় যে দাবী করিয়াছেন এবং যে দাবী বসু মহাশয় ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সমগ্র বাঙলার জনসাধারণের সেই দাবী। গভর্নর যদি সে দাবী গ্রাহ্য না করেন তবে বাঙলা দেশের জনসাধারণের মনে একটা প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

অখণ্ড ভারতের আদর্শ—

ধর্মের নামে মধ্যযুগীয় বর্বতায় আঁকড়াইয়া থাকিবার দিন এখন আর নাই। মানবতার উদার অনুভূতির মূলের সুব্যবস্থিত ঐক্য এবং সংহতির প্রতিষ্ঠাই সংস্কৃতির সত্যকার স্বরূপ। এই আত্মীয়তার সম্প্রসারণশীলতাকে অবলম্বন করিয়া ভারতের সংস্কৃতির সাধনা চলিতেছে। জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী স্যার মির্জা ইসমাইল সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতির এই আদর্শকে

তরুণদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "প্রকৃতপক্ষে যদি কোন কথা আমার বলিবার থাকে তাহা এই যে, এক জাতীয়তার ধর্ম, শক্তি এবং গৌরব আমাদিগকে অর্জন করিতেই হইবে। অখণ্ড ভারতের আদর্শ আমার মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং এ আদর্শের মূলে যুক্তিও রহিয়াছে। আমরা যে জাতি বা যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই হই না কেন, এ দেশ আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এখন নূতন করিয়া রাজনীতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা দরকার। আমি দেশের সর্বত্র জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ প্রত্যক্ষ করিতেছি।" স্যার মির্জা ইসমাইল ঐক্য এবং সংহতির উপর প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড ভারতের যে আদর্শের কথা বলিয়াছেন, আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যুক্তপ্রদেশের এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের নেতা মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনীর উক্তিতেও সেই উক্তিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মিঃ এণ্টনী বলিয়াছেন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী। ভারতের মাতৃভূমিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিবার সকল প্রচেষ্টার তাঁহারা বিরোধী। অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তার ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এদেশে ঘটে, ইহাই তাঁহারা দেখিতে চান। এই সঙ্গে বোম্বাইর পার্শী সম্প্রদায়ের ছয় শতের অধিক প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি সম্প্রতি স্যার এটলীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিয়া ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা করার যুক্তি যাঁহারা উপস্থিত করেন, তাঁহারা তাহাদিগকে সমর্থন করেন না। তাঁহারা অখণ্ড রাষ্ট্রীয়তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ভারতের স্বাধীনতাই চাহেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের হীন যুক্তি উপস্থিত করিয়া যাঁহারা ভারত বিচ্ছেদের দাবী তুলিতেছেন এবং সেই পথে ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, সমগ্র ভারতের জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের আদর্শে এই জনজাগরণ তাঁহাদের দুরভিসন্ধিকে বিচূর্ণ করিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

———

অন্ন ও অর্থ সমস্যা—

ময়দার দর মণ প্রতি ২২৲ টাকায় উঠিয়াছে; চাউলের দরও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা শহরেই কয়েক দিনের মধ্যে পনেরো টাকার কমে এক মণ চাউল মিলিবে না, এমন আতঙ্কের কারণ ঘটিয়াছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিদারুণ এই অন্ন সমস্যার মধ্যেও সরকার বাঙলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনা যাইতেছে, বাঙলা দেশ হইতে বোম্বাই অঞ্চলে চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাও শুনিতেছি যে, কিছুদিন পূর্বে বাঙলার সরকার বিশেষ সংকট দিনের সম্বল স্বরূপে যে চাউল জমা করিয়াছিলেন, সেই চাউলের এই উপায়ে সদগতি হইবে। কিন্তু বাঙলাদেশে যে অন্ন-সংকট দেখা দিয়াছে, সেই সঙ্কটের প্রতিকার সাধনের উদ্দেশ্যেই সে চাউল ব্যয় করা উচিত ছিল। ব্যারন জয়তিলক আসিয়া ইতিপূর্বে সিংহলে চাউল সরবরাহের যে বরাদ্দ পাকা করিয়া গিয়াছেন এবং সে বরাদ্দ বণ্টনের বোঝা বাঙলার ঘাড়েও যে কতকাংশে পড়িয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় বণিক সভা বোম্বাই অঞ্চলে বাঙলা হইতে চাউল প্রেরণের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বাঙলাদেশব্যাপী অন্নসমস্যার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে যে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা দরকার হয় ইহাই আশ্চর্য। কয়লার মণ কলিকাতা শহরেই কোন কোন স্থানে খুচরা দুই টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। শুনিতেছি কয়লার অভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যাপারেও নাকি বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট নিরুপায়। সম্প্রতি তাঁহারা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের এতৎসম্পর্কিত একটি অভিযোগ খণ্ডনসূত্রে সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কলিকাতা শহরে কয়লা আমদানী করিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট সংখ্যক মালগাড়ী যোগাড় করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু সরকারের অন্য কাজের তাগিদে এ পর্যন্ত মালগাড়ী সংগ্রহ করা যায় নাই। ইহার পরে পয়সার সমস্যা। পয়সা এ দেশ হইতে কিছুদিন হইল অদৃশ্য হইয়াছে; কিন্তু অদৃশ্য হইলেও প্রয়োজনের অভাব কমে নাই। এতদিন পরে ভারত সরকার পয়সার এই অভাবের সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, পয়সার অভাব মিটাইবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং সম্ভব হইলে আরও করিবেন; কিন্তু প্রকৃত প্রতীকার জনসাধারণের হাতে। খুচরা পয়সা গালাইয়া ভবিষ্যতে প্রচুর লাভ হইবে, এই আশায় অনেকেই খুচরা পয়সা জমা করিয়া রাখিতেছে। জনসাধারণ যদি ইহা বরদাস্ত না করে, তবেই লোকে এইভাবে আর পয়সা মজুত রাখিতে পারিবে না। যুক্তি বড় অদ্ভুত। খুচরা পয়সা গালাইয়া তাম্র মূল্যে লাভ হইবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে পয়সা জমাইবার সম্ভাবনা রহিবেই এবং সরকার পয়সা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে মজুতের পরিমাণ যদি বাড়ে, তবে সমস্যা কিছুতেই মিটিবে না। সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা বাজারে নূতন পয়সা অনেক ছাড়িয়াছেন, কিন্তু নূতন পয়সার সঙ্গে পরিচয় হওয়া তো দূরের কথা পরিচিত পুরাতন পয়সারও দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পয়সা বাজার হইতে সরিয়া যখন গিয়াছে তখন এক জায়গায় তাহা আছেই। সরকারের নিজের ঘরেও যে আছে ইহাও মনে হয় না; কারণ ডাকঘরে পয়সা মিলে না। এরূপে অবস্থায় পয়সা কোথায় যাইয়া জমা হইতেছে জনসাধারণের সাধ্য কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করে? পয়সা জমান যে দণ্ডনীয় অপরাধ সরকারী ইস্তাহারে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে; যদি তাহা দণ্ডনীয় অপরাধই হয়, সে অপরাধী ধরিয়া দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারেরই কর্তব্য এবং সে জন্য পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগই রহিয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার সম্পর্কে পুলিশের যদি কোন কর্তব্য না থাকে, কর্তব্য কেবল জনসাধারণেরই উপরই হক না হক বর্তে, তবে এত মোটা মাহিয়ানা দিয়া পুলিশ বিভাগ পুষিবার প্রয়োজন কি?

ভারতের স্বাধীনতার দাবী—

'ভারতের ব্যাপারে কি মার্কিণদের থাকা উচিত? নিশ্চয়ই; কারণ জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমরা ভারতের জনবলের সমর্থন চাই। ভারতীয়েরা জাপানীদিগকে চাহে না। তাহারা স্বাধীনতা কামনা করে। তাহাদের স্বাধীনতা যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে চীনারা যেভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, সেইভাবে তাহারাও জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। কিভাবে ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করা যাইতে পারে? কথায় কিংবা প্রতিশ্রুতিতে নয়। বিগত মহাসমরের সময় তাহারা বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে। তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে বিজয়লাভের পর তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করা হইবে। তাহারা দুই বৎসর অপেক্ষা করে; কিন্তু কিছুই ঘটে না। বর্তমানে আবশ্যক কাজ, প্রতিশ্রুতি নয়'—আমেরিকার বহু সংবাদিক, অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং সাহিত্যিক-বৃন্দের স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি আবেদনপত্র 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারিগণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং জেনারেল চিয়াং কাইশেককে ভারতের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের মতে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজদিগকেই গঠন করিতে হইবে; এই ধরণের সদিচ্ছা পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে কিছু সাহায্য করিতে পারে মাত্র। আধুনিক রাজনীতি সামর্থ্যকেই শুধু স্বীকার করে, সদিচ্ছার স্থান তাহাতে সামান্যই আছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে স্যার মীর্জা ইসমাইল অখণ্ড ভারতের আদর্শের উপর জোর দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি সেদিন যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও উক্ত আদর্শ অনুকরণের নিমিত্ত এ দেশের যুবকদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। স্যার মীর্জা ইসমাইল বলেন 'শুধু একতার মধ্যেই আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সন্ধান রহিয়াছে এবং সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আমাদিগকে প্রকৃত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। বৃত্তি বা উপজীবিকা যাহাই হউক না কেন, দেশের মধ্যে একটা একতার ভাব সৃষ্টি করা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। এর চেয়ে বড় কাজ বর্তমানে আর কিছু নাই। জনসাধারণের কাছে একতার এই আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রতিগণ বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন। এই আদর্শের পথে পরিচালিত করিয়া তাঁহারা দেশের তরুণ বংশধরগণের জীবন এইভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন যাহাতে অনেক বিভেদ দূর হইবে। সত্যকারের বৃহৎ আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়া তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইবে। সংহতিই ভারতের লক্ষ্য। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি, বিবাদ এবং স্বার্থ সব কিছুই ভারতবর্ষকে একটা অখণ্ড রূপ দানের চেষ্টা করিতেছে। আমি মানুষের বিদ্যার বুদ্ধির প্রতি আস্থাবান। আজ যদি ভেদ বিভেদে আমরা বিব্রত হই, আমাদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারই তাহার জন্য দায়ী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অশিক্ষিত মানুষের গোঁড়ামী দূর হইবে। অনুন্নত মনোবৃত্তির অন্ধ সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিবে। দেশের তরুণ সম্প্রদায়কেই এই অন্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতার গ্লানি কর্মসাধনার দ্বারা অপসৃত করিতে হইবে।' স্যার মীর্জা ইসমাইলের এই অভিভাষণ বাঙলার যুবকদের মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিবে এবং লীগের ভারত বিখণ্ডিত করিবার নীতির অন্তর্নিহিত অনিষ্টকারিতা উন্নতিশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন সকলের কাছে উন্মুক্ত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

চার্চিলের মদ গর্ব—

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শুধু বড় একজন মনীষীই নহেন, তিনি সত্যকার একজন স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য তিনি মর্মে মর্মে বেদনা অনুভব করেন এবং তাঁহার উক্তির ভিতরে এ সম্পর্কে তাঁহার অন্তরের উত্তাপের পরিচয়ও অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা এ পরিচয় পাইয়াছি। স্যার সর্বপল্লী বলেন, "যাহারা পরাধীনতার জ্বালা কোনদিন ভোগ করে নাই, তাহারা ইহার অনিষ্টকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। স্বাধীনতার অনুভূতি অত্যন্ত প্রগাঢ়।" ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে পার্লামেণ্টে একটি বক্তৃতায় বলেন, ভারতে বর্তমানে যে পরিমাণ শ্বেতাঙ্গ সেনা আছে, ভারতে ব্রিটিশ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরে এত অধিক পরিমাণ শ্বেতাঙ্গ সৈন্য কোন দিন তথায় প্রেরিত হয় নাই; সুতরাং ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সদস্য মহোদয়গণের কোনরূপ নৈরাশ্য বা উদ্বেগ বোধ করিবার কারণ নাই। স্যার সর্বপল্লী চার্চিলের এই উক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "এমন বক্তৃতা পাঠ করিলে ভারতবাসীদের অন্তরের গভীর ক্ষোভ এবং তিক্ততার সঞ্চার হয়। শান্তিরক্ষা করা অবশ্য গভর্নমেণ্টের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু তাহাই একমাত্র কর্তব্য নয়; তাহাদের শাসনকে দেশের জনসাধারণের সদিচ্ছা এবং সম্মতির দ্বারা সমর্থিত করাও তাঁহাদের কর্তব্য।" কিন্তু সাম্রাজ্য মোহে অন্ধ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারত শাসন ব্যাপারে জনমতকে মূল্য দান করিবার সে কর্তব্য এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না। তাঁহাদের নীতির এই অদূরদর্শিতার ফলে তাঁহাদের বৃহত্তর স্বার্থেরই হানি ঘটিতেছে। একদিন তাঁহাদিগকে বাস্তব স্বার্থের দায়েই এ সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।
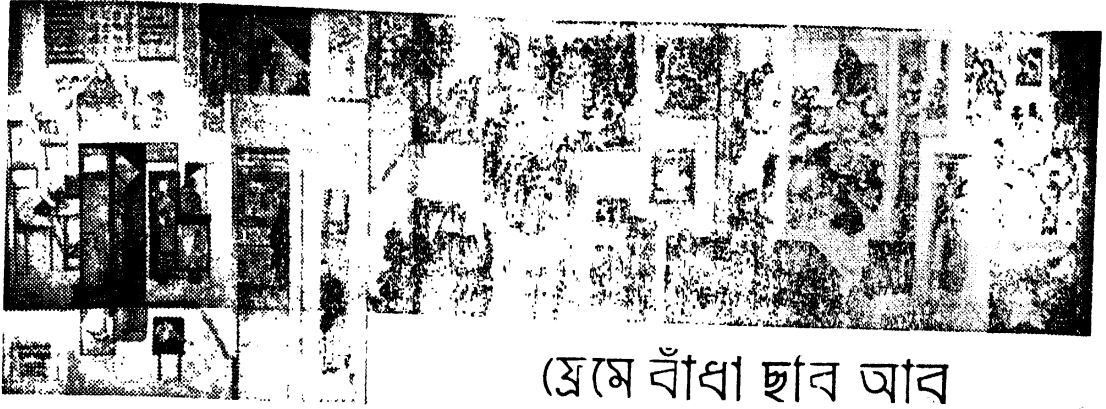
চীন ভবনের দেয়ালে অঙ্কিত ফ্রেস্কো
শিল্পী: শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ফ্রেমে বাঁধা ছবি আর দেয়াল করা ছবি

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ফ্রেমে বাঁধানো ছবি যখন আমরা দেয়ালে ঝোলাই তখন যেমন তেমন কোরে ঝোলাই না। আমরা দেখি কোন্ দিকের কোন্ দেয়ালে ছবিখানা ঝোলালে ছবিখানাও মানাবে, ঘরও দেখতে সুন্দর হবে। এমনও হয়, এক ঘরে যে ছবি মানাচ্ছে না তখন অন্য ঘরে নিয়ে তার উপযুক্ত জায়গা খুঁজি। সোজা কথায় ছবিখানা যাতে ঘরের সঙ্গে মানান সই হয় সেই চেষ্টাই আমরা করি।

আর্টিস্ট যখন নিজের ঘরে ছবি করে তখন কোন্ জায়গায় তার ছবি টাঙানো হবে, জানলার পাশে কি দরজার মাথায়, সে কথা সে সব সময় ভাবে না, আর ভাববার তার দরকার করে না। কিন্তু আর্টিস্টকে যদি ঘরে এনে বলা হয় এই ঘরের দেয়ালে তুমি ছবি করে দাও তবে সেই ছবি কোথায় কিভাবে আঁকলে মানাবে সে কথা প্রথমেই ভেবে দেখতে হয়। জানালা, দরজা, ভেন্টিলেটার ইলেকট্রিক সুইচ ইত্যাদি সমেত ঘরকে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। ভিত্তিচিত্রকারের প্রথম সমস্যা, এই মানানো নিয়ে। আর্টিস্টের মান রাখতে গেলে হয়তো ঘরের একটু এদিক সেদিক করা যায়, ইলেকট্রিকের সুইচ সরিয়ে দেওয়া চলতে পারে, দরজা জানালার রঙ বদলাতেও পারা যায়; কিন্তু যেখানে দরজা আছে সেটা বন্ধ করে আর এক জায়গায় দেয়াল ভেঙ্গে দরজা বসানো সম্ভব নয়। ঘরের কাঠামো (Structure) বদলানো চলে না। এই জন্যই বিলাতি ক্রিটিকরা ভিত্তি চিত্রের প্রকৃতিকে বলেন, architectural, অর্থাৎ ভিত্তিচিত্রে স্থাপত্যের ভঙ্গি মেনে চলতে হয় এবং স্থাপত্যের গুণ ভিত্তিচিত্রে আসবে। ভিত্তিচিত্রের প্রকৃতি এই রকম হওয়ায় বাড়ির যেখানে ভিত্তিচিত্র হবে সেই অংশের স্থাপত্যের শ্রী বাড়তে পারে, আবার ছবি এঁকে স্থাপত্যের শ্রী নষ্ট হোতেও পারে। এমন হোতে পারে ছবি খুব ভাল হোলো, কিন্তু ঘরের আগের রূপ আর রইল না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্বন্ধহীন মূল্যবান জিনিসের মত রাখতেও পারা যায় না, ফেলতেও কষ্ট হয়। আবার ঠিক এর উল্টোটাও হতে পারে।

শান্তিনিকেতন চীন ভবনের দেয়ালে অঙ্কিত "নটীর পূজা" চিত্রের এক অংশ
(এগ্ টেম্পারা)

শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

সাধারণ ছবি অথচ দেয়ালের যেখানে করা হোয়েছে সেখানে তা মানিয়েছে। যেখানে ছবি ও দেয়ালে মিলে ঘরের নূতন শ্রী দেখা দেবে সেইখানেই ভিত্তি চিত্রের একটা বড় সার্থকতা। আকারে বড় হোলেই তাকে ভিত্তিচিত্রের মর্যাদা দেওয়া যায় না। অনেক আকারে ছোট ছবিতে এমন সব গুণ থাকতে পারে, যাকে ভিত্তি চিত্রের মর্যাদা দেওয়া চলে। এর পরে দেখতে হবে ছবি স্থানের উপযোগী হোয়েছে কিনা। হাসপাতালে রুগীদের থাকবার ঘরের ছবি আর বৈঠকখানার ছবি বিষয়-বর্ণে এক হতে পারে না। আপিস ঘর আর মন্দিরের ছবির ধরণ এক হলে চলে না। মোট কথা অনেক বড় ব্যাপার অনেকখানি জায়গা নিয়ে দেখার পক্ষে ভিত্তিচিত্র সবচেয়ে উপযোগী, যেমন অজন্তার ছবি বা মাইকেল এঞ্জেলোর সিস্টেন চ্যাপেলের ছবি।

ছবির ক্ষেত্রে ভিত্তিচিত্র উপন্যাসের মত। রেনেসাঁ যুগের আর্টিস্টরা স্থাপত্যের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন। মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প সৃষ্টির এত খ্যাতি কেবল ছবির জন্য নয়, স্থাপত্যের সৌন্দর্য তাতে বেড়েছে বলে। মাইকেল এঞ্জেলোর Last Judgement বিরাট ছবি, কিন্তু ভিত্তিচিত্র রূপে তার খ্যাতি নেই। ইউরোপে যেমন রেনেসাঁ যুগের ভিত্তিচিত্র সব চেয়ে বিখ্যাত, তেমনি এসিয়ার সব চেয়ে বিখ্যাত অজন্তার ভিত্তিচিত্র। পরন্তু অজন্তার ভিত্তিচিত্র এবং রেনেসাঁর ভিত্তিচিত্রের অনেক জায়গায় মিল আছে। আবার সব চেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে অজন্তার চিত্রে অলংকরণের দিক আরও বেশি। প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের কথা ছেড়ে এবার আধুনিক যুগে আসা যাক।

আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা, মেক্সিকোতে ভিত্তিচিত্রের প্রতি আর্টিস্টদের নজর পড়েছে। আধুনিক যুগে ভিত্তি-

শ্রীচৈতন্যের জন্ম (জয়পুর পদ্ধতির ফ্রেস্কো, ভিজে অবস্থায় আঁকা)

শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

হল কর্ষণ উৎসবের একটি অংশ (ফ্রেস্কো, দেয়াল ভিজে থাকতে আঁকা)
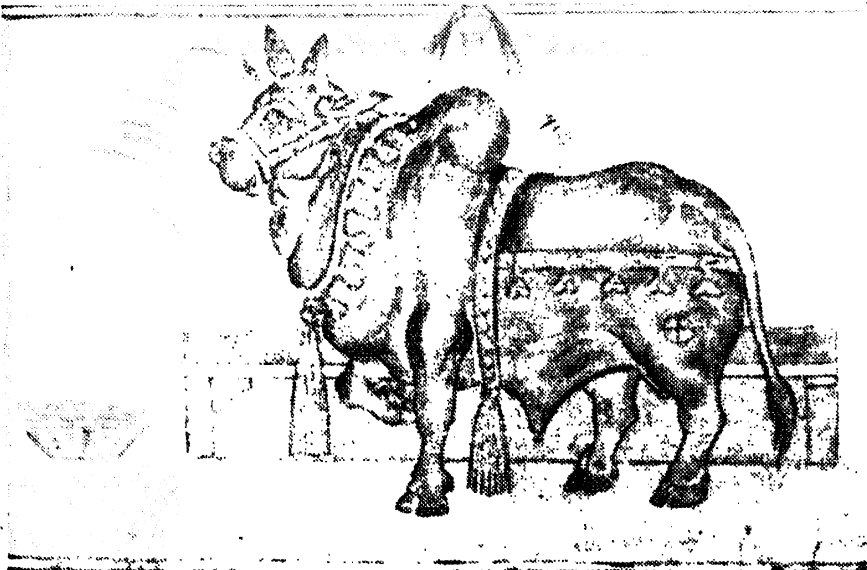
শিল্পী: শ্রীনন্দলাল বসু

চিত্রের নানা সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলেছে। অতীতের সকল রকম ভিত্তিচিত্র থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে কেউই কুণ্ঠিত নন। তাই আধুনিক ভিত্তিচিত্রের রূপও যেমন বিচিত্র, তেমনি তার করণ কৌশলেও নানা পরিবর্তন হয়েছে। পুরান দিনে ভিত্তিচিত্র করবার মোটামুটি দুরকম পদ্ধতি ছিল। দেয়ালের ওপর রং-এর আস্তর দিয়ে মিশরে কি রকম ছবি করা হোতো সে কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। বড় আদর্শ বা বড় উদ্দেশ্য না থাকলে যেমন উপন্যাস তৈরী হয় না, তেমনি চিত্রকরের সুদৃঢ় আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছাড়া ভিত্তিচিত্রের আদর্শ রাখা যায় না। কেবল নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগা নিয়ে ভিত্তিচিত্র করা চলে না।

এইবার নানা দেশে, নানা কালে ভিত্তিচিত্র কত রকম আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কিভাবে এই বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার পরিচয় দিই। মিশরে ভিত্তিচিত্র লেখারই সমগোত্রীয়। আলংকারিক পুঁথির পাতার মত মিশরের ভিত্তিচিত্রের রূপ। দেয়ালের ওপর সারি সারি ছবি আর লেখা মিলিয়ে যে আলংকারিক রূপ, দেয়ালের বিস্তৃতি এর দ্বারা আরও স্পষ্ট হোয়েছে। বুশম্যানদের পাহাড়ের গায়ে করা ছবি, চীনের পাহাড়ের গায়ে খোদাই ছবি, অজন্তার সব চেয়ে পুরান যা ছবি, এর মধ্যে তফাৎ থাকলেও মোটামুটি এরা এক জাতীয়। দেয়ালের উপর রং-এর আস্তর দিয়ে ছবি করা হোতো। পুরোপুরি ভিত্তিচিত্রের গুণ এতে বর্তমান। এদিক দিয়ে মিশরের ভিত্তিচিত্র আদর্শ স্থানীয়।

তারপর গ্রীক, রোম্যান এবং বিশেষভাবে পম্পিয়ান ভিত্তিচিত্রকে আর লেখার মত বলা চলে না। মোগল ছবি দিয়ে যদি ঘরের দেয়াল ভরে দেওয়া যায়, তা হলে পম্পিয়ান ভিত্তিচিত্রের ধারণা করা যায়। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগ ভিত্তিচিত্রের স্বর্ণ যুগ। মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল, গিওতো, বটিচেলি সকলেই ছবি করেছেন দেয়ালে। রেনেসাঁ যুগের আর্টিস্টদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পোপ, কাজেই সে যুগের চিত্রকরদের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই।

ধর্মের আদর্শ থাকলেও সে যুগের হাওয়া ধর্মভাবের চেয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকেই বইছিল। নিজের নিজের জ্ঞান ও চিত্র-বিজ্ঞানের ওপর তাঁদের অধিকার প্রকাশ পেয়েছে ছবিতে। আর এক উপায় ছিল, দেয়ালের ওপর চুণ-বালির আস্তর লাগিয়েই সংগে সংগে ছবি কোরে ফেলা, অর্থাৎ বালির আস্তর শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ছবিতে রং দিয়ে শেষ কোরে ফেলা। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় fresco (ফ্রেস্কো)। এই পদ্ধতির কাজের বাধা অনেক। আর্টিস্টের খেয়ালকে অনেকখানি সংযত কোরে ফ্রেস্কোর বাঁধাবাঁধির মধ্যে তার কাজ কারতে হয়; তারি ফলে ফ্রেস্কোর একটা বিশেষত্ব হয় বা তার বিশেষ সৌন্দর্য থাকে, যা অন্য উপায়ে হওয়া সম্ভব নয়। আজকালকার চিত্রকরদের একদল ফ্রেস্কো পদ্ধতি খুবই পছন্দ করেন, আর একদল মনে করেন অত ঝঞ্ঝাট দরকার নেই। তাই তাঁরা বড় ক্যানভাসে বা কাঠের তক্তায় ছবি কোরে দেয়ালে চাঁড়িয়ে দেওয়ার স্বপক্ষে। Mural Painting বলতে এই জিনিসই বোঝায়। এ ছাড়া আরও এক রকম কাজ এখন হয়—কংক্রিটের বড় টালি কোরে তার ওপর চুণ বালি ইত্যাদির মসলা জমিয়ে ফ্রেস্কো করা তারপর দেয়ালে টালি বসিয়ে দেওয়া।

ফ্রেস্কো — শিল্পী: শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

এইবার আমাদের নিজেদের দেশে ভিত্তিচিত্রের কি অবস্থা তার একটু পরিচয় দিই।

বাঙলাদেশে আধুনিক ভিত্তিচিত্রের ইতিহাস ২০।২২ বৎসরের বেশী নয়। শান্তিনিকেতনে এই কাজের প্রথম প্রচেষ্টা হয়। বালি কাজ করা দেয়ালে রং দিয়ে ছবি আঁকা থেকে শুরু হোয়ে জয়পুরের ধরণের ফ্রেস্কো কাজ, আধুনিক ইউরোপীয় ধরণের ফ্রেস্কো, ইজিপ্টের ধরণে দেয়ালে রং-এর আস্তর দিয়ে কাজের নানা চেষ্টা এখানে হোয়েছে। ভিত্তিচিত্রের করণ কৌশল খুবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু করণ কৌশলটুকুই সব নয়। ভিত্তিচিত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। এ পর্যন্ত বাঙলা দেশে আরও যেসব ভিত্তিচিত্রের উদাহরণ আমরা দেখছি, সেগুলির অধিকাংশই আর এক জাতীয় দেয়ালে সাঁটা ছবি। ভিত্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্য দৈবাৎ চোখে পড়ে।

আধুনিক যুগের ভিত্তিচিত্রের সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা আদর্শের। ধর্ম বা রাজার পৃষ্ঠপোষকতার দিন আর নেই। আমেরিকা, মেক্সিকো এবং নাৎসী জার্মানীতে রাষ্ট্রই অনেক ক্ষেত্রে ভিত্তিচিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষক।

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৪

শৈলজার চেয়ে বছর কয়েকের ছোট যে বোনের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তাকে তার বাপের বাড়ির সঙ্গে প্রায় সকল সম্পর্ক উঠিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার কার্যস্থলে বাসা বদল করে বেড়াতে হতো, তার পুরোপুরি নামটা ছিল মহামায়া; কিন্তু তার স্বামী সৌম্য নিজের আধুনিক রুচি অনুযায়ী নামটাকে কেটে ছেঁটে, ওর সনাতন সত্ত্বটাকে উড়িয়ে দিয়ে কিছু আধ্যাত্মিক এবং কিছু আলট্রা সামাজিকভাবে দাঁড় করালে—"মায়া"।

মায়ার আচার ব্যবহার, চলাফেরা, মায় হাবভাব পর্যন্ত, সমস্ত কিছুতেই নিজের পছন্দ মাফিক দাঁড় করাতে যতটুকু সাবধানতা দরকার, —সৌম্য তার এতটুকুও বাদ রাখে নি,—এবং মায়াও সে আশা করে নি কোনও দিন কিন্তু তবু যেন তার জড়তা, একটা অজানা আশংকা ছিল নিজের দিক দিয়ে,—যার জন্যে সে ঠিক নিজেকে প্রকাশ করার ভাষা পেত না সৌম্যর কাছে,—ভরসাও নয়· দাবী জানাবার কর্তৃত্বটুকুও ভাবতো অনধিকার; যার ফলে,—বিবাহিত জীবনের এই দীর্ঘ কয়েক বৎসর সৌম্যর একান্ত কাছে থেকে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে মিশেও সে যেন তবু তাকে ঠিক নিজের মনে করে নিতে পারছিল না।—

কোথায়—কেমন যেন একটা অসম্পূর্ণতা একটা ব্যর্থতার স্পর্শ ওকে ব্যথিত, ক্লান্ত করে তুলতো সময় সময়।

সৌম্য কাজ নিয়ে এসেছিল পোস্ট মাস্টারীর; বাঙলার অনেক গ্রাম, শহর আর পোস্টাপিস ঘুরে এবার যেখানে সে এসেছিল,—সে জায়গাটা বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে; চারদিকে পাহাড় ঘেরা—একটা ছোট স্থান; লোক জনের বসত খুব বেশী না হলেও—মোটামুটি কম নয়; —তবে তার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুব অল্প—যারা আছে, তাদের জীবন—তাদের ঘরকন্নার সঙ্গে কি সৌম্য, কি মায়া,—এদের মধ্যের কেউই যেন নিজেদের নিয়ে প্রবেশ করতে পারে না;—মিলও পায় না কিছু। তবু, এদেরই মাঝখানে, অথচ স্বতন্ত্রভাবে থেকে—এই একটানা ধরা-বাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার কল্পনায় সৌম্য একদিন আমন্ত্রণ করে পাঠালো তার বন্ধু পার্থ আর তার নব পরিণীতা বধূ অজন্তাকে।

সৌম্যর সাদর আমন্ত্রণকে অবহেলায় না ঠেলে ফেলে যেদিন ওর দুজনেই এই আতিথ্য গ্রহণ করতে এসে উপস্থিত হলো, সেদিন সকালের আকাশটার গায়ে আলোছায়ার আল্পনা এঁকে মাঝে মাঝে হাল্কা মেঘের দল ভেসে চলেছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। দূরে পাহাড়ের কোলে কোলে মহুয়া গাছগুলো দেখাচ্ছিল ধূম-ধূসর; কাছাকাছি গাছের পাতাগুলো উল্টে উল্টে যাচ্ছিল হাওয়া লেগে, কানে আসছিল সাঁওতালদের মিলিত কণ্ঠের গান, গুরু গম্ভীর মাদলের শব্দ।

দরজা থেকে ওদের সম্ভাষণ করলে মায়া।

মায়ার সর্বাঙ্গ ঘিরে লজ্জার আজ একটা বিশেষ সজ্জার পারিপাট্য, কিন্তু সে পারিপাট্য যেন নবাগতা অজন্তার দীর্ঘ পথশ্রমে বিশৃংখল সাজসজ্জা ও মলিনতার কাছেও হার মেনে নিলে অতি সহজে। অজন্তার পিঠের ওপোর এলানো দীর্ঘ বেণী, ঘুরিয়ে-পরা হাল্কা রঙের শাড়ি, আর ঘটি হাতা ভয়েলের ব্লাউজ, এ সমস্ত মিলে যেন একটা অপরূপ রূপ আরো মাধুর্যময় হয়ে দেখা দিল মায়ার চোখে; নিজেকে আজ যেন নতুন করে ওর মনে হলো নিষ্প্রভ, ম্লান তার কাছে।

অজন্তা কিন্তু এতটা বুঝতে চাইলে না সহজে; বড় বড় চোখের সহজ দৃষ্টি মায়ার মুখের ওপোর আবদ্ধ করে জানালোঃ—"নমস্কার; আপনার নাম আমি অনেক দিন আগেই শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি এতদিন।"

মায়া এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলে ম্লানহাস্যে।

যেন ঐ টুকুই তার কথার উত্তর এবং ঐ উত্তর পাওয়াই অজন্তার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ আজ সে পার্থের বিবাহিতা স্ত্রী হলেও, ওর অবিবাহিত জীবনের ইতিহাস একদিন যে রূপ নিয়ে মায়ার কাছে এসে পৌঁছেছিল, তাতে তার সহানুভূতিই শুধু নয়, শ্রদ্ধাও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারেনি, না পার্থ, না অজন্তা!

সময়োপযোগী রুচির ভিন্ন ভেদ কিছু কিছু হলেও আজন্ম সঞ্চিত সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না তখনই যখন মনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও স্বার্থহানির সংশয় জাগে।

মায়ার মনেও এই সংশয়, এই সন্দেহ কোন দুর্বল মুহূর্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তার এক দিক থেকে বিচার করতে গেলে তার এই সহানুভূতিটুকু না থাকার হেতু বিশেষ কিছু না হলেও, তুচ্ছ নয়।

পার্থ ওর মা, বাপ, ভাই বোন—কারো সম্মতি নেয়নি, মতামতও গ্রাহ্য করেনি বটে, তবু সে অজন্তাকে বিবাহ করেছিল সকলের সম্মুখে—নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে।...

হয়তো তার এ গৌরব অসীম সাহসিকতা। কিন্তু মায়ার মন যেন তাকে ঠিক স্বাভাবিক, সহজ বলে স্বীকার করতে পারছিল না। তাই অজন্তাকে অজন্তা, পার্থকে পার্থ বলে ভাবলে, চিরদিনের আদর্শবাদী মন ওর স্বামী স্ত্রী বলে মানতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল, সংকুচিত হয়ে পড়ছিল—বোধ হয়।

হয়তো এজন্য অজন্তাকে দায়ী করা অন্যায়, তবু মনের ওপোর জোর করা চলে না; আর চলে না বলেই মায়া হঠাৎ জবাব দিতে পারলো না অজন্তার কথার।

বেশী দিনও নয়—মাত্র মাস কতক হয়েছে ওদের বিবাহ, আর সে বিবাহের সাদর আমন্ত্রণ ও অনুরোধ-মাখা পত্রও যথাসময়ে এসে পৌঁছেছিল সৌম্য আর মায়ার হাতে, কিন্তু ওরা যেতে পারেনি। সৌহার্দ্দের মধ্যে হয়তো কোথাও ত্রুটি থেকে গিয়েছিল সৌম্যের; আর আজ সেই ত্রুটিটাকেই কতকটা ভর্ৎসনা, কতকটা অভিমানে মিশিয়ে দাবীর সুরে অজন্তা বললে—

"আজ আপনাদের এত কাছে পেয়েও কিন্তু একটা দুঃখ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিনে মায়াদি, সেটা হচ্ছে আমাদের বিবাহোৎসবে আপনাদের যোগ না দেওয়া।"

সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো পার্থের দিকে।

মায়া দেখলে তারও মুখে চোখে ভেসে উঠেছে **অজন্তারই** কথার সহাস্য সমর্থন!

অজন্তা দেখলে মায়া নির্বাক, কিন্তু সৌম্যর দৃষ্টিতে অসংখ্য প্রশ্ন, অনেকটা অনুশোচনা, কিন্তু সে মনোভাব প্রকাশের কোনও

ভাষাই খুঁজে পাচ্ছে না হয়তো।

কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে সৌম্য চুপ করে গেল হঠাৎ মায়ার দিকে তাকিয়ে।

মনে হলো অজন্তার পাশে দাঁড়িয়ে আজ যেন সে বড় ম্লান, বড় গম্ভীর হয়ে উঠেছে অকারণেই।

এক সময়ে সে প্রশ্ন করে বসলো—

"তোমার শরীরটা কি আজ তেমন ভালো নেই মায়া?"

মায়া চমকে উঠলো—

"শরীর খারাপ? কৈ, না তো! একথা কেন?"

"এমনি শুধু শুধু, মনে হলো হঠাৎ, তাই।"

সে ধীরে ধীরে মায়ার কপালের ওপোর এসে পড়া চুখগুলো সরিয়ে দিতে লাগলো যথাস্থানে, মায়া আপত্তি করলে না।

সৌম্য জিজ্ঞাসা করলে—

"ওরা কোথায়?"

"বেড়াতে বার হয়েছে।"

"ওরা বেড়াতে গেল, অথচ তুমি গেলে না ওদের সঙ্গে?"

দৃঢ়স্বরে মায়া জবাব দিল—

"না।"

"না—কেন?"

"ওদের সঙ্গে ঐ রকমভাবে বার হতে আমার লজ্জা করে, আর তা ছাড়া অভ্যাসও তো আমার নেই। চিরদিন ঘরে বন্ধ থাকাই সয়ে গেছে, আজ হঠাৎ দিনের আলোয় সকলের চোখের সামনে বার হতে গেলেই বা পারবো কেন?"

সৌম্য যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করলো—

"পারবে কেন?—লোকে চেষ্টা করলে পারে না কি এ জগতে; তবে যদি ইচ্ছে না থাকে, সে কথা আলাদা।"

একটু চুপ করে রইল দুইজনেই হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো সৌম্য, "কিন্তু কি জানো মায়া—আমার মনে হয় এই পারা আর না পারার মধ্যে গণ্ডী কাটে মানুষ নিজে—নিজেরই ক্ষণিকের ভুলে—যে ভুল ভেঙ্গে গেলেও সে গণ্ডী ডিঙোবার শক্তি সে আর ফিরে পায় না—সামর্থের অভাবে হা-হুতাশ করে কাঁদে আর ভগবানের দরবারে নালিশ করে এর ওর তার নামে, তবু বুঝতে চায়না, ইচ্ছে করেই চায়না যে, তার জন্যে একে ওকে তাকে দায়ী করা কত অন্যায়। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে, সকল অক্ষমতাকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে অপরের দোষ যতটুকুই হোক, তাকেই বড় করে দেখানোর মত আহাম্মকি আর নেই, তাতে অজ্ঞানেও বুঝতে পারে—যে গলদ কোথায়!"

মায়ার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে; এবার একটু কঠিন স্বরে বললে—

"তোমার একথার অর্থ কি আমিও বুঝিনে বলে মনে করো?"

সৌম্য চলে যাচ্ছিল; ফিরে এসে বললে—

"সে কথা মনে করবার মত বেকুব যে আমি নই মায়া—একথা তো তুমিও জানো! তবে আর একটা কথা আমার—অনুরোধই বল আর আদেশই বল মনে রেখো যে, ওরা আমার অতিথি! অতিথির যে আচার আর যে ব্যবহারই তোমার অমনোমত হোক না কেন, তা তোমার প্রকাশ করার কোনও দরকার আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না।"

সৌম্য চলে গেল।

নিস্তব্ধ হয়ে মায়া ভাবতে লাগলো শুধু ওর কথাগুলো; কি রূঢ়, কি উদ্ধত ব্যবহার সৌম্যের! হয়তো সে মনে করে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে শাসক আর শাসিতেরই সম্বন্ধ; দোষ গুণ প্রত্যেক মানুষেরই যেমন প্রকৃতিগত সৌম্যের স্ত্রী হয়েছে বলে মায়াও সে নিয়ম থেকে বাদ পড়েনি—কিন্তু সে ত্রুটি তার ক্ষমায় না ঢেকে তিরস্কারের আঘাত করা ছাড়া কি আর উপায় ছিল না সৌম্যের? হয়তো সেভাবে বাহ্যিক অভাব অনুযোগ মিটিয়ে অন্তরের দিকে না তাকালেও চলে; কিন্তু সেখানকার অভাবই যে সময় সময় সমস্ত প্রাচুর্যকে ছাপিয়েও উলঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে বসে, সে খবর সে রাখে না, কিম্বা রাখবার প্রয়োজন বোধও করে না কোনও দিন। একটা দীর্ঘশ্বাস মায়ার সমস্ত বুকখানাকে কাঁপিয়ে মিশে গেল বাইরের সজল হাওয়ায়।

সংসারের কাজে সে এসে হাত দিল। ঠাকুরকে ডেকে বললে—

"এ বেলার রান্নাটা আমিই করব এখন, তোমার ছুটি।"

ঠাকুর হয়তো বিস্মিত হলো না, কারণ মায়ার মনের রন্ধন-প্রীতির গোপন খবরটুকু সে পেত মাঝে মাঝে, এমনি অকারণেই। কিন্তু বিস্মিত হলো অজন্তা ফিরে এসে—

"একি মায়াদি, ঠাকুর থাকতে তুমি নিজে রাঁধছো—"

হাসিমুখে মায়া জবাব দিলে—

"এ অভ্যাস আমার বহু দিনের ভাই, তাই কষ্ট হয় না রাঁধতে, বরঞ্চ বেশ লাগে সময় কাটাতে। তার উপর নতুন অতিথিদেরও খাইয়ে একটু বাহাদুরী নেবার চেষ্টা আছে তো!"

সে হেসে উঠলো উচ্ছ্বসিতভাবে, অজন্তাও যোগ দিল বটে সে হাসিতে, কিন্তু যেন আন্তরিকভাবে নয়।

অনুযোগের স্বরে বললে—

"ওঁরা কিন্তু আমাদের পথ চেয়েই বাইরের বারান্দায় বসে আছেন মায়াদি—আর তুমি বাইরের খোলা হাওয়া ছেড়ে এই গরমে উনুনের ধারে বসে রান্না করবে, আর আমি তোমায় এখানে ছেড়ে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেব বলোতো?......

জোর করে টেনে আনা হাসিটুকু নিভে আসছিল মায়ার মুখে—অজন্তার এলো খোঁপায় গোজা মহুয়া ফুলের ছোট্ট থোকাটি কাঁটায় আটকে দিতে দিতে সস্নেহে বললে—

"বড় বোন থাকলে ছোট বোনের শাসনেরও যেমন আশঙ্কা থাকে, আদর আব্দারেরও তেমনি অবধি থাকে না; আমিও সেই বড় বোন, তাই ছোট বোন যদি কিছু উপদ্রবই করে ফেলে, ওদের কাছে আমায় না নিয়ে গিয়ে—তার জন্যে দোষী আমি, সে নয়।"

অজন্তা নির্বাকে তাকিয়ে ছিল মায়ার মুখের দিকে, চোখে তার ফুটে উঠেছিল অজানা একটা বিস্ময়, অচেনা মোহ; যে মোহের মধ্যে পড়ে—ঐ উনুনের আঁচ আর কেরোসিনের ডিবের ধূমায়িত আলোকে—আলোকিত মায়ার মুখে চোখের কোথাও তার খোল আনা—এতদিনের স্কুল-কলেজের তকমা-আঁটা মন হকি, টেনিস খেলার সঙ্গে মেশানো, হোটেল রেস্তোঁরার টেবিল চেয়ারে বসে রংবেরং-এর আলোকের উজ্জ্বলতায় কাটানো জীবনের কোনওখানে কোথাও এতটুকু সাদৃশ দেখতে না পেলেও মনে হলো এতদিন সে যেন একেই চেয়েছিল মনে মনে; নিভৃতে প্রার্থনা করেছিল—এমনি একটি রান্নাঘর, এমনি একটি সংসার—আর এমনি একটি দেহ মন ঢালা কর্তৃত্ব করার অধিকার!

কিন্তু সে তা পায়নি।

পার্থ তাকে সবই দিয়েছে হয়তো—দিতে পারেনি শুধু এই নিজেকে ডুবিয়ে ওর মধ্যে নিশ্চিহ্ন করার একাগ্রতা—সমর্পণের শেষ সুর।

মায়া বললে—

"তাছাড়া নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপারে এরা আমায় দিনের পর দিন ধরে এমন মমতায় বেঁধে ফেলেছে যে, একবেলা আমার দৃষ্টির অগোচর হলে মনে ব্যথা বাজে—!"

জলতরঙ্গের মত খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো অজন্তা! ওর হাসির সঙ্গে কানের দুল দুটোও দুলে উঠলো বারকয়েক।

(শেষাংশ ১২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে"র পরিশিষ্ট

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

'দেশে'র শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের "রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ (আমাদের 'ভূপেন দা') ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমার আসার প্রায় এক বৎসর পরে ১৩১০ সালে অগ্রহায়ণে (?) আশ্রমের কার্যে যোগদান করেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, প্রণয়প্রবণ হৃদয়, অমায়িক ব্যবহার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে আমাদের প্রীতিভাজন করিয়াছিল। তখন শিক্ষক ও ছাত্রদিগের বাসস্থান একটিমাত্র গৃহ; ইহা আদি বলিয়া এখন ইহার নাম "প্রাক্‌কুটীর"। এই কুটীরের পশ্চিমাংশে আমার বাসস্থান ছিল। ভূপেন দাও এই স্থানে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার সাহচর্য-লাভে কোন বাধাই ছিল না। সর্বদা একত্র বাসে অল্পকালেই তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ একটা প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল,—সেটা তাঁহারই চরিত্রমহত্ত্ব। অবসর পাইলেই দুইজন একত্র বসিয়া আশ্রমাদি নানা বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা চলিত। তিনি যতদিন আশ্রমে ছিলেন, বিদ্যালয়ের কার্যভার প্রধানভাবে তাঁহারই উপরে ন্যস্ত ছিল। সাহচর্য হেতু তাঁহার অধিকারের অনেক বিষয় আমার জানার সুসংযোগ হইয়াছিল। তিনি আমার অজ্ঞাত অনেক বিষয় আমাকে বলিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। এই হেতু তাঁহার লিখিত এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির ঘটনাসমূহ বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'এখন আর সব কথা মনে নাই',—কথাটা ঠিক। আমারও পক্ষে সেই একই কথা। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয় আমিও ভুলিয়াছিলাম। প্রবন্ধ পড়িয়া তাহা জানিতে পারিলাম। তিনি প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে ও কবির বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা নিঃশেষ হয় নাই, তত্তদ্‌বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; তাই তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টস্বরূপ এই প্রবন্ধ।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়—সতীশচন্দ্র রায় (সতীশবাবু) ভূপেনদার আগেই সম্ভবত গ্রীষ্মাবকাশের পরেই আশ্রমের অধ্যাপনা কার্যে যোগদান করেন। সতীশবাবুর মুখ তাঁহার সরল মনের দর্পণস্বরূপ ছিল, দেখামাত্রই প্রফুল্ল মুখে প্রীতিভাব অমায়িকভাব বুঝা যাইত। অধ্যাপক ছাত্র সকলেরই সঙ্গে তাঁহার মিশিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়াছি। শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া তিনি অধ্যাপনায় কথোপকথনে গল্পে বালকদিগের সহিত বেশ মিশিয়া যাইতেন। বাঙলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার গদ্যপদ্য-প্রবন্ধে লেখার শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গুণে তিনি কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরাও তাঁহাকে বিশেষ বন্ধুভাবে পাইয়াছিলাম। মাঘোৎসবের পূর্বে তিনি দিনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) সহিত পশ্চিমে বেড়াইতে যান। সতীশবাবু পশ্চিম হইতে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন; দিনুবাবু জোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আশ্রমে অধ্যক্ষের কার্যে ছিলেন। তিনি সতীশবাবুর চিকিৎসার সেবাশুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীশবাবুর প্রাণরক্ষা সাধ্যাতীত হইল—বসন্তের সাংঘাতিক আক্রমণ তাঁহার জীবিতকাল নিঃশেষ করিল। কবি এই সময়ে শিলাইদহের কুঠীবাড়িতে আশ্রমের কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। ভূপেনদা প্রবন্ধে ইহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ছাত্রগণের প্রাতঃস্নান—ভূপেনদা ছাত্রদিগের প্রাতঃস্নানের কথা লিখিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার আসার পূর্বে সকলেরই প্রাতঃস্নানের নিয়ম ছিল, বিশেষ কারণে বিশেষ বিধিও ছিল। আশ্রমের দক্ষিণে সুদীর্ঘ বাঁধ ছিল; উহার তলদেশ বালুকাময়, জল সুগভীর সুনির্মল। এই বাঁধেই বালকদিগের প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একজন অধ্যাপক বালকদিগের নায়ক থাকিতেন, স্নানের সময়ে তিনি ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই সময় সন্তরণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না, আমার স্মরণ নাই; সে চল্লিশ বৎসরের পূর্বের কথা। স্নানের পরে ব্রহ্মচারিবেশে পৃথক্‌ আসনে বৃক্ষমূলে বা অন্য নিভৃত স্থানে বালকগণের উপাসনার নিয়ম ছিল; সমবেত উপাসনায় উপনিষদের শ্লোকপাঠ, ঠিক মনে হয় না। বিশ্বভারতীতে এই নিয়ম এখনও অব্যভিচারে চলিয়া আসিতেছে। আশ্রমে স্নানের ব্যবস্থা ভূপেনদা দেখিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতা বা ম্যানেজারী—কবি যখন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার ভূপেনদাকে দিবেন স্থির করিয়া, তাঁহার নিকটে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই পদের নাথের আগ্রহাতিশয় হইতে তিনি মুক্তি পান নাই, আশ্রমের কার্যভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল—তিনিই ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কোষরক্ষায় ও হিসাবপত্রে যোগ্যতার অভাব বলিয়া তিনি যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই। তিনি হিসাবে খরচ লিখিতে কখন কখন ভুলিতেন। শেষে গচ্চা দিয়া হিসাব ঠিক করিতেন। কোষরক্ষায়ও তাঁহার অসাবধানতার পরিচয় পাইয়াছি। একবার তিনি লোহার সিন্ধুক হইতে টাকা বাহির করিয়া থোকে থোকে সাজাইয়া মজুত টাকার হিসাব মিলাইতেছিলেন, এই সময় কোন কার্যোপলক্ষে তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইল, ত্বরান্বিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন, টাকা তুলিয়া সিন্ধুকে রাখার কথা মনে হইল না, সবই তদবস্থায়ই রহিল। এই সময় একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য কোন কার্যোপলক্ষে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে তাঁহার ঘরের দরজায় পা দিয়াই দেখিতে পাইল, সিন্ধুক খোলা, টাকা থোকে থোকে সাজান। ভূপেনদার ভোলা-স্বভাব সে ভালই জানিত, ভাবিল ম্যানেজারবাবু নিশ্চয়ই ভুলিয়া এইরূপ করিয়াছেন; সে সেই দরজায়ই দাঁড়াইয়া রহিল, মনে করিল, অন্য চাকর এ লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না; ম্যানেজারবাবু বিপন্ন হইবেন। ভূপেনদার এ বিষয়ে সংশয় হওয়া দূরে থাক, এ কথা তাঁহার মনেই স্থান পায় নাই। তিনি নিঃসংশয় নিরুদ্বেগচিত্তে কার্য শেষ করিয়া ফিরিলেন, দেখিলেন দ্বারে ভৃত্য দণ্ডায়মান। বাহিরে থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে, তুই এখানে কেন? ভৃত্য বলিল,—আমার কাজ আছে। আমি এখানে এসে দেখলাম, আপনার সিন্ধুক খোলা, টাকার থোকা সাজান, এখন থেকে এক পাও নড়িনি, দাঁড়িয়েই আছি, পাছে আর কোন চাকর ঘরে ঢোকে। থোকা গুণে দেখুন, টাকা ঠিক আছে কিনা, তার পরে ঘরে ঢুকব,—আমার কথা বলব। ভৃত্যের এইরূপ কথায় ভূপেনদা নিজের ভুল জানিতে পারিলেন, শশব্যস্তে ঘরে গিয়া টাকার থোকা গুণিয়া দেখিলেন। টাকা ঠিকই আছে। ভৃত্য তখন নিকটে আসিল। সাধারণ ভৃত্যের এইরূপ বিশ্বস্তের আচরণ দেখিয়া তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এই ভৃত্য তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরস্কারাদিও তাহার ভাগ্যে ঘটিত, ভূপেনদা পরে অনুতপ্ত হইয়া বেচারাকে পুরস্কারও দিতেন। সে বলিত,—ম্যানেজারবাবু বকলে, শাসালে ভাল, আমার কিছু লাভ হয়। এক শত টাকা নোটের পরিবর্তে ভ্রমে হাজার টাকার নোট কবিকে দেওয়ার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—কবির মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সত্যবাবু) কয়েক বৎসর পরে বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ দীর্ঘ সুগঠিত-দেহ মৃদুস্বল্পভাষী একরূপ উদাসীন মনা। কিন্তু গম্ভীর-প্রকৃতি হইলেও, সকলের

সহিত তাঁহার বেশ মেশামিশি ছিল, আমোদসামোদে যোগ দিয়া তিনি তাহা বেশ উপভোগ করিতেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা শিক্ষকের আদর্শস্থানীয় ছিল। শান্তিনিকেতনে বর্ষার দৃশ্য বড় মনোহর। দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের মধ্যে শালতালমহুয়াদির শ্যামলপত্রসম্পদে শ্যামায়মান শান্তিনিকেতন তখন মরুদ্বীপের মতই বোধ হইত। কালবৈশাখীর দিনে, বর্ষার সমাগমে অবিরল ঝর-ঝর বৃষ্টিধারাপাত মাথায় লইয়া শিক্ষকেরা বালকগণের সহিত এই দিগন্ত প্রান্তরে মাতামাতি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বর্ষণের সুখ উপভোগ করিতেন। সত্যবাবুও বোধ হয়, ইহাতে যোগ দিতেন। একদিন বর্ষাকালে ভাদ্র মাসে (?) অবিরল ধারাপাত হইতেছে, ছাত্রাবাসের উত্তরে কিছু দূরে একটি নিভৃত কুটীরে আমরা কয়েক জন শিক্ষক বসিয়া আছি; আষাঢ়ে গল্প চলিতেছে। হঠাৎ বর্ষার গানের খেয়াল উঠিল। কে কে উপস্থিত ছিলেন, কে প্রথম গান ধরিলেন, ঠিক মনে নাই। তবে সত্যবাবু ভূপেনদা সে দলে ছিলেন, ইহা ঠিক। "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর"—বিদ্যাপতির এই বর্ষাবর্ণনার গান আরম্ভ হইল। সকলেই স্থিরভাবে নিবিষ্টচিত্তে সংগীত উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু "কুলিশ শত শত, পাত-মোদিত, ময়ূর নাচত মাতিয়া"—এই পদ গানের সময়ে ময়ূরের নাচে সত্যবাবুর মন নাচিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিলেন, এক পা তুলিয়া এক পায়ে ভর দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন; নৃত্য দেখিয়া সকলে হাসিয়া কুটপাট। গানটার আমোদ এইরূপে সকলেরই বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। সত্যবাবু ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঔষধে রোগ ভাল হয় না, উপবাসই রোগের পরম ঔষধ; উপবাসেই অপ্রকৃতিস্থ শরীর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া রোগমুক্ত হয়। সেইজন্য তিনি রোগে ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, উপবাস করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন।

বালকদিগের স্বাস্থ্য অধ্যাপনা ও শিষ্টাচার—ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের বিষয়ে কবি যেমন অবহিত ছিলেন, তাঁহাদের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলবিধানেও তাঁহার তদ্রূপই সাবধানতা ছিল। আমার "রবীন্দ্রনাথের কথা—গুণস্মৃতি" প্রবন্ধে স্বাস্থ্যে কবির সাবধানতার বিষয়ে ঘটনাবিশেষের উল্লেখ আছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ভূপেনদার প্রবন্ধে জগদানন্দ রায় মহাশয়ের ঘটনা অন্যতর উদাহরণ। অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া কবি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অজ্ঞাতভাবে তাঁহার অধ্যাপনার পদ্ধতি পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের ও অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রের আচরণও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি ইহা জানিতাম না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম—ইহা কোন অধ্যাপক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন।

১৩১৮ সালে কোন কারণে বিদ্যালয়ের কার্য হইতে আমাকে অবসর লইতে হইয়াছিল। এই সময়ে যিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অধ্যাপনার পরীক্ষায় তিনি কবির মনস্তুষ্টি করিতে পারেন নাই, বলা বাহুল্য, শীঘ্রই তাঁহাকে অবসর লইতে হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি আমাকে আবার আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের কথা—আমার পরিচয়" প্রবন্ধে ইহার বিবৃতি আছে।

কোনও কারণে ছাত্রের পীড়ন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিরক্তিকর ছিল। একবার কোন অধ্যাপক তাঁহার ব্যক্তিগত কারণে কুপিত হইয়া একটি ছাত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন—প্রহার একটু গুরুতরই হইয়াছিল। এই কথা কবির কর্ণগোচর হইবামাত্র অধ্যাপককে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়াছিলেন।

মৃদুস্বরে অধ্যাপনার পক্ষপাতিত্ব কবির ছিল না। তিনি বলিতেন, তাদৃশ পাঠনায় বালকগণের মনোনিবেশ সতর্ক ও পাঠাভিমুখ থাকে না, মন অলস হইয়া পড়ে, উচ্চস্বরে পাঠনায় মনোযোগ পাঠ্যের অভিমুখ ও সক্রিয় থাকে।

পাঠের সময়ে ছাত্রেরা শিক্ষককে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিবে,—ইহা তিনি শিক্ষকদিগকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। শিক্ষকেরাও তদনুসারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বালকেরা প্রথম প্রথম কয়েক দিন কবির আদেশ পালন করিত, পরে তদ্বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক শৈথিল্য দেখা যাইত, শিক্ষকেরাও অনিচ্ছা-সত্ত্বে বলপূর্বক সম্মান গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে বিশেষ ক্ষোভপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি যে যে দেশে গিয়েছি, লক্ষ্য করেছি, সে সকল স্থানে পূজ্যের প্রতি পূজা-প্রদর্শনের যে কোন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা স্বদেশীয়েরা অকৃপণভাবে প্রতিপালন করেছে। আমরা এ বিষয়ে অতি কৃপণ, সহজে এ সম্মান মাননীয়কে দিতে চাই না। এটা আমাদের পরম দুর্বলতা, অত্যন্ত অসভ্যতা।"

দরিদ্র-ভাণ্ডার, সাঁওতাল-পাঠশালা—[illegible] সহিত পরামর্শ করিয়া দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ আশ্রমে একটি দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। ইহা রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট বিষয়ের অন্যতম। শিক্ষকদিগের প্রদত্ত মাসিক চাঁদায়, অতিথি-অভ্যাগতের দানে, কবির সাময়িক অর্থসাহায্যে এই ভাণ্ডার অল্প দিনেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পাকশালায় প্রত্যহ যে চাউল আসিত, তাহা হইতে দুই সের চাউল ভাণ্ডারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মন্দিরের লৌহ-কপাটে ভাণ্ডারের একটি ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন ছিল; তাহার উপরে লিখিত ছিল,—"সব ধর্ম মাঝে ত্যাগধর্ম সার ভুবনে।" মন্দিরের দর্শকগণ ও পর্ববিশেষে সমাগত মহাত্মারা এই পাত্রে কিছু কিছু দান করিতেন। ইহাতেও ভাণ্ডারের কিছু ধনবৃদ্ধি হইত। বিদ্যালয়ের চাউল হইতে দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইত, উদ্বৃত্ত অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভাণ্ডারের হিসাবে জমা হইত। সংগৃহীত অর্থের হিসাবপত্র আমিই রাখিতাম। এই অর্থে কাপড়, চাদর, কম্বল কিনিয়া দরিদ্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দরিদ্র ছাত্রের বেতন পুস্তকের মূল্য, দুঃস্থদিগের সাহায্যার্থ অর্থ, বিদেশীয় অর্থহীন বিপন্ন ভদ্রলোকের পাথেয় ইত্যাদি এই ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইত। অধ্যাপক শরৎকুমার রায় সময় সময় ছাত্রদিগের নিকট হইতে ছাড়া কাপড়, জামা চাদর, মশারী ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে পাঠাইতেন। এইরূপে সমবেত চেষ্টায় ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধভাবে চলিয়াছিল। শেষে দরিদ্রবন্ধু মহাত্মা পিয়ার্সন এই ভাণ্ডারের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। তখন দুইজনের পরামর্শে ভাণ্ডারের কার্য চলিত। সাঁওতাল পল্লীতে সাঁওতাল বালকদিগের শিক্ষার্থে পিয়ার্সন যে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিকাংশ সময়ই থাকিতেন, সাঁওতাল বালকদিগকে লইয়া এইখানেই একত্র ভোজন করিতেন। তাঁহার দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও সহৃদয়তার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অমায়িক স্বভাব সকল সাঁওতাল পল্লীবাসীকে তাঁহার অনুরক্ত বন্ধু করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দরিদ্রের সহচর দুর্ভাগ্যের প্রতিকূলতায় মহাত্মা পিয়ার্সন অকালেই পরলোকগত হইলেন, দরিদ্রবন্ধুর অবসান হইল।

বন্ধুগণের সাহায্যে জন্ম হইতেই দরিদ্র-ভাণ্ডারকে লালিত-পালিত পরিবর্ধিত করিয়া শেষে কার্যবাহুল্যে সময়াভাবে ভাণ্ডারের কার্যভার, আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভূপেনদার সময়ে ভাণ্ডারের তাদৃশ সমৃদ্ধি হয় নাই, তাই তাঁহার প্রবন্ধে ইহার উল্লেখমাত্র আছে, বিবৃতি নাই।

প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন—প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, ইহা কবির অভিমত বিষয়ের অন্যতম। ছাত্রেরা স্বহস্তে সার দিয়া মাটীর পাট করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিবে, পশুর কবল হইতে সাবধানে তাহাকে রক্ষা করিবে, দরদী হইয়া জল দিয়া পরিপালিত পরিবর্ধিত করিবে এবং সেই শিশু বৃক্ষকে তরুবরের ফলফুলে সুশোভিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে উৎসাহের সহিত অন্য বৃক্ষ রোপণ পালন করিবে—ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। একদিন তিনি সমবেত ছাত্র শিক্ষকমণ্ডলীতে তাঁহার এই অভিমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এই বিষয়ে সকলেরই মনোযোগের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির এ আশা ফলবতী হয়

নাই। তাঁহার প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসবেই তাঁহাকে এই আশার পরিতৃপ্তি করিতে হইয়াছিল।

অপরাধীর প্রতি কবির ব্যবহার—দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া দোষীকে কর্কশ কথায় তিরস্কার করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ছিল না। অনেক স্থলে স্বাভাবিক সংকোচ-বোধ হেতু তিনি নীরবে অপরাধ সহ্য করিতেন; কোন কোন স্থলে, আবশ্যক হইলে, তিনি দলভবমধুর মৃদু কথায় দোষের বিষয় এমনভাবে বলিতেন, যেন দোষী মর্মাহত না হয়। আমার "রবীন্দ্রনাথের কথা—গুণস্মৃতি" প্রবন্ধে এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে দোষোল্লেখে তাঁহার প্রকৃতিগত সংকোচ বোধের উদাহরণরূপে আমার ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ভূপেনদার ম্যানেজারীর সময়ে সকালে বিকালে রাত্রিতে বালকদিগের খাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়া পর্যবেক্ষণ করার ভার আমার উপর ছিল। কোন কারণে মধ্যাহ্নে বালকদিগের আসার পূর্বে আমার আসা সম্ভব হইত না, সেই সময়ে আমার এক অধ্যাপক-বন্ধু আমার পরিবর্তে আসিয়া খাওয়ার প্রথম ব্যবস্থা করিতেন, আমি কিছু পরেই আসিতাম। এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুইশত। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের খাওয়ার পরে আমরা খাইতাম। একদিন সকলের খাওয়ার পরে শুনিলাম, একটি অস্পৃশ্য জাতির বালকের সংস্পর্শে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন দূষিত হইয়াছে। ঠাকুর চাকরেরা আপত্তি করিয়া বলিল, আমাদের কি ব্যবস্থা হইবে? আমি বলিলাম, কর্তৃপক্ষকে জানাও, তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন। আমরা দুগ্ধাদি খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া স্বস্থানে আসিলাম। কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, স্মরণ হয় না।

এই ঘটনার পাঁচ-ছয় মাস পরে মহর্ষির সরকারে খাজাঞ্চি আমার বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্যোপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন,— তোমার নামে কিছু অভিযোগ শুনিলাম। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাবুরা বলিলেন,—যদু, তোমার ভাইয়ের কথা শুনেছ? তোমার ভাই বিদ্যালয়ের অনেক ভাত নষ্ট করেছে। বড়দাদার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সেই সংস্পর্শদূষিত ভাতের কথা আমার মনে হইল। বড়দাদাকে তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া বলিলাম, —কবি ইহা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমিও তাঁর অপ্রিয়ভাজন হয়েছি। বড়দাদা বলিলেন,—এ-সব কথা তাঁর বড় মনে থাকে না, ভুলেই যান। এই কথায় আমি আর তখন ইহার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না; কিন্তু মনে অশান্তির বেদনা রহিয়া গেল। কিছুকাল পরে আমিও ইহা ভুলিয়া গেলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার দ্বিতলে থাকিতেন। রান্নাঘরের কার্যসংক্রান্ত কোন একটা বিষয় বলিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। আমার কার্য শেষ হইলে, হঠাৎ আমার ঐ নষ্ট-করা অন্ন-ব্যঞ্জনের কথা মনে হইল। আমি নিবেদন করিলাম,—আমার আর একটি বক্তব্য আছে। কবি বলিলেন, বল। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—বিদ্যালয়ের ভাত নষ্ট করার কথা আপনি কি শুনেছেন? তিনি উত্তর করিলেন—হাঁ শুনেছি, তুমি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জনের ভাত নষ্ট করেছ। আমি শুনিয়াই চমকিত হইলাম, বলিলাম,—পূর্বেই শিক্ষক ও ছাত্রদের খাওয়া হয়েছিল, আমরা দু-তিনজন শিক্ষক, আর ঠাকুর চাকর অবশিষ্ট ছিলাম। এতে এত লোকের ভাত নষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, কথাটা অতিরঞ্জিত হয়েই আপনার কানে উঠেছে। এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা যথাযথ তাঁহাকে শুনাইলাম। কবি তখন বলিলেন,—এখন সব বুঝলাম। আমি বলিলাম,—এর জন্য আমার উপর আপনার বিশেষ অসন্তোষ ছিল। কবি স্বীকার করিলেন। তখন বলিলাম,—এর পরে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা আপনি শুনলে আমাকে অনুগ্রহ করে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, দোষ থাকলে, স্পষ্টই স্বীকার করবো, একটুও অন্যথা করবো না, সমুচিত দণ্ডের জন্যও প্রস্তুত থাকবো। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কবির ক্ষমা—আমার "রবীন্দ্রনাথের কথা—গুণস্মৃতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কবির দয়াপ্রবণতা—আশ্রমে আসার কিছুকাল পরে আমার ছোট ভাই উন্মাদগ্রস্ত হয়। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন। তাঁহাকে ইহা জানাইয়া ছুটির জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন? আমি বলিলাম—পুরুষ কেই-ই নাই, মেয়েরাই আছেন। কবি বলিলেন,—তোমার ভাইকে এখানে আন, আমি তার সঙ্গে একজন চাকর রেখে দেব, সে দেখবে; তুমি নিরুদ্বেগে থাকতে পারবে। মহাত্মার আমার প্রতি এইরূপ অপ্রত্যাশিত সহানুভূতির সহিত দয়ার কথায় আমার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল, ভাব সংযত করিয়া নিবেদন করিলাম,—দেশে সেবা-শুশ্রূষার লোক, পথ্যদ্রব্য সহজলভ্য, এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব, এতে আপনাকেই অকারণে পীড়িত করা হবে মাত্র। তিনি কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন,—আচ্ছা, তবে যাও। আমার মত নগণ্যের প্রতি তাঁহার এই সদয় ব্যবহার আমরণ আমার স্মরণীয় বিষয়।

ধর্মে কবির পক্ষপাতহীনতা—ব্রাহ্ম-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ধর্মে অশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্র প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভূপেন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু মতানুসারে আশ্রমের পাকশালায় পাচক ব্রাহ্মণ, নবশাক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সহভোজন তাঁহার অনভিমত না হইলেও তিনি পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাহাকে প্রাধান্য দেন নাই সকলেই যথারুচি ভোজন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার সর্ববাদিসম্মত মত ছিল। কোন কোন অভিভাবক আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি কবির এই যথারুচি ভোজনের মত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধী যখন পাকশালায় ঠাকুর-চাকরের প্রচলন রহিত করিয়া সর্ববর্ণসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অনুপস্থিত। এইরূপ আকস্মিক আচারবিপ্লবে বিশৃঙ্খলার বিষম আঘাতে আশ্রমের চিরপ্রচলিত নিয়ম ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল; উদ্বেগ-অশান্তিতে সকলেরই মনও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিয়ম কিছুদিন চলিলে, কবি আশ্রমে আসিয়া গোল মিটাইয়া পুনর্বার পূর্ব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কবির সংক্রামক রোগে সাবধানতা—রবীন্দ্রনাথ সংক্রামক রোগে সর্বদা সাবধান ছিলেন। এ সাবধানতা কেবল তাঁহার নিজের বিষয়েই নহে, আশ্রমবাসী সকলেরই পক্ষে তাঁহার সাবধানতার লেশমাত্রও ত্রুটি ছিল না। একবার কোন অধ্যাপকের পুত্র বসন্তরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছিল। এই সংবাদ কবির কর্ণগোচর হইলেই তিনি সেই অধ্যাপকের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ঘরে আর যাঁহারা ছিলেন, ব্যবস্থা করিয়া তখনই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহার পরে এক সময়ে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, কবিকে সপরিবারে আমার বাসায় খাওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। সেই সময় 'উত্তরায়ণে' পরিবারস্থ একটি বালিকার হাম হয়; কবির বধূমাতা তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আমার বাসায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতাকে আসিতে দেন নাই, বলিয়াছিলেন, তার বাসায় বালকবালিকারা আছে, তাদের জন্য আমার শঙ্কা হয়।

মানব-প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে কবির নিপুণতা—লোকচরিত্র-পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল। অধ্যাপকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনা তাঁহার এই শক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

ভূপেন্দ্রনাথ ন্যায়নিষ্ঠ ম্যানেজার ছিলেন। বিদ্যালয়ের হিতকল্পে

যাহা তিনি ন্যায্য বলিয়া স্থির করিতেন শত বাধা সত্ত্বেও পক্ষাপক্ষ-নির্বিশেষে তাহাই কার্যে পরিণত করিতেন। কাহারও ভবিষ্যৎ প্রিয়া-প্রিয়তার বিচারণা তাঁহার ছিল না। এই হেতু আশ্রমের কোন কোন শিক্ষকের তিনি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একবার কবি কোন কার্যোপলক্ষ্যে ভূপেনদাকে শিলাইদহে আহ্বান করেন; তিনিও তদনুসারে কবির নিকট উপস্থিত হন। ঠিক এই সময়েই কোন কোন অধ্যাপক তাঁহার কার্যে দোষারোপ করিয়া কবির নিকট অভিযোগপত্র পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র যখন রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়, তখন ভূপেনদা কবির নিকটেই ছিলেন। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ কবি অভিযোগপত্র পড়িয়াই সব বুঝিলেন, বিচলিত হইলেন না; কিছু না বলিয়াই পত্রখানি ভূপেনদার হাতে দিলেন। ভূপেনদা পত্র পড়িয়া অপ্রত্যাশিত তাদৃশ অভিযোগে বিষণ্ণ হইলেন দেখিয়া, কবি স্বভাবমধুর স্নিগ্ধ-বাক্যে বলিলেন,—দুঃখিত হইবেন না, আশ্বস্ত হন; আমার এ কথায় আস্থা নাই। আপনি যে কাজের ভার নিয়েছেন, তা ন্যায্যভাবে করতে হলে সকলেরই মনোরঞ্জন করা দুষ্কর। এ কাজের তিরস্কার-পুরস্কার দুই-ই আছে। আমি জানি আপনি ন্যায়নিষ্ঠ, তাই আপনাকেই এ কাজের ভার দেওয়ার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কবির এই কথায় ভূপেনদা বলিলেন,—পত্র পড়ে দুঃখিত হই নি, একথা আমি বলতে পারি না—সেটা সত্যের অপলাপ। যথান্যায় যথাশক্তি কাজ করেও অভিযোগের কারণ হব, এটা আমি ভাবি নি; সকলকেই সন্তুষ্ট করে কাজ করার চেষ্টার ত্রুটি করি নি, তবে কেন অকৃতকার্য হয়েছি, জানি না। এক্ষেত্রে এ অভিযোগে আপনার আস্থা নাই, এইটুই আমার একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়। ভূপেনদা আশ্রমে ফিরিয়া আমাকেই এ ঘটনা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ নাই, আমিই ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভূপেনদার আসার পূর্বে দ্বিপেন্দ্রনাথ কিছুকাল বিদ্যালয়ের অর্থসচিব ছিলেন। তিনিও এইরূপ অভিযোগে বিরক্ত হইয়া শেষে সচিবপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন কথাপ্রসঙ্গে একথা আমি তাঁহার নিকটে শুনিয়াছিলাম।

কবির প্রতিভায় বিদ্বেষবুদ্ধি—পূর্ব হইতেই কবির প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির অভাব ছিল না। কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবিই এই বিপক্ষতাচরণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। প্রতিভা-সম্পন্ন মাত্রেরই এই একই কথা চিরসত্য; কবি কালিদাস ইহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের পরেই এই বিদ্বেষবিষ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। কবির দেশ-বিদেশে খ্যাত সুনামে মিত্রভাপন্নেরাও ঈর্ষাপন্ন হইয়াছিল। এই সকল বিদ্বেষীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের কুটিলতায় বিদ্বেষবিষ উদ্গিরণ করিতেন, উদ্দেশ্য কবির এই খ্যাতি অমূলক, ইহার মধ্যে কোন কূটকৌশল আছেই। কূট প্রশ্নে বিপন্ন হইয়া আমি মাধ্যস্থ্য অবলম্বন করিতাম। 'হাঁ না' কিছুই বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতাম না, কোনপ্রকারে তাঁহাদের এই ঈর্ষামূলক কূটপ্রশ্নজাল হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

ইংরেজী রচনায় কবির শক্তিতে সংশয়বুদ্ধি—একদিন প্রাতঃ-কালে দেখা করিবার জন্য আমি স্বর্গত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাসায় গিয়াছিলাম। কুশলপ্রশ্নের পরে তিনি আমার অভিধানের কথা পাড়িলেন এবং তদ্বিষয়ে উভয়ের বক্তব্য-শ্রোতব্য শেষ হইলে, ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই সন্দেহ করেন, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত নয়, অন্যেরই রচনা। আমি তখন তাঁহাকে স্বকীয় মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—আমার এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই,—এ অনুবাদ রবীন্দ্রনাথেরই। পূর্বে কবির এ শক্তির কোন প্রমাণ না পেলেও, এ শক্তি তাঁর মূলেই ছিল না, এটা বিশ্বাস করি না। শক্তি নিশ্চয়ই ছিল, কোন কারণে ইহা প্রকাশ পায় নি। আমি আর কোন কথা বলি নাই।

কবি যখন বিলাতে অধ্যাপক মর্লির ইংরেজী সাহিত্যের শিষ্য ছিলেন, তখন অধ্যাপক একদিন তাঁহার ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে বিষয়-বিশেষের প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অভিমত হয় নাই বলিয়া অধ্যাপককে দেন নাই। একদিন অধ্যাপক তাঁহার প্রবন্ধ দেখিতে চাহিলে, অগত্যা কবি প্রবন্ধটি আনিয়া দিলেন। শুনিয়াছি, স্বর্গত কবির বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত ঐ প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রবন্ধ শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিষ্যাবস্থাপন্ন রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি যে অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

আমি কবির মুখে শুনিয়াছি,—আমি চিরকালই বাঙলায়ই কবিতা প্রবন্ধাদি লিখি, ইংরেজীতে লিখতে পারি, এটা আমার ধারণাই ছিল না। ইংরেজীতে লেখার পত্র অজিতকে দিয়েই লিখিয়েছি। এখন দেখছি, আমার লেখা ইংরেজী প্রশংসার বিষয়ই হয়। তবে বাঙলা যেমন লেখনীর মুখে সহজেই আসে, ইংরেজী তত সহজ হয় নি, পরে হয়ত হ'তে পারে।

আনন্দেই কবির জীবিতকালের পর্যবসান—কবি আনন্দময়ের উপাসক, তাই তাঁহার জীবিতকাল আনন্দেরই অবিরত ধারায় আনন্দ-সাগরে মিশিয়াছে। তিনি অন্তরের অনন্ত আনন্দধারায় ভাসিয়া গাহিয়াছেন,—

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।"

আনন্দ গানের মূর্তিতেই বাহিরে প্রকাশ পায়, গান আনন্দের বাহ্য-রূপ। এখানে আসিয়া প্রাক্‌কুটীরে বালকদিগের সহিত হার-মোনিয়মের সুরের সহিত গীত তাঁহার এই গান দুটি শুনিয়াছি,—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর,
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি গরায়, তা ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়॥"

"ঘাটে বসে' আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
সে বাতাসে তরী ভাসাব না
যাহা তোমা পানে নাহি রয়॥"

সকল ঋতুতেই তাঁহার প্রাতরুত্থান অভ্যস্ত ছিল; প্রত্যূষে শান্তি-নিকেতনের দ্বিতলে তাঁহার ললিতকণ্ঠের মধুর সংগীতও মধ্যে মধ্যে উপভোগ করিয়াছি। ছায়াভিনয়, অভিনয়, নৃত্যগীতবাদ্য, বক্তৃতা, প্রবন্ধ-পাঠ, ঋতুপর্যায়ে বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, পৌষোৎসব, বসন্তোৎসব—এইরূপ নানাবিধ আনন্দের অনুষ্ঠানপরম্পরায় তিনি স্বীয় জীবিতকাল আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্রম-বাসীরও সেই সঙ্গে আনন্দ উপভোগের সীমা ছিল না—আশ্রমজীবন আনন্দের জীবনই ছিল। অভিনয় অভিমতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত তিনি বার্ধক্যেও অনলসভাবে ছায়াভিনয়ে যোগ দিয়া নাটকীয় পাত্রগণকে উপদেশ দিতেন এবং অভিনয়-সৌষ্ঠবে তাঁহার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইল, ইহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতেন। 'ঘরোয়া'য় জানা যায়, তাঁহার এই অভিনয়ের আনন্দধারা যৌবনের প্রারম্ভে আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিকভাবে বার্ধক্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবে একবার তিনি সন্ন্যাসীর ভূমিকার অভিনেতা সাজিয়াছিলেন। এই ভূমিকায়, "আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?"—এই লক্ষেশ্বরের উদ্দেশে

(শেষাংশ ১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অসবণ

সমীর ঘোষ

ধূসর কুয়াশার পাতলা প্রলেপে দিগন্ত ঢাকা। পূর্বাকাশের গায়ে রাত্রি শেষের মেঘের স্তর জমিয়াছিল। তাহার উপর কুয়াশার প্রলেপ ভেদ করিয়া কে যেন জাফরান রংয়ের তুলি টানিল।

সুহাসের ঘুম অনেক আগে ভাঙিয়াছিল। বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে সে থামিল। রংয়ের তুলি তখন উদয় দিগন্তের ওপর নিপুণ হাতে কে টানিয়া চলিয়াছে। চারি পাশ নীরব, নিথর। মেঘের কালো স্তর ধীরে ধীরে সকল কালিমা মুছিয়া অরুণাভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

এক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকার পর সুহাস ঘরে আসিয়া ঢুকিল। গভীর নিদ্রায় অবলুপ্ত বাণীর গালে একটা টোকা মারিয়া ডাকিল, বাণী ওঠো, ওঠো। আকাশে কেমন রংয়ের খেলা চলছে দেখবে এসো।

নিদ্রিতা বাণী সুহাসের কথা কি বুঝিল জানি না। সে শুধু পাশ ফিরিয়া শুইল আর শুইবার সময় হাত বাড়াইয়া খুকুকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল।

সুহাসের গলার স্বরে খুকুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। ঘুমের যেটুকুন জড়িমা তাহার নিষ্কলঙ্ক চোখে লাগিয়াছিল, তাহা বাণীর হাতের ছোঁয়ায় মুছিয়া গেল।

বাণীকে আর দ্বিতীয়বার না ডাকিয়া সুহাস খুকুকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর দুইজনে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্বাকাশ তখন লাল রংয়ে ডুবিয়া গেছে। ধীরে ধীরে বাতাস উঠিতেছিল। সেই বাতাসে বোধ হয় খুকুর পাতলা চুলের কয়েকটি আসিয়া সুহাসের মুখে লাগায় সুহাসের নিজের গালের উপর খুকুর গাল চাপিয়া ধরিল। প্রত্যুত্তরে খুকু খিল খিল করিয়া হাসিল। সুহাসের মনে হইল প্রভাতের সমস্ত নিস্তব্ধতা খুকুর এই হাসিতে ভাঙিয়া গেল। বাতাস বহিল, পাখীরা ডাকিল, অবাঙ্ময়তার কোল হইতে মানুষের ভাষার মুখরতা পৃথিবীর ইথারে তরঙ্গ বিস্তার করিল। সুহাস গভীর স্নেহে খুকুকে বুকের ভিতর টানিয়া চুমু খাইল।—খুকু তখন তাহার কোমল ছোট্ট দুইটি বাহু দিয়া সুহাসের গলা জড়াইয়া রহিয়াছে।

বোধ হয় খুকুর হাসিতে বাণীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে বারান্দায় সুহাসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর খুকুকে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে খুকু আর একবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া সুহাসের বুকে মুখ লুকাইল।

সুহাস হাসিল, বলিল, আজ সকাল থেকেই তোমার পরাজয় শুরু হোল বাণী!

বাণীও হাসিল, মুখের উপর হইতে কয়েক গাছি রেশমী চুল সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, সংসারে আমি কোনদিন জয়ী হোতে চাই না, আমার আনন্দ তোমার জয়ে।

—তবে আমার জয় তোমারি হোক।—সুহাস খুকুকে বাণীর কোলে দিল।

খুকুকে কোলে লইতে লইতে বাণী বলিল, তুমি কি কাজে চললে?

হ্যাঁ।

—কতো বেজেছে?

—বাণী ঘড়ির দিকে চেয়ে কি মানুষের কাজ চলে। মানুষের কাজ করা হোচ্ছে ওই উদয় দিগন্তের দিকে চেয়ে। যে দিগন্তে উঠছে নতুন দিনের সূর্য, এসেছে নতুন আলোর সাদা জোয়ার। বৈদিক যুগে শুরু হোয়েছে সূর্য-দেবতার যজ্ঞ। সুহাস থামিল। তরপরে বাণীর গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, অলরাইট বাণী, চা তৈরী হোলে সোণালী এক পেয়ালা যেন আগে আসে!

একটু ইতস্তত করিয়া বাণী বলিল, তোমার কি বড্ড বেশী কাজ?

কেন বলো তো?

আমি স্টোভ্ ধরাবো, তুমি খুকুকে একটু আগলাবে।

—তারপরে গরম চা হোলে এক পেয়ালা থেকে দুজনে—

ভ্রূকুটী করিয়া বাণী বাধা দিল, য্যা।

"য্যা মানেই তো হ্যাঁ"।—সুহাস মুখ টিপিয়া হাসিল, এসো খুকু এখন বাণীর জয়।—সুহাস খুকুকে কোলে টানিয়া লইল।

ট্রেন চলিতেছিল। আকাশের গায়ে তখনও অন্ধকার জড়াইয়া আছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে মণির মতোন তারা জ্বলিতেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে চারিপাশ নীরব, নিথর। সুহাস আস্তে আস্তে জানালার কাঁচ নামাইয়া দিল। বাহিরের পাতলা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বাথরুমের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন বাহিরে আসিল অন্ধকার প্রায় মুছিয়া গেছে। তারার জ্যোতি অদৃশ্য, দূর পাহাড়ের নীল রেখা দিগন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টেবিলে বসিতে গিয়া সুহাস দেখিল, বয় চা আনিয়া তাহার টেবিলে রাখিয়া গিয়াছে। কেটলী হইতে চা ঢালিয়া পেয়ালায় লইতেই ধূমায়িত চায়ের গন্ধে এতক্ষণের জন্য যেন সেলুনের বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। সুহাস মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে একবার মাত্র চাহিল: চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া দূরে দিগন্ত হইতে অজস্র সোণালী আলো আর ঝলমল সূর্য চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। সুরভিত চায়ের গন্ধে আর বাহিরের এই আলোয় সুহাসের মন যেন উদাসী হইয়া গেল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু সুহাস নিজেকে ঝাঁকুনী দিয়া ঠিক করিয়া লইল। চায়ে ঘন ঘন চুমুক দিতে দিতে সে এই ঔদাস্যকে গলা টিপিয়া মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। দুর্বল ভাবালু মুহূর্তগুলিকে সে মোটেই দেখিতে পারে না। সে চায় না পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলো তাহার সম্মুখে সারিবদ্ধ সৈন্যের মতো আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার কাজের ক্ষতি করিবে।

চাশূন্য কাপটা নামাইয়া রাখিবার সময় সুহাস আর একবার আকাশের দিকে চাহিল। সাদা রৌদ্রের প্লাবনে আকাশ ভাসিয়া গেছে। তীব্র আলোকে সূর্য উদ্ভাসিত। সামনের টেবিলের দুইটি বাস্কেট আর তাহাতে সংরক্ষিত কাগজপত্রের দিকে চাহিয়া ইস্পাতের মতোন তীক্ষ্ণ অথচ কঠিন কণ্ঠে সুহাস ডাকিল, বয়!

বয় আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া গেল।

খস্ খস্ করিয়া সুহাস লিখিয়া চলিল। ট্রেনের দ্রুতগতিকেও সে যেন তাহার মননশীলতা আর লিপিবদ্ধতার কাছে পরাজিত করিতে চায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বাহিরের জগতকে ভুলিল—নিজের কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

সেই কাজের মধ্য হইতে কি একটা কাগজ লইবার জন্য মাথা তুলিতে আবার তাহার চোখ বাহিরে গিয়া পড়িল। সে দেখিল দূরে পাহাড়ের নীল রেখার উপর ঝকঝকে সূর্য নামিয়াছে—ঘন অরণ্যের শ্যামলতায় সেই আলোর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, অজস্র রঙ্গীন প্রজাপতির মতোন আনন্দ ও আশার কল্পনা বাতাসে উড়িয়া চলিয়াছে।

বাণী কি ছেলেমানুষ! তাহার ছেলেমানুষীতে আজও বাঁধ

সুহাস ভুলিয়া থাকিত! পাগল, ওই সব কথা ভাবিয়া আজ শুধু হাসা চলে। কিন্তু হাসিবারই বা সময় কোথায়?

একটা চুরুট সুহাস ধরাইয়া লইল। চশমার কাঁচে বোধ হয় সামান্য ধোঁয়া লাগিয়াছিল—চশমাটা সে একবার মুছিয়া লইল। আবার কলম তুলিয়া লইতে হইল! তাহা ছাড়া আর উপায় কি? তদারক শেষ হইয়া গেছে, যথাসম্ভব শীঘ্র তদারকের বিবরণসহ তাহার নিজের মন্তব্য পাঠাইতে হইবে।

চুরুটটা আর ভালো না লাগায় কয়েক টান দিয়া পাশের ছাই-দানীতে সেটা সে রাখিয়া দিল। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে একটু নিবিড় করিয়া লেপটাইয়া লইল। তারপর আবার সে নিজের কাজে ডুবিয়া গেল।

বাণী বলে, সে নাকি ধীরে ধীরে সমস্ত সংসারকে ভুলিতেছে। বহির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বাতাস আর রৌদ্রকে হারাইয়া ফেলিতেছে। তাহার দিন আর রাত্রি নাকি অধিকার করিতেছে শুধু কাজ। রেলের লাইন নাকি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে! এক কথায় বাণী বলে, সুহাস আজ সংস্কৃতি হারাইয়া ফেলিতেছে—তাহার কাজের সংকীর্ণ জগতে সে নিজেকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে।

বাণী পাগল, অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

বাণীকে যেন প্রশ্রয় না দিবার জন্য সুহাস আরো দ্রুতগতিতে লিখিয়া চলিল।

এমনি করিয়া বাণীর কাছ হইতে নাকি সুহাস দূরে সরিয়া গেছে। দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত দিগন্তে আসিয়া উদয় দিগন্তের দিকে চাহিয়া ডুবিয়াছে। আর বাণী ও সুহাসের ব্যবধানের প্রাচীর দৃঢ় করিয়া গেছে।

খোকার জন্মদিনের কথা ধরা যাক। সারা সংসারে সেদিন উৎসব লাগিয়া গেল। সেই উৎসবে কিন্তু সুহাসের সাক্ষাৎ মিলিল না। দূরে কোথায় একটা নদ বর্ষার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অজস্র জলভার পাইয়া ভৈরব মূর্তিতে নাচিয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসের তান্ডব-লীলায় মানুষের বহু আয়াস রচিত সেতুকে নিজের বক্ষ হইতে সরাইয়াস্বাধীনতার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে—সুহাসকে ছুটিতে হইল সেইখানে, সেই নদের সহিত যুদ্ধ করিতে!

আকাশ ছিল কালো মেঘে ঢাকা। বাতাসে কেয়া ঝাড় হইতে প্রচুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বাংলোর চারিপাশে সারিবদ্ধ করিয়া বসানো রজনীগন্ধা প্রদীপ্ত মুক্তার মতো কুঁড়ি সবুজ বৃন্তের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে।

না গেলেও চলিত। কিন্তু সুহাস গেল। তখন গাড়িবারান্দার উপর বর্ষাতি চাপানো শেষ হইয়াছে। রবার ক্লথের ভিতর সমস্ত কাগজপত্র পুরিয়া সেলুনে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় তাহার কাছে খবর গেল: নতুন অতিথি জন্ম লইয়াছে।

নতুন অতিথি জন্ম লইয়াছে!—সামান্য ইতস্তত করিয়া সুহাস পিছন ফিরিয়া বারান্দার উপর দিয়া খানিকটা হাটিয়া ভিতরে গেল। তারপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইল। চুরুটে গোটা কয়েক টান দিয়া সে পিছন ফিরিল। সামনে কাহাকে যেন দেখিয়া বলিল, ফিরে এসে খোকা দেখবো, ট্রেনের সময় হোয়ে গেছে!

এই কথার প্রতিবাদ করার মতোন লোক সেখানে কেহ ছিল না। যাহারা আশে পাশে ছিল, এই অদ্ভুত উক্তি যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা শুধু পরক্ষণে বর্ষার ফলার মতোন তীব্র বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া দেখিল সুহাস মোটরে স্টার্ট দিয়া স্টেশনে চলিয়া গেল।

বাণী সেদিন কাঁদিয়াছিল। এমন অভিমানের কান্না আগে কখনও সে কাঁদে নাই। কি এমন সুহাসের কাজ যে খোকার জন্ম-দিনে বাণীর চোখ দিয়া জল বাহির করাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল জলকল্লোলে উদ্বেলিত কোন নদের সহিত যুদ্ধ করিতে! প্রতিভার যদি পরিচয় দিতে হয় তো এমন করিয়া অকারণ আঘাতের সত্যই কি কোনো প্রয়োজন থাকে? যে কাজ অনায়াসে সুহাসের নিম্নতর কর্ম-চারী করিতে পারিত, সেই কাজে বিশ্বসংসারকে উপেক্ষা করিয়া এমন ছুটিয়া যাওয়াকে নিছক বাণীর প্রতি বিদ্রূপ, অবহেলা ছাড়া আর কি বলিয়া ধরিবার আছে।

বাণী চোখের জল মুছিল, কিন্তু সুহাসকে ক্ষমা করিতে পারিল না। সে আজ কিছুতে বলিতে পারিল না, তোমার জয়ে আমার জয়—কোথাও আমার পরাজয় নাই! কালো মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া বার বার সে ভাবিল: সংসারে তাহা হইলে আমার কোনো অংশ নাই, আমার কোনো দাবীর মাথা তুলিবার অধিকার নাই। যে আমাকে রাণীর আসনে বসাইয়াছে, তাহার নিজেরই যেদিন প্রয়োজন হইবে, সেদিন সে বিনা কথায় পথের ধারে আমাকে বসাইয়া একখানা ছিন্ন শাড়ি দিয়া ভিখারিণী সাজাইয়া দিবে—সেদিন আমার কোনো প্রতিবাদ টিকিবে না! অভিমান করিবারও সেদিন কিছু নাই। সেদিন শুধু নীরবে চোখের জল মোছা ছাড়া আর কোনো কাজ আমার নাই!

খোকার জন্মদিন—বাণী আঁচল দিয়া আর একবার চোখের জল মুছিল, কিন্তু সুহাসকে ক্ষমা করিতে পারিল না।

কাজে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করিয়া সুহাস ফিরিল। ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল, তাহার পরাজয় হইয়া গেছে। সংসারে দুই দল দুই রকমে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকি-বার চেষ্টা করে। প্রথম দল গলার জোর বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া জানাইতে চাহে, সংসারে কেহ তাহাদের জয় আটকাইতে পারে না, তাহাদের বাধা দিবার শক্তি অপর কাহারও নাই। অপর দল ঠিক উল্টোভাবে নিজেদের মুছিয়া ফেলিয়া, শুধু কাজের মধ্যে কারণে অকারণে ডুব মারিয়া নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিতে চায়।

অন্য কোন ক্ষেত্রে হইলে সুহাস হয়তো প্রথম দলে ভিড়িয়া চীৎকার করিত, দাসী চাকরদের ধমকাইয়া নিজের পরাজয়, সেদিন কাজের অজুহাতে পালাইয়া যাওয়ার দুর্বলতা ঢাকিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহা হয় না। বাণীর চাপা ঠোঁট আর মুখের কঠিন রেখা-গুলির দিকে চাহিয়া সুহাস দ্বিতীয় পন্থা ধরিল। মনে মনে সে জানিয়াছিল, তাহার চীৎকারে বাণী যদি ঠোঁট টিপিয়া হাসে আর সেই হাসি তৃতীয় ব্যক্তির চোখে পড়ে তবে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার জীবনের সমস্ত বৎসরগুলি ধরিয়া ব্যয় করিলেও বাণীর উপেক্ষার হাসি ঢাকা যাইবে না।

কাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় খুব দামী একটা উপহার সে আনিয়াছিল। পরের দিন দুপুর বেলায় এক নিভৃত মুহূর্তে খুকুকে সুহাস ধরিয়া ফেলিল, ভাই কেমন দেখতে হোয়েছে খুকু?

খুব সুন্দর—দেখবেন আসুন না বাবা?

ঠিক এমনি একটি আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া অব-শেষে খুকুকে সুহাস ধরিয়াছিল।

তা বেশ, চলো। সুহাস খুকুর পিছন পিছন বারান্দা বাহিয়া চলিল।

সুহাস মনে মনে বোধ হয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল: নবজাত শিশু ঘুমাইতেছে, বাণী অনুপস্থিত।

সোণার চেন সংলগ্ন উপহারটি খোকার গলায় পরাইয়া দিয়া উঠিবার সময় হঠাৎ সুহাসের কি মনে হইল কে জানে, সুহাসকে দেখা গেল খোকাকে কোলে তুলিয়া লইতে।

—খুব সুন্দর, না বাবা?

—হ্যাঁ।—বলিয়া খুকুর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুহাস দেখিল সামনে দাঁড়াইয়া বাণী, তাহার ঠোঁটে কি তীক্ষ্ণ হাসি চাপা।

সেই হাসি গায়ে নিঃশব্দে মাখিয়া লইয়া সুহাস যাচিয়া আলাপ করিল, খোকা কি সুন্দর দেখতে হয়েছে!

খুব শান্তস্তিমিত কণ্ঠে সেই কথার উত্তর না দিয়া কপোলের উপরে উড়িয়া আসা রুক্ষ চুল কয়েক গাছিকে সরাইয়া দিতে দিতে বাণী বলিল, তোমার কাজের চেয়ে?

মানুষের যেখানটিতে দুর্বলতা সেইখানে যদি সে কোনদিন সামনাসামনি ঘা খায়, তবে সংসারে কাহাকেও আর ভয় করিবার মতন অবস্থা তাহার থাকে না। আজ বাণীর এই উদ্বেলতাহীন কণ্ঠের প্রশ্ন সুহাসকে ঠিক তেমনি ভয়বিহীন করিয়া দিল;

খোকাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বাণীর সামনে সটান হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, বাণী, ঘরের চারটে দেয়াল আর তার মধ্যের ছেলেমেয়ে বা স্বামী নিয়েই আমার জীবন নয় -আমার জীবন ওই সম্মুখের অনন্ত প্রসারী পথে, সূর্যের প্রদীপ্ত আলোকে, কাজের মধ্যে!

বাণী যদি সুহাসের এই কথার উত্তর না দিতো, তবে বোধ হয় মুখে বলিলেও কাজে বাণীকে আরো উপেক্ষা করিয়া চলিতে সে পারিত না। কিন্তু সুহাসের মুখের সম্বোধন বাণীকে হঠাৎ উদ্দীপ্ত, উচ্চকিত করিয়া তুলিল, তীব্রকণ্ঠে সে সুহাসকে প্রতিবাদ করিল, তুমি স্বার্থপর তাই এমন কথা বলছো। ভেবে দেখেছো, ছেলেমেয়ে বা স্বামী নিয়েই যাদের জীবন, তারা যদি তাও না পায় তাহলে চার দেয়ালের মধ্যে তাদের খাঁচার পাখীর মতন বন্দী করে রাখার বীরত্ব না থাকাই ভালো!

অতি অকস্মাৎ সুহাস নুইয়া গেল। কিছুদিন আগে সে কোন মতে বাণীর অনুরোধ না রাখিয়া খুকুকে কোন কনভেণ্ট স্কুলের বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়াছিল। আজ বোধ হয় তাহাকে ছুটি করাইয়া খোকার জন্মোপলক্ষে আনানো হইয়াছে।

মাথা নত করিয়া সুহাস চলিয়া গেল। বাণীর জীবন হইতে তাহার এই যাওয়া বোধ হয় বিদায় লইয়া যাওয়া বলা যায়। ব্যবধানের প্রাচীর বাড়িয়া গেল।

কিন্তু যে কারণেই হোক, খুকুকে আর স্কুলের বোর্ডিংএ ফেরত পাঠানো হইল না। আজ যাইবে, যাওয়া হইল না, কাল যাইবে, যাওয়া হইল না, তারপরের দিন যাইবে, যাওয়া হইল না— এমন করিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, খুকুর জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন। অনেক দিন, মাস কাটিয়া গেল। বছর কয়েক পরে বাড়ির সকলে, এমন কি খুকুর লীলা দিদিমণি পর্যন্ত জানিল, সুহাসের সহিত বাণীর কোন কথা নাই। মাসের পাঁচ তারিখে খুকুকে ডাকিয়া সুহাস একটা খামের ভিতর করিয়া এক তাড়া নোট পাঠাইয়া দেয়, তারপর সমস্ত মাস সে ডুবিয়া থাকে তাহার কাজে। কি কাজ সে করে, কোথায় কখন লাইনে তদারকে যায়, তাহার কোন খবর সে বাণীকে পাঠায় না, বাণীও কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে খবর লয় না।

বাড়িতে নিজের অফিস-ঘর ছাড়া আর কোথাও সুহাস যায় না। খালি এক একদিন নিজের খেয়াল মতোন সে খুকুকে ডাকিয়া পাঠায়, খুকু আসিলে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কেমন পড়াশোনা হইতেছে জিজ্ঞাসা করে। কোন কোন দিন খুকু একা আসে না, খোকাকে সংগে লইয়া আসে। সেদিন অফিস ঘরের গাম্ভীর্য আর চুরুটের গন্ধ ছাপাইয়া খোকার কলহাসির সহিত খুকুর আনন্দের কলকণ্ঠ সোনা যায়।

মধ্যে মধ্যে সুহাস লীলা দিদিমণিকে ডাকিয়া পাঠায়। তাহাকে খুকুর সম্বন্ধে বহু কথা জিজ্ঞাসা করে। তীক্ষ্ম বুদ্ধি লীলা দিদিমণি স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এতো কথা বা আলোচনার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে। সাহায্য করিতে পারিলে সত্যই সে সুখী হইত, কিন্তু উপায় নাই। যদিও সে বাণীর সমবয়সী তবুও বাণীর গাম্ভীর্যের গণ্ডী পার হইবার ক্ষমতা তাহার নাই! বাণী যে তাহাকে ঘৃণা করে তাহা নয়, বাণী শুধু অনবরত একটা ব্যবধান রাখিয়া চলে। লীলা স্পষ্টই বোঝে, বাণী যদি নিজে হইতে এই পার্থক্য না মুছিয়া দেয়, তবে তাহার পক্ষে বাণীর কাছে কোন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাওয়া একেবারে অসম্ভব!

এই পার্থক্যের দেয়ালে বিন্দুমাত্র আঁচড় টানিবার অক্ষমতা লইয়াই একদিন লীলা দিদিমণি চলিয়া গেল। খুকুর মারফৎ বাণী জানিল, তাহার বিবাহের সকল কিছু ঠিক ছিল এখন লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কলকাতায় টাকা পাঠাইয়া বাণী খানকয়েক দামী শাড়ি এবং আরো কয়েকটা জিনিসপত্র আনিয়া খুকুকে বলিল, তোমার দিদিমণিকে প্রণাম করো।

লীলা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, বলিল, এ সমস্ত—

বাণী বাধা দিল। সহজ, স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, আপনি আমাদের দিয়েছেন অনেক, আপনার ঋণ আমরা শোধ দিতে পারবো না। আপনাকে আমরা কোন দিন ভুলতে পারবো না। আর আমাদের যাতে আপনার মাঝে মাঝে মনে পড়ে তাই খুকুর এই প্রণাম।

লীলা দিদিমণি কোন কথা না বলিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিতে করিতে বাণী কথা শেষ করিল, আমাকে হয়তো আপনি, দাম্ভিক, গর্বিত ভেবেছেন। আপনি আমার সমবয়সী, তবুও আপনাকে আমি কোনদিন সমবয়সীর অধিকার দিই নি, যদিও বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়ো। তার কারণ আপনার অজ্ঞাত নয়—সেইজন্যে মনে হয় আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে একদিন ক্ষমা পাবো।

অভিভূতের মতোন সহসা আগাইয়া আসিয়া লীলা দিদিমণি বাণীকে প্রণাম করিতে গেল। বাণী পিছনে হটিয়া সসংকোচে বলিল, ছি, ছি আপনি করছেন কি!

মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে লীলা বলিল, আমি ঠিকই করছি। সংসারে আমি সত্যি ছেলেমানুষ, তাই আপনার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছিলুম।

বাণীকে প্রণাম সারিয়া খুকুকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুনিষিক্ত মুখে চুম্বন দিয়া লীলা দিদিমণি বলিল, কেঁদো না খুকু! আমি চলে যাচ্ছি তো কি হয়েছে? তুমি ভালো করে লেখাপড়া করবে আর মার কাছে কাছে থাকবে। তাহোলে পরে তুমি নিশ্চয়ই অনেক বড়ো হোতে পারবে।

সুহাস ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। লীলা ঘরে ঢুকিলে সুহাস তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া বলিল, আপনাকে ছাড়বার ইচ্ছা আমাদের মোটে ছিল না, কিন্তু আটকেও তো রাখা চলে না। আপনি খুকুর জন্যে যা করেছেন, সে ঋণ অপরিশোধ্য। শুধু খুকুর প্রণাম হিসাবে আপনাকে আমার এই দেওয়া। সুহাস টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা মুখ আঁটা খাম বাহির করিয়া লীলার দিকে আগাইয়া দিল।

খামে যে টাকার নোট আছে, তা বুঝিতে লীলা দিদিমণির বিন্দুমাত্র দেরী হইল না। সুহাসের আগাইয়া দেওয়া খামে হাত না দিয়া সে নতমুখে বলিল, খুকু আমাকে আগেই প্রণাম করেছে।

খুকু আপনাকে প্রণাম করেছে। সুহাস বিস্মিত হইল। পরমুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। সংসারে শুধু খুকু নাই, বাণীও আছে। ভিতরে যাহা কিছুই ঘটিয়া থাকুক না, বাহির হইতে দেখিলে সুহাস, খুকু আর খোকাকে লইয়া বাণীর গৃহস্থালীও আছে। সেই গৃহস্থালীতে কোন ত্রুটি বাণী ঘটিতে দিতে পারে না।

সুহাসের সমস্ত শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। ঘণ্টি বাজাইলে আর্দালি আসিয়া ঘরে ঢুকিতে সুহাস হুকুম দিল, মিসিবাবাকো বোলাও।

আর্দালি ছুটিয়া খুকুকে ডাকিয়া আনিল।

খুকু আসিলে সুহাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দিদিমণিকে কি দিয়ে প্রণাম করলে খুকু?

খুকু থমকিয়া দাঁড়াইল: দিদিমণিকে তো অনেক কিছু দিয়া প্রণাম করা হইয়াছে—কোনটার নাম সে আগে করিবে! একটু ভাবিয়া সে বলিল, সেগুলো নিয়ে আসবো বাবা?

ঘাড় নাড়িয়া সুহাস বলিল, আনো।

কাপড়ের বাক্স খুলিয়া ও অন্যান্য জিনিষপত্র দেখিয়া সুহাস বুঝিল, বাণী কোন ত্রুটি রাখে নাই। তবুও সে লীলা দিদিমণির হাতে খামখানা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আমার নমস্কারই না হয় রইলো—আমাদের এই নির্বাসনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব-বিহীন হয়ে আপনাকে যে কষ্ট পেতে হয়েছে, তার তুলনায়—সুহাস চুপ করিয়া গেল।

লীলা বোধ হয় এতোক্ষণ ধরিয়া এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সুহাসের দেওয়া খামখানা ডান হাতের ছোট্ট মুঠির মধ্যে সজোরে চাপিয়া বাঁ হাত চেয়ারের হাতলে রাখিয়া মাটীতে চোখ নামাইয়া ভারী গলায় বলিল, আপনার কথার প্রতিবাদ করে আমি বলছি, কোন কষ্ট আমি পাই নি। তবুও আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমার থেকে যা আশা করা হয়েছিল বিন্দুমাত্র আমি তা করতে পারি নি। তার জন্যে অবশ্য নিজেকে যতটা দায়ী মনে করেছিলাম, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমি সত্যই ততোটা দায়ী নই। অপরপক্ষ যতোটা দোষী যে পক্ষের হাতে ক্ষমতা আছে, সে পক্ষ এজন্যে আরো বেশী পরিমাণে দোষ করেছে! সে নমস্কার করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অপসৃয়মান লীলা দিদিমণির দিকে চাহিয়া সুহাসের সমস্ত শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল: একবার মনে হইল ওই প্রগলভ মেয়েটাকে ডাকিয়া সে বুঝাইয়া দেয়, বেশী পরিমাণে দোষ সে করিয়াছে বলিয়াই খুকুর জন্য তাহাকে অতো মোটা টাকা মাসে মাসে দিয়া সে আনিতে পারিয়াছে।

পরমুহূর্তেই চুরুট ধরাইতে সুহাস আপন মনে হাসিয়া উঠিল: পাগল, কাহাকে সে এই কথা বুঝাইতে যাইবে। স্কুল কলেজের পড়া শেষ করিয়া চাকরী করিলেও মেয়েমানুষের মন তো ঘর ছাড়িয়া পথে আসিবে না। ও মন সেই ভাঁড়ার ঘরের স্বল্পান্ধকারে আর রান্নাঘরের পাঁচ ফোড়নের গন্ধে স্বতঃসম্পন্ন সিদ্ধান্তের ন্যায় মিশিয়া যাইতেছে, উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। ওখানে তর্ক করা মিথ্যা, রাগ করা অবাঞ্ছনীয়, অভিমান করিয়া মুখ ফিরাইয়া লওয়া ছেলেমানুষী।

সজোরে একটা টান দিয়া চুরুটটা ছাইদানীতে রাখিতে রাখিতে সুহাসের মনে হইল, কিছু না বলিয়া সে খুবই ভালো করিয়াছে। কিছু বলিলে সে যদি বাণীর মতোন তাহাকে অভিযুক্ত করিত, বলিত, বন্দী করিয়া রাখিতে সে ভালোবাসে, তবে তাহা সুহাসের অসহ্য হইত—কিছু না বলিয়া সে ভালোই করিয়াছে।

খুকুর জন্য আর কোন নতুন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন না। একদিন খুকুকে ডাকিয়া ডাকিয়া সুহাস যখন বিরক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছে, সেই সময় বাণীর হাতে লেখা এক টুকরা কাগজ আসিল খুকুকে আমি বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়াছি, আপত্তি থাকিলে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা হইবে।

সুহাসের আপত্তি?—কিছু না বলিয়া খোকাকে সুহাস হাত ধরিয়া বুকের ভিতর টানিয়া আনিয়া বলিল, দিদিমণি কবে বোর্ডিংয়ে গেছে?

খোকার শ্যামল মুখের সুন্দর দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, রুদ্ধস্বরে সে বলিল, অ-নেক দিন! দিদির বোর্ডিংয়ে যাওয়া তাহার ভালো লাগে নাই।

খোকার অভিমান আর অশ্রুপূর্ণ চোখের দিকে চাহিয়া সুহাসের একবার মনে হইল, উঠিয়া সে বাণীর কাছে যায়, বলে, খুকু বাড়িতেই থাক বাণী, আর একজন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী আনলেই চলে যাবে।

কিন্তু আর একদিনের কথা সুহাসের মনে হইল, মনে হইল বাণীর অভিযোগের কথা, তাহার উপরে লীলার যায়—পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া খোকার চোখ মুছাইয়া সে বলিল মার কাছে যাও খোকন, আমার কাজ আছে। সেই রাত্রে সুহাস লাইনে গেল।

মাঝে মাঝে দীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে খুকু আসে—সুহাসের ঘরে মাঝে মাঝে দুই ভাইবোন একত্রিত হইয়া ঢুকে—সুহাস হাত হইতে কলম নামাইয়া রাখিয়া তাহাদের দিকে চায়। তাহার অতিথিদের স্বাগতম জানায়! খুকুর অনুপস্থিতির সময় এক একদিন যখন মনটা চঞ্চল হইয়া উঠে, সুহাস কখনো খোকাকে ডাকিয়া পাঠায়, কখনো লাইনে বাহির হইয়া যায়।

এমনি করিয়া সময় কাটিতেছিল। সুহাসের কাছে সংসারের যেমন কোন হিসাব ছিল না, তেমনি হিসাব ছিল না দিনের। তাই বোধ হয় একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে বাণীর কাছ হইতে সংবাদ আসিল, খুকুর বিয়ের সমস্ত কিছু সে ঠিক করিয়াছে, এখন শুধু চাই সুহাসের সম্মতি।

একবার মনে সামান্য দ্বিধা জাগিলেও, সেই দ্বিধা চাপিয়া সুহাস সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিল, তাহার কোন আপত্তি নাই, কতো টাকার দরকার যেন শীঘ্র জানানো হয়।

বিয়ে হইয়া গেল। আশীর্বাদের সময় বরকনেকে একত্র দাঁড় করাইয়া সুহাসের মনে হইল, বাণীকে বিশ্বাস করিয়া সে ঠকে নাই, খুকুর জন্য উপযুক্ত বর বাণী সংগ্রহ করিয়াছে।

আশীর্বাদের পালা শেষ হইল। আকাশে অস্ত দিগন্তের উপর সূর্য তখনও অজস্র স্বর্ণাভ রশ্মিতে জাগিয়া আছে—অন্ধকারের নিশানা তখন কোথাও নাই। বাণীকে একদিন সুহাস যে কথা বলিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া সে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিল: যেন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত তেজে তাহারা নিজেদের কর্তব্য করিয়া যায়।

বাণী কি আশীর্বাদ করিল সুহাস তাহা জানিতে পারিল না। সে শুধু দেখিল বাণীর শুষ্ক ঠোঁট দুইটি নড়িল, বাণীর যাহা বলিবার ছিল মনে মনেই বলিল, সুহাস শুনিতে পাইল না, জানিতে পারিল না।

খুকু চলিয়া গেল। সংসারের যে সামান্য হিসাব সুহাস কলম নামাইয়া মাঝে মাঝে কাজ থামাইয়া খুকু আর খোকার দিকে চাহিয়া তাহাদের হাসি আর কথা শুনিয়া কষিবার চেষ্টা করিত, তাহা সে ভুলিতে বসিল। খোকাও কিছুদিন আগে বোর্ডিংয়ে গেছে।

সুহাসের ঠিক টেবিলের ওপারের জানালার ফাঁকে যে আকাশ, যে প্রান্তর চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেইখানে সেই আকাশ আর প্রান্তরে সুহাস কখনো দেখিত মেঘেরা কালো আঁচল বিছাইয়াছে, বর্ষার বিস্রস্ত বায়ু আকাশ হইতে প্রান্তরে নামিয়া প্রান্তর পার হইয়া জানালার এক পাশে সরাইয়া দেওয়া বাদামী পর্দা দোলাইতেছে। কোনদিন আবার সই রূপ বদলাইত আকাশ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত অজস্র নীল। প্রান্তরে কাঁপিতে সূর্যের সোনার আলো, রাত্রি ভাসিয়া যাইতো জ্যোৎস্নার প্রাবল্যে। সুহাসের চোখে খোকাখুকুর মুখ ভাসিত, কান যেন তাহাদের কলহাসি শুনিত।

সেলুনে করিয়া লাইনে চলিতে চলিতে এক একদিন রাত্রিতে খাওয়া শেষে চুরুটে আগুন দেওয়ার অবসরে বাহিরের প্রকৃতির দিকে চাহিলে মনে পড়িত বাণীর কথা। একখানা কাগজ তাড়াতাড়ি টানিয়া লইয়া সুহাস সে কথা ভুলিবার চেষ্টা করিত—কি ছেলে মানুষ বাণী!

একদিন যখন এই রকম অবসরে জানালার ওপারে চাহিয়া সুহাস চুরুটে আগুন দিতেছে, বাণী আসিয়া ঝড়ের মতোন ঘরে

ঢুকিল। টেবিলের উপর পা তোলা ছিল। তাড়াতাড়ি মুখের চুরুট সরাইয়া, পা নামাইয়া সুহাস বাণীর মুখের দিকে চাহিল।

টেবিলের এক প্রান্তে নুইয়া পড়িয়া বাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল খুকুর ভয়ানক অসুখ, তার এসেছে, চলো যাই।

বাণীর মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া সুহাস জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবো?

সুহাসের সেই শূন্য দৃষ্টির উপর চোখ রাখিয়া পরিপূর্ণ বিস্ময়ে বাণী বলিল, কেন কলকাতায় খুকুর শ্বশুরবাড়িতে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ছাইদানী হইতে চুরুটটা তুলিয়া লইয়া সেইটা নাড়িতে নাড়িতে সুহাস বলিল, দেখো তুমিই যাও। আর খোকাকে বরঞ্চ টেলিগ্রাম করো—আমি বাকী ব্যবস্থা করছি।

আর তুমি?

—আমি? সামান্য ইতঃস্তত করিয়া সুহাস চেয়ারে নড়িয়া বসিল, আমার একটু দরকার ছিল, একবার লাইন ঘরে—

অতি ক্ষীণতম শব্দ না করিয়া সুহাসের কথা শেষ হইবার আগে বাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুহাস শুধু এইটুকু দেখিলঃ ঘরের বাহিরে গিয়া বাণী চোখে আঁচল চাপা দিল।

চুরুটে দুই একটা টান দিয়া সুহাস আর্দালীকে হুকুম দিল লাইনে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে।

ভোর রাত্রে স্টেশানে যাইবার সময় সুহাসের চোখে পড়িল বাণীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বাণী কি তবে এখনও যায় নাই?

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বহুদিন পরে সুহাস বারান্দা পার হইয়া বাণীর ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে কাহার দীর্ঘ ছায়া আসিয়া পড়িল। থমকিয়া আসিয়া সুহাস পিছন ফিরিল। আর্দালী সেলাম করিল, হুজুর তার আয়া।

অফিস-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সুহাস তার পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সজোরে নিজেকে নাড়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপরে অত্যন্ত ধীর, শান্তগতিতে বাণীর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। দেখিল খাটের উপর অবসন্নভাবে বাণী পড়িয়া আছে। সিক্ত আঁখির কোণ বাহিয়া অজস্র জলধারা নামিয়া চলিয়াছে। ঘরের ঈষৎ নীল আলোয় বাণীর মুখের সংকুচিত রেখায় স্পষ্টই বোঝা যায় সে আজ পরিশ্রান্ত, জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত, বলিতে পারা যায় পরাজিত।

সুহাস বাণীর দিকে আগাইয়া গেল। সুহাস আসিছে জানিতে পারিয়াও বাণী নড়িল না। চোখের জল মুছিল না, শুধু দৃষ্টি ফিরাইয়া সুহাসের দিকে চাহিল।

—তুমি কলকাতায় গেলে না?

—না।

—কেন?

—তারা জিগ্যেস করলে তোমার কথা কি বলবো?

—কোন কথা না বলিয়া হাতের তারখানা সুহাস বাণীর দিকে আগাইয়া দিল।

সুহাসের হাত হইতে তারখানা লইয়া বাণী পড়িল। একবার পড়িল, দুইবার পড়িল, তিনবার সেই তারখানা পড়িল। মনে হইল তারের মানে সে বুঝিতে পারিতেছে না। তারপরে সে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, খুকু—

হঠাৎ নুইয়া পড়িয়া বাণীকে দুই হাতে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া সুহাস বাণীর প্রশ্নের উত্তর দিল, হ্যাঁ, নেই।

সুহাস ডাকিল—বাণী, বাণী!

কোন উত্তর নাই—বাণী জ্ঞান হারাইয়াছে। সুহাস অবরুদ্ধ কণ্ঠে আবার ডাকিল, বাণী, বাণী!

সমস্ত নিস্তব্ধ বাংলো যেন সেই ডাকে কাঁদিয়া উঠিল। সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবার সংগে সংগে সুহাসের যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল আর্দালি, আর্দালি!

আর্দালি আসিবার আগে বাণীর ঝি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে বাণীর অচেতন দেহ ছাড়িয়া দিয়া সুহাস একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দাঁড়াইবার শক্তি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার দুই পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। রক্তের চাপ এতো বেশী হইয়া গেছে যে, মনে হইতেছে, হৃদপিণ্ড ফাটিয়া যাইবে।

রাত্রির অন্ধকার তখন সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গেছে। ভোরের সূর্য আকাশে মাথা তুলিয়াছে। মেঘ পাহাড়ে রঙীন তুলি বুলাইতেছে। দুই হাতে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া সুহাস একবার সেইদিকে চাহিল।

চক্রবাল

(১১৭ পৃষ্ঠার পর)

মায়ার আশা ছেড়ে সে ফিরে এলো বারান্দায়, যেখানে পাশাপাশি দুখানা চেয়ার পেতে বসেছিল পার্থ আর সৌম্য।

অজন্তা এসে ওদেরই মাঝামাঝি চেয়ারখানায় নিজের ভ্রমণ-পরিশ্রান্ত কৃশ তনু এলিয়ে দিলে—ছিন্ন আলোকলতার মত।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

পশ্চিমাকাশের স্তিমিত আলোর ছটা এসে ওর মুখে, বুকে, গলায় পড়ে গলার সরু হারটা চিক চিক করে উঠলো, হাওয়ায় দুলে উঠলো কপালের পাশে এসে পড়া চুলের গোছা। এরই কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে বসে মায়া শুনলে অজন্তা গাইছে—

আসা যাওয়ার পথের ধারে—
গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন,
যাবার বেলায় দেব কারে
বুকের মাঝে বাজলো যে বীণ;
সুরগুলি তার নানা ভাগে,
রেখে যাব পুষ্পরাগে;—
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণ লেখায়
করবো বিলীন।
কেটেছে দিন।
কিছু বা সে মিলন মালায়, যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে ঐ চাহনীর চোখের পাতা;
কিছু বা কোন চৈত্র মাসে,
বকুল ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো-আমার
কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন।
কেটেছে দিন॥

ক্রমশ

জ্ঞান-বিজ্ঞান

স্ব বসু

আচার্য জগদীশ স্মরণে

পাঁচ বছর পূর্বে (১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে) বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ মহাপ্রয়াণ করেছেন, কিন্তু তাঁর দেশবাসীর অন্তরে তাঁর স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয়নি। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তিনি যে কীর্তি ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাতে তাঁর নাম জগতের ইতিহাসে চিরদিন সমুজ্জ্বল হয়েই থাকবে। তাঁর আবিষ্কারের অভিনবত্ব জগৎকে যেমন বিস্মিত ও সচকিত করেছে, ভারতবর্ষকেও উহা তেমনি এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত, আচার্য জগদীশের পূর্বে আর কোন ভারতবাসী বিজ্ঞানে এরূপ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হন নি।

গাছপালা, ফুলফল ও নানা রকমের খনিজ দ্রব্যগুলোকে চিরদিনই আমরা চোখে দেখে এসেছি। কবিরা কেহ তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ তাদের গঠন-প্রকৃতি, গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে এসেছেন; এমনি ভাবে একপ্রকার বাঁধা ধরা গণ্ডীর মধ্যেই এ সবের আলোচনা চলে আসছিল। কিন্তু এই নির্বাক অচেতন উদ্ভিদজগতের প্রাণের পরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা পূর্বে বড় একটা হয়নি। কোন কোন ফুল সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে; লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করা মাত্র সে যেমন জড়সড় হয়ে পড়ে—বহুবিধ যন্ত্রপাতিকে উপর্যুপরি ব্যবহার করার পর তাদেরও যেন ক্লান্তি পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানসেবীদের দৃষ্টি এদিকে যে একেবারে আকৃষ্ট না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য নির্ণয়ে তেমন মনোযোগী হননি। আচার্য জগদীশই সর্বপ্রথম প্রকৃতির এই রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নবান হন এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নানাবিধ পরীক্ষা করে একদিন সমগ্র জগৎকে বিস্মিত সচকিত করে ঘোষণা করেন—আপাত দৃষ্টিতে অচেতন এই উদ্ভিদগুলোও মানুষের মতই চেতনাশীল। সুখ দুঃখের অনুভূতি তাদেরও আছে। তাদেরও জীবন প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় মানুষের মত। বাহিরের আঘাত বা উত্তেজনায় জৈব-অজৈব চেতন-অচেতন সমভাবেই সাড়া দিয়ে থাকে।

তাঁর এই নূতন আবিষ্কারে বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন উপস্থিত হল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অভ্যস্থ বৈজ্ঞানিকদের অনেকের মন সংশয়ে আন্দোলিত হল বটে, কিন্তু আচার্য জগদীশ তাঁর গবেষণা লব্ধ ফল যখন নিজের উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইংলণ্ডের বিদ্বৎসমাজে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করলেন, তখন তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। ১৯২৬ সালে অক্সফোর্ডে 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের' এক বৈঠকে আচার্য জগদীশ যখন তাঁর আবিষ্কার রহস্য উদ্ঘাটন করেন, তখন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তা দেখে এমনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হন যে, তিনি আচার্যদেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, 'বিজ্ঞান ক্ষেত্রে স্যার জগদীশ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর সম্মানার্থে জাতি সঙ্ঘের রাজধানী জেনেভাতে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।' আচার্য জগদীশ বিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা গণ্ডীকে অতিক্রম করে যে বিশ্বজনীন মতবাদ প্রবর্তন করেন, তাতে তাঁর পুণ্যস্মৃতি যে আন্তর্জাতিক ভাবেই রক্ষিত হওয়া সমীচীন তাতে সন্দেহ নাই। জৈব ও অজৈবের, চেতন ও অচেতনের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাতে প্রাচ্যের দর্শন ও পাশ্চাত্যের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ব্যবধানই শুধু দূর হয়নি, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে একপ্রাণতার উচ্চ আদর্শও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্বজনীন সত্য বিজ্ঞানকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করেছে।

আজ ভারতের দিকে দিকে বিজ্ঞান সাধনার প্রসার আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু আচার্য জগদীশ যে যুগে বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হন, সে সময়ে ও-পথের পথিক আর বড় কেহ ছিলেন না। তাঁকে একাই বিজ্ঞান সাধনার এই দুর্গম পথে যাত্রা করতে হয়েছিল। ভারতের বিজ্ঞান সাধনার প্রথম সাধক আচার্য জগদীশ শুধু নিজ অসামান্য প্রতিভা ও একাগ্র সাধনার বলেই বহু রকমের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ভারতে বিজ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করতে সমর্থ হন। বিজ্ঞানচর্চা ব্যতীত ভারতবাসীদের উন্নতি সম্ভবপর নহে, ইহা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এদেশে বিজ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে "বিজ্ঞান মন্দির" প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়' দেবচরণে এই 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নিবেদিত হয়েছে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিকল্প আচার্য জগদীশের জীবনী যতই আলোচনা করা যায়, ততই এ কথা গভীরভাবে অনুভূত হয় যে, বহু বৎসরের তপস্যার জোর না থাকলে এরূপ মহা মনীষীর জন্ম হয় না। বাঙলা দেশের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর মত মনীষীকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক রূপ

আধুনিক জগতের যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যবহৃত নানাবিধ মারণাস্ত্রের জন্য বিজ্ঞানকেই দোষারোপ করা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গুলোর এই অপব্যবহারের নিমিত্ত বিজ্ঞানই দায়ী, না বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সাম্রাজ্যলিপ্সা দায়ী, তাহা আলোচনার বিষয় বটে; তবে আন্তর্জাতিক কল্যাণেই বিজ্ঞানের দান যে সমধিক তাহা অস্বীকার করা যায় না। 'রকফেলার ফাউণ্ডেসনে'র ১৯৪১ সালের যে কার্য বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রকার দলাদলি বা রেষারেষি বাদ দিয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে বিজ্ঞান কিরূপ ভাবে মানব সেবায় তার বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলগুলোকে নিয়োজিত করেছে, এই বিবরণী হতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হবে। বিবরণীতে লিখিত আছে:—

"সুদূর প্রাচ্যে কোন মার্কিন সৈন্য যুদ্ধে আহত হলে তার প্রাণ রক্ষা পায় জাপানী বৈজ্ঞানিক কিতাসাতোর কৃপায়, যিনি 'টিটেনাস ব্যাসিলি' আবিষ্কার করেছেন। রুশীয় বৈজ্ঞানিক 'চেনিকফে'র আবিষ্কারের ফলে জার্মান সৈনিকরা 'টাইফয়েডের' হাত হতে আত্ম-রক্ষা করছে। ইস্ট ইণ্ডিজে ওলন্দাজ নাবিক বাহিনী ইতালিয়

বৈজ্ঞানিক 'গ্রাসির' গবেষণার ফলে ম্যালেরিয়া হতে রক্ষা পাচ্ছে; তেমনি ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর ও জার্মান বৈজ্ঞানিক কক্‌এর আবিষ্কারের ফলে অস্ত্রোপচার ক্ষেত্রে যে নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে উত্তর আফ্রিকায় আহত ব্রিটিশ বৈমানিক প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে।

শান্তিকালেই বলুন বা যুদ্ধ সময়েই বলুন, পৃথিবীর সকল জাতির লোকের গবেষণায় পুষ্ট বিজ্ঞানের দান আমরা সকলে সমভাবেই পাচ্ছি। আমাদের সন্তানগণ জাপানী ও জার্মানের গবেষণার ফলে 'ডিপথেরিয়া' রোগ হতে রক্ষা পাচ্ছে। একজন ইংরেজের আবিষ্কারের দ্বারা তারা বসন্ত রোগের আক্রমণ হতে বেঁচে যাচ্ছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার 'জলাতঙ্ক' রোগ হতে রক্ষা করছে, আর একজন অস্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে কুষ্ঠরোগ (Pellagra) এড়াতে পাচ্ছে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে এক দল বিজ্ঞান-সেবকের অদৃশ্য পূত আত্মা আমাদের সন্তানদের ঘিরে আছে—এই সমস্ত সেবকেরা নিজেদের জাতীয় পতাকা কিংবা শুধু নিজ দেশের সীমারেখার গণ্ডীতে কোন দিন কিছু চিন্তা করেন নি, মানবের সর্বজনীন কল্যাণ সাধনের প্রতি তাঁরা ছিলেন অধিকতর অনুরক্ত। এভাবে জগতের যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি বা দল যা কিছু ভাল ও কল্যাণের আবিষ্কার করেছেন, তাহা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বলোকের নিকট এসে পৌঁছেছে।"

বিজ্ঞানের এই যে রূপ তা কোনদিন বদলাবে না। আজ যদিও যুদ্ধ বিগ্রহ, রেষারেষি ও অর্থনীতিক বিবিধ প্রতিযোগিতা কিছুকালের জন্য জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ইহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এসবের উর্ধ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্র তাহা চিরদিন মানুষকে সমভাবেই অধিকার দিয়েছে। তার আন্তর্জাতিক বাঁধন বিভিন্ন জাতিকে অদৃশ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত করছে। এই মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবী যদি কোনদিন নবভাবে গঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, বিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক রূপ সমাজ জীবন সংগঠনে কম সাহায্য করবে না।

পুরাকীর্তি আবিষ্কার

সুপ্রাচীন ভারতভূমির প্রতি স্তরে স্তরে শত সহস্র বৎসরের সভ্যতার নিদর্শন বিদ্যমান; তাই প্রাচীনকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি খনন করলে আজও এমন সব জিনিস আবিষ্কৃত হয়, সভ্যতার মাপকাঠির বিচারে যা থেকে যথেষ্ট আলোক সম্পাত হতে পারে। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে স্থানে অবস্থিত ছিল, ইদানীং সে স্থান খনন করে এমন কতকগুলো উৎকীর্ণ শিলা ও তাম্রফলক উদ্ধার হয়েছে, যা থেকে এই প্রাচীন মহাবিদ্যালয়ের সহিত যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের যে এক সময়ে বিশেষ যোগাযোগ ছিল তা বেশ সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এ ছাড়া মাটীর তৈরী কতকগুলো শীলমোহরও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের পল্লী ও শহর অঞ্চলের পৌর ব্যবস্থার ভার যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, এই সমস্ত মোহরাঙ্কিত নাম থেকে তাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এগার শত বছর পূর্বেও এ দেশে পৌর শাসন ব্যবস্থা যে বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল, এই সমস্ত মোহর বা শীলগুলো থেকে তা বেশ বোঝা যায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে এই খনন কার্য সম্পর্কে এক স্মারক লিপি প্রকাশিত হয়েছে। আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়গুলির পরিচয় তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন স্তূপ ও মঠে সমৃদ্ধ প্রাচীনকালের এই মহাবিদ্যালয় যে এক সময়ে সর্বদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রফলকে তার বহু নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়।

দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ শহর হতে ৪১ মাইল দূরে কোণ্ডাপুর নামক একটি স্থান খনন করে হায়দরাবাদ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগও একটি সুপ্রাচীন অন্ধ্র শহরের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। গত বৎসর এপ্রিল মাস হতে এ স্থানের খনন কাজ শুরু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ স্থানে প্রাচীনকালের এরূপ সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যে, মনে হয় উহা হতে দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপাদান সংগ্রহ করা যাবে। প্লিনি লিখিত বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল ধরে এক সময়ে এক বিরাট রাজ্যখণ্ড ছিল। অন্ধ্রগণ খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সাল হতে আরম্ভ করে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছয় শত বৎসর এই ভূখণ্ডে রাজত্ব করেন। এই রাজ্যমধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত ও সুরক্ষিত প্রায় ৩০টি শহর বিদ্যমান ছিল বলেও প্লিনি তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। হায়দরাবাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মনে করেন আবিষ্কৃত শহরটি উপরোক্ত শহরেরই একটি হইবে। এই শহরের আবিষ্কৃত জিনিসগুলির মধ্যে বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার ও চৈত্য সদৃশ অনেকগুলি স্থান দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ যুগের প্রচলিত কতকগুলি দেব-দেবতার মূর্তিও ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিদর্শন-সূচক কোন দ্রব্য এতাবৎ পাওয়া যায়নি। খননের ফলে যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা পুলমাভি যুগেরই অধিকাংশ, তবে তারও পূর্ব সময়ের কিছু মুদ্রাও যে না আছে এমন নয়। এই সমস্ত মুদ্রা সীসা বা তামার প্রস্তুত। কতকগুলি মুদ্রা আবার 'পোটিন' নামক একপ্রকার মিশ্র ধাতুতে গঠিত। এই সমস্ত মুদ্রার ছাঁচও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে মনে হয়, অন্ধ্র যুগে এই শহরের মধ্যে টাঁকশালও বিদ্যমান ছিল। লৌহ নির্মিত কতকগুলি জিনিস ব্যতীত তাম্রনির্মিত বলয় ও স্বর্ণালঙ্কারও কিছু পাওয়া গিয়েছে। চিত্রবিচিত্রিত নানাপ্রকার চীনা মাটীর বাসন এবং পাথরে উৎকীর্ণ নানারূপ দৃশ্য যা এ স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে, ইউরোপীয় দেশগুলির ক্লাসিক্যাল যুগের প্রচলিত কতকগুলি দৃশ্যের সহিত তাদের সাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ফ্রেমে বাঁধা ছবি আর দেয়ালে করা ছবি

(১১৫ পৃষ্ঠার পর)

তারপর শিক্ষাকেন্দ্রও বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ইউরোপীয় ভিত্তিচিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক দৈবাৎ বড় চিত্রকররা এই সব পৃষ্ঠপোষকদের অধীনে কাজ করেছেন। এই জন্য মেক্সিকো ছাড়া ইউরোপ বা আমেরিকায় ভিত্তিচিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কমই আছে। আমাদের দেশে ভিত্তিচিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষক আরও অল্প এবং পৃষ্ঠপোষকরা অন্যান্য দেশের তুলনায় আরও অর্বাচীন।*

***প্রবন্ধের ছবিগুলি শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগীর সৌজন্যে প্রাপ্ত**

অসুখ

শ্রীরণেন্দ্রনাথ সান্যাল

রোজ বিকালের দিকে কনে-দেখানো আলোয় আকাশ যখন অপরূপ হয়ে ওঠে, বিনয় তখন নীলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়।

এক বছরের কিছু ওপর হল, ওদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই ওদের পরিচয় ছিল, পরিচয় একটু গাঢ় হবার পর থেকে বিয়ের পর কিছু কাল পর্যন্ত বিনয় নীলাকে নানারূপে এবং নানা পরিবেশের মধ্যে এনে দেখেছে তাকে কেমন মানায়। বিকালের পড়ন্ত রোদে মাঠের খোলা বুকে নীলাকে যেমন সুন্দর মানায়, তেমন আর কোন অবস্থাতেই মানায় না, তাই শত কাজ বেঁধে রাখতে চাইলেও এই সময়টায় বিনয় কিছুতেই বাঁধা থাকে না।

সেদিন অফিস থেকে বাড়িতে পা দিয়ে না দিয়েই বিনয় জোর গলায় হাঁকল—জলদি, তৈরী হোয়ে নাও নীলা।

আজ দু' তিন দিন হলো নীলার যেন কি হয়েছে, অন্তত বিনয় তাই মনে করে। মেয়েদের একটি অভ্যাস ছাড়া আর সবই ভাল, এই মধ্যে মধ্যে বাক্‌সংযমের খেয়াল কেন যে তাদের চাপে, তা বোঝা যায় না। জিজ্ঞেস করলে জবাবে বলে বটে—কিছু হয়নি। কিন্তু তাদের চলাফেরা আর ভাবভঙ্গি দেখে যে কোন স্বামীই জলের মত বুঝতে পারে যে, একটা কিছু হয়েছে। বিনয় এই সনাতন পথেই বুঝেছে যে, নীলার কিছু হয়েছে, তবে এই কিছু হওয়াটা সারানোর উপায় সে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। আর পারে নি বলেই, হাতুড়ে বদ্যির মত যখন যে ওষুধের কথা মনে পড়ছে, তখন সেটাই প্রয়োগ করছে।

কাল মাঠের দিকে নীলা তেমন খুশী মনে যায় নি, মাঠের খোলা হাওয়ায় বিনয়ের মনের কপাট খুলতে দেরী না হলেও—বিনয়ের মনে কপাটই নেই, আর যদিই বা থেকে থাকে, তবে তা বিয়ের আগে থেকেই তো খুলে আছে, এ কথাটা নীলা বেশ ভাল করেই জানে—নীলার খোলে নি, অন্তত বিনয় তাই মনে করে। মাঠে বিকালের আলোয় নীলাকে মানায় সুন্দর, সন্দেহ নেই, কিন্তু বাইরের মানানোটাই তো সবটা নয়, নীলাকে অন্ধের মতো ভাল বাসলেও, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি বিনয়ের এখনও অবশিষ্ট আছে।

কাজেই আজ মাঠে না গিয়ে সিনেমায় যাবে স্থির করে বিনয় টিকিট কেটে এনেছে।

ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে দেখল যে, নীলা যেন তার মনের কথা আগে হতে টের পেয়েই আজ সাজগোজ করে একেবারে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে।

দুদিনের মেঘের ঘোর তবে কাটল নাকি! খুশীতে দিশেহারা হয়ে বিনয় নীলার তুল তুলে গালে একটা চুমু খেয়ে ফেললো।

মিনিট দশেকের মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়ে বিনয় বললে—চল আজ আর মাঠে নয়—সোজা সিনেমাতে।

—কিন্তু আমি তো আজ তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না।

যেতে পারবে না? কেন? বিনয়ের এক চোখে বিস্ময়, আর এক চোখে উদ্বেগ।

দুপুরে মীরা এসেছিলো, বিশেষ জরুরী কাজ, তখনই ধরে নিয়ে যায়, অনেক বলে করে তুমি আসা পর্যন্ত সময় নিয়েছি। আমায় পৌঁছে দেবে চল।

এর পর আর কোন কথা বলা চলে না।

মীরার বাড়ি নীলাকে পৌঁছে দিয়ে বিনয় পথ আর চায়ের দোকান করে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটালো। সিনেমায় যাবার বা টিকিট নষ্ট হবার কথা তার আর মনেই হলো না, না হবারই কথা।

বাড়ি ফিরে দেখে রান্নাঘর ছাড়া আর সব ঘর অন্ধকার। নীলা ফেরেনি বুঝি, বন্ধুর সঙ্গে কি এমন জরুরী কাজ তার।

ঘরে ঢুকে বিনয় আলো জ্বাললো।

বিছানায় ও কে পড়ে আছে তাল গোল পাকিয়ে? নীলা নাকি? সে ছাড়া তাদের বিছানায় শোবেই বা কে? কিন্তু নীলা ও-রকম করে পড়েই বা থাকবে কেন? কি বিপদ, আবার কি হলো।

গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বিনয় ডাকলো—নীলা, ও নীলা।

উত্তর নেই।

অসুখ? অসুখ হবে কেন। বেশ তাজা দেহেই তো নীলাকে বিনয় মীরার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। হঠাৎ—এ কি বিপত্তি—

জোর গলায় ডাকল—নীলা, নীলা। সাড়া নেই। মূর্চ্ছা, রক্তপ্রবাহ থেমে গেছে নাকি? কি আপদ, চাকর বাকরগুলোই বা গেল কোথায়? বিনয় পাড়া মাতিয়ে হাঁকল—ঝি ও ঝি।

ঝি রান্নাঘরে ঠাকুরকে সাহায্য করছিল, হাঁক শুনেই ক্ষিপ্রপদে ছুটে এসে হাঁপাতে লাগলো।

লম্বাচওড়া ভূমিকা করে ঝি যা বললো তা থেকে বোঝা গেল যে, নীলার বড্ড অসুখ করেছে—গা বমি বমি, বুক ধরফর, মাথা ধরা এবং আরো কত কি।

এমন অসহ্য অবস্থায় কোন স্বামী কখনো পড়েছে কি? বিনয় ঘেমে নেয়ে উঠলো, চোখে অন্ধকার দেখল, কি করবে বুঝতে না পেরে দড়ি ছেঁড়া গরুর মত ঊর্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মিনিট কয়েক পরেই সে ফিরে এলো, একা নয়, সঙ্গে ডাক্তার। রোগের ইতিহাস সে যতটুকু বলেছিল, তা থেকে ডাক্তার কিছুই বুঝতে না পেরে প্রয়োজনীয়—অন্তত প্রয়োজন হতে পারে, এমন সমস্ত ঔষধপত্র মায় অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি পর্যন্ত সঙ্গে এনেছেন।

ডাক্তার এসে নীলার শিয়রের কাছে বসলেন, নাড়ী টিপলেন, গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন, জিভ দেখলেন, শেষে হৃদ্‌যন্ত্রটি ঠিক মত চলছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে বুকের উপর যন্ত্র বসালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু বুঝতে না পেরে রীতিমত ভ্যাবাচেকা খেয়ে পর্যায়ক্রমে একবার রোগিণীর এবং একবার বিনয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন।

ডাক্তারের এই মূর্তি দেখে বিনয় যতদূর ঘাবড়ে যাবার গেল।

কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে চুপচাপ থাকলে তো চলবে না, শেষ পর্যন্ত দু' হাতে সাহস সঞ্চয় করে সে জিজ্ঞেস করলে—অসুখটা কি খুবই কঠিন, বাঁচবে তো?

বিনয়ের সাহস দেখে ডাক্তারও বল ফিরে পেলেন। এক গাল হেসে বললেন—অসুখ বলছেন কি বিনয়বাবু, সুখ, বিপুল সুখ! প্রথম আবিষ্কারের পুলকে অনেক তরুণীই একটা স্নায়বিক আঘাত পেয়ে থাকেন।

বিছানায় নীলা তাল গোল পাকিয়ে পড়ে, আর ডাক্তার করছে কিনা তামাসা। বিনয় ভীষণ চটে মটে নিতান্ত অভদ্রের মত বললে—তামাসা করবার জন্যে আপনাকে ডেকে আনা হয়নি, যা বলার স্পষ্ট করে বলুন।

বিনয়ের উষ্মায় ডাক্তার বেশ একটু কৌতুক বোধ করলেন, পরে হাসি চেপে বললেন—কি অবস্থায় মেয়েরা এমন করতে পারেন, জানেন না নাকি? একটু থেমে হাল্কা কণ্ঠে পুনশ্চ বললেন—আর জানবেনই বা কি করে, এই তো সবে হাতে খড়ি।

বিনয় এবার কিছুটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো। ডাক্তারের কথার কোন জবাব সে দিল না।

ডাক্তার একটা ওষুধের নাম লিখে দিলেন। আর যাবার আগে

সাবধান করার ছলে আবার একটু পরিহাস করার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বললেন—হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে যাওয়া আমার উচিত। আজ রাতে ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না যেন।

ডাক্তার তো ভরসা দিয়েই খালাস। কিন্তু নীলার দিকে চাইলে ভরসা পাওয়া যায় কই?

প্রায় দু'ঘণ্টা হতে চললো, বিনয় বাড়ি ফিরে এসেছে; এর মধ্যে নীলা কথা কওয়া তো দূরের কথা, একটা শব্দ পর্যন্ত করেনি।

বিনয় ঠিক করিল আজ সে আর চোখ বুজবে না, নীলার শিয়রে ঠায় জেগে বসে থেকে পাহারা দেবে। অমন পাখীর বুকের মত নরম যার দেহ, তার স্নায়ুতন্ত্রে কতটুকুই বা শক্তি থাকতে পারে? তার উপর আবার পেয়েছে শক—তা হোক না কেন সুখের—একটু গোলমাল হলে অসুখ হতে কতক্ষণ? বিনয় নীলার শিয়রে ঠায় বসে রইলো।

নীলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে, রাত তিনটার সময় শেষ দাগ ওষুধ খাওয়াবার জন্যে ডেকেও যখন নীলার ঘুম ভাঙান গেল না, তখন ভাবলো,—এত গাঢ় ঘুম যখন নীলা ঘুমুচ্ছে তখন সত্যিই তার তেমন কিছু অসুখ আর থাকতে পারে না। কাজেই বিনয়ও ইচ্ছে করলে স্বামীর কর্তব্যে কোনরূপ শৈথিল্য না দেখিয়েও একটু চোখ বুজতে পারে। নইলে কাল নীলাই আবার এজন্য নানা অনুযোগ করবে।

খাটের পাশেই একটা আরাম কেদারা টেনে নিয়ে বিনয় তার দেহটা এলিয়ে দিল।

পরদিন ঘুম যখন ভাঙল তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় ৯টার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। অফিসে একবার যেতেই হবে, আর নীলাও তো বেশ ভালই আছে। সাহেবকে বলে কয়ে একটার সময় আসা যাবে।

বিকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠবার জন্যে নীলাকে চেষ্টা করতে বলে বিনয় অফিসে চলে গেল।

গ্রহের ফের আর কাকে বলে। সেদিন কতকগুলি অত্যন্ত জরুরী কাজ যেন ষড়যন্ত্র করে এসে জুটে আছে। সাহেবের কাছে নীলার অসুখের কথা বলতে সাহেব বললেন,—তোমায় এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে দিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু কাজগুলি অত্যন্ত জরুরী কিনা, আজ না করলে বিশেষ ক্ষতি হবে। এগুলো শেষ হলেই তুমি চলে যেও।

ঘরে পত্নীদায় আর বাইরে অফিসদায়—এই দোটানায় পড়ে বিনয়ের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হলেও অফিসের কাজ যে রকম করে হোক শেষ করতেই হবে। বিনয় কাজে বসে গেল।

চারটের কাছাকাছি কাজ শেষ হলে বিনয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্যাক্সি করে ছুটলো, বাড়িতে গিয়ে কি আবার দেখতে হয় কে জানে?

বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ঝি তাকে জানালো যে, দুপুরবেলা বৌদিদিমণি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, তিনি নাকি আর বাঁচবেন না, শুধু এই নয়, বাঁচবার ইচ্ছেও নাকি তাঁর আর নেই।

হঠাৎ তাড়া খেলে গরু যেমন লেজ উঁচু করে পিছনের দিকে ছুটতে শুরু করে তেমনিভাবে বিনয়ও ছুটে বেরিয়ে গেল। কালকের সেই ছাবসার কাছে নয়—একেবারে শহরের সেরা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে করে তবে ঘরে এসে ঢুকল।

আর ভয় নেই। এবার আসল রোগ ধরা না পড়ে যাবে কোথায়?

দস্তুরমত পরীক্ষা করার পর ডাক্তার মুখ কালো করে জানিয়ে দিলেন—বসন্তের লক্ষণ দেখা দিলেও দিতে পারে।

স্বর্গ হতে সোজা পাতালে—মাতৃত্ব হতে একেবারে বসন্তে, বিনয় আকাশ থেকে ধপাস করে পড়লো। তার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল—আর এই ডাক্তার জাতটার ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটতে লাগলো। ওরা রোগ সারাতে পারে না—পারে কেবল বাড়াতে। নসিবের ওপর নির্ভর করে চরমক্ষণের জন্যে বসে থাকা ছাড়া সে আর কোন পথই দেখতে পেলো না।

সে রাতও বিনয় নীলার শিয়রে বসে জেগে কাটালো, আর মাঝে মাঝে 'ম্যাগনিফাই গ্লাস' দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো, বসন্তের গুটি বের হচ্ছে কিনা। আর 'এখন কেমন আছ নীলা', 'একটু ভাল বোধ করছ কিনা'—জাতীয় প্রশ্নের অবিরাম পুনরাবৃত্তি করে নীলাকে ঘুমোতে না দিয়ে বিনয় আজ নীলার সুস্থ দেহ সত্যিই ব্যস্ত করে তুললো।

ডাক্তার জাতটার ওপর রাগই কর বা আর নাই কর, অসুখ যদ্দিন না সারছে, তদ্দিন তার কাছে দৌড়োতেই হবে। পরদিন সকাল বেলা বিনয় আবার ডাক্তারের কাছে গেল।

ফিরে এসে দেখে মীরা এসেছে নীলার অসুখের খবর পেয়ে, আর নীলা আস্তে আস্তে তার সঙ্গে কথা কইছে। মীরার পরনে আসমানি রং-এর হাল ফ্যাসানের স্কার্ট, শাড়ি—কলকাতার বাজারে হপ্তাখানেক হলো বেরিয়েছে।

নীলাকে কথা কইতে দেখে বিনয় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এখনও তাহলে আশা ছেড়ে দেবার মত অবস্থা দেখা দেয়নি। নীলাকে হারিয়ে বেঁচে থাকার কথা বিনয় কল্পনাও করতে পারে না।

কিছুক্ষণ বাদে 'আবার আসব' বলে মীরা বিদায় নিল।

নীলা তখন কষ্টে সৃষ্টে টেনে বিনয়কে বললো—আমার একটা অনুরোধ করবার আছে। আমি হয়ত আর বাঁচবো না, মীরা আজ যে শাড়িখানি পরে এসেছিল, আমি মরলে ঐ রকম একখানি শাড়ি পরিয়ে আমায় শ্মশানে নিয়ে যেও।

দুর্বল দেহ, এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে নীলা হাঁপাতে লাগলো।

একটু আগেকার ফেলা স্বস্তির নিঃশ্বাস আবার অস্বস্তির হয়ে উঠলো। জবাব দেবার মত কোন কথা বিনয় খুঁজে পেল না।

আসমানি শাড়ি পরা নীলার নীল দেহ দেখাই কি তার ললাট লিপি!

নীলার শেষ সাধ মরণের আগেই পুরাতে হবে—বিনয় আবার ছুটলো—ডাক্তারের কাছে নয়—দোকানে।

শাড়ি এলো, নীলা দু'চোখ ভরে, বোধ করি মরবার জন্যে প্রস্তুত হতে, দেখে নিল। কিন্তু মীরা তার উপর টেক্কা মেরে গেল যে, তার আগেই সে ওই শাড়ি পরে ফ্যাসান পুরোনো করে ফেলেছে। তা ফেলুক, কি আর করা যাবে; নীলা এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিল।

দু'চোখ ভরে শাড়িখানি দেখতে দেখতে নীলা ভাবল যে সে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, মরতে গেলে যতটুকু শক্তি থাকা দরকার, ততটুকু শক্তিও আর তার দেহে অবশিষ্ট নেই।

সুতরাং নীলা বাঁচল আর সেদিন বিকালেই কনে দেখনো আলোয় রোগপাণ্ডুর গালে গোলাপের আভা ফুটিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বের হলো—শ্মশানের পথে নয়, মাঠের দিকে। *

জার্মান কথাশিল্পী Christian Gillertএর 'The sick wife' গল্পের ছায়া অবলম্বনে।
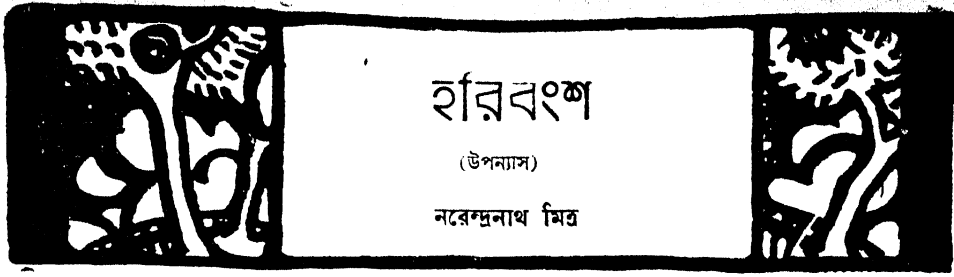
হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৭

বিনোদের মনে হোল মুরলীর আপ্যায়নের মধ্যে বেশ একটু ব্যঙ্গের গন্ধ আছে। বিনোদের ধরণধারণ, তার সাত্ত্বিকতা, ভগবদ্ভক্তি সবই যে মুরলীর কাছে কৌতুকের বস্তু তা বিনোদের অজানা নেই। কিন্তু মনে মনে বিনোদও মুরলীকে অনুকম্পা করে তার এই তরল লঘুচিত্ততার জন্য। আসলে যেটা মুরলীর অক্ষমতা তাকেই সে ক্ষমতা হিসাবে জাহির করতে চায়। বয়স হোলেও বয়সোচিত দায়িত্ববোধ তার যে জন্মেনি, ছেলেমানুষী চাপল্য তার যে রয়েই গেছে—তার জন্য লজ্জা পাবে থাক, মুরলী এটাকে যেন তার কৃতিত্ব বলেই মনে করে। আর তার এই নির্লজ্জ দম্ভের জন্যই বোধ হয় ছেলেরা তার পিছনে পিছনে ঘোরে, সমস্বরে বাহবা দেয়। কিন্তু ব্যঙ্গই করুক আর যাই করুক মুরলী, বিনোদ তাতে একটুও চটে না। লোকের ঠাট্টা পরিহাসে চটে গেলে লোকে যে সেই সুযোগ নিয়ে আরো বেশী করে ক্ষেপিয়ে তোলে, এ শিক্ষা বিনোদের প্রায় ছেলেবেলা থেকেই হয়েছে। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ধৈর্য ও সহনশীলতার আশ্রয় বিনোদকে নিতে হয়েছিল। কিন্তু সে কথা এখন আর লোকেরও মনে নেই, বিনোদেরও মনে নেই। বরং সকলেরই এখন ধারণা—সংযম সহনশীলতাই বিনোদকে আশ্রয় করেছে। এমনো মনে হয়, এখন একেক সময় যে ওসব ঠাট্টা-পরিহাস যেন বিনোদ বোঝে না, কিংবা গায়ে মাখে না। অদ্ভুত তার সহগুণ। পরিহাস ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে বিনোদ সহজভাবে কথা বলতে পারে। মনেই হয় না—কোন কিছু তাকে আঘাত করেছে।

মুরলীর আমন্ত্রণের উত্তরে আজও বিনোদ হাসিমুখেই বলল, 'না ভাই বসবার সময় তো এখন হবে না, একটু নাম কীর্তনের আয়োজন করেছি, তার জন্যই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। দীঘলকান্দির ছোট গোঁসাইর জন্য লোক পাঠিয়েছি, বাড়িতে যদি থাকেন, না এসে পারবেন না। আমার ওপর তাঁর অনুগ্রহের কথা তো জানোই। খেলাটেলা শেষ হয়ে গেলে যেয়ো কিন্তু মুরলী। আর তোমাদের বড় সতরঞ্চিটা—'

মুরলী বলল, 'সতরঞ্চি? আচ্ছা দাঁড়াও!' তারপর মেয়েকে ডেকে মুরলী বলে, 'তোর রাঙা কাকাকে আমাদের সতরঞ্চিটা নামিয়ে দেতো ললিতা।'

সতরঞ্চি নিয়ে বিনোদের চলে যাওয়ার পর পাশা খেলাটা তেমন জমে ওঠে না। বরং পাশার চেয়ে বিনোদের সম্বন্ধে আলোচনাই বৈঠকে বেশী উপভোগ্য মনে হয়। বিনোদের ওপর বিপিনের রাগটাই যেন বেশী সকলের চেয়ে। কীর্তন, ভাগবত পাঠ—এ সবের জন্য পৌষ মাঘ মাসে একটা সময় তো পাড়ার সকলে ঠিক করেই রেখেছে। তখন বারোয়ারী ভাবে হরিখোলায় এসব কাজ নির্বাহ হয়। কিন্তু বিনোদের তাতে তৃপ্তি নেই। মাসে দু'একবার করে এ ধরণের ছোটখাট অনুষ্ঠান নিজের বাড়িতে তার করা চাই-ই। না হলে ভক্ত হিসাবে তার নাম ছাড়িয়ে পড়বে কী করে। শশধর মুচকি মুচকি হাসে। বিনোদের নিন্দার চেয়ে এ সম্বন্ধে বিপিনের উষ্মাটাই তার কাছে বেশী উপভোগ্য লাগে। 'ভাইপো বুঝি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিনোদদার নিন্দা না করে জল গ্রহণ করবেন না?' শশধর বিপিনের চেয়ে বয়সে পঁচিশ ত্রিশ বছরের ছোট; কিন্তু সম্পর্কের সূক্ষ্ম হিসাবে বিপিনই শশধরের ভাইপো হয়। বিপিন বলে, 'কারো নিন্দা বন্দনার ধার আমি ধারিনে। কিন্তু আলস্য আমার সহ্য হয় না। কেবল কীর্তন আর কীর্তন। এদিকে তো খাবার থাকে না ঘরে—খাবার যে অনেক সময় বিপিনের ঘরেও থাকে না একথাটা উপস্থিত সকলেরই মনে পড়ে। তাস-পাশায় সঙ্গ দান করে বিপিন যে প্রায়ই মুরলীর কাছে হাত পাতে এ কথাও কারো অজানা নেই। এদিক থেকে বিনোদের সঙ্গে বরং মিল আছে বিপিনের। কাজকর্মে মন নেই দুজনেরই। একজন মেতে আছে কীর্তন নিয়ে, আর একজন তাস-পাশায়। দুটোই নেশা। কিন্তু স্বভাবের এই মিল থাকা সত্ত্বেও বিপিন বিনোদকে দেখতে পারে না। বরং এই মিল থাকার জন্যই যেন বিনোদকে বিপিনের বেশী খারাপ লাগে। নিজের বিকৃত প্রতিবিম্ব যেন সে দেখতে পায় আয়নায়।

বিপিনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খেলা আর বেশীক্ষণ চলে না, মুরলীই বিরক্ত হয়ে বলে, 'আজ থাক ছোটখুড়ো, আজ আর নয়।' তবু বিপিন সহজে নিরস্ত হয় না, 'তাস চলবে নাকি বাবাজী, এসো দু'একখানা কালো সেট ওদের ভজিয়ে দিয়ে তারপর উঠি।'

মুরলী বলে, 'না ছোট খুড়ো, ভালো লাগে না আর—'

বিপিন মহাব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শরীর ভালো নেই বুঝি, সে কথা আগে বললে না কেন বাবাজী, দেখেছ কী অন্যায় হয়ে গেল।'

শশধর আর নিতাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে হাসে। স্পষ্ট বক্তা বলে সবাই জানে বিপিনকে। কাউকে সে ছেড়ে কথা বলে না। বরং বয়স হবার পর বিপিন দিন দিন একটু রূঢ়-ভাষীই হয়ে পড়ছে। তার মুখে এমন কোমল উৎকণ্ঠা ভারি বেমানান মনে হয়। এমন কি মুরলীও বিপিনের অতি স্তবকতায় হাসে, 'শরীর আমার ভালোই আছে সেজন্য ভাববেন না খুড়ো, বাড়ি যান।'

সকলের সামনে এমনভাবে ধরিয়ে দেওয়ায় মনে মনে ভারি দুঃখ হয় বিপিনের। ঠেকলে মুরলী না হয় তাকে দু'চার টাকা ধারই দেয় এবং সে ধার ফিরে চায় না, কারণ ধার শোধ করবার শক্তি যে বিপিনের নেই তা মুরলী বোঝে। সেই উদারতার জন্য বিপিন যদি কৃতজ্ঞই থাকে মুরলীর কাছে, মুরলী কি সব সময়ই তার হাব-ভাবে চালচলনে মনে করিয়ে দেবে যে, মুরলী আর বিপিনের মধ্যে কেবল দাতা আর গ্রহীতারই সম্পর্ক? বিপিন যা কিছু মুরলীকে বলে তা কি স্তাবকতা ছাড়া আর কিছু নয়? এতদিনের মেলামেশার যাতায়াতে স্নেহের সম্বন্ধ, ভালোবাসার সম্বন্ধ কি একটুও গড়ে উঠতে পারে না? দু'চার টাকা ধার চাইতে গেলে মুরলী আপত্তি করে না, টাকাটা আর ফিরেও চায় না, বিপিন মনে মনে এজন্য মুরলীর বিবেচনা শক্তিকে শ্রদ্ধা করত, আবার মাঝে মাঝে আশঙ্কাও হোত, পাছে টাকাগুলি সত্যিই ফেরৎ চেয়ে বসে মুরলী। কিন্তু এই মুহূর্তে বিপিনের মনে হোতে লাগল, সমস্ত টাকা হিসাব করে মুরলীকে ফিরিয়ে দিতে পারলে যেন সে বাঁচে। মুরলীর ধার শোধ করতে গিয়ে বসত বাড়ির অংশও যদি বাঁধা দিতে হয় তাতেও বিপিন পিছু-পা হবে না।

বিপিনরা চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মুরলী। খেলায় আজকাল আর সত্যিই তার মন বসে না, খেলতে সে বসে নিতান্তই সময় কাটাবার জন্য। কারবারপত্র, বিষয়-আসয়ের মত বেশ শক্ত, দুরূহ কোন জিনিসই আজকাল ধরতে চায় মুরলী। কিন্তু আবাল্যের অনভ্যস্ততার জন্য কাজটাকে বড় বেশী শক্ত আর নীরস

বলে মনে হয় মুরলীর কাছে; তা ছাড়া গোড়া থেকে ক খ শেখবার মত ধৈর্য আর নেই। অথচ নবদ্বীপ তাকে সেইভাবেই শেখাতে চায়। আবার ছেলেবেলা থেকে এতদিন পর্যন্ত খেলাটাকে যেমন ভালো লাগত আজকাল আর তেমন লাগে না। খেলাকে বড় জোলো, হালকা আর ছেলেমানুষী মনে হয় এখন মুরলীর, কাজও ভালো লাগে না, খেলাও নয়, দুটোর মাঝামাঝি কিছু একটা যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে।

ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটায় শরীরটা এলিয়ে দেয় মুরলী। কাজ নেই, পরিশ্রম নেই, তবু অদ্ভুত ক্লান্ত মনে হতে থাকে নিজেকে। আলস্যের ক্লান্তি আরো যেন বেশী খারাপ।

রান্নাঘরে দুধের কড়াটা মনে করে ঢেকে এসেছে কিনা তাই দেখতে গিয়েছিল মনোরমা। ফিরে এসে মুরলীকে ওভাবে শুয়ে পড়তে দেখে বলল, 'কি, খুব পরিশ্রম করে এলে বুঝি?' মুরলী চোখ মেলে তাকালো। স্বামীর স্বভাব আচার-ব্যবহার নিয়ে প্রতিবাদ করা যেমন বন্ধ করেছে মনোরমা তেমনি ঠাট্টা পরিহাস ব্যঙ্গ বিদ্রূপও সে আজকাল সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। এসব যেন স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গেছে। মুরলী যেমন চেয়েছিল এতদিনে ঠিক তেমনই হয়ে উঠেছে মনোরমা। তার সেই জোর নেই, জেদ নেই, কান্নাকাটি ঝগড়া-ঝাটি নেই, সম্পূর্ণভাবে সে এতদিনে মেনে নিয়েছে মুরলীকে। কতদিন মনোরমার প্রতিবাদের উত্তরে সে তাকে ধরে মেরেছে পর্যন্ত। 'আমি যা খুসি তাই করব, তাতে তোর কি, তোর বাবার কি—হারামজাদী। তুই চুপ করে থাকবি, খবরদার, একটু শব্দও যেন না হয়।'

এখন মনোরমা যখন সত্যসত্যই চুপ ক'রে গেছে, তখন এই নিঃশব্দতা মুরলীর সহ্য হতে চায় না। মনে হয় মনোরমার যা আকর্ষণ ছিল, তা তার ওই জোর আর জেদের মধ্যে—তার অমন হাহুতাশ দাপাদাপির মধ্যে। সে-সব বাদ দিয়ে মনোরমাকে মনোরমা বলেই যেন মনে হয় না আজকাল। এত অল্পতেই কি মনোরমা ফুরিয়ে গেল? এতই কম ছিল তার প্রাণশক্তি? তখন যেভাবে হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি করত, তা দেখে কি ভাবতে পারা যেত একথা? অবশ্য হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি না করবার আরও অনেক কারণ আছে মনোরমার। তখনকার চেয়ে বয়স এখন অনেক বেড়েছে, পেটের মেয়েই তো প্রায় সেই বয়সের হ'তে চলল, তা ছাড়া সেই শরীরও নেই, সেই শক্তিও নেই মনোরমার। এখন হাত-পা ছোঁড়া তো দূরের কথা, হাতপা নাড়তেও যেন তার কষ্ট হয়। ললিতা হওয়ার সময় সেই যে অপারেসন করতে হয়েছিল জেলা শহর থেকে ডাক্তার এনে, তারপর থেকে মনোরমার শরীর আর ভালো হয়নি। তারপর আরো বার দুই শক্ত অসুখ গেছে মনোরমার। এখন বহুকাল আর তেমন অসুখবিসুখ হয় না; তবু মনে হয়, তার মজ্জার মধ্যে যেন ক্লান্তি আর দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। অবশ্য এর চেয়ে আর বেশী খারাপ হবে না মনোরমার শরীর, এর চেয়ে বেশী শুকোবেও না, বেশী বুড়োও হবে না। এই অবস্থাই যেন তার শেষ পরিণতি।

এখন যেমন করল, তেমনি নিরামিষ, নিতান্ত নিরীহ ধরণের পরিহাস রসিকতাই করে আজকাল মনোরমা। কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন উত্তেজনা নেই, সব কিছুই এখন স্থির শান্ত হয়ে গেছে। মনোরমাকে দেখে ভারি আশঙ্কা বোধ করে মুরলী। মনোরমার জন্য নয়, তার নিজের জন্যই। ভয় হয়, মুরলী নিজেও বুঝি অকালে বুড়ো হয়ে পড়ল। মনোরমার কাছে এলেই কেবলই তার মনে হ'তে থাকে বয়স হয়েছে, বয়স হচ্ছে। আজকালও মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যখন ফেরে মুরলী, তখন আগের মত মনোরমা আর তুমুল কোলাহল বাধায় না, দরজা বন্ধ করে বলে না, 'এখানে আবার কেন, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও।' বরং স্বাভাবিকভাবেই এখন দরজা খুলে দেয় মনোরমা, সাধ্যমত স্বামীর সেবাপরিচর্যা করে। যেদিন এসব কান্ড করে মুরলী, সেদিন লজ্জায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মনোরমা। তার সেবাশুশ্রূষার মধ্যেও যেন এই লজ্জা ফুটে বেরুতে থাকে। মুরলীর চরিত্রহীনতার জন্য সেদিনের মত ঈর্ষার ঝাঁজ আর নেই মনোরমার। নেই সেই সজল অভিমান, যা কত যেমন দুরূহ তেমনি মধুর মনে হোত মুরলীর। এখন শুধু লজ্জা। মুরলীর আচরণের জন্য এখন কেবল লজ্জা বোধ করে মনোরমা। 'ইঃ, তোমার লজ্জা করে না, অত বড় মেয়ে রয়েছে সামনে।' কথায় কথায় আজকাল মেয়ের দোহাই দেয় মনোরমা। মেয়ের বয়স বাড়ায় বাড়ায় নিজেদের বয়স। বয়সের কাছে লজ্জিত করে যদি মুরলীকে নিরস্ত করা যায়। তাছাড়া নিরস্ত করবার তেমন গরজও যেন মনোরমার নেই আজকাল। সবই যেন তার গা সওয়া হয়ে গেছে। এতকালই যখন এভাবে কাটাতে পেরেছে, বাকি দিনগুলিও এভাবে কাটলে ক্ষতি কি।

মনোরমা ধীরে ধীরে এমন শান্ত হয়ে যাওয়ায়, পরাভূত হয়ে এভাবে আপোষ-নিষ্পত্তিতে আসায় মুরলীর মনে হয়—জীবনের অর্ধেক আনন্দই যেন মাটি হয়ে গেছে। ছুটোছুটি ক'রে তেমন কি আনন্দ পাওয়া যায়, যদি ভিতর থেকে কেউ আকর্ষণ ক'রে না ধরে? হাত ছিনিয়ে নেবে কার কাছ থেকে, যদি কোমল ক্ষুদ্র মুঠিতে হাতখানা কেউ আঁকড়ে না রাখতে চায়?

মনোরমার মোলায়েম পরিহাসে মুরলীও মোলায়েমভাবে জবাব দেয়, 'কেন তাসপাশা খেলায় কি পরিশ্রম নেই?

মনোরমা বলে, 'আছে। তবে সকলের নয়। খেলতে বসে পরিশ্রম যদি কেউ করে, সে তোমাদের ও বাড়ির জ্যেঠখুড়ো। বাবাঃ যেভাবে হাঁকডাক, চেঁচামেচি সুরু হয় খেলতে বসলে! আচ্ছা তোমরা কি রোজই ঠকো? অত গাল মন্দ সহ্য কর কি করে? মনে হয়—তুমি যেন কেনা চাকর জ্যেঠখুড়োর। কেবল বুড়ো কর্তা কিছু বললেই যত দোষ।'

মনোরমার কথাবার্তায় তেমন মাদকতা আর নেই, কিন্তু মুরলীর মনে হয়, কেমন একটু স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ যেন এখনো রয়েছে তার গলায়। আর আগের চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আরো যেন অন্তরঙ্গ হয়েছে মনোরমা। মনেই হয় না, মনোরমা নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে—চরম নির্যাতন সহ্য ক'রেছে স্বামীর হাতে। সবই বোধ হয় মেয়েদের সয়, সব কিছুর সঙ্গেই তারা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

আজ অনেকদিন পরে মনোরমাকে বেশ একটু ভালোই যেন লাগলো মুরলীর। ভালো লাগতে লাগলো এই শান্ত নিরিবিলি আবহাওয়া। একটু একটু করে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জানলার বাইরে পেয়ারা গাছটার সবুজ পাতাগুলো নড়ছে একটু একটু। রোদ্রের রঙ লালচে হয়ে এসেছে। বেলা পড়ে এলো প্রায়। তেমন ধার নেই, ঝাঁজ নেই, তীব্র মাদকতা আর নেই মনোরমার মধ্যে, কেবল শান্ত স্নিগ্ধতা। তবু এটুকুও কি সবদিন চোখে পড়ে, কি চোখে পড়লে এমন ভালো লাগে? সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে যেদিন ধরা দেয়, সে-সব দিন খুব বেশী আসে না জীবনে। কিংবা এত বেশী আসে যে, সে-সব দিনের কথা বেশী দিন মনে রাখা যায় না, তারা এত ক্ষণস্থায়ী, এত অগভীর।

মুরলী বলল, 'কি ক'রবে এখন? দুর্বল শরীর নিয়ে অত নড়াচড়া করতে যাও কেন? এক মুহূর্তও কি চুপ করে বিশ্রাম করতে পারো না?

স্বামীর স্বরে স্নেহের আর্দ্রতার আভাষে খুসি হয় মনোরমা। "কি আর এমন নড়াচড়া ক'রতে যাই বলো, চুপ করেই তো থাকি প্রায়? তারপর আর কিছু ভেবে না পেয়ে মনোরমা বলে, 'চা খাবে? চা করে নিয়ে আসব?'

মুরলী বোঝে, মনোরমারও বেশ ভালো লাগছে, এই মুহূর্তে তার মনও বেশ খুসিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু তা কি আর কোনভাবে প্রকাশ ক'রতে পারল না মনোরমা? কেবল চা, যাতে কোন

নেশা নেই, উগ্রতা নেই, কেবল মোলায়েম একটু আরাম আছে মাত্র? মুরলীর মনে পড়ল না, এই চায়ের মধ্যেই এক সময় কত রোমান্স, কত দুঃসাহসিকতা ছিল। যখন গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে পাকের ঘরের এক কোণায় গিয়ে চা করে দিত মনোরমা আর বাপের ভয়ে চোরের মত লুকিয়ে গিয়ে খেয়ে আসত মুরলী। চা খাওয়া মোটেই সহ্য করতে পারত না নবদ্বীপ। বিড়ি খাক, তামাক খাক, আড়ালে আবডালে একটু এদিক ওদিকও না হয় চলুক মুরলী, কিন্তু চা-কে সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে বেশী বিজাতীয় মনে করত নবদ্বীপ। কলকাতার আড়তে গিয়ে অন্যান্য বাবুয়ানার সঙ্গে এই চা খাওয়ার বাবুগিরিও মুরলী শিখে এসেছে, কিন্তু এসব স্লেচ্ছপনা আর যেখানে চলে চলুক, নবদ্বীপের বাড়িতে বসে চলবে না। তখন নবদ্বীপকে বেশ ভয় করে চলত মুরলী, এখনকার মত মুখের ওপর জবাব দিতে পারত না এমন করে,—প্রত্যক্ষভাবে অবাধ্যতা করতে সাহস পেত না।

কোথায় ছিল ললিতা, চায়ের নাম শুনতেই মৌমাছির মত যেন উড়ে এল একেবারে। ও যেন কান খাড়া করেই ছিল। 'আমার জন্যও এক কাপ করো কিন্তু মা।' মনোরমা নীরস কণ্ঠে বলল, তা আমি আগেই বুঝেছি। এই বয়সেই বেশ চা-খোর হয়ে উঠেছে মেয়ে। কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? সেই দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছে আর ফেরবার নাম নেই। এমন পাড়াবেড়ানো মেয়েই হয়েছিস তুই, আর বেড়ানোর কি একটা সময় অসময় নেই?'

যে স্নিগ্ধ কোমল পরিবেশ এতক্ষণে জমে উঠেছিল, মনোরমার এই তীক্ষ্ন ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠে তা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো। বিরক্ত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ললিতার দিকে তাকাতেই সমস্ত স্ফীতি যেন পূরণ হয়ে গেল মুরলীর। নিজের পছন্দমত সেজেছে ললিতা, মুরলীর পছন্দের একটুও মান রাখেনি। তবু মুরলীর মোটেই আর খারাপ লাগলো। নিজের খুসিমত শাড়ি পরেছে, চুল বেঁধেছে, তারপর একগাল পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে ললিতা। পান খেতে কতদিন মুরলী ওকে নিষেধ করেছে, এর জন্য মেরেছে পর্যন্ত, তবু পান খাওয়া সম্পূর্ণ ওকে ছাড়ানো যায়নি। তার কথার অবাধ্য হওয়ার মত এমন সাহস অতটুকু মেয়ে কোথায় পায়, মুরলী যেন বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু ললিতার পান খাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে খুব যে রাগ হয় মুরলীর খুব যে বিশ্রী লাগে তা নয়, বরং মনে হয় বেশ তো মানিয়েছে ললিতাকে, ওর নিজের খুসিমত সাজতে দিলেই তো ওকে সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায়। বয়স অনুযায়ী গড়ন একটু বাড়ন্তই ললিতার। নারীত্ব তার যেন সবুর করতে পারছে না। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয় তার কথাবার্তা, চালচলনে। গ্রাম্য যুবতী ঝি বউদের ভাবভঙ্গী সে অবিকল নকল করতে শিখেছে। মাঝে মাঝে ভারি রাগ হয় মুরলীর, ভারি অশোভন লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন একটা সস্নেহ কৌতুকই যেন বোধ করে মুরলী, বেশ একটু প্রশ্রয় দিতেই ইচ্ছা করে। হাত ধরে টেনে খুব কাছে নিয়ে আদর করে মুরলী জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা লিলি, এক সময়ও কি বাড়িতে থাকতে তোর ভালো লাগে না, দুপুর রোদে কোথায় টো টো করে ঘুরে এলি বল্ তো।'

মুরলীর বাহুর মধ্যে কেমন যেন আড়ষ্টভাবে থাকে ললিতা, ফিরে একবার মার দিকে একটু তাকায়—তারপর ছাড়িয়ে আসবার চেষ্টা করতে করতে বলে, 'ছাড়ো না বাবা, আমার ভারি লজ্জা করে!

রক্ত নেই মনোরমার শরীরে। তবু তার ফ্যাকাসে গাল দুটো হঠাৎ অত্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। অবশ্য এক মুহূর্ত পূর্বে মেয়েকে অমন করে আদর করাটা মনে মনে মনোরমার নিজেরই কেমন একটু অশোভন লাগছিল। বয়স না হোক, বাড় তো হয়েছে মেয়ের। কেউ যদি দেখে কী ভাববে, কিন্তু মেয়ের মুখে নিজের মনের কথা শোনামাত্র মনোরমার মন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। স্বামীর অপ্রতিভ বিপন্নতার অংশ গ্রহণ করল মনোরমা, তারপর খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, 'কথা শোন পোড়ামুখীর। এক ফোঁটা মেয়ে, কিন্তু মুখে কি পাকা পাকা কথা দেখেছ। লজ্জা করবার কত বয়স হয়েছে যেন ওর। বুড়োমানুষের মত এসব পাকা পাকা কথা নিশ্চয়ই ও আলতার কাছে গিয়ে শিখেছে।'

কেমন একটু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মুরলী। হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে ভয়ঙ্কর রেগে যায় মুরলী। চটাপট চড় মারতে থাকে ললিতার গালে, 'কেন গিয়েছিলি তুই আলতার কাছে? কেন যাস? কেন মিশিস ওর সঙ্গে? ও কি তোর সমবয়সী। আর যাবি, আর যাবি কোনদিন?'

এবার মনোরমার বেশ কষ্ট হয়। আহা, অমন করে মারা কেন মেয়েটাকে। ঐ তো এক ফোঁটা মেয়ে, কী-ই বা এমন বোঝে, আর সত্যি যদি কিছু বুঝতোই, তাহলে কি আর বলতো? তাছাড়া কয়েক বছর আগের নিজের কথাগুলির অনেকটা প্রতিধ্বনি যেন মনোরমার কানে বাজে মুরলীরকণ্ঠের মধ্য দিয়ে। 'কেবল আমার মনই খারাপ, আমি কি বোকা, আমি কি কালা যে লোকের কথা আমি বুঝতে পারিনে? আমি কি অন্ধ যে, কিছুই চোখে পড়ে না আমার? কেন সুযোগ পেলেই অলতার সঙ্গে তুমি কথা বলো? কেন অত যাওয়া-আসা ওদের বাড়ি? কী দরকার, কী কাজ আমাদের?'

ক্রমশ

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস, ভূপর্যটক

(২)

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জঙ্গলের মৃদুমন্দ বাতাস বইতে আরম্ভ হয়েছে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখী নীরবে উড়ে চলেছে। তাদের চলার শব্দ আমার কাছে নতুন নয়, তবুও যেন মনে হোলো এবার আমাকেও কোথাও যেতে হবে। জঙ্গলের

সভ্যতাপ্রাপ্ত নিগ্রো পরিবার

মধ্য থেকে ঝুপ ঝাপ করে ছোট ছোট পাখী এসে পথের মাঝখানে পরিষ্কার জায়গায় উড়ে এসে বসছে। তারা নিজেরা শিকার করে আবার অন্যের শিকার হয়ে প্রাণ হারায়। সবাই বের হয়েছে আহারের অন্বেষণে, কিন্তু কত জীব খাদ্য না পেয়ে অপর জীবের খাদ্য হবে তাই ভেবে আমি মাথা নত করে বসে ছিলাম। এসব চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। উঠে দাঁড়ালাম। রাত্রে কোথায় শোয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলাম। যে সব গল্প লেখক গল্পের পথিক-নায়ককে রাত্রি বেলা গাছে চড়িয়ে প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁদের বলছি আফ্রিকার জঙ্গলের গল্প লেখার বেলা সে রকম না করাই ভাল। আফ্রিকাতে গরম আর হাওয়াতে যত গাছ ও লতাপাতা আমি দেখেছি তার প্রত্যেকটি কাঁটায় পূর্ণ। তাতে হাত দেওয়া যায় না। শীত প্রধান স্থানে বন্য জীব বিরল। এরূপ ক্ষেত্রে নায়ককে গাছে চড়িয়ে প্রাণ বাঁচাতে যাওয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের বড়ই অভাব হবে। তারপর রাত্রি বেলা সরু ও লম্বা এক জাতীয় সাপ গাছে উঠে তাদের খাদ্য অনুসন্ধান করে।

এই সাপগুলি এতই বিষাক্ত যে আজ পর্যন্ত সেই সাপের কামড় হতে কারো প্রাণ বাঁচেনি।

আমি গাছে উঠি নি, পথের ঠিক মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে বসে ছিলাম।

রাত্রি জাগরণ কত কষ্টের, যারা রাত্রি জাগে তারাই অনুভব করতে পারে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কোন কষ্ট পেতে হলো না। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে খরগোসের চোখের আলো দেখে মনে হতে লাগল, এই বুঝি চিতাবাঘ খাপ পেতেছে, এই বুঝি আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। অনেক সময় এই অনর্থক চিন্তাজাল আমাকে এত হয়রাণ করে তুলত যে, ভাবতাম এবার মরলেই ভাল। কিন্তু অনেকের হয়ত জানা নেই, মৃত্যুর চেয়ে মৃত্যু ভীতিই মানুষকে অধিকতর কাতর করে। চোখ ভেঙে আসছিল, কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই। এই শ্বাপদ সংকুল গভীর অরণ্যে চোখের পাতা বোজা আর মরণকে বরণ করা একই কথা। তাই অতি কষ্টে চোখের পাতা খুলে রাখছিলাম। যখনই আগুন নিবে যাচ্ছিল তখনই গাছের শুকনো ডাল এনে আগুনটাকে বাড়িয়ে দিতাম।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ত্যাগ করি নি, কারণ তখনও অনেক হিংস্র জীব অভুক্ত রয়েছে, আপন আপন খাদ্য খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটছে। সেজন্য অনেকক্ষণ বসে থেকে আবার রওয়ানা হতে হয়েছিল। বেশী আর চলতে পারলাম না। একটি ছোট নদীতীরে এসে নদীতে স্নান করে গিনি ফাউলটুকু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম বেশ হলো। দ্বিপ্রহরে ঘুম থেকে উঠে ফের চলতে লাগলাম।

অদূরে একটা মোটর গাড়ির শব্দ শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কত সুখের চিন্তা করতে লাগলাম তার ঠিক নেই। কিন্তু যখন মোটর গাড়িটি কাছে এল, তখন দেখলাম কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র রডেশিয়ার দিক থেকে আসছে, যাবে **লুইসত্রিকার্ত**। তাদের দাঁড়াতে বললাম। তারা দাঁড়াল। তাদের কাছে যদি রুটি থাকে, তবে দিয়ে যেতে বললাম। তারা আমার দিকে চেয়ে একটু হেসেই আবার আগিয়ে চললো। আমার সকল সুখের আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে আনন্দের গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে চলল। আমরা যেমন ভাবি ছোটলোকদের জীবনের মূল্য নেই, তারা পথে মরলেও আমরা দুঃখ করি না, শুকিয়ে মরলেও বলি, 'বেটার ভাগ্যের দোষ' তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়রা ভারতবাসীদের সেরূপ-ভেবে থাকে বলেই, আমাকে একটুকরা রুটি দিতেও রাজি হলো না। পাঠক যদি অব্রাহ্মণ হও এবং দরিদ্র হিন্দু হও, তবে বুঝবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা দরিদ্র নীচ শ্রেণীর উপর কত অত্যাচার করে। তাদের ঘরে কুকুর বেড়ালের স্থান হয়, কিন্তু তোমার স্থান হয় না। আমি এসব কথা ভাবি বলেই, আমার ঘরে বাইরে সমান। আমি নিজের দেশের নিজের জাতের ভাল মন্দ যেমন বলি, বিদেশের লোকের সম্বন্ধেও সেরূপ ভালমন্দ বলবার ক্ষমতা রাখি। অপরের দোষ বলে কি লাভ, যদি সে

দোষে আমরা নিজেরাই দূষিত হই। কিন্তু এসব অসৎ হতে যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে পৃথক্ দল পাকিয়ে লাভ নেই, মনে রেখো। সাম্রাজ্যবাদ এসবকে পোষণ করে। পুঁজিবাদী এসব অসৎগুণকে সাহায্য করে। যতদিন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন এই দুর্দশা আমাদের ভোগ করতেই হবে।

নিগ্রো যুবতীর প্রসাধন

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এই কথাই ভাবছিলাম। আমার মনে হয় এর বেশি কিছুই আমি চিন্তা করি নি। এর বেশি কিছু চিন্তা করার আমার ছিল না। আমার মাথা ঘুরছিল খাবারের চিন্তায়। এ জঙ্গলে খাবার পাওয়া মুস্কিল।

সাহস আমার লোপ পায় নি। খাবার পাবো বলেই আমার ধারণা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পা চলতে চাইছিল না। কতক্ষণ হেঁটে একটা পরিষ্কার স্থানে গিয়ে বসেছি, অমনি কিছু দূরেই আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছে দেখে মনে হল, লোকালয় নিশ্চয়ই এখানে আছে। শরীরে শক্তি ফিরে এল। আমি আগুনের ধোঁয়া লক্ষ্য করে চললাম। পথ হতে সামান্য দূরেই একটি ফার্ম শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষক আমাদের কৃষকের মত নয়। প্রভেদটা বলছি। চাষার জমির চারদিকে তারের বেড়া থাকে। সিংহ, চিতাবাঘ যাতে চাষার জমির সীমানায় মাঝে না পৌঁছতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। বেড়ার ভেতরও জঙ্গলে পূর্ণ। পার্বত্য জঙ্গলের অংশ বললেও দোষ হয় না। বেড়া এতই শক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমি সেই বেড়া ডিঙ্গাতে গিয়ে কাঁটায় বিঁধে গিয়েছিলাম। বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেলেও আমার কোন লাভ হোত না। যতদূর দেখা যায়, ততদূর জংলী গাছে ভর্তি। চাষার বাড়িতে যাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। তিন মাইল আগিয়ে গিয়ে বাড়ির গেট পেয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দু'মাইল পথ এগিয়ে গিয়ে একটি বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটার চারদিকে পরিষ্কার জায়গা। আশে পাশে একখানা ঘরও নেই। দরজার সামনে দাঁড়াতেই দুটো বড় বড় কুকুর চিৎকার করতে লাগল। দুটো কুকুরই বাঁধা ছিল। কুকুরের শব্দে ঘরের ভেতর হতে একটি নিগ্রো বের হয়ে এসে আমার পরিচয় ডাচ ভাষায় জিজ্ঞাসা করল। ইংলিশে তাকে বললাম 'আমি একজন পর্যটক, বড়ই ক্ষুধার্থ, কিছু খেতে চাই'। লোকটি আমার কথার জবাব না দিয়ে ঘরে গেল। একটু পর ঘর হতে একজন ডাচ মহিলা বের হয়ে এসে আমায় বললেন, "খেতে চাও কিছু খেতে পার, কিন্তু এখানে থাকবার স্থান হবে না।" আমি তাতেই রাজি হলাম। চারখানা নিগ্রো চপাতি আমাকে দেওয়া হল, আর দেওয়া হল কতকটা সিদ্ধ মাংস। তাই নিয়ে আমি বাড়ি হতে চলে এলাম। বার বার তাদের দানের জন্য ধন্যবাদ জানালাম।

আমি বড়ই ধীরে পথ চলছিলাম। বাড়ির সীমানা পার হবার পূর্বেই একটি নিগ্রো এসে আমাকে তাদের ভাষায় কি বলল তা বুঝলাম না। শেষটায় ইংলিশে বলল, "আজ আর আগিয়ে যাবেন না, নিকটেই আমাদের গ্রাম আছে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।" বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করলাম।

জঙ্গলের মধ্যেই এই গ্রাম একটা ছোট পথ ধরে গ্রামে যেতে হয়েছিল। গ্রাম বড় নয়। পাঁচখানা ছোট ঘর আর দুখানা খড়ের ঘর মাত্র। লোকজন কেউ ছিল না। লোকটি বললে বিকালের দিকে সবাই যখন ফিরে আসবে, তখন বেশ আনন্দ পাবেন। সে তার ঘরখানা দেখিয়ে দিল। আমি তাতেই আরাম করে গিয়ে বসলাম। ঘরখানার চারিদিক পরিষ্কার। নিকটেই একটি ঝরণার জল ঝির ঝির করে পড়ছিল। লোকটি চলে গেলে সেই জলে স্নান করে ডাচ মহিলার দেওয়া খাদ্য খেতে লাগলাম। তখন ভাবছিলাম, চপাতি তৈরি করাটা অসভ্য নিগ্রোরাও জানে।

বেশীক্ষণ বিশ্রাম করতে হয় নি, এরই মাঝে কয়েকটি নিগ্রো ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে ফিরে এল। আমরা ঘরে বসে যেমন জুতা, মোজা, কোট প্যান্ট তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি এবং হাত পা ছড়িয়ে বসি, নিগ্রোদের মাঝে যাদের বস্ত্র-প্রিয়তা হয় নি, তারাও তেমনি করে শরীর হতে সকল রকমের কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে আরাম পেয়ে থাকে। আমার সামনেই স্ত্রীপুরুষ সবাই কাপড়গুলি শুকনা এবং পরিষ্কার স্থানে খুলে একটুও বিশ্রাম না করে একদম ঝরণার জলে গিয়ে স্থান করতে লাগল। ওদের মাঝে উলঙ্গ হয়ে স্নানের প্রথা এখনও প্রচলন আছে। স্নান শেষ করে সকলেই রৌদ্রে শরীর শুকিয়ে ঘরে এসে শুধু

স্ত্রীলোকেরা সামান্য কাপড় পরে রান্নার কাজে লেগে গেল। আমি দাঁড়িয়ে তাদের পাক প্রণালী দেখতে লাগলাম।

একটা হাঁড়িতে জল চড়িয়ে দেওয়া হল। জলটা যখন ফুটতে লাগল, তখন এক জাতীয় কন্দকের শিখর চূর্ণ তাতে ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগল এবং একটা হাতা দিয়ে তাই ক্রমাগত নাড়তে লাগল। শিখর চূর্ণ যখন একদম ময়দার মত জমে উঠল, তখন কয়েক টুকরা মাংস এবং সামান্য নুন তাতে দেওয়ার পর নামিয়ে রেখে ঢেকে দেওয়া হল। তারপর ঐ ঢাকা পাত্রটার চারিদিকে সকলে বসে নানারূপ কথা এবং গান করে সময় কাটাতে লাগল। অর্ধ ঘণ্টা পর হাঁড়িটার ঢাকনা খুলে সবাই তাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগল। লক্ষ্য করে দেখলাম, কেউ তাড়াতাড়ি খায় নি, ধীরে সুস্থিরে খেতে লাগল। পাত্রটা যখন একদম খালি হল, তখন হাঁড়িটাকে ঘরের মাঝে রেখে দিয়ে অপরিষ্কার হাত পায়ের নীচে মুছে ফেলল। হাত ধুতে কেউ ঝরণায় যায় নি, অথবা খাবারের সময় কেউ জলও খায় নি। খাবার খেয়ে সিগারেট অথবা অন্য কিছু খাওয়া অথবা মুখে জল দিয়ে ধোয়ার দরকার কেউ উপলব্ধি করে নি। দিব্য আরাম করে ফের কথা বলতে শুরু করল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আমার পরিচিত লোকটি যার নাম 'মাও' সে এসে হাজির হল। মাও আমাকে সকলের কাছে পরিচয় করে দিয়ে, আধ ঘণ্টা সময় তাদের সঙ্গে কথা বলে আমাকে নিয়ে গ্রাম দেখাতে বের হল।

গ্রামের চার দিকে জঙ্গল, শুধু একটা উঁচু ভূমির গা বেয়ে একটি ঝরণা নীচের দিকে চলে গেছে। দেখবার মত আর কিছুই ছিল না। তারপর সে গেল একটি বাড়িতে। সেই বাড়িতে ছিল মাত্র কয়েকটি লোক। একটি যুবতী মাওকে দেখা মাত্রই দৌড়ে এসে আঁকড়ে ধরল। মাও তাকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। উভয়ের মাঝে কি কথা হয়েছিল, তার একটাও আমি বুঝতে পারি নি, তবে এটা বুঝতে পেরে ছিলাম যে, তারা একে অন্যকে ভালবাসে। নিগ্রোদের মাঝে চুম্বন প্রথা আছে বটে, তবে ইউরোপীয় ধরণে নয়। মাওকে স্ত্রীলোকটির গাল স্পর্শ করে চুম্বন করতে দেখলাম, কিন্তু সেরূপ চুম্বন আমাদের মাঝেও আছে। নিগ্রো চুম্বনে কামের নাম গন্ধও নেই। যে সে লোক যাকে তাকে চুম্বন করতে পারে, যদি পরস্পরের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকে।

ওরা হাত ধরে বাড়ির দিকে আগিয়ে যাচ্ছিল, আর আমি তাদের পেছনে ছিলাম। পথেই মশার উপদ্রব বুঝতে পারলাম, ভাবলাম ওদের ঘরে কি করে রাত্রি কাটাব। মাও ঘরে গিয়ে একটু আগুন প্রজ্জ্বলিত করল এবং পরে ঘরেতে যত্নে রক্ষিত কতকগুলি কাঠ ছিল তার কয়েক টুকরা প্রজ্জ্বলিত আগুনে ছেড়ে দিল। ঘরটা যখন ধুঁয়ায় অন্ধকার হল, তখন আমাকে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলল। তার কথা মত ঘরে গিয়ে এক পাশে মাটিতেই ডান হাতকে বালিশ করে শুয়ে পড়লাম। মাও এবং যুবতীও একদিকে শুয়ে পড়ল।

"রবীন্দ্র প্রসঙ্গে"র পরিশিষ্ট

(১২১ পৃষ্ঠার পর)

অভিনয় অংশটুক আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 'রাজা' নাটকেও সুরঙ্গমার ভূমিকায় রঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ঐ লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ, রজনীজাগর ক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ" ইত্যাদি।

দূর অতীতের কথা হইলেও, তাঁহার কলকণ্ঠের অনুরণন এখনও এই গীতির স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

বৈষ্ণব কবির পদাবলী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদাবলী তিনি সমালোচকের বুদ্ধিতে অভিনিবেশপূর্বক আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলেন, স্থানে স্থানে অধীত পদে তাঁহার মন্তব্যেরও চিহ্ন দেখা যায়। আশ্রমে তাঁহার উদ্যোগেই দুই তিনবার কীর্তনে জয়দেব-চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর গান শুনিয়াছি, সে সভায় কবিও উপস্থিত ছিলেন, মনে হয়। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পৌষোৎসবে প্রথমে যেবার কৃষ্ণলীলা যাত্রা করিতে আসেন, সে সময়ে আসরে কবি উপস্থিত ছিলেন ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার প্রাঙ্গণে একবার কথকতাও শুনিয়াছি, কবি সে সভায় ছিলেন কি না, মনে হয় না।

কবির প্রভুত্ব—রবীন্দ্রনাথ অনেকেরই প্রভু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুত্বের সংকটে কেহ কখন বিপন্ন হইয়াছেন, একথা মনে হয় না। বার বার শত্রুতা করিয়াও অধীনস্থ শরণাগত হইলে, শত্রুর প্রতি বৈরনির্যাতন সংকল্প তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে এইরূপ প্রতিকূল আঘাত তাঁহার প্রভুজনোচিত চরিত্রের মহত্বই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে; মিত্রের চক্ষে মিত্রজ্ঞানে শত্রুর দোষলেশও তাঁহার মনে স্থান পাইত না। "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। আমার "রবীন্দ্রনাথের কথা পুণ্যস্মৃতি" প্রবন্ধও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভূপেন্দ্রনাথের অবসর—দীর্ঘকাল কার্যের পরে ভূপেন্দ্রনাথ কবিকে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা জানাইলেন। কবি প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। কিন্তু পরে ভূপেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে অবসরগ্রহণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—আমার প্রতি কবির বিশেষ স্নেহ তাঁহার সম্মতির অন্তরায় হইবে জানি, কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থকৃচ্ছ্রে তিনি আমাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, ইচ্ছা থাকিলেও অর্থশক্তি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে না; তখন রাখাও কষ্টকর, পক্ষান্তরে অবসরেও বিশেষ সংকোচবোধ হইবে। কবির এই ভবিষ্যৎ উভয় সংকটের কথা ভাবিয়াই অবসর গ্রহণ শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, —সমানভাবে সকলেরই মনোরঞ্জন বিষম সমস্যার কথা। সকলের সকল মনোবৃত্তি একরূপে হয় না, ভিন্ন হইবেই। এরূপ স্থলে বিষম বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া সমবৃত্তিগুলি লইতে পারিলে কাহারও মনে দ্বেষ হিংসা থাকে না, শান্তিলাভই হয়।*

* ইহা কবির ভাষা নহে, কবির লিখিত বিষয়ের তাৎপর্য আমার ভাষায় লিখিয়াছি।

টিউনিসিয়া

বসুবন্ধু শর্মা

সামগ্রিক যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা আজ হঠাৎ খুব প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। শান্তির সময়ে এ অঞ্চলের এরূপ একটা স্থায়ী প্রসিদ্ধি না থাকলেও, সামরিক গুরুত্ব ছাড়াও এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কম নয়। টিউনিসিয়া উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারই একটি ফরাসী রক্ষিত ছোট রাজ্য। এই টিউনিসিয়ায় ঘাঁটি করার জন্য বর্তমান মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানদের একটা প্রবল লড়াই চলছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে তার ফলাফলের উপর যে এই যুদ্ধের গতি অনেকটা নির্ভর করছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতালি যুদ্ধে নামার পর থেকে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য নিয়ে মিত্রশক্তির সঙ্গে অক্ষশক্তির একটা চূড়ান্ত রকমের বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছিল। নানা কারণে এতদিন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তিরই আধিপত্য ছিল বেশী। ফলে লিবিয়ার রোমেলের পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করে মিত্রশক্তিকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মিত্রশক্তি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে আজ লিবিয়ার রণক্ষেত্রে রোমেলকে বহু দূর পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে এসেছে; ফরাসীদের অধীন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়ও মিত্রশক্তি হানা দিয়েছে। হিটলার আশ্রিত ভিসি গভর্নমেণ্টের পক্ষে মিত্রশক্তির গতিরোধ সম্ভব হয়নি—অনেকস্থানে আবার ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যদল সক্রিয়ভাবে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করছে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে অক্ষশক্তিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মিত্রশক্তি আজ বদ্ধপরিকর। জার্মানরা ইউরোপ থেকে নতুন সৈন্য ও ট্যাঙ্ক আমদানী করে ফরাসী আশ্রিত টিউনিসিয়া রাজ্যে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। এই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার যুদ্ধের উপর ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য যে অনেকটা নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার যুদ্ধ কিছু পরিমাণে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যও সাধন করছে। এর ফলে পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারকে বেশ কিছুটা অসুবিধায় যে পড়তে হচ্ছে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ককেশাস যুদ্ধের গতি এতে বদলে যেতে পারে। তৃতীয়ত মিত্রশক্তি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা দখল করে ভূমধ্যসাগরের উপর তাদের পূর্ব প্রভাব কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে পারলে তাদের পক্ষে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলারও সুবিধা হবে। আফ্রিকা থেকে সরাসরি ইতালির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া খুব অসুবিধার ব্যাপার হবে না। এসব দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার যুদ্ধের যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে সে কথা স্বীকার না করে পারা যায় না। তাই টিউনিসিয়ার যুদ্ধ আজ আর একটি খণ্ড যুদ্ধ নয়—এটা সামগ্রিক যুদ্ধেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

টিউনিসিয়া, মরক্কো ও আলজেরিয়া এই তিনটি রাজ্যকে একত্রে বলা হয় বারবারি স্টেটস (Barbary States)। নামটির মধ্যে যেমন প্রাচীনত্বের গন্ধ আছে তেমনি আছে রোমান্সের গন্ধ। মরক্কো রাজ্যটা পশ্চিমে, আলজেরিয়া মধ্যে এবং টিউনিসিয়া পূর্বে। তিনটি রাজ্যই দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে বালুকাময় সাহারা মরুভূমির বুকে মিশে গেছে। এই অঞ্চলের সঙ্গেই বহু প্রাচীন কার্থেজের স্মৃতি বিজড়িত; কার্থেজের বিরুদ্ধে রোমের বিজয়দৃপ্ত অভিযান এই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বুকেই লিপিবদ্ধ আছে। ইসলাম সভ্যতার প্রথম যুগে এই অঞ্চল থেকেই সারাসেনরা স্পেনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর এ অঞ্চল বহুদিন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলের জলদস্যুরা তখন ভূমধ্যসাগরের জলপথ বিপদসঙ্কুল করে রাখত; এদের জন্য ভূমধ্যসাগরের পথে
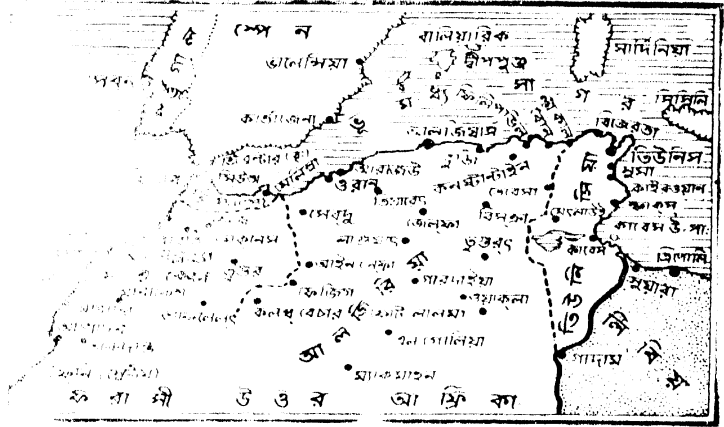
নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য চালানো একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা এই জলদস্যুর উৎপাত নিবারণে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। ফলে এ অঞ্চলে আবার অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সব যুদ্ধবিগ্রহ অবলম্বন করে অনেক রূপকথা ও গাথার সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের মুখে মুখে আজও সেসব কাহিনী ফেরে। একে একে আলজেরিয়া মরক্কো প্রভৃতি ফরাসীদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানে সুপটু আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। একদা জলদস্যু অধ্যুষিত অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছিল। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ফরাসী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ অঞ্চলের খাদ্যোৎপাদন ক্ষমতা যেমন বেশী, এখানকার অধিবাসীদের বীরত্বও তেমনি প্রসিদ্ধ।

আলজেরিয়া মরক্কোর মত টিউনিসিয়াও কেমন করে ধীরে ধীরে ফরাসীদের অধীনে গেছিল সে কথাই এখন বলছি। টিউনিসিয়াও তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে তুরস্ক রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালির সাম্রাজ্যবাদের নজর পড়েছিল টিউনিসিয়ার উপর। টিউনিসিয়া ইতালির খুব কাছ কাছি বলে ইতালি মনে করত যে তার দাবী সব চেয়ে বেশী; ব্রিটিশরা ইতালীয়দের কাছে টিউনিস থেকে অন্তর্মুখী একটা ছোট রেলওয়ে লাইন বিক্রী করেছিল। তারপর ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশরা জানাল যে, ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলে টিউনিসিয়া নিয়ে নিতে পারে—

কিন্তু সে সময় ইতালীয় গভর্নমেণ্টের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় তারা সে প্রস্তাব কাজে লাগাতে পারে না। চতুর ফরাসীরা এই সুযোগ গ্রহণ করল এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন বিদ্রোহী টিউনিসীয় নেতাকে শাস্তি দেবার অজুহাতে তারা টিউনিসিয়া আক্রমণ করে বসল। ইতালীয়দের সব সময়ে ধারণা ছিল যে টিউনিসিয়া শেষ পর্যন্ত তাদেরই হবে। তারা ভীষণ রেগে গেল। ব্রিটিশরা কিন্তু এ ব্যাপারে নির্বিকারই রইল—কারণ তারা ফরাসীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছিল যে, ফরাসীরা যদি সাইপ্রাস দ্বীপের উপর তাদের দাবী স্বীকার করে, তবে তারাও টিউনিসের উপর ফরাসীদের দাবী স্বীকার করবে। বেশ কৌশলেই চুক্তির সর্ত সম্পাদিত হল। এমনি করে টিউনিসিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। টিউনিসিয়া কিন্তু সরাসরি ফরাসী গভর্নমেণ্টের অধীন নয়; কার্যত অধীন হলেও টিউনিসিয়া রক্ষিত রাজ্য (Protectorate)। টিউনিসিয়ার একজন দেশীয় সুলতানও আছেন—তাঁকে বলা হয় টিউনিসিয়ার বে (Bey of Tunisia)। বর্তমান সুলতানের নাম সিদি তুর আহম্মদ বে—তিনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে টিউনিসিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন।

অ্যালজেরিয়া ও ত্রিপলির মধ্যস্থিত টিউনিসিয়ার আয়তন প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে) ২৬০৮৩১৩। এর মধ্যে ইউরোপীয় বেসামরিক অধিবাসী সংখ্যা ২১৯৫৮—ইউরোপীয়দের মধ্যে আবার ফরাসীদের সংখ্যা ১০৮০৬৮ এবং ইতালীয়দের সংখ্যা ৯৪২৮৯। ইতালীয় অধিবাসীরা বেশীর ভাগই সিসিলি থেকে এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে—দক্ষিণ টিউনিসিয়ার সঙ্গে ত্রিপলির বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ফরাসীরা চেষ্টা করেও নিজেদের দেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক অধিবাসী এখানে আমদানী করাতে পারে নি—এ ব্যর্থতার জন্য তারা সত্যি দুঃখিত। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রধানত আরব জাতীয় হলেও আরবদের চেয়ে তুর্কীদের সঙ্গেই তাদের সাদৃশ্য বেশী বলে মনে হয়। তারা দেখতে দীর্ঘকায়, সুপুরুষ; যোদ্ধা হিসাবেও তাদের খ্যাতি আছে। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও তারা খুব বেশী বদলায় নি; পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও অধিবাসীদের তারা কিঞ্চিৎ ঘৃণার চোখেই দেখে। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হবার ক্ষমতা অবশ্য তাদের নেই—তবু তাদের মনোভাবকে অস্বীকার করা যায় না। রক্ষকর্তা হিসাবে ফরাসী দেশের আনুগত্য স্বীকার করলেও পরাধীনতায় তারা খুব উল্লসিত নয়। তবু তাদের মধ্যে যে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ আছে তারা বিদেশীদের প্রয়োজন এবং কর্মক্ষমতার প্রশংসা করে ও মুক্তকণ্ঠে তার অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করে।

টিউনিসিয়ার ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ খুব মনোরম। অবশ্য নীল, নাইগার প্রভৃতির মত বড় বড় নদী টিউনিসিয়ায় নেই—আছে দেশের মধ্যে বড় বড় হ্রদ। এইসব হ্রদের গভীরতা খুব বেশী নয়। দক্ষিণ টিউনিসিয়ায় প্রায় দশ লক্ষ খেজুর গাছ আছে; এইসব গাছ থেকে বছরে প্রায় নয় কোটি পাউণ্ড খেজুর উৎপন্ন হয়। টিউনিসিয়ায় প্রধানত দুটি ঋতুরই প্রভাব অনুভূত হয়—বর্ষা আর গ্রীষ্ম। পুরোপুরি গরম না পড়া পর্যন্ত রাত্রিতে বেশ শীত অনুভব করা যায়। এখানে শীতকাল খুবই খারাপ—শীতের মাঝামাঝি মাস দুয়েক খুব বেশী বৃষ্টি হয়। বসন্তের সময়টা খুব মধুর হলেও বড় ক্ষণস্থায়ী—মে মাসের পরে খুব বেশী গরম পড়ে যায়। পূর্ব উপকূলস্থিত সাহেল অঞ্চলটা বেশ উর্বর। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের জলে সাহেল অঞ্চল বেশ পরিপুষ্ট এবং এখানকার আবহাওয়াও বেশ মনোরম। দেশের মধ্যাংশ অসমতল এবং পর্বতসংকুল—গ্যাবেসের পরে দক্ষিণ দিকে আবার মরুভূমি। ফ্যাক্সের (Sfax) কাছাকাছি প্রচুর জলপাইয়ের বন আছে; এইসব বনের দৃশ্য বড় নয়ন-তৃপ্তিকর। উত্তরাঞ্চলের উপত্যকাগুলিতে অনেক মেষ ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু চরে বেড়ায়। কৃষিকর্মের উপযোগী ভূমিও প্রধানত এই অঞ্চলে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ওট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কোন কোন স্থানে দ্রাক্ষার চাষও হয়।

খনিজ দ্রব্যের দিক থেকেও টিউনিসিয়ার গুরুত্ব কম নয়। প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, তামা, সীসা, দস্তা, লোহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মার্বেল পাথর ও ফসফেটও (লবণ বিশেষ) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ফসফেট জলপাইর তেল, গম, যব, কম্বল, খেজুর প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে; বস্ত্র, ইস্পাত, যন্ত্রাদি শিল্প দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। টিউনিসিয়ার নিজস্ব মুদ্রা আছে; গত মহাযুদ্ধের পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধাতুজ মুদ্রার চেয়ে কাগজের মুদ্রারই প্রচলন ছিল বেশী—সম্প্রতি ধাতব মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে। টিউনিসিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত ফ্রান্স এবং অ্যালজেরিয়ার সঙ্গেই চলে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমদানী দ্রব্যের মূল্য ছিল ১৩২৪৩০০০০০ ফ্রাঁ (Franc) আর রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ছিল ১১৪০৮০০০০০ ফ্রাঁ। সম্প্রতি দেশের রাস্তাঘাট সংস্কৃত হওয়ায় এবং রেলওয়ের প্রসার হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছে। রাজধানী টিউনিসের সঙ্গে সমুদ্রোপকূলস্থিত লাগুলেৎ বন্দরের একটি খালের দ্বারা যোগাযোগ করা হয়েছে; রাজধানীর লোকসংখ্যা ২১৯৫৭৮। অন্যান্য শহরের মধ্যে ফ্যাক্স (লোক সংখ্যা ৪৬৩৩৩) বাইজার্টা (লোক সংখ্যা ৩৪৭৯৮), সুজা (লোকসংখ্যা ২৮৪৬৩) এবং কেয়ারওয়ান (লোকসংখ্যা ২২৯৯১) প্রসিদ্ধ। বাইজার্টস বন্দরটি খুব সুরক্ষিত এবং এখানকার পোতাশ্রয়টিও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। এ পোতাশ্রয়টি এত বড় যে সমস্ত ফরাসী নৌবহর এখানে নির্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকতে পারে। টিউনিস শহরের আবহাওয়া অনেকটা তুরস্কের মত; সুন্দর সুপুষ্ট টিউনিসীয় যুবকদের সুগঠিত দেহ দেখে ভ্রমণকারীরা প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু বিরাট একটি ইতালীয় উপনিবেশ থাকায় টিউনিসিয়া দেশের আবহাওয়া ফরাসীদের পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। ইতালীয়রা ফরাসীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বললেও অত্যুক্তি হয় না। ইটালীয়দের উপস্থিতি ফরাসীরা ভালভাবে না নিলেও, তাদের পক্ষে অন্য কোন উপায় নেই। ফরাসীরা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য নিজেদের দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে লোক আমদানী করে উঠাতে পারে না। বর্তমানে টিউনিসিয়ায় মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানদের যে যুদ্ধ হচ্ছে তার ফলাফল যে কিয়ৎপরিমাণে এই ইতালীয় অধিবাসীদের উপর নির্ভর করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফরাসীরা প্রথম থেকেই ইতালীয়দের সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে, কিন্তু তাদের তাড়ানোর কোন পথ আবিষ্কার করতে পারেনি।
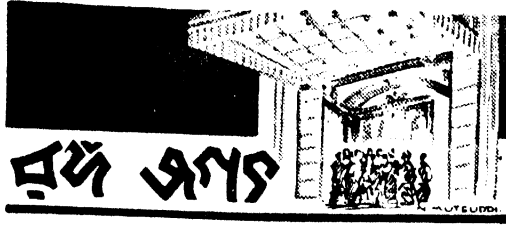
মেদিনীপুরের মর্মান্তিক বিপর্যয়ে সাহায্য করবার জন্য চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি কেন যে এপর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্বিকার হ'য়ে আছে বোঝা শক্ত। শোনা যায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সংঘ এবিষয়ে আলোচনা করবার জন্য একদা সম্মিলিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেন নি। এ-ব্যপারেও যে বিতর্কের ফাঁক আছে আমাদের তা জানা ছিল না—চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের এই নিশ্চুপতা সকলকেই বিস্মিত ক'রেছে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা—প্রযোজক, পরিবেশক বা প্রদর্শক প্রত্যেকেই অনায়াসে সাহায্য ক'রতে পারেন এবং দলবেঁধে যখন তাঁরা কিছু ক'রে উঠতে সক্ষম হ'লেন না তখন আলাদা ভাবে সাহায্য করাও কারুর পক্ষেই ক্ষমতার বাইরে নয়। অন্য কারুর কথা বাদ দিই, বাঙলার জনগণ্য চিত্রব্যবসায়ী—নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, অরোরার শ্রীঅনাদি বসু এবং রূপবাণীর শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় সাহায্য উদ্যোগে অগ্রণী হবেন সকলে আশা করেছিল কিন্তু সে আশাও বোধ হয় নিরর্থক। বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিষ্ঠান বলে যাঁরা দাবী করেন তাঁদের কাছ থেকে বাঙলা ও বাঙালী কিছু আশা কি ক'রতে পারে না, বিশেষ এই বিপর্যয় কালে!

*　　*　　*　　*

বম্বেতে বিবেকানন্দ পিকচার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছে যাঁদের প্রথম ছবি হবে 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ছবিখানি তোলা হবে তিনটি ভাষায়, বাঙলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে। খবরটি আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিতাপও ক'রতে হচ্ছে যে, বাঙলার মনীষীর জীবনীকে বাঙলা দেশের কেউ প্রচার ক'রতে এগিয়ে এল না! ছবির নামে অত্যন্ত রদ্দি জিনিস পরিবেশন ক'রতে তৎপর হবেন, তবু সারবস্তু বিষয়-বস্তুর ধার দিয়েও চিত্রপ্রযোজকরা কেউ ঘেঁষবেন না। তা নয়তো, বাঙলা দেশের সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে আসন পায় যে, সেখানকার চিত্রগুলির মধ্যেও কাহিনীর এমন দীনতা থাকে! বহু মনীষির অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশই সবচেয়ে ধন্য হ'য়েছে। মনীষীদের প্রত্যেকের জীবনই অনন্যসাধারণ ঘটনা-সঙ্কুল, যে-কোন কল্পিত কাহিনীর চেয়ে তা উপভোগ্য। তাছাড়া তাঁদের কথা দেশকে যেমন শিক্ষার সুযোগ দেয় তেমনি তা আনন্দবিনোদনেও ব্যর্থ হবে না। মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজনের জীবনী অবলম্বনে নাটকও অনেকগুলি বেরিয়েছে সুতরাং মঞ্চ বা পর্দায় পরিবেশন করবার মত মালমসলা নেই এমন কথা তো কেউ ব'লতে পারবে না। তবে কেন এমন ছবি হয় না? পয়সার দিক থেকে এসব ছবিতে লোকসান হ'তেই পারে না। এটাকে তাহ'লে চিত্রপ্রযোজক তথা **পরিচালকদের যোগ্যতার অভাব বলা যায় না কি?**

*　　*　　*　　*

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে এবারে মহিলারাও হস্তক্ষেপ ক'রলেন। সম্প্রতি শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল নাম্নী এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা চিত্রপ্রযোজকরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রছেন। তাঁর প্রথম ছবির

আচার্য আর্ট প্রডাকসন্সের 'বসন্ত সেনা' চিত্রে বনমালা

মহরৎ কার্য সুসম্পন্ন হ'য়েছে এবং সেখানি পরিচালনা ক'রছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাঙালী মহিলার এ প্রচেষ্টা অবশ্য নূতন নয়, কারণ ইতিপূর্বেই শ্রীমতী দেবিকারাণী বম্বে টকীজের প্রযোজক পদ অলংকৃতা ক'রে আসছেন, তবে বাঙলা দেশে শ্রীমতী প্রতিভাই হ'লেন প্রথম মহিলা-প্রযোজক। বম্বে এ বিষয়ে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, জগতের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা যায়। খুব কম ক'রে সেখানে এক ডজন মহিলা-প্রযোজক পাওয়া যায়। এমন কি হলিউডে কোন মহিলা চিত্রপ্রযোজনা কার্যে হস্তক্ষেপ করবার আগে বম্বেতে মমতাজ বেগম সে সম্মান অধিকার ক'রে নেন, আর কৃতিত্বেও কোন মহিলা-প্রযোজকই ব্যর্থ হন নি। সুতরাং শ্রীমতী প্রতিভা শাসমলের **সাফল্য আশা করা অযৌক্তিক হবে না।**

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীরাণী চন্দ প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মূল্য দুই টাকা।

কিছুদিন আগে 'ঘরোয়া' নামে একখানি বই লেখিকা প্রকাশ করেছেন, বইখানিতে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের কথা-বার্তা সংকলিত হয়েছে। এবার তাঁর 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হলো। বই দুখানি পরে পরে পড়ার পর লেখিকার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। অবনীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার ভঙ্গির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা দুখানি বইয়ে সেই সেই ভঙ্গি কি রকম স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে দেখতে পাবেন। লেখিকার স্মরণশক্তি ও বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি শ্রদ্ধার্হ।

বর্তমান বইখানির সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তিন দিক থেকে বলাই কর্তব্য। প্রথম গ্রন্থকর্ত্রী, দ্বিতীয় বিষয়বস্তু, শেষ ভাষা।

লেখিকা কবির আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রী এবং আশ্রমেই ঘরকন্না পেতেছেন, আবার রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগের সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে নিরবচ্ছিন্ন ছিলেন। কবির নানা সুখ দুঃখ, স্বচ্ছন্দে এঁদেরই কয়জনের নিরলস হস্ত ছিল সেবানিরত। কাজেই কবির মুখের কথা এই লেখিকার কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, তা অত্যুক্তি-প্রক্ষিপ্ত-রহিত। কাজেই অনন্যসাধারণ।

এর পর আসে বইয়ের বিষয়বস্তুর কথা। তা বড়ই বৈচিত্র্যময়। নানা ক্ষেত্রে, নানা প্রসঙ্গে গভীর ও হাল্কা ভাবের ছোট বড় কবির উক্তি-সমূহ এই বইয়ে সংগৃহীত। এক কথায় বলা চলে যেন এটি কবির গদ্য লেখার ছোট্ট একটি Anthology.

এই সব ছোট্ট ছোট্ট উক্তির মধ্য দিয়ে কবিকে এমন একটি সহজ অবস্থায় দেখতে পাই, যা অন্যত্র দুর্লভ। আবার এর মধ্যে রয়েছে অনেক গল্প ও কবিতার লেখার কারণ, গান, ছবি, সমাজ, স্বদেশ, নারী, পুরুষ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে কৌতূহলপ্রদ, জ্ঞাতব্য আলাপ-আলোচনা, যেগুলি অন্য কোন বই থেকে পাওয়া সহজে সম্ভবপর নয়।

বই-এর ভাষার বেলা দেখা যায়, কবি যা বলেছেন, লেখিকা শুনে পরে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন; কাজেই এর ভাষা রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ভাষা থেকে দল ছাড়া হয়ে পড়েনি। তবে লেখিকাকে স্মরণশক্তির ওপর চাপ দিয়ে লিখতে হয়েছে বলে দু-এক জায়গায় কোন কথা বাদ পড়েছে অথবা বেশি হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

এই সব লেখাগুলির মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছে কবির নানা সময়ের নানা ভাবের মূর্তি। এখানে লিপিকৌশল লেখিকার নিজস্ব। কয়েকটি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা গেল না, যেমন—'বেতের চেয়ারে বসে আছেন—কমলা রঙের জোব্বা গায়ে ধবধব করছে শাদা রেশমের মতো চুল দাড়ি'—'ইজিচেয়ারে পা লম্বা করে মেলে, গা এলিয়ে দিয়ে চুপ চাপ বসে আছেন'—'খাতা খুলে কলম হাতে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লাগলেন'—'ইজি চেয়ারে বসে আছেন, ডান হাতখানি কোলে এলানো, চেয়ারের হাতলের ওপর কনুই ভর দেওয়া, বাঁ হাতখানি থুৎনির নিচে, মৃদু মৃদু পা নাড়াতে নাড়াতে চোখ বুজে কি যেন ভাবছেন—চোখ বড় করে কপালে টান দিয়ে বললেন, বলে হো হো করে হেসে উঠলেন—থেকে থেকে কোলের ওপর রাখা ডান হাতের আঙুলগুলি নাড়ছেন' ইত্যাদি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চক্ষে দেখেছেন, তাঁরা এই বর্ণনাগুলির মধ্যেও তাঁকে দেখতে পাবেন।

মোটকথা, এই বইখানির বিশেষ অভিনবত্ব রয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকবর্গের বিশেষ প্রিয় হবে বলে আশা করি।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হয়। পাঠকবর্গকে পড়ার সময় একটু সতর্ক থাকতে হবে, যে রবীন্দ্রনাথ হাসি ঠাট্টায় বা রোগাক্রান্ত অবস্থায় যে সব কথা নিজের প্রতি লক্ষ্য করে বলে গেছেন, তার মধ্যে হয়তো পরস্পর বিরোধী ভাব থাকতে পারে, সেগুলিকে ধরে যেন সমগ্র কবি জীবনকে বিচার না করেন।

আফগানিস্থান—ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। পর্যটক প্রকাশনাভবন, ১৬৫, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ভূপর্যটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের লেখার পরিচয় দেওয়া বাঙলার পাঠক সমাজের নিকট অনাবশ্যক। তিনি প্রথিতযশা ব্যক্তি। আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। অন্য দেশের রাজনীতি এবং সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষায় দেশের বর্তমান অবস্থার উপর সুপণ্ডিত গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকখানায় যে আলোকসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রেরণাকে পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে। সার্বভৌম মানব-বেদনার একটা উদার অনুভূতি তাঁহার লেখার প্রধান বিশেষত্ব। এমন দেখিবার শক্তি সকলের নাই। আফগানিস্থানের উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব, বাঙলার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন-ধারার সঙ্গে তাহার যোগাযোগের অনেক কথা এই পুস্তক পাঠে জানা যায়। বাঙালী মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে কাবুলের রাজপথে বিশ্বাস মহাশয়ের পরিচয় এবং তাহার জীবনের কাহিনী উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয়। এমন পুস্তক ঘরে ঘরে আদৃত হইবে, একথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি এবং সকলকেই এমন পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশ্বাস মহাশয়ের অভিজ্ঞতা দেশের বর্তমান দুর্গতি দূর করিবার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে আমাদের এই আশা।

চলার পথে—উপন্যাস। শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। বাঙলার কথা এবং আলোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। ভিক্টোরিয়া জাহাজের যাত্রী বাঙালীর ছেলে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অরুণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগিণী যুগোশ্লাভ তরুণী ঈভার আকস্মিক মিলন এবং তাহাদের প্রণয়-লীলার পটভূমিকায় উপন্যাসখানা পরিকল্পিত হইয়াছে। লেখকের সুদক্ষ রসপরিবেশন কৌশলের সঙ্গে ইউরোপ ও ভারতের সংস্কৃতির মর্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অভিব্যক্তির ভঙ্গীটি বেশ সুন্দর হইয়াছে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তটি মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

বিলাতে বাঙ্গালী—প্রতাপচন্দ্র দত্ত, বি-এ, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রণেতা। প্রকাশক—জে সি দত্ত, ১২১নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

স্বর্গীয় গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ইউরোপের কতিপয় দেশ আমাদের দেশের একজন মধ্যবিত্তবংশসম্ভূতা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলার মনে কিরূপ লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ও কর্ণের ভিতর দিয়া তাঁহার মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারা তথায় কিরূপ আঁচড় কাটিল তাহা ব্যক্ত করা। আমাদের দুইজনের মধ্যে এই সর্তে এ কার্য আমরা আরম্ভ করি যে, আমার স্ত্রী দেখিবেন, শুনিবেন, মনে রেখা অঙ্কিত করিবেন আর আমি লিখিব।" সুতরাং বলিতে গেলে গ্রন্থকারের সহধর্মিণীর বিবৃতি অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয়া তরুলতা দেবী স্বর্গীয় গ্রন্থকারের সহধর্মিণী। আমরা এই গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া পরলোকগতা এই মহিলার মনস্বিতা, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম এবং মানবধর্ম বিশ্লেষণে তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। ৪৯১ পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমুদ্র যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আয়ার্লাণ্ড প্রভৃতি দেশের বহুস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রদ্ধেয়া তরুলতা দেবী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তৎসম্বন্ধে ইহাতে বর্ণনা আছে। ভাষা সরল, মধুর ও চিত্তাকর্ষক এবং সে বর্ণনা-ভঙ্গী সর্বত্র মনীষার আলোকে উদ্দীপ্ত, ইহাই হইল বিশেষত্ব। পুস্তকের উপসংহারভাগে "ইহারা ও আমরা" শীর্ষক যে আলোচনা আছে, তাহা অধীন জাতি আমাদের সত্যানুসন্ধানের অনেক উপকরণ যোগাইবে এবং আমরা আমাদের অধোগতির কারণ উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পথে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে অনেক আলোক পাইব। সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সকল দিক হইতে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এমন সুন্দর আলোচনা বাঙলা ভাষায় আমরা খুব কমই পড়িয়াছি। পুস্তকখানা পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন। প্রত্যেকেই অনেক নূতন বিষয় জানিতে এবং বুঝিতে পারিবেন। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হওয়া কর্তব্য এবং প্রত্যেক পুস্তকাগারে এমন পুস্তক থাকা উচিত।
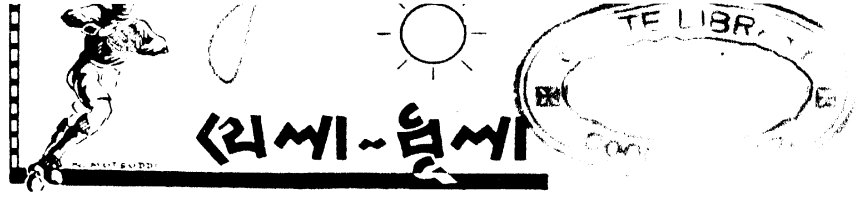
রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলার দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বাঙলা দলকে বিহার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই পর্যন্ত যতবার বাঙলার দল বিহার দলের সহিত মিলিত হইয়াছে, ততবারই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। গত বৎসর খুব অল্পের জন্যই বাঙলার সেই পূর্বার্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। বিহার দল এই বৎসর গত বৎসর অপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়াছে। সেইজন্য বাঙলা দল গঠন ব্যাপারটি বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণকে বিশেষ চিন্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙলার সম্মান কিরূপে বজায় থাকে, তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই পর্যন্ত খেলোয়াড় বাছাই পর্ব শেষ হয় নাই। ১২ই ডিসেম্বর খেলা আরম্ভ হইবে। অথচ এখনও পর্যন্ত ট্রায়াল ম্যাচ বা বাছাই খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সম্প্রতি একটা খেলা হইয়াছে। এই খেলায় যে সকল খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে এগারজনকে দলভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র কার্তিক বসু ব্যতীত কোন খেলোয়াড়ই ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অপর সকল খেলোয়াড়েরই খেলা অতি সাধারণ শ্রেণীর হইয়াছে। ডাঃ সাধু ও জব্বর খেলায় দৃঢ়তা দেখাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দলের রাণ তোলা বিষয়ে ইঁহাদের সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইবে না। বোলারের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে। দ্রুত বল করিতে পারেন, এইরূপ একটি বোলার নাই। দেবরাজ-পুরী যদি আসিয়া এই দলে যোগদান না করেন, তবে এই অভাব অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এস দত্ত ও এন চ্যাটার্জি—এই দুইজনকে দলভুক্ত করা যাইতে পারে। ফিল্ডিং বিষয়ে বাঙলার দল চিরকাল দুর্নামের ভাগী হয়। এই বৎসর তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। উইকেটরক্ষক হিসাবে টেম্পলিন বেশ ভাল। তবে ব্যাটিং বিষয়ে তিনি সুবিধা করিতে পারিবেন না। এই বিভাগে এ দেবকেই দলভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে।

রেঞ্জার্স ক্লাবের জি নিশ ব্যাটিং ভালই করিতেছেন। এই খেলোয়াড়টিকে ব্যাটিং করিবার জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। হার্ভি জনস্টন, গ্রিণ প্রভৃতি খেলোয়াড়দের অপেক্ষা ইনি যথেষ্ট ভাল। শীঘ্রই দ্বিতীয় ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হইবে। সুতরাং বর্তমানে বাঙলার দল কোন্ কোন্ খেলোয়াড় লইয়া গঠিত হইলে ভাল হইবে, তাহার উল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম। তবে এই কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বাঙলা দল এই বৎসর বিহার দলের বিরুদ্ধে সুবিধা করিতে পারিবে না। যতই ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হউক না কেন, বিহার দলের ন্যায় শক্তিশালী দল বাঙলার পরিচালকগণ গঠন করিতে পারিবেন না।

লাহোরে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

লাহোরে যুদ্ধভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে একটি দর্শনযোগ্য ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল গভর্নরের দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গভর্নরের পক্ষে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্যাপ্টেন ডি আর জার্ডিন, পাতিয়ালার মহারাজা, পতৌদির নবাব, আমীর ইলাহি নিশার, অমরনাথ, নাজির আলী প্রভৃতি বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। অপরপক্ষে ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, রামপ্রকাশ, দালজিন্দারসিং, বালিন্দু শা, মুণিলাল, চুণিলাল প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। গভর্নরের দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রকাশিত হইলে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সমানে লড়িয়া খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে। তরুণ খেলোয়াড় চুণিলাল বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অপর তরুণ খেলোয়াড় জগদীশলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম ইনিংসে ১১০ রাণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৫৮ রাণ করিয়া আউট হন। চুণিলাল গভর্নরের প্রথম ইনিংসে ১০২ রাণে ২টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রাণে ৮টি উইকেট পতন সম্ভব করিয়াছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সমানে ৩০ ওভার বল করেন।

গভর্নরের পক্ষে অমরনাথ প্রথম ইনিংসে ২০৯ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। এই সময় জার্ডিনও ৬৭ রাণ করিয়া নট আউট ছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পতৌদির নবাব খেলায় যোগদান করিয়া ১০৯ রাণ করেন। তিনি উক্ত রাণ করিতে ১৬০ মিনিট লইয়াছেন। উক্ত রাণসংখ্যার মধ্যে ১৫টি বাউণ্ডারী করেন। পতৌদির নবাবের খেলা বেশ দর্শনযোগ্য হয়।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গভর্নরের দল প্রথম খেলা আরম্ভ করে। সমস্ত দিন খেলিয়া ৪ উইকেটে ৩৭৫ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। অমরনাথ ২০৯ রাণ ও জার্ডিন ৬৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলা আরম্ভ করে; ২ উইকেটে ১২৪ রাণ হয়। ইহার পর জগদীশলাল, দালজিন্দার সিংহ রাণ তুলিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫ মিনিট খেলিয়া জগদীশলাল নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইনিংস ৩৬৬ রাণে শেষ হয়। তৃতীয় দিনে গভর্নরের দল পুনরায় খেলা আরম্ভ করে। চা পানের অল্প পরেই গভর্নরের দল সকলে ২৪৫ রাণ করিয়া আউট হইয়া যায়। পতৌদির নবাব ১০৯ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পাতিয়ালার মহারাজা ৩৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৩৭ রাণ করিতে সক্ষম হয়। ফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল ঃ—

গভর্নরের দল ১ম ইনিংস ঃ—৪ উইঃ ৩৭৮ রাণ

(অমরনাথ নট আউট ২০৯, ডি ক্রাউডেন নট আউট ৬৭, পাতিয়ালার মহারাজা ৩৯, দিলওয়ার হোসেন ২১; চুণিলাল ১০২ রাণে ২টি, জাহাঙ্গীর খাঁ ৬৯ রাণে ১টি ও হাফিজ ৬১ রাণে ১টি উইকেট পান)।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১ম ইনিংস ৩৬৬ রাণ

(জগদীশলাল ১১০, দালজিন্দারসিং ৭০, চুণিলাল নট আউট ৩০, মহম্মদ নাজির ৩১, আমীর ইলাহি ১৭ রাণে ৫টি, নিশার ৯২ রাণে ১টি, অমরনাথ ৫৪ রাণে ১টি, কিদা ২৫ রাণে ১টি ও বদরুদ্দিন ৫৪ রাণে একটি উইকেট পান)।

গভর্নরের দল ২য় ইনিংস ঃ—২৪৫ রাণ

(পতৌদির নবাব ১০৯ রাণ, দিলওয়ার হোসেন ৩৪, পাতিয়ালার মহারাজা নট আউট ৩৬; চুণিলাল ১১২ রাণে ৮টি, জাহাঙ্গীর খাঁ ৫১ রাণে ২টি উইকেট পান)।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ২য় ইনিংস ঃ—৪ উইঃ ১৩৭ রাণ

(জগদীশলাল ৫৮, মতিলাল ৩৫, দালজিন্দারসিং ২৪; অমরনাথ ১৪ রাণে ১টি, আমীর ইলাহি ৫০ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

(খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ)

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

জামনগরে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একটি খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় নবনগর দলের সহিত পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নবনগর দল ৮ উইকেটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে।

নবনগর দল প্রথমে খেলা আরম্ভ করে ও ২২৫ রাণে ইনিংস শেষ করে। পশ্চিম ভারত দলের জে ওঝা ৯৩ রাণে ৫টি উইকেট দখল করেন। পরে পশ্চিম ভারত রাজ্য দল খেলা আরম্ভ করে ও দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত খেলিয়া ৩৪৯ রাণে ইনিংস শেষ করে। পৃথ্বিরাজ ১০৯ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরে নবনগর দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও ২০৭ রাণে ইনিংস শেষ করে। পশ্চিম ভারত দলের কিষেণচাঁদ ৬৯ রাণে ৫টি উইকেট পান। পশ্চিম ভারত দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া ২ উইকেটে ৮৪ রাণ করিতে সক্ষম হয়। ফলে নবনগর দল ৮ উইকেটে পরাজিত হয়। খেলার ফলাফল ঃ—

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ঃ—১ম ইনিংস ৩৪৯ রাণ

২য় ইনিংস ২ উইকেটে ৮৪ রাণ

নবনগর দল ঃ—১ম ইনিংস ২২৫ রাণ

২য় ইনিংস ২০৭ রাণ

টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ল্যাংটন

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলোয়াড় এ বি সি ল্যাংটন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ্যাল দলের খেলোয়াড়। ১৯১২ সালে ২রা মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাটিং বোলিং উভয় বিষয়েই তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড দল দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলিতে গেলে তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্ট খেলাতেই অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ৬৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি ৫টি টেস্ট খেলায় মোট ২১৯ ওভার বল দিয়া ৩৭টি মেডেন প্ ও ১৩টি উইকেটের পতন সম্ভব করেন। তাঁহার ন্যায় উৎসাহী ও তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হারাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বিশেষ ক্ষতি হইল।

জাতীয় খেলাধূলায় বাঙলার বালিকাগণ

জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ গত বৎসর হইতে জাতীয় খেলাধূলায় বাঙলার বালিকাগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা যে কিছু ফলবতী হইয়াছে, তাহার প্রমাণ জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত এ্যালফা এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশনের পরিচালিত বালিকাদের গাদী লীগ প্রতিযোগিতার খেলা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক দল গ্রহণ করা হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রতিদিন এই প্রতিযোগিতার খেলা দেখিবার জন্য যেরূপ বালিকাদের ভীড় পরিলক্ষিত হইতেছে ইতিপূর্বে বালিকাদের কোন অনুষ্ঠানে এরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। যোগদানকারী বালিকাগণও এই বিপুল বালিকাদের সম্মেলনের সম্মুখে খেলা দেখাইবার উৎসাহে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। প্রত্যেক দিনের খেলায় সেই জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব হইতেছে না। এই অনুষ্ঠানের পর এই ধরণের যদি কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, যোগদানকারী দলের সংখ্যা কল্পনাতীত হইবে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করিতে আসিয়া বালিকাগণের উৎসাহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি এইরূপ দেখিবেন বলিয়া আশাই করেন নাই। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "জাতীয় খেলাধূলায় যোগদান করিলে জাতীয় মনোভাবাপন্ন হইবে।" ইহা সত্য হইলেও জাতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ এই উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। এই সঙ্ঘ জাতীয় খেলাধূলা বৈদেশিক খেলাধূলার সমান অধিকার লাভ করুক, দেশবাসী জাতীয় খেলাধূলায় দলে দলে যোগদান করুন, জাতীয় খেলাধূলার উন্নতি হউক, এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য করিতেছেন। প্রত্যেক দেশের খেলাধূলার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এইরূপ একটি সঙ্ঘের প্রচেষ্টার ফলেই ঐ দেশের খেলাধূলা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলে জাতীয় খেলাধূলার দিকে দৃষ্টি না দিলে ইহাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে নাই। এই জন্যই ইহাদের বালিকাদের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। আরও অনেক প্রতিযোগিতা বালিকাদের জন্য অনুষ্ঠিত হইবে। **বাঙলার বালিকাগণ এই সকল প্রতিযোগিতায় দলে দলে যোগদান করিয়া দেশের অনাদৃত খেলাধূলার উন্নতিতে সাহায্য করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।**

২৫শে নভেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—বিহারের চম্পারণ জেলায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যাইয়া পুলিশকে একদল লোকের সহিত লড়াই করিতে হয়। পুলিশের গুলীতে বহু লোক আহত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের মাণ্ডবীর খত্রেক বাজারে একটি ঘরে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

পাইকারী জরিমানা—যশোহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে বাসুদিয়া বাজারের অধিবাসীদের উপর ২ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার বিশ্বনাথ বাজারের অধিবাসীদের উপর পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। শিবসাগর জেলার কয়েকটি গ্রামের উপর ২২ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে আলিপুর ও ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কাঁথির সংবাদে প্রকাশ, রামনগর থানার ১০নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে গত ২৩শে নভেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ১৬ই অক্টোবরের বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় তাহার পরিবারের ২১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

২৬শে নভেম্বর

শিবসাগরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই নভেম্বর ফুরকাটিং ও শারজী রেল ষ্টেশনের মধ্যে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে দশজন লোক মারা গিয়াছে ও ৪০ জন লোক আহত হইয়াছে। আজ আসাম পরিষদের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কর্তৃক এই তথ্য প্রকাশিত হয়। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, রেললাইনের অনিষ্ট সাধনের ফলে এঞ্জিন সহ সাতখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়াছিল।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পদত্যাগের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয় কংগ্রেস (বাতিল) এসেম্বলী পার্টির অভিমত জ্ঞাপন করিয়া জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হকের নিকট এক মেমোরেণ্ডাম দাখিল করিয়াছেন। মেমোরেণ্ডামে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পাইকারী জরিমানা ধার্য, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহে সাহায্য কার্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নীতির কিছুরূপ পরিবর্তন না হইলে স্বাক্ষরকারীদ্বয়ের পক্ষে তাহাদের পদে থাকা একরূপ অসম্ভব।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—পুণার সংবাদে প্রকাশ, তালেগাঁও পোস্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। সুরাটের খবরে প্রকাশ, ভগতালাও পোস্ট অফিসে একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে।

বাঙলার দৈনিক ভারত পত্রিকার ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনকে কলিকাতায় ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৭শে নভেম্বর

বাঙলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন—কেশপুর (মেদিনীপুর) এর সংবাদে প্রকাশ, গত ১৮ই নভেম্বর শালবনী থানার এলাকাধীন পিড়াকাটা গ্রামের ডাক বাংলো এবং পোস্ট অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল। পরদিন গোদাপিয়াশাল সাব পোস্ট অফিসও ভস্মীভূত হইয়াছে। গত ২০শে নভেম্বর তীর, ধনুক, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রায় চারিশত লোক কেশপুর থানায় হানা দিয়া থানার সমুদয় রেকর্ডপত্র এবং আসবাবাদি পোড়াইয়া ফেলে। কেলেপুরের ডাক বাংলো এবং পোস্ট অফিসও ভস্মীভূত হয়।

২৮শে নভেম্বর

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক ট্রেণ ডাকাতিতে ৮১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত ও একজন লোক নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জের দুইটি পাটের অফিসের কয়েকজন দ্বারোয়ান কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী সহ ট্রেণযোগে টাকা লইয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার পর ট্রেণখানি ঢাকা হইতে ৪৫ মাইল দূরে নরসিংদী ও দৌলতকান্দীর মধ্যবর্তী স্থানে অতিক্রমকালে একদল ডাকাত সশস্ত্র প্রহরীদিগকে আক্রমণ করে। একজন প্রহরী সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়, অপর একজন ছোরার আঘাতে আহত হয়। আততায়ীগণ শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়া টাকার থলিয়া সহ সরিয়া পড়ে। থলিয়াতে ৮১ হাজার টাকা ছিল।

ভারতের নিজে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গভর্ণমেণ্ট নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিকদের এক বিরাট সভা হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৯শে নভেম্বর

গত শনিবার শেষ রাত্রে উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত বোস্টন শহরের "কোকোনাট গ্রোভ নাইট ক্লাবে" এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪৬৩ জন প্রমোদ বিলাসী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন দুইশত জনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ক্লাব গৃহটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। কি কারণে আগুন লাগিয়াছিল, এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন, ইলেকট্রিকের তার জ্বলিয়া যাওয়ায় অগ্নিকাণ্ড হয়। কেহ আবার বলিতেছেন,—জ্বলন্ত সিগারেটে এই অগ্নিকাণ্ড হয়।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সাল: Saturday, 12th December, 1942 [৫ম সংখ্যা
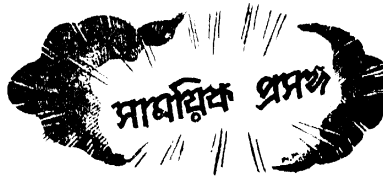
পরলোকে স্যার মন্মথনাথ—

গত ২০শে অগ্রহায়ণ রবিবার স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। স্যার মন্মথনাথের পরলোকগমনে বর্তমানে বাঙলার মনীষিমণ্ডলের যে ক্ষতি ঘটিল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। স্যার মন্মথনাথ প্রতিভাবান ব্যবহারবিদ্ ছিলেন এবং সেই প্রতিভার প্রাখর্য প্রভাবে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং সাময়িকভাবে ভারত সরকারের আইন-সচিবের পদও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তিনি মনীষী ছিলেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশের সংস্কৃতি তাঁহার জীবনে এবং আচরণে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ইহাই স্যার মন্মথনাথের সবন্ধে সব কথা নয়; স্বদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় মর্যাদাবুদ্ধি তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। এই মর্যাদাবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সমাজ-সেবার পথে স্যার মন্মথনাথের সাধনা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু মহাসভার নেতাস্বরূপেই বাঙলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ ঘটে। রাজনীতিক মতবাদে তিনি মডারেট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই মডারেট রাজনীতিক মতবাদ পরানুগ্রহ প্রত্যাশাকেই বড় বলিয়া বুঝে নাই। হিন্দু সমাজের সেবার পথে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি এবং তেজস্বিতার মহিমায় তাহা জ্বলন্ত হইয়া উঠে। হিন্দু সমাজের সেবায় স্যার মন্মথনাথ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই সেবার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। অপক্ষপাত ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের উপর জোর দিতে গিয়াই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে তাঁহার সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষে তিনি কোন দিন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সেই আদর্শনিষ্ঠার বলে তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দু সমাজের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন মানুষের মত মানুষকে হারাইল। সমগ্র জাতির সঙ্গে যোগ দিয়া আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মেদিনীপুরে সেবাকার্য

মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য পরিচালনা করা দেশবাসীর সম্মুখে এখনও প্রধান কর্তব্য রহিয়াছে। কিছুদিন হইল মেদিনীপুর বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীদিগকে দলে দলে কলিকাতা শহরের রাজপথে দেখা

যাইতেছে। ইহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, এই শীতের দিনে গা ঢাকিবার উপযুক্ত আবরণ নাই। ইহারা সমস্ত দিন ঘুরিয়া ভিক্ষায়ে জীবনধারণ করে, রাত্রিতে শহরের ফুটপাতে পড়িয়া থাকে। সকলে অবশ্য দেশ হইতে শহরে আসিতে পারে নাই; কারণ আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্বল নাই। ইহা হইতেই মেদিনীপুরের দুর্গত জনগণের অবস্থার কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। মানুষ যে, মানুষের এমন দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। মানবতার দিক হইতে আমরা দেশবাসীদিগকে, বিশেষভাবে বাঙলার যুবকদিগকে দুর্গতের সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। সম্প্রতি বাঙলা সরকার মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা সেবাকার্যের সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। মেদিনীপুরে এই সাহায্য কার্যে তথাকার সরকারী কর্মচারীদের দিক হইতে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিয়াছিল, সরকার প্রথমেই সেই অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন,—"গভর্নমেণ্ট দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ মন্তব্যেই সরকারী কর্মচারীদিগকে যেরূপ অবস্থায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কাজ করিতে হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই অভূতপূর্ব সমস্যার সমাধানকল্পে স্থানীয় কর্মচারিগণ যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, দুর্গত জন-গণের সাহায্য কার্যই এ ক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই কর্তব্য প্রতিপালনেই যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারের অর্থসচিব-স্বরূপে এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, দেশের লোক তাহা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করিতে পারে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবৃতি প্রসঙ্গে রাজস্বসচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৬শে কার্তিক একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, যত সত্বর সাহায্যকার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল এই ক্ষেত্রে তত সত্বর তাহা করা সম্ভব হয় নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে সত্য। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরে জেলার রাজ-নীতিক অশান্তির কথা উল্লেখ করিয়া রাজস্বসচিব বলেন, এজন্য পুলিশ প্রহরী ব্যতীত কোন কোন এলাকায় রাজকর্মচারীদিগের নিরাপদে কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য সরকারী বিবৃতিতেও দেখিতেছি সেই কথার উপরই বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। রাজনীতিক অশান্তিজনিত প্রতিবন্ধকতার কথা স্বীকার করিলেও বিপন্ন জনগণের সাহায্য সম্পর্কে কর্তব্য লঘু হয় না। কারণ সেজন্য দুর্গত জনগণের সকলকে দায়ী করা যায় না; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সরকারের কর্তব্যও থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রেস্টিজের উপর বেশী জোর না দিয়া অশান্তির আবহাওয়া কাটিয়া গিয়া জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিশ্বস্তির ভাব জাগে এরূপ নীতি অবলম্বন করাই সরকারের কর্তব্য। সরকার রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ একতরফাভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যতই জোর দিয়া কথা বলুন না কেন, অভিযোগ খণ্ডনের প্রকৃত পথ ইহা নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার যদি জন-সাধারণের অভিযোগ যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে না চাহেন, তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বস্তির ভাব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সব কর্মচারীদের কার্য সম্বন্ধে সরকারের তদন্ত করা উচিত। মোটের উপর মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িতদের সাহায্য-কার্যে প্রতিবন্ধকতা যাহাতে সৃষ্টি না হয়, এই প্রশ্নই আমাদের পক্ষে বড় প্রশ্ন, সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতার বিচার আমরা সেই দিক হইতেই করিব।

ভারতের একত্ব—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে বাঙলা দেশের মাননীয় অতিথিস্বরূপে সমাগত স্যার মির্জা ইসমাইলকে যেভাবে আপ্যায়িত করা হইয়াছে তাহার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, ঢাকার মুসলিম ছাত্র সমাজকে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট লজ্জায় অধোবদন হইতে হইবে। স্যার মির্জা ইসমাইল একজন চিন্তাশীল মনীষী বলিয়া সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি রাজনীতিক নহেন এবং রাজনীতি চর্চা করিবার জন্যও বাঙলা দেশে তিনি আসেন নাই। সংস্কৃতির কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেই তাঁহার বক্তব্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা তাঁহাকে সমাদর করিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সংস্কৃতির মর্যাদা, আতিথেয়তার কর্তব্য—সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে পড়িয়া এ সবগুলি জলাঞ্জলি দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টিতে প্রকাশ্যভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সাহায্যই করিয়াছিলেন। ঢাকা শহরে বাঙলার মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা সম্পর্কে ইহার পূর্বে ছাত্র-সমাজে যে-সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, আলোচ্য ব্যাপারের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না। মন্ত্রীদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে; সে ক্ষেত্রে অপ্রিয় সমালোচনা বা আচরণ এড়ান সম্ভব নয়; কিন্তু স্যার মির্জা ইসমাইলের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্কই ছিল না। আর শুধু ছাত্রেরাই যে তাঁহার অভ্যর্থনা বর্জন করে, ইহাই নয়, তাঁহার প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন, সাক্ষাৎ সম্পর্কে যাহাদের কর্তব্য ছিল, তাঁহারাও নিতান্ত নির্লজ্জভাবে সে কর্তব্য লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র বাঙলার লজ্জার ভারই বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান অধ্যাপকগণ পর্যন্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া মুসলমান ছাত্রদের অসংগত আচরণেরই অনুসরণ করিয়া-ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব হইতে স্যার মির্জা ইসমাইলকে সম্বর্ধনার জন্য আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সভাপতি ডাঃ সহীদুল্লা তাহাতে অনুপস্থিত থাকেন, ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ সফিউল্লাও অতিথিকে আসিয়া অভ্যর্থনা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় নিমন্ত্রণ করিবারই বা কি উদ্দেশ্য ছিল বুঝা যায় না।

স্যার মির্জা ইসমাইল অবশ্য সম্মানের প্রত্যাশী নহেন; কিন্তু যে সত্যকে তিনি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাও কি তাঁহার নাই? আতিথেয়তার পবিত্র আদর্শকে যাঁহারা এইভাবে পদদলিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিন্দাকারীদের প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে পুষ্প উপহার প্রদান করিয়া তিনি নিজের মহিমাকেই উজ্জ্বলতর করিয়াছেন এবং সংস্কৃতির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

স্যার মির্জার আদর্শ—

সংস্কৃতি, সভ্যতা বা শিক্ষা আমরা যে জন্য লাভ করি, তাহার উদ্দেশ্য কি? তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই দ্বেষ-বিদ্বেষ নয় বা মারামারি কাটাকাটি নয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির সূত্রে জীবনে একটি সুব্যবস্থিত সঙ্গতি লাভই তাহার উদ্দেশ্য। পশু হইতে মানুষের বিশেষত্ব হইল এই সৌহার্দ্য এবং প্রীতির বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিতে। স্যার মির্জা মহম্মদ ইসমাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এই সংস্কৃতির মর্মকথা বিশ্লেষণ করেন। তিনি ভেদ-বিভেদ বাড়াইবার কথা বলিতে পারেন নাই। দেখা যাইতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের মতে ইহাই হইতেছে তাঁহার পক্ষে প্রধান অপরাধ। স্যার মির্জা ইসমাইলের প্রধান অপরাধ হইয়াছে এই যে, ক্ষুদ্র স্বার্থ যেখানে মানুষের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে নাই, ধর্মের নামে কুসংস্কার মানুষের মনকে আজ অনেক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বর্বরতা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাহা হইতে মুক্ত করিয়া মনে যেখানে আনিয়াছে উদার আত্মীয়তার অনুভূতি, তিনি সেই আদর্শকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ঢাকার ছাত্রগণের দুর্ভাগ্য তাঁহারা এমন আদর্শের আদর করিতে পারে নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ তাহারা লাভ করে নাই কিংবা কুশিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা অসংস্কৃত মনোবৃত্তির উপর অনায়াসেই প্রভাব বিস্তার করে এবং কর্তব্যবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া থাকে। দীর্ঘ পরাধীনতার মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের গ্লানি আমাদের জাতীয় জীবনে কতটা দৃঢ় হইয়া গিয়াছে এই ব্যাপারেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রসমাজ সব দেশেই সাধারণত উন্নতিশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র স্বার্থের ঘুণ তাঁহাদের মনে ধরে না। এইদিক হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আচরণ বিস্ময়কর এবং মুসলমান অধ্যাপকদের আচরণ লজ্জাজনক হইয়াছে। কিন্তু আমরা হতাশ হইব না। দেশের স্বাধীনতার বিরোধীদের কৌশল যতই মোহময় হউক, নতুন যুগের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না এবং অচিরে এমন সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতার গ্লানি হইতে বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তরুণদের চিত্ত মুক্ত হইয়া মানবাধিকার লাভের পথেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব—

দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই; একথাটা শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারত সরকারের যান-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল সেদিনও বেতার-বার্তাযোগে এই কথা প্রচার করিয়াছেন। খাদ্যের অভাব নাই, তবে খাদ্যদ্রব্যের এমন মহার্ঘতা কেন এবং কোন কোন জিনিস কেন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে? আমাদের বাঙলা দেশের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্তারা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ এই কথাই শুনাইয়া আসিতেছেন যে, মালগাড়ির অভাব ইহার প্রধান কারণ। বিহারে চিনি যথেষ্ট আছে, কিন্তু গাড়ি পাওয়া যায় না; লবণ যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আনিবার উপযুক্ত গাড়ি নাই; আলু আছে পর্যাপ্ত কিন্তু গাড়ি পাওয়া যাইতেছে না। চাউলের সম্বন্ধেও নাকি এই মালগাড়ির সমস্যাই প্রধান সমস্যা। কিন্তু বেন্থল সাহেব বলিয়াছেন, গাড়ির অভাবের কথা একটা ছুতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে গাড়ির অভাব ঘটিতে দেওয়া হইতেছে না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, 'দেশে অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেরই কোন অভাব নাই এবং এই সব খাদ্যদ্রব্য চালান দিবার জন্য গাড়ি চাওয়া হইলে অন্য কাজ ফেলিয়া সেই কাজেই গাড়ি আগে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কেহ যেন কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। লোকের খাদ্যের প্রশ্ন সব চেয়ে জরুরী প্রশ্ন এবং যখনই খাদ্য চালান দেওয়া দরকার হইবে, তখনই গাড়িও দেওয়া হইবে।' স্যার এডওয়ার্ড এই সঙ্গে আরও বলেন যে, গাড়ির অভাবে খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘতা ঘটে নাই, লাভখোর প্রবৃত্তি, ভবিষ্যতের আশঙ্কা প্রভৃতি কারণে খাদ্যদ্রব্য বিলি ব্যবস্থাতে দোষ ঘটিতেছে। সমস্যার মূল কারণ হইল ইহাই। এই সমস্যার তত্ত্বকথা লইয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না; কারণ তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বা মহার্ঘতা কিছু-মাত্রই হ্রাস পাইতেছে না। অন্নাভাব সত্য হইয়াই উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে চুরি ডাকাতি প্রভৃতিও অনিবার্য কারণেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল খাদ্যদ্রব্যের সমস্যার দায়িত্ব মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপর ষোল আনা চাপাইয়াছেন। দেশে খাদ্যের অভাব নাই, খাদ্যসরবরাহের গাড়িরও অভাব নাই, তবু খাদ্যাভাব কেন সত্য এবং নিত্য এ রহস্যের সমাধান তাঁহারাই করুন, দেশের লোকে ইহাই চায়।

চার্চিলের আদর্শ—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ব্রাডফোর্ডের টাউন হলে বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় চার্চিলী ঢং অর্থাৎ ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ সুপরিস্ফুট। চার্চিল বলিয়াছেন,—"রুশিয়া তাহাদের জন্মভূমি রক্ষা করিতেছে, আমরাও অবশ্য আমাদের জন্মভূমি রক্ষা করিতেছি; কিন্তু আমরা সকলে মিলিয়া আরও কিছু রক্ষা করিতেছি, যাহা দেশের চেয়ে

প্রিয়তর না হইলেও মহত্তর। ইহাই হইল আমাদের সমরাদর্শ। সে আদর্শ স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের। সে আদর্শ হইল প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বলকে-সমর্থন, তাহা হইল হিংসার বিরুদ্ধে নীতির, পাশবিকতার ও বর্বরতার বিরুদ্ধে দয়া ও সহিষ্ণুতার পক্ষ অবলম্বন।" কথাগুলি খুব বড় বড় সন্দেহ নাই; কিন্তু কথার ভোজবাজীরও একটা সীমা আছে। সে সীমা তিনি যে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি চার্চিলের অন্তত তাহা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। স্বাধীনতা তাঁহাদের সংগ্রামের আদর্শ—ন্যায় বিচার, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা, প্রেম, মৈত্রী এ সব বড় বড় তত্ত্বের মধ্যে যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই; কিন্তু স্বাধীনতার সেই আদর্শেই চার্চিলী দলের আন্তরিকতা কতখানি, তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত নীতির ভিতরেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার মতলব বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নাই, চার্চিল সাহেবের দেশের লোকেরা পর্যন্ত স্পষ্টভাষায় এমন কথা বলিতেছেন। চার্চিল সেদিন নিজেও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবার গুটাইবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। উহার পর চার্চিল সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য লর্ড ক্র্যানবোর্নের মুখেও আমরা শুনিয়াছি- "বৃটিশের উপনিবেশ সাম্রাজ্য নির্দিষ্ট পথে সুপরিচালিত হইতেছে। কোন কোন দেশের উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হইয়াছে, আর কোন কোন দেশ খুব ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যতদিন বৃটিশের অধীনে এই সকল দেশে আশানুরূপ উন্নতি, রাজনীতিক জ্ঞান, ঐক্য, শান্তি দেখা না দেয়, ততদিন বৃটিশ কোনমতেই ঐ সব দেশের সম্পর্কে তাহাদের পবিত্র কর্তব্য পরিত্যাগ করিবে না।" বৃটিশের স্বাধীনতার আদর্শের স্বরূপ হইল অপর দেশের উপর তাহাদের এই মুরুব্বিয়ানা মহিমা-তৃপ্তিতে। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে দেশের লোকের কোন অধিকার নাই। সে ক্ষেত্রে তাহাদের বিচারবুদ্ধির কোনই মূল্য বৃটিশের কাছে নাই। কে কোন্ দিন স্বাধীনতা পাইবে তাহার বিচার করিবে বৃটিশ। বলা বাহুল্য, ভারত সম্পর্কে বৃটিশের নীতি এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছে এবং আরও কতদিন চলিবে হিসাব করিয়া বলা কঠিন। আপাতত বৃটিশের আশানুরূপ পথে ৪০ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সঞ্চালিত হইতেছে। ভারতের প্রতি ব্রিটিশের সে গুরুতর কর্তব্যভার প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ন সাহেবকে নাকি ভারতের বড়লাট করিয়া পাঠান হইতেছে। একথা সত্য হইলে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের এ নির্বাচন উপযুক্তই হইয়াছে। বৃটিশের সমরাদর্শস্বরূপে বিজ্ঞাপিত মানব স্বাধীনতার সঙ্গে এমন মতিগতির সঙ্গতির কথা নিতান্ত মূর্খেরাই তুলিবে।

উইলকীর ইঙ্গিত—

সমরাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য সম্প্রতি ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ বিশেষ রকমে ব্রতী হইয়াছেন। কিছুদিন আগে মিঃ এডেন এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন; তার পর লর্ড ক্র্যানবোর্ন ও লর্ড হেলিফাক্স মিঃ চার্চিলের বক্তৃতাও শুনা গেল। ব্যর্থ বাগাড়ম্বরের আড়ালে চার্চিলী দল ঘুরাইয় ফিরাইয়া এই কথাই বলিতেছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বাধীনতার আয়তন; সুতরাং যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বজায় রাখা হইবে; সেজন্য তোমরা কেহ, বিশেষভাবে ব্রিটিশের মার্কিন বন্ধুর দল, কোন রকম ভিন্ন সুর তুলও না। অপরপক্ষে মার্কিনের জনমত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। মার্কিন গভর্নমেণ্ট সোজাসুজি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিবাদে সুর এখনও তুলেন নাই; একথা ঠিক; কিন্তু মার্কিন জনমত নানাভবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতিগতির প্রতি সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী সেদিন চিকাগো শহরের 'ক্রিশ্চান এডভোকেট' পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন, "মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে যুক্তভাবে তাঁহাদের সমরাদর্শ সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করা উচিত। যাঁহারা এখনও এইরূপ ধারণা লইয়া চলিতেছেন যে, ভগবানের অনুগৃহীত অভিভাবকস্বরূপে তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ জাতি হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বোঝা বহন করিবেন কিংবা যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদীর গদীতে নিজেরা পুনরায় গিয়া বসিবেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ঐরূপ বিশ্বাসে যাঁহারা বড় বড় কথা বলেন, তাঁহারা বর্তমানের সমস্যাটি ভাল করিয়া বুঝেন না, অথবা এখনও একগুঁয়েমির সঙ্গে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতে চাহেন। মিঃ উইলকী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য লর্ড ক্র্যানবোর্ন ও লর্ড হেলিফ্যাক্স প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন কি না জানা যায় না; কিন্তু তিনি যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্তব্য করুন না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্তমান মতিগতির ক্ষেত্রে সে মন্তব্য যে সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে, ইহা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। মিঃ উইলকী পরবর্তী মন্তব্যগুলি কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বোঝা বহনকারী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে সমধিক সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিলাম—আফ্রিকা, আরব, পারস্য, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী সমগ্র দেশের লোকেরা স্বাধীনতা বলিতে বিদেশীদের সুগঠিত শাসনপদ্ধতির বিলোপ সাধনই বুঝে এবং তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ বৈদেশিক শাসনের বিলোপ সাধন রূপ স্বাধীনতাই যে পহেলা নম্বর সমরাদর্শ, একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না। মার্কিন দেশের জনগণের প্রতি এত রকমের কৌশলপূর্ণ প্রচার কার্যের পরও মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীর মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হতাশ হইবেন, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি সম্বন্ধে অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতা মার্কিন জাতির মনের অবচেতন স্তরে এমন ভাবেই দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ হইতে রাজনীতিক চাতুর্যপূর্ণ প্রচারকার্যেও তাহা চাপা থাকিতে চাহিতেছে না। অধীনতার জ্বালা এমনই প্রবল।

দেয়

শুক্র-সঞ্জীবন

মেরুদণ্ড
স্বাস্থ্য ও শক্তির
আধার

স্বাস্থ্য, শক্তি, সুখ ও সাফল্যের মূলে থাকে শুক্র, বুদ্ধি, তেজ ও চিন্তাশক্তির উদ্বোধন করে শুক্র! অথচ কত সংযম-হীন কিশোর ও যুবকই না এই মূল্যবান শারীরধাতুটিকে নষ্ট করিয়া নিজেদেরই চরম অনিষ্ট করে এবং পরিণামে বিবাহিত জীবনকে পর্য্যন্ত বিষময় করিয়া তোলে।

অস্বাভাবিক উপায়ে ও অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করিবার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী ও জননযন্ত্রসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, চক্ষুতে কালি পড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, কৃশতা, অল্প পরিশ্রমেই হাঁপ ধরা, তালু ও কান গরম হওয়া, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মাথাঘোরা, প্রস্রাবে তলানি পড়া, উৎসাহ ও উদ্যমহীনতা, জীবনে নৈরাশ্য, অস্থিরতা, নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

অকাল জরাগ্রস্ত ও অমিতব্যয়ী যুবকদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও পরমায়ু লাভের একমাত্র ভরসা আয়ুর্ব্বেদোক্ত **"শুক্রসঞ্জীবন"**। ইহার শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদানগুলি জনন-যন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ, পুষ্ট ও সবল করিয়া স্বপ্নদোষ ও শুক্রতারল্য নিরাময় করে, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্রচুর শুক্র উৎপাদন করিয়া রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও পেশীসমূহ গঠন করে। ইহা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সুস্থ ও সবল করে এবং জীবনীশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধন করে। **"শুক্রসঞ্জীবন"** ঔষধ ও খাদ্য দুই; তাই সঙ্গে সঙ্গে **"অষ্টাঙ্গ লবণ"** ব্যবহার করিলে অতি দ্রুত ফল পাওয়া যায়। সুস্থদেহে **"শুক্রসঞ্জীবন"** দাম্পত্য জীবন মধুর করিয়া তোলে।

শুক্র
শক্তি উৎপাদক

শুক্রসঞ্জীবন
মূল্য—বড় কৌটা ৪৷৷৹
অষ্টাঙ্গলবণ
মূল্য—৷৷৵৹ আনা সপ্তাহ

অধ্যক্ষ—**শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,** এম্-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ক্যাটালগ্ পাঠান হয়।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
শাখা ও এজেন্সী—**ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাইরে।**

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত)

ওঁ

21 Cromwell Road
South Kensington
London S. W.

কল্যাণীয়েষু

যতীন, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম্। তোমাদের সংঘের (১) খবর এ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে পাই নি—এবং কাউকে জিজ্ঞাসাও করি নি। না করবার কারণ হচ্চে এই যে, আমি হয়ত কিছু দীর্ঘকাল প্রবাসে যাপন করব ইতিমধ্যে আমাদের সব অনুষ্ঠানগুলিই পরিবর্তনের পথে চল্‌তে থাক্‌বে—যার মধ্যে যে সত্যের বীজ নিহিত আছে নিজের আভ্যন্তরিক জীবনীশক্তির দ্বারাই তার পরিণতি ঘট্‌তে থাক্‌বে। দূরের থেকে কোনোমতে তাগিদ করে তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কিছু নয়। ভাল সংকল্পও ভাল বলেই টেঁকে না, সত্য হলেই তবে তা টিঁক্‌তে পারে। অনেক সময়ে ভালোর প্রলোভনে অনেক অসত্য এবং অর্ধসত্য চারিদিক থেকে এসে জোটে এবং ভালোকে আচ্ছন্ন করে—তারাই ভালোর শত্রু—তারাই জগতে বিস্তর আবর্জনা সৃষ্টি করে এবং বাতাসকে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই জন্যেই যা না-হবার তাকে না হতে দেওয়াই উচিত। তাকে লজ্জা দিয়ে তাগিদ করে কোনোরকমে চালাবার চেষ্টা করা কিছুতেই শ্রেয়স্কর নয়। সেইজন্যে আমি দূরে সরে এসে চুপ করে বসে আছি—ইতিমধ্যে যা মরবার তা মরে যাবে, যা টেঁকবার তা আপনার যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করবে। কিছুকাল নিজেকে একেবারে আড়ালে সরিয়ে রেখে তারপরে যখন কাছে এসে দেখব তখন সত্যকে অনেক দিক থেকে এখনকার চেয়ে সুস্পষ্ট করে দেখতে পাব এই আশাটা মনে বহন করে রেখেছি। মাঝে মাঝে নিকটের জিনিসকে ছেড়ে দূরে তীর্থযাত্রা করবার এইই সার্থকতা। আমি সেই দূরত্বের অঞ্জনটি বেশ ভাল রকম করে দৃষ্টিতে না মাখিয়ে দেশে ফিরব না। কিছুকাল এই রকম দূরে থাক্‌লে পর তোমাদের সংগে আমার পরিচয়টি অভ্যাসের পরিচয় না হয়ে আবার সত্যের পরিচয় হয়ে উঠ্‌বে।

বঙ্কিম (২) কাল লণ্ডনে এসে আজ আমেরিকায় যাত্রা করেছেন। তিনি কি করবেন সম্পূর্ণ ঠিক করেন নি কিন্তু এখনো তাঁর বোলপুরের ক্ষুধা মরে নি। বল্‌চেন, টাকা করবার বয়স আমার চলে গেছে—এখন যদি কিছু কাজ করতে পারি তাহলেই জীবন সার্থক হয়। এখনো তিনি মনে আশা কর্‌চেন বিজ্ঞান কোনো একটা বিষয় শিক্ষা করে তিনি আমাদের বিদ্যালয়েরই কাজে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু আপাতত প্রতিবাদ কথা মনে মনে রাখাই ভাল। কালীমোহন (৩) এবং দেবল (৪) লণ্ডন য়ুনিভর্সিটি কলেজে

ঠে আসছিল.
; সে জ্যোৎস্নাও
, শান্ত। অজন্তাও

(১) বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রদের আশ্রমিক সংঘ।
(২) বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় (১৯০৭-১০)
(৩) প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ।
(৪) প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল।

ইংরাজি ও সাহিত্যের কোর্স্ নিয়েছেন—এইটে সমাধা করতে পারলেই আমার বিদ্যালয়ে তাঁদের যেটুকু প্রয়োজন তা সাধন করতে পারবেন,—ডিগ্রি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার দরকার দেখি নে।

এখন বেলা দশটা। রৌদ্রের চিহ্ন নেই। ঘন মেঘ করে রয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে; ঠাণ্ডা এবং ভিজে এবং অন্ধকার।

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। মাঝে শরীর ভাল ছিল না—ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিলুম। ভয় হচ্ছিল এখানকার শীতের সঙ্গে শরীর হয়ত লড়ে উঠ্‌তে পারবে না। তাই অনেকদিন পরে মাছ খাওয়া ধরতে হল। এখন আবার শরীরটা টেঁকবার মত হয়ে এসেছে। এখানকার কাজ না সারা করে রণে ভঙ্গ দেওয়া চল্‌বে না। ১৬ই আশ্বিন, ১৩১৯।

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় থাকবার সময় হঠাৎ যে সব সভা জমে ওঠে তাতে তোমাদের যথাসময়ে খবর দেওয়া সম্ভব হয় না। দেখ্‌লে ত সেদিন সবাই এসে জুটে পড়লেন বলে আপনিই একটা বৈঠক হল আমি ত এর জন্যে প্রস্তুতই ছিলুম না। মেয়ো হাঁসপাতালে কোনো জটলা হবে কিনা জানি নে। বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের তরফ থেকে কোথাও কোনো একটা সম্মিলনী হবে কিন্তু তার কোনো বিবরণ জানি নে—ডাক্তার মৈত্র (৫) প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি ত নেই,—কারণ আমিই সেখানে শিকারের লক্ষ্য। Daily strength for daily needs বইখানি ভালই। আমাদের লাইব্রেরিতে সম্ভবত আছে কিন্তু লাইব্রেরিয়ান কোথায় আছেন জানি নে। ইতি সোমবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[৪ঠা নভেম্বর ১৯১৩]

Uttarayan
Santiniketan, Bengal.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানি এবং লেখাটি পেয়ে খুশি হলুম। আশ্রম সম্বন্ধে তোমার অভিমত সম্পাদকের (৬) হাতে দেব—তিনি এখন ছাত্রপতি শিবাজি হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইতি ৪।১।৪০।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫) ডাক্তার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।
(৬) বিশ্বভারতী নিউজের সম্পাদক।
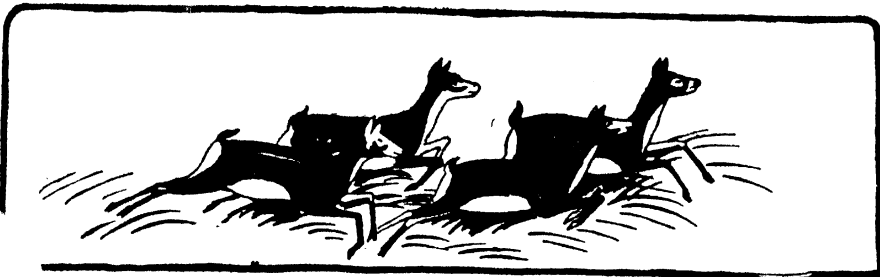
৫

গান থেমে গেল;

টেবিল হারমোনিয়মের কোল থেকে উঠে এসে অজন্তা আবার বসে পড়লো ওর আগের ফেলে যাওয়া চেয়ারে।

কপালে ওর ফুটে উঠেছে অল্প অল্প ঘর্মবিন্দু, মুখে চোখে একটা ক্ষীণ ক্লান্তির ছায়া।

ভজা চাকর এসে আলো জেবলে দিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে রেখে গেল কয়েক কাপ চা আর চিংড়ীর কাটলেট।

গরম চা,—কাপের ওপোর থেকে সাদা ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলাকার হয়ে;

সেই দিকে তাকিয়ে সৌম্য চুপ করে বসেছিল ওর দিকে চেয়ে, যেন ঐ দিকে তার নজর থাকলেও কোনও আগ্রহ নেই।

পার্থ তুলে নিলে একটা চায়ের কাপ; একখানা কাটলেটে কামড় দিয়ে সহাস্যে বললে,—

স্বপ্ন দেখছো নাকি সৌম্য?

সৌম্য একটু চমকে উঠলো, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে,—

"কিসের স্বপ্ন বলে আশা করো?"

"ঐ যে—

কিছু বা সে মিলন মালায়, যুগল গলায় রইবে গাঁথা,

কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে ঐ চাহনির চোখের পাতা!"

"কবিতা লেখার সখটা পাঠ্যজীবনেই ছিল সীমাবদ্ধ, আজ এই নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনে পেঁৗছে দেখি তার মূল্যেরও চিহ্ন নেই এতটুকু, নিশ্চিহ্ন মরুভূমি সব; আর সেই মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে এসে গর্জন করে ফিরছে কালবৈশাখের অট্টহাসি। বন্ধু সে হাসির প্রতিধ্বনিতে যে জীবন পরিপূর্ণ, তার রেশটুকুও যদি তোমার কানে না পেঁৗছে থাকে, তাতে দুঃখ নেই; বরণ্ড সান্ত্বনা আছে।.... ."

ম্লান একটু হাসির রেখা সৌম্যর ওষ্ঠাধরে ভেসে উঠেই গেল মিলিয়ে, একটা উদ্যত দীর্ঘশ্বাসকে চেপে সে যেন চায়ের কাপটা শূন্য করে নামিয়ে রাখলে টেবিলের ওপোর। তাকিয়ে দেখলে অজন্তার সঙ্গে পার্থও তাকিয়ে আছে তার দিকে কেমন একটা ঔৎসুক্য নিয়ে।

ইচ্ছে করেই সৌম্য চেপে গেল আগের প্রসঙ্গটা। খাওয়ার পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল তিনজনেরই, ভজা এসে টেবিলটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

ওরা তিনজনে যে বারান্দায় পাশাপাশি তিনখানা চেয়ার পেতে বসেছিল, তার সামনে খানিকটা ফুলবাগান; কয়েকটা টবে দেওয়া ফুল গাছ সিঁড়ির ওপোর, তাতেও রংবেরংয়ের ফুল ফুটেছে, বাগানেও ফুটে উঠেছে হাস্নাহানা। ওরই গন্ধে আকুল হাওয়া অদূরের ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর সরু সরু লম্বা পাতাগুলো দুলিয়ে চলে গেল দিগ্‌-দিগন্তরে।

অজন্তা তাকিয়েছিল আকাশের দিকে, যেখানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল পাণ্ডুর চাঁদ উদয় হতে;

হয়তো ওরই সঙ্গে অতীতের কোন প্রান্তসীমা থেকে ভেসে আসছিল ভুলে যাওয়া রাগ রাগিণীর ক্ষীণ মূর্ছনা!

কিন্তু সে মূর্ছনা ডুবিয়ে দিলে পার্থর উচ্চহাসি।

আগের কথার খেই ধরে হেসে সে বললে,—"যাই বল, স্বপ্ন আর কবিতা, এ দুটোর মধ্যেও সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য; এক গেলেও আর একের মধ্যে যে তার ছায়া রেখে যায়—এটা অস্বীকার করা চলে না; বিলাস জিনিসটা একই, তা সে কল্পনাতেই হোক আর বাস্তবেই হোক; বাস্তবে যে বিলাসী, লোকচক্ষু তাকে বলবে অসংযমী, অত্যাচারী; সুতরাং তার প্রাপ্য হবে সমাজের চোখে অশ্রদ্ধা আর উপেক্ষা। কিন্তু ভাববিলাসীর বিলাসটুকু ওরাই করবে উপভোগ, আর তার বিনিময়ে দেবে অফুরন্ত সম্মান। লোকের বিচারের পার্থক্য শুধু এইটুকুই, কিন্তু হিসেব করে দেখতে গেলে লাভ আর লোকসান, জীবনে এই দুটোরই দরকার সমানভাবে। সমাজ যাই বলুক, শাসনের ভয় যতখানিই দেখাক তারা—তাদের ভয়ে দেহটাকে কষ্ট দিয়ে দিনের পর দিন অনাহারে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত করে তোলাকে যেমন সংযম বলতে পারিনে, তেমনি মনের ইচ্ছাটাকেও কার্যে পরিণত করাকে অত্যাচার বলেও ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব; শুধু তাই নয়, যুগে যুগে নিজের সুবিধা অনুযায়ী সমাজ সৃষ্টি করেছে এই মানুষ, মানুষই করেছে সম্ভব আর অসম্ভবের মধ্যে তরতফাৎ, আর বিবেকের দোহাই দিয়ে বুদ্ধি আর চাতুর্যের নতুন নাম দিয়েছে যুক্তি; যে যুক্তির সাহায্যে লোকে বিচার করার অভিনয় করে! কিন্তু ভূত নয়, ভবিষ্যৎও নয়, যেটুকু বর্তমান, সে তার মূল্য কতটুকু দিতে পারে; এক কানাকড়িও নয়, অর্থাৎ তার পরেই হয় তার সমাপ্তি। শেষ তার ঐখানেই।"

চুপ করলো সে, কিন্তু সৌম্য তার একটা কথারও প্রতিবাদ করলো না।

নির্বাকে সময় কেটে চললো;

ধীরে ধীরে চাঁদটা আকাশের মাঝামাঝি উঠে আসছিল, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তার পাণ্ডুর জ্যোৎস্না; সে জ্যোৎস্নাও যেন আজকের সজল আকাশের মতই শীতল, শান্ত। অজন্তাও

নির্বাকে শুনে চলেছিল পার্থর কথাগুলো, সৌম্যর মত সেও তার কোনও জবাব দিলে না দেখে পার্থ উঠে দাঁড়ালো নিজের চেয়ার ছেড়ে; বারকয়েক বারান্দার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারী করে এসে দাঁড়ালো ঠিক সামনা সামনি; অতর্কিতে টেবিলের ওপোরেই একটা প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করে বলে উঠলো,—

"সেই জন্য কল্পনার চেয়ে বাস্তবের দিকেই পক্ষপাত আমার বেশী; আর তার জন্যে লজ্জাও অনুভব করিনে আমি, বরঞ্চ এইটুকুই ভেবে নেই যে, এই আমার পক্ষে পরম এবং চরম; সুতরাং এই রুটিন অনুযায়ী চলা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় উপায় নেই চলবার। চলেছিও এত দিন, আর সেই চলারই প্রথম ও প্রধান সাক্ষী অজন্তা নিজে।"

অজন্তার মুখখানা একবার বিবর্ণ হয়ে উঠলো বলে মনে হলো সৌম্যের; বুঝলে এ বিবর্ণতার হেতু কি! তবু, হেতু যাই থাক, তাকেই আজ হঠাৎ এ সময় অপরিচয়ের অদৃশ্যতা থেকে টেনে হিঁচড়ে এনে পরিচয়ের আলোকে আলোকিত করবার ইচ্ছা সৌম্যের ছিল না, আগ্রহও হল না বিন্দুমাত্র, তাই এ কথাটাকে একেবারে উল্টে দেবার চেষ্টায় এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করে হাত ঘড়িটা তুলে ধরলে সামনে,—

"ওঃ ন'টা বাজে যে!......"

"কেন, খিদে পেয়েছে?"

"খিদে আমার নয়টা কেন, বারোটাও পায় না; কিন্তু তোমাদের তো সে অভ্যাস নেই।"

"না থাকে, সে ব্যবস্থা আমরাই করে নেব, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না কিছু।"

সৌম্যর কথার উত্তর দিয়ে পার্থ লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হলো বারান্দা থেকে; সোজা রান্নাঘরের সামনে এসে সকৌতুক প্রশ্ন করলে,—

"প্রবেশ নিষেধ নয় তো?"

হাত কয়েক তফাতে একখানা টুলের ওপোর বসে মায়া পরম উৎসাহে নূতন রান্না শেষ করছিল;

সামনে আঁচের উনুন।

ওরই লাল আভায় ওর মুখ চোখ, কানের দুল, গলার হার সব যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিচ্ছদের মধ্যে একখানি লালপাড় শাড়ি, আর সেমিজ; সদ্য চুল বেঁধে পরা সিন্দুর বিন্দুটি তখনও দুই ভ্রূর মধ্যে অম্লান।

পার্থর আসার সাড়া পেয়ে সে মাথায় কাপড় তুলে দিলে; মৃদুহাস্যে পার্থ বললে,—

"চিংড়ীর কাটলেট খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ দিতে এলুম মায়া!"

স্মিতহাস্যে মায়া একটা মোড়া আগিয়ে দিলে তার দিকে,—"বসুন।"

পার্থ বসলো। অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—

"ক্ষমা চাওয়া হয়তো আমারই তোমার কাছে উচিত ছিল প্রথমে, এই নাম ধরে ডাকার অনধিকার চর্চার জন্যে; কিন্তু ওটা নাকি আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই, যেটুকু যার প্রাপ্য তার বেশী তাকে দেওয়াই হচ্ছে অন্যায়, এই বিবেচনায় যদি তোমায় আঘাত করে থাকি তো ক্ষমা করো।

মায়া তাকালো বিস্মিত দৃষ্টিতে।

পার্থ বললে,—

"সম্মান আর সঙ্কোচের বাধায় নিকটকেও দূরে সরিয়ে দেওয়াই হয়তো এ যুগের সভ্যতা; হয়তো সেই শিক্ষাই আমিও পেয়েছিলাম; কিন্তু মেনে নিতে পারিনি আপন বলে একথা, আর সকলেই যেমন হেসে উড়িয়ে দেয়, তুমিও কি তাই দেবে বলেই চুপ করে চেয়ে আছো মায়া?......"

মায়া একটু হাসলে এ কথায়,—

"না। তবে অসময়ে অসামঞ্জস্যকর কোনও কথা শুনলে মানুষ আশ্চর্য হয় বটে, কিন্তু সে বিস্ময় তো তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। মানুষের মনের নিয়মই যে এই, এটুকুতে আহত হওয়াও তো উচিত নয় দাদা, বরঞ্চ সেটা সহজভাবে নিলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে।"

পার্থ চমকে উঠলো নিজের অজ্ঞাতে।

পেছনে ফেলে আসা স্নেহ মায়া, আচার অনুষ্ঠানে ভরা কোন একটি গার্হস্থ্য জীবনের ইঙ্গিত হঠাৎ যেন ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠলো মায়ার ঐ "দাদা" সম্বোধনে।

বাধা নিষেধে বাঁধা একটি ছোট সংসার!

তার নিত্যকার ক্ষমা, আদর, শাসন আর দাবীতে মেশামিশি করা জীবনের গত দিনগুলো আজ যেন হঠাৎ এক নিমেষের জন্য উঁকি মেরে গেল মনের অতল গহ্বর থেকে; যেখানে আবেগ ছিল না, উচ্ছ্বাস ছিল না, অজন্তা ছিল না অথচ আনন্দ ছিল, আর ছিল অপার শান্তি।......

বড় চেষ্টাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস যেন চেপে গেল পার্থ; স্বাভাবিক হাসির ব্যর্থ চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করে বললে,—

"বুঝি সবই, জানিও সব; তবু নতুন করে জানতে ইচ্ছে করে—যাদের আপন বলে কাছে টেনে নিতে চাই, তারাই জোর করে এমনি এক একটা ব্যবধানের ওপাশে আমায় সরিয়ে দেয় কেন, যা পার হবার উপায় আমার থাকে না, শক্তিরও অভাব হয়ে পড়ে ক্রমশ। তোমার কাছ থেকেও তাই ঐ 'আপনি' 'আজ্ঞে' আর অহেতুক সম্মানের কল্পনা আমাকে আঘাত করেছে বারম্বার; মনে হয়েছে তুমিও বুঝি আর পাঁচজনের মত ভেবে দেখবে বিচার করবে আমাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে! অবশ্য, এ অপরাধ তোমার নয়, কিন্তু আমার পক্ষে এইটাই দণ্ড।"

মায়া চুপ করে রইল; পার্থ বললে,—

"আমার কথায় তুমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছো বলে মনে হয়—নয় কি?"

মায়া জবাব দিল,—"না।"

একটু থেমে হাসিমুখে পার্থ বললে,—

"আমার এখনে আসা কিন্তু ঠিক এই কথাগুলো তোমাকে শোনাতে নয়, তোমার আতিথেয়তাকে প্রশংসা করতে তোমার এই রান্না, খাওয়ানোর এই ব্যবস্থা আমায় কি মনে করিয়ে দেয় জানো? আমার মা ঠাকুরমায়ের কথা। তাঁদের মধ্যে কে

(শেষাংশ ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনদর্শন

ডাঃ সরসীলাল সরকার এম-এ

সাহিত্য পরিষদে ৭৫ বৎসরের জন্মদিনের সম্বর্দ্ধনার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাটিতে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমরা ২রা জ্যৈষ্ঠ সকালে জোড়াসাঁকো উপস্থিত হইলাম। কবি তখন দ্বিতলে নিজের কক্ষে একখানি ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। ঘরটির বাহুল্যবর্জিত একটি স্নিগ্ধ শান্ত ভাব এবং কবির আত্মসমাহিত গৈরিক পরিচ্ছদ পরিহিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, দুই একত্র হইয়া যেন একখানি গভীর ভাবময় চিত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নির্দেশে আসন গ্রহণ করিলে আমি কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আপনার কাছে আসতে সর্বদাই ইচ্ছা হয়, কিন্তু ছেলেরা বাধা দেয়। বলে যে, গুরুদেব মনস্তত্ত্বের চর্চা প্রীতিকর মনে করেন না, আর আপনি তাঁর কাছে গিয়ে হয়তো মনস্তত্ত্বের চর্চাই তুলবেন।"

কবি শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "বাস্তবিক তোমাদের ওই মনস্তত্ত্বের চর্চাকে আমি বড় ভয় করি। কিসের থেকে তোমরা কি যে বের করবে, বলা যায় না। তারপর, তোমাদের নিজের মনের ভাব দিয়ে বিষয়টি রঞ্জিত করে যা খাড়া করে তুলবে, সেইটেই হবে তোমাদের বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আর তাছাড়া এই মনস্তত্ত্ব হয়েছে তোমাদের লোককে গালি দেবার একটা উপায়স্বরূপ।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু মনস্তত্ত্ব ছাড়া সংসারে আর কি আছে? আপনার সমস্ত রচনাতেই যেমন গভীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে, আর কোথায়ও তেমন পাওয়া যায় না।"

উত্তরে কবি বলিলেন, "সাহিত্য তাছাড়া হতেই পারে না। সাহিত্যের ভিতর মানুষের মনের ভাবগুলির ক্রিয়ার ছবি থাকবেই।"

ইহার পর আমি এখন কি করিতেছি, সে সম্বন্ধে কবি প্রশ্ন করিলে আমি বলিলাম যে, আমি এখন spiritualism, অর্থাৎ পারলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু চর্চা করিতেছি।"

কবি বলিলেন, "স্বপ্নতত্ত্ব থেকে এবার ভূতের তত্ত্ব আবিষ্কারে লেগেছ? তুমি ডনের বই পড়েছ? তাতে ভবিষ্যৎ ঘটনার স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। স্বপ্নে একটা ঘটনা দেখা গেল, সেইটিই ঠিক ঠিক সফল হল, এই রকম অনেকগুলি বিবরণ ডন সংগ্রহ করেছেন, আর কেন যে এইভাবে স্বপ্নে দেখা ঘটনা সফল হয়, তারই একটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। ডনের মতে ঘটনা যা কিছু ঘটছে, পৃথিবীতে যে সব forces অর্থাৎ শক্তির ক্রিয়া আছে, সেগুলির দ্বারাই সমস্ত ঘটছে। কাজেই যে কোন ঘটনার কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ঘটনা আরম্ভ হয়েছে এবং শক্তিগুলি ঘটনার উপর কি ভাবে ক্রিয়া করছে, তার স্বরূপ যদি জানা যায়, তাহলে ঘটনার পরিণাম কি হবে, তা বুঝে নেওয়া যায়। মানুষের গভীর মনে কখনও কখনও কিভাবে ঘটনা শক্তির ক্রিয়ায় চালিত হচ্ছে, তার ছাপ পড়ে, আর তার থেকেই ভবিষ্যবাচক স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, ডন এইভাবে বুঝিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে তো 'ভাবী কাল' বলে আর কিছুই থাকে না। ভবিষ্যতে কি হবে আগে থাকতেই সব ঠিক হয়েই আছে, ঘটনাটা ঘটাই কেবল বাকি।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, তাহলে পৃথিবীর ঘটনাগুলি বায়স্কোপে তোলা ছবির মত হয়, আগে থাকতে ফটো তোলাই আছে। এরকম হলে মনুষের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতাই থাকে না।"

কবি বলিলেন, "আর মরালিটি'রও কোন অর্থ তাহলে থাকে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি এই স্বপ্ন সম্বন্ধে study করবার জন্য যে সমস্ত স্বপ্নের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলাম, তার মধ্যে কতকগুলি ঘটনা সফল হয়েছে বটে, আবার এমন কতকগুলি ঘটনার বিবরণ আছে, যা সফল হবার কাছাকাছি গিয়েও কেটে গিয়েছে।"

কবি বলিলেন, "ফলতে ফলতে কেটেও গিয়েছে তাহলে?"

ইহার পর বোলপুরের কথা উঠিল ও কবির নূতন গৃহ 'শ্যামলী'র কথাও উঠিল। বোলপুরে এখন ভয়ানক গরম। কবি বলিলেন, "আগে গরম বলে আমার কিছুই মনে হত না; বোলপুরে গরমের দিন দুপুর বেলায় সবাই যখন নিজের নিজের ঘরের চারপাশের দুয়ার-জানালা বন্ধ করে ঘুমোত, আমার ঘরের তখন চারধারের দুয়ার খোলা থাকত, গরমে আমার কোন কষ্টই হত না, কিন্তু এখন অন্যরকম হয়েছে। শরীরের অবস্থা বদলে গিয়েছে।"

এই বলিয়া বলিলেন, "আমাদের দেশে যে আশ্রম বিভাগ ছিল, সেটা খুবই ভাল ছিল। প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রম, সেটা ছিল গার্হস্থ্য আশ্রমেরই ভূমিকাস্বরূপ। গার্হস্থ্য আশ্রমে সংসারের যত কিছু কাজ, যত কিছু কর্তব্য সাধন শেষ করে মানুষ যে বয়সে উপনীত হত, সেটা বানপ্রস্থের কাল। তখন মানুষের বলবার সময় এসেছে যে, "আর আমার সংসারের কোন দায় নাই; সংসারের দেনাপাওনা আমি চুকিয়ে এসেছি, এখন আমার অবসর নেবার সময়।"

আমার সেই অবসর নেবার সময় অনেকদিন হল এসেছে। পাশ্চাত্যে একটা কথা আছে, 'dying in harness' যতদিন বাঁচ কাজ করে যাও। কিন্তু প্রাচ্যের আদর্শ তা নয়।

আমি বলিলাম, "কিন্তু মানুষের জীবনের দু'রকম phychological type আছে, কতকগুলি লোক Extravert হয়, তাহারা ঘটনার জগতের মধ্য দিয়ে জীবনের রস পায় আর কতকগুলি লোক introvert হয়, তারা অন্তর জগতের ভিতর দিয়ে জীবনের রস গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকই introvert, আর পাশ্চাত্যে অধিকাংশই Extravert, সেইজন্য dying in hanress-এর অবস্থাই তারা কাম্য বলে মনে করে।"

উত্তরে কবি বলিলেন, Extraverson-এর সঙ্গে intro-

verson-এর যোগ থাকা চাই। শুধু Extraverson-এ হয় না। দুয়ের মধ্যে যোগ না থাকলে কর্ম হবে অকর্ম। আগে ধ্যানের মধ্য দিয়ে সংকল্পশুদ্ধি চাই। সংকল্পশুদ্ধি না হলে যতই মহৎ কাজের প্রয়াস কর না কেন, তা সত্যকারভাবে সফল হবে না। কাজের মধ্যে কেবল মাতামাতির মত্ততাই বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে এই যে দেশের জন্য কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছে, এর মূলে সংকল্পশুদ্ধি না থাকায় সব কেবল গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কাজ অবশ্য মানুষকে করতেই হবে, কিন্তু কর্ম আবার অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় কর্মবন্ধন, তাই প্রাচ্যে কর্ম করার কথাও আছে, আবার কর্মত্যাগ করার কথাও আছে।"

তারপর কবি বলিলেন, "তবে বানপ্রস্থ গ্রহণের অবশ্য সময় আছে। এক জায়গা থেকে দূরের আর এক জায়গায় যেতে হলে যেমন মধ্যবর্তী স্থানকে একেবারে অস্বীকার করে লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায় না, সেই রকম গার্হস্থ্য আশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করে বানপ্রস্থে পেঁছোনো যায় না। মানুষের মধ্যে অনেক প্রবৃত্তি আছে, আর সে সমস্ত প্রবৃত্তিরই একটা অর্থ আছে, কোন প্রবৃত্তিই নিরর্থক নয়। ক্ষুধা মানুষের একটা প্রবৃত্তি, খাদ্য গ্রহণের জন্য ক্ষুধা চাই। কেউ যদি বলে, আমার ক্ষুধা নাই, শরীরের জন্য খাওয়া দরকার, তাই ক্ষুধা না থাকলেও খেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে রকম খাওয়ায় খাওয়ার কাজ হয় না, শরীর রক্ষাও হয় না। যখন মানুষের বয়স থাকে অল্প, তখন শরীর থাকে সতেজ, প্রবৃত্তিগুলিও থাকে সতেজ ও বলবান। মানুষ যদি সেই প্রবৃত্তি রোধ করবার জন্য সংসার ছেড়ে গুহার মধ্যে নিজেকে রুদ্ধ করে রাখে অথবা মানুষ যদি প্রবৃত্তিকে repression করে চেপে রাখবার চেষ্টা করে, তার ফলে এই হয় যে, সেগুলি চাপা পড়ে মনের ভিতর ভিতরে ভিতরে গোল বাধায়, তাইত মনের স্বাভাবিক অবস্থা বিকৃত হয়ে যায়!"

"মানুষকে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই চলতে হবে, প্রবৃত্তিকে পূর্ণভাবে উপভোগ করে তার পরের সেই অবস্থায় পেঁছতে হবে যে অবস্থায় প্রবৃত্তিগুলি আপনা হ'তেই শান্ত হয়ে আসে।"

"পূর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে উপভোগ" বলতে কি বুঝায় ইহা বুঝইবার জন্য কবি বলিলেন, "পূর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে উপভোগের অর্থ প্রবৃত্তির উচ্ছৃংখলতা নয়। প্রত্যেক প্রবৃত্তিই মানুষের জীবন গঠনের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ স্বরূপ, কিন্তু সেই সব প্রবৃত্তির একটা সীমা আছে। কর্তব্য সাধনে প্রবৃত্তি আমাদের সহায় হয়, আবার সেই প্রবৃত্তি যখন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক দিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সেইটিই হয় পাপ। আমাদের ক্রোধ একটি প্রবৃত্তি। যদি আমরা এত সংযত হই যে অন্যের উপর অত্যাচার দেখেও আমাদের ক্রোধ হয় না, অসহায়ের উপর পীড়ন দেখলেও আমাদের ক্রোধ হয় না। তাহলে সেরূপ অবস্থা স্বাভাবিক নয়- মনুষ্যত্বের পরিচায়কও নয়। Divine anger বলে একটা কথা আছে। ক্রোধ দৈবীভাবাপন্ন হতেও পারে, আবার সেই যদি নিজের 'অহং'—নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে প্রযুক্ত হ'য়ে সীমা ছাড়ায় তখন রাগের মাথায় এমন কুকাজ নাই যা' মানুষ করতে পারে না। নিজের স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই মানুষের রাগ হয়। নিজের সম্বন্ধে কোনও নিন্দা শুনলেই মানুষের রাগ হয়। চেষ্টা করেও মানুষ নিজেকে সংযত করতে পারে না যখন তখনই ক্রোধ হয় 'রিপু'। সব প্রবৃত্তির সম্বন্ধেই একথা বলা চলে।"

কবি আরও বলিলেন, "লাফ দিয়ে এক অবস্থা পার হয়ে অন্য অবস্থায় পেঁছানো যায় না, এইটিই জগতের সাধারণ নিয়ম। তবে অবশ্য কাহারও কাহারও পক্ষে আবার অন্য রকমও দেখা যায়। এমন মানুষও পৃথিবীতে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের জীবন সাধারণ জীবনের নিয়মে চলে না। অঙ্কশাস্ত্রে জন্মগত ব্যুৎপন্ন যাঁরা, তাঁদের অবশ্য নামতা মুখস্থ করবার দরকার হয় না। কিন্তু সেটা সংসারের সাধারণ নিয়ম নয়, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইহার পর কবি বলিলেন, "গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে আসার মানে, জীবন আগে যে plane-এ ছিল, সে plane-এ আর রইলো না, জীবনের ধারা একেবারে বদলে সে জীবন থেকে এ জীবন সম্পূর্ণ পৃথক হ'য়ে গেল। তখনও যদি গত দিনের সূত্র টেনে নিয়ে জীবন চলতে থাকে, গত জীবনের মোহ তখনও যদি ছাড়া না যায়, যদি একথা পরিপূর্ণ মনে বলতে না পারি যে, আমার করবার যা তা আমি করে শেষ করে এসেছি, বাহিরের দেনাপাওনা আমি মিটিয়ে এসেছি, এখন আমি দায়মুক্ত, এখন আমাকে আমার নিজের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করে নিজেকে বুঝে নিতে হবে—তাহ'লে জীবনের পরিণতিতে শান্তি হ'তে সার্থকতা হ'তে আমরা বঞ্চিত হই।"

'আগের জীবনের সঙ্গে পরের জীবনের কোন যোগসূত্র কি থাকবে না?' এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিলেন, "যোগ নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু সে যোগ আসক্তির মধ্য দিয়ে নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়ে। ফুলের সঙ্গে ফলের যে যোগ সেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে। ফুল নিজেকে ত্যাগ করে ফলে পরিণত হয়, নিজের বিচিত্র বর্ণের দলগুলি খসিয়ে ফেলে দেয়, তার মায়া একেবারে ত্যাগ করে। আবার ফল, সেও পক্ক হ'লে আর বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে না; বৃন্ত থেকে আপনি খসে' পড়ে, যাতে তার ভিতরের বীজের সঙ্গে মাটির যোগ হয়ে নূতন গাছ জন্মাতে পারে। অথবা ফল নিজেকে বিদীর্ণ করে তার ভিতরের বীজ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়। ফুলের সার্থকতা ফলের জন্য নিজেকে ত্যাগ করা, ফলের সার্থকতা বীজকে পরিপুষ্ট করে জগতকে দান করা।

কবি বলিতে লাগিলেন, "জীবন এইভাবে সার্থকতার পথে চলেছে ত্যাগের মধ্য দিয়ে। প্রাণলক্ষ্মী এইরূপে নব নব ভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন সর্বজীবের মধ্য দিয়ে ও সমস্ত জগতের মধ্য দিয়ে। গার্হস্থ্য জীবনেও মানুষ কত কাজ করছে, কত কঠিন প্রয়াস। সেই সমস্ত কর্মের ফল সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হচ্ছে। মানুষ এগিয়ে চলছে, এগিয়ে চলা মানেই ত্যাগ। পিছনের মাটি তাকে ছেড়ে আসতে হবে। মানুষ নানা কর্মের মধ্য দিয়ে চলছে, যখন সে কর্মের উদ্দামতা শান্ত হবার সময় এল, তখন প্রবৃত্তি বাহিরের জগত থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিজের মধ্যে ফিরে এল মন জগতের কর্মকোলাহল থেকে ফিরে এসে নিজের গভীরতার মধ্যে সত্যের সন্ধানে মগ্ন হ'ল। তখন তার বানপ্রস্থের সময়।"

আমি বলিলাম, "তখন কি কোন কাজই থাকবে না?"

কবি বলিলেন, "হাঁ, কাজ থাকবে নিশ্চয়, কিন্তু বাইরের কাজ নয়। এইভাবে যাঁরা অন্তরের মধ্যে মগ্ন হয়ে আত্মোপলব্ধি করেছেন তাঁরা তাঁদের সেই উপলব্ধির ফল জগতকে দান করেছেন। ভাবরূপে ও বাণীরূপে। তাঁরা নিজের মনে যে সত্য উপলব্ধি করেন সে সত্য জগতকে দান করবার দায়ও তাঁদের উপর আসে, কেননা সত্য লাভ কেবল নিজের জন্য নয়, জগতের জন্য।"

এই বলিয়া কবি বলিলেন, "তোমরা কিছু মনে কোর না, আমি নিজের কথা কিছু বলছি। আমার একটা শক্তি আছে, সেটা Expression অর্থাৎ ব্যক্ত করবার ক্ষমতা। আমি আমার জীবনের নানা Stage-এর অনুভূতি নানাভাবে ব্যক্ত করে এসেছি। কৈশোরে যে কথা বলেছিলাম, যৌবনে হয়তো আবার অন্যভাবে সে কথা বলেছি। হয়তো আমার এক সময়ের কথার সঙ্গে আর এক সময়ের কথার অমিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি বলেছি, না বলে পারিনি। কেননা আমার মনের মধ্যে আমি যে সত্য লাভ করেছি, সে তো আমার নিজের মনে গোপন করে রাখার জিনিস নয়, সে যে আমাকে সকলকে দিতেই হবে, সকলের কাছে প্রকাশ করতেই হবে। আমি যখনি অনুভব করলাম যে, মনের ভিতরে যা লাভ করেছি তা সত্য, তখনি সে সত্যকে জগতে প্রকাশ করবার জন্য দায়ও আমার উপর এল। আমি একটা যন্ত্র, ঘটনাক্রমে যার সুর বাঁধা এমনভাবে হয়েছে, যাতে ভাব প্রকাশের সুবিধা হয়েছে। সেই যন্ত্র বেজে চলেছে, বাজাই তার কাজ।"

কবি বলিলেন, "সত্যকে মনের মধ্যে পূর্ণভাবে অনুভব যখন করেছি, যখন আমার সমস্ত প্রাণ তাতে সায় দিয়েছে তখন আমার বাক্যে তা বেজে উঠেছে। যেমন যন্ত্র বাজে। সকলের এক ভাব হয় না। জগতে কেউ হয় শ্রোতা, আবার কাউকে বলতে হয়। জগতের মধ্যে এই বৈচিত্র্য চিরদিন আছে আর থাকবে।"

কবি অনেকক্ষণ আমাদের জন্য সময় দিয়াছিলেন; তাঁহার আরও অনেক দর্শনপ্রার্থী উপস্থিত আছেন, এই সংবাদ দু-তিনবার উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কবি তাঁহার আলোচনা আবেগপূর্ণ ভাষায় চালাইয়া যাইতেছিলেন। অবশেষে আমরা দর্শনার্থিগণকে অধিক অপেক্ষা করানো অনুচিত মনে করিয়া কবির নিকট বিদায় লইলাম। ফিরিবার সময় সমস্ত পথ তাঁহার সেই ওজস্বিনী বাক্যঝঙ্কার মনের ভিতর বাজিতে লাগিল। বাড়ি ফিরিয়াই কলম লইয়া সেই অমূল্য বাক্যগুলি যথাসাধ্য লিখিয়া রাখিলাম।

চক্রবাল

(১৫২ পৃষ্ঠার পর)

বেঁচে আছেন, কেউ নেই, কিন্তু আমায় ঘিরে জড়িয়ে আছে আজও ওঁদেরই স্মৃতিগুলো। ঐ হেঁসেলের ধূম ধূসরতার মধ্যে চাবী দেওয়া ভাঁড়ের হাড়ি কলসীর মধ্যে বেঁচে আছে আজও; তাই এক এক সময়ে মনে হয় মায়া—যে খাবার সময়—রাঁধুনী কি বাবুর্চির মুখগুলো চারিপাশে ঘুরতে না দেখে যদি একখানিও স্নেহকাতর মুখ দেখতে পেতাম, কারো হাতের সযত্নস্পর্শ পেতাম সমস্ত আহার্যের মধ্যে তা হলে হয়তো আমার এ জীবনের গতি ঘুরে যেত অন্যপথে, আমি বাঁচতাম সেই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে।"

মায়া চমকে তাকালো পার্থর মুখের দিকে; মনে হলো ওর সমস্ত মুখে চোখে যেন ভেসে উঠেছে একটা গভীর মর্মবেদনার ছায়া, যে ছায়া দেখার আশা সে স্বপ্নেও করেনি। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞাসা করে—অজন্তা কি সে অভাবপূর্ণ করেনি; না পূর্ণ করার তার ক্ষমতার একান্ত অভাব?

কিন্তু মনে এলেও একথা সে মুখে প্রকাশ করতে পারলো না, বললে,—

"বেশ তো আজ থেকে আপনাকে আর 'আপনি' নাই বললাম, তাতেও আমার কিছু ক্ষতি নেই তো লাভই আছে বরঞ্চ, কারণ কোনও দিন এর গণ্ডি ডিঙিয়ে চলে যেতে চাইলেও পারবে না, বাধা দেবে এই আত্মীয়তার দাবী।"

পার্থ উঠে দাঁড়ালো; বার হয়ে যেতে যেতে বললে,—

"কিন্তু আমি যে তাই চাই মায়া, শুধু ঐটুকু, ঐটুকুই আমার চিরদিনের কল্পনা, যাকে আমি যত দুঃখ দিয়েই ছাড়িয়ে যেতে চাই না কেন সে যেন আমায় তার তুলনায় ঢের বেশী দুঃখ দেয়, ঢের বেশী শক্তিতে জড়িয়ে ধরে, নিষ্পেষিত করে, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে লুপ্ত করে দেয় আমার সমস্ত অনুভূতিকে, সমস্ত সত্তাকে।"

সে চলে গেল; ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ওর চটীর শব্দ, দৃষ্টির অন্তরালে মিলিয়ে গেল ওর সুদীর্ঘ দেহ।

মায়া কিন্তু তার চলে যাবার পরেও নড়তে পারলো না সেখান থেকে কেমন একটা আড়ষ্টভাব এসে পড়েছিল তার মধ্যে, একটা টুকরো টুকরো চিন্তাসূত্র ওর মাথার মধ্যে যেন এলোমেলোভাবে পাক খেতে শুরু করেছিল, আর তা ঐ পার্থ আর অজন্তাকে কেন্দ্রীভূত করে। কিসের একটা সংশয় মনের মধ্যে নিরন্তর দোলা দিতে দিতে প্রশ্ন করছিল,—পার্থ কি তাহলে অজন্তাকে বিবাহ করে সুখী হতে পেরেছে সম্পূর্ণভাবে! তবে আজ তার মুখের ওপোরে যে মনোবেদনার ছায়া সে ভেসে উঠতে দেখেছে, তা মিথ্যা নয়? অভিনয় নয়?

মায়া জানালার বাইরে তাকালো অন্ধকার আকাশের দিকে, সেখানে কতকগুলো নক্ষত্র জ্বলছে, দূর থেকে ভেসে আসছে সাঁওতালদের গুরুগম্ভীর মাদলের শব্দ।

মায়া সেই দিকে তাকিয়ে রইল নিজের অস্তিত্ব ভুলে।

ক্রমশ

অস্পষ্ট

শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

অনেক ভেবেচিন্তে পদ্মপিসি কোলকাতা ছাড়বেন—ঠিক করলেন। সাত বছর বয়সে তিনি মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে ফুট-ফুটে ছোট্ট বধূর মত একখানি প্রতিমা হয়ে এই কোলকাতায় এসে উঠেছিলেন,—তারপর থেকে আর কোথাও যাননি বাইরে। শুধু একটিবার মাত্র তারকেশ্বরে গিয়েছিলেন মানসিক পুজো দিতে। কিন্তু সেটা এমন কোনো মনে রাখবার মতো ঘটনা নয়। দুটো দিনের কথা মাত্র ঃ একটুখানি তোড়জোড়, সামান্য তাড়াতাড়ির মধ্যেই তার যবনিকাপাত ঘটেছিল। পদ্মপিসির স্মৃতিতে আজ আর তার কোন রেশ নেই।

জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। এমন সুসমৃদ্ধ, সুসংহত কোলকাতা তচনচ হয়ে যাবে। পদ্মপিসির এই সাজানো গোছানো বাড়িখানি, কত যত্ন নিয়ে গড়ে তোলা পেছনের ওই বাগানটা—সব পুড়ে ঝুড়ে একাকার হয়ে যাবে। পদ্মপিসির সত্যিই দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

বাড়ির ভাড়াটেগুলি সব উঠে গেল এক এক করে। যে রকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এখন—তাতে যে নতুন কোনো ভাড়াটে আসবে বিজ্ঞাপন দেখে, সে আশাও নেই। আয়ের দিক থেকে এই সমস্যাটা খুব বড় করে দেখা না দিলেও পদ্মপিসি নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

মেয়েমানুষ। তার ওপর একা, সংসারে দেখা শোনা করবার লোকজন নেই। এর ওপর টুকিকে রেখে গেল ছোট ভাই এসে, মাস কতক হল। এসে বললে—দিদি, বদলী হয়ে গেলাম। ঝরিয়া ছেড়ে অনেক দূরের কলিয়ারীতে বদল করে দিলে, টুকিকে তোমার কাছেই রেখে গেলাম। তোমার কাছে থেকেই যখন ও মানুষ হয়েছে—

পদ্মপিসি নিষেধ করতে পারলেন না। একটু চড়া কথা বলতে তাঁর আটকায় অবশ্য, কিন্তু সে জন্যে যে তিনি চুপ করে রইলেন এক্ষেত্রে, তা নয়। গত বছর পত্নী এবং একমাত্র পুত্রের আকস্মিক যুগপৎ বিয়োগের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ছোট ভাই রমেশ শোকের সরল অভিব্যক্তিতে অকাতরে কাতর হয়ে উঠবে—এই আশঙ্কায় তিনি কিছু না বলেই রাজী হলেন। বললেন—ভালই হল রে রমেশ। এই বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে রান্না বান্না করছি; টুকি থাকবে, পিসিমার একটু সেবা শুশ্রূষা করবে, হাতের দু একখানা কাজ সেরে দেবে—সে ত' বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

কিন্তু তদানীন্তন সৌভাগ্য লাভ করবার যে এমন আশু ফল ঘটবে একথা পদ্মপিসির মস্তিষ্কে তখন আসেনি। আসবার কথাও নয়। সহসা যুদ্ধ বেধে গেল। কোলকাতা ছাড়বার এমন হিড়িক পড়ে গেল যে পদ্মপিসির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিছু ব্যাহত হয়ে পড়ল। টুকির জন্যে নূতন দুর্ভাবনা সঞ্চিত হয়েছে এর ওপর।

আশে পাশে সকলেই বাড়ি ফাঁকা করে সরে পড়তে লাগল। চাকরটিও একদা শুভক্ষণ দেখে সেই যে কোথায় বেরোল—আর ফিরে আসবার নাম পর্যন্ত করলে না। পিসিমা স্বল্প দুশ্চিন্তিত হয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং আশা করলেন—হয়তো আবার এসেও পড়বে হট করে। আহা, ছেলেটা বড় ভালো ছিল। পিসীমা মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন।

পাশের বাড়িতেই নব্য একজন উকীল থাকে। বয়সে সে অনেক ছোট, ছেলের বয়সীই হবে। অগত্যা পদ্মপিসি তাকেই একদা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ বাবা, বঙ্কু, সত্যি কি আমাদের কোল-কাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে?

বঙ্কুবিহারী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পিসিমাকে সে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা করে, অথচ পিসিমাকে মাঝে মাঝে ঈষৎ উত্তপ্তও করে তোলে, আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এখন পিসিমার সভয় কণ্ঠ উপলব্ধি করে বঙ্কুবিহারী সরলভাবেই জানালে—হ্যাঁ, পিসিমা কোলকাতা আর নিরাপদ নয়।

সামান্য এই কয়েকটি কথাতেই পদ্মপিসির মন টলে গেল। তিনিও কোলকাতা ছাড়বার তোড়জোড় শুরু করলেন। তিনি সকল কাজেই রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠলেন—ওমা টুকি, এ আলনাটা বেঁধে নে মা ভালো করে। লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা নিয়েছিস্ ত' ঠিক করে। কি জ্বালা যে হলো!

পিসিমা সন্তর্পণে সব কাজ করলেন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি কাজ করেন; হঠকারিতাকে তাই তিনি নিন্দে করেন অন্তরের সঙ্গে।

টুকি পিসিমার অনেক কাজ সেরে দিলে। মোট ঘাট বাঁধা থেকে শুরু করে কুলির সঙ্গে সেগুলিকে রেল গাড়িতে নিরাপদে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজেই সে অতিমাত্রায় লঘু এবং চঞ্চল হয়ে পিসিমার পরিশ্রমের বড় ভগ্নাংশটাই হাল্কা করে তুললো।

কাশী যাওয়াই ঠিক হল। জীবনে তীর্থ করা হয়নি, এই সুযোগে যদি ওধারগুলোয় বেড়িয়ে আসা যায়—মন্দ হয় না।

কাশীতে নেমে নলিনীকান্তের সঙ্গে দেখা। নলিনীরা কোলকাতায় পিসিমাদের পাশের বাড়িতেই কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছিল; ছেলেটি বিশেষ শান্ত না হলেও মিষ্টি মুখের বাধ্য। তা ছাড়া, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পরিচিত একজনের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে—এ কল্পনাই ত' পিসিমার মাথায় আসে নি, এমন কি টুকিরও না। তারা দুজনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পিসিমা ডাকলেন—নলিনী বাবা, তোমরা এসেছ নাকি এখানে? বেশ হল তবে।

নলিনীর চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠেছে, সারা শরীরে কেমন যেন একটা দৈন্যের আভাস উঁকি দিচ্ছে। দেখে মনে হয়, মনোবিকারের মোহ যেন নলিনীকে পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করতে চাইছে। অন্তরে কোনও অভিনব যন্ত্রণায় যেন সে জর্জর। চুপ করে রইল সে।

টুকি নরম গলায় প্রশ্ন করলে—নলিনীদার কি হল? কথা কইছ না যে?

নলিনী টুকিকে আগে দেখেছিল, উভয়ে শৈশবে খেলা ধূলোও করেছে, কিন্তু সেই টুকি—চাঁটা মেরে আর মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদাতো যাকে, সে আজ বয়সের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এবং সৌম্য হয়ে উঠেছে। নলিনীর দৃষ্টি বিস্ময়ে হত হল।

নলিনীর পক্ষে এই নীরবতা পিসিমার ভাল লাগল না। তিনি বললেন—আমাদের একটা বিহিত করে দে বাবা; বড় বিপাকে পড়েছি। জানাশুনো নেই, এখানে এসেছি—তোরা আছিস জেনেই তো!

নলিনী আশ্চর্য হল—আমি এখানে আছি—কে বলেছে একথা?

পিসিমা কেমন যেন অভিভূতভাবে বললেন বলবে আবার কে রে? ছেলের যেমন কথা, মনেই বুঝতে পারলাম রে।

নলিনীই সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে। বাসা দেখে দেওয়া, সেখানের জীবন যাত্রার সঙ্গে দু একদিন ধরে পিসিমা ও টুকিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া,—টুকির বাবাকে পত্র দিয়ে জানানো, সব কাজই সে চটপট সেরে নিলে।

টুকি পিসিমার সাক্ষাতেই একদিন নলিনীকে ধরে বসলো-- হাস্যচপল সেই নলিনী এমন গম্ভীর এবং মন্থর হয়ে উঠলো কেন?

নলিনী আনুপূর্বিক তার সমস্ত তথ্য ব্যক্ত করে গেল। হৃদয়স্পর্শী করুণ কথা হলেও নলিনী সহজেই তা বলে গেল নিস্পৃহকণ্ঠে, এতটুকু পর্যন্ত গলা না কাঁপিয়ে। ধনী কয়েকজন বন্ধুদের সংগে যৌথ কারবার খুলে সংসার চালাচ্ছিল নলিনী; কিন্তু সহসা তাদের সংসারে এল বিপর্যয়, দারুণতম দুর্যোগ। আত্মীয় কুটুম্বদের সংগে কি একটা মোকদ্দমায় তাদের সামাজিক জীবনে এল বিপ্লব। সাংসারিক সুনাম বজায় রাখবার জন্যে নলিনীকে টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় মেতে উঠতে হল। অনুপায় নলিনীর আজও মনে পড়ে--সে ওই কারবারের সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছে। বন্ধুরা পুলিশের হেফাজতে তাকে ধরিয়ে দিয়ে জমা রাখলে--কিন্তু নলিনী পালালো সেখান থেকে। জীবনকে সে কত আপন কত গভীরভাবে যে ভালবাসে তার উপলব্ধি হল মুহূর্তের পর। তাই তাকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কাশীতে আর কয়েকদিন থেকেই সে চম্পট দেবে। জীবন বাঁচাতে এখন প্রতি পদে এবং প্রতি মুহূর্তেই তার জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

পিসিমা বললেন--তুমি থাকো না কেন বাবা, কোথায় আর যাবে এই দুর্দিনে, ছেলের মত তুমি; আমার কাছেই থাকো। কোথায় আর নড়বি বাবা?

চোখের অনুরোধে টুকিও ওই কথা জানালে। কাজেই নলিনী আপাতত রইলো।

দোকান বাজার করে দেয়, বাকী সময়টা ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকে, রাত্রে একবার বাইরে নিঃশ্বাস নিতে বেরোয়;--দিন কেটে যায়, অত্যন্ত সঙ্কোচ ও সংগোপনের দিন।

একদা পিসিমা টুকিকে বললেন--সেদিন নলিনী বলছিল তুই ওর দিকে অমন করে তাকাস কেন বলত? অমন করে চেয়ে থাকলে ও পালাবে এখান থেকে বলছে।

টুকি লজ্জায় এবং বিস্ময়ে আহত হয়ে অন্যত্র সরে গেল। হয়তো তার দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যার জন্যে এমন অভিযোগ নলিনীর তরফ থেকে পিসিমার কাছে পৌঁছবে।

পিসিমা বোঝাতে চেষ্টা করলেন--তোর জন্যে যদি ছোঁড়াটা চলেই যায়, তাহলে কি সেটা শান্তির হবে টুকি? মাথা খুঁড়ে মরতে হবে আমাকে। বাছা প্রাণের ভয়ে আমার এখানে এসেছে.....

সেদিন টুকি এবং নলিনীর আর সাক্ষাৎ হয়নি। নলিনীই পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো টুকির কথা।

গলাটা অসম্ভব নিখাদে নামিয়ে বললেন--সে কথা আর তুমি বাবা জানতে চাইছ কেন? ও মেয়ে অমনি। কোথাও কিছু নেই--বলে কিনা নলিনীদার সামনে আমি আর বেরোবো না, রাতদিন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে থাকে, যেন গিলে খেতে আসে। আমি ত' বাবা হেসে আর বাঁচিনে; বড় ভয়ের মত তোর, তোর দিকে আবার চেয়ে থাকে কিরে? এমন ধারাই বাপু আমাদের টুকি?

নলিনী নীরব হয়েই রইল। টুকি যে এতদূরে লজ্জাহীন হয়ে পিসিমার কাছে কাব্য করতে পারে--তার ধারণাতীত। নলিনী ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়ল কেমন ধারা।

টুকি সম্বন্ধে তার চেতনায় যে অনুভূতি কত কম, তা আজ বেশ উপলব্ধি করতে পারছে; একেবারে নেই বললেই চলে। তার সংগে কোন আত্মীয়তা নেই, জীবনের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখে তার উপলব্ধি এখানে অভাবনীয়ভাবে মিশে গেছে বটে, কিন্তু নলিনী এমন কৃতঘ্ন নয়। প্রকাণ্ড পরিব্যাপ্ত যাযাবরের জীবন নলিনীর ঃ এখানে টুকির নীড় বাঁধার পরিসর কোথায়? নলিনী এখানে নিতান্ত সহজ, নিতান্ত সরল; অথচ পিসিমাকে টুকি ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথাই না বলেছে। নলিনী গম্ভীর হয়ে গেল।

পদ্মীপিসির মনটা কেমন ধারা ঘুলিয়ে উঠতে লাগলো। নলিনী বা টুকি কেউই তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে না। তাঁর এই কাজটা যে খুব আশ্চর্যজনকভাবেই সাফল্য লাভ করেছে--এর জন্যে তিনি অতি মাত্রায় হৃষ্ট হয়ে উঠলেন। উভয়ে পিসিমাকে দোষারোপ করবে না, তাদের জায়মান সৌহার্দ্যে যে কোথায় বিচ্ছেদের ছিদ্র করে দেওয়া হলো, তার বিন্দুবিসর্গ কেউই অনুধাবন করতে পারবে না। পিসিমার হাসি এল এই সাফল্যে। অকারণ এক ঝিলিক হাসি।... অথচ পিসিমা নিজে নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করতে পারেন না। অনেকটা রহস্যময় বলেই মনে হয়। হাসেন, কথা কন, পরিহাস করে বেড়ান, পরিহাস উপলব্ধি করে মজা পান, প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে ছিটকে দেন, কিন্তু তবু নিজের বিশেষ পছন্দ অপছন্দের সংস্কার বোধকে জাগ্রত করে রাখেন। বাইরে থেকে মনে হবে পিসিমা মানুষটি অত্যত সাধারণ, এতটুকু পর্যন্ত নাটকীয় নয়। কিন্তু কেমন যেন এক ধরণের তিনি; এবং ঐ কেমন ধারা ধরণটির জন্যেই দুর্বোধ এবং অদ্ভুত ঠেকে মাঝে মাঝে।

নলিনীকে একদিন বললেন--তুমি আছ বাবা--আমাদের কত যে উপকার হচ্ছে। এই বিদেশ বিভুঁয়ে তুমি না থাকলে আমরা অকূলে ভাসতাম।

হ্যাঁ, বলে নলিনী বাইরে চলে গেল।

টুকি রান্না ঘর থেকে নলিনীদার প্রশংসা করলে--খুব খাটে পিসীমা, যখন যে কাজটা বলা হোক কেন, না নেই নলিনীদার কাছে।

পিসিমা একটু হতচকিত হলেন--তুই থাম টুকি। নলিনীর কথায় তুই যে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি। আমার চোখ নেই, দেখতে পাইনা আমি?

পিসিমা যেন সন্ত্রস্ত এবং চঞ্চল হয়ে উঠছেন, অহেতুক একটা সচেতনতা পিসিমার সহৃদয় চিত্তটাকে বারবার নাড়া দিতে লাগল। নলিনী এবং টুকি--উভয়ের জীবনের গতি একমুখী কিনা কে জানে? সবচেয়ে করুণ হচ্ছে এর ওপর, পিসিমা নলিনীকে ফেলতে পারেন না, সন্তানহীন বন্ধ্যা মনের সমস্ত শিকড়গুলিই নলিনীকে আঁকড়ে ধরে রসপান করছে ঃ অথচ টুকি ভাইঝি। তার প্রতি পিসিমার দরদ ও মমতাবোধ অহেতুক নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক। আনুপূর্বিক চিন্তা করতে বসলে পিসিমার সমস্ত ঘুলিয়ে ওঠে।

টুকি এবং নলিনী হাস্যে লাস্যে লঘু এবং চপল হয়ে উঠুক--এটা পিসিমার মনের কোঠায় বার বার ধাক্কা খেয়েছে। আবচেতনিক বিশ্লেষণ কি এর-- তা পিসিমার অস্থির মন বুঝে উঠতে পারেনি সত্য, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের কথাটা হঠাৎ মনে উঠে পড়ে, সম্পূর্ণ অকারণে না হলেও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ত' বটেই। আঠারো বছর বয়সেই শাঁখা সিঁদুর খোয়ানোর পর পিসিমার মনটা এমনি ধারা হয়ে যায় যদি--তাঁর তরফ থেকে করণীয় নেই কিছু। ঈর্ষা? পিসিমার হাসি পায়--তির্যক অসরল হাসি। নলিনী তাঁর ছেলের মতই, টুকি তাঁর আপন ভাইঝি!

পিসিমার রান্না করবার সময় সেদিন নলিনী ঘরে বসে অনেক দিনের পুরানো একখানা খবরের কাগজ পড়ছিল। কি কাজে একবার টুকি এসে চলে গেল। পিসিমার চোখে তা এড়াল না। তিনি রান্নাঘর থেকেই নলিনীকে ইসারায় ডাকলেন এবং আস্তে আস্তে বললেন,--ও-নলিনী, রাতদিন ঘরে বসে বসে ভাবো কি বলো ত' বাবা? যাও না বেড়িয়ে-টেরিয়ে এসো, মন ভালো থাকবে'খন। ভাতের এখনও ত দেরি আছে কিছু।

নলিনী বেরিয়ে গেলে পিসিমা এলেন টুকির কাছে। অত্যন্ত ঝাঁঝে বলে উঠলেন তিনি--কি দরকার ছিল ছেলেটাকে এখন বাইরে বের করে দেবার? রাতদিনই ত খাটছে আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু বসেছে কি না বসেছে, অমনি তাকে তাড়ানো হল।

টুকি বিস্মিত হল--কি বলছ পিসিমা?

পিসিমা আরো উগ্র হ'য়ে উঠলেন—যেন কিছু জানেন না, বলি, এ-ঘরে নলিনীর সামনে না এলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেত? তুই এলি বলেই নলিনী বাইরে ঘুরে আসতে গেল—আমায় ও বলে গেল তাই। স্বরটা আরও একটু নীচু এবং মোলায়েম করে বললেন, নলিনীর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, ছোট বোনের মত তুই, তোকে দেখে অত কিসের লজ্জা রে বাপু! তা যাই হোক, টুকি, তুই আর ওর সামনে বেরোস নি মোটে। লজ্জাই যখন পায় ছেলেটা—প্রাণের ভয়ে বাছা এসে আমার কোলে মাথা গুঁজেছে যখন......

বিকালে নলিনী পিসিমাকে অত্যন্ত সংগোপনে জানালে—আমাকে এবার এখান থেকে চলে যেতে হবে পিসিমা। জানাশোনা অনেক লোকই আমার চোখে পড়ে যাচ্ছে এখানে। কাজে কাজেই নির্জনে অজ্ঞাতবাস হবে না।

আকাশ থেকে পড়েন পিসিমা—এমনি ধারা আশ্চর্যের ভঙ্গিতে এবং চোখ দুটি যথাসম্ভব ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও দরদী কণ্ঠে বললেন,—সে কি হয় বাবা? কোথায় ছেড়ে দেব আমি ছেলেকে। থাক না তোমার চেনাশুনো লোক, মার কোল ছাড়িয়ে যম পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না সন্তানকে, তার আবার অন্য কেউ। ও-কথা তুই মুখে আনিস নি বাবা, যাবার কথা কোনদিন আর বলিস নি।

সহানুভূতি এবং স্নেহের সরল অভিব্যক্তি যা তা এই কথাগুলির মধ্যে ষোলআনাভাবে নিহিত রয়েছে। নলিনী পিসিমার আত্মীয়তায় এবং হৃদ্যতায় একেবারে ভেঙে পড়বার মত হ'ল। তার শীর্ণ চোখও অশ্রুশ্যামল হয়ে উঠলো।

টুকির জ্বর হল। পিসিমা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। আবার সে জ্বর যে সে জ্বর নয়, টাইফয়েড হবার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়েই সে জ্বর দেখা দিলে। পিসিমা নলিনীর হাত ধরে কেঁদে উঠলেন—কি হবে বাবা

নলিনীও ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়ে পড়ল। টুকির শুশ্রূষার ভার পিসিমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারের কাছ আর বাড়ি করতে হবে সব সময়। পিসিমা স্বজাতি, কাজেই রান্নার ভারটা নলিনী নিজেই নিয়ে নেবে'খন। পিসিমা একাই টুকির কাছে থাকুক।

পিসিমা কিন্তু একটুতেই ডাকতে শুরু করে দিলেন,—নলিনী বাবা, জ্বরটা দেখে যা। টুকি যে আমার কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এইখানে পাশে এসে বসো বাবা, আইসব্যাগটা মাথায় চেপে ধরো। নলিনী—কি যে হবে?

পিসিমা টুকির কপালে পয়সা স্পর্শ করে তুলে রাখলেন—টুকি সেরে উঠলে তিনি বিশ্বনাথের পুজো দেবেন ঘটা করে। বিশ্বনাথ যেন তাঁর এই অন্তকামনাকে ফলবতী করেন।

রমেশবাবুকে চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে। নলিনীই লিখে দিয়েছে টপ করে আসতে—টুকির ভয়ানক বাড়াবাড়ি অসুখ। কিন্তু রমেশবাবুর কাছ থেকে উত্তর বিশেষ আশাপ্রদ এল না, কাজের চাপে তিনি যেতে পারলেন না; কাশীতে কোনো হাসপাতালে পাঠাবার সুযুক্তি এবং সদুপদেশ দিয়ে তিনি অত্যাবশ্যকীয় তার করে দিলেন।

পিসিমার নাড়ি ছেড়ে দেবার লক্ষণ দেখা দিল। পরের মেয়ের হাতে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করবার প্রচণ্ড লোভ যে পিসিমার না ছিল তা নয়, কিন্তু এ-ধরণের বিপদও যে যখন তখন দেখা দিতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি কতকটা অচেতন না থাকুন, অবচেতন যে ছিলেন—এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি ঘন ঘন পাওয়া যেতে লাগলো।

টুকি এবং নলিনী সম্বন্ধে পিসিমার যে ভাব মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, টুকির অসুখে তার প্রকাশ উপলব্ধি করা গেল না। নলিনীকে এক মিনিটও পিসিমা অন্যত্র ছেড়ে থাকতে পারছেন না। তাছাড়া, এমন শক্ত রোগীই পিসিমা কোনদিন সেবা-শুশ্রূষা করেন নি! তিনি কটুভাষায় অদৃষ্টের প্রতি বক্রোক্তি করলেন এবং যারা কোলকাতা থেকে তাঁকে দেশছাড়া করে বিদেশে এমন অসহায়ভাবে (একমাত্র নলিনী ছাড়া, তিনি ত অসহায়ই!) নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে সেই জাপান জাতিকেও তিনি মন্দ বললেন।

টুকি সেরে উঠলো। পিসিমা বিশ্বনাথের উদ্দেশে পুজো দিতে যাবার তোড়জোড় করলেন। টুকিকে এক রাখা চলে না, অথচ নলিনীকেও রেখে যাওয়া যায় না টুকির কাছে। একটি অনূঢ় যুবকের কাছে একটি ষোড়শী মেয়ের নির্জনে থাকাটা তিনি কখনই বরদাস্ত করতে পারলেন না। কিন্তু উপায় কি?

নলিনী আস্তে আস্তে পিসিমার কাছে সরে এসে বললে,—পিসিমা, আমি এই ফাঁকে রান্না চড়াবার জোগাড় করি।

হৃষ্টচিত্ত হলেন পিসিমা। টুকির শয়নকক্ষে এসে হাজির হলেন তিনি। লঘু আনন্দের চাঞ্চল্যে তিনি বললেন,—টুকি, লক্ষ্মী মা, তুমি একটুখানি চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি পুজোটা দিয়ে আসি, প্রসাদ আর চরণামৃত এনে দেব। বিছানা ছেড়ে উঠো না যেন।

টুকি দুর্বলকণ্ঠে জবাব দিলে—শুতে আর আমি পারবো না পিসিমা। আমি না হয় নলিনীদা'র সঙ্গে বসে বসে গল্প করি গে।

চোখ দুটি কপালে তুলে পিসিমা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন,—সে কি রে টুকি? তুই কি ছোঁড়াটাকে সত্যিই তাড়াতে চাস নাকি? তোকে মোটেই সহ্য করতে পারে না, তোর সামনে আসতে চায় না মোটে—কতবার ও-বলেছে আমাকে। এই তোর অসুখের সময়ই দেখনা, কতবার বলেছে নলিনী যে, এখুনি চলে যেতে হবে আর থাকা যাবে না কাশীতে। ওই বিপদের মধ্যেও ত মা অমনভাবে যাবার কথা বলতে পেরেছে। কথায় বলে, পর আবার আপন হয়!

টুকি নীরব হয়ে রইল। পিসিমাকে কথা বাড়াবার সুযোগ দিলে বিশ্বনাথের পুজো দেওয়া দূরে থাকুক, আজকের আহারাদির কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাওয়া যাবে না। কাজেই প্রতিপক্ষের এমন অভাবনীয়ভাবে রণে ভঙ্গ দেওয়ায় পিসিমা একাই কিছুক্ষণ বকে বেরোবার উদ্যোগ করলেন। নলিনীকে একান্তে ডেকে বলেও গেলেন, টুকির সঙ্গে যেন সে কথাবার্তা না বলে। ওতে ও-মেয়ের রাগ হবে। এতটুকু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত টুকির আছে নাকি? এই যে নলিনী ওর অসুখে এত সেবা করলে, রাত নেই, দিন নেই—নীরবে বেচারির মত খেটে মরলে, সেকথা একবারও বলেছে নাকি টুকি? একটিবারও নামও করেছে নাকি? সে-রকম মেয়েই নয় ও।

সর্বশেষে এখুনিই তিনি ফিরে আসবেন, এই আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নলিনী রান্নাঘরের কাজে মন দিলে। মন্দ কি, অজ্ঞাতবাসের মধ্যে এই পলায়নপর সংক্ষুব্ধ জীবনের স্পন্দনপুঞ্জকে বাইরের লোক-চক্ষুর সম্মুখ থেকে গোপন করতে পারা যাচ্ছে, এইটাই নলিনীর সবচেয়ে বড় লাভ। টুকির প্রতি দুর্বলতা জাগা এমন কিছুই অনৈসর্গিক নয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত এবং চিন্তাক্লিষ্ট মনে ওই দুর্বলতার স্থান নেই। তাই নলিনী পিসিমার কথা অবমাননা করবার পক্ষে আদৌ প্রয়াসশীল নয়।

টুকিই কিছুক্ষণ পরে উঠে এল দুর্বল পায়ে আস্তে আস্তে ভর দিয়ে, আলতো এবং অগোছালভাবে। রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে ক্ষীণভাবে বললে, শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগল না নলিনীদা। কাঁহাতক আর শুয়ে থাকি বলো? শুয়ে শুয়ে আমার গা-হাত-পায় ব্যথা ধরে গেছে। তাই উঠে এলাম গল্প করতে।

নলিনী একটু বিচলিত হ'ল টুকিকে দেখে। রুগ্ন ও দুর্বল টুকি, এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। টুকি কথা বলেই চলেছে—কি রান্না করছ নলিনীদা?

এবার নলিনীর আর উত্তর দেবার অবকাশ ঘটলো না, সদর দোর থেকেই পিসিমা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। পিসিমাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থের মতো সাংঘাতিক মনে হল এক মুহূর্ত, কিন্তু

তিনি পরক্ষণেই আবেগপূর্ণকণ্ঠে বললেন,—রান্না আবার করবে কি ও? তেমন কি আর রাঁধতে শিখেছে কিছু? তরকারি হয় আলুনি রাখে, নয় নুনে পুড়িয়ে দেয়। তুই যাতো মা, ঘরে গিয়ে বোস গে, পায় ঠান্ডা লাগছে, আবার কোথা দিয়ে কি হবে। এই নে প্রসাদ নে।

প্রসাদ এবং চরণামৃত দিয়ে টুকিকে তিনি কোলে তুলেই শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন। পায়ে ঠান্ডা লাগলে সে ঠান্ডা মাথায় উঠবে—এ-জ্ঞান পদ্মীপিসির আছে। টুকি শুধু অসহায়ভাবে নলিনীর দিকে একবার তাকালে। নলিনী পিসিমার ব্যস্তসমস্ত হয়ে টুকিকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমাটি দেখে তৃপ্ত হয়ে উঠলো।

এক মাস পরে টুকি সম্পূর্ণ সেরে উঠলো।

পিসিমার কাশীর জীবন সহনীয় হয়ে উঠেছে। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শুরু করে দিলেন। তীর্থে এসে এতদিন পরে তাঁর মনটা হাল্কা এবং নিশ্চিন্ত হল। মন খারাপ হলে বিশ্বনাথের মন্দিরে ভাইঝিকে নিয়ে গিয়ে বসেন, মন ভালো থাকলে সাংসারিক হিসাব নিকাশের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। সব সময়ই টুকি এবং নলিনীর সম্পর্কে সচেতন থাকতেন কিন্তু।

রাত্রে পিসিমার ঘুম ভেঙে গেল। ও পাশে নলিনীর ঘরে কিসের আওয়াজ হচ্ছে স্পষ্টভাবে। তিনি উঠলেন, বাইরে এসে দেখলেন—নলিনীর ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে নলিনী ফোঁপাচ্ছে। পিসিমা দরজার সামনে এলেন, বললেন—নলিনী, কাঁদছিস কেন রে?

নলিনী অশ্রুম্লান চোখদুটি তুলে পিসিমার দিকে তাকালে। নলিনীর হাতে একখানা কিসের চিঠি। পিসিমা দূর থেকে তা স্পষ্টই দেখতে পেলেন। এই রকম একখানা কাগজই না তিনি আজ দুপুরে টুকির হাতে দেখেছিলেন! পিসিমার মাথায় রক্ত উষ্ণ এবং চঞ্চল হয়ে উঠলো। তিনি নলিনীকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে বললেন। বললেন অবশ্য মৃদুভাবেই—আমার কি হাত আছে বাবা? টুকির বাবাই চিঠি লিখেছে আজ, আজকের মধ্যেই তোমাকে যেতে বলেছে। বলি বলি করেও বলতে পারিনি আমি কথাটা। কিন্তু কি করবো বাবা? ওই টুকিই যত নষ্টের গোড়া। ওইত' কতখানা করে বাবাকে লিখেছে তোমার নামে, অপবাদ দিয়েছে কত, নইলে রমেশ দেয় কখনো এমন চিঠি? অথচ তুমিই ত' বাবা যমের দোর থেকে ওকে ফিরিয়ে আনলে।

নলিনীকে আর কিছু শুনতে হ'ল না। সে পিসিমাকে নমস্কার করে ওই অতল অন্ধকার গভীর রাত্রেও পথে বেরিয়ে পড়ল। পথেই যার ঘরবাসা, সেই বেদের জীবনে নীড়ে এই ক্ষণিকের বিশ্রামের মূল্য কিছু নেই। সোজা চলতে শুরু করলে।

পিসিমা টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢিপ করে শুয়ে পড়ল, আর সেই শব্দে টুকি জেগে উঠলো, পিসিমার এই অস্বাভাবিকতায় সে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে পিসিমা, ভয়টয় পেলে নাকি?

অশ্রু চাপতে না পেরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে পিসিমা বললেন—নলিনী চলে গেল আজ এই মাত্র। কত বারণ করলাম, হাতে পর্যন্ত ধরলাম, কিছুতেই শুনলো না সে। কত বোঝালাম—তুমি চলে গেলে টুকির আমার বড় কষ্ট হবে, দুজনে বেশ আছো ত আমাকে ঘিরে। কেন চলে যাচ্ছো। কিন্তু আমার কোন কথাই সে শুনলো না মা। গোঁ করেই চলে গেল।...পর এমন ধারাই হয় বটে!

বেদনাপ্লুত উচ্ছ্বসিত পিসিমা কান্নায় টুকরো টুকরো হতে লাগলেন। পিসিমা এত নরম, এত কোমল। তিনি বিশ্বনাথের উদ্দেশে আকুল আবেদন জানালেন—নিঃসহায় ছন্নছাড়া ছেলেটির মঙ্গল যেন হয়। মনটা তাঁর হু হু করে উঠলো। পিসিমার কেবলই মনে হতে লাগলো—গৃহহারা পথিক ছেলেটি হয়তো জনহীন অন্ধকার পথ ধরে ধরে কোথায় চলেছে একেবেঁকে। রাত্রে মাথা গোঁজবার স্থান নেই, দিনে বিশ্রাম করবার ডেরা নেই। মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই তার...

পিসিমা কান্নার মধ্যে অজস্রভাবে খণ্ডিত হয়ে পড়লেন।

টুকি আহত হল। নলিনীদা সত্যিই চলে গেল। এক মুহূর্তেই যেন তার সমস্ত জগৎ আজকের এই অন্ধকার রাত্রির মতই নিষ্প্রভ জ্যোতিঃহীন হয়ে উঠলো। সে কাতর হয়ে বললে—আজ গুপ্ত নামে নলিনীদার ভাই একখানা চিঠি দিয়েছে। দুপুরে আমি চিঠিখানা দেখছিলাম, ওর মায়ের খুব অসুখ। তাই বোধ হয় মন খারাপ হয়েছে, নলিনীদা চলে গেছে।

পিসিমা কাপড়ের আঁচল দিয়ে যে দুফোঁটা জল জমা ছিল চোখে তাই মুছলেন, কিন্তু আরও বেশী অশ্রু এসে এবার চোখে জমা হল ঘনভাবে।

রাত্রি আজ অন্ধকার। অন্ধ অশ্রুর ভেতর দিয়ে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের আকাশের তারা দেখা গেল না। ধীরে ধীরে শুধু মনের নিভৃত কোণে বেদনা পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে গাঢ়তর হতে লাগলো। নলিনী চলে গেল, পিছনে ফেলে রেখে গেল তার জীবনেতিহাসের সামান্য কয়েকটা ছেঁড়া পাতা, কিন্তু এর মধ্যে পিসিমার বিরাট অধ্যবসায়ের প্রকাণ্ড অধ্যায় লিখিত আছে। পিসিমা জল মোছবার জন্যে আবার কাপড়ের আঁচল তুললেন চোখে, কিন্তু এবার অশ্রু বাধা মানল না, উচ্ছ্বসিত হয়ে প্লাবিত হয়ে উঠলো।
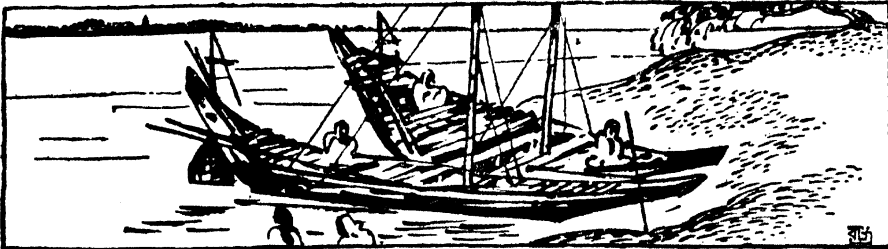
ইয়াপ দ্বীপের বৃহৎ টাকা

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

আধুনিক জগতে টাকার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা' সকলেই জানেন। আদিম কাল ছিল বিনিময়ের যুগ—লোকে তখন টাকার মর্মই বুঝতো না। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝলো বিনিময় প্রথার অসুবিধা। তখন লোকে এই বিনিময় প্রথাটা সোজা করবার জন্যে এই বিনিময়েরই একটা মধ্যস্থ ঠিক করে নিলে। নানান দেশে নানান রকমের টাকার উদ্ভব হল। এই রকম করে কড়ি, মাদুর, নারকোল, পাথর, তামা, দস্তা, সিসে ইত্যাদি সব রকম জিনিসকেই এক এক দেশ বিনিময়ের মধ্যস্থ হিসাবে চালিয়ে আসছে। এত গেল আগের কালের কথা কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও এমন এক দেশ আছে যেখানে পাথর বিনিময়ের মধ্যস্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর এই পাথুরে টাকা এক একটা হচ্ছে গরুর গাড়ীর চাকার মতন।

ফিলিপাইনের প্রায় ৮০০ মাইল পূর্বে "ইয়াপ" নামে একটা দ্বীপ আছে যেখানে এই পাথুরে টাকা চলে। এর চেয়ে বড় এর চেয়ে আশ্চর্য টাকার খোঁজ পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এটা নিশ্চয় যে হঠাৎ যদি একদিন দেখা যায় একজন লোক প্রায়ই তারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ একটা টাকা ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলেছে তাহলে সেটা আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হবে। কিন্তু ইয়াপ দ্বীপে এ ধরণের ব্যাপার একটা আশ্চর্য কিছুই নয় যেহেতু সেখানে হামেসাই এরকম দেখা যায়। এই ধরণের এক একটা টাকাকে যদি খাড়া করে রাখা যায় তাহলে সেটা প্রায় দু'মানুষের সমান উঁচু হতে পারে। প্রত্যেক টাকার মাঝখানে একটা করে ফুটো থাকে, দরকার হলে তার মধ্যে দিয়ে একটুকরো গাছের ডাল দিয়ে বহন করা হয় বা টেনে নিয়ে যাওয়া চলে। ইয়াপ দ্বীপ জপানীদের অধিকারে, তাই তার প্রধান শহরে অবশ্য জাপানী টাকাই চলে, কিন্তু দ্বীপের একটু ভেতরে গেলেই জাপানী ইয়েনের বদলে এই রকম পাথুরে টাকা চলছে দেখা যায়।

আমাদের দেশের কোন মহিলা বাজার করতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ছোট্ট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ.........তার থেকে দরকার মত টুক করে খুলে জিনিস কেনবার টাকা বার করে দিচ্ছেন। কিন্তু ওদেশে হামেসাই দেখা যায় যে কোনও বিশিষ্ট মহিলা বাজারে চলেছেন আর তাঁর পিছন চলেছে তাঁর চাকর কাঁধের ওপোর টাকা নিয়ে। যদি টাকা ছোট হয় তো একজন চাকরেই চলে, কিন্তু বড় টাকা হলে সেই অনুপাতে বহনকারীর সংখ্যাও বেড়ে চলে। এটা না বললেও চলে যে সে টাকা টোকিওতেও চলবে

কাঁধের উপর টাকা নিয়ে বাজারে চলেছে

না, আমেরিকাতেও চলবে না, ভারতবর্ষেও চলবে না, কিন্তু তারা তা দিয়ে বেশ বেচা-কেনা চালিয়ে নেবে। হঠাৎ কোনও বাইরের ভ্রমণকারীর টুপিটা হয়তো গাঁয়ের মোড়লের পছন্দ হয়ে গেলো। সে চাইলে সেটা কিনতে......অবশ্য দাম দিয়ে। ফলে হয়ত দেখা গেল যে মোড়লের চারজন চাকর একটা টাকা নিয়ে হেইয়ো জোয়ান......সাবাস জোয়ান করতে করতে এগিয়ে আসছে টুপির অধিকারীর দিকে। এই টাকা চালাতে গেলে চাকরের সংখ্যা একটু বেশী হওয়া দরকার নয় কি?

এত বড় টাকার প্রচলন যে কি করে হ'ল এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ইয়াপ দেশে এ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত গল্প আছে;—বহুপূর্বে ইয়াপবাসীরা খুব শান্তিপ্রিয় ছিল। এ দেখে এক অপদেবতার খুব হিংসে হয়। অপদেবতাটি চিন্তা করতে লাগলো কি করে এদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করা যায়। এর জন্য তিনি হয়ত কোনও লোককে প্ররোচনা দিচ্ছেন পাশের বাড়ির নারকোল চুরি করার জন্যে; কিন্তু যাকে প্ররোচনা দিচ্ছেন তার নারকোলের অভাব নেই তাই সে আর চুরি করবার দরকার বোধ

করলে না। তখন তিনি আর এক উপায় বের করলেন। এই দ্বীপের পাশে তামিল নামে আর একটা দ্বীপ আছে; এই দ্বীপের রাজার কানে অপদেবতাটি কি যে মন্তর দিলেন তা' তিনিই জানেন,—রাজা কিন্তু তাই শুনে খানকতক ডোঙা সমুদ্রে ভাসালেন পেলিউ নামে আর একটি দ্বীপের উদ্দেশ্যে। এই দ্বীদের চারদিকে চকচকে পাথর (calcite) ছিল অনেক। রাজার হুকুম অনুযায়ী সেইগুলোকে নৌকাজাত করা হ'ল। অপদেবতাটি নাকি এও বলে দিয়েছিলেন যে, পাথরগুলো নৌকায় তোলার আগে যেন চাঁদের মত গোল করে নেওয়া হয়। যা হোক কোদাল কুড়ুল দিয়ে কেটে-কুটে পাথরগুলো তো দেশে এসে পৌঁছল। অপদেবতাটি কিন্তু সেই সঙ্গে সরল দেশবাসীর মনে পাথরগুলো নেবার এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললেন। তাই দেশবাসীরা রাজাকে নৌকা, নারকোল ইত্যাদি দিয়ে পাথরগুলো নিতে লাগলো। সেই থেকে পাথরগুলো দাঁড়ালো জিনিস বিনিময়ের মধ্যস্থ হিসাবে। এর পরই দেশের যত অশান্তি, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি। তাদের প্রাজ্ঞরা নাকি এখনও তাই তাঁদের ভাষায় বলেন,—"অর্থমনর্থং"।

টাকা হিসাবে এই পাথুরে টাকার সুবিধা কিছু কম নয়। প্রথমত জাল হবার ও দ্বিতীয়ত সংখ্যায় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় নেই। কারণ পাথরটা হচ্ছে Calcite (crystallised Carbonate of Lime); এই রকম পাথর ইয়াপ দ্বীপে পাওয়া যায় না বললেই হয়, অথচ লোকের পাবার ইচ্ছেটা সমান তালে চলেছে। যে জিনিসটা কম তার যে চাহিদা হবে এতে আশ্চর্য কি? তা ছাড়া জিনিসটা দেখতেও বেশ।

কানাঘুসোয় এই টাকার কথা শুনতে পেয়ে এক দুঃসাহসী স্পেনীয় কাপ্তেন তার জাহাজখানা ইয়াপ দ্বীপের উপকূলে লাগালে। একটু ভেবে দেখলে, সে যদি পেলু দ্বীপ থেকে

ইয়াপ দ্বীপের বড় টাকা। এর ব্যাস হচ্ছে ১২ ফুট

খানকতক ঐ রকম পাথর তার জাহাজ করে নিয়ে আসতে পারে তা'হলে বেশ কিছু লাভ করা যায়। স্পেনীয় কাপ্তেন তার জাহাজ নিয়ে পেলু দ্বীপের রাজার কাছে ঐ দ্বীপ থেকে কিছু পাথর আনবার অনুমতি প্রার্থনা করলে এবং এর বিনিময়ে সে যে রাজাকে অন্য জিনিস দেবে তাও জানিয়ে রাখলে। খানকতক ছোট্ট ছোট ছোট পাথরের সঙ্গে একখানা সুবৃহৎ পাথরও গোল করে কাটিয়ে যখন জাহাজে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তখন রাজা গেলেন রেগে, হেতু হল যে কাপ্তেন নাকি উপযুক্ত মূল্য দেয়নি। কাপ্তেন তাড়াতাড়ি পালাবার সময় ইয়াপে সেই সুবৃহৎ পাথরখানা ফেলে পালায়। সেটাই হচ্ছে ইয়াপের ব্যাঙ্কের সব চেয়ে বড় টাকা। দৈর্ঘ্যে প্রায় বার ফুট এবং ওজন প্রায় ২ টন। ইয়াপবাসীরা বলে যে এর চেয়ে বড় টাকা নাকি তারা দেখেছে। আর সেটা নাকি দৈর্ঘ্যে ছিল ২০ ফুট তবে পেলু দ্বীপ থেকে আনবার সময় সেই পাথরখানি ইয়াপের উপকূলেই ডুবে গিয়েছিল। জলে টাকাটা পড়লেও তার দামটা জলে পড়েনি। সেই টাকা দিয়ে এখনও কেনা-বেচা চলে। সেই ডুবো টাকাটা হস্তান্তরিত না হলেও

(শেষাংশ ১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শামুকের খোলের মালার বিনিময়ে এক বোতল পেট্রোল কিনছে

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৮

পুরানো কর্মচারী নীলকমল ঘর ঝাঁট দিয়ে সমস্ত দোকান ঘরটায় গাড়ুর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিল; তারপর গদির পোড়ামাটির বড় লুক্সে দেড়কোর ওপরকার প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিল দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে। পুরানো পিতলের ধুনোচিটার রঙ এতো কালো হয়ে গেছে যে পিতলের বলে চেনাই যায় না। খানকয়েক নারকোলের ছোবড়ার খণ্ড ভরে ধুনোচিটাও নীলকমল ধরাল। ধূপের খুঁটিটা থেকে সামান্য একটু ধূপের গুঁড়া ছিটিয়ে দিল ধুনোচির মধ্যে। তারপর গদির তিনটা হাত-বাক্সের সামনে ধুনোচিটা বার কয়েক ঘুরাতে ঘুরাতে অনুচ্চস্বরে তিন চারবার বলল, 'হরিবোল, হরিবোল।'

গদির ওপর মাঝখানের বড় হাতবাক্সটা সামনে করে উটকোভাবে নবদ্বীপ এতক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে নীলকমলের সায়ং-কৃত্যের দিকে চেয়েছিল। হরিধ্বনি শুনে নিতান্ত অভ্যাসবশে হাত দুখানা জোড় করে একবার কপালে ছোঁয়াল। নীলকমল ততক্ষণে একটুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়ে হ্যারিকেনের চিমনি মুছতে বসেছে।

নবদ্বীপ বলল, 'এ সব আগেই ঠিক করে রাখতে পার না নীলু? এখন চিমনি মুছবে তবে আলো ধরাবে।'

নীলকমলের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলল, 'কি করব বড়কর্তা, আমাকে কি একমুহূর্তও বসে থাকতে দেখেন? এখন এ সব জিনিসও যদি আমাকে দেখতে হয়—রাখালকে ব'লে ব'লে আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম।'

নবদ্বীপ ওকথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'রাখালই তো গেল বুঝি সুবলের ওখানে?'

নীলকমল ঘাড় নাড়ল।

নবদ্বীপের ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যাসন্ধিই বাড়ি ফিরবে আজ। সুবলকে সেকথা বলেও রেখেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে অথচ সুবলের দেখা নেই। তার হিসাব-নিকাশ, তহবিল মিলানো আর হয় না। টাকা-কড়ির মুখ এই প্রথম কেবল দেখা আরম্ভ করেছে কিনা সুবল। মত্ততা তো থাকবেই। মনে মনে হাসলো নবদ্বীপ। অবশ্য সুবল যদি বলতো তার দেরি হবে তা হ'লে নবদ্বীপ আর তার জন্য অপেক্ষা করত না। এতক্ষণ প্রায় বাড়ি ধরধর হোত। কিন্তু এখন একা একা যেতে ভালো লাগে না। তা ছাড়া অন্য কারো চেয়ে সুবলকে সংগী হিসাবে পেতেই বেশী ভালো লাগে নবদ্বীপের।

গরহাটবারের দিনগুলিতে বেচা-কেনা যা হবার সকালে বাজারের সময়েই প্রায় শেষ হয়ে যায়। বিকালের দিকে দু এক-জন পাইকার আসে, আসে সমবয়সী অন্যান্য দোকানদাররা, তামাক খায়, পাঁচ রকমের কথাবার্তা বলে, জিনিসপত্রের বাজার দর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগে এ সব ব্যাপারে নবদ্বীপের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে বাজারের সবাই তাকে বিচক্ষণ বলে জানে। প্রয়োজনমত অনেকেই তার কাছে এসে বুদ্ধ পরামর্শ নেয়। কারবার নবদ্বীপের তামাকেরই, কিন্তু এমন কোন জিনিস নেই বাজারে নবদ্বীপ যার খোঁজ খবর রাখে না কিংবা ব্যবসা বোঝে না। কিন্তু ইদানীং মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে নবদ্বীপ, কেমন যেন অন্যমনস্ক বীতস্পৃহ দেখা যায় নবদ্বীপকে। গানবাজনা, কীর্তন ভাগবত যদি কোথাও হয় কাছে ধারে, নবদ্বীপকে আসরের মধ্যে গিয়ে বসতে দেখা যায়। দেখে মনে হয় সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে রস গ্রহণের জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য অন্য কোন অবলম্বন যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে নবদ্বীপ, শুধু কারবারপত্রে তার মন আর যেন আটকে থাকতে চাচ্ছে না। কিন্তু এ ধরণের মনোভাব বেশী দিন থাকে না নবদ্বীপের। হঠাৎ আবার একদিন ব্যবসায়ে তার দ্বিগুণ মনোযোগ দেখা যায়। কাজকর্মের শৈথিল্যের জন্য কর্মচারীদের ধমকায়। খুচরো খদ্দেরদের একটা পয়সাও ছাড়তে চায় না।

একটু পরেই নবদ্বীপের ছোকরা কর্মচারী রাখাল এসে ঘরে ঢুকলো। নবদ্বীপ বলল, 'কি বলল, হয়েছে তার?'

রাখাল জবাব দিল, 'আজ্ঞে বললেন তো, আসছি, তুই যা।'

নবদ্বীপ একটু হতাশব্যঞ্জক ভঙ্গি করে বলল, 'তবেই হয়েছে, তার 'আসছি' মানে তো আরো এক ঘণ্টা।'

কিন্তু এক ঘণ্টা লাগলো না, তার আগেই এসে সুবল আজ উপস্থিত হোল। সুবলও আজকাল আর খুচরো দোকানদার নয়। খেয়াঘাটে যাওয়ার পথটায় ক'বছর হোল সেও একটা ঘর নিয়েছে। হলুদ, আদা, শুকনো লঙ্কা আজকাল রাখী করছে সুবল। বাজারের অন্যান্য ছোটখাট দোকানদাররা তার কাছে থেকেই এসব জিনিস পাইকারী দরে কিনে নেয়। তাছাড়া কাছে-ধারের অন্য দু তিনটা হাটবাজার থেকেও লোক আসে সুবলের ঘরে।

সুবল হ্যারিকেন ধরিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, ঘরে ঢুকেই বলল, 'চলুন জ্যেঠামশাই। গাজনাহাটির একজন পাইকার এসেছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে একটু দেরী হয়ে গেল, তা বিনোদের কীর্তন আরম্ভ হতে দেরী আছে। সবে তো সন্ধ্যা হোল।'

নবদ্বীপ একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'কীর্তনের জন্য আর কি। বিনোদের কীর্তন যেন শুনিনিই না কোনদিন। সেজন্য

নয়। রাত-বিরাতে চলা-ফেরা করতে ভারি অসুবিধা হয় সুবল। যে পথটুকু আগে এক লাফে পার হয়েছি, এখন সেই পথে নামলেই চিন্তা হয় কখন ফুরোবে। রক্তের জোর কি আর চিরকাল সমান থাকে মানুষের ?'

নবদ্বীপের দিকে চেয়ে বেশ একটু মায়াই হয় সুবলের। এই ক'বছরে নবদ্বীপ যেন হঠাৎ বড় বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছে। বয়সও অবশ্য সত্তরের কম হয়নি। কিন্তু কিছুদিন আগেও তার বয়সটা এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যেত না। তা ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বহুদিনের ব্যাধি অম্লশূলটাও বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নবদ্বীপকে ভারি কাতর হয়ে পড়তে দেখা যায় আজকাল। এক একবার মনে হয় এ যাত্রা বুঝি আর টি'কবে না। কিন্তু অদ্ভুত বুড়োর জীবনীশক্তি। দুদিন যেতে না যেতেই আবার বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে খাদ আছে রাস্তায়। বর্ষার সময় যাতে নৌকো বেরোতে পারে সেজন্য জায়গায় জায়গায় খানিকটা ফাঁক রাখা হয়েছে। এ সব জায়গায় পাকা পুল করে দেবার জন্য টাকা নাকি মঞ্জুর হয়েই আছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একখানা তক্তাও দেখা গেল না। বর্ষার সময় কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারাই জুটে বাঁশের সাঁকো বেঁধে কাজ চালিয়ে নেয়। একটা মোটা বাঁশ থাকে পায়ের নীচে আর খানিকটা উঁচুতে অপেক্ষাকৃত সরু একটা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয় হাত দিয়ে ধরবার জন্য, কিন্তু জল শুকোতে না শুকোতে যে যত আগে পারে তাড়াতাড়ি সাঁকোর বাঁশ আর খুটোগুলি সরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়।

ওঠানামা করতে, বিশেষ করে রাত্রে সত্যিই বেশ একটু কষ্ট হয় আজকাল। একটা জায়গায় নামতে নামতে নবদ্বীপ খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'না আর পারিনে বাপু, একবার ঘাড় ধরে নামাবে, আর একবার কান ধরে ওঠাবে। এর চেয়ে আগের মেঠো পথই ছিল ভালো।'

ফিরে দাঁড়িয়ে সুবল হাত ধরে উঠতে সাহায্য করে নবদ্বীপকে। তার শক্ত সবল মুঠির মধ্যে লোল চর্ম, অস্থি-সর্বস্ব বুড়োর হাতখানা অসহায়ভাবে নিস্পন্দ হয়ে থাকে। অদ্ভুত অনুভূতি জাগে সুবলের মনে। এই মুহূর্তে নবদ্বীপকে তার প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে সে যেন ভাবতেই পারে না। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সে অনুভব করে নবদ্বীপের সঙ্গে। সস্নেহ শাসনের ভঙ্গিতে বলে, 'উঠতে নামতে পারেন না তা বললেই তো পারেন। তাতো নয়; নিজের গোঁ মত চলে এলেন চিরকাল। সব বয়সেই কি তা চলে ? পড়েটড়ে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটিয়ে বসবেন আর কি। আর সে মেড়োটাকেই বা বাড়িতে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন; সে কি এখন এ সব দেখা শোনা করতে পারে না ?'

ছেলের ওপর যত বিদ্বেষভাবই থাকুক, নিজে যত গালা-গালিই করুক, অন্যে সামান্য কিছু বললেও নবদ্বীপের কেমন যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। তবু এক্ষেত্রে স্পষ্টত সুবলের সে প্রতিবাদ করে না, বলে, 'তবেই হয়েছে। ওর হাতে দেখাশোনার ভার দিলেই দুদিনের মধ্যেই সব লোপাট হয়ে যাবে, দেখাশোনার আর কারো দরকারই হবে না তখন। কোন কাণ্ডজ্ঞান কি জন্মেছে ওর? একটা দশ বছরের ছেলের যে বুদ্ধি আছে, ওর তাও নেই।'

নবদ্বীপের কথার ভঙ্গিতে মনে হয় বুদ্ধি না থাকাটা সত্যিই যেন তেমন দোষের নয় মুরলীর পক্ষে। আর আসলে দশ বছরের বেশী বয়স যেন মুরলীর হয়নি আজো।

সুবলের মন আবার একটু একটু করে বিরূপ হতে থাকে। মুরলীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তা ছাড়া রাত্রে তো আপনি দোকানেই থাকতে পারেন ইচ্ছা করলে। আসা-যাওয়ার এমন কষ্ট তা হ'লে রোজ রোজ আর পেতে হয় না।'

সুবলের এ পরামর্শও নবদ্বীপ খুব ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না, বলে, 'এক একদিন তো তাই ভাবি, যাবো না আর বাড়িতে, এমন কোন টান তো আর নেই যে আসতেই হবে, তবু থাকতে পারি কই।'

খানিকটা দূর থেকেই বিনোদের বাড়ির খোলের আওয়াজ শোনা যায়। গানের পদ বোঝা যায় না, কিন্তু বিনোদের দরাজ সুমিষ্ট গলা এতদূর পর্যন্ত ভেসে আসে। এদিক থেকে পাড়ায় ঢুকে দুতিনখানা বাড়ির পরই বিনোদের বাড়ি। বাড়িগুলির ওপর দিয়ে যেতে নবদ্বীপ আর সুবলের চোখে পড়ে বাড়ি কয়েকখানায় যেন আর জনপ্রাণী নেই। একেকখানা বাড়িতে অনেকগুলি করে সরিক। ঘরগুলির বেশীর ভাগই তালাবন্ধ। সব বিনোদের কীর্তন শুনতে গিয়েছে। দু'একখানা ঘরে কেবল মিট মিট করে আলো জ্বলছে। নিতান্ত নতুন বউ যারা তারাই দু'একজন রয়েছে বাড়ি পাহারা দিতে।

বিনোদের বাড়িতে পা দিতেই দেখা গেল বিনোদ বিনয় করে যেমন বলেছিল আসর তত ছোট হয়নি। উঠানে, আনাচে-কানাচে একটুও ফাঁক নেই দাঁড়াবার মত। সমস্ত বাড়িটা লোকে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। দক্ষিণপাড়া থেকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এসে একদিকে বসেছে। পুবের দিকে একটা কোণ ঘেঁষে বসেছে নমঃশূদ্রের দল। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী নয়। এই পাড়ার লোকেই বাড়ি ভরে গেছে। ঘরের ভিতর, বারান্ডায়, পাড়ার ঝি-বউরা গিস গিস করছে।

নবদ্বীপ আর সুবলকে দেখে পাশের বাড়ির ফটিক সম্বর্ধনা করে বলল, 'আসুন ঠাকুরদা, এসো সুবলকাকা।' তারপর চাপাচাপি করে ফটিক তাদের বসবার জায়গা করে দিল। বিষ্টু সা হুঁকো টানছিল অনেকক্ষণ ধরে। নবদ্বীপকে দেখে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধর হে নবুদা।'

নবদ্বীপ হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল, কিন্তু টান দেওয়ার আগে বিষ্টুকে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'আছে কিছু এতে?'

বিষ্টু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, টান দিয়েই দেখ।'

দীঘলকান্দি থেকে নন্দকিশোর গোঁসাই এসেছেন। আসরের মাঝখানে বড় একখানা আসন পেতে তাঁকে বসানো হয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই দূর থেকেই দণ্ডবৎ হয়ে নবদ্বীপ

তাঁকে প্রণাম করল। নন্দকিশোর স্নিগ্ধ একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

কীর্তন তখন বেশ জমে উঠেছে। আশেপাশে দু'তিনখানা খোলের মৃদু মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। মন্দিরা বাজছে কয়েক জোড়া। বিনোদই মূল গায়েন। গোঁসাইকে বিনোদ প্রথমে অনুরোধ ক'রেছিল। কিন্তু তিনি পাল্টা বিনোদকেই অনুরোধ ক'রে গান গাইতে বলেছেন। নন্দকিশোর আজকাল আর তেমন পরিশ্রম করতে পারেন না। তাছাড়া তেমন গলাও আর নেই। নন্দকিশোর বলেছেন, 'নিজের বাড়ি ব'লে বুঝি সঙ্কোচ হচ্ছে তোমার বিনোদ? কিন্তু আসল ভক্তের কি আবার নিজের বাড়ি, আর অন্যের বাড়ির প্রভেদ আছে? আমি বলছি তুমি গাও। এতগুলি লোক এসেছে তোমার গান শোনবার জন্য। এ তো কথকতা নয় যে, আমার নাম শুনে তারা আসবে।'

নন্দকিশোর অত্যন্ত স্নেহ করেন বিনোদকে। শিষ্য তো এ পাড়ায় প্রায় তাঁর সকলেই, কিন্তু বিনোদকে তিনি শিষ্যের মতন দেখেন না, ছোট ভাইয়ের মতই দেখেন। অবশ্য বিনোদ নন্দকিশোরের সাক্ষাৎ শিষ্য নয়, তাঁর বাবার শিষ্য। কিন্তু বিনোদের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা। নন্দকিশোরের নিজের ছেলেমেয়ে কিছু নেই। কথকতা ক'রে এবং শিষ্যবাড়ি থেকে যা আয় হয়, তা তিনি নিজের খেয়ালেই ব্যয় করেন। মাঝে মাঝে তীর্থপর্যটনে বের হন, বিনোদ যায় সঙ্গে। কোন জায়গায় কীর্তন কথকতার আমন্ত্রণ পেলে বিনোদকে তিনি সঙ্গে নিতে ভোলেন না। তিনি বাড়ি থাকলে বিনোদও ডাকামাত্রই তিনি চলে আসেন। আর ঠিক শিষ্যবাড়িতে আসার মত এখানে আসেন না। বিনোদের বাড়ি যেন তাঁর নিজেরই বাড়ি। বিনোদের অবস্থার কথা জেনে নিজের গাঁট থেকেই পয়সা খরচ করেন এখানে এসে। বিনোদ মাঝে মাঝে জিভে কামড় দিয়ে বলে, "আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে হবে গোঁসাইয়া, বলেন কি?'

নন্দকিশোর হেসে বলেন, 'তোর সংসার চালাবার জন্য তো আর দিচ্ছি না, এ দিচ্ছি ভক্তদের সৎকারের জন্য, তা আমার বাড়িতেও যা, তোর বাড়িতেও তাই।'

আজও গোঁসাইর পায়ের ধুলো নিয়ে বিনোদ আসরে নেমেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই নিজের ভাবে বিনোদ নিজেই এত মত্ত হয়ে গেছে যে, মনে হয় তার বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। একখানা গরদের কাপড় বিনোদের পরণে। সাধারণত কীর্তন ভাগবৎ ইত্যাদির সময় এই কাপড়খানাই সে পরে নেয়। ফুল কোঁচাটা সামনে ঝুলানো। গায়ে কোন আবরণ নেই। তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ওপর কোন আবরণের প্রয়োজনই যেন হয় না। কেবল মাজায় একখানা রঙীন নীল চাদর বাঁধা। শীতে হোক, গ্রীষ্মে হোক, এই চাদরখানা প্রায় সব সময়েই সঙ্গে রাখে বিনোদ। ভারি পছন্দ করে বোধ হয় এখনো। কোমর খানিকটা বাঁকিয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বিনোদ তখন গাইছে, 'তোরা কে কে যাবি আয় রে, মন্মথ যায় রে।'

সমস্ত গোপীনীদের মন মথন ক'রে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপরূপ ভঙ্গিতে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। জীবন যৌবন মন প্রাণ সমস্ত তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। 'মন্মথ যায় রে।'

যতবার এই কলিটুকু বিনোদ তার অপরূপ সুর ও ভঙ্গিতে ফিরে ফিরে ধরছে, ততই এই অংশটুকুর মাধুর্য যেন বেশী নিবিড় হয়ে উঠছে।

এই দুটি লাইন আরও কতদিন পাড়ার লোকে শুনেছে। কিন্তু প্রতিবারই বিনোদের কণ্ঠে যেন তা নতুন হয়ে ওঠে—তার মাধুর্যের শেষ হ'তে চায় না। কীর্তন গাইবার সময় বিনোদ নিজে এত মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তার মুগ্ধতাই যেন সকলের মনে সংক্রামিত হয়ে যায়। ঘন ঘন বিনোদের রোমাঞ্চ হ'তে থাকে, চোখের জল বাধা মানে না। অভিভূত ও আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে অদ্ভুত আরাম আছে, বিনোদের সঙ্গে সকলেই যেন তার অংশ গ্রহণ করে এবং গ্রহণ ক'রে কৃতজ্ঞ হয়। এই বিনোদই যে পাড়ার সেই বিনোদ সাধু—যার সারল্য নিতান্তই বোকামির সামিল, যার বিষয় বুদ্ধিহীনতা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র, একথা এই মুহূর্তে ধারণায় আনা যেন সম্ভবপর হয় না। শুধু নিজের গভীর আবিষ্টতা আর সুমিষ্ট কণ্ঠের সাহায্যে অতিপরিচয়ের তুচ্ছতা থেকে বিনোদ যেন তার চারদিকে ক্ষণিকের জন্য অপরিচয়ের এক মায়ামণ্ডল সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে থেকেও যেন সে নেই, যেন অনেক দূরে চলে গেছে। হাত দিয়ে যেখানে ওরা ওকে স্পর্শ করতে পারছে না, ধারণায় আনতে পারছে না, মনের ভাবনা বেদনা দিয়ে।

এসব ব্যাপারে খুব গভীরভাবে আবিষ্ট কোনদিনই হ'তে পারে না নবদ্বীপ। এক সময়ে এ ধরণের মাতামাতিটাকে সে বেশ পরিহাসের চোখেই দেখত, দশায় পড়ে গড়াগড়ি যাওয়াটাকে তার কাছে ভক্তির লোক দেখানো আতিশয্য বলে মনে হোত। কিন্তু পাড়ার দু'চারজন চ্যাংড়া ছেলেরাই এ ধরণের সমালোচনা করে, তখন বুড়ো হয়ে এ ধারণার মনোভাব তার পক্ষে যে মানায় না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বার্ধক্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বেশ একটু দুর্বলতাই যেন এসেছে এ সব বিষয়ে। লোকে যেন না বলে, বুড়ো হয়েও লোকটার স্বভাব বদলালো না। নবদ্বীপের কেমন আশঙ্কা হয়, না বদলানোটাই বার্ধক্যের পক্ষে অশোভন।

আট ন' বছরের সুন্দরপানা একটি ছেলে নবদ্বীপের পিঠের ওপর বার বার ঝিমিয়ে পড়ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হলেও নিজের শুকনো হাড়ের ওপর বার বার ছেলেটি এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় শারীরিক কষ্টই হচ্ছিল নবদ্বীপের। অবশেষে এক সময় নবদ্বীপ বেশ একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, কে হে ছেলেটি, ঘুম পাচ্ছে তো উঠে চলে যা না বাড়িতে।'

বিষ্টু ছিল পাশেই বসা। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আয়রে নিমু, এদিকে আয়। একে চিনতে পারলে না নবুদা? এ আমার নাতি, মেজ ছেলে মুকুন্দের ঘরের।'

বিষ্টু সার নাতি হলেই যে তার নবদ্বীপের পিঠের ওপর

ঢুলে পড়বার অধিকার জন্মাবে তা নয়। তবু অভিভাবকের সামনেই ছেলেটিকে অমন করে ধমকানোর জন্য বেশ একটু লজ্জিত হোল নবদ্বীপ। বলল, ওঃ, তোমার নাতি? তাই বলো! তা ওকে এখন কারো সঙ্গে বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও না বিষ্টু, ছেলে মানুষ, কেন মিছামিছি কষ্ট পাচ্ছে।'

অনেক সময় চোখেই ঠাহর হয় না, অনেক সময় আবার পরিচয় না করিয়ে দিলে সমবয়সীদের এসব পৌত্র প্রপৌত্রদের যথার্থই চিনতে পারে না নবদ্বীপ। লোক কি কম হয়েছে পাড়ায়। আদাড়ে বাদাড়ে যেখানে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে কেবল ঘর তুলছে। লাগা লাগা ঘিচি ঘিচি সব ঘর, আর এক একটা ঘরে লোকজন ছেলেপুলে একেবারে ঠাসা। নবদ্বীপ আর একবার আসরটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত বাড়িটায় আর তিল ধরবার জায়গা নেই। ভাবলে বিস্ময় লাগে, একই বংশের একই গোষ্ঠীর লোক এরা। কোন বাড়িতে কেউ হলে কি মরলে পাড়া-শুদ্ধ এখনো প্রায় সকলেরই অশৌচ বাজে। কারো বা ডুব মাত্র, কারো বা তিন দিন, আর দু-এক পুরুষের মধ্যে হোলে তিরিশ দিন। এমনো হয়, একই ঘরে বুড়োকর্তার হয়তো একমাসই অশৌচ বেজেছে, আর তার নাতি নাতনীরা ডুব দিয়ে মুক্ত হয়ে এলো। সব এরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কিন্তু জন্মমৃত্যু ছাড়া সব সময় কি সে কথা মনে রাখা যায়?

বিষ্টু বলল, 'গান কেমন লাগছে নবুদা?'

নবদ্বীপ মাথা নাড়ল, 'না, যত ঠাট্টাপটকেরাই করি না, গানের নিন্দা কেউ করতে পারবে না বিনোদের।' কোন সাজ-পোষাক নেই, সিন সিনারি নেই, নতুন কোন বিষয়বস্তুও নেই। সেই চিরকালের রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাও গাইছে বিদেশী এমন কোন নামকরা কীর্তনীয়া নয়, যার সঙ্গে একটা অপরিচয়ের মোহ জড়ানো থাকতে পারে, বিস্ময় কৌতূহলের স্পর্শ পাওয়া যেতে পারে যার সংস্পর্শে। কীর্তন গাইছে পাড়ারই বিনোদ ছোকরা। তবু লোক জমতে বাকি থাকেনি। এত এক ঘেঁয়ে এদের জীবনযাত্রা যে, কোন রকম একটু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কোথাও হলেই তা গ্রহণ করবার জন্য এদের সর্বাঙ্গমন যেন উৎসুক হয়ে ওঠে।

কীর্তন ক্রমেই বেশ জমে উঠছিল। শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনাটা কোন কোন জায়গায় এক আধটু শ্রুতি-গোচর হয়ে উঠলেই ফটিক সা দাঁড়িয়ে উঠে কড়া ধমক ঝাড়ছিল। মায়ের কোলে শিশুরা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠলেও ফটিক বিরক্তি গোপন না করে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'মাই দিন মুখে, মাই দিন।' এ সব সামান্য গোলমালে তেমন কোন রসভঙ্গ হচ্ছিল না। হঠাৎ বিনোদের বাড়ির পিছারায় কলা বাগানটার দিকে একটু বেশী রকমের সোরগোল উঠলো যেন। ইতিমধ্যেই কয়েকজন লোক উঠে গিয়ে ওদিকে ভিড় জমিয়ে তুলেছে। শা[illegible] ফটিক তাদের বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কি ব্যাপার, হয়েছে কি? গানটাকে কি তোমরা মাটি না করে ছাড়বে না?'

ক্রমশ

ইয়াপদ্বীপের বৃহৎ টাকা

(১৬১ পৃষ্ঠার পর)

উত্তরাধিকারিত্ব বদলে চলেছে। কথাটা এই রকম দাঁড়াল,—আমাদের দেশে কেউ যদি বলে যে তার ব্যাঙ্কে এত টাকা আছে তো জনৈক ইয়াপবাসী বলবে যে তার একটা টাকা আছে সমুদ্রের ওই জায়গায়।

বড় বড় টাকাগুলো একটা বাড়ির সমুখে রাখা হয়, যেমন আমাদের দেশে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে; তার দেশীয় নাম হ'ল "ফেবাই" (Febai)। বড় টাকা তারা বাড়ির বাইরে রাখারই পক্ষপাতী, কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে, "আমার যে এত বড় টাকা আছে তা' লোককে ত' দেখাতে হবে?" সে টাকা চুরি করবার উপায় নেই, কারণ প্রথমত তা বিদেশে চলবে না, দ্বিতীয়ত দেশে প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন অন্য কেউ ব্যবহার করলে ধরা পড়ে যাবে। টাকাটা যে কার সম্পত্তি তা' সব সময় সর্বজন বিদিত থাকে আর প্রত্যেক অধিকারী তার টাকাকে চেনে। কোনধারে কতখানি ভাঙা আছে কোনধারে কতখানি ফাটা এই সব দিয়ে। যেমন বড় টাকাগুলো বাইরে রাখে তেমন ছোটোগুলো ভিতরে রাখে। চুরি যাওয়ার চেয়ে সম্মানহানির আশঙ্কা তাদের বেশী। যদি কেউ জানতে পারে যে অমুক লোকের মাত্র ৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটা টাকা আছে তাহ'লে কি লজ্জার কথা? এই সম্মান থেকেই তাদের ঘরোয়া বিবাদের আমদানী। বড় টাকা নিতে সবাই চায়। টাকা ধার দিয়ে দিয়ে যখন কোনও লোকের একটা বড় টাকা পাওনা হবে, তখন সে বেশ গর্বের সঙ্গে সেই টাকাটা তার বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে দেবে।

ছোটখাট লেনদেনের ব্যাপারে তারা অন্য ধরণের টাকা ব্যবহার করে। শামুকের খোল কাঁকড়ার খোল ইত্যাদি দিয়ে মালা গেঁথে তারা টাকা তৈরী করে। পাশের এক দ্বীপ থেকে এক রকম সুক্ষ্ম কাপড় এনে তারা "ফেবাই" জাত করে রেখেছে। এই ধরণের জিনিস দিয়ে তারা আশেপাশের দ্বীপগুলির সঙ্গে লেনদেন চালায়। এখন এর বিনিময় মূল্য দেখা যাক। গুয়াম দ্বীপে ১ ফুট একটা টাকার দাম প্রায় পঁচাত্তর ডলার। পিলু দেশের এই টাকার দামে কিছু কম তবুও এক কোমর সমান একটা টাকায় ৪০০০ নারকোল পাওয়া যায়, আমেরিকায় যার দাম হ'ল প্রায় বিশ ডলার। এক মানুষ সমান একটা টাকা দিয়ে তাদের দেশে গোটাক-এক গাঁ আর কিছু আবাদী জমি পাওয়া যাবে আর দু'মানুষ সমান টাকা ত' অমূল্য জিনিস।

ইয়াপের টাকশাল অর্থাৎ অর্থের জন্য খননকার্য এখন বন্ধ তবুও তার দাম কমে আসছে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে, জাপানী টাকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইয়াপের টাকা ঠিক মত পারছে না। কিন্তু তার চেয়েও আর একটা বড় কারণ আছে। ইয়াপের অধিবাসী সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে, কিন্তু টাকার অস্তিত্ব রয়েছে পুরো মাত্রায়, তার একটাও এ পর্যন্ত ক্ষয় হয়নি। যদিও এইভাবে টাকার দাম কমে আসছে সত্যি তবে একেবারে সম্পূর্ণভাবে চলে যাবে না তার কারণ হচ্ছে সে টাকার সম্মান আর তার সঙ্গে জড়ানো পুরানো ইতিহাস। এই রাক্ষুসে টাকা-গুলোর সরে পড়বার কোনও লক্ষণ নেই। বাড়ির সরাই মরে গেছে অথচ তাদের টাকাগুলো গাদা গাদা করে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপোর পড়ে আছে।

পাঁচামিশেলী

— শ্রীপঞ্চক

সমগ্র চীন অভিযানে জাপানীরা অস্ত্র হিসাবে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করার কথা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছে। গ্যাসের প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশাদি সম্পর্কীয় সমস্ত নথিপত্র নষ্ট করার কড়া হুকুম আছে। জাপানীরা 'গ্যাস' কথাটি ব্যবহার করে না, সে জায়গায় বলে 'বিশেষ বাষ্প।'

জাপানী সেনা নানাপ্রকার গ্যাস অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। যুদ্ধ-দর্শীরা বলেন যে, জাপানীরা ব্যাপকভাবে গ্যাস ব্যবহার করার জন্য সম্পূর্ণ তৈরী।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অনেকগুলির ক্ষুদে সংস্করণ জাপানীরা আবিষ্কার ক'রেছে। যেমন দু'মানুষের সাবমেরিন, ক্ষুদে ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। এই ক্ষুদে ট্যাঙ্ক ওজনে তিন টন এবং তার মধ্যে থাকে শুধু একজন চালক ও একজন গোলন্দাজ। লম্বায় ১০ ফিট এবং উচ্চতা ৫ ফিট। ছোট শোবার ঘরেও তাকে অনায়াসে রাখা যায়। এতে থাকে একটা মেসিনগান এবং গতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল। আরও এক রকমের ঐ আয়তন ও ওজনের ট্যাঙ্ক আছে, তাতে খালি গোলন্দাজ থাকে দু'জন, দুটো মেসিনগান এবং তার গতি ৩৩ মাইল।

চীনেতে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মতৎপরতা উচ্চহারের দেখা গিয়াছিল, কিন্তু মালয়ে তা অদ্ভুত মনে হয়। পশ্চাদগামী বৃটিশ সৈন্য কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতু নামমাত্র সময়ে তারা মেরামত ক'রে ফেলে, অনেক সময়ে বেশ গোলাবর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়েই।

মালয়ে একবার, কুয়ালালামপুরের দক্ষিণে বৃটিশ সৈন্য স্থানত্যাগ ঘোষণা করে এবং সেতু ধ্বংস ও রাস্তাবন্ধেরও কথা ছিল তাতে। পরদিনই বৃটিশরা জানায় যে, মাত্র ২৪ ঘণ্টা পূর্বে যে রাস্তা তারা সম্পূর্ণ অচল ক'রে এসেছিল, তার ওপর দিয়ে চালিত ১০০০ জাপানী যানের ওপর তাদের বিমান মেসিনগান ছোঁড়ে।

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বিমান ঘাঁটিকে ৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় কার্যকরী ক'রে তোলারও জাপানীরা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

জাপানী সৈন্যদের বহু বছর ধরে আত্মগোপন করে শত্রুদেশে প্রবেশ করার বিদ্যা শেখানো হ'য়েছে। মালয়ে, বার্মায় ও জাভাতে জাপানীরা দৈহিক শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে, যাতে তারা জঙ্গল, জলা এবং ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গোপনে এগিয়ে যেতে পেরেছে।

তারা নিজেদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়েছে, তদ্দেশীয় পোষাক পরেছে, বানরের মত গাছে আরোহণ করেছে এবং জঙ্গলে শত্রুকে ঘিরে ফেলার জন্য গাছ থেকে গাছে টার্জনের মত লাফিয়েও গিয়েছে।

মালয়ে জাপানী সেনারা ঠিক মালয়বাসীর মতই অবিকল সারঙ পরিধান ক'রেছে এবং সেই সারঙের নীচে তার টমিগান লুকিয়ে রেখেছে। কোন সাইকেল তার হস্তগত হলে তাতে বাজারের ঝুড়িটা রাখতে ভোলে নি, যাতে মনে হয় স্থানীয় অধিবাসী চলেছে বাজার করতে।

সিঙ্গাপুরে একটা গল্প শোনা যায়—এর অবশ্য সরকারী সায় পাওয়া যায়নি—গল্পটি হচ্ছেঃ জাপানীরা নাকি চীনেদের এক শবযাত্রার অনুকরণ ক'রে মালয়ের এক বিমানঘাঁটিতে সরাসরি উপস্থিত হ'য়ে দখল করে নেয়।

জাপানীরা নৃশংসভাবে শ্বেতপতাকা ব্যবহার করে। ফিলিপাইন ও মালয়ে অনেকবার দেখা গিয়েছেঃ একদল জাপানী সাদা পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; বিপক্ষদল তাদের দেখলে যেই অস্ত্র নামিয়ে রাখে, অমনি তারা তাদের টমিগান ছুঁড়তে থাকে।

প্রত্যেক জাপানী সৈন্যকে হুকুম দেওয়া আছে যে, সে কোন মতেই আত্মসমর্পণ ক'রবে না। কারণ শত্রুর হাতে পড়লেই তারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ক'রবে। জাপানী সৈন্যদের মনে এ বিশ্বাস জন্মানো শক্ত নয়।

আক্রমণ কাজে জাপানীরা চমৎকার, কিন্তু রক্ষণ বা পশ্চাদ্‌গামীতায় তারা অত্যন্ত দুর্বল বলে সামরিক কর্তাদের বিশ্বাস।

জাপানী সৈন্যের সাহস আছে, কিন্তু যখন ফাঁদে পড়ে এবং হেরে যায়, তখন দারুণ ভীতির পরিচয় দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষের প্রহারে তারা ফুঁপিয়ে ওঠে পর্যন্ত। একবার বাটানে আমেরিকান সৈন্যদের সোজাসুজি তীব্র আক্রমণে জাপানীরা তাদের অস্ত্র ফেলে ১০০ গজ দূরের এক টিলায় গিয়ে আরোহণ করে এবং ১৫০ ফিট নীচে নিজেদের নিক্ষেপ করে। —সানডে এক্সপ্রেস

* * * *

পুরুষের চেহারা দেখলে তার বয়েস অনুমান করা যায়, আর নারীর ঠিক বয়েস হ'চ্ছে পুরুষের চোখে যা প্রতীয়মান হয়।

* * * *

একটা মাছি তার নিজের আকারের চেয়ে দু'শত গুণ দীর্ঘ দূরত্ব লাফিয়ে অতিক্রম ক'রতে পারে।

* * * *

একেবারে হাসিশূন্য দিনটাই হবে সবচেয়ে ব্যর্থ দিন।

* * * *

বৃটিশ ও জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলের দুপার থেকে পরস্পরের প্রতি গোলা বর্ষণ ক'রছে। উত্তর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অভ্যন্তর ভাগের অধিবাসীরা বলে যে তারা সেই সব গোলার আওয়াজ শুনতে পায়। তীব্র আওয়াজ (আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ বা বড় গোলা) যে প্রায় ৩০০ মাইল দূর পর্যন্তও শোনা যায়, তা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। একটা কোন বড় বিস্ফোরণের স্থান থেকে ৭০ মাইল এমনকি ১৩০ মাইল দূরের জানালার শার্সী ভাঙ্গার কথা শোনা গেছে।

* * * * *

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কোনটা আগে দরকার বিশ্রাম না খাওয়া? বুদ্ধিমানের কাজ হ'চ্ছে একেবারে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়া এবং খাবার আগে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করা। পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কাছে খাবারের চেয়ে বিশ্রামটাই আগে দরকার। এই নিয়ম যদি

পালন করেন, দেখবেন যে পরিশ্রান্তির পরই আগে খাওয়ার চেয়ে আপনি কত তাড়াতাড়ি হজম ক'রতে পারবেন।

* * * *

প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির গড়ে চব্বিশ ঘণ্টায়ঃ

হৃদ্ স্পন্দিত হয় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৮০বার;
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে ২৩ হাজার ৪০বার;
সে বায়ু গ্রহণ করে ৫৩৮ বর্গফিট;
পৌনে ২ সের খাদ্য গ্রহণ করে;
প্রায় তিন পাঁইট জলীয় পদার্থ গ্রহণ করে;
ঘুমন্ত অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করে ২৫ থেকে ৩৫বার;
কথায় ৪৮০০ শব্দ ব্যবহার করে;
প্রধান প্রধান ৭৫০টি পেশী সঞ্চালিত করে;
নখ বাড়ে ০০০০৪৬ ইঞ্চি;
কেশ বাড়ে ০১৭১৪ ইঞ্চি;
৭০,০০০,০০ মস্তিষ্ক শেষ পরিশ্রম করে।

—আমেরিকান ওয়ার্লর্ড ডাইজেস্ট

* * * *

আমাদের জীবনকে উচ্ছন্নে দেয় এমন সব দোষগুলিকে কাটিয়ে উঠতে না পারার কারণ হ'চ্ছে আমরা সেগুলি সম্পর্কে গর্বিত থাকি ব'লে।

"আমার মেজাজ তো জানো!" বেশ হেসেই আমরা একথা বলে থাকি। তারপরই সেদিন অমুক লোক আমাকে বিরক্ত ক'রতে আসায়, কি রাগই আমার হ'য়েছিল এবং তাকে কেমন মজাটা টের পাইয়ে দিয়েছিলুম সে কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা ক'রতে লজ্জিত হই না মোটেই।

কোন ব্যাপারে যদি আমরা লজ্জিত থাকি, সে কথা তো করি না। বক্র দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কখনও ব'লে বেড়াতে শুনেছেন।

"আমার চোখ তো জানেন?"

"আমার আবার সব বিষয়ে ভারী কৌতূহল।" ছিদ্রান্বেষীরা বলে, কিন্তু লোকে তাদের পরিহার ক'রতেই চায়।

"আমাকে তো জানেন। চাকরী গেলেও গোঁ ছাড়ছি না।" গোঁয়ার লোকে বলে। অর্থাৎ সে বলতে চায়ঃ

"আমার অন্ন সংস্থান, আমার পোষ্যদের ভালমন্দ উচ্ছন্ন যাক, আমার গোঁ-ই হ'চ্ছে বড়।"

আমরা দোষ নিয়েও গর্ব করি।

—ইওর লাইফ্

এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান অস্ত্র ট্যাঙ্ক। গত মহাযুদ্ধে বৃটিশেরই আবিষ্কার। প্রথম ট্যাঙ্কটি অত্যন্ত গোপনে তৈরী হয়, এমন কি কারিগররাও জানতো না কিসের জন্য তারা এটা তৈরী করছে। [illegible]দের বলা হয় যে, এই যানগুলি তৈরী হচ্ছে মিশরের মরুপথে [illegible] বহন করবার জন্যে এবং এই যান সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্রে '[illegible]বাহক' কথাটিই ব্যবহার করা হয়। কারখানার লোকেরা সংক্ষেপে সমস্ত এর নাম দেয় 'tank' (জলাধার)। এই নামটিই শেষ [illegible] মধ্যে যায় এবং পৃথিবীর সব দেশে চলিত হয়।

* * * *

পারিবারিক সমস্ত কলহ-বিবাদের অবসান হ'তে পারে যদি স্ত্রীপুরুষে নীচের কথামত চলতে চেষ্টা করেঃ—

পয়সাকড়ি নিয়ে কখনো বাদানুবাদের সৃষ্টি না করা।

পরস্পর পরস্পরকে কোন ব্যাপারে কোন সময় দিয়ে থাকলে তা যেন অবশ্যই পালন করা হয়। স্ত্রীকে ব'লে গেলেন পাঁচটায় এসে সিনেমায় নিয়ে যাবেন, তিনি সেজে বসে রইলেন। কিন্তু আপনার পাত্তা নেই! এমন যেন না হয়।

ঘরদোরের ছিরি, লোকের সঙ্গে ব্যবহার, কারুর বিষয়ে মন্তব্য—এ নিয়ে পরস্পরের কেউ যেন পরস্পরকে তিরস্কার না করে।

বিবাহ স্মরণোৎসব, নিজেদের বা ছেলেমেয়েদের জন্মোৎসব, নিমন্ত্রণ, সিনেমার টিকিট, রেলের টিকিট, বাক্সর চাবি ইত্যাদি যেন কখনো ভুল না হয়।

কেউ কারুর সাজপোষাক নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ না করা।

মেজাজ গরম ক'রে কেউ কাউকে যেন তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিতে, রাস্তা পার হ'তে কি নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে অথবা জটলা থেকে চলে আসতে না বলে।

একজনের বিরক্ত বোধ হলে আর একজন যেন রঙ্গতামাসায় মেতে না থাকে।

একজনের যাকে ভাল লাগে আর একজন যেন তাকে দেখে না চটে যায়।

একজন যাতে সুখ পায় আর একজনের তা ভাল না লাগলেও যেন কখনো অনুযোগ না তোলে।

—পেম্বারটন ম্যাগাজিন

* * * *

মাতালঃ (বাসে বিপরীত আসনে উপবিষ্ট লোককে উদ্দেশ করে) আচ্ছা মশাই, আমাকে আপনি বাসে উঠতে দেখেছেন?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমাকে চেনেন আপনি"

"না।"

"তাহলে কি করে জানলেন আমিই বাসে উঠেছি?"

* * * *

থারাপের সঙ্গে মানিয়ে চলাটাই হ'চ্ছে সৎস্বভাবের পরীক্ষা।

* * * *

কিছুদিন আগে এক আমেরিকান সেনেটর যুদ্ধের দাম কসে দেখিয়েছিলেন যে, যুগে যুগে যুদ্ধের খরচ কত বেড়ে চলেছেঃ সিজারের সময়ে লোক পিছু হত্যার খরচ ছিল তিন শিলিঙ নেপোলিয়ানের সময়ে খরচ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৬০০ পাউণ্ডে, আমেরিকান গৃহযুদ্ধে ১০০০ পাউণ্ডে এবং গত মহাযুদ্ধে দাঁড়ায় ৪০০০ পাউণ্ডে। আর এ যুদ্ধে ইতিমধ্যেই দৈনিক খরচ পড়ছে ১২০০০০০০ পাউণ্ড।

—গ্লাসগো হেরাল্ড

বরফ

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সাদা বরফের টুকরো দু' এক কণা
ঝিমানো এ মনে বহু দিন আছে জমে;
রঙীন আলোর নেই কোন আনাগোনা,
রঙীন আলোক?—আলোই আসে না ভ্রমে!

বরফের বুকে রেখেছ তোমার হাত?
—মৃত্যুর মত শীতল শোণিতে ভরা!
আমার বুকেও মরণের পদপাত,
টুকরো বরফে আমারো বক্ষ গড়া।

টুকরো বরফে ধোঁয়া ওড়ে দেখা যায়,
আর গলে গলে পড়ে থাকে মরা জল;
ধোঁয়া ছাড়া মোর আর কিছু খোঁজা দায়,
বরফের মত গ'লে যাই অবিকল।

টুকরো বরফ জমানো আমার মনে,
ফ্রিজিডেয়ারের শীতল আবেশ আর—
রঙীন আলোক পড়ে আছে কোন্ কোণে,
আমার মনেতে মরণ—অন্ধকার।

অন্তরে ভগবান

শ্রীসতু সেনগুপ্ত

রুদ্ধ করেছে বাহিরের দ্বার
অন্তর দেরে খুলে
আহবান দিল চির-সুন্দর
ধূপ ধুনা রাখ তুলে।
তোরে—মুগ্ধ করেছে শ্যামল ধরণী
সিন্ধু দিয়েছে দোলা
স্বপ্ন দিয়েছে মায়ার বাঁধন
বাহির রয়েছে খোলা।
দেবতা রয়েছে পাষাণের মত
মন্দির ছায়া তলে
চেয়ে দেখ ওরে অন্ধ পূজারি
অন্তরে দীপ জ্বলে।
মন্ত্র হয়েছে নিষ্ফল তোর
রুদ্ধ যে ভগবান
ভস্মের তলে বহ্নির শিখা—
মুক্তির আহবান,
ছিন্ন করেছে জটাজাল রাজি
মুক্তি মন্ত্রে লাগি
তোরই অন্তরে ধেয়ানের ধন—
চিন্ময় রূপে জাগি।

পরিবর্তন

কুমারী নমিতা সেন রায়

তোমার পরশে সুপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিছে ধীরে,
নূতন করিয়া তাই যে গো আমি চিনিতেছি পৃথিবীরে।
ধরা মোর কাছে এতদিন তাই ছিল রহস্যে ভরা—
অলীক বলিয়া মনে হোত মোর তার যে গো আগাগোড়া।
এ ধরার মাঝে সব কিছু মোর লাগিতেছে আজ ভালো,
সকলি আমার লাগে যে রঙ্গীন, কিছু আর নহে কালো।

আগেকার সেই কুহেলীর মেঘ কাটিয়া গি
নূতন তপন দাঁড়ায়েছে পথে পড়িয়া সো
ক্ষণিকের তব পরশে আমার জীবন হয়েছে
ধরারে আমার মনে হয় আজ রঙ্গীন ফুলে
মরুভূমি সম জীবনে আমার এনেছ শান্তি
কৃতজ্ঞতায় নমিত হইয়া নিতি তোমা আমি

নিষ্ক্রমণ

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

(১)

ইতিমধ্যে সৌভাগ্যশশী রাহুগ্রস্ত হ'ল। মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মার খেলেন একটা চরদখলী দাঙ্গায়। লাঠির জোর তাঁর ছিল। ঘৃতচিক্কণ ভোজপুরির হাতে তৈলকর্কশ বাঁশের লাঠি। ইস্পাতের বোরখা পরে অমাবস্যার রাত এলো। সারি সারি পুরুষ দেহের পেশীমূল থেকে অজস্র শোণিতপাত হলো ঊষর বালুচরে, শ্রাবণের ধারাসারের মতো। ধরিত্রী উর্বরা হ'ল। বিধিমত দারোগাকে মৃত্যুঞ্জয় পানও খাওয়ালেন, ষোড়শোপচারে অর্ঘ্য প্রেরণ করলেন সহরে। কিন্তু জানতেন না তাঁর বাড়িতে পান খাবার পর দারোগাবাবু দত্তদের বাড়ি গিয়েও পান খেয়ে এসেছেন। যখন জানতে পারলেন তখন শিরে করাঘাত করে বিলাপ করা ছাড়া উপায় কি।

ফাঁসি হ'ল না বটে, দ্বীপান্তরও না। কারাগৃহের প্রসারিত বাহুদ্বয়ের নিমন্ত্রণকেও নিরস্ত করলেন উঁচু আদালতের আপিলে। কিন্তু তাতে প্রেস্টিষ মারা গেল। অর্থাৎ জানে মারা না গিয়েও মৃত্যুঞ্জয় মারা গেলেন,—মানে। নবাবী-সংহিতায় এই শেষোক্ত মৃত্যুই বেশী ঘৃণার্হ বলে লেখা আছে।

মোসাহেব নীলকমল গৃহিণী না হলেও, সচিব এবং মিথঃ সখা। সে বললে জোর যার মুলুক তার, ওটা ঊনিশ শতকের ন্যায়শাস্ত্রে লেখা আছে। চলুন ক'লকাতা।

দেশে এমনিতেও মুখ দেখাবার উপায় বিলুপ্ত হয়েছিল। সপরিবারে মৃত্যুঞ্জয় কলকাতায় এলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের কলকাতার বাড়ির বর্ণনা আবশ্যক। শহরতলীতে তাঁর পূর্বপুরুষ তৈরী করিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সেকেলে ফ্যাশনের বাড়ি, স্থান জুড়েছিল যত, প্রয়োজন ছিল না তার সিকিও। আর চারধারের কম্পাউণ্ড জুড়েছিল বাড়িটার তিনগুণ। দশগজ কাপড়ের কোঁচায় কাছাতেই গেল সাড়ে আট হাত। পাঞ্জাবির ঢিলে আস্তিনের মতো বাড়তি খানিকটা অপচয়। বাগানের ভেতর পুকুর একটা, আর প্রত্যন্তদেশে মালীদের আস্তানা। লাল শুরকিঢালা পথ এঁকে বেঁকে গেছে, নির্ভুল জ্যামিতিক সমকোণে। পাতাবাহার আর মরশুমী ফুল পোষ্যপুত্রের মতো নিরুদ্বেগে বাড়ছে। মাঝে মাঝে ঝাউগাছগুলোর উচ্চতা মেপে দেওয়া। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে শিবমন্দির একটা।

মৃত্যুঞ্জয় একেবারে অন্তঃপুরে ঠাঁই নিলেন। খালি পুজোর সময় আসতেন মন্দিরে। নীলকমল রইলো জমিদারি আর তাঁর মধ্যে দূতিয়ালীর কাজে। মাঝে মাঝে কাগজপত্র যা এনে দিত, চোখ বুজে সই করে দিতেন মৃত্যুঞ্জয়। একান্ত সুহৃৎ কেউ কেউ আপত্তি করলেও মৃত্যুঞ্জয় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ত্বয়া হৃষিকেশ—এই মন্ত্র মাহাত্ম্যে নীলকমলের হাতেই আপনাকে স'পে দিলেন।

মাঝে মাঝে নীলকমল দু'চারটে প্ল্যান এনে দিত বটে, বানচাল বনেদিয়ানাকে কোন গতিকে ভাসমান রাখার ফন্দি;—কিন্তু ভবি কি ভুলবেন অতো সহজে। উদয়াস্ত আর জোয়ার-ভাঁটার হিসাবের মতো সামাজিক অধ্যায়ের ক্রান্তি যে মাপা ইতিহাসের গাণিতিক সূত্রে।

চঞ্চলা যদি একবার চোখের জলে বিদায় নেন, তবে আর কোন ছলেই, তাঁকে ফেরানো যায় না। সচ্চিদানন্দর ছিল এক জলা। স্বয়ং নিরামিশাষী হলেও, ঐ মাছের দরুণ তাঁর আয়ের অঙ্কটা ছিল রীতিমত উল্লেখযোগ্য। স্থির করলেন, সেটাকে হাত-বদল করিয়ে দেবেন। অর্ধেক ত্যাগ করে পুরোটাকে বাচানোর ফিলজফি।

নীলকমল ক'দিন মোরিয়া হয়ে পার্টনার সংগ্রহের চেষ্টা করলে। কিন্তু লাভ হ'ল না। বাঙালীরা ঝুঁকি নিতে নারাজ। আর মারোয়াড়িরা ব্যবসা বোঝে। তারা বিদ্রূপ করলে। পার্টনার হতে তাদের কোন আগ্রহ নেই। বখ্‌রার কারবার নয়, সবটাই গেলবার মতলব।

তাছাড়া, সর্বনাশের বেণোজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও, মৃত্যুঞ্জয় তখনো আভিজাত্যের অহঙ্কৃত আকাশে শ্বাস টানছেন। তিনপুরুষের লক্ষ্মীকে সামান্য কয়েকখণ্ড চাঁদির বিনিময়ে ছাতুখোরদের হাতে ছেড়ে দেবো? কভি নেহি। দাম হাঁকলেন বিশ হাজার।

মারোয়াড়িরা উপহাস করলে। বাবু, তোমার দিমাগ্ খারাপ হয়ে গিয়েছে। মার-খাওয়া বিজনেস, ওর কিম্মৎ শও রুপেয়া। তোমার খাতিরে আরো চারশো দিতে পারি।

মৃত্যুঞ্জয় গর্জন করে উঠলেন,—দারোয়ান উসকো নিকাল দো।

দারোয়ান অবশ্য আগেই ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু মারোয়াড়ি নিজেই পথ দেখলে। রাগ সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় বললেন, অল রাইট। নো ও'রি। যায় যাবে জমিদারি গোল্লায় আমি নিজেই দেখবো।

ইতিমধ্যে মহল থেকে আরেকটা দুঃসংবাদ এলো। প্রজারা বিগড়েছে। নায়েব কিছু জুলুম করেছিলেন, প্রত্যুত্তর দিয়েছে নায়েবের কুঠিবাড়ি জ্বালিয়ে।

এর প্রত্যুত্তরও মৃত্যুঞ্জয়ের জানা ছিল। সুকোমল তৃণদলের মধ্য থেকে বিদ্রোহী কুশাঙ্কুর উপড়ে ফেলার সহজ উপায় তিনি জানতেন। লাঠির আগায় আর সঙিনের ঝলকে প্রয়োগ করতেন শাণিত ফিউড্যালি যুক্তি। কিন্তু সেসব স্বর্ণযুগ অবসিত।

হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, পদে পদে হিসাব ভুল। প্রামাণ্য দু'চার দশটা নথিপত্র ফেরার। তিনটে মহল লাটের দায়ে ইতিপূর্বে গোপনে বিক্রী হয়ে গেছে, তিনি টেরও পাননি।

রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করে মৃত্যুঞ্জয় প্রশ্ন করলেন নীলকমলকে, এসব কি।

অনায়াসকণ্ঠে নীলকমল বললে বটে আমি কি জানি, কিন্তু মনে মনে চতুর হাসলে। কেননা প্রকাশ্য হিসাবে কিঞ্চিৎ ভুল থেকে গেলেও তার মনের হিসাব পাকা। এপার ভেঙ্গে নদী ওপারে তৈরি করে চর। একটি টাকাও অপব্যয় করেনি নীলকমল, স্বনামে তালুক ক'টা ক্রয় করেছে, আর সেখানে করেছে নকল রেশমের চাষ। এমন কি, মহলের প্রজা-বিদ্রোহটা যে

অগাগোড়াই নীলকমলের কারসাজি, একথা তার চেয়ে কে বেশি জানে।

মৃত্যুঞ্জয় নিঃস্ব হয়েও নির্বোধ নন। নীলকমলের উক্তিতে বিশ্বাস করলেন না। তাঁর মনে যে ভাব হ'ল, সেটা সীজারিয়। মনে মনে বললেন, ব্রুট্‌স্‌, তুমিও! ঘরে ফিরে ফের শয্যা নিলেন। ডাক্তারে বললে, নার্ভ জখম হয়েছে। নীলকমলকে ডেকে বললেন, তোমাকে আর প্রয়োজন নেই।

মৃত্যুঞ্জয়ের যে ব্রুটস, আসলে সে ব্রুট; নির্লজ্জ দাঁত বার করে হাসলো।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা তখন উইংস্‌এর পাশে বসে ড্রপসিন নিয়ে টানাটানি করছেন। বেকায়দায় পড়ে মৃত্যুঞ্জয় ইতিপূর্বে সামান্য কয়েক হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটেছিলেন, সেটাই সুদ প্রসব করে এখন পুত্র পরিজনে বিপুল আকার ধারণ করেছে। দু' হপ্তার মধ্যে অন্তত একটা কিস্তীর সুদ দিতেই হবে। মৃত্যুঞ্জয় প্রমাদ গণলেন। দ্বিতীয় পত্র এলো বিলাত থেকে। একমাত্র বংশধর প্রবীরের পত্র। আই সি এস পরীক্ষায় ফেল করেছে। ব্যারিস্টারি পাশ না করে দেশে ফেরা নির্বুদ্ধিতা। অতএব পত্রপাঠ—

অতএব পত্রপাঠ নামমাত্র মূল্যে আরো একটা মহল বিক্রী হ'ল। এবারে মৃত্যুঞ্জয়ের সম্মতিক্রমেই। আভিজাত্যের গর্ব ঘা খেল বটে, কিন্তু উপর্যুপরি ঘা খেয়ে খেয়ে ঘা তখন শুকিয়ে এসেছে। বিলাতে টেলিগ্রাম গেল, ব্যারিস্টারি পাশ করে দরকার নেই, আমাকে যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, একবার এসো। প্যাসেজ মানি পাঠালাম।

মহাল যেদিন বিকিয়ে গেল, সেদিন মৃত্যুঞ্জয় স্বয়ং উপস্থিত থাকেননি। ফোনে সংবাদ পেলেন দশ হাজার টাকার যৌতুকে ভূমিলক্ষ্মীর বিধবা-বিবাহ ঘটেছে। দশ হাজার টাকা সামান্যই। গায়ে টানতে ঘোমটায় কুলোবে না। কিন্তু তবুতো স্বস্তি। মনে মনে মৃত্যুঞ্জয় অজ্ঞাতনামা ক্রেতাকে ধন্যবাদ জানালেন।

ক্রেতার নাম জেনে আর একবার চমকে উঠেছিলেন বৈকি মৃত্যুঞ্জয়, দুর্বল হৃৎপিণ্ডে প্রবল একটা ঘা খেয়েছিলেন। ক্রেতা কে? কেন, নীলকমল! নীলকমল চৌধুরী, হেসিয়ান মার্চেণ্ট, ব্যাঙ্কার এ্যাণ্ড ব্রোকার। মৃত্যুঞ্জয়ের নার্ভ ইতিপূর্বেই জখম হয়েছিল, নতুন করে বেচাল আর কি হবেন। পূজোর ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। যতকাল ইজ্জৎ ছিল, কেবল বহিঃশত্রুকে ঘায়েল করবার ফন্দি এঁটেছেন। কিন্তু তাঁর যে শত্রু সে গোকুলে বাড়েনি, তাঁর ঘরেই দুধকলা খেয়ে পুষ্ট হয়েছে। তিনি ছিলেন একচক্ষু হরিণের মত সতর্কতা নিয়ে। ইমারত গেঁথেছেন পাকা করে, দেউড়িতে দারোয়ানের আয়োজনের ছিল না ত্রুটি, কিন্তু ভিৎটাই যে রয়ে গেছে চোরা-বালিতে, এ সত্যটাই ছিল তাঁর অজানা। গোমস্তা কে বললেন, নীলকমলকে ডেকে পাঠাও। কি জানি, নীলকমল এখন টাকার মানুষ, যদি নাই আসে, এই আশঙ্কাতে সঙ্গে সঙ্গে একটি চিরকুটও পাঠালেন। আমি বড় অসুস্থ নীলকমল, যদি পারো, একবার দেখা কোরো।

নীলকমল এলো সন্ধ্যার পর। প্রকাণ্ড বাড়ি, শাঁস গেছে, কিন্তু আঁশ যায়নি। গেট থেকে লাল কাঁকরের রাস্তা, তারপর কার্পেট বিছানো হলঘর। অতিপরিচিত সিঁড়ি। ফের কার্পেট। কোণে কোণে মর্মর নগ্নিকা। মাঝে মাঝে কিউরিয়ো-শপ-চয়িত বিবিধ অত্যাশ্চর্য দ্রষ্টব্য। বারান্দা পার হয়ে মোড় ফিরতেই মৃত্যুঞ্জয়ের শোবার ঘর। নীলকমলের প্রতিটি ইট পরিচিত। কিন্তু আজ আর তার পা সরছিল না। ব্রুট হ'লেও নীলকমল মানুষ!

মৃত্যুঞ্জয় একখানা কোচে শুয়েছেন। নীলকমলকে ঘরে ঢুকতে দেখে খানিকক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইলেন, প্রেতস্পৃষ্টের মতো। নীলকমল এগিয়ে এসে প্রণাম করলে, মৃত্যুঞ্জয় তখনো নীরব। হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন মাত্র। অভ্যাসের দাসত্ব। নীলকমল বিনয়ের অবতার, মৃত্যুঞ্জয়ের পা ঘেঁসে একখানা ছোট টুলের ওপর বসলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছেন।

এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের সম্বিৎ ফিরে এলো; নাটকীয় প্রথায় আর্তনাদ করে উঠলেন। কাঁদতেও পারতেন, কিন্তু কান্নাটা খানি পৌরুষের বিরোধী নয়, আভিজাত্যেরও দুশমন। বললেন, দংশন করে দেখতে এসেছ নীলকমল, নীল হয়ে গেছি কিনা। কিন্তু সর্পদংশনে পাথরের কি কোন বিকৃতি ঘটে।

নীলকমল কোন জবাব দিলে না। মৃত্যুঞ্জয় সহসা করলেন কি, কোচে সোজা হয়ে বসে নীলকমলের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার মান-সম্ভ্রম, ঐশ্বর্যের কিছুই তো বাকি রাখোনি, এই যে দেহের মধ্যে প্রাণটা শুধু ধুকধুক করছে, এটাকেই বা বাকি রেখেছ কেন। শেষ করে দাও।

নীলকমল তড়িতাহত হয়ে লাফিয়ে উঠলো। দ্বিতীয়বার পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, আমরা কি আপনার পায়ের নখেরো যোগ্য। যাই করে থাকি না কেন, আমি আপনার ভৃত্য বই তো নই।

ডাক্তার আর পথ্যের ব্যবস্থা নীলকমল স্বয়ং করলো। মৃত্যুঞ্জয়ের মাথার কাছে একটা বিজলী-পাখা ঘুরছিল। সেটাকে বন্ধ করে নিজে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে দিলে।

মৃত্যুঞ্জয় বাধা দিলেন না। ক্রমে নীলকমলের ব্যবহার এমন বাড়াবাড়িতে ঠেকল যে, মৃত্যুঞ্জয় নিজেকেই নিজে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। হয়ত তিনি ভুল করেছেন বা ভুল বুঝেছেন।

ফলে, এ বাড়িতে নীলকমলের পথ খোলাই রইলো।

(২)

অতঃপর বিদেশ থেকে প্রবীর ফিরে এলো। সংসারের হাল সে কিঞ্চিৎ জেনেছিল পত্রযোগে। সিঁদুরে মেঘ দেখে মল্লিকাই তাকে জানিয়েছিল। বাকিটা অনুমান করেছিল, ক্রম-ক্ষীয়মান অর্থপ্রাপ্তি থেকে। সেই অর্থপ্রাপ্তি যখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সে ব্যারিস্টার হবার আশায় জলাঞ্জলি

দিয়ে, কোনক্রমে প্যাসেজ সংগ্রহ করে, দেশের ঘাটে এসে উত্তীর্ণ হ'ল।

প্রবীর ব্যারিস্টার ইত্যাদি কিছুই হয়নি বটে, হয়েছিল খাঁটি য়ুরেশীয়। সংস্কার ইত্যাদি তো কবেই টেমসের জলে বিসর্জিত হয়েছে। য়ুরোপীয় সমাজাদর্শের নীচেটা পর্যন্ত তার দৃষ্টির সম্মুখে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। চলনে বলনে তার ছিল না জুড়ি। আর ব্ল্যাকমেইলের মাহাত্ম্য, ফ্লার্টিংএর সর্বনাশিকা শক্তি প্রভৃতি বিবিধ টেকনিকের কার্যকারিতা সম্পর্কে তার মনে সংশয়-মাত্র ছিল না।

দেশে ফিরে দেখলে, সম্পদ সূর্যচুম্বিত শিশিরকণার মতো অন্তর্হিত। আয় নেই এক পয়সা, বাবা খালি হ্যান্ডনোটের পর হ্যান্ড নোট কাটছেন। পৈতৃক চাল অতি কষ্টে বজায় থাকছে। এর কাছ থেকে টাকা ধার করে ওকে শোধ দিচ্ছেন, ওর টাকায় সুদ জোগাচ্ছেন একে। প্রবীর স্থির করলে এই টেকনিকটা পাল্টাতে হবে। ফ্রিডম ফার্স্ট-এর মতো তারও বুলি হ'ল সলভেন্সি ফার্স্ট, সলভেন্সি সেকেন্ড, সলভেন্সি অলওয়েজ। ঘানির বলদের মতো সুদ টানা আর না।

প্রথমেই সে আবিষ্কার করলে সংসার খরচের ফর্দের মধ্যে চাকর-বাকরের নিষ্প্রয়োজন সংখ্যাধিক্য। আয়ের চেয়ে অপব্যয়ের পাল্লা ভারি করছে। স্থির করলে, ওদের উঠিয়ে দিতে হবে।

শোনা মাত্র মৃত্যুঞ্জয় গর্জন করে উঠলেন। নো, নেভার। তিন পুরুষের চাল। সেদিন পর্যন্ত ওরা পুজোয় পেয়েছে শালের জোড়। বন্ধ করে দিলে লোকনিন্দার হাতে না বাঁচে কান, না বাঁচে মান।

আয়-ব্যয়ের চেয়ে ঠাট বজায় রাখার দুশ্চিন্তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মনের সওয়ার হয়ে ঘোড়দৌড় করাচ্ছে,—দেউলে আভিজাত্যের স্বধর্মই এই।

কিন্তু সেদিনই কোনখান থেকে সুদের চোখ রাঙানি নিয়ে এক পত্র এলো। প্রবীরের সেইটেই হ'ল রঙের টেক্কা। বললে, দেখলেন তো। খরচ কমান।

ফলে কিছুসংখ্যক ভৃত্যকে বরখাস্ত করতে হ'ল। মৃত্যুঞ্জয় সেদিন জল স্পর্শ করলেন না। সারাদিন বালিশে মুখ ঢেকে শুয়ে রইলেন। খরগোস যেন বালিতে মুখ ঢেকেছে। কিন্তু মুখ ঢাকলেই সর্বনাশের ছিদ্র ঢাকা পড়ে না। কমলা ছেড়েছেন, কিন্তু কমলি ছাড়ে না সহজে। দেওয়ালে টানানো ছিল বহু অয়েল পেন্টিং আর দুষ্প্রাপ্য খান কয়েক ছবি। সেগুলোতেও টান পড়লো।

প্রবীর বললে, এগুলো রয়েছে কি করতে। বেচে দিন। দুটো পয়সা ঘরে আসুক। অয়েল পেন্টিংগুলো ফ্রেমের দামে বিকোবে। আর ইতালীয় ছবির জন্যে তো আর্ট স্কুলগুলো জিরাফের গলা বাড়িয়েই আছে। কোন্না বিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

মৃত্যুঞ্জয়ের হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুততরো হ'ল। প্রবীর বলে কি। অয়েলপেন্টিংগুলো পূর্বপুরুষের। আর ছবিগুলো বহু ব্যয় ও পরিশ্রমের সংগ্রহ। এর পাশে আধুনিক হালকা রঙের পাৎলা ফ্রেমের ছবি?

প্রবীর বিদেশ থেকে বৈশ্যনীতি শিখে এসেছে, সুকুমার-কলার ব্রহ্মণ্যধর্মে তার আস্থা নেই।

ক্রমে গেল ফার্নিচার। বনেদি চালের গোড়াকার ইটে শুদ্ধ টান পড়লো। ওসব সেকেলে সৌখিনতায় নাকি অপব্যয় যতখানি, সুরুচি নেই তার সিকিও। প্রতিবার মৃত্যুঞ্জয় আপত্তির ফণা তুলেছে, প্রতিবার প্রবীর তাঁকে সম্মোহিত করেছে পাওনাদারের নোটিশের মন্ত্রপাঠে। নসিবের মার।

(৩)

সংস্কারের ভেতর দিয়ে প্রবীর সর্বনাশের সঙ্গে একটা রফা করলে বটে, কিন্তু সে সাময়িক। নদীর স্রোতকে বাঁধ দিয়ে বাধা দেওয়া যায়, কিন্তু চিরকালের মতো বাঁচাতে হলে স্রোত-ধারাকে অন্য কোন খাতে বহানো প্রয়োজন।

খোঁজ নিয়ে জানলে, তাদের দেনার অধিকাংশটাই একজন মাত্র মহাজনের কাছে; স্বনামে বা বেনামে তিনিই জাল ফেলে বসে আছেন, বিধাতা পুরুষের মতো, মৎস্যশিকারীর অক্ষয় ধৈর্যে। প্রবীর খোঁজ করলে কে সেই স্বনামধন্য মহাজন।

আবার কে, নীলকমল চৌধুরী। তলে তলে সব খত আর বন্ধকী সে সংগ্রহ করে রেখেছে; সস্তা সুদের বারুদ জমিয়েছে ইমারতের ফাঁপা ভিতের নীচে। ছ'মাস বাদে সব জমিদারী আর এই বাড়ি চড়বে নীলামে।

প্রবীর মনে মনে এক প্ল্যান করেল এবং বাড়ি ফিরে মল্লিকাকে বললে, ওই স্কাউন্ড্রেল নীলকমলটা রোজ যায় আর আসে, আর তুই কি করিস।

ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট। পরদিন নীলকমল অন্তঃপুরের ছাড়পত্র পেলো।

মল্লিকা ইনস্টিটিউটে গান গেয়েছে কমপক্ষে বারো বার, এম্পায়ারে নেচেছে বার তিনেক। স্বদেশির আমলে ঝান্ডা উড়িয়ে পার্কে গেছে মিছিলের পুরোবর্তিনী হয়ে। নীলকমলের জন্য মিছরির ছুরি শান দেওয়া তার পক্ষে আর এমন শক্ত কথা কি।

প্রথমদিন সে যখন গান শুরু করলে,—আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে—নীলকমলের হৃদয়ভূমিও ততক্ষণ শ্রাবণধারার মতো সরস হয়ে উঠেছে। টাকার আওয়াজকেই এতকাল জানতো সেরা গান; এতদিনে সত্যিকার সুর তার কানে গেল। মল্লিকা যখন দ্বিতীয় গান গাইছিল, তখন নীলকমলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হ'ল, তার চুল সেকেলে রকমের ছোট করে ছাঁটা নয় তো।

পরের দিন মল্লিকা যখন কাব্যসমালোচনা প্রসঙ্গে বললে আধুনিক কবিতা আর চীনেবাদাম এক জাতের। এক সঙ্গে তার সবটার আস্বাদ পাওয়া যায় না। থেমে থেমে খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে হয়। তখন নীলকমল মল্লিকার শুক্ল প্রতিপদের মতো ভ্রূভঙ্গিতে আপন প্রতিবিম্বের কোটের গলাবন্ধ বলে মনে মনে অতিশয় আক্ষেপ করলে।

(শেষাংশ ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বৈতাদ্বৈত

শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ, এম এস-সি, বি এল

সুদূরে অতীতে ইতিহাসও যার সাক্ষ্য দিতে পারে না, এমনি শারদ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধবলিত রজনীতে যে মিলনোৎসব সংঘটিত হয়েছিল,—আজ সেই রাসপূর্ণিমা—ভগবান নিম্বার্ক স্বামীর শুভ আবির্ভাব তিথি। এই পুণ্য দিনে উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণে সমবেত সুধীবৃন্দের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়েছি শ্রীনিম্বার্ক স্বামী প্রবর্তিত দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি সে সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শনার্থ দু'একটি কথা বলবার জন্য। দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কি বললে বুঝবো? সত্যদ্রষ্টা পূর্বাচার্যগণের অনুভূতির বাইরে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা করে ইহা কি নিজের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে? উত্তর—অপ্রিয়; অপ্রিয় বলছি এই জন্য যে তাহলে তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

ভারতীয় দর্শন—দর্শনই অর্থাৎ সাধনার সিদ্ধিতে প্রত্যক্ষানুভূতির ফল। ইহা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ কিংবা ভাষার চাতুর্য বা বিচারের কৌশল নহে। তাই শ্রুতিমুখে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা দাবী করছেন:—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

অজ্ঞানের পরপারস্থিত, আদিত্যবর্ণ—স্বপ্রকাশ সেই মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি,—শুধু জানি নাই,—তাঁকে জেনে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে অমৃতত্ব লাভ করেছি। "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি"। শ্রুতি আধিব্যাধি-বিজড়িত জরামরণসঙ্কুল নরনারীকে বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলছেন—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

তাঁকে জানা ছাড়া অমৃতত্ব লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

মরণোত্তীর্ণ ঋষিকণ্ঠের এ বাণী সত্য বাণী। পরবর্তী যুগের মহাজনগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় এই সত্যানুভূতি থাকলে তার সঙ্গে শাস্ত্র বাক্যের, আপ্ত বাক্যের অসামঞ্জস্য হবার অবকাশ কোথায়?

প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান ও শব্দ (শাস্ত্র) প্রমাণ চতুর্বিধ। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ সকল সময় সত্য বলে প্রমাণিত হয় না; তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলবস্তু সম্বন্ধেই কত সময় মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে,—যেমন রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত, মরুভূমিতে মরীচিকা। কাজেই ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেহ যদি এইরূপ প্রমাণের দাবী করে, তবে তাহা সম্ভব তো নয়ই, অধিকন্তু অযৌক্তিক। ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ, ভ্রম প্রমাদ শূন্য আপ্তবাক্য এবং অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্য। তাই ব্যাসদেব সূত্র করলেন:—

"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" (যোনি=প্রমাণম্)

শাস্ত্রই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। যুক্তি তর্ক, অনুমান উপমান, প্রত্যক্ষ এ সকলের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণিত হওয়া সম্ভব নয়।

শাস্ত্রই যদি এবিষয়ে মাপকাঠি, তবে এ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত হলেই তা গ্রহণীয়। সম্প্রদায়ভুক্ত কেহ যদি একে নূতন বলে দাবী করতে চান, তবে বলবো "না, এ নূতন নয়। প্রকাশে, ভাষায় এবং ভঙ্গিতে নূতনত্ব থাকতে পারে, কিন্তু আসলে নূতন কিছু নয়। নূতন কিছু হলে যা শাস্ত্রবাক্যের সহিত একতানতা রক্ষা করে না, তা গ্রহণীয় নয়, তা তো আগেই বলেছি। সম্প্রদায়ের ইহা নিজস্ব কিছু বলেও দাবী করা চলে না। কারণ সর্বশাস্ত্রসম্মত যে মতবাদ, তা সকলেরই। কোন বিশেষ সম্প্রদায় একেই যদি তাদের মত বলে ঘোষণা করে, আপত্তি নেই; কিন্তু ব্রহ্ম যাহা সত্যস্বরূপ, যাহা জ্ঞানস্বরূপ, যাহা ভূমা, তাহা কারো একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না। তাই আমাদের বক্তব্য শ্রীনিম্বার্ক স্বামীর কোন নিজস্ব মতবাদ নেই, তিনি কেবল নিখিল শাস্ত্রসম্মত অনাদি অনন্তশাশ্বত সত্যেরই ধারক এবং বাহক মাত্র। অতএব এই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত কোন দল বা সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ নহে—ইহা সনাতন ধর্মের মূল সত্য—চিরন্তন বাণী।

শাস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপ বলতে যেয়ে সগুণ নির্গুণ উভয় প্রকার বাক্যই বলেছে। এর অর্থ কি তিনি একই সঙ্গে যুগপৎ সগুণ নির্গুণ অথবা এক সময় সগুণ, অন্য সময় নির্গুণ কিংবা কেবলই সগুণ অথবা কেবলই নির্গুণ? এর মীমাংসার উপরই জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এবং জগত সৃষ্টির তাৎপর্য কি তা নির্ণিত হবে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করতে যেয়েই দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। দ্বৈতবাদী সগুণ শ্রুতি এবং অদ্বৈতবাদী নির্গুণ শ্রুতির প্রাধান্য দিয়ে স্ব স্ব মতের পরিপোষণার্থ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বলছেন, শাস্ত্রে যখন দুরকম বাক্যই আছে, তখন দুরকমই গ্রহণ করতে হবে—একটাকে প্রধান—অন্যটাকে অপ্রধান কিংবা একটাকে শ্রেষ্ঠ অন্যটাকে নিকৃষ্ট অথবা একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে রক্ষা করা চলবে না।

এইবার সগুণ শ্রুতি বাদ দিলে ফল কি দাঁড়ায় দেখা যাক। সগুণ শ্রুতি বাদ দিলে, জীব ও জগতের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকৃত হয় না—জীব, জগত উভয়ই মিথ্যা হয়ে যায়, অথচ জগত এবং জীবরূপ যে তাঁরই, তাহাও ত অস্বীকার করা যায় না:—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। (কঠ, ৫ বল্লী ৯)

একই অগ্নি যেমন দাহ্য বস্তুর রূপভেদে পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করে, সেইরূপ সর্বভূতস্থিত এক আত্মাই বস্তুভেদে পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করেছে। আবার নির্গুণ শ্রুতি বাদ দিলে, তিনি যে সবকিছু হয়েও তদতীত, গুণী হয়েও গুণাতীত—শাস্ত্রসম্মত এই নির্গুণ তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায়—"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্ব ভাবেন চোভয়োঃ।"

(কঠ, ৬ বল্লী ১৩)

তিনি আছেন এইরূপে তাঁকে জানতে হবে এবং তত্ত্বভাবে, নির্বিষয় চিন্মাত্রভাবেও তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। সোপাধিক বিশ্বরূপ, নিরুপাধিক তদতীতরূপ—এই উভয় রূপেই তাঁকে জানতে হবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে—তাঁর একরূপ নিলে চলবে না, নিতে হবে তাঁর উভয় রূপই। এই উভয় বাক্য গ্রহণ করে, শাস্ত্রের যে সামঞ্জস্য, তাহাই দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত—তাহাই ভগবান নিম্বার্ক স্বামী প্রচারিত সনাতন ধর্ম। তিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং, শান্তং, নিরবদ্যং, নিরঞ্জনম্........" "নেতি নেতি.........অহ্রস্বম্—অদীর্ঘমিতি"—ব্রহ্ম অদ্বয় ভাগরহিত, নিষ্ক্রিয় শান্ত, শুদ্ধস্বভাব, নিরঞ্জন—তিনি মোক্ষের সেতুস্বরূপ—নির্ধূম পাবকস্বরূপ। তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। আবার—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
......জনয়ন্ দেব একঃ॥

সর্বত্র যাঁহার চক্ষু, সর্বত্র যাঁহার মুখ, সর্বত্র যাঁহার বাহু এবং সর্বত্র যাঁহার পাদ, সেই একমাত্র দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে মনুষ্যাদিতে বাহু এবং পক্ষীদিগকে পক্ষ দান করেছেন।

[শ্বেত—৩য় (৩২)]

য একো জাল বানীশত.........য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—সেই একমাত্র পুরুষ আত্মশক্তিভূতা মায়াশক্তি দ্বারা সমস্ত লোক নিয়মিত করছেন,—তিনিই জগতের উদ্ভব ও স্থিতির একমাত্র কারণ, তাঁকে যাঁরা জানতে পারেন, তাঁরাই অমর হন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে উপায়? উপায় নিশ্চয়ই আছে—তাই বেদব্যাস সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সার বেদান্তদর্শনে সূত্র করলেন,—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ব্রহ্মই শ্রুতিবাক্য সকলের প্রতিপাদ্য। এক ব্রহ্মেতেই সকল রকম দ্বৈত অদ্বৈত শ্রুতির সমন্বয় হয়—অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যে আপাতদৃষ্ট বিরোধ যথার্থ বিরোধ নহে। সকল রকম বিরুদ্ধ ধর্ম এবং শক্তির আশ্রয়স্বরূপ বলেই তিনি সর্বশক্তিমান। পরিমিত পরিচ্ছিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীবের মন, বুদ্ধি, বাক্য যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে অকূলে তলিয়ে গিয়ে নির্বাক হতে বাধ্য, তা তো ঠিকই। তাই শ্রুতি বলছে,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।"

ব্রহ্ম এতটুকুই—ততটুকু নহেন,—ব্রহ্মে ইহাই সম্ভব—উহা অসম্ভব নহে,—এই যদি তাঁর স্বরূপ হয়, তবে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যগুলো অর্থহীন পাগলের প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায় না কি?

(ক) অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান
তিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম—মহান হতেও মহত্তর
(খ) অজায়মানো বহুধা বিজায়তে—
তিনি জন্মরহিত হয়েও বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন
(গ) ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ,—তুমি কুমার তুমিই কুমারী।
(ঘ) "মূর্ত্তশ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" তিনি মূর্ত—আবার তিনিই অমূর্ত।
(ঙ) "যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্"
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নেই।
(চ) "অপাণি পাদোজবানোগ্রহীতা"
হস্তপদ বিহীন হয়েও তিনি চলেন, তিনি গ্রহণ করেন।

এইরূপ শত শত শ্রুতি—শুধু শ্রুতি কেন, স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে—ব্রহ্ম সম্বন্ধে উভয়াত্মক বাক্য দেখতে পাওয়া যায়।

গীতায় আছে:—

'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেস্ববস্থিতঃ।'

আবার—'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।

বিষ্ণুপুরাণেও দেখতে পাই ঃ—

'আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধাতচ্চ স্বভাবতঃ
ভূপ মূর্ত্ত অমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ॥'

হে ভূপ, মনের আশ্রয় (ধ্যাতব্য) ব্রহ্মের স্বভাবত দ্বিবিধ রূপ আছে—মূর্ত এবং অমূর্ত—তা আবার পর এবং অপর। অতএব শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে—তাঁর এক রূপ নিলে চলবে না,—'তাঁর উভয় রূপই নিতে হবে। এই উভয় রূপতা স্থূল বুদ্ধির অগম্য এবং যুক্তিসহ নয় বল্লেও চলবে না—কারণ, গুণাতীত পরব্রহ্ম অনুমান-প্রত্যক্ষাদির বিষয়ীভূত নয় বলেই ত বলা হল, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

এক তিনি ঠিকই। এক থেকেও তিনি বহু হতে পারেন এবং হলেনও তাই। "সোঽকাময়ত।" "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" তিনি ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব। × × × "ইদং সর্ব্বং অসৃজত" "যদিদং কিঞ্চ।" যাহা কিছু (দৃশ্যমান) সমস্তই তিনি সৃষ্টি করলেন। শুধু কি সৃষ্টি করলেন? কুম্ভকার যেমন করে ঘট নির্মাণ করেন,—তেমনি? না, তা নয়। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" সব কিছু সৃষ্টি করে,—তাতে নিজেও প্রবিষ্ট হলেন—অর্থাৎ যা কিছু সবই তিনি হলেন। এই সব হাওয়া কি তা আরো পরিষ্কার করে বলছেন—তদনু প্রবিশ্য।

'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ।
নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ।
সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ।'

সব কিছুতে প্রবিষ্ট হয়ে সৎ ও তৎ অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য যাহা কিছু আছে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হলেন। তিনি যদি সবই,—তা'হলে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবো এ প্রশ্ন তো দাঁড়ায় না। জীব-জগৎকে কেটে ছেঁটে যে "অদ্বৈততত্ত্ব" তাহা শাস্ত্র-প্রমাণসহ নয় বল্লেই, নিম্বার্ক স্বামী বল্লেন,—তিনি শুধু অদ্বৈতই নন,—দ্বৈতও বটেন,—তাই তাঁহার মতে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সর্বশাস্ত্র গ্রাহ্য।

বেদান্ত-কামধেনু নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন,—

'সর্ব্বংহি বিজ্ঞান মতো যথার্থকম্
শ্রুতি স্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতম্
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতি সূত্র সাধিতা॥'

এতৎ সমস্তই বিজ্ঞানময়—

অতএব যথার্থ,—কারণ এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলে শ্রুতিস্মৃতি সর্বত্র প্রমাণ করেছেন,—ইহাই বেদজ্ঞদিগের অভিমত এবং ব্রহ্মের ত্রিরূপতাও (প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরত্ব) শ্রুতি স্থাপন করেছেন—।

শ্রুতিও বলছেন—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

ভোক্তৃ, ভোগ্য ও প্রেরয়িতৃরূপ (জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ রূপ) সমুদায়কে ব্রহ্মরূপে অবগত হও।

প্রবন্ধের বিস্তৃতির ভয়ে আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করে এই বলে বিদায় নিচ্ছি—

'যো দেবো অগ্নৌ—যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধীসু, যো বনস্পতিসু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥ শ্বেত।২।অঃ ১৭

* ৬ই অগ্রহায়ণ, বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

নিষ্ক্রমণ

(১৭১ পৃষ্ঠার পর)

অতঃপর খোলাবুক কোটপরে নীলকমল মল্লিকাকে বর্ধমান পর্যন্ত মোটরে ঘুরিয়ে আনলে। আর একদিন শিবপুরে চড়ি-ভাতি।

সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুঞ্জয় সংবাদ পেলেন, তার বসতবাড়িটিও নিলামে চড়েছে। এর আসবাব, বাইরের বাগান, কিছুই তাঁর নয়। ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষে তাঁর হাতের কব্জি গেছে ভেঙে। আর সাতদিনের মধ্যেই ক্রেতা দখল নেবে। ক্রেতা কে?

আবার কে, নীলকমল চৌধুরী।

এবারে আর মৃত্যুঞ্জয় বিস্ময়পীড়িত হলেন না। গলা শুকিয়ে এসেছিল, চেঁচিয়ে এক গ্লাস জল প্রার্থনা করলেন।

জল এলো না। চাকর বিদায় নিয়েছে আগেই। প্রবীরের সন্ধান করলেন। কোথায় প্রবীর! পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের শৃংখলা ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতো।

স্বয়ং জল গড়িয়ে খাবেন বলে মৃত্যুঞ্জয় অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সিঁড়ির বাঁকে তাঁকে থামতে হ'ল। ঈষৎ দূরে অতি ঘনিষ্ট দুটি মনুষ্যমূর্তি স্বল্পালোকেও চিনতে অসুবিধা হ'ল না তাঁর মেয়ে মল্লিকা-কে। আর একজন কে? আবার কে, নীলকমল, নীলকমল চৌধুরী।

টলতে টলতে মৃত্যুঞ্জয় স্বগৃহে ফিরে এলেন। মল্লিকা আর নীলকমলকে মনে মনে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখলেন। কিন্তু নীলকমল যে একদা ছিল তাঁর বেতনভুক্, আর জাতে যে সে তিলি!

পরদিন প্রবীর বললে, বাবা, অতোবড় বাগানটায় ক'ঘর ভাড়াটে বসাবো। খামখা কতগুলো জায়গা নষ্ট হচ্ছে। নীলকমলের আইডিয়া। এতে মুনফা হবে ডবল। আর একটু ইতস্তত করে প্রবীর বললে, ট্যাংরায় একটা ট্যানারী খুলবো ভাবছি। চামড়ার ব্যবসায় আজকাল বিস্তর লাভ। নীলকমল ফিনান্স করবে, আমাকে ওর ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে নেবে বলেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাকস্ফূর্তি হল না। তাঁর ছেলে হবে ব্যবসাদার। ক্ষত্রিয়ের বাচ্চা ধরবে বেণের দাঁড়িপাল্লা, আর পিতৃপুরুষের ভিটেয় চড়বে ঘুঘুরূপী ভাড়াটে! মৃত্যুঞ্জয় সারাদিন দরজা বন্ধ করে গীতায় মনোনিবেশ করলেন।

প্রবীর সন্ধ্যাবেলা বললে, আর একটা কথা। মল্লিকা আর নীলকমল—It's such an agreeable match! আমি সম্মতি দিয়েছি। আপনি ওদের আশীর্বাদ করুণ!

মৃত্যুঞ্জয় জবাব দিলেন না।

৪

কাহিনীর শেষ পর্বে দেখা গেল মৃত্যুঞ্জয় তাঁর পৈতৃক জুড়িগাড়িটায় চেপে বসেছেন। মল্লিকাকে ডেকে বললেন, এ বাড়ি ছেড়ে চললুম। আমারি ছেলে তার অভিজাত নাক থেৎলে দেবে দোকানির জুতোর তলায়, ঐ আমি সইতে পারবো না।

কুলি মিস্ত্রীগুলো গাঁইতি-সাবল নিয়ে সমস্ত বাগানটা খুঁড়ছে। সামন্ততন্ত্রের কবর। ওরি ওপর ভাড়াটের সৌধ নির্মিত হবে। Out লেখা দরজা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের জুড়িগাড়ি বেরিয়ে গেল। In লেখা ফটক দিয়ে তখন ঢুকছে নীলকমল আর প্রবীরের মোটর। ওরা ট্যানারি তৈরির সলাপরামর্শে মসগুল। ওদের পিছনে পিছনে লরি-বোঝাই হয়ে এলো, লোহার কড়ি, বরগা, আর নানা যন্ত্রপাতি।

জাপ যুদ্ধের এক বৎসর

বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে জাপান সুদূর প্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চল করতলগত করে। উত্তরে মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে দক্ষিণ টিমর দ্বীপ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভারতের সীমান্ত হইতে পূর্বে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিরাট স্থল ও জলভাগ তাহার করায়ত্ত হইয়াছে। প্রথম ছয় মাসের যুদ্ধে জাপানের সাফল্যের কাহিনী বিস্ময়কর। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ড—এই তিন প্রতিপক্ষ শক্তিকে সে আঘাতের পর আঘাতে দ্রুত পর্যুদস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য দখল করিয়া লয়। প্রথম বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে মিত্রপক্ষ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া আক্রমণোদ্যোগী হয়। সলোমন ও নিউগিনিতে মার্কিন অভিযান ইহার নিদর্শন। এই সময়ে জাপান নূতন কোন বড় আক্রমণ না করিয়া বিজিত রাজ্যে তাহার দখল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার কার্যে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়। নিম্নে যুদ্ধের এক বৎসরের ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হইল:—

মিঃ চার্চিল   জেনারেল তোজো

মিঃ রুজভেল্ট

ডিসেম্বর—১৯৪১

৭ই—জাপান বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওয়াহু দ্বীপ এবং পার্ল বন্দরের নৌঘাঁটি, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলা, প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়েক ও গুয়াম দ্বীপ, হংকং ও সিঙ্গাপুরে প্রথম বিমান হানা চালায় এবং মালয়ের উপকূলে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করে।

৮ই—বৃটেন ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। থাইল্যাণ্ডে জাপ বাহিনীর প্রবেশ—উত্তর মালয়ের কোটাবারুতে জাপানীদের অবতরণ—সিঙ্গাপুরে বিমান আক্রমণ—ফিলিপাইনে প্যারাসুট সৈন্যের অবতরণ। জাপান কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়েক দ্বীপে ও সাংহাই দখলের দাবী।

৯ই উত্তর মালয়ে কোটাবারু বিমান ঘাঁটি দখলের জন্য তীব্র লড়াই

শ্যাম উপসাগরে বৃটিশ ব্যাটলসিপ 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' (৩৫ হাজার টন) ও বৃটিশ ব্যাটল ক্রুজার 'রিপালস্' (৩২ হাজার টন) নিমজ্জিত।

১১ই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইতালী ও জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন।

মার্কিন বিমানপোতের বোমা বর্ষণে জাপ ব্যাটলসিপ 'হারুনা' (২৯ হাজার টন) নিমজ্জিত।

১৩ই জাপান কর্তৃক গুয়াম দ্বীপ অধিকারের দাবী।

১৪ই থাইল্যাণ্ড হইতে আগত জাপ বাহিনীর ব্রহ্মের দক্ষিণাংশে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট অঞ্চলে প্রবেশ।

১৬ই—বৃটিশ উত্তর বোর্নিওতে জাপ বাহিনীর অবতরণ।

১৮ই—মালয়ের কেদা ও ওয়েলেসলী প্রদেশে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।

১৯শে—পেনাং হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত।

২০শে—ফিলিপাইনের মিণ্ডানাও দ্বীপে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

২৩শে—রেঙ্গুনে প্রথম জাপ বিমান আক্রমণ।

২৫শে—হংকংয়ের আত্মসমর্পণ।

২৭শে—ম্যানিলার উপর জাপ বিমান আক্রমণ। প্রশান্ত মহাসাগরে আবিয়াং দ্বীপে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

জানুয়ারী—১৯৪২

১লা—সারাওয়াক হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত।

২রা—ব্রহ্ম রক্ষায় চীনা বাহিনীর ব্রহ্মে প্রবেশ।

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন।

৪ঠা—বৃটিশ উত্তর বোর্নিওতে জাপ সৈন্যদলের অবতরণ।

১১ই—ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজে জাপ অভিযান আরম্ভ।

১৩ই—মালয়ের কুয়ালালামপুরের পতন।

১৫ই—মালাক্কা প্রণালীর উপর জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯শে—বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক দক্ষিণ ব্রহ্মের টাভয় নগরী পরিত্যক্ত।

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ' শ' বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আটক।

২৩শে—জাপ সৈন্যদল কর্তৃক বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের রাবাউল, নিউগিনি এবং সলোমন দ্বীপে অবতরণ।

২৬শে—জাপ বাহিনী কর্তৃক মালয়ের বাটু পাহাড় অধিকৃত।

২৭শে—ব্রহ্মের মাগুই নগরীর পতন।

বৃটিশ ব্যাটলশিপ 'বারহাম' (৩১ হাজার টন) নিমজ্জিত।

৩১শে—মালয়ে মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধের অবসান। সিঙ্গাপুরে সংগ্রাম আরম্ভ। জোহোরবারুর সেতুমুখ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সংবাদ।

ফেব্রুয়ারী—১৯৪২

৮ই—জোহর ও সিঙ্গাপুরের মধ্যবর্তী দ্বীপে জাপানীদের অবতরণ।

১০ই—সেলিবিস, নিউ ব্রিটেন ও বাটানে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

১১ই—সিঙ্গাপুর শহরে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

ব্রহ্মের মার্তাবান নগরী জাপ করতলগত।

১৫ই—সিঙ্গাপুরের পতন।

সুমাত্রায় জাপ সৈন্যের অবতরণ।

১৬ই—সুমাত্রার পালেম্বাং তৈলঘাঁটি জাপ অধিকৃত।

২০শে—টিমর দ্বীপে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

২৪শে—দক্ষিণ সুমাত্রা ও বলী দ্বীপ জাপ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত।

২৬শে—আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের উপর জাপ বিমানের বোমা বর্ষণ।

মার্চ—১৯৪২

১লা—জাভায় জাপ সৈন্যের অবতরণ।

২রা—ব্রহ্মে জাপ বাহিনীর সিতাং নদী অতিক্রম।

৬ই—জাপ বাহিনী কর্তৃক বাটাভিয়া অধিকৃত হইবার দাবী।

৯ই—ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের নূতন রাজধানী বাণ্ডোয়েংয়ের পতন।

১০ই—রেঙ্গুনের পতন।

১৪ই—অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

১৬ই—ব্রহ্মের বেসিন শহর জাপ করতলগত।

২০শে—ব্রহ্মে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক থারাওয়াডি পরিত্যক্ত।

২১শে—ব্রহ্মে জাপ বাহিনীর সহিত চীনা অভিযানকারী বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ।

২৩শে—জাপ বাহিনী কর্তৃক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অধিকার—কয়েকদিন পূর্বে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত।

২৯শে—ব্রহ্মের টংগু শহরে জাপ বাহিনীর প্রবেশ।

এপ্রিল—১৯৪২

২রা—ব্রহ্মের আকিয়াব বন্দরে জাপ সৈন্যের অবতরণ।

৪ঠা—বঙ্গোপসাগরে অভিযানকারী জাপ নৌবহরের উপর মার্কিন বিমান আক্রমণ—একখানি জাপ ক্রুজার ও অপর তিনখানা জাহাজ জলমগ্ন।

ব্রহ্মে প্রোম হইতে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।

৫ই—সিংহলে কলম্বোর উপর জাপ বিমান হানা।

৬ই—ভারতে জাপ বিমানের প্রথম আক্রমণ—ভিজাগাপট্টম ও কোকনদে বোমা বর্ষণ।

৯ই—ভারত মহাসাগরে জাপ বিমানের আক্রমণে দুইটি বৃটিশ ক্রুজার জলমগ্ন—বঙ্গোপসাগরে কয়েকখানি পণ্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত।

সিংহলে ত্রিণকোমালীর উপর জাপ বিমান হানা।

ফিলিপাইনে বাতান প্রতিরোধের পরিসমাপ্তি।

১০ই—সিংহলের উপকূলে জাপ বিমান আক্রমণের ফলে বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ "হার্মিস" নিমজ্জিত।

১৮ই—টোকিও, ইয়োকোহামা ও ওশাকা অঞ্চলে প্রথম মার্কিন বিমান হানা।

২২শে—ব্রহ্মের ইরাবতী রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ সম্পূর্ণ।

মে—১৯৪২

১লা—ব্রহ্মে জাপ বাহিনী কর্তৃক লাসিও দখল।

৩রা—ব্রহ্মে চীনা বাহিনী কর্তৃক মান্দালয় ত্যাগ।

৬ই—ফিলিপাইনের দ্বীপদুর্গ করিজিডরের আত্মসমর্পণ।

৮ই—চট্টগ্রামে প্রথম জাপ বিমান হানা।

জাপ বাহিনী কর্তৃক আকিয়াব অধিকৃত।

১০ই—পূর্ব আসামের একটি ছোট শহরে জাপ বিমান হানা।

১৬ই—পূর্ব আসামের একটি শহরে পুনরায় বিমান হানা।

২৯শে—ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান—ব্রহ্ম হইতে বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ সমাপ্ত।

৩০শে—চীনাগণ কর্তৃক চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়া পরিত্যক্ত।

জুন—১৯৪২

৩রা—আলস্কায় জাপ বিমান হানা।

৭ই—মিডওয়ে দ্বীপের নৌযুদ্ধে জাপ নৌবহরের বিপর্যয়—তেরখানি যুদ্ধজাহাজ এবং সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ নিমজ্জিত।

মার্কিন জেনারেল ম্যাক্ আর্থার—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি

জাপ জেনারেল যিমসীতা—মালয়, সিংগাপুর ও ফিলিপাইন বিজয়ী

১৩ই—মিডওয়ে ও প্রবাল সাগরের যুদ্ধে জাপানীদের বিপুল ক্ষতি—চারিখানি বিমানবাহী জাহাজ নিমজ্জিত ও দশ হাজার সৈন্য নিহত হওয়ার সংবাদ। প্রবাল সাগরে ৩৭ খানি জাপ রণতরী নিমজ্জিত বা ঘায়েল—আমেরিকার বিমানবাহী জাহাজ "লেক্সিংটন" নিমজ্জিত।

এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের অবতরণ।

২১শে—জাপ বাহিনী কর্তৃক এলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিসকা দ্বীপ দখল।

২৭শে—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার প্রথম অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরিত।

২৯শে—মিডওয়ের যুদ্ধে জাপ নৌবহরের ক্ষতি—চারিটি বিমানবাহী জাহাজ, দুইটি বড় ক্রুজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ার, এক বা ততোধিক সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত এবং আঠার হাজার জাপ সৈন্য ধ্বংস হওয়ার সংবাদ।

জুলাই—১৯৪২

১৯শে—চীনের চেকিয়াংয়ের উপকূলে চীনাদের পাল্টা আক্রমণ।

২১শে—ব্রহ্মে ব্রিটিশ বিমান হানা।

২৩শে—নিউগিনির বুনায় জাপানীদের অবতরণ।

আগস্ট, ১৯৪২

৩রা—চীনের চেকিয়াংএর উপকূল হইতে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ।

৭ই—জাপ বাহিনী কর্তৃক অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে টিমর ও ডাচ নিউগিনির মধ্যবর্তী টেনিম্বার, কেই ও আরু দ্বীপ দখল।

১০ই—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন সৈন্যদলের অবতরণ।

১৭ই—সলোমনের কয়েকটি দ্বীপ মার্কিন সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদ।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৭ই—সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালকানারে জাপানীদের সৈন্য নামাইবার চেষ্টা ব্যর্থ—গুয়াদালকানারে আরও মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

১১ই—নিউগিনির ওয়েন স্ট্যানলি এলাকায় জাপ অগ্রগতি প্রতিহত।

(শেষাংশ ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
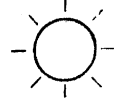
বাঙ্গলা বনাম বিহার দলের খেলা

বাঙ্গলা বনাম বিহার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আগামী ১২ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে আরম্ভ হইবে। এই খেলা দর্শনীয় হইবে ও দর্শক সমাগম ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। গত তিন বৎসর এই খেলাটি জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল এবং বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদিগণ এই খেলা অবলোকন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর তাঁহারা এই খেলা দেখিয়া তিন বৎসরের সঞ্চিত দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবেন আশা হয়।

খেলার ফল কি হইবে, কেহই পূর্বে হইতে বলিতে পারে না। বাঙ্গলা ও বিহার দলের পরিচালকগণ দল শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বিহার দলের পরিচালকগণের প্রচেষ্টার অবসান হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দলের পরিচালকগণ এখনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের চিরাচরিত ইউরোপীয় খেলোয়াড় দ্বারা দল পুষ্ট করিবার প্রথা এই বৎসর নষ্ট হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ইংলণ্ডের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিবার এখনও চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাঙ্গলার পক্ষ সমর্থনকারী দলের তালিকা প্রকাশ করিয়া নীচে উল্লেখ করিয়াছেন, দুইজন বিশিষ্ট ইংলণ্ডের খেলোয়াড়ের নাম যাঁহাদের খেলিবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ তাঁহারা যাহাতে বাঙ্গলার পক্ষ সমর্থন করেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের নাম যথাক্রমে হার্ডস্টাফ ও বার্টলার। ইঁহারা দুইজনেই ইংলণ্ডের নটস দলের খেলোয়াড়। হার্ডস্টাফের খেলা ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেকেরই দেখিবার সুযোগ হইয়াছে এবং তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যাটসম্যান, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে বার্টলার শোনা যায়, ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। এই দুইজন খেলোয়াড় বাঙ্গলার পক্ষ সমর্থন করিলে নির্বাচিত দল হইতে হার্ভে জনস্টন ও পি ডি দত্ত বাদ পড়িবেন। বাঙ্গলার এই দুইজন খেলোয়াড় বর্তমানে কিরূপ মানসিক কষ্ট পাইতেছেন, ইহা ভাবিতেও দুঃখ হয়। পরিচালকগণের হার্ডস্টাফ ও বার্টলারকে দলভুক্ত করিবার ইচ্ছাই যদি ছিল, তবে এইভাবে তালিকা প্রকাশিত না করিলেই পারিতেন? বিহার দলের পরিচালকগণ কৈ এইরূপ নির্বাচিত দলের কাহাকেও ঝুলাইয়া রাখেন নাই। তাঁহারা প্রথমে বিদেশ হইতে আগত খেলোয়াড়দের সহিত দলে খেলিতে পারিবেন কি না, এই বিষয় স্থির নিশ্চয় হইয়াছেন ও পরে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ক্রিকেট পরিচালকগণের পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব ছিল? যাঁহারা এই সকল দল পরিচালনা করেন, তাঁহারা বিনাদ্বিধায় বলিবেন, "না", এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিবেন, "শেষ সময়ে তাড়াতাড়ি কোন কিছু করিতে গেলেই এইরূপ হইয়া থাকে।" তাহা ছাড়া বাঙ্গলার পরিচালকগণ যদি হার্ডস্টাফ ও বার্টলারের নাম তালিকাভুক্ত করিতেন এবং অতিরিক্তের মধ্যে হার্ভে জনস্টন ও পি ডি দত্তের নাম প্রকাশিত করিতেন, তাহা হইলে মনে হয়, কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। নিম্নে বাঙ্গলা ও বিহারের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

বাঙ্গলার দলঃ—কার্তিক বসু (অধিনায়ক), কুচবিহারের মহারাজা, কে ভট্টাচার্য, এন চ্যাটার্জি, এস গাঙ্গুলী, এ জব্বর, এস দত্ত, এস মুস্তাফি, ই হার্ভে জনষ্টন, পি ডি দত্ত, সি টেম্পলিন।

দ্বাদশ ব্যক্তিঃ—ধ্রুব দাশ।

অতিরিক্তঃ—এম সেন, এস মিত্র, এম নায়িম ও এ দেব।

বিহার দলঃ—সুঁটে ব্যানার্জি (অধিনায়ক), বিজয় সেন, এস ব্যানার্জি (ছোট), বিমল বসু, পি চৌধুরী, শান্তি বাগচী, মহেন্দর সিং, ডি খাম্বাটা, কল্যাণ বসু, কৃষ্ণ ঘোষ, কর্পোর‍্যাল লান, মিনু দস্তুর, লেফটেনাণ্ট এডমান্ডস ও এন কুমার।

ইফতিকার আমেদের কৃতিত্ব

পাঞ্জাবের উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদ লক্ষ্ণৌর রিফায়েম ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতার খেলায় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস, তিনটি বিভাগেই বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছেন। সিঙ্গলসের সাফল্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; কারণ এই বিভাগের ফাইনালে ইফতিকার আমেদকে গউস মহম্মদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। খেলার সূচনায় সকলেই কল্পনা করেন—ইফতিকার পরাজিত হইবেন। কারণ, ইতিপূর্বে লাহোর টেনিস প্রতিযোগিতায় গউস মহম্মদ সহজেই ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করেন। কিন্তু খেলা আরম্ভ হইবার অর্ধ ঘণ্টা পরে সকলেই মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইফতিকার আমেদ পর পর দুইটি সেট দখল করেন। এই সময়েও কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ইফতিকার স্ট্রেট সেটে গউসকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন। গউস এই সময় প্রাণপণ খেলিয়া খেলার মোড় ফিরাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ডাবলসের খেলায় ইফতিকার গউস মহম্মদের সহযোগিতায় সহজেই বিজয়ী হন। মিক্সড ডাবলসে মিস আজিজ তাঁহাকে জয়লাভে সাহায্য করেন। তবে এই খেলায় দিলীপ বসু ও মিসেস বিশপ বিশেষ বেগ দেন। তাঁহারা দ্বিতীয় সেটের খেলায় তীব্র মারের দ্বারা ইফতিকার আমেদ ও মিস আজিজকে বিব্রত করেন। কেবল ইফতিকার আমেদ খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তা প্রকাশ করায় শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য তিনিই লাভ করেন।

এই বৎসর টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা গঠিত হইবে না, নতুবা ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম স্থানের জন্য গউস

মহম্মদকে ইফতিকারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইত। ফল কি হইত, বলা কঠিন। ইফতিকার আমেদ রিফায়েম ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতায় শোচনীয়ভাবে গউস মহম্মদকে পরাজিত করিয়া যে সাহস ও আস্থা লাভ করিলেন, পরবর্তী প্রতিযোগিতায় তাহা ইফতিকারকে গউস মহম্মদকে পরাজিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় এই পর্যন্ত কোন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মানলাভ করেন নাই সত্য, তবে ক্রমপর্যায় তালিকায় তাহার স্থান উর্ধ্বে হইবে, তাহার প্রমাণ তিনি দিতেছেন। নিম্নে রিফায়েম ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পুরুষদের সিঙ্গলস

ইফতিকার আমেদ ৬—৩, ৬—১, ৬—৩ গেমে গউস মহম্মদকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

ইফতিকার আমেদ ও গউস মহম্মদ ৮—৬, ৬—২, ২—৬, ৬—৩ গেমে দিলীপ বসু ও ইরসাদ হোসেনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস আজিজ ও মিসেস বিশপ ৬—৩, ৬—৩ গেমে মিসেস হ্যানসন ও মিসেস কোসেনকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ইফতিকার আমেদ ও মিস আজিজ ৬—৪, ৯—৭ গেমে দিলীপ বসু ও মিসেস বিশপকে পরাজিত করেন।

পেশাদার সিঙ্গলস

নবাবুদ্দিন ৭—৫, ১—৬, ৬—৮, ৬—৩, ৬—৩ গেমে আজিজুল হককে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস

ভি পি সয়াল ৬—৩, ৬—৪ গেমে উমাকান্তকে পরাজিত করেন।

জাপ যুদ্ধের এক বৎসর

(১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

অক্টোবর, ১৯৪২

৮ই—নিউগিনিতে মিত্রপক্ষের বাহিনী কর্তৃক ওয়েন স্ট্যানলী এলাকা অধিকার।

১২ই—গত ৮ই সেপ্টেম্বর সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে তিনখানি বড় মার্কিন ক্রুজার (কুইন্সি, ভিন্সেন ও এস্টোরিয়া) নিমজ্জিত এবং বহুলোক হতাহত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা।

১৪ই—সলোমনের নৌযুদ্ধে জাপানের ছয়খানি রণতরী নিমজ্জিত—গুয়াদালকানারে আরও জাপ সৈন্যের অবতরণ।

১৭ই—গুয়াদালকানার দখলের জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম—জল স্থলে ও অন্তরীক্ষে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ।

১৮ই—আসামের ডিগবয়ের নিকট হইতে শত্রু বিমান বিতাড়িত।

২৫শে—চট্টগ্রামে বিমান ঘাঁটি এবং উত্তর-পূর্ব আসামে কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমান আক্রমণ—সামান্য লোক হতাহত। গুয়াদালকানারে ট্যাঙ্কসহ জাপানীদের ব্যাপক আক্রমণ—মার্কিন বিমান আক্রমণে পাঁচটি জাপ রণতরী জখম।

২৬শে—উত্তর আসামের একটি বিমান ঘাঁটিতে জাপ বিমান হানা।

২৭শে—২৫শে অক্টোবর ডিব্রুগড় অঞ্চলে জাপ বিমান বহর কর্তৃক আমেরিকান বিমান ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ।

২৮শে—আসাম অঞ্চলে মিত্রপক্ষের বিমান ঘাঁটির উপর পুনরায় জাপ বিমান হানা।

৩১শে—নিউগিনিতে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক আলোলা অধিকার।

নবেম্বর, ১৯৪২

৩রা—নিউগিনিতে অস্ট্রেলিয়ান বাহিনী কর্তৃক কোকোদা অধিকৃত। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপ ও বৃটিশ টহলদার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ।

১৬ই—সলোমনের দরিয়ায় নৌযুদ্ধ—গুয়াদালকানার তুলাগি এলাকায় অভিযানকারী জাপ নৌবহরের ক্ষতি—২৩টি জাপ জাহাজ নিমজ্জিত। আমেরিকানদের আটটি জাহাজ জলমগ্ন।

নিউগিনিতে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জেনারেল ম্যাক আর্থার স্বয়ং রণাঙ্গনে অবতীর্ণ।

২০শে—গত সপ্তাহে সলোমনের নৌযুদ্ধে জাপানীদের ২৮খানি জাহাজ জলমগ্ন।

২৬শে—নিউগিনিতে বুনার চারিদিকে প্রবল যুদ্ধ।

ডিসেম্বর, ১৯৪২

২রা—ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে উভয় পক্ষের টহলদারী সৈন্যদের কর্মতৎপরতা—অতর্কিত আক্রমণে কতিপয় জাপ সৈন্য হতাহত।

৩রা—নিউগিনিতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের বুনার উপকণ্ঠে প্রবল চাপ।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালকানারের উত্তরে এক নৌ-যুদ্ধে ৬টি জাপ ডেস্ট্রয়ার ও অপর তিনটি জাহাজ জলমগ্ন—যুক্তরাষ্ট্রের একটি ক্রুজার নিমজ্জিত—গুয়াদালকানারে জাপানীদের নূতন সৈন্য নামাইবার চেষ্টা ব্যর্থ।

৫ই—চট্টগ্রামে পুনরায় জাপ বিমান আক্রমণ।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৩রা পৌষ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 19th December, 1942 [৬ষ্ঠ সংখ্যা

দেশব্যাপী অন্নসঙ্কট

জাপানীদের আক্রমণ কিংবা তাহাদের বোমার ভয় ছাড়াইয়া অন্ন চিন্তাই দেশের সর্বত্র প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সরকার আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, হৈমন্তিক ফসল উৎপন্ন হইবার পর চাউলের দর কমিবে; কিন্তু দর কমিবার কোন লক্ষণ তো নাই-ই, দিনের পর দিন অস্বাভাবিক রকমে চাউলের দর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যে ১০ টাকা হইতে দর ১৬ টাকা ১৭ টাকা এবং কোথায় কোথায় ২০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে টাকায় দুই সের পর্যন্ত চাউল বিক্রয় হইতেছে। কুমিল্লা শহরে মফঃস্বল হইতে চাউল আমদানী না হওয়ায় চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং কোন কোন পরিবারকে চিড়া খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে। অবস্থা তো এইরূপ। ইহার প্রতিকার কি? বাঙলা সরকার চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সে দর কেবল সময় সময় সংবাদ-পত্রের স্তম্ভেই শুধু দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী বাঁধা দরে জনসাধারণ চাউল পায় না; পক্ষান্তরে তাহাতে উল্টা বিপত্তিই ঘটিতেছে। লাভখোর ব্যবসায়ীর দল সরকারী বাঁধা দরে চাউল বিক্রয় বন্ধ করিয়া বাজারে কৃত্রিমভাবে চাউলের অভাব সৃষ্টি করিয়া চাউলের দর ইচ্ছামত রাতারাতি বাড়াইয়া তুলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে চারিদিকে লাভখোরদের লুঠের কারবার আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি পাবনা শহরের একটি খবরে ব্যাপার কিরূপ 'চলিতেছে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। খবরে প্রকাশ, একদিন চাউলের ব্যাপারীরা জোট বাঁধিয়া ঠিক করে যে, সরকারী বাঁধা দরে তাহারা চাউল বিক্রয় করিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সকলকে জানাইয়া দেয় যে, তাহাদের দোকানে চাউল নাই। পেটের দায় বড় দায়, মানুষ এক্ষেত্রে কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে অসম্ভব কিছু নয়। কতকগুলি লোক এই অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া দোকান ভাঙিতে উদ্যত হয়। তখন একজন ব্যবসায়ী কিছু চাউল বিতরণ করিয়া এই বিপদ কাটাইয়া দেন। যে সব লাভখোর ব্যবসায়ী এইরূপ অসঙ্গত উপায়ে চাউলের দর বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা জানা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায় স্থানীয় কর্মচারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং সে কর্তব্য যাহাতে লঙ্ঘিত না হইতে পারে সরকারের নীতি তদুপযোগী সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। চাউলের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া যাওয়ায় চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে এবং এতৎসম্পর্কে সরকারী বিধি-ব্যবস্থার সম্বন্ধে লোকের মনে নানারকম সন্দেহের ভাবও সৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রীযুত মদনমোহন বর্মণ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এই সন্দেহের ভাব দূর করিবার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়াছেন। তিনি এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'গভর্নমেন্ট খাদ্য সরবরাহ বিভাগের উচ্চতন কর্মচারীদের সহযোগে ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যবসায়ী ফার্মগুলি খাদ্যদ্রব্যের

মজুত পরিমাণ ও মূল্য লইয়া কারসাজি করিতেছেন বলিয়া লোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে গভর্ণমেণ্ট হইতে তদন্ত হওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট কোন জিনিসের মূল্য বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রব্য বাজার হইতে অকস্মাৎ যেভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহাতে দোকানদারদের কারসাজীর সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। খাদ্য সমস্যা কেবল জনসাধারণের জীবন-মৃত্যুর সমস্যাই নয়, দেশবাসীর মনোবল অব্যাহত রাখা এবং শান্তি ও আস্থার ভাব দৃঢ় রাখার দিক হইতে গভর্নমেন্টের নিকটও ইহা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা; সুতরাং এই সমস্যার সত্বর সমাধান করিবার জন্য গভর্নমেন্টের সর্বতোভাবে তৎপর হওয়া কর্তব্য।

অবস্থার প্রতিকার—

সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে, গত বৎসর অপেক্ষা গোটা ভারতবর্ষে এ বৎসর প্রায় ২৪ লক্ষ বিঘা জমিতে ধানের চাষ কম হইয়াছে। বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে অনেক স্থানে শস্য ভাল উৎপন্ন হয় নাই। বর্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে পোকা ধরিয়া অনেক ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিধ্বস্ত ও বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের ধানের ক্ষতি তো হইয়াছেই। বাঙলা দেশে যে ধান উৎপন্ন হয়, সকলেই জানেন, তাহাতে বাঙলার বৎসরের অভাব মিটে না। রেঙ্গুন হইতে চাউল আনাইয়া এই অভাব মিটান হইত। কিন্তু ব্রহ্মদেশ জাপানীদের হস্তগত হওয়াতে সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাদ্য সমস্যার দিক হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বাঙলার একটু বিশেষত্ব আছে। বাঙলা দেশের অধিকাংশ লোকের চাউলই প্রধান খাদ্য। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইবার পর জগতের অন্য কোন দেশ হইতে বাঙলার খাদ্যাভাব মিটান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আটার অভাব-জনিত সমস্যাও গুরুতর অকার ধারণ করিয়াছে, পাঞ্জাব এবং বোম্বাই হইতে আমরা সে খবর পাইতেছি। সামরিক অবস্থার জন্য বিদেশ হইতে গম আমদানী করার পথ বন্ধ হইয়াছে; ইহার উপর বহু সৈন্য এদেশে আসার ফলে খাদ্য শস্যের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। জানি না, ভারত সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলার উপর চাপ দিলে এখানকার অবস্থা দুঃসহ হইয়া উঠিবে। অন্য দেশ হইতে গম আনিয়া সে সব অভাব মিটান সরকারের পক্ষে কিছু সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু বাঙলা দেশের পক্ষে অন্য উপায় নাই। বাঙলা দেশ ছাড়া মাদ্রাজে অবশ্য চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বাঙলা দেশ এক্ষেত্রে মাদ্রাজ হইতে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু সাহায্য পইয়াছে বলিয়া আমরা কিছু জানি না। সম্ভবত মাদ্রাজ হইতে চাউল বিদেশে বহু পরিমাণে রপ্তানী করা হইতেছে। সেখান হইতে চাউল আমদানী করিয়া বাঙলার অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি যে, এমন অবস্থার মধ্যেও ভারত সরকার ভারতের অন্ন-সমস্যাকে বড় করিয়া না দেখিয়া বিদেশে চাউল রপ্তানী হইতে দিতেছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব আমাদিগকে কিছুদিন পূর্বে জানাইয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে মোটের উপর ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের অভাব পড়িবে; কিন্তু এই নিশ্চিত অভাবের মধ্যেও তিন মাসে এক সিংহলেই ৩৪ লক্ষ টন খাদ্য শস্য ভারত হইতে রপ্তানী করা হইয়া গিয়াছে। সিংহলের মন্ত্রী স্যার ব্যারন জয়তিলক এই রপ্তানী কার্য চালাইবার প্রয়োজনে এখন ভারতে পাকাপাকি রকমেই ঘাঁটি করিয়া বসিলেন; সুতরাং রপ্তানীর প্রবাহ অপ্রতিহত বেগেই চলিবে। এক্ষেত্রে মাদ্রাজ হইতে বাঙলা দেশ চাউল পাইবে, এ আশা তো নাইই; অধিকন্তু অন্নাভাবগ্রস্ত বাঙলার উপরই বাহিরে চাউল রপ্তানী করিবার জন্য চাপ আসিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে অবস্থা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি প্রস্তাবেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এসোসিয়েশন বলেন, বাঙলা গভর্নমেন্ট চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য বহু পরিমাণে মজুত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলির বহু পরিমাণ ইতিমধ্যেই বিদেশে রপ্তানী করিতে হইয়াছে। ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আর এল নোপানীও বলিয়াছেন যে, নিকটবর্তী দেশে খাদ্য শস্য রপ্তানী করার ফলে এ দেশে খাদ্য শস্যের ঘাটতি আরও বাড়িয়াছে। সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চাটুজ্যে মহাশয়ও এই অভিযোগ করেন যে, বাঙলা দেশের এই অন্নাভাবের মধ্যে এখান হইতে বিদেশে ১৫ হাজার টন চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব বোম্বাইয়ের একটি সভায় বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে বিদেশে খাদ্য শস্য রপ্তানীর পরিমাণ নিম্নতম সীমায় আনা হইয়াছে এবং অতঃপর এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অভাব মিটাইবার কথাই প্রথমে বিবেচনা করা হইবে। ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিবের এই উক্তিতেও আমাদের ভরসা কিছু বাড়িতেছে না; কারণ বিদেশে খাদ্য শস্য প্রেরণের নিম্নতম পরিমাণটা কি—আমাদের জানা নাই এবং এই নিম্নতম পরিমাণে রপ্তানীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বাঙলাব উপর কতটা চাপ আসিয়া পড়িবে তাহাও আমাদের দুর্বোধ্য। এ সম্বন্ধে একটা সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব এই সমস্যা সম্পর্কে দিল্লী গিয়া বাঙলা হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস কতটা সফল হইবে আমরা জানি না। কিন্তু রপ্তানী বন্ধ করিলেই সমস্যা মিটিবে না। খাদ্য বণ্টন এবং মূল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে যে সব গলদ ঢুকিতেছে সেগুলি দূর করিবার জন্য সরকারকে সজাগ থাকিতে হইবে। দীর্ঘ দিনের পরাধীন এই দেশে মানবতার আদর্শে কিংবা তজ্জনিত কর্তব্য-বুদ্ধির তাগিদের চেয়ে দরিদ্রকে শোষণ করিবার হিংস্র প্রবৃত্তিই রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে। এই পাপকে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে।

মেদিনীপুরের বর্তমান অবস্থা

বাঙলার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁহার একটি বিবৃতিতে বলেন, বিহারে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার ফলে বড় বড় ইমারত ধ্বংস হয়। কিন্তু মেদিনীপুরের দুর্দৈবের ফলে দরিদ্র ব্যক্তিগণই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের অসংখ্য আত্মীয়স্বজনের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই কেহ না কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহাদের অন্তরে যে স্বজন বিয়োগের ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এখনও নূতনই আছে। বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্যকার্যে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চেষ্টার প্রশংসা করিয়া শ্রীযুত বসু বলেন এই অসময়ে যিনি দান করেন, তিনি তিনবার দান করেন। শ্রীযুত বসুর এই বিবৃতি হইতে মেদিনীপুরের সেবাকার্য সম্বন্ধে সরকারের নীতির সুস্পষ্ট কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে স্বাস্থ্যবিধান সপর্কে মেদিনীপুরে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অন্যদিক হইতে দুর্গতিগণের দুঃখ কষ্টের এখনও নিরসন হয় নাই। ক্ষুধার দায়ে এখনও মানুষ পাগল। সুতরাং সেবাকার্য অধিকতর সুগঠিত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে যে-সব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, কিংবা সরকার পক্ষ হইতে সে কাজে যে সব প্রতিবন্ধকতার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, সেগুলি দূর হইয়া সেবাকার্য যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে এই বিবৃতি হইতে তেমন কোন আশ্বস্তিরও আমরা আভাষ পাই না। অথচ দেশের লোক সেজন্যই অধিক উৎকণ্ঠিত আছে। আমরা আশা করি, বাঙলা সরকার দেশবাসীর সেই উৎকণ্ঠা দূর করিবেন।

রাষ্ট্র ও আধ্যাত্মিকতা

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-লেকচারে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দিয়াছেন। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের বেষ্টনী হইতে বৃহতের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে সংযোগের স্বাধীনতা লাভের দিকেই ভারতের দার্শনিকগণ তাঁহাদের সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। মনু স্বারাজ্য বলিতে সেই অধিকারকেই বুঝিয়াছেন এবং পরবর্তী যুগে বাঙলা দেশের বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীল রূপ গোস্বামীও প্রেমধর্মের পথে জীবনকে মধুময় করিয়া স্বারাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার লিখিত "বিদগ্ধ মাধব" গ্রন্থের উপসংহার শ্লোকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক স্বারাজ্যের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্যের উপরই আধ্যাত্মিক সেই স্বারাজ্য নির্ভর করে। ঋষিরা আধ্যাত্মবাদী হইলেও এই সত্যকে কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই বরং তাহর উপরই জোর দিয়াছেন। "ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং" এ কথা তাঁহাদেরই কথা। জনসমাজের বিগ্রহ-মূর্তি রাষ্ট্ররূপে বিরাটের উপাসনাকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিকতার আদর্শকে মানবের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ পার্থিব জড় সুখকে পরম বা চরম সাধ্য-স্বরূপে গ্রহণ করে নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু পরম বা চরম সাধ্য লাভের পথে রাষ্ট্র-ধর্মের ভিতর দিয়া মানব জীবনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সুনিশ্চিত করিবার গুরুত্ব তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন এবং সেজন্য জনসেবামূলক রাষ্ট্রতন্ত্র অব্যাহত রাখার কর্তব্যকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভারতের আদর্শ আধ্যাত্মিকতার আদর্শ; শুধু ভারতের কেন মানব-সমাজের পক্ষেই এই আদর্শ সত্য। জড় সুখের প্রাচুর্যে মানবের সর্বাঙ্গীন তুষ্টি এবং পুষ্টি সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিগত কৃষ্টি বা সাধনার পথে স্বাধীনভাবে বৃহতের সঙ্গে সংযোগ একান্তভাবে কামনা করে। মানব সংস্কৃতি সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ও বিচিত্র অবদানের আকারে সেই সাধনার পথেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কোন সমাজ বা জাতির পক্ষেই তাহার সর্বাঙ্গীন অভি-ব্যক্তির এই পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। পরাধীন দেশে রাষ্ট্রের শোষণমূলক নীতি জড় প্রয়োজনকে একান্ত করিয়া তুলিয়া মানুষকে দাবাইয়া রাখে। স্বাধীনভাবে তাহার চিন্তাধারা বৃহতের অভিমুখে অগ্রসর হইবার মত সরসতা পায় না। অধঃপতিত ভারতের বর্তমান অবস্থাও তাহাই। ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীনতা লভ না করিবে এবং পরকীয় শোষণের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত অতীত আধ্যাত্মিকতার কোন আদর্শ এদেশের জাতীয় জীবনে সত্য হইবে না।

স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ

স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ বা গরীবের জন্য সস্তা দামে যে কাপড় ভারত সরকারের চেষ্টায় পাওয়া যাইবে বলিয়া শোনা গিয়াছিল, সে সবন্ধে দেশের লোকে আশা-ভরসা ছাড়িয়াই দেয়; সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আবার নূতন আশা উজ্জীবিত হইয়াছে। শুনিতেছি, বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি কমিটি এই কাপড় উৎপাদন সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে ইংরেজী নববর্ষ পড়িবার কিছু পরেই এদেশের লোক এই নববস্ত্র পরিধান করিতে সমর্থ হইবে। এই কাপড় তিন শ্রেণীর হইবে এবং তদনুযায়ী মূল্যেরও তারতম্য থাকিবে। মূল্য ভারতের সর্বত্র এই রকম হইবে। অন্যান্য সাধারণ কাপড়ের চেয়ে সেই মূল্য শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ টাকা হারে কম হইবে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ এই কাপড় বণ্টনের ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণে এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীসমাজ, জনসমাজ এবং গভর্নমেণ্ট পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ গঠিত হইবে। যে প্রদেশের গভর্নমেণ্ট এ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না, তথায় একজন দালালের উপর এই ভার দেওয়া হইবে। এ ব্যবস্থা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু দালালের কথা শুনিয়াই আমাদের ভয় হয়। দালালীর ভার যাহারা পাইবে,

জনসাধারণের স্বার্থের দিকে তাহাদের দৃষ্টি থাকিবে—এমন আশা আমরা করি না। মোটা হাতে লাভ উঠাইবার দিকেই থাকিবে এই সব লোকের নজর। আমাদের মতে এই ক্ষেত্রে দালালগিরি দ্বারা জনসাধারণকে শোষণ করিবার ফাঁক না রাখাই সরকারের উচিত। দেশের লোকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। তাঁহারা এ-কাজের দায়িত্ব নিজেরা কেন গ্রহণ করিবেন না বুঝা যায় না। অন্যতম কর্তব্যস্বরূপে তাঁহাদিগকেই এই ভার নিতে হইবে। তারপর, সস্তা দামে এই যে কাপড়, ইহাতে গরীবকে যাহাতে পস্তাইতে না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কাপড়গুলি অন্ততঃপক্ষে পরিধান করিবার উপযুক্ত হওয়া দরকার এবং টেকসই হওয়াও আবশ্যক। সে যাহাই হউক, কাপড় যেরূপ অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দরিদ্রেরা যাহাতে এই দুর্মূল্যের বাজারে লজ্জানিবারণ করিতে পারে, সেজন্য এই কাপড় যথাসম্ভব সত্বর বাজারে আমদানী করিবার জন্য সরকার আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হইলেও অনেকটা রক্ষা।

ভারতের ব্যাপরে মার্কিন

ভারতশাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার জন্য মার্কিন দেশের জনমতকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা কিছুদিন হইতে এইরূপ সংবাদ পাইতেছি। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকী লণ্ডনের 'ইভেনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতের সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ভারতে এবং চীনে নবীন জাতি জাগিয়া উঠিতেছে। তাহারা আজ মানবের অধিকার এবং স্বাধীনতা চায়। মার্কিনদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি স্বভাবত এই দিকেই। মাদাম চিয়াং কাইশেক কিছুদিন পূর্বে আমেরিকায় যান, তথা হইতে তিনি লণ্ডনে গিয়াছেন। মিঃ উইলকী বলিতেছেন, "মার্কিনদিগকে এশিয়ার সমস্যাবলী এবং ভারতবর্ষের চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব সম্পর্কে অবহিত করাই মাদাম চিয়াং কাইশেকের যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এশিয়ার কোটি কোটি নরনারীর দুর্দমনীয় স্বাধীনতা স্পৃহা এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য জাতির প্রভাবমুক্ত স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কে মাদাম চিয়াং কাইশেকের একটা দৃঢ় ধারণা আছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, মিঃ উইলকী নিউইয়র্কের 'লুক' পত্রে এইরূপে আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। মাদাম চিয়াং কাইশেকের মার্কিন গমনের উদ্দেশ্য কি ছিল, আমরা বলিতে পারি না। তবে ভারতে ব্রিটিশ-নীতির সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মতের যে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পরবর্তী ব্যাপারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিস্বরূপে মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস্ সত্বরই ভারতে আসিতেছেন। ইঁহার নিয়োগ সম্পর্কে রুজভেল্ট যেন কতকটা অবান্তরভাবেই এই কথাটা জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ পরিকল্পনা অথবা প্রস্তাব লইয়া মিঃ ফিলিপস্ ভারতে যাইতেছেন না। সমরাদর্শ সম্বন্ধে মার্কিন এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। রুজভেল্ট, মিঃ সামনার ওয়েলস্, মিঃ কর্ডেল হাল প্রভৃতি রাজনীতিকগণ মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে স্বাধীনতার বড় বড় কথা বলিতেছেন, অন্য দিকে চার্চিল এবং তাঁহার দলবল শুধু কথায় নয়, কথার সঙ্গে কাজেও দেখাইতেছেন যে, স্বাধীনতার দাবী প্রভৃতি তাঁহারা বুঝেন না, সাম্রাজ্য-শাসন-নীতিতেই তাঁহারা নিষ্ঠাবান। ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কার্যকাল আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করিয়া ভারত সম্পর্কে বর্তমান ব্রিটিশ নীতি অপরিবর্তিত রাখিবার সঙ্কল্পকেই সুদৃঢ় করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মার্কিন রাজনীতিকদের কথা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাজকে বদলাইতে পারিতেছে না। কথার চেয়ে কাজের মূল্যই যে বেশী, মার্কিন রাজনীতিকদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত; কিন্তু মনে হয়, অন্তত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহা উপলব্ধি করেন নাই। দুর্বলের পক্ষে সান্ত্বনা শুধু কথাতেই থাকে, কার্যক্ষেত্রে তাহা বাস্তব আকার ধারণ করে না এক্ষেত্রে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিতেছি।

সাংবাদিকের পরলোকগমন

সুপরিচিত সাংবাদিক বীরেন্দ্রবিনোদ রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। রায় মহাশয় দীর্ঘকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে কাজ করিয়া সুযশ অর্জন করেন। তিনি এক সময়ে 'বেঙ্গলী' পত্রের সঙ্গে সংশিলষ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রে সহকারী সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। রাজনীতিক মতে তিনি মডারেট ছিলেন। তাঁহার লেখনী শক্তিশালী ছিল এবং তিনি সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানুষের দাবী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

বহু কালের পর সনাতন গ্রামে ফিরিল।

গ্রামের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, সনাতন এ গ্রাম দেখিবার কল্পনাও কোনদিন করে নাই। প্রথম গ্রামের বুকে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া সে চিনিতে পারে না, সে মনে করিতে চেষ্টা করে, কোথায় কি ছিল।

বারো বৎসর আগে সনাতন গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল,—দীর্ঘ একযুগের কথা। তখন যাহারা ছিল ছোট, আজ তাহারা অনেক বড় হইয়া গেছে, তখন যাহারা ছিল মাতৃ গর্ভে, আজ তাহারা খেলিয়া বেড়ায়, তখন যাহারা বড় ছিল, আজ তাহাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুকবলে। গ্রামের কত বাড়ি শূন্য হইয়া গেছে, কত বাড়ি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সনাতন গ্রামের পানে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তাহার নিজের জীবনেও কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে আজ সে ভাবিয়া দেখে।

এই গ্রামের বুকে সে জন্মিয়াছে, মানুষ হইয়াছে। তাহার মা লোকের বাড়ি কাজ করিয়া কোন রকমে নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। কি কষ্টেই যে দিন কাটিয়াছিল তাহা সনাতন আজ বলিতে পারে না।

এতটুকু বেলা হইতে সে সহিয়াছে অপমান, লাঞ্ছনা, সহিয়াছে প্রহার ও নির্যাতন। কেন তাহা সেদিন না বুঝিলেও জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিল।

কারণ ছিল সে অস্পৃশ্য, সে দাসীপুত্র। বাল্যে জাতির ব্যবধান, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সে বুঝে নাই, তাই সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে চাহিত, খেলিতে যাইত, অপমান, লাঞ্ছনা সহিয়া কাঁদিয়া সে মায়ের কোলে ফিরিত।

মানুষের প্রতি মানুষের এই অবিচার বাল্য হইতে তাহার মনে জাগাইয়া তুলিয়াছিল বহ্নিশিখা, গর্তের সাপকে খুঁচাইয়া বাহির করিয়া ফণা ধরিতে শিখানো হইয়াছিল। গর্জন করিয়া সে বলিয়াছিল এই অপমানের প্রতিশোধ সে লইবে, মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি ঘৃণা সে সহ্য করিবে না।

বড় হইয়া সে চাহিল ন্যায্য অধিকার মানুষে যাহা দাবী করিতে পারে। সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, জোর করিয়া মানুষের অধিকার দখল করিতে চাহিল, বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দুরা সহ্য করিল না; এই ছোট লোককে তাহারা পায়ে দলিয়া মারিতে চাহিল।

ফলে বাধিয়াছিল স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের সংঘর্ষ, দাঙ্গা করা এবং লাঠি মারিয়া মানুষ মারার অপরাধে সনাতন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

বহুকাল পরে সনাতন দেশের টানে আবার দেশেই ফিরিয়াছে।

আজ তাহার মা নাই, বহুকাল পূর্বে পুত্রশোকে অধীরা মাতা মারা গিয়াছে। যেখানে তাহাদের ছোট কুঁড়ে ঘরখানি ছিল, সেখানে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুদৃশ্য ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে।

সনাতন ক্ষোভে দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, চোখ মুছিল।

(২)

আজ মনে পড়িল তাহার সীতার কথা—গাঙ্গুলী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। পিতা সনাতনকে গ্রাম হইতে বিদায় দিবার অগ্রণী হইলেও সীতা ছিল সনাতনের পক্ষপাতিনী।

সনাতনের মা জমিদার ও সমাজপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে কাজ করিত, কাজেই সনাতন সারাদিন তাহাদের বাড়িতেই থাকিত। খেলার সহচরী সীতা, সে কোনদিন সনাতনকে ঘৃণা করে নাই, বরং উৎসাহ দিত—অস্পৃশ্য হইলেও ভগবানের চোখে সে অস্পৃশ্য নয় সেও মানুষ। সীতা বলিত—সনাতন নিশ্চয়ই খুব বড় কাজ করিতে পারিবে—দেশের ও জাতির উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

আজ সে কথা মনে করিলে হাসি পায়। সনাতন সন্ধান লইয়া জানিল গাঙ্গুলী মহাশয় মারা গিয়াছেন, সীতা বিধবা অবস্থায় এখানেই আছে। সে খুব নিষ্ঠার সহিত পূজার্চনা লইয়া দিন কাটায়। সম্প্রতি তাহার নবনির্মিত মন্দিরে রাধা-মাধবজিউ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই জন্য সে খুবই ব্যস্ত আছে।

দুইদিন উদরে অন্ন নাই—

সনাতন ভাবিয়াছিল সীতার নিকটে সে দাঁড়াইবে। তাহার পৈত্রিক ভিটার উপর ফুলবাগান নির্মিত হইয়াছে, হোক—এই ফুলে সীতা তাহার বিগ্রহের পূজা করিবে, ইহাও তাহার কাছে শান্তিপ্রদ। আজ সীতার নিকটে গেলে সীতা যে তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিবে না তাহা সে জানে।

ভুল তাহার ভাঙ্গিয়া গেল—

বারো বৎসর পরে সীতা আজ তাহাকে প্রথমে চিনিতেই পারিল না।

তাহার পর চিনিল, কিন্তু নিতান্ত অবজ্ঞার ভাবে,—

"ও, আমাদের নিন্দুর ছেলে—সেই যে আমাদের বাইরের কাজ করতো? বুঝেছি—তুমিই না দাঙ্গা করে কত বছরের জন্য জেলে গিয়েছিলে?"

সনাতন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সীতা জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি দরকার আছে?

সনাতন কেবলমাত্র বলিল, "আমি দুদিন খাইনি।" সীতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার পানে চাহিল, বলিল, "বাইরের বাড়িতে বসো, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ো।"

রাণীর মত আদেশ দিয়া সে চলিয়া গেল।

এই সীতা,—এই একদিন তাহাকে অনেক আশা দিয়াছিল, অস্পৃশ্যদের স্পৃশ্যরূপে পরিণত করিবার বাসনা তাহারও ছিল। আজ ঠিক নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সে, সীমানার বাহিরে সেও পা দিবে না।

সনাতনের বুকের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রসাদ না লইয়া কখন সে চলিয়া গেল তাহা কেহ জানিল না।

(৩)

আইনের সাহায্যে সনাতন নিজের জায়গা দখল করিল। সীতার পূজার জন্য রচিত ফুলবাগান নষ্ট হইয়া গেল, ক্রোধে সীতা শপথ করিয়া বসিল, যে কোনরূপে হোক—এই লোকটাকে সে গ্রাম হইতে তাড়াইবেই।

সনাতন বাড়াবাড়ি কিছুই করিল না,—কেবল নিজের বাড়িতেই নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া দিল। এখানে পড়িবে তাহারই মত অস্পৃশ্যেরা—যাহারা কেবলমাত্র স্পৃশ্যদের জন্য সৃষ্ট বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার পায় নাই।

একদিন এই বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার সনাতনও পায় নাই। বর্ণহিন্দু গৃহের ছেলেরা তাহার সহিত এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িতে চায় নাই, কাজেই শিক্ষক তাহাকে পৃথক আসন দিয়াছিলেন। এ অপমান সনাতনের মর্মে মর্মে বিঁধিয়াছিল এবং সেইজন্য সে বিদ্যালয়ে পড়ে নাই।

নিজের চেষ্টায় সে খানিক দূর পর্যন্ত পড়িয়াছিল, সেই বিদ্যার জোরে যতটুকু পারে—এই সব অস্পৃশ্যদের পড়াইতে সে মনস্থ করিল।

বর্ণহিন্দুগণ বাধা দিলেন, বলিলেন, "ছোটলোকের লেখাপড়া শিখবার কোন দরকার নেই। যারা বাইরে ছোট কাজ করবে, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি লাভ হবে শুনি?"

সনাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—উদ্ধত ব্যবহার সে আর করিবে না, যে যাহাই বলুক, সে সবই শুনিয়া এবং সহিয়া যাইবে। সেইজন্য শান্তভাবেই উত্তর দিল, "বাইরে কাজ করলেও ওদের মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্যে খানিকটা লেখাপড়া শিখবার দরকার আছে বই কি?"

তাহার এই বিনীত কথাতেও তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

সীতা বলিয়া পাঠাইল—বিশেষ দরকারে সে সনাতনের সহিত দেখা করিতে চায়, সনাতন যেন এখনই তাহার নিকটে আসে।

সনাতন ধীরে সুস্থে কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পরে সীতার সহিত দেখা করিতে গেল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সীতা জিজ্ঞাসা করিল "এসব কি হচ্ছে শুনি—?"

সনাতন বলিল, "কি হচ্ছে বলুন।" সীতা কি বলিতে চায় তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল, তথাপি অজ্ঞের ভাণ করিল।

সীতা তীব্রকণ্ঠে বলিল, "রোজ সন্ধ্যে হতে রাত দুপুর পর্যন্ত অতগুলো লোকের চেঁচামেচিতে আমার নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছু হয় না। এগুলো তোমায় বন্ধ করতে হবে।"

সনাতন ধীরকণ্ঠে বলিল, "তা হলে আপনার বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের পাঠশালাটা করতে দিন। আমার ঘরটা আপনার কানের কাছে হয়, কাজেই চেঁচামেচিতে আপনার জপ-তপের ব্যাঘাত হতে পারে তা আমি বুঝি। বৈঠকখানাটা দূরে, অত দূর হতে কোন গোলমাল আপনার কানে পেঁছাবে না।—"

সীতা বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল—"তোমার স্পর্ধা তো বড় কম নয়, আমার বৈঠকখানায় তোমার ঐ ইস্কুলটাকে আনতে চাও।"

সনাতন একটু হাসিয়া বলিল,—"এ স্পর্ধা একদিন আপনিই বাড়িয়েছিলেন সীতা দেবী, সে কথা মনে করবেন। জেনে রাখবেন, আমি দেশের কাজ করব বলে দেশেই ফিরে এসেছি, জীবন পণ করেছি। আপনারা আমায় যতই বাধা দিন, যত খুসি পীড়ন করুন, আমি নিজের জিদ ছাড়ব না—কাজ আমি করে যাবই।"

"আমি বাড়িয়েছিলুম—"

সীতা স্তব্ধভাবে সনাতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পরেই দৃপ্ত হইয়া উঠিল—"যাও, যাও তুমি এখান হতে, এখনই যাও, আর এসো না।"

সনাতন বলিল, "আমি যাচ্ছি, না ডাকলে আসব না এ কথাও বলে যাচ্ছি। একটা কথা শুধু বলে যাই সীতা দেবী, সমাজপতির মেয়ে আপনি, গাঁয়ের সবাই আপনাকে অনেক উপরে জায়গা দিয়েছে, আপনার কথা সবাই শোনে। গাঁয়ের দলাদলি ঝগড়া-বিবাদগুলো আগে মিটান দেখি—সকলকে একতাবদ্ধ করুন, আমরা কেউ কোন কিছুতে হাত দিতে আসব না, কোন কথাও বলব না। একটা কথা মনে রাখবেন—গাঁকে আগে উন্নত করা চাই, তবে হবে জাতি উন্নত, দেশ উন্নত। ধর্মের ভাণ করলেই ধার্মিক হওয়া যায় না, সত্যকার ধর্ম আচরণ করা চাই।"

ধীরপদে সে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

গ্রামে দলাদলি, বিবাদ, বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে এবং ইহা যথার্থই সত্য কথা—এইগুলি থাকার জন্যই গ্রাম উন্নতি লাভ না করিয়া অবনতির পথে নামিয়া যাইতেছে। সনাতন অনেক গ্রাম ঘুরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে—গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে আগে নিজেদের মধ্য হইতে এইগুলি দূর করিতে হইবে, সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

অজ্ঞ গ্রামবাসীকে এ বিষয়ে চৈতন্য দিবে কে, তাহার কথা কেই বা শোনে? সনাতন যেখানে একথা বলিতে গেল সেখান হইতেই তিরস্কৃত এবং বহিষ্কৃত হইল—

"হ্যাঁঃ—ছোটলোকের ছেলে, ওর মা চিরটাকাল বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বেড়িয়েছে, সে কিনা আসে আজ উপদেশ দিতে—আমাদের? চিরটাকাল আমাদের বাপ-ঠাকুরদা এই একভাবে দিন কাটিয়েছে, আমরা কাটাচ্ছি, আজ ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলে পদ্ম-লোচন এসে আমাদের কাজ বলে দেয়? কলিকাল কিনা—আরো কত হবে। কোনদিন দেখব—পুজো করতেও চাইবে—।"

সীতার নিকট অভিযোগ আসে।

পাংশুমুখে সীতা বলিল, "আপনারা গাঁয়ে এত লোক থাকতে একটা ছোটলোক এসে প্রভুত্ব করবে? ওকে তাড়ানোর ক্ষমতা আপনাদের নেই?"

গ্রামের বর্ণশ্রেষ্ঠগণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "ও যে একটা দল গড়েছে, ওর হুকুমে তারা জীবন দিতে পারে।"

সীতা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু তারা তো জোর করে কিছু করতে চাচ্ছে না—"

গ্রামের লোকেরা বলিলেন, "সেইটাই তো ভয়ের কথা। জোর করলে তার ব্যবস্থা করা যেত, পুলিশ ডেকে আবার জেলে পাঠানো যেতো—"

বাধা দিয়া উষ্ণ কণ্ঠে সীতা বলিল, "কেবল ওইটুকুই শিখেছেন। আরও একবার কয়েক বছরের মত সনাতনকে জেলে পঠিয়েছিলেন না—"

মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আচ্ছা যান, আমি একবার বলে দেখব।"

ঠিক এই সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিয়া বসিল—যাহা সত্যই কল্পনারও অতীত।

গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার বসুদের বাড়ির বিধবা একটি তরুণীকে পাওয়া যাইতেছিল না। দুইদিন পরে সেই মেয়েটি যখন গ্রামেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল—কয়েকজন লোক তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের মধ্যে মিটিং বসিয়া গেল। বিচার্য বিষয়—এই ধর্ষিতা মেয়েটিকে আবার গ্রহণ করা উচিত কি না।

অনেক তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটির পর স্থিরীকৃত হইল—এ মেয়েটি পতিতা হইয়াছে, অতএব আর ইহাকে সমাজে বা গ্রামে স্থান দেওয়া চলিতে পারে না—তাহাতে সমাজ নষ্ট হইবে, গ্রাম দূষিত হইবে।

সকলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, গ্রহণ করিল না কেবল সনাতন। বর্ণ হিন্দুদের বিচার দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, ক্রোধে গর্জন করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "এত বড় অন্যায় কখনও চলতে পারে না। মেয়েটির যখন কোন দোষ নেই, আপনারা যখন ওঁকে রক্ষা করতে পারেন নি—"

ধমক দিয়া একজন বলিলেন, "তুমি চুপ কর ফাজিল কোথাকার, মনে রেখো তুমি অস্পৃশ্য—আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই।"

"সম্পর্ক নেই—"

সনাতন কতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর মেয়েটির নিকটে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি এসো মা লক্ষ্মি, এই অস্পৃশ্য সন্তানের ঘরে তোমার স্থান করে নেবে চল। তোমার সন্তান তোমায় ত্যাগ করবে না—তুমি এসো।"

মেয়েটি উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল—

সকলেই দেখিল—তাহাদের বুক মাড়াইয়া পতিতা মেয়েটি অস্পৃশ্য সনাতনের কুটিরে চলিয়া গেল।

(৫)

ছোটলোকদের স্পর্ধা অসহ্য—

গ্রামের লোক জমিদার সীতার নিকট গিয়া পড়িল—সনাতনের চালা কাটিয়া তাহাকে তুলিয়া দেওয়া হোক, নচেৎ দেশের, দশের, সমাজের—সর্বোপরি ধর্মের সর্বনাশ হইবে, কিছুই থাকিবে না।

সেইদিন গভীর রাত্রে—

হঠাৎ সনাতনের কুটিরখানিতে কেমন করিয়া আগুন লাগিয়া গেল তাহা কেহ জানে না। সনাতন কোনক্রমে বাহিরে আসিয়া বাঁচিল, তাহার মা লক্ষ্মীও কোন রকমে বাঁচিয়া গেল, গৃহে যাহা কিছু ছিল সবই পুড়িয়া গেল।

পরদিন সকালে পূজার সময় ধ্যানে বসিয়া সীতার মানস-চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—অস্পৃশ্য সনাতনের মূর্তিটাই। যতবার চেষ্টা করিয়া সে দেবতাকে ডাকিতে গেল, ততবারই সনাতনকে দেখিয়া বিরক্তভাবে পূজা শেষ না করিয়াই সীতা উঠিয়া পড়িল।

সীতার আহ্বান শুনিয়া সনাতন আজ আর বিলম্ব করিল না, তখনই চলিয়া আসিল।

শান্তকণ্ঠে সীতা বলিল, "শোন, আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি একটা বিশেষ দরকারে, তোমায় এখনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

সনাতন কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আদেশ?"

সীতা বলিল, "যদি বলি তাই?"

সনাতন মাথা নাড়িল, বলিল, "আমি যদি বলি আমি যাব না—"

ধমকের সুরে সীতা বলিল, "যাবে না কি রকম—তোমায় যেতেই হবে।"

সনাতন হাসিল, বলিল, "ধমক দিয়ে আমাকে গাঁ ছাড়াবেন সীতা দেবী? আমি আগেই বলেছি—আমি যখন এসেছি—যাব না।"

"যাবে না—?" সীতা জিজ্ঞাসা করিল—"কিছুতেই যাবে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে সনাতন বলিল, "না, কিছুতেই যাব না।"

সীতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে যে—"

সনাতন আশ্চর্য হইয়া বলিল,—"কেন, আমি কি অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ—?"

বিকৃতকণ্ঠে সীতা বলিল, "অপরাধ তোমার নয় সনাতন—অপরাধ আমাদের—অপরাধ আমার। পুলিশে জানানো হয়েছে তুমি ওই মেয়েটিকে জোর করে ঘর হতে বার করে নিয়ে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করছো। অনেক প্রমাণও সংগ্রহ হয়েছে, তোমার নিস্তার নেই সনাতন। তুমি এখনই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও—দূরে—অনেকদূরে যাও, যেখানে সহজে কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। তারপর আমি যেমন করেই পারি তোমার নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করব—তোমায়—"

সনাতন হাসিল, বলিল, "ধন্যবাদ, আমি সব বুঝেছি সীতা

(শেষাংশ ১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রুশরা কিসের জোরে লড়ছে

শ্রীদীগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাডে প্রচণ্ড ঘা খাওয়ার পর রুশরা আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। যুদ্ধের খবর দেখে মনে হয়, তাদের এ পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা সামান্য নয়। মস্কো রণাঙ্গনে জার্মান-অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ শহর রজেভ ইতিমধ্যেই বিপন্ন হয়েছে এবং স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ-অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রশ্ন হল, এত ক্ষতি সত্ত্বেও রুশরা এতদিন ধরে কিসের জোরে লড়ছে এবং এই দুর্জয় সংকল্পই বা তাদের এল কোথা থেকে ?

এ শক্তি রুশরা যুদ্ধের সময় অর্জন করে নি। বিপ্লবের পর সমগ্র সোভিয়েট জনসাধারণের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারের জন্য গত পঁচিশ বছর যে চেষ্টা করা হয়েছে, তারই প্রত্যক্ষ ফল রুশ-জার্মান যুদ্ধে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েট কৃষাণীরা ঘাস সংগ্রহ করছে।

কোন বিশেষ এলাকায় বা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে শক্তি সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র দেশ-ব্যাপী সর্বসাধারণের মধ্যে শক্তির উদ্বোধনই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প ও যানবাহন চলাচলের নতুন ব্যবস্থা করা হয়। তদনুসারে বিভিন্ন এলাকায় শিল্পোৎপাদনকেন্দ্র ছড়িয়ে পড়ে। কেবল তাই নয়, উৎপাদনের প্রধান শক্তি জনবলের বণ্টনও সেই অনুযায়ী হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে সেখানে জন-সংখ্যা অতিশয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের হিসাবেই দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ দৈনিক আট হাজার করে লোক বেড়ে যাচ্ছে। এই হার তারপর আরও বেড়ে গিয়েছে। বলশেভিক বিপ্লবের আগে রুশিয়া বাদে সমগ্র য়ুরোপে যত লোক বাড়ত, রুশিয়ায় বৃদ্ধি হত তার তিনভাগের একভাগ। আর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক লোকবৃদ্ধি সমগ্র য়ুরোপের বার্ষিক লোকবৃদ্ধির প্রায় সমান; অথচ য়ুরোপের লোকসংখ্যা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোক-সংখ্যার প্রায় সওয়া দুই গুণ। এত দ্রুত জনবল বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে নি, তার কারণ জনবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনবল বেড়ে চলেছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভৌগোলিক ভিত্তিতে শ্রম বণ্টন করায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকাগুলির। পশুপালক এবং অজ্ঞ কৃষককুল সংস্কারমুক্ত হয়ে জীবিকার্জনের নতুন পন্থা গ্রহণ করেছে। কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির প্রতি তারা আর এখন বিমুখ নয়। নতুন জীবন লাভ করে তারা সুদক্ষ যান্ত্রিক সেজেছে। বিজ্ঞানের আবেদন তাদের কাছে গিয়েও পৌঁচেছে এবং সেই আবেদনে তারা সাড়া দিয়েছে বলেই সোভিয়েট যুদ্ধ সত্যিকারের জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

নতুনভাবে শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লোকবিস্তার হয়েছে নতুন ভিত্তিতে। প্রাচীন রুশিয়ায়ও স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে লোক বসবাস করত, কিন্তু তার মূলে ছিল একটা শোষণ-ব্যবস্থা। অগ্রসর সমাজের লোকেরা অনগ্রসর সমাজকে শোষণ করতে গিয়ে এমন উৎপীড়ন আরম্ভ করত যে, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে লোক তখন স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হত। অনগ্রসর এলাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হত খুবই কম। উত্তর রুশিয়ার ছোট ছোট জাতিগুলি এক রকম লোপ পেতেই বসেছিল। জারের আমলের সরকারী নথিপত্রেই স্বীকৃতি রয়েছে যে, কতকগুলি উপ-জাতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট আমলে একটি জাতিরও নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা নেই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতিরই লোকসংখ্যা বাড়ছে।

কাজাক, কিরঘীজ, তুর্কী, কালমুক, অয়রট, বুরিয়াট, ইভেংক প্রভৃতি সবই ছিল এককালে যাযাবর জাতি। দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকাই ছিল এদের বিচরণভূমি। প্রায় এক কোটি লোক তাদের গো-মহিষ, ছাগল-ভেড়া নিয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। শতচ্ছিদ্র তাঁবুতে ছিল তাদের বাস এবং দারিদ্র্য ও অনাহার ছিল তাদের নিত্য সহচর। এই প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রাপ্রণালী তাদের সেদিনও পর্যন্ত চলে আসছিল। জারের আমলের গভর্নমেণ্ট তাদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করে নি। তখন বলা হত, কিরঘীজের যাযাবরগণ তাদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হলে বসত পেতে পারে। সেই আমলে রুশদের প্রাধান্য বিস্তারের পন্থাই ছিল এই। কোন যাযাবর প্রাচীন রুশিয়ায় বসত পেলে তার গো-মহিষাদি পালন করে স্বাধীন জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেত; কারণ রুশ উপনিবেশিগণ তার ভাল গবাদি পশু সব নিয়ে নিত। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই যাযাবর জাতি এখন বসত

স্থাপন করে গৃহবাসী হয়েছে। গো পালন ও মেষ পালনই এককালে যাদের একমাত্র জীবিকার্জনের উপায় ছিল, আজ তারা শিল্প ও উন্নত কৃষি ধরেছে এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনের অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। সরকারী ব্যয়ে তাদের বসতগুলি সুসংবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই লক্ষাধিক

একটি সোভিয়েট গ্রাজুয়েট মেয়ে রসায়নাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করছে।

...দের পরিবার স্থায়ী বসত স্থাপন করেছে। যে সমস্যার কোনদিন সমাধান হয়নি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অকর্ষিত জমিতে যাযাবর জাতির জন্য যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করেছে। বসত স্থাপন করেও যাযাবররা তাদের পশুপালন ব্যবসা ছেড়ে দেয়নি; বরঞ্চ তার আরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পশুগুলি আগে খোলা মাঠেই থাকত এবং বরফ পড়লে ঘাসের খুবই অসুবিধা হত; কিন্তু এখন সরকারী খরচে পশুর জন্য সব চালাঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেবল কাঁচা ঘাসের ওপরই আজকাল আর নির্ভর করতে হয় না, খন্দের সময় ঘাস শুকিয়ে গাদা করে রাখা হয়। কেবল তাই নয়, সমবায় পদ্ধতিতে তারা এখন ঘাসের চাষও করে। যাযাবরদের আগে জীবনে মাত্র দুবার স্নানের রীতি ছিল—জন্মের পর এবং মৃত্যুর পর; তারা ছিল একেবারে নিরক্ষর; মূর্খ ওঝারা ছিল তাদের চিকিৎসক। এখন তাদের বসতগুলিতে স্নানাগার, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় কিছুরই অভাব নেই। নিরক্ষরতা একরূপ বিদায় নিয়েছে বললেই চলে। চির-ভ্রাম্যমান গৃহহীন যাযাবর জাতি আজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ইমারতবাসী গৃহস্থ পরিবারে পরিণত হয়েছে।

নতুন বসতগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জীর চাষ হচ্ছে এবং সেখানে সব শস্যভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আজ কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত। বিজ্ঞানের সাহায্যে মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে ফসলোৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোকবণ্টনও নতুন ভিত্তি লাভ করেছে। উত্তর এবং পূর্বদিকে শিল্পের সম্প্রসারণ হওয়ায় লোক সেদিকে বিস্তার লাভ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১২ জন লোক বৃদ্ধি হয়; সেই তুলনায় পূর্বাঞ্চলের লোক বৃদ্ধি হয় শতকরা ২৪ জন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রান্তিক এলাকায় লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জোর করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোক পাঠিয়ে যে অনগ্রসর এলাকায় লোকসংখ্যা বাড়ান হয়েছে এমন নয়। অনাবাদি ও অনধ্যুষিত অঞ্চলে শিল্প ও কৃষির ব্যবস্থা হওয়ায় লোক স্বেচ্ছায় জীবিকার্জনের জন্য সেখানে গিয়ে বসত স্থাপন করেছে। অবশ্য রাষ্ট্র থেকে তারা এই স্থানান্তরে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। তাদের নতুন বসতে বাড়িঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্র তাদের শিল্পোৎপাদন ও চাষের জন্য যন্ত্রপাতি যুগিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাহা খরচও পেয়েছে। রাষ্ট্র এতখানি সাহায্য করেছে বলেই উত্তরে সুমেরু অঞ্চল এবং সুদূর প্রাচ্যের কামচটকা অন্তরীপে পর্যন্ত আজ বসত স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার লোক গিয়ে উক্ত অন্তরীপে বসত স্থাপন করে।

বলশেভিক বিপ্লবের আগেও রুশিয়ায় লোক স্থানান্তরে গিয়ে বসত না করত এমন নয়; কিন্তু তখন লোক স্থানান্তরে যেত প্রধানত নতুন কৃষিক্ষেত্র পাওয়ার আশায়। অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থাপন্ন কৃষকরা গিয়ে দরিদ্র চাষীদের ভাল জমিগুলি কেড়ে নিত। দরিদ্র চাষীরা উৎখাত হয়ে হয় সেখান থেকে অন্যত্র সরে পড়ত, আর তা না হলে অবস্থাপন্ন জোতদারদের অধীনে তাদের দাস-জীবন যাপন করতে হত। কিন্তু সোভিয়েট আমলে লোক স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস করছে প্রধানত শিল্পের আকর্ষণে। কাউকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন তাতে আসে না। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ যে সকল এলাকা জারের আমলে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল, সেই সব জনবিরল এলাকায় সোভিয়েট আমলে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠায় লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে জীবিকার্জনের জন্য সেখানে গিয়ে বসত স্থাপন করেছে। এদ্দ্বারা স্থানীয় কোন সম্প্রদায় বা জাতি বঞ্চিত হয় নি। বরঞ্চ নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় লোক উপকৃতই হয়েছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই জাতীয় সম্পদের সমান অধিকারী।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের আগে রুশিয়ায় ইহুদীদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন হত। অথচ তারাই ছিল সমগ্র রুশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দু ভাগ। কৃষিকাজ করার কোন অধিকার তাদের ছিল না এবং সরকারী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তারা বসবাস করতে পারত না। সামান্য দু'এক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলেও তাতে কড়াকাড়ির অন্ত ছিল না। সাধারণ ব্যবসা এবং কুটিরশিল্পই ছিল তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। শ্বেত রুশিয়া ও পশ্চিম যুক্রেনের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাদের বসবাস করতে হত। কিন্তু সোভিয়েট আমলে তাদের সেই দুর্দশা ঘুচেছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত জাতিই সমান; কাজেই ইহুদীদের জন্য সৃষ্ট সেই কৃত্রিম গণ্ডীরেখা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়। ইহুদীরা যাতে কৃষিকাজে সুযোগ পায় তার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে নানাভাবে তাদের সাহায্য করা হয়। পশ্চিম রুশিয়ার যে সকল ইহুদী একদিন দর্জি, মুচির কাজ করে অতি দরিদ্র জীবন যাপন করত, আজ তারা সমবায় কৃষিক্ষেত্রে এক একজন সুখী কৃষক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিসাবেই দেখা যায়, যুক্রেন এবং ক্রিমিয়ায় দুই লক্ষাধিক ইহুদী

কৃষিকাজে যোগ দিয়েছে। বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা তাদের স্থানও পরিবর্তন করেছে। উর্বর অথচ একরূপ অনাবাদি জমি তাদের কৃষিকাজের জন্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বদিকে আমুরের শাখা নদী বিজান ও বীরার তীরে ইহুদীদের এক নতুন উপনিবেশ
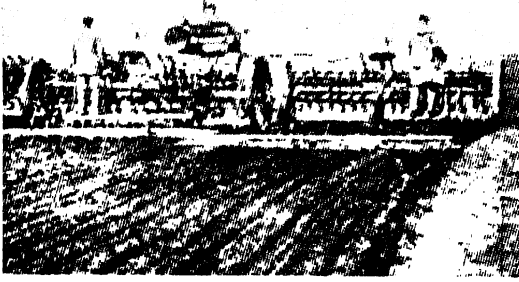
সোভিয়েট কৃষকরা ট্রাক্‌টর দিয়ে জমি চাষ করছে।

গড়ে উঠেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে একজন ইহুদীরও বাস ছিল কিনা সন্দেহ। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক প্রচেষ্টা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে ৭ হাজার ইহুদী গিয়ে বসত স্থাপন করে। তারা সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজে লেগে যায়। তারপর সেই উপনিবেশে ধীরে ধীরে বিদ্যুতের কারখানা, কাপড়ের কল, ইমারতী মালমসলা প্রস্তুতের কারখানা, কাঠের আসবাবপত্রের কারখানা, করাত কল প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ইহুদীদের বিদ্যালয় ও শিল্প শিক্ষালয় খোলা হয়। ক্রমশ সেখানে ইহুদী পত্রিকা বেরয় এবং ইহুদীরা তাদের থিয়েটার খোলে। দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশকে স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত ইহুদী প্রদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। জার্মানীতে নাৎসীরা যে ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত আচরণ করেছে এবং যে ইহুদী সমস্যা নিয়ে জগতের বিভিন্ন দেশ বিব্রত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই ইহুদী সমস্যার এভাবে সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে। ইহুদীদের এরূপ ভৌগোলিক সংগঠন ইতিপূর্বে জগতে আর কোথাও হয়নি।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র শহর ও গ্রামের পার্থক্য ঘুচাতে চায়। তার অর্থ এ নয় যে, সেখানে শহরগুলি সব তুলে দেওয়া হবে। গ্রাম্য অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুললে আপনা থেকেই সেখানে ছোট ছোট শহরের পত্তন হবে এবং তার ফলে গ্রাম্য জীবনেও শহরের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার আঁচ লাগবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার এ চেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছে। সেখানে বহু কৃষিজীবী শিল্পজীবী হয়ে উঠেছে এবং গ্রামগুলির রূপান্তর ঘটেছে। নতুন নতুন শহরের পত্তন হওয়ায় প্রাচীন শহর ও গ্রামে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল তা লোপ পেতে চলেছে। আগের তুলনায় শহরবাসীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়ই শহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ১৮ থেকে বেড়ে ২৪শে গিয়ে দাঁড়ায়। রুশ বিপ্লবের পর সমগ্র দেশে বাসগৃহের সংখ্যা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বেড়ে যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছ'বছরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পহীন শহরগুলিতে লোকসংখ্যা শতকরা মাত্র ১২ জন বাড়ে; আর শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে বাড়ে শতকরা প্রায় ৪৫ জন। নতুন কারখানাঞ্চলে লোকবৃদ্ধির অনুপাত আরও বেশী। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্রগুলির উন্নতির দিকে অধিক নজর দেওয়া হয়। সেজন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় একরূপ নিয়মেই দাঁড়িয়ে যায় যে, মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে আর কোন বড় কারখানা স্থাপিত হবে না।

কেবল শিল্প নয়, কৃষি অবলম্বন করেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শহর গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষির যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করতে হয়েছে। কেবল কারখানা নয়, জমির উর্বরতা, বীজ ও ফসল পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে সব স্থানে কৃষি গবেষণাগারও স্থাপিত হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট শহর। তা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপ্রচেষ্টা আজ তার পল্লী অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত এবং সেখানেই তার প্রাণশক্তি নিহিত।
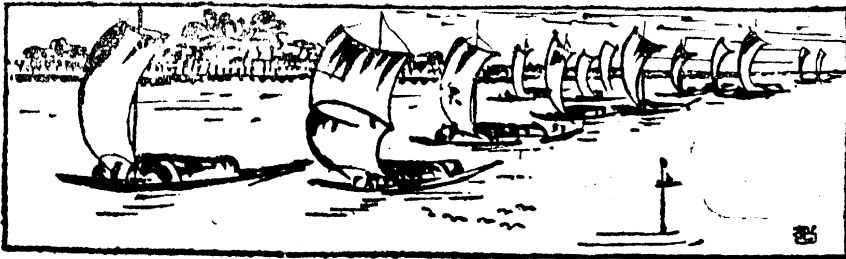
৬

ভাঙ্গা চূণবালি খসা, কড়ি ঝুলে পড়া পড়ো ঘরখানাকেই বাঁশের খুঁটো এবং আরো তার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানে জোড়া-তাড়ায় কোনও রকমে সাজিয়ে গুছিয়ে শৈলজা তার দরজায় এক প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড মেরে দিলে দেখে বনবিহারী খানিকক্ষণ নির্বাকে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হাতের হুঁকোয় পর পর গোটা কতক টান দিয়ে বললে ঃ—

"কি জানো তরঙ্গ, আদেখলার হলো ঝারি, জল খেয়ে খেয়ে আর না পারি ; ভাগ্যে মামাটা মলো অসময়ে,—তাই তার খুদ কুঁড়ো যা কিছু দু'দশ পয়সা জমানো ছিল, তাই নিয়ে এত ফুটুনী ; কেমন করে যে পেটের ভাতের সংস্থান করতে হয়, তা জানেন না, কিন্তু কেমন করে যে কাপ্তেন বাবুগিরী করতে হয়, সেটুকুর জ্ঞান খুব আছে। কিন্তু ঐ ত্রৈলক্যর ছেলে যদি আমার হাতে পড়তো, তাহলে দেখতো সকলে, বুঝতো আমি বাঁদর তৈরী করিনি, মানুষ গড়িয়েছি ; মানুষের মত মানুষ, যে মানুষ দুঃখে পড়ুক, কষ্টে পড়ুক, কোনও বাধাই তাকে আটকে রাখতে পারবে না, সে বুঝতো পয়সাই যখন জগতের সবচেয়ে দরকারী, তখন পয়সা উপার্জ্জনই সব শিক্ষা আর সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য।

তরঙ্গ বারান্দার একটা সীমায় বসে কচুর শাক কুটছিল বেছে বেছে, বনবিহারীর কথার কোনও জবাব দিলে না, নির্বাকে, নত মুখে হাতের কাজ ক'রে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে।

বনবিহারী হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ; এক সময়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে বসলো ঃ—

"কি, উত্তর দিলে না যে বড় !"

"উত্তর ? কিন্তু—কি উত্তর দেব ?"

"কেন, যা তোমার ইচ্ছে।"

তরঙ্গ মুখ টিপে একটু হাসি চাপা দিল ; বললে ঃ—

"দেখ চক্কোত্তি মশায়, সংসারে এমনও এক একজন মানুষ আছে, যাদের বকতে না পেলে পেট ফাঁপে।"

"তোমার ডাক্তারীতে বলে বুঝি ?"

তরঙ্গ একথার জবাব না দিয়ে বললে ঃ—

"কারো কোনও ত্রুটি দেখলে, সেইটাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতেই হয় এই মানুষগুলোর আনন্দ, উৎসাহও অপরিসীম ; তাদের কথায় কথা কওয়া মানে জলকে উঁচুতো উঁচু, আর নিচুতো নিচু বলেই নির্বিচারে মেনে নেওয়া ; আমার ও ভালো লাগে না।"

বনবিহারী এবার সচকিতে মুখ তুলে তাকালো তরঙ্গর দিকে, কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে বসায় সে মুখের অল্প একটু অংশ ছাড়া, আর কিছুই সে দেখতে পেল না, বুঝতেও পারলো না, এটা তরঙ্গর ঠিক আন্তরিক কথা না ব্যঙ্গোক্তি।

কিন্তু দুটোর মধ্যে যে ভাবটা নিয়েই হোক, তার এ উক্তিতে বনবিহারী আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলো না, বরঞ্চ মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব ক'রে উঠে দাঁড়ালো চৌকী ছেড়ে।

মুখ ফিরিয়ে তরঙ্গ প্রশ্ন করলো ঃ—

"উঠলে যে ?"

"আমার ও সব ঠাট্টা মস্করা শুনবার সময় নেই।"

অভিমানাহত স্বরে কথাটা ব'লে বনবিহারী চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। বাধা দিল তরঙ্গ ঃ—

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি ?"

"যেখানে খুশী।"

এতক্ষণের চাপা হাসিতে তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো ; হাসির তোড়ে নুইয়ে পড়ে সে ডাকলো ঃ—

"চক্কোত্তি মশায়, ও চক্কোত্তি মশায়"

বনবিহারী তার দিকে ফিরলো না ; কিন্তু চলতে চলতে চলা থামিয়ে তিক্ত স্বরে ব'লে উঠলো ঃ—

"বল কি ব'লতে চাও !"

"বলবো আর কি ; বলছি তুমি তোমার বিষয়কর্ম্ম নিজে না চালিয়ে আমার ওপোর ভার দিলেই পারো, দুগুণ লাভ করিয়ে দেব তোমার।"

"কেন ?"

বনবিহারী ফিরে দাঁড়ালো ঃ—

"একথা কেন ?"

"বলেছি তো, দুগুণ লাভ করিয়ে দেব।"

"এই বুদ্ধিতেই যা রোজগার করেছি, তাতেই আমার মত দশটা জীবন সচ্ছন্দে কেটে যেতে পারে ; এর বেশী ক'রতে গেলে ভগবান সইবে না।"

তরঙ্গ চমকে উঠলো যেন ঃ—

"তুমি ভগবান মানো চক্কোত্তি মশায়—"

বনবিহারী হাসলো ; উদারতার হাসি ঃ—

"তা আর মানিনে ? হিন্দুর ছেলে, জাতে ব্রাহ্মণ ; 'দেব আর দ্বিজ' কথাটা যখন পাশাপাশি জায়গা অধিকার ক'রেছে তখন এত নিকট-সান্নিধ্যেও ভগবান মানব না ? এত বড় মহাপাতক করা আমার দ্বারায় সম্ভব ব'লে তুমি মনে করো নাকি তরঙ্গ ?"

বনবিহারী আবার ঘুরে এসে ব'সলো নিজের পরিত্যক্ত

আসনে; উত্তরের আশায় আগ্রহ আকুল দৃষ্টি স্থাপন ক'রে দেখলে তরঙ্গ যেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল; মুখের হাসিটা যেন জোর ক'রেই আঁকড়ে ধরে বললেঃ—

"আমার কথা বাদ দাও,—আমার আবার মনে করার দাম? লোকে শুনলে হাসবে।"

"লোকে অমন হাসে কাঁদে অনেক কথাতেই, তবে সেইটাকেই মুখ্য বলে মেনে নিতে হ'বে নাকি সব কাজের মধ্যেই—"

তরঙ্গ জবাব দিল না একথার। বনবিহারী প্রশ্ন করলেঃ—

"লোকের কথা বাতিল করো তরঙ্গ;—তুমি নিজের চোখেই তো আমাকে দেখছো একযুগের বেশী বই কম নয়,—তুমিই বল,—ভগবান না মেনে অধর্মের কাজ আমি কোন্‌টা করেছি তোমার সামনে,—বল।"

সকৌতুক দৃষ্টি তরঙ্গ মেলে ধরলো বনবিহারীর মুখের ওপোরঃ—

"গো"-শব্দটাও কিন্তু "ব্রাহ্মণ" শব্দটার আগে লোকে যোগ ক'রে থাকে সময় সময়; তাই বলছি—জীব-জীবনের মধ্যে নির্বিরোধীত্বের দোহাই পেড়ে গো-বুদ্ধির পরিচয়ও যে তুমি দান করোনি কোথাও এটা আমি কিন্তু অস্বীকার ক'রতে পারবো না চক্কোত্তি মশায়,—তাতে তুমি আমায় যাই ভাবো, আর বোঝ না কেন,—আমি নাচার।"

বনবিহারী নির্বাকে শুধু একটা "হুম্‌ শব্দ ক'রলে মাত্র; তারপরে মুখখানা নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগলো; যখন মুখ তুললে, তখন তরঙ্গর কুট্‌নো কোটা হ'য়ে গেছে। আনাজের ঝুড়ি চুপ্‌ড়িগুলো গুছিয়ে যথাস্থানে রাখতে রাখতে প্রশ্ন করলেঃ—

"কি ভাবছো?—"

"কিছু না—।"

তরঙ্গ একটু হাসলোঃ—

"একটু আগেই তুমি ব'লছিলে তোমাকে নাকি আমি দেখছি দীর্ঘ এক যুগ ধরে; যদি তাহাই হয়, তাহলে সেই একযুগ দেখার অভিজ্ঞতা এইটুকু আমার জন্মেছে যে, তুমি মুখে যখন বল এক, কাজে তখন করো আর একখানা। এও যে তারই পূর্বাভাস নয়, তা কি ক'রে বুঝবো?—

আহত স্বরে বনবিহারী উত্তর দিলেঃ—

"না বুঝে থাকো, জোর ক'রে বোঝাতে আমি চাইনে তরঙ্গ, সে অভ্যাস আমার নেই, তুমি তো জানো!"

তরঙ্গ এসে সামনে দাঁড়ালো।

স্নানের পরে ভিজে চুলগুলো ওর নিটোল বাহু আর কাঁধে লুটোচ্ছে; সরু কালাপাড় মটকার শাড়ীখানা বেষ্টন ক'রে রয়েছে ওর সমস্ত দেহকে।......

স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে সে যেন ভাদ্রের একটি পরিপূর্ণ তটিনী; যেদিক দিয়েই সে ব'য়ে চলুক, সকলকেই ক'রে তুলেছে সৌন্দর্যময়,—শোভন।......

বনবিহারী মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে তরঙ্গর অধরোষ্ঠ যেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে একটু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠলো;—শ্লেষের হাসি হেসে ব'ললে'—

"জানি সব, বুঝিও সমস্তই,—কিন্তু বুঝেও যে কোনও উপায় করতে পারিনে কেন—সে কথা তোমায় বলে বোঝাতে চাইনে চক্কোত্তি মশায়।...তবে যদি কোনওদিন সময় আসে তখন এমনিই জানতে পারবে, ডেকে শুনতে হবে না।"

সদর্প পদক্ষেপে সে আঁচলের চাবী বাঁধতে বাঁধতে ভাঁড়ারের দিকে চ'লে গেল, তাকে ফিরে ডাকবার মত সাহস বনবিহারীর হলো না।...

ধীরে ধীরে বেলা কেটে চ'ললো দিনান্তের অন্ধকারের তলে; সন্ধ্যাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের সঙ্গে ভেসে উঠলো এতটুকু একফালি চাঁদ।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শঙ্খনিনাদে সন্ধ্যার আগমন-বার্তা ঘোষণা ক'রে তরঙ্গ যখন ফিরে দাঁড়ালো, দেখলো সমস্ত দিনের রোগী দেখার পরে শৈলজা তখন বাড়ি ফিরছে সাইকেলটাকে টানতে টানতে।......

ওর সমস্ত মুখে চোখে একটা দারুণ ক্লান্তির ছায়া।

একেবারে সামনা-সামনি দেখা হ'তে তরঙ্গ প্রশ্ন করলেঃ—

"কোথায় গিয়েছিলে শৈলজা, আজ এত দেরী হ'লো যে বাড়ি ফিরতে?"

স্মিতহাস্যে শৈলজা জবাব দিলেঃ—

"সে অনেক দূরে,—প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ তফাতে—একটা কলেরা রোগী দেখতে—।"

"কলেরা রোগী?—"

তরঙ্গ প্রায় আঁৎকে উঠলো; কিন্তু সেদিকে শৈলজার দৃষ্টি ছিল না, সাইকেলখানা উঁচু ক'রে পৈঠে ডিঙিয়ে,—বারান্দায় তুলতে তুলতে ব'ললেঃ—

"রোগীটার অবস্থা খুব ভালো নয়, তাই বসেছিলাম একটা ইনজেক্‌সান দিয়ে।"

একটুখানি থেমে, সাইকেলটা ঠিকভাবে রাখা হ'য়েছে কি না পরীক্ষা ক'রে যেন নিজের মনেই ব'লে চ'ললোঃ—

"কিন্তু মানুষে যে মানুষের ওপোর কি রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রতে পারে, ঐ মেয়েটাই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। নইলে অসুখ হয় সবারই, তাই ব'লে তাকে ঘর থেকে বার ক'রে পথের পাশে......"

হঠাৎ মুখ তুলে তরঙ্গর দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে থেমে গেল, যেন কতকটা লজ্জা আর কতকটা কুণ্ঠায় মিশিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে।

তরঙ্গ প্রশ্ন ক'রলোঃ—

"মেয়েটি খুব গরীব বুঝি? কেউ নেই নিজের?..."

শৈলজা ব'ললেঃ—

"জানিনে ঠিক, হয়তো নেই,—কিম্বা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন আপন লোকও পর হ'য়ে যায়—সময় বুঝে।"

একটু থেমে অনেকটা উদাস স্বরে ব'ললেঃ—

"কিন্তু আশ্চর্য এই, যে মানুষে প্রথম জীবনে হয়তো কত

উ'চু আশা করে, কত উদার থাকে,—কত স্বার্থও বলি দেয় হাসতে হাসতে, কিন্তু তারপরে আর তার চিহ্নও থাকে না তার জীবনে; এর জাজ্বল্যমান সাক্ষী আমিও। আমারও কত আশা ছিল এই সব পরোপকার করবার, অনাথকে আশ্রয় দেবার, আর্তকে সাহায্য করবার; কিন্তু আজ মনে হয় সে সব স্বপ্ন, স্বপ্ন রচনা করেছিলাম মনে মনে, আবার মিলিয়েও গেছে তাই মনের বাইরে এসে।"

এত দুঃখেও তরঙ্গর হাসি এলো; ব'ললেঃ—

"যা গেছে তার জন্যে ভেবে ফল নেই,—যা আছে, তার ভাবনা ভাবলেই ঢের হবে এখন।"

শৈলজার তবু কোথায় যেন একটা চিন্তা খচ্ খচ্ করে বি'ধছিলঃ—

"কিন্তু—"

তরঙ্গ বুঝলো সে কিছু বলতে চায়; হয়তো হয়তো ঐ মেয়েটারই সম্বন্ধে, কিম্বা আর কিছু। জিজ্ঞাসা ক'রলেঃ—

"কিন্তু, কি—? বল।"

"কিছু নয়,—মানে..."

কি একটা কথা মনে ক'রবার বৃথা চেষ্টায় শৈলজা যেন বিশৃঙ্খল চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে লাগলো বারম্বার।

ক্ষণিকের জন্যে এই সময় তরঙ্গর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে হেসে ফেললে ফিস্ করে,—তারপরে আঁচলে মুখখানা বারম্বার ঘাম মুছবার ছলে বারম্বার ঘসে আরক্তিম করে তুললে অহেতুক। শৈলজা সচকিত হয়ে উঠলো।

বুঝলো—এতটা ভাবোচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠা তার পক্ষে কোনও মতেই ঠিক হয়নি।

তরঙ্গর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে দ্রুতপদে গিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলো...

কিছুক্ষণ পরে একখানা রেকাবীতে কিছু কাটা ফল, মিষ্টি আর এক হাতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে তরঙ্গ এসে ঘরে ঢুকলো; শৈলজা তখন বিছানার ওপোরে শ্রান্ত দেহখানা এলিয়ে দিয়েছে।

তরঙ্গ সাড়া পেয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালে মাত্র, কোনও কথা বললে না।

পাশে সরানো টুলখানা এক হাতে তার সামনে টেনে এনে অন্য হাতের খাবার সমেত রেকাবী আর জলের গ্লাসটা ওর ওপোরে নামিয়ে রেখে তরঙ্গ যেন কতকটা আগ্রহে নিয়েই বসে পড়লো মেঝের ওপোর। অনুযোগের স্বরে প্রশ্ন করলো—

"আমার ওপোরে রাগ করলে শৈল?"

শৈলজা সচকিত হয়ে উঠলো; তারপর আহার্যগুলো একটার পর একটা ভালোমন্দ মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করলেঃ—

"রাগ? তোমার ওপোরে? কেন?......

তরঙ্গ বললে—

"উকে তখন—সেই হেসে ফেলেছিলাম বলে!"

শৈলজা এবার সত্যই হেসে উঠলো উচ্ছ্বসিত হয়েঃ—

"তুমি দেখছি আমার চেয়েও পাগল। হাসলে কেউ কখনও কারো ওপোরে রাগ করে নাকি? ভারী অদ্ভুত তো!"

তরঙ্গ কথা বললে না, নির্বাকে নতনেত্রে বসে রইল কোলের ওপোর হাত দুখানা জড়ো করে,—

আজ যেন সে শৈলজার কাছে নিজের কাজের জন্য যে জবাবদিহি করতে এসেছে, সে উত্তর ফুটে উঠেছে তার ঐ নিবেদনের নত ভঙ্গিতে। ক্রমশ

সীতার বনবাস

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিল চন্দ্র। লোলচর্মসার দেহের স্থানে স্থানে কুঞ্চন রেখা। শুভ্র ভ্রূর নীচে ধারহীন দৃষ্টি: কহিল, "যোগিনীর মত এ-বেশ কেন তোমার মা! তপস্যা করছ কার।"

মেয়েটির নাম সীতা। নবীন দাসের অবিবাহিতা মেয়ে। কৃশাঙ্গী ছন্দময়ী তাহার দেহ। ঈষৎ কালো রং। মাথায় ঘন কালো কুন্তলভার। কিন্তু কাজের চাপে কোনদিন প্রসাধন করিতে পারে নাই সে।

হাসিয়া কহিল,—'শিবের।'

—'শিবের জন্য এ তপস্যা আমার কাছে ভাল লাগে না। তেল কি ফুরিয়ে গেছে।'

—'না।'

—'মিছে কথা তুমি বলছো। আমি পারি যেতে ঐ গোলক-বাজারে। অত শক্তি নেই মা। নদীয়া তোমাকে কিছু এনে দেয় না।'

সীতার মুখ আরক্তিম হইয়া গেল, নতমুখে কহিল,—'কি বলছেন আপনি।'

চন্দ্র এ-কথার কোন জবাব দিল না, সে কহিল,—'একি অন্যায় মা। আমি ওকে বলেছি, তোমার কি লাগে না লাগে একটু দেখতে। এ-খেয়াল ও এখন হয়নি কি করে যে সংসার করবে!'

—'আপনি চুপ করুন কাকা। আমার ভাল লাগে না একথা শুনতে। এই আমি চলে যাচ্ছি!' লজ্জার ছোঁয়াচে ঘন পল্লবময়ী চোখ আরো কৌতুকময়ী হইয়া উঠিল সীতার। সত্যই সে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ চন্দ্র প্রসন্নদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিল। আত্মিক সুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাহার লোল মুখ। মৃদুস্বরে কহিল,—'পাগলী।'

বিশ মাইল দূরে গোলকপুর বাজার। বাজার বড় নয়, তবু এর নাম আছে এদিকে। তরি-তরকারি বিক্রি হয় রোজ, আর আসে কয়েক ঝাঁপি মাছ। বাজারের নীচেই খরস্রোতা ধেনুগাং। বাজারকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরিয়া আকুলপ্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। পার ঘেঁসিয়া কয়েক সার ঢেউটিনের ঘর। ইহাদের মালিকেরাই এখানকার বড় মহাজন। সন্ধ্যায় টিম-টিম তেলের প্রদীপের সামনে বসিয়া হিসাব মিলায়, দুপুরে পাটি বিছাইয়া তাস খেলে।

এই বাজারের কাছ দিয়াই বিশগাঁও যাইবার রাস্তা। গোলকপুর হইতে গাংপার ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রায় একদিন লাগে বিশগাঁও পৌঁছিতে। খুব সকাল রওনা হইলে সন্ধ্যা হয়-হয় সময় সেখানে পৌঁছান যায়। নৌকায় ধেনুগাং-এর স্রোত উজান ঠেলিয়া বাঁকবহুল রাস্তায় দুই-তিন দিন লাগিয়া যায়। যারা সবল, তারা হাঁটিয়াই রওনা হয়। কোমরে কাপড় জড়াইয়া নেয়, গামছায় চিড়া আর গুড় বাঁধিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়ে। পানতলির বরুণ গাছের নীচে একবার বসিয়া জিরায়, বিড়ি খায়। তারপর গ্রামের মুখে দুই-তিন মাইল দূরে পাওয়া যায় বিয়ানহাটার কাচারী বাড়ি!

বিশগাঁয়ে কেবল কৃষকদের বাস। মাটি চষিয়া ধান ফলায়। গ্রামকে দুইভাগে চিড়িয়া একটি খাল বড়নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার পারেই বিয়ানহাটার কাচারী। বর্ষাকালে কথা নাই,—খাল ফাঁপিয়া উঠে। দুই পার ছাপাইয়া জল বিস্তৃত হইয়া পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। পাল তুলিয়া বড় বড় নৌকা চলাচল তখন করে। হেমন্তে স্রোতধারা ক্ষীণ হইয়া আসে। গ্রীষ্মকালে খালের বুকে এক হাঁটু ঘোলাটে জল প্রখর সূর্যের তাপে ঝিমাইতে থাকে। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা অতি কষ্টে, কোথাও বা মাটির উপর দিয়া টানিয়া তবে নেওয়া যায়। মাঝে মাঝে কচুরীপানা আটকা পড়ে। দারুণ গরমে হাঁফাইয়া গরুর পাল পাঁকময় জলে নামিয়া খাইতে থাকে।

খালের পারেই বিশগাঁয়ের আধমাইল পূবে একটা ছোটমোট বাজার জমিয়া উঠিয়াছে। দেশবিদেশের ব্যাপারীরা নৌকা লাগাইয়া ধান কিনে। কাচের রকমারী বাসন, রঙীন চুড়ী, সওদাগরের সামান নিয়া ফেরিনৌকা আসে মাঝে মাঝে। তখন গ্রামের মেয়েরা পাগল হইয়া যায়। যাদের বিয়া হয় নাই, ছোট ভাইকে লোভ দেখাইয়া ধান দিয়া পাঠায়। আর গ্রামের বৌএরা শরণ নেয় আপন না হয় পাড়াপড়সী ঠাকুরপোর! একাগ্র উগ্র অপেক্ষায় থাকে তারা। রঙীন চুড়ী তাদের চাই-ই!

নদীয়া গিয়াছিল গোলকপুরের বাজারে। পথ অনেকখানি। কিন্তু সে চিন্তা তাহার নাই। এক মধুর কল্পনায় মেদুর তাহার যৌবন তেজরঞ্জিত মন!

সীতার সহিত দেখা হইয়াছিল কাল সন্ধ্যায়। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সীতা বলিয়াছিল,—"তোমার সাথে আমার ঝগড়া করতে হবে নদীয়াদা।" নদীয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল,—"কেন।"

—"কেন! এই দেখ।" বলিয়া সীতা তাহার রুক্ষ চুল খুলিয়া দেখাইল।—"কাকা বলেছে, আমি নাকি যোগিনী সেজেছি।" বলিয়া সীতা ফিক করিয়া হাসিল।

নদীয়াও হাসিয়া কহিল,—"মন্দ কি।"

—"ইস্। এ বুঝি খুব ভাল। কালই তোমাকে যেতে হবে গোলকপুর বাজারে—বুঝলে।"

পায়ে হাটার পথে স্বপ্নের জাল বুনন আরম্ভ হইয়াছে নদীয়ার মনে। অতীত নাই, বর্তমান নাই, আছে শুধু অনন্ত প্রসারী আনন্দময় এক ভবিষ্যৎ। নদীয়া আর সীতা!

কিন্তু খাল যেখানে নদীতে মিশিয়াছে, সেখানে আসিয়া তাহার ভাব নেশা কাটিয়া গেল।

জমিদারবাবুর কাছ হইতে ইজারা নিয়া খালের মুখ হইতে আধমাইল দূরে মধুসূদন কৈবর্ত এক প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়াছে। বাঁধ পার হইয়া জল আর ওদিকে যাইতে পারে না,

দুই পাশের জমিতে গিয়া জমা হইতেছে। বিপুল জলরাশি জমা হইয়া এক বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। নদীর মাছ খাল দিয়া বিলে আসিয়া পড়ে।

বিশগাঁয়ের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বাজার ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু জলের অভাবে বোরো ধানের অনিষ্টের আশঙ্কায় তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল বেশী।

হরীশ কহিল,—"আমরা কি মরবো।"

ধর্ম নমঃসুত কহিল,—"খালও যে মরে গেছে এর মধ্যে।"

চন্দ্র বয়সে প্রাচীন। মাথার চুল সাদা ধবধবে। শরীর প্রায় অথর্ব। উত্তেজনায় শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, নির্বাক হইয়া যায়। স্তব্ধ রহিয়া কহিল,—"হুঁ।" কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। উত্তেজিতভাবে কহিল,—"বিশগাঁয়ের বৌএরা কি বিধবা হয়েছে—লাঠির কি হয়েছে। সব কুত্তার পাল! সব কুত্তার পাল!!"

একটু থামিয়া বলিল,—"নদীয়া! নদীয়া!"

—"আজ্ঞে!"

—"পারবি না তুই যেতে।"

—"কোথায়।"

—"যাবো একবার জমিদারের কাছে। দেখি কি বলেন তিনি। তারপর দেখাবো চন্দ্র মরেছে না এখনও বেঁচে আছে।" বৃদ্ধের লোল ম্লান চোখ আবার সতেজ হইয়া উঠিল বহুদিন পরে।

জমিদারবাবুর সদরের কাচারীতে বিশগাঁও-এর প্রজারা আসিয়া জড়ো হইল। কিন্তু বৃথা। জমিদারবাবুর বয়স বেশী নয়—দুই তিন বৎসর হইল বিরাট জমিদারীর মালিক হইয়াছেন। তাঁহার পরিপূর্ণ দৃষ্টির প্রচ্ছদপটে আঁকা দৃঢ়তার, অটল প্রতিজ্ঞার কাছে বিশগাঁয়ের আশু দুঃখ, কষ্টের কোনই আবর্ত সৃষ্টি করিতে পারিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিল, বিদ্বেষময় উত্তেজিত আলোচনায় বিষাইয়া উঠিল তাহাদের মন। নিঃসহায় তাহারা, মূক তাহারা, আশা ভঙ্গের ক্ষেভে ক্ষেপিয়া উঠিল বেশী। এই বিদ্বেষের আগুন ধুয়াইতে ধুয়াইতে একদিন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহার বিবরণ এইঃ—

আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই বিশগাঁয়ের প্রজাদের অবসর থাকে। বোরো ধানের হাঙ্গামা বৈশাখের মাঝামাঝি চুকিয়া এটা-সেটা কাজে জ্যৈষ্ঠ মাসও শেষ হয়। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ হয় একটানা অবসর। বুড়োরা বসিয়া গল্পগুজব করে, কীর্তন গায়। আর যুবার দল টেরী কাটে, গন্ধতেল দেয়, প্রসাধন করিয়া বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়।

তখন গ্রামে দেখা দেয় জমিদারের পেয়াদা। খাজনার তাগিদ দেয়। তারপর আসেন তহশীলদার। নৌকা ভাসাইয়া খাজনা আদায় করে। বিয়ানহাটার কাচারী তখন প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। লোক আসে যায়—তাদের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে সেদিক।

ভুবন পেয়াদা আসে প্রতি সন। গ্রামের সকলেই তাহাকে চিনে। কাঁধে বোঁচকা ফেলিয়া ভুবন যখন গ্রামে প্রবেশ করে, ছেলের দল বলাবলি করে,—"ভুবন পেয়াদা এসেছে।" বুড়োরা তাহাকে ডাকিয়া বলে,—"ভুবনদা, তামাক খেয়ে যাও।"

এবার ভুবনের সাথে আসিল এক ছোকরা-পেয়াদা। বেলা তখন দুপুর। মেয়েরা দাপাদাপি করিয়া স্নান করিতেছে। স্তব্ধ জল তরঙ্গায়িত হইয়া পাড়ে লাগিতেছে।

ভুবন কহিল,—"কি গো তালুকদারের ঝি! খুব যে স্নান করছো, আমাদের পাক করে রেখেছ কি।"

মেয়েটির নাম দুর্গা। সেই ছোট বয়স হইতেই ভুবনকে সে দেখিতেছে, এই জন্য চৌদ্দ বৎসর বয়সে পড়িয়াও তাহাকে লজ্জা করে না। হাসি-ঠাট্টা করে।

কহিল,—"ইস্, আমার ভারি ঠেকা!"

—"ঠেকা নয় ত কি। দেখ না কাকে সাথে নিয়ে এসেছি।"

—"কে আবার।"

—"তোমার বর!"

দুর্গা একবার মাথা ফিরাইয়া দেখিল। লজ্জায় লাল হইয়া কহিল,—"যাঃ!"

ভুবন হাসিয়া কহিল,—"কি গো রূপবতী, পছন্দ হয়েছে।"

দুর্গা কহিল,—"দূর বেটা।"

দুর্গার ফুটি-ফুটি যৌবন জলসিক্ত দেহ সৌষ্ঠব ছোকরা পেয়াদার মাথায় নেশা লাগাইয়া দিল। সেই দিন অবশ্য একবার আড়চোখে চাহিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিন হইতে দেখা গেল ছোকরা পেয়াদা সেদিকে ঘুরাঘুরি করিতেছে। দুর্গা স্নান করিতে নামিলেই নৌকা ভাসাইয়া অনর্থক কাছ দিয়া যাতায়াত করে। চোখ টিপিয়া হাসে, গুণ গুণ করিয়া গান গায়।

একথা আর চাপা রহিল না। বিশগাঁয়ের লোক আগুন হইয়া উঠিল।

শিব সরকার কহিল—"দে হারামজাদার মাথা দুফাঁক করে। জমিদারের পেয়াদা না নবাব পুত্তুর!"

সেদিন রাত্রে ছোকরা পেয়াদাকে আর কাচারীতে পাওয়া গেল না। পরদিন দেখা গেল, কাচারীর অদূরে এক গাছের নীচে রক্তাক্ত দেহে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ভুবনের মুস্কিল হইল। সকলে তাহাকে বলিল, জমিদারের খাজনা তাহারা দিবে না।

চন্দ্র কহিল,—"বাবুকে বলবে, খালের বাঁধ না কাটলে কেউ যেন খাজনার জন্য এখানে না আসে।"

ভুবন চলিয়া গেল। ছোকরা পেয়াদাও গেল। বাবুর কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, কেমন করিয়া তাহাকে মারধর করিয়াছে।

—"কোন দোহাই মানে না বাবু। বড় বদমাইস ব্যাটারা। রুখিয়া বলে, বাবু তোর বাপ নাকি!"

ইতিমধ্যে একটা লোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত। একটু সুস্থ হইয়া নিবেদন করিল, মধুসূদন কৈবর্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। গত রাত্রে একদল লোক জোর

করিয়া খালের বাঁধ কাটিয়া দিয়াছে। বাধা দিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। সংখ্যায় তাহারা ছিল বেশী, লাঠি ও বর্শা লইয়া ছিল তাহারা সজ্জিত।

জমিদারবাবুর চোখ তীব্র হইয়া উঠিল। বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

—"বিশ্বাস মশায়, ইয়াকুবকে খবর দিন। দেখি বিশগাঁয়ের প্রজার কত তেজ হয়েছে।"

বিশ্বাস মশায় বাপের আমল হইতে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেছেন। প্রথমে মুহুরী ছিল, ক্রমে নায়েব হইয়াছেন।

আস্তে আস্তে কহিলেন,—"বাবু।"

—"আমি কোন কথা শুনবো না। বিশগাঁয়ের এই শয়তানির উচিত শাস্তি আমি দিব-ই। নৌকা সাজাতে বলুন, আমি নিজে যাব।" বিশ্বাস বিচলিত হইলেন না। সংযতভাবে বলিলেন,—"যদি আজ্ঞা করেন বাবু শাস্তির বিধান আমি-ই করি।"

জমিদারবাবু কহিলেন,—"আপনি নিজে যাবেন?"

বিশ্বাস বিনয়ের সহিত বললেন,—"যদি বাবুর আজ্ঞা হয়, তবে আমি সব করতে পারি। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন, একগাছা চুলও কাঁচা নেই। বাপদাদার আশীর্বাদে এখানে-ই সব সাদা হয়েছে। জমিদারীর এক ইঞ্চি জায়গাও আমার অচেনা নেই। সব লোকের রগও আমি জানি। তবে বাবু একটা কথা।"

—"বলুন।"

"—কোন লোকজনের দরকার আমার নেই। ভুবনকে নিয়ে বিয়ানহাটায় কিছুদিন থাকবো। আপনাদের আশীর্বাদে দেখবেন, ওদের শিরদাঁড়া আমি জন্মের মত ভেঙ্গে দিয়েছি-ভবিষ্যতে আর কোন দিন গোলমাল হবে না।"

জমিদারবাবু একটু চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"মধুসূদন যে জমির ইজারা নিয়েছে, এর কি হবে।"

বিশ্বাস মশায় হাসিয়া বলিলেন,—"সব হবে বাবু। সব বন্দোবস্ত আমি করবো। সাপ মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না!"

বিশগাঁয়ে উত্তেজনার স্রোত বহিয়া চলিল। কেমন এক উন্মত্ত নেশায় পাইয়াছে তাদের। বাঁধ কাটিয়া নিরস্ত হইল না, ঢোল পিটাইয়া চারিদিকে প্রচার করিল, বাজার আবার মিলিবে। রাত্রে তাহারা ঘুমায় না। মশাল জ্বালাইয়া পাহারা দেয়। সজাগ দৃষ্টিতে তাহারা দেখে, জমিদারের বাড়ি হইতে কেহ আসিতেছে কিনা। কোন নৌকা গ্রামের ভিতর দিয়া গেলে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কে যায়।" আবার কখনও বা নৌকার ভিতর উঁকি মারিয়া মানুষ দেখিয়া নেয়—কে আছে। উত্তেজনায় তাহারা হইয়া গিয়াছে বাঘের মত হিংস্র। গ্রামের প্রতি এক অদ্ভুত মায়ার আবেগে তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে বেহিসাবী দুর্জয় সাহস। সরল আর তাহারা নাই, শান্তি আর তাহাদের নাই।

এমন সময় একদিন দেখা গেল, বিয়ানহাটার কাচারীতে তিন চারজন প্রাণী আসিয়াছে। বিশ্বাস মশায় আর ভুবন পেয়াদা। সঙ্গে কোন লাঠিয়াল নাই।

বিশগাঁয়ের লোকেরা অল্পবিস্তর অবাক হইল।

পথে ভুবনের সঙ্গে নদীয়ার দেখা।

নদীয়া কহিল,—"কি ভুবন কাকা, খবর কি?"

একগাল হাসিয়া ভুবন কহিল,—"খবর ভাল। নায়েব নিজে এসেছেন। গ্রামের দশজনকে ডাকতে যাচ্ছি। দেখবে একটা মিটমাট হবেই। সাবাস তোমরা!"

নদীয়া বলিল,—"বাবু কি বলেছে।"

"বলবে কি—জানেন কি—এই লবডঙ্কা। সব নায়েব মশায়ের মুঠোর মধ্যে। কেবল গদিতে বসলেই হয় না।"

—"কিন্তু এই ইজারা বন্ধ না করলে কোন মীমাংসা হবে না, ভুবন কাকা। আমরা ঘরে ঘরে চাঁদা তুলেছি। দরকার হলে খুনখারাপিও করবো। আমরা এখন একেবারে মরিনি।"

ভুবন হাসিয়া বলিল,—"দূর পাগল। একি একটা কথার কথা। —চন্দ্রদা বাড়ি আছে?"

কাচারীতে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল।

বিশ্বাস মশায় বলিলেন,—"আগেই জানতাম তোমরা আসবে। সব কুশল তো। এযে চন্দ্র এদিকে এসো—বুড়োতে বুড়োতে মিলবে ভাল—হাঃ হাঃ! কতদিন একসঙ্গে কাটালাম এক সঙ্গেই বিদায় নিবো। কি বল—হাঃ হাঃ!"

চন্দ্র কহিল,—"আর যেমন রেখেছেন কর্তা! আমরা মুখখু মানুষ, কি বুঝবো। এতদিন ছিলাম মানে মানে—আপনাদের কৃপাও পেয়েছি। কিন্তু এখন—কি যে ভগবানের ইচ্ছা। হরি, হরি!"

তামাক আসিল, পান আসিল; আর বিশগাঁয়ের লোকদের সামনে বসিয়া রহিলেন পক্ককেশ বৃদ্ধ নায়েব। কোঠরাগত অর্ধনিমীলিত মিট-মিটে চোখের পাতার ফাঁক দিয়া সাপের মত ক্রূর দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিলেন জনতাকে। ইহাদের সে জানে, হাসি দিয়া বঞ্চনা করিবার কৌশল দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তাহার আয়ত্ত।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা মনে কিছু রেখো না বাপু। বাবুর আর বয়েস কি। তিনি তোমাদের জানেন না। আমি জানি কার কোথায় ব্যথা। কতদিন আছি তোমাদের সঙ্গে—এই যে চন্দ্র বল না সে কথা—।"

চন্দ্র কহিল,—"আজ্ঞে ঠিক কর্তা।"

—"তবে! আর কেন—হাঙ্গামায় কাজ কি! খালের ইজারা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা বাঁধ না কাটলে আমিই কাটিয়ে দিতাম। যাও বাড়ি, আর কি। এই বুড়ো যতদিন আছে, তোমাদের চিন্তা নেই—মরলে পর অন্য কথা!"

জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল। চাপা আলোচনার শব্দে কাচারীবাড়ি পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নদীয়া কহিল,—"কিন্তু।"

তাহার দিকে চাহিয়া বিশ্বাস মশায় বলিলেন,—"তুমি কার ঘরের?"

চন্দ্র কহিল,—"আমার ছেলে কর্তা।"

"বাঃ বেশ। বাপের বেটা হও। আর শুন......।"

সকলে তাহারা চাহিল।

নায়েব মশায় বলিলেন,—"তোমাদের কথা আমি জানি—বাজারের কথা বলবে ত। তারও এক দিক করে আমি যাবো। কত শ্মশানে বাজার বসালাম, সে তুলনায় এ ত স্বর্গপুরী। কি বল তোমরা।"

—"আজ্ঞা এখন আপনার কৃপা।"

—"সেই জন্যই এখানে এসেছি। নইলে এই বুড়ো বয়সে, আমার হ'ল—কি যে বলে—বাণপ্রস্থের সময়। আমি এখানে থাকবো—বিয়ানহাটার কাচারীবাড়ি নিয়ে আসবো। আর কি—যাও কাল বাজারে একটা কীর্তনের বন্দোবস্ত কর। তোমাদের উপর এই ভার দিলাম—এই যে চন্দ্রের ছেলে—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমিই নাও এর ভার!"

বিশগাঁয়ের লোকেরা খুশি হইয়া ফিরিয়া গেল। অসন্তোষ ধুইয়া মুছিয়া গেল। প্রাচীনের দলেরা গেল বিগত দিনের মৃত জমিদারের নায়েবের কথা বলিতে বলিতে এবং নদীয়া প্রমুখ অল্প বয়সীর দল গেল, কার খোল আছে কা নাই, কে গায় ভাল ইত্যাদি আলোচনায় মত্ত হইয়া।

কিছুদিন পর দেখা গেল সত্যই বাজারের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন কাচারীবাড়ি তৈরি হইয়াছে, দোকানও বসিয়াছে নূতন নূতন। পূর্বদিকটা ভরাট হইয়া বাজার আরো বিস্তৃত হইয়াছে।

বিশ্বাস মশায় সেইখানেই আছেন।

বলিলেন,—"বাজার তৈরি হচ্ছে সুখের বিষয়, কিন্তু এর বিপদও আছে। কত রকমের লোক আছে—তোমরা বরং পাহারার বন্দোবস্ত কর। কি বল নদীয়া।"

নদীয়া বলিল,—"আজ্ঞে সে কথা ঠিক, তবে......।"

বিশ্বাস হাসিয়া বলিলেন,—"কিছু বেতনও দিব, খোরাকও পাবে। এমনি ত বসে আছো, আপত্তি কিসের। এ বাজার হল তোমাদের নিজের—কি বল। আমি কে।"

নদীয়ার আপত্তি হইবার কথা নয়। মাসে মাসে যা পাইবে, তাহাতে প্রসাধন কিছু করিতে পারিবে ত; এটা সেটা সৌখিন জিনিস কিনিয়া উপহার ত দিতে পারিবে। না হয় চুরুট বিড়ির খরচটা চলিয়া যাইবে।

আরো কয়েকজন তাহারা পাহারার কাজে ভর্তি হইল। কাচারী বাড়িতে খায় দায়, রাত্রে হৈ চৈ করিয়া পাহারা দেয়, দিনের বেলা চলিয়া আসে বাড়ি। ঘুমাইয়া সুস্থ হয় তবে আবার যায়।

দিন সাতেক পর দেখা গেল, তাহাদের খাবারের ব্যবস্থার একটু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। চাকর আর পাক করে না তাহার পরিবর্তে আসিয়াছে তিনজন মেয়ে লোক। দুইজনের বয়স অল্প ষোল কি সতের আর একজন কিছু প্রাচীন।

কালোপনা গোলগাল মেয়েটির নাম সুভদ্রা। কারণে অকারণে সে হি হি করিয়া হাসে। অপরটির নাম রমা, কৃশাঙ্গী; মুখের অনাড়ম্বর ভঙ্গির মধ্যে তাহার স্থির করুণ চাউনি মনকে বিদ্ধ করে বেশী। আর প্রাচীনার নাম হরিদাসী। কাচারী ঘর হইতে কিছু দূরে তাহাদের ঘর। আলাদা ঘরে তাহারা থাকে ঘরের বাহির তাহারা বড় হয় না।

কিন্তু তবু সুভদ্রার হাসিয়ে-পড়া দেহের রেখা-মালা রমার স্থির চোখের করুণ চাউনি হইতে রেহাই কেউ পায় না। অকারণে তাহারা ভিতরে আসে। তাহারাও জানে না এর কারণ কি। ভিতরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তামাক খাইবার জন্য আগুন চাহিতে গিয়াও সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায়।

সুভদ্রা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, হাসিয়া বলে—"কি চাই।"

—"একটু জল দাও।"

হি হি করিয়া হাসিয়া উঠে।

বলে,—"জল!"

তাহারা অবাক হইয়া যায়, বলে "এতে হাসবার কি আছে।"

সুভদ্রা কোন উত্তর দেয় না, আরো জোরে হাসিয়া উঠে।

কেহ কেহ হয়ত একটু রাগ করে, কিন্তু রাগতপ্ত কথা বলিবার আগেই চাহিয়া দেখে ত্রস্তা হরিণীর মত সুভদ্রা কখন চলিয়া গিয়াছে এবং সেই স্থানে অচঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে করুণনয়না রমা। সুভদ্রার হাসি হয়ত তাহারা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু রমাকে দেখিয়া মন কেমন থিতাইয়া যায়। ইচ্ছা করে, ডাকিয়া কাছে বসায়, একটু আদর করে, সোহাগ করে, রমার মনের একঘেঁয়ে পটে টানিয়া আনে হাসির মোটা মোটা রেখা।

এমন সময় হয়ত আসে হরিদাসী। মুখ ফিরাইয়া একটু হাসে। কিন্তু সামনাসামনি হাসি গোপন করিয়া বলে,—"এখন কি গল্প করবার সময় পোড়ারমুখী। সন্ধ্যের পর থাকে অবসর, তখন না হয় গল্প করিস।"

তারপর নদীয়া প্রমুখ যুবকদের বলে,—"রাত্রে থাকি আমরা একলা; আছি কি মরেছি, মাঝে মাঝে একবার দেখে যেও তোমরা!"

নদীয়ার দল বলে,—"আচ্ছা।"

হরিদাসী আবার মুখ টিপিয়া হাসে, বলে,—"সেই ভাল। তবে তোমরা এসো। আমি ওদের বলবো।"

পাহারা দিতে নদীয়ারা সুভদ্রা-রমাদের ঘন ঘন দেখিয়া যায়। কোনদিন শুনা যায়, রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুভদ্রার ফেনিল হাসির উচ্ছ্বাস। কোনদিন ছড়াইয়া পড়ে রমার গানের সুরে কামনার প্রশস্তি! তাহারা শুনে মগ্ন হইয়া, হাসে তাহারা মত্ত হইয়া। বসিয়া থাকিতে তাহাদের কাছে কেমন নেশার মত লাগে।

হরিদাসীও নাকি কীর্তন গায় ভাল। রাত্রে চুপি চুপি আসে আধা বুড়ার দল। হরিদাসীর ঘরে প্রবেশ করে চোরের মত, কথা বলে ফিস্ ফিস করিয়া। কি জানি, পাশের ঘরে ছেলে বয়েসী নদীয়া-রা তাহাদের কথা যদি শুনিয়া ফেলে। কিন্তু যখন রমা-সুভদ্রার ঘরে গান ও হাসির প্রবাহ উত্তাল হইয়া উঠে, তাহারা আধা বুড়ারা নির্ভয়ে কথা বলে। মাঝে মাঝে জোরেও হাসে।

কেমন নেশায় পাইয়াছে বিশগাঁয়ের যুবা ও বুড়ারদলকে। নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার তাহারা যেন ভুলিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে, পাত্র ভরিয়া যে মদ তাহারা মেয়েদের হাত হইতে পায়,

আনন্দে মত্ত হইয়া পান করে, ইহার অর্থ অন্তত বুঝিতে পারিত। এই পানীয়ও বা আসে কোথা হইতে! তাহা হইলে কি আনন্দ করিতে পারিত। কিন্তু এখন তাহাদের নেশাগ্রস্ত মনের কাছে এ বিচারের প্রয়োজন কি? সুভদ্রার হাসির মাদকতা বজায় আছে, রমার গান এখনও মিঠা, হরিদাসী কীর্তনের সুর ভুলে নাই, আর অবসাদগ্রস্ত হয় নাই তাহাদের মধুপিয়াসী মন। এই যথেষ্ট!

কিন্তু চন্দ্রের এসব ভালো লাগে না। বুঝিতে পারে না, বিশগাঁয়ের লোকেরা কেন বাজারের দিকে পাগল হইয়া ছুটে। কি ওখানে!

বলে,—"এরা সব ডাইনী।"

শিব সরকার হাসিয়া বলে,—"দাদা, সেদিন আর নেই। কিন্তু মাগী গায় ভাল। যাবে?"

চন্দ্র বলে,—"কোথায়।"

—"সেখানে গান শুনতে। তিনকাল হাল চষতেই গেল দাদা, শেষকালটায় স্ফূর্তি করে নাও। বেশ চল আজ-ই না হয়।"

উত্তেজনা আর চাপিয়া রাখিতে পারে না, চীৎকার করিয়া চন্দ্র বলে,—"চুপ।"

শিব সরকার কিন্তু বিচলিত হয় না; হাসিয়া বলে,—"অত রাগ কিসের দাদা—নদীয়ার খোঁজও একটু নিও।"

চন্দ্রের হুঁস হইল। নদীয়াকে সে দেখে নাই অনেক দিন। বাড়িতে আসে কিনা সে খোঁজ নেয় নাই এতদিন। আর বাড়ি আসিলে নদীয়া কেমন এড়াইয়া চলে। সেদিন হঠাৎ সামনা-সামনি দেখা। নদীয়া সরিয়া যাইতেছিল।

চন্দ্র বলিল,—"নদীয়া এদিকে আয়।"

নদীয়া বলিল,—"আমার কাজ আছে।"

—"তা থাক। কিন্তু তোকে আজকাল দেখতে পাই না কেন।"

—"বাজার ছেড়ে আসতে পারি না।"

—"এত ভাল নয় নদীয়া। ওরা সব ডাইনী—বাজারে গিয়ে কাজ নেই তোর। বাড়ি চলে আয়।"

—"আচ্ছা।" বলিয়া নদীয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

চন্দ্র বিস্মিত হইয়া গেল। নদীয়া তাহার কাছে আসিতে চায় না। আস্তে আস্তে চলিয়া আসিল নবীন দাসের বাড়ি—সীতার কাছে।

সীতাকে বলিল,—"আচ্ছা মা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—বল ঠিক উত্তর দিবি।"

—"বলুন।"

—"নদীয়ার সঙ্গে তোর দেখা হয়।"

সীতার লজ্জায় রক্তিম মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

চন্দ্র বলিল,—"লজ্জা কি মা, বল।"

সীতা আস্তে আস্তে বলিল,—"না, দেখা হয় না।"

—"নদীয়া কতদিন হল আসে না।"

—"অনেক দিন।"

—"তোকে কিছু বলে না—কিছু দেয় না আজকাল।"

কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য সীতার মুখের দিকে চাহিয়া চন্দ্র অবাক হইয়া গেল। সীতার দু'চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে!

চন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। উন্মত্তের মত চলিল বাজারের দিকে। সে নিজে দেখিবে, নদীয়া সেখানে করে কি। কিসের নেশায় সীতাকেও সে ভুলিতে পারিয়াছে।

বিশ্বাস মশায় বাহিরে বসিয়াছিলেন। চন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—"এ-যে চন্দ্র; বসো বসো; তারপর খবর কি।"

উত্তর দিবার অবস্থা তখন চন্দ্রের নয়। তবু বলিল,—"দেখতে এলাম বাজার।"

বিশ্বাস মশায় হাসিয়া বলিলেন,—"এখন বাজার নয় চন্দ্র সোনার হাট। কত সাবান, কত তেল বিক্রি হয় এখন।"

"কিন্তু শুনেছি রাতে নাকি বাজারের চেহারা অন্যরকম—সেটাই দেখতে এসেছি।"

নায়েব মশাই জোরে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ঠিক চন্দ্র, ঠিক। এবার আমার ছুটি—কাজ আমার হয়ে গেছে।"

হাসির তরঙ্গে সমস্ত বাজার একবার কাঁপিয়া উঠিল।

চন্দ্র আর সেখানে বসিল না। ফেনার মত হাসি যেখানে ছড়াইয়া পড়িতেছে সেইখানেই চলিল। তিনটা ঘরই তখন শব্দময়। সুভদ্রার ঘরের কাছে আসিয়া চন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে নদীয়ার কথা শুনা যাইতেছে।

নদীয়া বলিতেছে,—"আর এখানে ভাল লাগে না।"

সুভদ্রা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"তবে কি করবে।"

—"তোমার আমার সব সময় ভাল লাগে না—চল অন্য কোথাও চলে যাই।"

—"পালিয়ে যাবো!"

—"হ্যাঁ, পালিয়ে যাবো! বাপটা আবার প্যান প্যান করছে।"

সুভদ্রা আবার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"আচ্ছা মরদ।"

কিন্তু পরক্ষণে বলিল,—"কত টাকা আছে।"

নদীয়া বলিল—"নিজের সব টাকা তোমাকেই দিয়েছি। বাপের বাক্স হতে চুরি করে নিব।"

সুভদ্রা আবার হি হি করিয়া হাসিল। পানীয়ভরা একটা পাত্র আগাইয়া কহিল,—"এখন খেয়ে নাও।"

ঘৃণায় চন্দ্রের শরীর শিহরিয়া উঠিল। তেজদীপ্ত পোক্ত-দেহ নদীয়ার পরিণতি হইয়াছে এই। ছি! ছি! সব কুত্তার পাল! আর এখানে নয়। সত্যই বৃদ্ধ ছুটিয়া চলিল। কিন্তু খালের পার ধরিয়া চলিতে গিয়া কেমন বিস্মিত হইয়া গেল—এ যে সড়ক! গরুর গাড়ির চাকার দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে ইহার বুকে।

খালের মুখে আসিয়া দেখিল—চারিদিকটা আলোময় ডে-লাইট জ্বালিয়া মধুসূদন কৈবর্তের লোকেরা মাছ ধরিতেছে। কাজে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে—কিসের রাত্রি আর কিসের দিন!

স্তব্ধ হইয়া চন্দ্র সেখানে দাঁড়াইল। বাঁধ আবার নূতন করিয়া বাঁধা। বিশগাঁয়ের লোকদের হইয়াছে কি—খাল শুকাইতে শুকাইতে একেবারে মরিয়া গিয়াছে সেদিকে কাহারো নজর নাই। এমন কি মেয়েরা, যাহাদের জল না হইলে এক মুহূর্তও চলে না, তাহারাও কিছু বলে না। টিউব-ওয়েলের জল পাম্প করিয়া তুলিতেই তাহারা যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে। বিস্মিত হইয়াছে খালের কথা।

বাঁধের দিকে আগাইয়া আসিয়া উন্মত্তের মত, লাঠি দিয় ক্ষত বিক্ষত করিয়া চলিল কিছুক্ষণ। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না—বাঁধ ভাঙিল না।

"সব কুত্তার পাল!"

চন্দ্র ছুটিয়া চলিল—বিশগাঁয়ে তাহার আর কেহ নাই। তবে সীতাকে দেখা গিয়াছে, একাকী সে বসিয়া থাকে। হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলে, কথা বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইয়া যায়। জনকোলাহলের মধ্যেও সে একাকী।

Vlaupr.

মানুষের দাবী

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

দেবী। কিন্তু নিশ্চিন্ত হোন—আমি যাব না, কোথাও, যাব না। মিথ্যে ধরা যদি পড়ি এখন হতেই ধরা পড়ব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সীতা বলিল—"না সনাতন, আমি তোমায় ধরা পড়তে দেব না। তোমায় জব্দ করবার জন্যে গাঁয়ের লোক যে মেয়েকে সেদিন সভা-সমিতি করে তাড়িয়ে দিয়েছিল পতিতা বলে, আজ তাকেই ডেকে নিয়েছে, তা তুমি জানো না। ওকে তারা ক্ষমা করে সমাজে তুলেছে, তোমার বিরুদ্ধে কথা বলতে শিখিয়েছে। তার দোষ নেই, সে আমার কাছে থাকবে—আমারই কাছ হতে এই ভরসা পেয়ে তোমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কথা বলতে রাজি হয়েছে।"

সনাতন শান্তকণ্ঠে বলিল, "মানুষে যা করে সে তাই করেছে। আপনি ওদের কর্ত্রী, আপনার হুকুমেই সব হচ্ছে, আবার আমাকে সরানোর জন্যে কেন অস্থির হচ্ছেন সীতা দেবী, এটা তো ঠিক মানুষের কাজ হচ্ছে না, অমানুষের মত কাজ হচ্ছে যে।"

সীতা মুখ ফিরাইল—

খানিক পরে সে যখন মুখ ফিরাইল তখনও তাহার চোখের পাতা চকচক্ করিতেছে। উঠিয়া ড্রয়ার খুলিয়া কি লইয়া সে ফিরিল—

"টাকার ভাবনা করো না সনাতন—এই নাও তোমায় হাজার টাকা দিচ্ছি, তুমি চলে যাও। আমি যে কাণ্ড করেছি, দুচার দিনের মধ্যে আমিই তা মিটাব, সব মিথ্যে প্রতিপন্ন করব, তুমি নাও সনাতন—"

অস্পৃশ্য সনাতনের হাতের মধ্যে সে নোট তুলিয়া দিল—কিন্তু সনাতন লইল না; শুষ্ক হাসিয়া পিছাইয়া গিয়া বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণের বিধবা, আমায় স্পর্শ করবেন না। আপনার সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ। আমার উপায় আমিই করে নেব—আপনাকে ভাবতে হবে না।"

একটা নমস্কার করিয়া সে পিছন ফিরিল।

তখন যদি সে ফিরিয়া চাহিত—দেখিতে পাইত—সীতার দুইটি চোখ দিয়া ঝর্ ঝরে করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

পুলিশ আসিল এবং সনাতন বন্দী অবস্থায় গ্রামত্যাগ করিল। ইহার পর কয়দিন চলিল বিচার, সে সব খবরই সীতার কানে পৌছিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল—সনাতন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

পূজার ঘরে সীতা তখন পূজা করিতে বসিয়াছিল সংবাদটা তাহার কানে তখনই পৌছাইল।

শূন্য দৃষ্টিতে বিগ্রহের পানে সে তাকাইয়া রহিল, হাতের অর্ঘ্য কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল—

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সীতা ধরাতলে লুটাইয়া পড়িল—ঠাকুর—একি করলে ঠাকুর, এ কার পাপ, এ কার রাক্ষসী পিপাসা?

পাথরের দেবতা কোন সাড়া দিল না।

আমাদের টাকার বাজার

শ্রীঅনিলকুমার বসু এম-এ

হেঁয়ালি করিয়া প্রশ্ন করা হয়—"পৃথিবীটা কার বশ।" উত্তর হইল টাকার। বস্তুত জগতটাই টাকার খেলা। জৈবিক জগতে যেমন বায়ু ছাড়া বাঁচা যায় না, আর্থিক জগতেও টাকা ছাড়া চলা যায় না। টাকা আর্থিক দুনিয়ার বায়ু। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বায়ু পরিবর্তন আবশ্যক। তেমনিই অবসন্ন প্রাণে শক্তি সঞ্চারের জন্য সিলভার টনিকেরও প্রয়োজন। অতএব আর্থিক দুনিয়ায় চলাফেরা করিতে হইলে টাকার উপাদান যে টাকার বাজার তাহা সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। টাকা বলিতে কেবল কাগজের নোট, সোণা, রূপা কিংবা তামার চাকতি বুঝায় না। বস্তুত ঐ সকল নোট ও ধাতব পদার্থ দ্বারা যাহা কেনা যায়। বাঙলাতে যাহাকে বলে ক্রয়-ক্ষমতা (Purchasing power)। অতএব এই ক্রয়-ক্ষমতা যেখান হইতে অর্জন করা যায় তাহাকেই টাকার বাজার বলা হয়। মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—কেবল গভর্নমেন্টের দপ্তর ছাড়া অন্য কোথাও ক্রয়-ক্ষমতা লাভ করা যায় ইহা কিরূপে সম্ভবে। আমরা ত জানি শুধু সরকারের টেঁকশাল আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাপাখানাতেই প্রকৃত টাকার বাজার বসে। সরকারের ছাড়পত্র ছাড়া অন্য কোন টাকার অস্তিত্ব থাকা কি সম্ভবপর? এরূপ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, টাকা চলাচলের মূলে আছে জনসাধারণের বিশ্বাস। কথায় বলে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।" এই টাকা দ্বারা আমি অনায়াসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিব এবং সকলেই নির্বিকারে এই টাকা গ্রহণ করিবে এই বদ্ধমূল ধারণার উপরই টাকার বাজারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই বিশ্বাসটুকু যে সকল টাকার উপর অটুট আছে সে সকল টাকাই বিনিময়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাতে সরকারের ছাপ না থাকিলই বা। বর্তমানে তামার পয়সার অভাবে ট্রামে যে সকল কুপন দেওয়া হয়, তাহা ট্রামযাত্রী সকলেই গ্রহণ করিতেছেন। এমন কি ঐ কুপন দ্বারা জিনিস কিনিতেও দেখা গিয়াছে। এই কুপনগুলিই যদি একটু বৃহত্তর এলাকায় লেন দেন হয় তবে এই সকল কুপনই এক পয়সার অভাব মিটাইবে এবং ঐ সকল বিনিময় করাও জনসাধারণের অভ্যাসে দাঁড়াইবে। তবে কথা উঠিতে পারে সরকারের ছাপের কি কোন মূল্যই নাই? স্বীকার করিতে হইবে নিশ্চয় আছে। সরকারের ছাপ মারা টাকা যে কোন অবস্থাতেই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী ছাপশূন্য অন্য সব টাকা গ্রহণ না করিলেও আমাকে কিছু বলিবার নাই—বা কাহারও কাছে জবাবদিহি করিবার নাই। কিন্তু সরকারী টাকা গ্রহণ না করিলে এবং উহার বিনিময়-যোগ্যতা অস্বীকার করিলে আমাকে লালবাজারে পুরিয়া দিতে পারে। দুইয়ের প্রভেদ শুধু এই জায়গাতেই। অতএব ব্যাপক অর্থে টাকা বলিতে সেই সব জিনিসই বুঝায় যাহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের লেনদেন-কারবার চুকান যায়। এই পর্যায়ে সরকারী মুদ্রা, নোট এবং বেসরকারী চেক্, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক ড্রাফট্, হুণ্ডি ইত্যাদি পড়ে। বর্তমান আর্থিক জগতে নগদ টাকা অপেক্ষা চেক্, ড্রাফট্, হুণ্ডি ইত্যাদির চলাচলই বেশী। কাজেই এই সকলকেও টাকা বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। ইংরেজীতে বলা হয়, "Representative money" বা "Bank money"। এখন টাকার প্রকৃত অর্থ যখন বুঝিতে পারিলাম তখন আমরা মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসিতে পারি। টাকার বাজার বলিতে তাহা হইলে সরকারী টেঁকশাল বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়াও অন্য সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি শ্রেণী বুঝায় যাহারা প্রয়োজনীয় টাকার জোগান দিয়া আমাদের ক্রয়-ক্ষমতা প্রদান করে। কাজেই টাকার বাজারের অন্যান্য দোকানদার হইল যৌথ ব্যাঙ্ক, মহাজন, বিলের দালাল, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, এক্সেপটেন্স হাউস, ডিসকাউণ্ট হাউস ইত্যাদি।

ভারতের টাকার বাজারকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও অপরাপর ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক। সুবিধার জন্য এই সকলকে "বাহির বাজার" বলিয়া অভিহিত করিলাম। দ্বিতীয়ত মহাজন, স্রফ, মুলতানী, বানিয়া, সাহুকর, মাড়োয়ারী প্রমুখ ব্যক্তিবিশেষ ব্যাঙ্কার। ইহা-দিগকে ভিতর বাজারের দোকানদার বলিয়া শ্রেণীভুক্ত করিলাম। এতদ্ব্যতীত সমবায়-ব্যাঙ্কগুলিকে দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি এক পর্যায়ে ফেলিলাম এবং পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, জমি-বন্দকী ব্যাঙ্ক, ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্রভৃতিকেও টাকার বাজারের অন্য সরিক বলিয়া ধরিয়া নিলাম। প্রত্যেক দেশেই সুপরিচালিত টাকার বাজারের নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ টাকার বাজারের স্থিরতার উপরই সেই দেশের আর্থিক কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভর করে। টাকার বাজার যত বেশী সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ হইবে, ততই উহা নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজ হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে আর্থিক স্থিরতা রক্ষার জন্য অবস্থানুসারে টাকার চলাচল প্রসারিত ও সংকুচিত করিতে হয়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চলতি টাকার পরিমাণ কমাইতে চায়, তখনই কোম্পানী কাগজ ইত্যাদি বাজারে বিক্রয় করিয়া জন-সাধারণের হস্তস্থিত টাকা আকর্ষণ করে। আবার বাড়াইতে হইলে ঐ সকল কাগজ বাজারে অগ্রণী হইয়া ক্রয় করে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা বাজারে চালু হইয়া চলতি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে "open-market operations" অর্থাৎ খোলাখুলিভাবে কোম্পানী কাগজ বাজারে কেনাবেচা করা। ইহা ছাড়া Bank-rate দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দাদনের হারের (advance-rate) উপরই টাকার বাজারে ধার নেওয়া-দেওয়ার পরিমাণ (volume of credit) নির্ভর করে। দাদনের হার বাড়াইলে ধার নেওয়ার স্পৃহা ক্ষীণ হয়। আবার কমাইলে উহা বৃদ্ধি পায়, একমাত্র সুগঠিত টাকার বাজারেই উপরোক্ত পরিস্থিতির উৎপত্তি সম্ভব। এই টাকার বাজারই দেশের লেনদেনের মাপকাঠি এবং ইহার ভিতর দিয়াই অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এমন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত টাকার বাজার নাই, "বাহির বাজারের" দোকানদারদের সাথে "ভিতর বাজারের" শরিকদের কমই বনিবনা আছে এরূপ সহযোগিতার অভাব দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নয়। এমন কি "বাহির বাজারের" দোকানদারদের মাঝেও কোন একতা নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি এখন পর্যন্ত অপ্রতিহত, অপরাপর যৌথ ব্যাঙ্কগুলিও উপরোক্ত ব্যাঙ্কের ঈদৃশ দোর্দণ্ড প্রতাপকে ভাল চক্ষে দেখে না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও কাহারও দিকে তাকায় না। অপরদিকে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বহুদিনের অর্জিত প্রতিষ্ঠা ও শক্তির দ্বারা ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলিকে এতদিন কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় এই দুর্দিনের কালো মেঘ এখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি আবার মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এইদিকে আবার সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পরস্পর কোন সংযোগ নাই, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত টাকা লেনদেনের কারবার ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের সহিতই

চালায়। টাকার বাজারে যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সাথে তাদের কাজের কোন ঐক্য নাই। সাধারণত সমবায় ব্যাঙ্কের সাহায্যে আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত বাহিরের কাজকারবারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু যৌথ ব্যাঙ্কগুলির সাথে তাহাদের কোন সংযোগ না থাকায় নিভৃত পল্লী অঞ্চলের টাকার বাজারের সাথে বাহির বাজারের বিভেদই দৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়েই দেখা যায় যে, শহরাদি অঞ্চলে টাকার আমদানী খুব প্রচুর ও কম সুদেই ধার পাওয়া যায়। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে টাকার চলতি সেই অনুপাতে নিতান্ত নগণ্য এবং সেখানে চড়া সুদেও ধার পাওয়া দুষ্কর। এই যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান তাহা কোন অর্থনীতিবিদই মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করিবেন না। সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যতিরেকেও মহাজনশ্রেণী পল্লী অঞ্চলে লেনদেন করিয়া থাকেন। তাহাদের সুদের হারের সাথে বাহিরের সুদের হারেরও কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা ইচ্ছামত চড়া-সুদ আদায় করিয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশে তিন শ্রেণীর মহাজনের তিন রকম বিভিন্ন বাজার আছে, যথা মারোয়াড়ী মুলতানী ও গুজরাটী বাজার। এই বাজারগুলি স্ব স্ব প্রধান। বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন সুদের হার বিদ্যমান থাকায়, ভারতীয় টাকার বাজারের এক-মুখী সমষ্টিগত রূপটি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলে টাকার বাজারে নির্দিষ্ট কোন সুদের হার নাই, এইজন্যই Central Banking Enquiry Committee নিম্ন প্রদত্ত মন্তব্যটি করিয়াছেন—"ভারতীয় টাকার বাজারে একই সঙ্গে কল রেট ½%, হুন্ডীর বাট্টা হার ৩%, ব্যাঙ্ক রেট ৪%, বোম্বাই ও কলিকাতায় বিল ভাঙাইবার রেট যথা-ক্রম ৬½% ও ১০%, বিদ্যমান থাকা কিছুই বিচিত্র নয়।" সুদের হারের ঈদৃশ বৈলক্ষণ্য টাকা চলাচলের মন্দাভাবেরই পরিচায়ক। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে একমাত্র ব্যাঙ্ক রেট দ্বারাই অন্যান্য সুদের হার নিরূপিত হয়। আমাদের দুইটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র বোম্বাই ও কলিকাতার মাঝে সুদের কিরূপ পার্থক্য তাহা নিম্ন প্রদত্ত সূচী হইতেই বুঝা যাইবেঃ—

মনে করেন, টাকার বাজারে সরকারের অত্যধিক ঋণ গ্রহণের জন্যই বোধ হয় সুদের হার বাড়িয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে সরকারকে কোন এক বৎসরে মোট পাঁচ কোটি টাকার বেশী ভারতীয় টাকার বাজার হইতে ঋণ করিতে দেখা যায় নাই।—কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ লাগিবার পর ১৯১৭—১৮—১৯ সালের মধ্যে সরকারী ঋণ ১৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠে। বিগত যুদ্ধাবসানের পর হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতীয় টাকার বাজারে সরকারী ঋণ বৎসরে গড়পড়তা ৩০ কোটি টাকা পরিমিত দাঁড়াইয়াছিল। সরকারী পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেট ও সেভিংস একাউন্টের মোট আমানত ১৩৫½ কোটি টাকা ও ৪৫০½ কোটি টাকা পরিমিত অন্য ঋণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিক্রীত ট্রেজারী বিলের পরিমাণ ১৯৩৯—৪০ সাল অন্তে মোট ১৩২½ কোটি টাকা ছিল। এরূপ ধারের ফলে টাকার বাজার যে বিশেষরূপে প্রভাবিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি।

উপরোক্ত সাময়িকভাবে টাকা চলাচলের দরুণ (seasonal nature of funds) আমাদের দেশে বিলের বাজার (Bill-market) ও গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। যে কোন দেশে বিলের বাজার টাকার বাজারেরই একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশে এরূপ কোন মার্কেট না থাকাতে টাকার বাজারেরই অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। বিল ভাঙাইবার ফলে স্বল্প মেয়াদী ধারের প্রচলন হয়। কারণ বিক্রেতা তাহার মাল পাঠান বাবদ বিল কোন একটি ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙাইয়া বহুপূর্বেই টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাঙ্কও কয়েকদিন বা মাস বাদে বিলটি দেয় হইলে (mature) ক্রেতার কাছ হইতে উপরোক্ত বিল দেখাইয়া টাকা আদায় করিতে পারে। ইহার ফলে টাকা পাওয়ার যে ব্যবধানটুকু থাকে তাহাও মুছিয়া যায় এবং ইহাতে মালপত্রের আমদানী রপ্তানী অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রচুর সুবিধা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে টাকার বাজারে লেন দেন চলিতেছে

	কল রেট্		বাজার বিল রেট্	
	কলিকাতা	বোম্বাই	কলিকাতা	বোম্বাই
১লা এপ্রিল, '৩৯	২%	২¾%	৬—৭%	৫¾%
" মে, '৩৯	২%	২%	৬—৭%	৫¾%
" জুন, '৩৯	১¾%	¾%	৬—৭%	৫¾%
" জুলাই, '৩৯	½%	½%	৬—৭%	৫½%
" আগষ্ট, '৩৯	½%	¾%	৬—৭%	৫¾%
" সেপ্টেম্বর, '৩৯	¾%	¾%	৬—৭%	৬%
" অক্টোবর, '৩৯	১%	¾%	৬—৭%	৫½%
" নভেম্বর, '৩৯	½%	½%	৬—৭%	৫½%
" ডিসেম্বর, '৩৯	১%	১½%	৬—৭%	৬¾%
" জানুয়ারী, '৪০	১¾%	২%	৬—৭%	৬¾%
" ফেব্রুয়ারী, '৩৯	১¾%	১½%	৬—৭%	৬¾%
" মার্চ, '৪০	¾%	১½%	৬—৭%	৬¾%

আমাদের দেশে টাকার চলতি সময় বিশেষ বাড়ে ও কমে। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়া সংবৎসরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় —যথা অক্টোবর হইতে মার্চ এবং মে হইতে সেপটেম্বর। প্রথমভাগে ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় ভাগ মন্দার সময় বলিয়া পরিগণিত হয়। এইভাবে অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ফসলাদি চালান দিবার জন্য টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার মে মাস হইতে ব্যবসায় মন্দা হইলে টাকার বাজারও নরম হইয়া পড়ে। এই দুইভাগে সুদের হারেও বিশেষ বৈষম্য লক্ষিত হয়। প্রথম দিকে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হারও চড়িয়া যায়। আবার শেষভাগে টাকার চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় সুদের হারও পড়িয়া যায়। একই বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সুদের হারের এরূপ আকাশ-পাতাল বৈষম্য ভারতীয় টাকার বাজারের দুর্বলতারই চিহ্ন। অনেকে

ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে। এই তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের দেশে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথমত মহাজন শ্রেণী তাহাদের মূলধনের কোন হিসাব প্রকাশ করিতে নারাজ। দ্বিতীয়ত জমি, দালান প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তিতে কত টাকা নিয়োজিত হইতেছে তাহারও কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত আমাদের দেশে বৈদেশিক মূলধন কত খাটিতেছে তাহার পরিমাণও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে কতকটা অনু-মানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য এই অনুমান মন-গড়া হইলে চলিবে না। ইহার ভিত্তি পাকা হওয়া আবশ্যক। টাকার বাজারে যে সকল অর্থের লেনদেন হয়, তাহার উৎপত্তি দেশবাসীর সঞ্চয় হইতে। সঞ্চয় হইলে উদ্বৃত্ত অর্থ অর্থাৎ খরচ চুকাইবার পর আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হইল সঞ্চয়ীর আয় বৃদ্ধি

কার্যে সহায়তা করা। অতএব সঞ্চিত অর্থ হইতে আয় করিতে হইলে তাহা খাটান প্রয়োজন। সাধারণত আমাদের দেশে নিম্ন প্রদত্ত পথে টাকা খাটেঃ—

(১) মহাজনী কারবার, জমি, বাড়ি ইত্যাদি, (২) নগদ ও সোনার অলঙ্কার, (৩) ব্যাঙ্কে আমানত, (৪) পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেট ও সেভিংস একাউন্ট, (৫) যৌথ কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বন্ড, (৬) পারিবারিক ব্যবসায়, (৭) ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম, (৮) সরকারী লোন, (৯) বিদেশে অর্থ খাটান ইত্যাদি। ইহারই একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

ভারতীয় টাকার বাজারে অল্পকাল ও দীর্ঘকালের জন্য যে সকল টাকা খাটে।

(কোটি টাকা হিসাবে)

	পোষ্ট অফিস লভ্যাংশ	পোষ্ট অফিস ক্যাস্ সার্টিফিকেট	ব্যাঙ্ক আমানত	লাইফ এসিওরেন্স্ ফণ্ড	কো-অপারেটিভ ফণ্ড	যৌথ কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন	সরকারী ঋণ
১৯২৯-৩০ ...	৩৭·১৩	৩৫·০০	২০১·০১	১৮·৭৪	৮৯·৫২	২৬১·১১	৪০৪·৮০
১৯৩০-৩১ ...	৩৭·০২	৩৮·৪৩	২০৭·৯৬	২০·৫৩	৯১·৯৯	২৫৬·১২	৪১৬·৬৭
১৯৩১-৩২ ...	৩৮·২০	৪৪·৫৮	১৯৩·৫৯	২২·৪৬	৯২·৬৯	২৫৯·২০	৪২২·২৫
১৯৩২-৩৩ ...	৪৩·৪৫	৫৫·৬৪	২১৩·৭৬	২৫·১০	৯৫·৮৪	২৫৯·৪৬	৪৪৬·৪৭
১৯৩৩-৩৪ ...	৫২·২৩	৬৩·৭১	২১৬·৫৮	২৮·৭৫	৯৫·৭২	২৭৬·০৬	৪৩৪·৫৭
১৯৩৪-৩৫ ...	৫৮·৩০	৬৫·৯৬	২২২·৪৪	৩১·৯২	৯৬·৮৮	২৭৯·২৫	৪৩৭·৭২
১৯৩৫-৩৬ ...	৬৭·২৫	৬৫·৯৮	২৩৯·৭২	৩৫·২৩	৯৭·৭২	২৭৭·৪৮	৪২৫·৩২
১৯৩৬-৩৭ ...	৭৪·৬৮	৬৪·৪০	২৫২·১৫	৪০·২৯	৯৯·৩৮	২৮৫·৭৬	৪৩৭·৮৮
১৯৩৭-৩৮ ...	৭৭·৫৬	৬০·২১	২৫৪·৫৫	৪৫·১৪	১০১·৫১	২৭৯·১৬	৪৩৮·৮২
১৯২৯-৩৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি	৪০·৪৩	২৫·২১	৫৩·৫৪	২৬·৪০	১১·৯৯	১৮·০৫	৩৪·০২
বার্ষিক হার ...	৪·৪৯	২·৮০	৫·৯৫	২·৯৩	১·৩৩	২·০০	৩·৭৮=২৩·২৮

এখন দেখা যাক্, আমাদের দেশে ব্যয় ইত্যাদি চুকাইয়া কতটুকু অর্থ বাঁচান যায়। সাধারণত দেখা গিয়াছে যে মোট জাতীয় আয়ের (national income) ৮% হইতে ১২% মাত্র বৎসরে জমান সম্ভব; ইংলণ্ডে কিন্তু Keynesএর মতে ১২% হইতে ১৫% সঞ্চয় করা সম্ভবপর। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, আমাদের মোট জাতীয় আয় ২০০০ কোটি টাকা ও ২৫০০ কোটি টাকার মাঝামাঝি এবং উক্ত আয়ের ৮% হইতে ১২% জমান যায়, তবে মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৎসরে ১৬০ কোটি টাকা হইতে ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইবে। কিন্তু উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, এই সঞ্চিত অর্থের মাত্র ২৩.২৮ কোটি টাকা অল্পকাল ও দীর্ঘকালের জন্য টাকার বাজারে খাটিতেছে। বাকি অর্থ তাহা হইলে কোথায় গেল? অতএব আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে এখনও অনেক অর্থ অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। জাতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সেই সঞ্চিত অর্থের লাভজনক ভাবে বিনিয়োগ করিবার উপায় উদ্ভাবন করা কর্তব্য।

প্রবন্ধটি শেষ করিবার পূর্বে একটি জিনিস পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। স্বল্পকালের মেয়াদী লেনদেনের কারবারকে টাকার বাজারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দীর্ঘকালের স্থায়ী লেনদেনের কারবারকে অন্য পর্যায়ে ফেলিয়াছি। ইংরাজীতে যাকে বলে "Capital market" অল্পকালের জন্য যে সকল টাকা খাটিতেছে (short-term lending and borrowing) তাহাকেই বর্তমান প্রবন্ধে টাকার বাজারের বিষয় বস্তু বলিয়া অবতারণা করা হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, টাকার বাজারকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কি সার্থকতা থাকিতে পারে। টাকার লেনদেন যখন করিতেই হইবে, তখন অল্পকালের বা দীর্ঘকালের জন্য খাটানর কথা তুলিয়া কি লাভ? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, টাকা বেশী দিনের জন্য খাটিবে না অল্প দিনের জন্য খাটিবে—এই বিচারের উপরই লোকের টাকা খাটাইবার স্পৃহা নির্ভর করে। বর্তমান যুদ্ধ সময়ে আমাদের মনে টাকা খাটান ব্যাপারে কি কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা একটু বিচার করিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আমরা প্রথমেই ভাবি—আমাদের টাকাগুলি কি-ভাবে থাকিলে অনায়াসে ফিরিয়া পাইতে পারি। এই বিচারের ফলে কেহ কেহ নগদ টাকা নিজের কাছে পুঁজি করিয়া রাখেন বা ব্যাঙ্কে চলতি আমানত বা স্থায়ী আমানতরূপে জমা রাখেন। বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় সকলেই নিজের কাছাকাছি টাকা রাখিতে চাহেন এবং প্রয়োজনানুসারে নগদ পরিবর্তন যোগ্য (convertible into cash) যে সকল investments আছে তাহাই বাছিয়া নেন। Keynes এই স্পৃহাকেই liquidity-preference বলিয়াছেন, যাহা টাকার বাজারকে অনেকখানি প্রভাবিত করে ও সুদের হার একপ্রকার ঠিক করিয়া দেয়। অতএব অল্পদিনের জন্য টাকা খাটিবে না বেশী দিনের জন্য টাকা খাটিবে এই বিষয়টির অনেক দিক আছে, যাহা আমাদের আলাদাভাবে বিচার করিয়া দেখা উচিত। স্থানান্তরে দীর্ঘকালের জন্য টাকা লেনদেনের কারবার (Capital-market) সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

"সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ"

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু কর্তৃক প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর]

শ্রীযুক্ত 'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

শ্রীযুক্ত অমল হোম 'রবীন্দ্র-সংখ্যা' 'দেশে' প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথে'র যে সমালোচনা বা প্রতিবাদ ছাপিয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহার একখণ্ড জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পাইলাম। আমার দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি মাত্র দুইটি 'ভুল' আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার বনিয়াদে আমাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য লিখিয়াছেন অনেক বেশী। আমার প্রবন্ধে নাকি 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' হয় নাই। তাহা না হইতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা'র সোল এজেন্সী হোম মহাশয়ের। 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' তিনি না লিখিয়া আমি লিখিয়াছি ইহাতে তাঁহার ক্রোধের কারণ অনুমান করিতে পারি।

'রবিবাসরে'র অনুরোধে ঐ প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছিলাম। উহার সম্পূর্ণ 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের Journalistic writing বা সাংবাদিক লিপি-চাতুর্য তাঁহার সাহিত্যিক লেখা অপেক্ষা ন্যূন নহে ইহাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। Journalistic writing ও সাহিত্যিক লেখা এক প্রকারের নহে ইহা আলোচনা করিয়াছিলাম। 'দেশে' ঐ অংশটা নাকি অনবধানতাবশত মুদ্রিত হয় নাই। প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহে আমার কয়েকটি বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন—তাহা প্রবন্ধ পাঠের সময়ই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। হোম মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের কোন বিশেষ সংখ্যা হইতে সংকলিত। কিন্তু ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রবন্ধে আমার 'কল্পনা বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানে'র কথাও আছে। এবং ঠিক এই সব স্থানেই আমি 'গোলযোগ' করিয়া বসিয়াছি। যে দুইটি 'ভুল' তিনি বাহির করিয়াছেন, উহা নাকি ঐ প্রকারের 'গোলযোগ'। 'ভুল' দুইটি এই:—'হিন্দু বিবাহ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে আমি লিখিয়াছি যে, 'বিতর্কে'র দিন কয়েক পরে পণ্ডিতবর হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে গেলেন। চন্দ্রনাথবাবুর হাত ধ'রে তিনি সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন: 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে সখা, তোমারই চরণ ধূলায় তলে'।" হোম মহাশয় বলেন যে, এ গল্পটা অসম্ভব কেননা রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র যে গানটি রচনা করিলেন ১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে সে গান তিনি ১৮৮৭ সালে কেমন করিয়া গাহিয়া উঠিলেন। কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই বলিবেন যে, স্থান ও কালের পরিচয় থাকিলেই যে কবি তৎকালে ও তৎসময়ে ঐটি রচনা করিয়াছিলেন—তার পূর্বে, এমন কি বহুপূর্বেও, ঐভাবের কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই বা ব্যক্ত করিতে পারেন না ইহা বলা যায় না। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানটির সহিত আমার উদ্ধৃত গানের পার্থক্য আছে। হোম মহাশয় বলিতে চান যে গল্পটি আমার কল্পনা-প্রসূত। ইহা মনে করিবার আর একটি কারণ তিনি বলেন এই যে,—চন্দ্রনাথবাবু রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাকে যে রবীন্দ্রনাথ সখা সম্বোধন করিবেন ইহা অসম্ভব। হোম মহাশয়ের অজ্ঞতা তাঁহার অহমিকার সঙ্গেই তুলনীয়, নচেৎ তিনি এটা অসম্ভব মনে করিতেন না। উহা একটা গান। বিস্তর গানে ঈশ্বরকেও সখা, বন্ধু প্রভৃতি সম্বোধন আছে। রবীন্দ্রনাথ বাদানুবাদ প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন যে, বিস্তর শাস্ত্র ঘাঁটিয়া চন্দ্রনাথবাবুর 'অপচার রোগ' হইয়াছে। কুড়ি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠকে একথা বলা যায়? প্রবন্ধে লিখি নাই, কিন্তু এখন ব্যক্ত করিতেছি যে, গল্পটি মায় উদ্ধৃত গানটি আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন—চন্দ্রনাথবাবুর পুত্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক হরনাথ বসু। তিনি নিজে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বকর্ণে উহা শুনিয়াছিলেন। শুধু ওই একটা গান নয়, হরনাথবাবু চন্দ্রনাথবাবুর বাটিতে রবীন্দ্রনাথের মুখে মুখে রচিত অনেকগুলি কবিতা ও গান আমার নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সেগুলির কতক বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের রচনায় সম্পূর্ণভাবে বা পরিবর্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে। অনেকগুলি এখনও পায় নাই। দ্বিসপ্ততি বৎসর বয়স্ক হরনাথবাবুর ঐ গল্পটি হোম মহাশয় উড়াইয়া দিতে পারেন। কারণ ১৮৮৭ সালে হোম মহাশয়ের জন্ম হয় নাই। কিন্তু আমি তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি নাই। হরনাথবাবু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আরও অনেক উপকরণ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তৃতভাবে সেগুলি পরে আলোচনা করিব মনে করিয়া 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথে' তাহার সকলগুলির উল্লেখ করি নাই। হরনাথবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিলে হোম মহাশয় রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানিতে পারিবেন। তবে যদি তিনি মনে করেন, কাহারও নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার জানিবার আর কিছু নাই—তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

আমার প্রবন্ধের দুই নম্বর 'ভুল' 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা 'স্ত্রীর পত্র' বিষয় লইয়া। হোম মহাশয় বলিতেছেন যে, বিপিনচন্দ্র পালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'মৃণালের পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটি ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিবার কথা সঠিক; কারণ উহা 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' হইতে সংগৃহীত'। কিন্তু রবিবাবু 'সবুজ পত্রে' 'লোকহিত' ও 'বাস্তব' প্রবন্ধে বিপিনবাবুর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন এ বিষয়টি আমার নিছক কল্পনা। হোম মহাশয় লিখিয়াছেন, "মৃণালবাবু শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কি যে, ঐ দুটি প্রবন্ধের সহিত 'স্ত্রীর পত্র' বা 'মৃণালের পত্র' কোনটিরই কোন সম্বন্ধ নাই!" বটে? 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' যে সংখ্যা হইতে আমি সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি হোম মহাশয় বলেন, তাহাতেই এই প্রসঙ্গে আছে:—

"The 'Narayan' criticises Tagore for lacking in realism and exotic writings that had no root in the soil; the *Poet replies* in the 'Sabuj Patra' with two essays *Bastab and Lokahit,* deploring in the latter essay, the tendency on the part of those engaged in social service to patronise the common people while dealing with the problem of poverty and social uplift."

'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদককে তারিফ করিতে হয়। তাঁহার কাগজে কি বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া দেখিবার অবসর হয় নাই—'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের লেখককে গালি দিবার ব্যগ্রতা এত অধিক! আশা করি হোম মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে 'লোকহিত' প্রবন্ধ আমি পড়িয়াছি এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বিপিনবাবু লিখিত 'মৃণালের পত্রে'র উল্লেখ না করিলেও উহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। 'লোকহিত' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত নীচের পংক্তি কয়টি হইতেই আমার উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হইবে: "স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোন জবাবদিহি

(শেষাংশ ২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৯

দুহাত দিয়ে ভিড় সরিয়ে ফটিক আরো এগিয়ে যেতেই মুরলীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুরলী কোন রকমে যেন পাশ কাটিয়েই যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু ফটিক একেবারে সামনা-সামনি জিজ্ঞাসা করে বসল, 'এই যে মুরলীদা কি ব্যাপার, ওদিক থেকে অমন সোরগোল উঠল কিসের?'

মুরলী নিমেষের জন্য একটু থমকে গেল, তারপর সপ্রতিভভাবে বলল, 'যেতে দে যেতে দে, মেয়েদের সোরগোল তার আবার একটা মাথামুণ্ড আছে নাকি কিছু?

ফটিক বলল, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কি?'

ততক্ষণে কীর্তন রেখে আরো অনেকে এসে চারদিকে ঘিরে ধরেছে, এত কলরোলের মধ্যেও দু তিনজন প্রৌঢ়া মেয়ে মানুষের তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে পিছন থেকে, 'ছি ছি ছি, বুড়ো হয়ে গেল, তবু স্বভাব বদলালো না'

'নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়ে—'

'পাড়ায় কি পুরুষ মানুষ আছে কেউ, সব ভেড়ার দল, না হলে এই লোক কি উঠে আবার এতদিন ধানের ভাত খেতে পারত? একদিন ধরে হাড়গোড় গুঁড়ো ক'রে রাখত না গুঁতিয়ে?'

নিজের শক্তির উপর এই কটাক্ষে পুরুষরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, নানারকম গালিগালাজ শাসন তিরস্কারের ঝড় ছুটলো, কিন্তু সাহস করে সহসা কেউ হাত তুলল না মুরলীর গায়ে, বিষয়টা কি তাও পরিষ্কার ক'রে বোঝা গেল না। ততক্ষণে নবদ্বীপ আর সুবল এসে দাঁড়িয়েছে। নন্দকিশোরও উঠে এসেছেন আসন ছেড়ে।

নবদ্বীপ বলল, 'আগে এদের একটু থামিয়ে দে তো সুবল, বিষয়টাই শুনব, না এদের গোলমালই শুনব কেবল।'

সুবলকে কিছু বলতে হোল না। নবদ্বীপের গলায় আগের মত জোর আজকাল না থাকলেও ধমক দেওয়ার ভঙ্গিটি তেমনি আছে। গোলমাল অনেকটা কমে গেল। তাছাড়া সবারই মনে হোল, ঠিক কথা, ঘটনাটাই ভালো ক'রে শোনা হয়নি এখনো।

যে কয়েকজন প্রৌঢ়া একেবারে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল নবদ্বীপ তাদের একজনকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল, সত্যি ক'রে বলতো নসুর মা, ব্যাপারখানা কি?'

এত লোক থাকতে তাকেই হঠাৎ ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায় নসুর মা প্রথমটা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠল। নবদ্বীপের সুরটা এমনি যেন এই গোলমালের জন্য নসুর মাই দায়ী। যেন নসুরমাই এই ঘটনাটাকে তৈরী ক'রে তুলেছে। আর অকারণে নবদ্বীপকে এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে আসতে হয়েছে ব'লে যেন নবদ্বীপের বিরক্তির অবধি নেই। নসুর মার ওপর নবদ্বীপের কেমন একটা আক্রোশ বহুদিন থেকেই আছে তা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল। মাথার কাপড়টা আর একটু নামিয়ে দিল নসুর মা, কিন্তু গলা মোটেই নামাল না; বেশ চড়া ঝাঁঝালো সুরেই জবাব দিল, 'সত্যি কথা বলব কারো ভয়ে ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ঢুকবে এমন বাপের ঝি নসুর মা নয়। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখনা রঙ্গীকে?'

রঙ্গী নামে কারো কথা সহসা নবদ্বীপের মনে পড়ল না, বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার রঙ্গীকে ধরে টানাটানি কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু জানো তুমিই বলনা। চেঁচাচ্ছিলে তো তুমিই সবচেয়ে বেশী।'

নসুর মা তেমনি ধারালো গলায় জবাব দিল, 'নিজের গুণধর পুত্তুরের কীর্তি কিনা, কানে সইতে চায় না—কেউ কিছু বলবে। রঙ্গীকে নিয়ে টানাটানি আমি ক'রতে যাইনি, গিয়েছিল তোমার গুণের ছেলে, কেন গিয়েছিল তাকেই জিজ্ঞাসা কর। নিজের মেয়ের বয়সী একরত্তি একটা ছুঁড়ী, তার হাত ধরে টানাটানি, লজ্জাও করে না, ঝাঁটা মারতে হয় অমন হতভাগার মুখে। সেই ছেলের হয়ে উনি আবার ওকালতি ক'রতে এসেছেন।'

মুহূর্তের জন্য নবদ্বীপ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। কিন্তু নবদ্বীপ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরলী রুখে উঠল, 'এসব তোমার একেবারে নিজের চোখে দেখা না ছোট জেঠি?'

কিন্তু নসুর মা কি আর কেউ কিছু বলবার আগে নিজের ছেলের ওপরই ঝাঁজিয়ে উঠল নবদ্বীপ, 'সরে যা, সরে যা এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, লজ্জা করে না, মুখ ফুটে আবার কথা বলছিস তুই?'

সকলের সামনে মুরলীকে এভাবে তিরস্কার করায় অনেকেই খুসি হয়ে উঠল নবদ্বীপের ওপর। না, কেবল ছেলের পক্ষ টেনে কথা বলবার লোক নবদ্বীপ নয়। তাহ'লে পাড়ার মাতব্বর বলে দশজনে তাকে এমন ক'রে মানত না।

ছেলেকে তিরস্কার ক'রেই নবদ্বীপের গলা আবার স্বাভাবিক পর্দায় নেমে এল। বেশ কোমল, মধুর স্বরে নবদ্বীপ বলল, 'কিন্তু তুমি যে অসম্ভব কথা বলছ নসুর মা।' এযেন শুধু একটা প্রতিবাদ নয়, এ নবদ্বীপের স্থির দৃঢ় বিশ্বাস। এর প্রতিবাদ নসুর মার মুখ দিয়েও সহসা বেরুল না। নবদ্বীপ বলল, 'তবু কথাটা যখন উঠেছেই সংশয় ভঞ্জন হওয়াই ভালো।' বেশ, তুমি যখন নিজের চোখে কিছু দেখনি,

নবদ্বীপ একটু হাসল, 'এসব ব্যাপার অবশ্য কেউ দেখে না, না দেখেই বলে, যাহোক, রঙ্গী না বেঙ্গী কার কথা বললে, তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।'

বিষ্টু সা বলল, 'থাক না নবুদা, যেতে দাও যেতে দাও, যত সব—' নবদ্বীপ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তা হয় না, ব্যাপারটার একটা হ্যস্তন্যস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো, বিষ্টু, না হ'লে অনেকের মনেই হয়তো একটা ধুরেকুচি থেকে যাবে। ডেকে আনো রঙ্গীকে।'

সুবল এতক্ষণ প্রায় চুপ ক'রেই ছিল, এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "কি যে বলেন জেঠামশাই! এই ভিড়ের মধ্যে সোমত্ত মেয়েটাকে না নিয়ে এলেই আপনার চলবে না। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে, কেলেঙ্কারির ওপর একটা কেলেঙ্কারি করবেন আপনি। জিজ্ঞাসাবাদ যদি কিছু করতেই হয়, বিনোদের ঘরের মধ্যে চলুন।" তারপর যারা চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল সুবল তাদের তাড়া দিয়ে উঠল, 'যাও, যে আসরে গিয়ে ব'স, না হয় বাড়ি চলে যাও। কোত্থেকে একটু গন্ধ পেয়েছে আর সব মাছি এসে উড়ে পড়েছে,—সব সমান।'

যেতে যেতে কে একজন অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'বাবারে বাবা, গন্ধ তোমরা বের করতে পারো আর আমাদের নাকে গেলেই দোষ।'

বিনোদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কীর্তন আর নতুন ক'রে জমে উঠল না। অগত্যা কীর্তন বন্ধ ক'রে দিতে হোল বিনোদকে। নিজের বাড়ির ওপরেই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটায় তার কুণ্ঠা আর লজ্জার অবধি রইল না। সকলের কাছে হাত জোড় ক'রে বিনোদ বলতে লাগল, 'অবিলম্বেই আর একদিন সে আয়োজন করবে কীর্তনের। সেদিনও যেন সকলের পায়ের ধুলো পড়ে এখানে।'

এসব গোলমালে রঙ্গীর মার শরীর কাঁপছিল থর থর ক'রে। ভারি সাদাসিধা আর ভীতু ধরণের বৌ সুলোচনা। এত দিন বিয়ে হয়েছে, কিন্তু কেউ এপর্যন্ত তার ঘোমটা একটু খাটো হ'তে দেখেনি কিংবা বড় ক'রে কথা বলতে শোনেনি তাকে। লক্ষ্মী, লজ্জাশীলা বউ হিসাবে বেশ সুনাম আছে তার পাড়ায়। সুলোচনা এসেছিল তার বিধবা জায়ের সঙ্গে। সম্পর্কে জা হ'লেও বয়সে প্রায় সুলোচনার মার বয়সী মানদা। নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই। জা'র ছেলেমেয়ের ওপর বেশ স্নেহ আছে মানদার। পৃথগন্নে থাকলেও এবং খুঁটিনাটি ঝগড়া-বিবাদ বাঁধলেও মধু তার বউদির ওপর খুব নির্ভর করে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে প্রায়ই গাওয়াল ক'রতে বের হয় মধু।—চার পাঁচ দিনের মধ্যে আর ফিরে আসে না। তার স্ত্রীপুত্রের দেখাশোনা এই মানদাই তখন করে।

সুলোচনাকে কাঁপতে দেখে মানদা বলল, 'এমন ভয় পাচ্ছিস কেন ছোট বৌ।' শুনিই না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, যদি অন্যায় কিছু ক'রে থাকে বড়লোকের ছেলে বলে ছেড়ে কথা বলব নাকি আমরা, তা মনেও করিস না।'

সুলোচনা বলল, 'না দিদি, শোনাশুনির আর দরকার নেই। বাড়ি চল। আমি আসতেই চাইনি; এপাড়ার ভাব-সাব আমার জানতে বাকি নেই। এরা নিজের মাংস নিজে খায়' ওবছর মাত্র বিয়ে হয়েছে মেয়ের, জামাইর কাণে যদি এসব কথা ওঠে কি হবে বল দেখি। একেই ওরা দিতে চায় না মেয়েকে, এরপর তো আনবার কথা তোলাই যাবে না। যাক, যা আমার কপালে আছে তাতো কেউ খণ্ডাতে পারবে না, এখন বাড়ি চল।

কিন্তু বাড়ি চল বললেই চলা যায় না। অন্য সব মেয়ের দল এসে তৎক্ষণে রঙ্গীকে ঘিরে ধরেছে, 'কারোরই কৌতূহলের শেষ নেই। অসহায়ভাবে সুলোচনার মনে হোল এই ভিড়ের মধ্য থেকে মেয়েকে উদ্ধার ক'রে সে বুঝি আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না।

এমন সময় আসতে দেখা গেল সুবলকে। একটু দূর থেকেই সুবল ধমকের সুরে বলল, 'আবার জটলা পাকান হচ্ছে! যাও, বাড়ি যাও সব।' তারপর মানদাকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'বউঠান, রঙ্গীকে নিয়ে একবার এসো তো এ ঘরে।'

মানদা মাথার কাপড় টেনে দিয়ে অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'এঘর, ওঘর তদন্ত তল্লাসের কোন দরকার নেই আমাদের, অমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। চল, রঙ্গী, বাড়ি যাই আমরা।'

সুবল বলল, 'আঃ, কেন মিছে রাগ করছ বউঠান, শুনতেই দাও না আগে ব্যাপারখানা, কোন অন্যায় যদি হয়ে থাকে তার বিধান কি করব না আমরা? কাউকে খাতির ক'রে কথা বলবে, সুবল সা তেমন লোকই নয়।'

ঘর একখানাই কিন্তু তার মধ্যে তিন চারটে প্রায় খোপ। দুপাশে বারান্ডা আছে, বারান্ডায় ছোটবড় তিনটে ক'রে খোপ। মনে হয়, বিনোদের বাবা যেন অনেকগুলি ঘরের সাধ এই একখানা ঘর তুলে মিটিয়েছিল। এই একটা উত্তরের পোতা ছাড়া সরিক অংশে আর কোন স্থান মেলেনি বিনোদের। বড় ঘরের কানাচ দিয়ে পাক করবার জন্য আর একটু চালার মত কোন রকমে কেবল তোলা হয়েছে। ঘরে দামী আসবাবপত্রের অভাব থাকলেও হাঁড়িকুঁড়ি আর দড়ির সিকার অভাব নেই। বিনোদের বাবা যেমন অনেক ঘরের সখ মিটিয়েছিল একখানা ঘর তুলে তেমনি বিনোদের মা আর বউরও বোধহয় আসবাব-পত্রের সাধ মিটাতে হয়েছে নানা আকারের হাঁড়িকুঁড়ি জড় ক'রে আর নানা রঙবেরঙের সিকা তৈরী ক'রে।

রঙ্গীকে নিয়ে সুবল ঘরে ঢুকতেই উপস্থিত সকলের মনে হোল যত তাচ্ছিল্য ক'রে তার নাম উচ্চারণ ক'রেছিল নবদ্বীপ, তত তুচ্ছ করবার মেয়ে এ নয়। মধু সার মেয়ে যে এত সুন্দরী, এটা যেন হঠাৎ আজ সকলের চোখে পড়ল। পনের ষোল বছরের একটি বিবাহিতা মেয়ে,—সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল জ্বল ক'রছে। কিন্তু এই সিঁদুর স্নিগ্ধ মাঙ্গল্যের চেয়ে তার প্রসাধনের উগ্রতাই যেন বাড়িয়ে তুলেছে। কোন্ এক রহস্য রাজ্যের যেন সন্ধান পেয়েছে এই মেয়েটি, কোন্ এক ঐশ্বর্য সম্ভারের, যার জন্য তার অহঙ্কার যেন সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বোধহয় মনে মনে সম্পর্কের হিসাব ক'রে নবদ্বীপ বলল, 'মধুর মেয়ে বুঝি তুমি—তাই

বলো। রেবতীর ছেলে মধু আমার নাতি হয় সম্পর্কে। খুব দূরের নয়। এখনো চার পুরুষের মধ্যে আছে। আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ওর ঠাকুরদার বাবা বাড়ির অংশ নিয়ে ঝগড়া করে ওই ভিটায় গিয়ে ঘর তুলেছিল। বাবার কাছে গল্প শুনেছি। কিন্তু দূরে গিয়ে ঘর বাঁধলেই কি আর আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যেতে পারে। তবে আর রক্তের টানের কথা বলে কেন লোকে, কিন্তু যাই হোক, পূর্বপুরুষে যা করেছে করেছে মধুর বাবার সঙ্গে কোনদিন আমার অসম্প্রীতি ছিল না, বরং বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করত। মধুও হয়েছে তেমনি। বেশ লোক, কোন সাতে পাঁচে নেই। আর এমন খাটুয়ে ছেলে পাড়ায় আর কাউকে দেখবে না তুমি। এখন ভাগ্যে যদি বেড় না পায়, তাহলে আর কি করবে। যাকগে বিষয়টা কি হয়েছিল মা। আমার কাছে আবার লজ্জা করবার মত বয়স হয়েছে নাকি তোমার।'

এ কথায় মাথা নীচু করে মেয়েটি একটু মুচকি হাসল। এ হাসির অর্থ ভাল করে যেন বুঝতে পারল না নবদ্বীপ। কিন্তু একটু পরই নবদ্বীপ আবার অসঙ্কোচে বলে চলল, 'বুঝতে পারছি, পথ দিয়ে আসতে আসতে তোমাকে দেখে কোন ঠাট্টা পরিহাস করতে গিয়েছিল বোধ হয় মুরলী। ওর ওই অভ্যাস। আসলে লোক যে ১ত খারাপ তা নয়, কিন্তু ঠাট্টা পরিহাসের বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই যত বদনাম রটেছে ওর পাড়ায়। মাত্রা রাখতে জানে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ওর নাতনি ঠাকুরদার সম্বন্ধ। বাড়াবাড়ি করতে যদি গিয়েই থাকে, ঝুলে পড়লে না কেন কান ধরে। হতভাগা কোথাকার', বলে নবদ্বীপ হেসে উঠল, দু-একজন জোর করে ঠোঁটের ওপর একটু হাসি টানতে চেষ্টা করলে ও বাকি কয়েকজন সে চেষ্টাও করল না; তাও অবশ্য দৃষ্টি এড়াল না নবদ্বীপের। কিন্তু বেশী ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই। ব্যাপারটার এখানেই যেন শেষ হয়ে গেছে, এরপর আর কিছু বাকি থাকতে পারে না, এমনিভাবেই নবদ্বীপ উঠে পড়ল। 'যাও, বেশ রাত হয়ে গেছে, বাড়ি চলে যাও এখন মা জেঠির সঙ্গে। কিছুর মধ্যে কিছু না মিছামিছি এমন কীর্তন-টাই তোমার মাটি হয়ে গেল বিনোদ। ভগবান গলা সত্যি দিয়েছিলেন বটে তোমাকে। জিজ্ঞেস করে দেখ সুবলকে, এই কীর্তন শোনবার জন্য ওকে আমি বেলা দুপুর থেকে কেবল তাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু যত রাজ্যের বিভ্রাট দেখতো, আমার নেই ভাগ্যে তা তুমি করবে কি। আর কোন কোন মানুষের স্বভাব এমনি যে তিলকে তারা তাল করে তুলবেই। তাদের জ্বালায়'—বলে নসুর মার দিকে একটু কটাক্ষ করল নবদ্বীপ। প্রত্যুত্তরে নসুর মা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবল তাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কথা নয় জেঠি, বাঁড়ি যাও, রাত যথেষ্ট হয়েছে।'

লাঠি গাছটা তুলে নিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'হ্যাঁ রাত বেশ হয়েছে, আর কি অন্ধকার দেখছ, আলোটা ধরে আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে কে? সুবল যাবে? আচ্ছা থাক, দরকার নেই, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে তোমার। বিনোদ তুমিই বল তো কাউকে, আলোটা একটু ধরবে সঙ্গে সঙ্গে।'

বিনোদ বলল, 'চলুন আমিই আসছি।'

সুবল বলল, 'থাক না বিনোদ, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আলো তো আমার সঙ্গেই আছে। জেঠামশাইকে এগিয়ে দিয়ে একটু ঘুরেই যাব না হয়।'

নবদ্বীপ বলল, 'কীর্তন এভাবে ভেঙে যাওয়ার জন্য তোমার চেয়ে আমার দুঃখও কম হয়নি বিনোদ। আচ্ছা নিজের বাড়িতে বসেই একদিন কীর্তন শুনব তোমার; দেখি ভগবান যদি শুনতে দেন কোন দিন।'

বিনোদ সবিনয়ে মাথা নাড়ল। ক্রমশ

সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশী। কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই!" হোম মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে কি যে 'মৃণালের পত্রে'র ইহাই প্রত্যুত্তর? দেখা যাইতেছে যে তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধটি পড়েন নাই অথচ আমাকে টিটকারী দিয়াছেন এই বলিয়া যে, আমি পড়ি নাই! এই প্রত্যুত্তর দীর্ঘ হইয়া পড়িল। "বাস্তব" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম না। বিষয়বস্তু একই।

এই তো 'ভুল'! 'দেশ' পত্রিকায় হোম মহাশয়ের সমালোচনা পড়িয়া উত্তর দিবার আবশ্যক বোধ করি নাই। এজন্য এতদিন নীরব ছিলাম—কিন্তু সম্প্রতি হোম মহাশয় করিয়াছেন কি? এই কাগজের দুর্মূল্যতার বাজারে তাঁহার প্রতিবাদ পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাংবাদিক মহলে ও রবিবাসরের সভাদের, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও পরিচালকদের সকাশে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে আমার কিছু প্রতিপত্তি আছে মনে করিয়াছেন, সেখানে সেখানে ডাক খরচ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা কি রবীন্দ্র প্রীতির নিদর্শন না ব্যক্তি বিশেষকে হেয় করিবার চেষ্টা? ঠিক এই রকম প্রপাগাণ্ডা করিয়াছিলেন তিনি ১৯৩৫ সালে। ঐ সালের ১৮ই আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে পরলোকগত স্যার চিরভুরী চিন্তামণির সভাপতিত্বে যে সর্বভারতীয় সাংবাদিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলাম আমি। কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার উদ্যোগে সাংবাদিকতা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা হয়। অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। হোম মহাশয় অধিবেশনের ঠিক পূর্বদিন অর্থাৎ ১৭ই তারিখে টাউন হলে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একখানা ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা। বিদ্বেষের সেই জ্বালা এতদিন প্রধূমিত ছিল। 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ পড়িয়া তাহাই বহ্নিমান হইয়া উঠিয়াছে। হোম মহাশয় আমাকে হেয় করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি আর আমাকে "দুঃখ" দিবেন না। বহু ধন্যবাদ! তাঁহার অজ্ঞতা বা অহমিকতা কিছুর জন্য আমার দুঃখ নাই। দুঃখ হয় তাঁহার অপরিমেয় নীচাশয়তার পুনরায় পরিচয় পাইয়া। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমৃণালকান্তি বসু।

৪৬, সাউথ এণ্ড পার্ক কলিকাতা।

সুধীর বসু

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে থাকে। গত জানুয়ারী মাসে বরোদাতে সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ ডি এন ওয়াদিয়ার সভাপতিত্বে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে আগামী ১৯৪৩ সালের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ঐ অধিবেশনে এরূপও স্থিরীকৃত হয় যে, তাঁর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক—হয় আর। দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আজ কারারুদ্ধ। যুক্তপ্রদেশের অবস্থাও এরূপ যে, লক্ষ্ণৌ শহরে এবারের অধিবেশন হওয়া সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তাই আগামী অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত স্থগিত না রেখে বর্তমান বৎসরের সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়ার সভাপতিত্বে কলকাতাতেই আহ্বান করবার নিমিত্ত উদ্যোগী হয়েছে। আগামী জানুয়ারী মাসে উহা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে বলে এখন আশা করা যায়।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওহরলালকে আমরা এবার দেখতে পাব না—ইহাতে সবাই দুঃখিত হবেন সন্দেহ নাই। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা আজ দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিজ্ঞানের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণাগারে তাঁর ছাত্র-জীবনের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হয়। যদিও অবস্থা বিপাকে পরে তিনি বিজ্ঞান-চর্চা পরিত্যাগ করে' রাজনীতির দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হন, তথাপি দেখা গিয়াছে, তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে তিনি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই সর্বদা বিচার করে' সমাধান করার পথ খুঁজেছেন। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস যখন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে, বিজ্ঞানের সাহায্যে গোটা দেশকে সংগঠন করবার অভিপ্রায়ে সে-সময় তাঁর উদ্যোগেই জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠিত হয় এবং তিনিই উহার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতবর্ষে শিল্পপতি, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকগণকে এভাবে সমবেত করে' দেশের উন্নতি-সাধনে নিয়োগ করার চেষ্টা ইতিপূর্বে আর হয়নি। বিজ্ঞানের কার্যকারিতায় পণ্ডিত জওহরলালের বিশ্বাস অসীম। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে রজত-জয়ন্তী উৎসব হয়, তা'তে তিনি যে বাণী প্রেরণ করেন, তা' আজও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। "দারিদ্র্য ও ক্ষুধার্তের হাহাকার, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, কু-সংস্কার ও অর্থহীন আচার-ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও অপচয়, অনাহারক্লিষ্ট নরনারী-অধ্যুষিত ধনিকের এই দেশ—ইহার সকল রকম সমস্যার সমাধান একমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। * * * ভারতবর্ষ যেন শুধু বিজ্ঞান-চর্চার নিমিত্তই বিজ্ঞানের আবাসভূমি না হয়, এ-দেশের জনগণের উন্নতিবিধানের জন্যও যেন বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে যখন বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়, তখন আমরা সকলেই এই মনে করে আনন্দ লাভ করেছিলাম যে, এতদিনে রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীর মধ্যে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হ'ল। পণ্ডিত নেহরু কারারুদ্ধ হওয়ায় আমাদের সে আশা পূর্ণ হ'ল না। তবে ভারতের বিজ্ঞানীগণ তাঁর আদর্শ সম্মুখে রেখে বিজ্ঞানকে দেশের যথার্থ কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করবেন—ইহাই আমরা আশা করছি।

বেয়ার্ডের নূতন আবিষ্কার

নিরন্ধ্র অন্ধকারে বা কুয়াসাচ্ছন্ন আবহাওয়াতে শত্রুবিমান আত্মগোপন করে অতর্কিতে আক্রমণ করবার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ আলোকের সাহায্যে এদের সকল সময়ে নিরীক্ষণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। কারণ অন্ধকার বা কুয়াসা ভেদ করে সাধারণ আলোক লক্ষ্যবস্তুকে ঠিক দেখতে পারে না। অন্ধকারভেদী এরূপ আলোকের সন্ধানে বৈজ্ঞানিকগণ তাই অনেক দিন ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, 'টেলিভিসন' বা দূরদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা সুবিখ্যাত স্কচ্ বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড 'নক্টোভিসর' (Noctovisor) নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারেও সব দেখা যেতে পারবে। 'নক্টোভিসর' আসলে 'টেলিভিসন'-যন্ত্রের প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের সমাবেশ মাত্র। ইহা এরূপভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে, সাধারণ আলোকের পরিবর্তে উহা অদৃশ্য ইনফ্রারেড (Infra-Red) রশ্মি দ্বারাই বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। সাধারণ আলোকের চেয়ে ইনফ্রারেড রশ্মির অন্ধকার বা কুয়াসাভেদী শক্তি প্রায় ষোলগুণ অধিক। সাধারণ ক্যামেরায় যেরূপ আলোকচিত্র পর্দায় প্রতিফলিত হয়, 'নক্টোভিসর' যন্ত্রটিতেও তেমনিভাবে প্রতিফলনের ব্যবস্থা আছে এবং দূরবর্তী কোন পর্দায় অনায়াসেই এই চিত্র আবার গৃহীত হতে পারে। বেয়ার্ড প্রথম যখন এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করে' বৈজ্ঞানিক সমাজে উহার কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন, তখন ইহার অভিনবত্ব সকলকে বিস্মিত করলেও ইহা যে অদূর ভবিষ্যতেই তেমন কাজে আসবে কেহ তখন মনে করেনি। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে আজ উহার কার্যকারিতার কথা বিশেষভাবেই ওদেশের সমরবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'নক্টোভিসরে'র মত একটি যন্ত্র যদি যুদ্ধজাহাজে কিংবা বোমারু বিমানে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তা'হলে ঘোর অন্ধকার বা কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতেও উহারা অনায়াসে শত্রু-বিমানের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে। কেহ কেহ বলেন ব্রিটেনের উপকূলে চারিদিকে যদি এরূপ যন্ত্র বসিয়ে রাখা হয়, তবে শত্রুবিমানের আত্মগোপন করে আসবার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে,—অবস্থান নির্ণয় করে তাদের ঘায়েল করাও সহজ হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানী বেয়ার্ডের যুগান্তকারী এই উদ্ভাবনে যে তাঁর যশোগৌরব আরও দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'নক্টোভিসর' যন্ত্রের আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড

'বক্সাইট' খনির সন্ধান

'বক্সাইট' হতে এলুমিনিয়ম ধাতু বেশ ভাল পরিমাণে পাওয়া যায় বলে, এই খনিজ পদার্থ বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধানকার্যে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ বহু দিন ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি ভূতত্ত্ব বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক রেকর্ড হতে জানা যায় ইস্টার্ণ স্টেটস্ এজেন্সির অন্তর্গত ছোটনাগপুরের যশপুর রাজ্যে বিরাট বক্সাইট খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই খনিজ পদার্থটিতে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ছাড়াও লৌহ, টিটেনিয়ম, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড বেশ আছে। এলুমিনিয়ম অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০।৬০ ভাগ হবে, টিটেনিয়ম অক্সাইডও শতকরা ১৪ ভাগের মত। এই খনিতে কাজ সুরু করবার তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছে এবং আশা করা যায় এই আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এলুমিনিয়ম শিল্পের প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। তবে অসুবিধা এই যে, যে স্থানে বক্সাইট খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা অত্যন্ত দুর্গম। স্থানটির ৮০ মাইলের মধ্যেও কোন রেল স্টেশন নেই, সুতরাং মালামাল আনা নেওয়ার অসুবিধা অত্যধিক। এই সব প্রাথমিক অসুবিধা দূর করে এই প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা যে অচিরেই হবে ইহা আমরা আশা করতে পারি।

শিল্পোন্নতির বাধা কোথায়!

বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি শিল্প সম্পদে কতই না উন্নতি লাভ করেছে! কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশকে শিল্প বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করার কোন পথই এ পর্যন্ত উন্মুক্ত হল না! আজ যুদ্ধের হিড়িকে আমরা বেশ টের পাচ্ছি—আমাদের ঘরে কত অভাব! দেশে এত কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ ক্ষেত্রে সময় মত তার সুযোগ গ্রহণ কর্তে না পারায় আমরা আজ পদে পদে কত জিনিসেরই না অভাব অনুভব কচ্ছি! ভারতে শিল্পোন্নতি কম দিন সুরু হয়নি, বিজ্ঞান কর্মীর অভাবও এখন খুব বেশী নেই; অথচ আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' যেন থেকে যাচ্ছি। এর প্রধান কারণ এই যে, শিল্পোন্নতিতে এদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক ইহা সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর অভিপ্রেত নহে। যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের এ মনোভাব এবার আরও স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়েছে।

ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের কোন তফাৎ নেই, কিন্তু এখানে অবস্থা অন্যরূপ। বিদেশী শাসকের দল নিজেদের স্বার্থ বজায়ের ব্যবস্থা ঠিক করে তবেই কাজে হাত দেয়। ফলও তাই তদনুরূপ হয়ে থাকে। জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে বিলাতের অনুকরণে এদেশেও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু যে গঠনবিধি অনুযায়ী ঐ সব প্রতিষ্ঠান এদেশে পরিচালিত হয়, তাতে ওদেশের মত ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান হতে তেমন কাজ পাওয়া একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের 'ডিপার্টমেণ্ট অব সয়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' আর ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে গঠিত "বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ"—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রচারিত উদ্দেশ্য এক হলেও বিলাতী প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় ওদেশে শিল্পোন্নতির যেরূপ প্রসার হচ্ছে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি হতে তার সিকি ভাগের একভাগ কাজও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! বিলাতের বোর্ডটিতে গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত যে 'কাউন্সিল' আছে তাতে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বে-সরকারী বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যাই বেশী; উহার চেয়ারম্যান হতে আরম্ভ করে সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই নামজাদা বৈজ্ঞানিক; সুতরাং তাঁহারা যে সব বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বা যেভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করার নির্দেশ দেন, তদনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। এই পরামর্শ-সমিতির নির্দেশে কোথাও কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কথা শুনা যায় না।

আমাদের দেশের ব্যাপার অন্যরূপ। এখানে বোর্ড যেভাবে গঠিত হয় তাতে শিল্পপতি ও সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যাই বেশী। বে-সরকারী বৈজ্ঞানিক অল্পই বোর্ডে স্থান পেয়ে থাকেন। বাণিজ্য সচিব এই বোর্ডের চেয়ারম্যান, কাউন্সিল এবং 'গভর্নিং বডি'র যে দুজন সেক্রেটারী, তাদেরও একজন সিভিলিয়ান অপরজন ফাইনেন্স অফিসার। কর্মব্যস্ত বাণিজ্যসচিব মহাশয়ের সময় ও সুযোগমত বোর্ডের অধিবেশন হয়। সমস্ত কার্যতালিকা এরূপ যে কোন একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে গড়ে বোর্ডের দুইটি ও কাউন্সিলের একটি করে সভা করা দরকার হয়। সুতরাং বাণিজ্য-সচিব ও উচ্চ রাজকর্মচারিগণ একই বিষয়ে বার তিনেক বিবেচনার সুযোগ লাভ করার পরে হয়তো ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে; এরূপ দেখা যায়—একটি বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত হতে প্রায় এক বৎসর দেড় বৎসরের মত সময়ও অতিবাহিত হয়। ফলে এই হয়—যিনি পরিকল্পনা পেশ করেন, অতদিনে তাঁরও উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে আসে, কাজ আর তেমন এগোয় না। অথচ বিলাতের মত এদেশেও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠাবান্ বৈজ্ঞানিকদের নিয়েই বোর্ড গঠিত হতে পারে; কিন্তু তাঁদের হাতে এ সব ছেড়ে দিলে পাছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের হানি ঘটে, এ কারণে সরকারী বোর্ড "স্টীল ফ্রেমের" মধ্যেই নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান তেমন থাক আর না থাক—সরকারী সিভিলিয়ান কর্মচারীদের কর্তৃত্বে অন্তত স্বার্থহানির আশঙ্কা নেই।

যুদ্ধের ঢেউ আজ ভারত সীমান্তে এসে পেঁাছেচে। যুদ্ধারম্ভের পর হতেই এদেশে বিবিধ শিল্প যাতে গড়ে উঠে তার ব্যবস্থা করার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট বহু আবেদন, নিবেদন, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এদেশের কাঁচামাল নিরেট লোক ও তদুপরি ব্যবসায়ের বাজারের লোভ সাম্রাজ্যবাদীদের আজও যায়নি। "তোমরা কাঁচামাল জন্মাবে, আমরা তা থেকে দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করে, তোমাদের দেশে এনে ব্যবসা করব"—এ মনোভাব যতদিন না বদলাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক উন্নতি এ দেশে ততদিন সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়।

৬ই ডিসেম্বর

প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা ও ব্যবহার শাস্ত্র বিশারদ স্যার মন্মথনাথ মুখোর্জি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বন্যা ও ঝটিকা বিধ্বস্ত মেদিনীপুর জেলার অবস্থা সম্পর্কে বাঙলা সরকার একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্তাহারে বিশেষভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলেই তথায় সরকারী সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে নাই এবং এখনও পারিতেছে না।

৭ই ডিসেম্বর

বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কার্যকাল আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর

বোম্বাই ভারতীয় বণিক সমিতির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশে দশ লক্ষ টন খাদ্যবস্তুর অভাব হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সিংহলে খাদ্য শস্য রপ্তানি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। ইরাক ও ইরাণে আমাদের সৈন্যদের প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি ছাড়া সিংহলে খুব অল্পই প্রেরিত হয়। সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে সিংহলে মাত্র ৩৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—রায়পুর ডিস্ট্রিক্ট জেলের প্রাচীর বৈদ্যুতিক তার সংযোগে তিন স্থানে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। উহার ফলে প্রাচীরের সামান্য ক্ষতি হয়।

১০ই ডিসেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—পুণার সংবাদে প্রকাশ, জনতা সেলোলী রেলওয়ে স্টেশন-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে সমস্ত স্টেশন-গৃহটি একেবারে ভস্মীভূত হয়। বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী সারণ জেলার গরখা থানা ধ্বংস করিবার জন্য জনতাকে প্ররোচিত করার অভিযোগে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটস্থ পুলিশ আদালতে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত কে সি লাহা যখন বিচারকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন যুবক অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। এই ব্যাপারে আদালত গৃহে প্রবল চাঞ্চল্য হয়। আততায়ী ধৃত হইয়াছে।

১১ই ডিসেম্বর

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই প্রদেশে এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য না থাকায় বাঙলা দেশ হইতে চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি করা হইবে না।

পাবনার সংবাদে প্রকাশ, চাউলের নির্ধারিত মূল্য প্রতি মণ ১০ টাকা থাকিলেও গত বুধবার দিন স্থানীয় চাউল ব্যবসায়িগণ চাউলের মূল্য প্রতি মণ ১৫৲ টাকা চড়াইয়া দেওয়ায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গতকল্য রাত্রে এক জনতা একখানি দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বস্তা চাউল ও এক বস্তা আলু লুঠ করে।

১২ই ডিসেম্বর

অদ্য কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ভবনের একটি কক্ষে দেশী বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুইজন লোক আহত হইয়াছে। উক্ত কক্ষের প্রাচীর ও কক্ষ মধ্যস্থ জিনিসপত্রের ক্ষতি হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ দলের প্রতি নিক্ষিপ্ত একটি বোমার আঘাতে একজন পুলিশ কনেস্টবল নিহত এবং আরও দশজন পুলিশ ও একজন পথচারী আহত হয়। এই সম্পর্কে মোট ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হুবলীর (বোম্বাই) সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রে এম এণ্ড এস এম রেলওয়ের হুবলী গুণ্টাকল শাখার কানাগিনা হল এবং হরলাপুর স্টেশনের গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়াছে।

বাঙলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন—বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, এই জেলার খণ্ডকোষ থানার অধীন উকরিদের ইউনিয়ন বোর্ড এবং ঋণ-সালিশী বোর্ডের অফিস আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই ডিসেম্বর

নাভার ভূতপূর্ব মহারাজা রিপুদমন সিংহ কিছুদিন রোগ-ভোগের পর গতকল্য কোদাইকানালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে কোদাইকানালে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

অদ্য অপরাহ্ণে উত্তর কলিকাতায় বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের মধ্যে কতকগুলি যুবক হানা দিয়া পটকা নিক্ষেপ করে এবং প্রকাশ যে, ঐ পটকাগুলি তীব্র শব্দে বিস্ফোরণের ফলে যে ধূম্রজাল ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে উক্ত যুবকগণ নাকি মণি-অর্ডার কাউণ্টার হইতে প্রায় এক হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। পটকাগুলির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্যাদিপূর্ণ কতকগুলি শিশি-বোতলও নাকি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পটকাগুলি বিস্ফোরণের ফলে এবং বোতলের ভাঙ্গা টুকরাদিতে উক্ত পোস্ট অফিসের ৪ জন কর্মচারী সামান্য আহত হইয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক অধিবেশনে বাঙলা দেশে চাউল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভূতপূর্ব মূল্য বৃদ্ধি এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতার নাগরিক ও করদাতাদের দারুণ দুর্গতির বিষয় আলোচনা হয় এবং এই শঙ্কাজনক অবস্থার প্রতিকারকল্পে কতক-গুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতা ও বাঙলা দেশ হইতে ভবিষ্যতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করার জন্য একটি প্রস্তাবে গভর্নমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় এবং ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহার্থে একটি বিশেষ পরিকল্পনা রচনার জন্য কর্পোরেশন একটি স্পেশাল কমিটি গঠন করেন।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—কোলাপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে এক সশস্ত্র জনতা ভাদারগড় তালুক ট্রেজারী আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলী চালনা করে। ফলে জনতার ছয়জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। সাতারার সংবাদে প্রকাশ, এম এণ্ড এস এম রেলওয়ের পুণা-মীরাজ শাখার একটি স্টেশন অগ্নিসংযোগের ফলে একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে।

১০ই ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর খবরে প্রকাশ, কয়েক দিন অপেক্ষাকৃত মন্দা থাকার পর স্টালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে রুশ সৈন্যেরা আবার নবোদ্যমে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। জার্মানদের খবরে প্রকাশ যে ভলগা এবং ডন নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় রুশরা ক্রমাগত জোর আক্রমণ চালাইয়াছে। পশ্চিম ককেশাসে যে সকল জার্মান সৈন্য আগাইয়া গিয়াছে, তাহাদের সরবরাহে সকল দিক দিয়াই অসুবিধা হইতেছে বলিয়া অদ্য জার্মান বেতারে বলা হইয়াছে।

তিউনিসিয়া—উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, গত ৭ই ডিসেম্বর তেবুরবার নিকট জার্মান ও মার্কিন বাহিনীর মধ্যে বৃহত্তম সংঘর্ষ হয়। প্রথমত মার্কিন বাহিনী কিছু পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু প্রচণ্ড হানা দিয়া জার্মান বাহিনীকে রাত্রির অন্ধকারে পিছু হটিতে বাধ্য করে। এই সংঘর্ষে অনুমান ৪ শত জার্মান নিহত হয়। তিউনিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে সকল প্যারা-সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল, উহারা ধ্বংসকার্যে নিরত আছে।

নিউগিনি—অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন পার্লামেন্টে জানান যে, মিত্রবাহিনী সমগ্র গোনা এলাকা অধিকার করিয়াছে।

১১ই ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য অপরাহ্নে কতকগুলি জাপ বোমারু বিমান চট্টগ্রামের উপর অল্প ক্ষণ আক্রমণ চালায়। অ-সামরিক অধিবাসিগণ ধীরভাবে আশ্রয়স্থলে যায় এবং কতকগুলি বোমা পড়িলেও ক্ষতি সামান্যই হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যাও অতি সামান্য। বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ জাপানী বিমানগুলিকে বাধা দেয় এবং বহুবার আকাশযুদ্ধ হয়। ফলে তিনখানি জাপ বিমান ধ্বংস এবং দুইটি বৃটিশ বিমান ভূপাতিত হয়।

রুশ রণাঙ্গন—জার্মান সরকারী নিউজ এজেন্সী স্বীকার করিয়াছে যে, ভেলিকিলুকির উত্তরে বড় ট্যাঙ্ক বাহিনীসহ রাশিয়ানরা আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং তাহারা জার্মান ব্যূহ ভেদের চেষ্টা করিয়াছে—একথা জার্মান মুখপাত্র স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মধ্য ককেশাসে এক নৈশ আক্রমণে লালফৌজ জার্মান ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

তিউনিসিয়া—উত্তর আফ্রিকার মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহায়তাপুষ্ট হইয়া শত্রুপক্ষীয় পদাতিক বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া মেজেজ-এল-বারের দিকে দুই দিক হইতে আক্রমণ চালায়। মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর আক্রমণে উহারা পশ্চাদপসরণ করে এবং উহাদের প্রভূত ক্ষতি হয়। মেজেজ এলবার তেবুরবার ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

১২ই ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—বার্লিন নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ জেনারেল জুকভের বাহিনী বেলিয়াই এলাকায় পৌঁছিয়াছে। এই শহরটি স্মোলেনস্কের ৭৫ মাইল উত্তরে এবং রজেভের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আরও প্রকাশ যে, প্রবল রুশ পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী রজেভ এলাকায় সমবেত হইতেছে; এখানে বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে সারাদিনব্যাপী আক্রমণ চলে। রয়টারের বিশে[ষ] সংবাদদাতা বলেন যে, স্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে অবরুদ্ধ সৈন্যদের মু[ক্ত] করার জন্য জার্মানগণ দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে হয় তাহাদের পাল্[টা] আক্রমণ শুরু করিয়াছে নতুবা শীঘ্রই উহা শুরু করিতে যাইতেছে।

নিউগিনি—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা হইতে মিত্রপক্ষের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গোনা মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

লিবিয়া—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল কোয়েনিগ পরিচালিত ফরাসী যুদ্ধরত সৈন্যেরা বীরহাকিম দখল করিয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে স্ট্যালিনগ্রাদের কলকারখানা অঞ্চলে এবং উপকণ্ঠে সোভিয়েট সৈন্যদল শত্রু ঘাঁটির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া ক্ষতি সাধন করিয়াছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণপশ্চিমে এবং ভেলিকিলুকির পূর্বে জার্মানরা প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্মান বেতারে গত রাত্রে বলে যে, রুশ সৈন্যেরা কালিনিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বলা হয় যে, রুশ সৈন্যেরা "সংখ্যায় অনেক বেশী" 'প্রাভদা' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত লালফৌজ ৮০ লক্ষেরও বেশী জার্মান সৈন্য হতাহত করিয়াছে। মস্কোর বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, ১৯শে নভেম্বর হইতে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুপক্ষের মোট নিহত সৈন্যের সংখ্যা ৯৪ হাজারেরও বেশী। উক্ত সময়ের মধ্যে স্টালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের ৭২৪০০ জন সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে।

আফ্রিকার যুদ্ধ—উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মেজেজ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের অগ্রগতির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মরক্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, দক্ষিণে জানাতের নিকটে আলজিয়ার্স এবং ত্রিপলি-তানিয়ার সীমান্তে ফরাসী সৈন্যেরা সুরক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

১৪ই ডিসেম্বর

লিবিয়া—কায়রোতে সরকারীভাবে জানান হয় যে, এল আঘেইলার সুদৃঢ় ঘাঁটিসমূহ হইতে জেনারেল রোমেল বিতাড়িত হইয়াছেন এবং তিনি সসৈন্যে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিতেছেন।

১৪ই ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—রুশরা বৃহৎ ট্যাঙ্কবহর লইয়া রজেভের দক্ষিণে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। স্টালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ সৈন্যদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে।

১৫ই ডিসেম্বর

নিউগিনি—জেনারেল ম্যাক আর্থারের বাহিনী কর্তৃক বুনা অধিকৃত হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রজেভের পশ্চিমে জার্মানরা দিবারাত্রি পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। লালফৌজ প্রায় নিকভো পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা স্টালিনগ্রাদ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে চাপ বাড়াইয়াছে।

১০ মিনিট তখনও বাকী এইরূপ সময় বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলেন। জয়লাভ যখন সুনিশ্চিত তখন বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণ ভীত বা সন্ত্রস্থ হইয়া খেলিবেন কেন? তাঁহারা বিপুল উদ্যমে খেলিয়া ৩ উইকেটে ১২০ রান সংগ্রহ করিলেন। বিহার দলের বরাত জোর যে, মাত্র ১৬ রানের জন্য খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইলেন না। ১০ মিনিট খেলা চলিলেই উহা সংঘটিত হইতে পারিত। ফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ও বাঙলা দল তিনদিনের খেলায় নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়লাভ করেন।

খেলার বিবরণ

বিহার দল টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করেন। প্রথম উইকেট মাত্র ১৮ রানের সময় পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার পর শান্তি বাগচি ও কল্যাণ বসুর জন্য রান উঠিতে আরম্ভ করে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বিহার দলের ১ উইকেটে ৮৭ রান হয়। শান্তি বাগচি ১১০ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। বিশ্রামের পর বিহার দলের অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি উইকেট পড়িয়া যায়। শান্তি বাগচি দলের প্রথম খেলোয়াড় ৭৫ রান করিয়া আউট হন। এস ব্যানার্জি (ছোট) ও বিজয় সেনের প্রচেষ্টায় পুনরায় রান উঠিতে থাকে। ১১৪ রানের সময় এস ব্যানার্জি (ছোট) আউট হন। চা পানের সময় বিহার দলের ৫ উইকেটে ২১২ রান হয়। দিনের শেষে বিহার দল ৬ উইকেটে ২৪৭ রান করিতে সক্ষম হয়। বিজয় সেন ৪৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় খেলা আরম্ভ হইলে সকলেই আশা করিতে থাকেন বিহার ৩০০ রান পূর্ণ করিবেন। কিন্তু কুচবিহারের মহারাজার বোলিং কার্যকরী হওয়ায় বিহার দলের প্রথম ইনিংস ২৭১ রানে শেষ হয়। বাঙলা দল খেলা আরম্ভ করে। কোন রান হইবার পূর্বে প্রথম উইকেট ও চার রানের সময় দ্বিতীয় উইকেট হারায়। তৃতীয় উইকেটের পতন হয় ১৮ রানের সময়। বাঙলা দল পরাজিত হইবে এই আশঙ্কাই সকলে করিতে থাকেন। কিন্তু নির্মল চ্যাটার্জি ও হার্ভেজনস্টন একত্রে খেলিয়া রান তুলিতে থাকেন। এন চ্যাটার্জি কয়েকবার আউট হইবার সুযোগ দিয়াও রান তুলেন। এক ঘণ্টার খেলায় বাঙলা দলের ৫০ রান হয়। ইহার অল্প পরেই বিহার দলের অধিনায়ক এস ব্যানার্জি এন চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে এল বি ডবলিউ আবেদন করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া মাথার টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। নিখিল ভারতের খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় এস ব্যানার্জির এই আচরণ দর্শকগণকে ভীষণ উত্তেজিত করে। ধিক্কার ধ্বনিতে মাঠ ছাইয়া যায়। এস ব্যানার্জির পক্ষে বল করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাঙলা দলের অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বাঙলা দলের ৩ উইকেটে ৬২ রান হয়। ইহার পর খেলা আরম্ভ হইলে দ্রুত রান উঠিতে আরম্ভ করে। হার্ভেজনস্টন ৭৫ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। ১০৬ মিনিটে বাঙলা দলের ১০০ রান পূর্ণ হয়। এন চ্যাটার্জিও ১২৮ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। ১৭৯ রানের সময় হার্ভে-জনস্টন ১২৫ মিনিট খেলিয়া আউট হন। এই দুইজন খেলোয়াড়ের প্রচেষ্টায় ১৬১ রান সংগৃহীত হয়। বাঙলা দলের অধিনায়ক কার্তিক বসু খেলায় যোগদান করেন। কিন্তু তিনি সকলকে হতাশ করিয়া মাত্র ৫ রান করিয়া আউট হন। মঙ্গলবার ৫টি উইকেট ১৮৮ রানে পড়িয়া যায়। কুচবিহারের মহারাজা খেলায় যোগদান করেন ও রান উঠিতে থাকে। ১৭৫ মিনিটে ২০০ রান পূর্ণ হয়। চা পানের সময় বাঙলা দলের ৫ উইকেটে ২৩০ রান হয়। এন চ্যাটার্জি ৯৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চা পানের পর খেলা আরম্ভ হইলে এন চ্যাটার্জি ১৯২ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ১০০ রান পূর্ণ করেন। ২৪২ রানের সময় তিনি আউট হন। এম মুস্তাফ খেলায় যোগদান করেন। তিনিও সকলকে হতাশ করিয়া ২৫৩ রানের সময় মাত্র ৬ রান করিয়া আউট হন। পি ডি দত্ত খেলায় যোগদান করিলে রান উঠিতে আরম্ভ করে। কুচবিহারের মহারাজা দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রান তুলিতে থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে মহারাজা ও পি ডি দত্ত একত্রে বিহারের রান সংখ্যা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। দিনের শেষে বাঙলা দলের ৭ উইকেটে ২৮০ রান হয়। কুচবিহারের মহারাজা ৪৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলার সূচনায় পুনরায় বাঙলা দলের উইকেট দ্রুত পড়িতে আরম্ভ করে। মাত্র অর্ধ ঘণ্টা খেলা চলিবার পর বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস ৩১২ রানে শেষ হয়। কুচবিহারের মহারাজা ৭১ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি আর ২০ মিনিট খেলিবার সুযোগ পাইলে নিজস্ব শত রান পূর্ণ করিতে পারিতেন।

বিহার দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রথম হইতেই দ্রুত রান তুলিবার জন্য চেষ্টা করে। কোন রান হইবার পূর্বে প্রথম উইকেট ও ৪১ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায়। তৃতীয় উইকেট ৭৯ রানে, চতুর্থ উইকেট ৮০ রানে ও পঞ্চম উইকেট ১০৩ রানে হারায়। ষষ্ঠ উইকেট ১১০ রানে পড়িয়া যায়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ৬ উইকেটে ১১০ রান হয়। ইহার পর সপ্তম উইকেট ১৩৮ রানে, অষ্টম উইকেট ১৪০ রানে ও নবম উইকেট ১৬৮ রানে পড়িয়া যায়। ৯ উইকেটে ১৭৬ রান হইলে বিহার দল ডিক্লেয়ার্ড করে। বিজয় সেন পুনরায় ২৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

খেলা শেষ হইতে ৯০ মিনিট বাকী এই সময় বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। পুনরায় প্রথম দুইটি উইকেট ২০ রানে পড়িয়া যায়। নির্মল চ্যাটার্জি জব্বরের সহযোগিতায় ৭৬ রান করিতে সক্ষম হন। হার্ভেজনস্টন খেলায় যোগদান করিলে পুনরায় দ্রুত রান উঠিতে আরম্ভ করে। ৭৭ মিনিট খেলিয়া নির্মল চ্যাটার্জি নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করেন। উক্ত রানের মধ্যে তিনি খেলার একমাত্র ওভার বাউন্ডারী করিয়া দর্শকগণকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে বাঙলা দলের ৩ উইকেটে ১২০ রান হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তিনদিনের খেলার নিয়মানুসারে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাঙলা দল বিজয়ী হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

বিহার দলের প্রথম ইনিংস ঃ—২৭১ রান (এস বাগচি ৭৫, কল্যাণ বসু ২৪, এস ব্যানার্জি (ছোট) ৩৪, কে ঘোষ ৩৬, বিজয় সেন নট আউট ৫৬ রান; কুচবিহারের মহারাজা ২৯ রানে ৩টি, পি ডি দত্ত ৩৮ রানে ৩টি, এস মুস্তাফি ৫০ রানে ১টি, কে ভট্টাচার্য ৩৭ রানে ১টি, এস দত্ত ৫৬ রানে ১টি ও এন চ্যাটার্জি ৩৫ রানে ১টি উইকেট পান)

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংসঃ—৩১২ রান (নির্মল চ্যাটার্জি ১০৪, হার্ভেজনস্টন ৮৭, কুচবিহারের মহারাজা ৭১ রান নট আউট। এস ব্যানার্জি ৯২ রানে ৩টি, এন চৌধুরী ১০০ রানে ৭টি উইকেট পান)

বিহার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—৯ উইঃ ১৭৬ রান (এডমান্ডস ২২, এস ব্যানার্জি ২১, এস ব্যানার্জি (ছোট) ২৮, কল্যাণ বসু ২১, ডি খাম্বাটা ২১, বিজয় সেন নট আউট ২৬; কুচবিহারের মহারাজা ৪২ রানে ৪টি, এস দত্ত ৪৩ রানে ৩টি ও কে ভট্টাচার্য ৪৩ রানে ১টি উইকেট পান)

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৩ উইঃ ১২০ রান (জব্বর ২১, এন চ্যাটার্জি নট আউট ৬৪ রান, এন চৌধুরী ১৬ রানে ২টি, কে ঘোষ ২৬ রানে ১টি উইকেট পান)

রণজি ক্রিকেটের পূর্বাঞ্চলের খেলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের বাঙলা বনাম বিহার দলের খেলা শেষ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে বাঙলা দল প্রতি বৎসর বিহার দলকে পরাজিত করিয়া যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এই বৎসর তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। বিহার দল পুনরায় খেলায় পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বিহার দল গত বৎসরের ন্যায় তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়ে নাই। খেলা আরম্ভ হইলে বাঙলা দলের বোলারগণকে বিব্রত করিয়া বিহার দল যেভাবে রান তুলিতে সক্ষম হয় এবং বাঙলা দলের খেলা আরম্ভ হইলে যেভাবে অল্প রানের মধ্যে পর পর তিনটি উইকেট পতন সম্ভব করে তাহাতে বাঙলার অতি বড় সমর্থক পর্যন্ত বাঙলার পরাজয় ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় বিহার দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে "ক্যাচ" না ধরিতে পারা মারাত্মকরূপে দেখা না দিলে বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণ অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ সময় বিহার দলের খেলোয়াড়গণের ত্রুটি বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণকে যে সুযোগ দিল তাহাই জয়লাভের পথ সুপ্রশস্থ করিল। বাঙলা দলের নির্মল চ্যাটার্জি পাঁচ পাঁচটি ক্যাচ তুলিয়া আউটের সহজ সুযোগ দিয়া নিজস্ব শতাধিক রান করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার সহযোগী খেলোয়াড় হার্ভে জনষ্টন দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রান তুলিলেন। দুইজন খেলোয়াড়ের প্রচেষ্টায় বাঙলা দল ১৬১ রান লাভ করিল। ঐ রান সংখ্যা বাঙলা দলকে এইরূপ শক্তি দান করিল যে পরবর্তী খেলোয়াড়গণ অল্পায়াসেই বিহার দলের অর্জিত প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন। তিন দিনের খেলায় সাধারণত প্রথম ইনিংসের ফলাফলই জয় পরাজয় নির্ধারিত করে। সুতরাং বাঙলা দলকে প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হইতে দেখিয়া বিহার দলের খেলোয়াড়গণ জয়লাভের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সেইজন্য উক্ত দলের খেলোয়াড়গণকে নিরুৎসাহ হৃদয়ে খেলিতে দেখা গেল। অধিনায়কের উৎসাহে ও প্ররোচনায় তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত রান তুলিয়া বাঙলা দলকে পরাজিত করিবার শেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা সফল হইল না। বাঙলা দলের বোলারগণ প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়ার শক্তিতে উৎসাহিত হইয়া বিপুলভাবে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিলেন। ৯টি উইকেট হারাইয়া বিহার দল মাত্র ১৭৬ রান সংগ্রহ করিতে পারিলেন। এই সময় বিহার দলের অধিনায়ক ডিক্লেয়ার্ড করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের

রণজি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাঙ্গলা দলের খেলোয়াড়গণ

রণজি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিহার দলের খেলোয়াড়গণ

দেওয়া হচ্ছে। এ সপ্তাহের কথাই ধরুন না,—নতুন বাঙলা ছবি যে কখানা চলেছে তার প্রত্যেকখানিতে প্রধান অভিনয়শিল্পীদের কয়েকজনকে পাবেনই। অভিনয়শিল্পীরা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের যতই পরিচয় দিক্ না কেন একই ব্যক্তিকে প্রতি ছবিতে দেখতে থাকলে ছবির বৈচিত্র্য যে অনেকখানি কমে যায়, একথা স্বীকার করতেই হবে। আর বৈচিত্র্য গেলে ছায়াছবির থাকে কি!

'পুণ্যস্মৃতি,'—শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থানঃ প্রবাসী কার্যালয়, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে যে সাহিত্য রচিত হইতেছে, 'পুণ্যস্মৃতি' তাহার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। সম্প্রতি রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। এই উপকরণের মূলে 'পুণ্যস্মৃতি'র দান সামান্য নহে। লেখিকার শৈশবকাল হইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। শিশুমনের আবেগে দিয়া যে দৃষ্টিতে তিনি কবিকে দেখিয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পুস্তকখানি আগাগোড়া অপূর্ব শুচিতার ভাবে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিমূলক দুই একটি ছাড়া অপর কোন পুস্তক এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা পরিপূর্ণ অধ্যায় লেখিকা আমাদের নিকট অর্ঘ্যরূপে ধরিয়া দিয়াছেন। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে যে শিশুপ্রীতি, ছাত্রবাৎসল্য, অতিথিপরায়ণতা, অদম্য কর্মপ্রচেষ্টা লুক্কায়িত ছিল, তাহার রহস্য এ পর্যন্ত জনসাধারণের একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

ইহা ছাড়া একটা 'ক্রনিক্‌ল' হিসাবে পুস্তকখানি অমূল্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, প্রতিমা দেবী ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। কবির কয়েকখানি ভাবসমৃদ্ধ আলেখ্য পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। সর্বোপরি লেখিকার সহজ-সুন্দর ভাষা কোথায়ও জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইহার বিরুদ্ধে একমাত্র বলিবার আছে যে, কার্ডবোর্ডে বাঁধা হইলে ইহার শ্রী আরও বৃদ্ধি পাইত।

Boatman Boy—শ্রী শচী রৌথ রয় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান ঃ বুক ফোরাম, ৩০।২, শশিভূষণ দে স্ট্রীট। মূল্য ১৷৷৹।

আলোচ্য পুস্তকখানি মূল উড়িয়া কবিতা হইতে শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমে অনুবাদকের বক্তব্য ও গ্রন্থকারের ভূমিকা আছে।

শ্রী শচী রৌথ রয় উড়িষ্যার বিদ্রোহী কবি। তাঁহার কাব্যে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার সুর এবং নিগৃহীত ও নিপীড়িত মানবাত্মার মর্মবেদনা ধ্বনিত হইয়াছে। ১৩৩৮ সালে ঢেনকানাল রাজ্যে যে প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছিল, এবং বাজী রৌথ নামক দশমবর্ষীয় নাবিক-বালক যে অদ্ভুতপূর্ব বীরত্বের সহিত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, 'Boatman Boy' তাহারই প্রতীক। ইংরেজী অনুবাদটি সুন্দর হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

ম্যালেরিয়া ঃ—রসাচার্য শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ, স্মৃতিতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য, বি-এ; কার্যাধ্যক্ষ—চিরঞ্জীব ঔষধালয়; ১৭০, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আয়ুর্বেদ বিষয়ে কয়েকখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানায় আয়ুর্বেদের দিক হইতে প্রগাঢ়ভাবে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত ম্যালেরিয়া রোগের নিদানতত্ত্ব এবং তাহার ভেষজ-ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কার্যে গ্রন্থখানা বিশেষ সহায়ক হইবে। অন্যান্য পাঠকেরা গ্রন্থখানা পাঠ করিলে ম্যালেরিয়া নিবারকণে স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রপন্ন-কল্পবল্লী—(ভগবন্নিম্বার্কাচার্য বিরচিত) শ্রীনির্মলচন্দ্র নাগ কর্তৃক প্রপন্নসুরতরুমঞ্জরী অবলম্বনে ব্যাখ্যাত। প্রাপ্তিস্থান—মহান্ত ব্রজবাসী শ্রীরাম বিহারীসরণ দেব গোস্বামী, পোঃ জয়দেব কেন্দুবিল্ব। জেলা বীরভূম।

শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্যের প্রপন্নকল্পবল্লী সকলের পক্ষে সহজগম্য নয়, সাধনার অন্তর্নিহিত গূঢ় অনুভূতিতে উহা দুরবগাহ। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যায় শরণাগতির সে তত্ত্ব উপলব্ধি করা পাঠকদের পক্ষে সুগম হইবে। বৈষ্ণব সাধনার তাৎপর্য সংক্ষেপে অথচ মোটামুটি সর্বাঙ্গীনরূপে উপলব্ধি করিতে এই পুস্তিকাখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। এমন সদালোচনার সমাদর হওয়া উচিত।

সমাজ ও সহধর্মিতা- শ্রীসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত কুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

গ্রন্থকার ১৯১৬ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই কয়েক বৎসর রাজবন্দী স্বরূপে নির্জন কারাকক্ষ হইতে ব্যক্তি ও স্ব সমাজের সম্পর্ক লইয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট যে সকল পত্র লিখেন, তাহারই কয়েকখানা বর্তমানে আলোচ্য পুস্তকের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জগতের প্রধান প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ মনীষীদের এতৎসম্পর্কিত বিচারের দ্বারা গীতার আদর্শকেই সমর্থন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের সঙ্গে আমাদের মতদ্বৈধ নাই। আমরা শুধু এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, গীতায় যে চাতুর্বর্ণ্য সমাজের আদর্শের কথা বলা আছে, সে আদর্শ বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। বিরাট স্বরূপে সমষ্টির সেবার আদর্শের দ্বারাই সমাজ যখন পরিচালিত হইত, তখন সেই বিরাটের অঙ্গাঙ্গী স্বার্থসংশ্লিষ্ট আত্মনিবেদনের পথেই সে আদর্শ বিধৃত ছিল। সে আদর্শ রক্ষার জন্য ছিল, ব্রাহ্মণের যজ্ঞার্থ-প্রেরণা পরিচালিত রাষ্ট্র। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তাহা হারাইয়াছে। মনীষীদের মহৎ প্রেরণা স্বীয় সমাজকে সংস্কৃত এবং পরিবর্তিত করিয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ভারতের সভ্যতার ধারা বা স্বধর্মকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। পরাধীন ভারতে সমাজের স্বাভাবিক সে ক্রমাভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। "আত্মনিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ ও নির্বাঢ় স্বাধীনতা ভোগ যে সমাজের আছে, সেই সমাজই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র না থাকিলে সমাজে ধর্মও সত্য থাকে না। ভারতের স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে আজ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন স্বাধীনতা। পরাধীনতার বাধা সত্ত্বেও নৈতিকশক্তির বলে চাকা ঘুরাইয়া আমরা ভারতের সুদিন আনিতে পারিব, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

আশা—মাসিক পত্র। কার্তিক সংখ্যা। কার্যালয় আবদুলাশ লেন, বাঁকীপুর, পাটনা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

আলোচনাংশ মন্দ নয়। সম্পাদক জানাইয়াছেন, বৃহত্তর বঙ্গের সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থিক প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ের আলোচনা 'আশা'র প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। এই দিক হইতে আমরা অধিক কিছু আশা করি।

শিল্প-সম্পদ বার্ষিকী (১৩৪৯-৫০)—শ্রীকমলচন্দ্র নাগ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—শিল্প-সম্পদ প্রকাশিনী। ১৫১সি, নীরোদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাঙলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে পাওয়া যাইবে।

বন্ধুলীলার মহানাম সম্প্রদায়—ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত কার্যালয়, ২৯, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা।

প্রভু জগদ্বন্ধুর সেবক মহানাম সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং ঐ সম্প্রদায়ের সাধ্য ও সাধনার কথা এই পুস্তকে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।
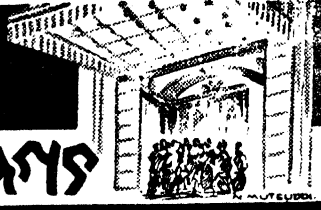
যুদ্ধ কি সত্যিই হচ্ছে নাকি? রঙ্গজগতের দিকে চাইলে তো সে কথা মনেই জাগে না। বাস্তবিকই রঙ্গ জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, কি মঞ্চপ্রদর্শনীতে আর কি ছবিঘরে বর্তমানে যে বিপুল জনসমাগম দেখা যায় ভারতের রঙ্গজগতের ইতিহাসে আর কখনও তা ঘটেছে ব'লে জানা নেই। যে কোন সিনেমাতে যান, যে কোন নাট্যমঞ্চে যান, ভীড় দেখে আপনি অবাক না হ'য়ে প্যারেন না। দর্শনীয় বস্তুর বাছবিচার নেই, স্ফূর্তিকালটা অতিবাহিত ক'রতে একটা কিছু পেলেই হল। ফলে অতি নিকৃষ্ট ছবি—কি নাট্যাভিনয়ও বেশ দু'পয়সা আমদানী করিয়ে দিচ্ছে। এর ভেতরেই আবার যেগুলি একটু কোন দিকে উৎকর্ষের পরিচয় দেয়, সে-তো প্রায় সোনার খনি বললেই চলে। ট্রাম-বাস নেই—না-ইবা রইলো! অন্ধকার ঘুরঘুট্টে, রাস্তা—পরোয়া নেই!...... প্রমোদ ক্ষেত্রগুলি জনাকীর্ণ থাকবেই।

* * * *

দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এই প্রমোদ উচ্ছলতা বেমানান মনে হ'লেও অন্য দিকের বিচারে এর ভাল দিকও আছে। আরও একটা কথা হ'চ্ছে—অস্থির মানসিকতাকে বাস্তব থেকে একটু রেহাই দিতে গেলে প্রমোদ ছাড়া উপায় নেই এবং সেটা দরকারও। সে হিসেবে প্রমোদ ক্ষেত্রে এই জনবিপুলতা জনগণের দারুণ চঞ্চল মনেরই পরিচয় দিচ্ছে। যাক্ সে কথা। এ থেকে যে লাভ হচ্ছে প্রমোদ উদ্যোক্তাদের খুবই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছবি কি নাটক মুক্ত হচ্ছে যেমন হুহু করে তেমনি তার জন্যে এই সব ক্ষেত্রে লোকেরও প্রয়োজন হচ্ছে এবং যত সামান্যই হোক কতক বেকার পালিত হচ্ছে বৈকি। তাছাড়া এর লাগোয়া দিকগুলিও কিছু পয়সা পাচ্ছে। এ অবস্থা কতদিন চলবে বলা যায় না; এ সবটাই তো শূন্যগর্ভে আস্ফালনের মত। কারণ, আমাদের প্রমোদ-ক্ষেত্রের যাবতীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী করা। এতদিন চলেছে, হয়ত আরও কিছুদিন সঞ্চয় ভেঙ্গে চলবে, কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা আরও পাকাতে থাকলে যে কি হবে সে কথা ভাববার অবসর কেউ পেয়েছেন মনে হয় না। নয়তো এই ফাঁকে বিদেশীর অনুকরণ ক'রেও তো কিছু কিছু মালমসলা এদেশে তৈরীর চেষ্টা হতো! দেশে তো তেমন বৈজ্ঞানিকের অভাব ঘটেনি। যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ; এমন বহু জিনিসের নকল তো বেরিয়েছে; এদিকেই বা কেউ দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন?

* * * *

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করবার আছে। সিনেমা থিয়েটারগুলি বিপুল অর্থ লাভ ক'রছে—যাকে বলে লুটছে, সিনেমা থিয়েটারের কর্মিবৃন্দও তেমনি যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। খাদ্য-দ্রব্যের দাম যে কি পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তা এদের মালিকরা অবহিত আছেন ব'লে বিশ্বাস করা যায় না। নিজেদের পয়সার আমদানী দেখে তাঁদের কি ধারণা যে তাঁদের কর্মীরা সেই পয়সার গন্ধেই উদরপূর্তি ক'রে নিতে পারে? সিনেমার ও চিত্রনির্মাণাগারের বহু কর্মীই এ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। তাঁদের দুঃখদৈন্যের প্রতিকার অন্তত আংশিকভাবেও করবার প্রয়োজন কি মালিকরা অনুভব করেন না?

বাঙালী ভাবপ্রাণ বলে খ্যাতি আছে। অর্থাৎ ভাব প্রবণতার যা প্রতিফলন কাব্য রচনা, চিত্রাঙ্কন ও অভিনয়ে পারদর্শীতা সে বিষয়ে বাঙলাদেশ কোনদিনই দীন হ'তে পারে না। কিন্তু অন্যান্য বহু উৎকর্ষকে যেমন অস্বীকার ক'রে যান, তেমনি এ বিষয়টিও

'পরিণীতা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী, জীবনে, পূর্ণিমা, বিজলী প্রভৃতি। ছবিখানি 'শ্রী' ও 'পূরবী'তে প্রদর্শিত হইবে

চলচ্চিত্র প্রযোজকরা মেনে নিতে চান না। তা নাহলে চিত্রজগতে শিল্পীর এত অভাব হ'তো না—নতুন শিল্পী যে গড়তে হয় এবং একই শিল্পী চিরকাল থাকে না—একথা তাঁরা প্রায় ভুলেই গেছেন যেন। পাঁচ বছরের হিসেব নিন, দেখবেন জন পাঁচেকের বেশী নতুন শিল্পীর অভ্যুদয় ঘটেনি। পুরাতন যাঁরা আছেন তাঁদেরই ডালে-ঝোলে-অম্বলে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পরিবেশন ক'রে চালিয়ে

'পতিব্রতা' চিত্রে অঞ্জলি ও চিত্রা। ১১শে ডিসেম্বর হইতে রূপবাণী ও বিজলীতে প্রদর্শিত হইবে

আবার মাথা তুলিল। আচ্ছা, কে আছে এমন লোক যে, তাহার স্ত্রীকে গোপনীয় চিঠি লিখিতে পারে? যদি তেমন কেহ থাকেই, আগে ত এ হাতের লেখা দেখা যায় নাই—এতদিন সে ছিল কোথায়? অথচ যদি গোপনীয় চিঠিই না হইবে তাহা হইলে ললিতার গোপন করিবারই বা কি দরকার ছিল?

নাঃ—আবার সেই চিন্তা শুরু হইল। সমর অস্থির হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হওয়া দরকার, নহিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। আচ্ছা, পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকগুলির কথাই শোনা যাক্—

কথা তাঁহারা অনেকক্ষণ ধরিয়াই বলিতেছেন, এতক্ষণ সমরের কানে যায় নাই। এবার যে জোর করিয়া মন দিল। একজন আর একজনকে বলিতেছেন, না, ও মেয়েদের চরিত্র পাহারা দিতে না যাওয়াই ভাল। স্বয়ং দেবতারা পারেন নি, মানুষ ত কোন্ ছার!

আর একটি বৃদ্ধ সায় দিলেন, হ্যাঁ। বলি সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা মনে আছে? সে সিন্দুকে পুরে সমুদ্রের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি! তার চেয়ে চোখ, কান বুজে থাকাই ভাল।

ছি, ছি, এখানেও এই আলোচনা। সমর সেখান হইতে উঠিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিল। ভগবান তাহাকে কী পাপে এই অশান্তি দিলেন, সে কি ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি পাইবে না? সে ত কিছুই এমন করে নাই, শুধু মাধবীকে গোপন চিঠি লেখে এই কি তাহার অপরাধ? কিন্তু তাহার মধ্যে ত কোন অন্যায় থাকে না। শুধু একটা নির্মল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।......তবে?......

আরও খানিকটা হাঁটিবার পর নিশীথ রাত্রির শৈত্যে মাথা যখন আর একটু ঠাণ্ডা হইল, তখন সে একবার ললিতার দিক হইতেও যুক্তি দিবার চেষ্টা করিল। সত্য, ললিতারই বা এমন কি অপরাধ? শুধু একখানা অপরিচিত হাতের চিঠি তাহার কাছে আসিয়াছে, এই ত? কি ব্যাপার, কাহার চিঠি কিছুই সমর জানে না, জিজ্ঞাসাও করে নাই, শুধু শুধু কি একটা নির্বোধ সংশয়ে কষ্ট পাইতেছে সে। ললিতার এত দিনের ভালবাসার, এতদিনের আন্তরিকতার কি কোন মূল্য নাই তবে?

না, এ শুধুই ছেলেমানুষী।

সমর জোর করিয়া বাড়ির পথ ধরিল। শুধু শুধু এতটা সময় বৃথা কাটিল, আর কি কষ্টটাই না পাইল মনে মনে। আর ঐ বুড়োগুলো যেন কি, বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টি হইতে সব রঙ মুছিয়া গিয়াছে, তাই সব কিছুকেই কালো দেখে। সে বাড়ি ফিরিয়া ললিতার সহিত নিজে ডাকিয়া কথা বলিবে। সম্ভব হইলে অপরাধ স্বীকার করিবে। ......সে একখানা চলন্ত ট্রামে চড়িয়া বসিল, আর বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তবু—

সাম্মুড়ির কাছাকাছি যত আসিতে লাগিল ততই সমস্ত ...ই একখানা সরকারী খামের নীচে যেন কোথায় তলাইয়া গেল। মনে হইল ললিতার প্রতি না জানিয়া অবিচার সে করিবে না, তবু তাহার সহিত আর আগেকার সেই মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হইবে না।

ললিতা দ্বার খুলিয়া দিয়া অনুযোগের সুরে কহিল, বেশ লোক যা হোক্। শরীর খারাপ ব'লে এই রাত দশটা অবধি কোথায় কোথায় ঘোরা হলো তাই শুনি? আমি এধারে ভেবে মরি। একদিন বুঝি আর আড্ডা না দিলে চলে না!

সমর কোন জবাব না দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারা যায় না যেন! আশ্চর্য। ললিতা শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল, ব্যাপার কি তোমার, সত্যিই জ্বর বাধিয়ে বসলে নাকি?

এবার জোর করিয়া সমর সহজ কণ্ঠ আনিল, না না, অনেকটা হেঁটে বেশ ভাল বোধ করছি।

ললিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু ভাল। কিন্তু তবু মুখের চেহারা তোমার ভাল নয় বাপু, সকাল ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়ো।

সমর কহিল, একটু পরে খাবো, এখন বড় ক্লান্ত।

জামা ছাড়িয়া মুখে হাতে জল দিল, তারপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া সে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। আঃ! অনেকটা ঘোরা হইয়াছে, আগে এতটা বোঝা যায় নাই।

ললিতা নীচে তখনও রান্নাঘর সারিতে ব্যস্ত। ভালই হইয়াছে, নহিলে এখনই হয়ত কথা কহিত, আর সে কথার জবাবও দিতে হইত সমরকে। কিন্তু চুপ করিয়াও শুইয়া থাকা যায় না, কী সব ছাই ভস্ম চিন্তা আসে মনে।

সে হাত বাড়াইয়া সেই ইংরেজী নভেলটাই টানিয়া লইল। কি বাজে কথাই বকিতে পারে এই নূতন লেখকগুলো। না আছে স্পষ্ট কোন বক্তব্য, না আছে কোন গল্প—শুধু বাজে বকুনি পড়া যায় কি করিয়া?......কিন্তু আর কোন বইও হাতের কাছে নাই। অগত্যা সেইখানাই খুলিল—। মাথার কাছেই আলো, শুইয়াই পড়া চলে। অন্যমনস্কভাবে বইখানা খুলিতেই ঠক্ করিয়া একখানা খাম পড়িল তাহার বুকের উপর। সহসা যেন তাহার হৃদপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল। এ কার চিঠি—আরে, এ যে সেই খামখানাই। সেই হাতের লেখা, ললিতারই শিরোনামা। আশ্চর্য!

সমর লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইতেছে যেন দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিতেছে। হাত কাঁপিতেছে থর থর করিয়া। চিঠিখানা খুলিয়া পড়া যায় না।

চিঠিখানা খুলিতে যেন সঙ্কোচেও বাধে। এত দিনের এত বন্ধুতার পর—অথচ আর নিজেকে সংযত করাও যায় না। সে আঙ্গুল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া খামখানা খুলিয়াই ফেলিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। ললিতা ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়িত, তাহার নিজস্ব ইমারত উঠিতেছে। টাকার দরকার, সেইজন্য সমস্ত পুরাতন ছাত্রীদের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি দেওয়া হইতেছে, এক টাকা, দু' টাকা, যা কিছু হয়। সেক্রেটারী

(শেষাংশ ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ম্যালেরিয়া ধ্বংসের নূতন ধারা

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ, স্মৃতিতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী

কোন বিষয় জানিতে হইলে তাহার মূলতত্ত্বকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। আবার সেই তত্ত্বকে জানিতে হইলে যদি তাহার কোন বিপরীত তত্ত্ব দ্বারা আমাদের মন অভিভূত হইয়া থাকে তাহাকে মন হইতে অপসারিত করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং গত ৫০ বৎসরের ম্যালেরিয়ার ধ্বংস-লীলা পর্যালোচনা করিলে দেখিব যে, আমরা ঐ রোগটি দেশ হইতে অপসারণ করিতে আদৌ সক্ষম হই নাই। কুইনাইন প্রয়োগে রোগের বেগ ক্ষেত্রবিশেষে আশু দমিত হয়, কিন্তু প্রতি বৎসর একই নিয়মে বহুলোক এ রোগে মারা যায়। কতক বা অর্ধমৃত অবস্থায় থাকে, কতক রোগান্তরে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, কতক পুনঃপুন আক্রান্ত হয়; এইভাবে যে কোন রোগের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি একেবারে হীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় যক্ষ্মা, উদর, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, কালাজ্বর প্রভৃতি বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগও আনুসঙ্গিকভাবে আসিয়া জাতির জীবনকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। আর এ রোগের প্রতিকারক ও প্রতিষেধক ঔষধ বলিতে কুইনাইন—যাহার বহুল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ইহার বার্ষিক গতি কিছু রুদ্ধ হয় নাই। বর্ষাকালের পানার মত প্রতি বৎসর আসে ও যায় এবং অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। এক কথায় বলিতে গেলে ইহার স্থায়ী মীমাংসা কিছু হয় নাই। সুতরাং ইহার মূলতত্ত্ব ও ঔষধ উভয়ের সম্বন্ধে একটা ধাঁধা রহিয়া গিয়াছে, তবে উপায়ান্তর না থাকাতে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে বা গ্রহণ করান হইয়াছে এই কথা বলা চলে। এ সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরের ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা হইতে যে সন্দেহ হয়, বর্তমান মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অবসর হয়। অনেক পল্লী-গ্রামে কুইনাইন একেবারে নাই বলিলেই হয়। এইরূপ কয়েকটি পল্লীগ্রামের সহিত সংযোগ স্থাপনের যে প্রয়োজন হয় এবং তাহাতে অসংখ্য রোগীকে চিকিৎসা করিবার অবসরও হয়, তাহার অদ্ভুত সাফল্য দর্শনে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সার মর্ম এই যে, মশার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ নিতান্ত গৌণ, দূষিত জলের সহিত ইহার সম্বন্ধ বেশী। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্যন্ত কাল অর্থাৎ বর্ষার প্রথম বর্ষণের পর বর্ষণ শেষ হইলে তাহার এক মাস কাল পরে পর্যন্ত সুসিদ্ধ জলে স্নান এবং সুসিদ্ধ জল পানে অভ্যস্ত হইলে শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে এ রোগের আক্রমণের কোন সম্ভব নাই। দ্বিতীয়ত সাগু, বার্লি, গ্লুকোজ, হর্লিকস্ প্রভৃতি পথ্য একেবারে বাদ দিয়া কেবল চাউল, চাউল ভাজা, চিঁড়া, চিঁড়া ভাজা, খই প্রভৃতি ধান্য জাতীয় দ্রব্যগুলি মাত্রা বিচার করিয়া মন্ডবৎ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারে খুবই উৎকৃষ্ট পথ্য প্রস্তুত করা যায় এবং জ্বরকালে দুধ বর্জন করিয়া জ্বরবিরামে দুধসহ ঐ সকল মন্ডবৎ দ্রব্যের ব্যবহার বিদেশজাত বিভিন্ন পথ্যের তুলনায় হীন ত নহেই, অধিকন্তু অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছি। তৃতীয়ত ঔষধরূপে নাটা, ছাতিম, নিমছাল, গুলঞ্চ, আতচি, অমৃত প্রভৃতি কয়েকটি এদেশজাত বনৌষধির ব্যবহারের কৌশল যথাবিধি অধিগত হইলে এ রোগ হইতে নিশ্চিত আরোগ্যলাভ করা যায়। চতুর্থত জ্বরবিরাম লাভ করিবার পরে একমাস হইতে দে[ড়] কাল পথ্য সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া স্বাভাবি[ক] ক্রমে ভাল হইলে প্লীহা, যকৃত বৃদ্ধি, পুনরাক্রমণ, ক বা অন্য কোনরূপ উপসর্গ আসে না। এই একমাস হই[তে] মাস এই জ্বরের সুপ্তিকাল (Latent stage) বলিয়া হইবে। সুতরাং জলের সংস্কার করিয়া ব্যবহারে এই আক্রান্ত হইতে হয় না। আর অসাবধানতায় আক্রান্ত পূর্বোক্ত নিয়মের পালনে এই রোগে বিপর্যস্ত হই না।

অবশ্য নব্যবৈজ্ঞানিক মতের যে চিন্তাধারায় আমর বহুকাল অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছি তাহার তত্ত্বের সহিত, ব্যবহৃত ঔষধ ও পথ্যের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই জীবাণু বিজ্ঞানের চিন্তাধারা হইতে ক্ষেত্রবিজ্ঞানের ধারায় অভ্যস্ত হইতে হইলে আমাদের চিন্তাধারার আমূ[ল] বর্তনের প্রয়োজন আছে। বিশেষত এই যুদ্ধ পরিস্থিতি[তে] চিন্তাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজন আজ অবশ্যম্ভাবী পড়িয়াছে। এক কথায় বলিতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে নূত[ন] মালা শিক্ষা, নূতন সাহিত্য রচনা এবং তাহাকে জাতি সুদৃঢ়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে এ পর্যন্ত যাহা শি[খিয়াছি] তাহা ভুলিয়া যাওয়া প্রথম প্রয়োজন। নূতন বর্ণমালার গ্রহণ দ্বিতীয় কার্য এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত করা তৃতীয় কার্য। নব্যবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পথে একটি চিন্তাধারাকে জাতির মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কি[ত করা] একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইলেও এই চিন্তাধারাকে জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। স্বাস্থ্যই প্রথম জীবন। এই ব্যাপক রোগে তাহা একেবারে নষ্ট বসিয়াছে। দ্বিতীয়ত মশাকে ইহার কারণ বলাতে এবং হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই জ্ঞানে লোকে হইতে শহরে আসিয়া পল্লীগ্রামকে শ্মশানে পরিণত ক[রি]- পল্লীপ্রাণ ভারতবর্ষকে পল্লীমুখী করিতে হইলে ম্যালে[রিয়া] নিরঙ্কুশভাবে ধ্বংস করাই চাই। যিনি যে পুকুরের জলে ও যে পুকুরের জল পান করেন তাহাকে সেওলামুক্ত র বাতাস বা রৌদ্র লাগিতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কূপের জল সর্বপ্রকার দোষমুক্ত একথাও ভুলিয়া যাইতে হ[ইবে]। বাঙলাদেশের অপরিপক্ক পলিমাটী হইতে পরিস্রুত জল কূপগত হয়। অধিকন্তু তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগে সুতরাং তাহা জীবাণুমুক্ত হইলেও দোষমুক্ত নয়। জলগত লোমকূপ পথে শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরে যে বিষ প্রকাশ করে, তাহাতে শরীরের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, ও মজ্জাগত অগ্নি বিকৃত হয়। এই বিকৃত অগ্নি বাহিরে আ[সিলে] জ্বরের প্রকাশ হয়। আর এই বিষক্রিয়ার ফলে রক্তের মধে বিশিষ্ট অবস্থা হয় তাহাতে এক জাতীয় বিশিষ্ট জীবাণু লক্ষ্য করা যায়। তাহা নববৈজ্ঞানিক কর্তৃক ম্যালেরিয়া-প্যারা[সাইট] বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই জীবাণু রক্তের

পরবর্তী বিকাশ। সুতরাং জীবাণু মুখ্য কারণ নহে গৌণ কারণ। কুইনাইন প্রয়োগে বা স্বাভাবিকভাবে বা অন্য ভেষজ প্রয়োগে জ্বর বিরাম লাভ করিলেও জ্বর চর্মাবরণের নীচে থাকে। ঐ উত্তাপ স্বস্থানগত হয় না। এই উত্তাপকে স্বস্থানগত করিতে বিষনাশক কতিপয় ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিলেও জ্বর বিরামের পরে এক মাসকাল স্বল্পতর লঘু পথ্যে অভ্যস্ততা, স্নান ও অভ্যঙ্গ পরিহার করা উচিত। জ্বর হইবামাত্র দ্রুত জ্বর বন্ধকারী ঔষধের প্রয়োগ না করাই সর্বপ্রকারে সমীচীন। সুতরাং যে কোন আদর্শ পরিবার সিদ্ধজল স্নান ও পানার্থ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া ম্যালেরিয়া মুক্ত থাকিলে তিনি সেই গ্রামের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইবেন,—তাঁহার আদর্শে পল্লী গঠিত হইবে। ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী হইতে পলায়নের কোন প্রয়োজন নাই। মশা হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিলেও উহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল বহিরুত্তাপ পরীক্ষা করিয়া স্বাভাবিক পথ্যে অভ্যস্ত হইবার আদর্শকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। মশা-মারণ যজ্ঞের কোন প্রয়োজন হইবে না। উই পোকা বা দীপালি পোকার মত উহারা স্বাভাবিক ঋতু বিপর্যয়ে আসিবে বা ধ্বংস পাইবে। পিতৃপরম্পরাতে উহাদের রক্তের মধ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উহারা মানুষের রক্ত খায় না। রক্তের বিশিষ্ট অবস্থায় উহাদের ব্যক্তভাব হইলেও এবং উহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে রক্তশূন্যতা দেখা গেলেও অগ্নিবলানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থাতে উহাদের বাসের ক্ষেত্র অনুপযোগী হইলে উহারা স্বভাবেই অব্যক্তে পরিণত হয়। মোটের উপর নব্যবৈজ্ঞানিক ধারা হইতে পৃথক ধারায় মনকে অভ্যস্ত করিতে পূর্ব কথা বিস্মরণ, নূতন বর্ণমালার গ্রহণ এবং নূতন ম্যালেরিয়ার সাহিত্য সৃষ্টি এবং জীবনে তাহা প্রতিফলিত করণের মধ্যে ম্যালেরিয়ার ধ্বংস ও ম্যালেরিয়া হইতে অব্যাহতি লাভের মূলমন্ত্র নিহিত আছে।

'সংশয়'

(২৩১ পৃষ্ঠার পর)

মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সেই মর্মে একখানা চিঠি ললিতার নামেও আসিয়াছে।

চিঠিখানা ললিতা বোধ হয় তাহাকে দেখাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া তাহার বইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। পাতলা চিঠি, তাই দুপুর বেলা বইখানা খুলিয়া পড়িলেও তাহার নজরে পড়ে নাই। সে সমস্ত ঘরটাই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, কিন্তু বইখানার কথা মনে হয় নাই একবারও।

সামনেই তাহাদের বিবাহের দরুণ আয়না বসানো আলমারীটা বিদ্যুতালোকে ঝক ঝক করিতেছে, আর তাহাতেই প্রতিফলিত অত্যন্ত নির্বোধ একটি মুখের ছবি সমরকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

গণ-পরিষদের গোড়ার কথা

(২২৭ পৃষ্ঠার পর)

হইতে প্যারিসে চলিয়া আসিল। জনসাধারণের অধিকার ঘোষণা ভার্সাই নগরেই হইয়াছিল। এই ঘোষণা অনুসারে ১৭৯১ সালে শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচিত হইল। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা এইভাবে স্বীকৃত হইল।

গণপরিষদের অর্থই হইতেছে যে, জনসাধারণের যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাহা স্বীকার করা। গণ-পরিষদ ব্যতীত দেশের অন্য কোন শক্তিই দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে না। ভারতের কংগ্রেস ইহা জানে বলিয়াই গণপরিষদের দাবী করিয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র কে রচনা করিবে? ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কেহই তাহা করিতে পারে না। তাহা পারে গণ-পরিষদ। যদি ব্রিটিশ সরকার গণ-পরিষদে বাধা দেন অথবা সম্মত না হন, তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ভারতের বিশেষ কোন দল বা উপদল কেন তাহাতে বাধা দেয় তাহা বুদ্ধির অগম্য। হয়ত বলা হইবে যে, গণপরিষদ মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিতে সম্মত হইবে না। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ গণ-পরিষদে কংগ্রেস (১) পৃথক নির্বাচন স্বীকার করিয়াছে, (২) মুসলিম স্বার্থ ও তাহার রক্ষাকবচ নির্ধারণের ভার মুসলমানদের উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং (৩) যে বিষয়ে কোন আপোষ হইবে না, তাহা বিচারের ভার নিরপেক্ষ কমিটির উপর ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তই চরম হইবে। রক্ষাকবচের এত প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও যদি মুসলিম লীগ গণ-পরিষদ সমর্থন না করে, তাহা হইলে বুঝিব যে লীগ ব্রিটিশ সরকারের সুবিধার জন্য মুসলিম সমাজের সর্বনাশ-সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১০
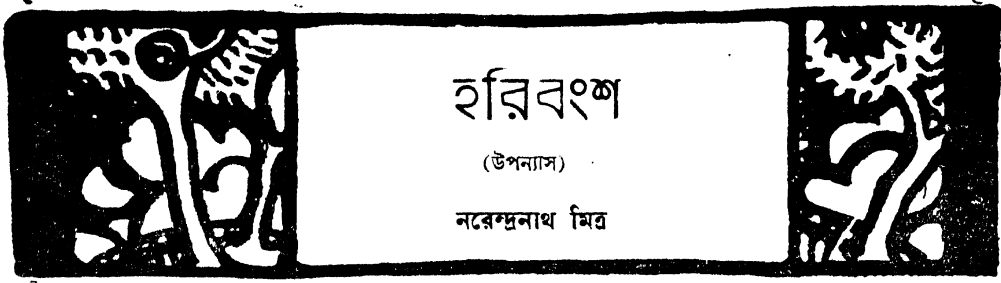
নবদ্বীপকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সুবল ফিরে গেল। গম্ভীর মুখে, চটি জুতার শব্দ করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল নবদ্বীপ। ঘরখানা অন্ধকার। ঢুকতে ঢুকতে নিজেব মনেই বিড় বিড় করে নবদ্বীপ বলতে লাগল, 'গুঁতো টুতো খেয়ে কোন্‌দিন যে পড়ে টরে মরি তার ঠিক কি। কপালে শেষ পর্যন্ত তাই আছে আমার। এখান থেকে এখন সরে যাওয়াই আমার ভালো। এতখানি রাত হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটা পর্যন্ত দেওয়ার সময় হয়নি কারো। কত কাজ। দিন রাত তো দেখি কেবল গুজুর গুজুর, গুজুর গুজুর।'

গুজুর গুজুর করবার মত মনের অবস্থা আজ ছিল না মনোরমার। মেয়েকে নিয়ে কীর্তন শুনতে সেও গিয়েছিল বিনোদের বাড়ি। সেখানকার কাণ্ড সে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। পাছে সবাইর কৌতুক এবং অনুকম্পার বস্তু হতে হয় এই ভয়ে আগেই মেয়েকে নিয়ে সে সরে পড়েছিল। ফিরে এসে দেখে, মুরলী তার আগেই এসে বসে আছে বারান্ডায়।

'মারের ভয়ে গর্তে এসে লুকিয়েছ বুঝি? লজ্জা করে না মুখ দেখাতে? দড়ি জোটে না গলায় দেওয়ার মত? লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না আমি।' মনোরমা ঝাঁজিয়ে উঠেছিল। কিন্তু অদ্ভুত সহিষ্ণুতা মুরলীর। শরীরে যেন তার রাগ নেই একেবারে। এই নিষ্ক্রোধ ইদানীং এত বেড়েছে যে স্ত্রীর রাগের উত্তরে প্রায়ই সে রসিকতা করে। 'তাই তো, এমন সুন্দর মুখ লোককে ডেকে দেখাতে পারো না, বড়ই দুঃখের কথা তো।'

মনোরমা অবাক হয়ে যায়। এই কিছুক্ষণ আগে যে লোক এমন একটা অপকর্ম করে এসেছে এবং ধরা পড়ে অপমানের একশেষ হয়েছে, সে কি করে এমনভাবে হাসি তামাসা করতে পারে। চক্ষুলজ্জা বলতে কি এক ফোঁটা পদার্থ নেই মানুষটির শরীরে?

শ্বশুরের পায়ের শব্দ আর বিড় বিড় বকুনি শুনে কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু চড়িয়ে দিয়ে সেটা হাতে করে এ ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মনোরমা। নবদ্বীপের বিড় বিড় শব্দ তার কানে গিয়েছিল। অবশ্য কানে যাতে যেতে পারে সে দিকে নবদ্বীপেরও লক্ষ্য ছিল। মনোরমা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'অন্ধকারে ঢোকেন কেন এসে ঘরে? আপনার পকেটেই তো দিয়াশলাই থাকে। একটা কাঠি জ্বে নিলেই পারেন।'

নবদ্বীপ বলল, 'হুঁ, বিড়িটা আরটা ধরাবার জন্য এক মাত্র দিয়াশলাই আমার কাছে থাকে তাইবা সহ্য হবে কেন? এ বেলা যে এক মুঠো মুখে দিই বাড়িতে এসে তাও এদে দুচোখের বিষ? নিজে উপোস করে থেকে তোমাদের গুষ্ঠি গণ্ডার পেট ভরাতে পারলেই ভালো হয়, না?'

কোথায় দিয়াশলাইর কাঠি, আর কোথায় বা উপোস ক থাকা। অবশ্য নিজের দিয়াশলাইটার ওপর চিরদিনই এ বেশী মমতা আছে নবদ্বীপের, পারতপক্ষে একটা কাঠিও খরচ করতে চায় না। তার সমস্ত কার্পণ্য এই দিয়াশলাইতে এ চরমে উঠেছে। এটা বহুদিন মনোরমা কৌতুকের সঙ্গে ল করেছে। কিন্তু কৌতুক বোধ করবার মত মনের অবস্থা সময় থাকে না। তা ছাড়া একেক সময় মনোরমার মনে হয় ইচ্ছা করেই নবদ্বীপ এই দিয়াশলাইর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক একটা দিয়াশলাইর কাঠির জন্য সত্যি সত্যিই কি অত মম থাকতে পারে লোকের? নবদ্বীপের ঘরে হ্যারিকেন জ্বালি সেটা কমিয়ে রেখে যাবারও উপায় নেই। ঘরে ঢুকে হ্যারিকে আলো জ্বলতে দেখলেই নবদ্বীপ রেগে ওঠে, 'তেল খুব স হয়েছে বুঝি বাজারে?'

কেরোসিনের ডিবাও জ্বালিয়ে রাখা যায় না। আরো দপ দপ করে জ্বলে। নবদ্বীপ বলে, 'নবাবের কোথাকার। রাস্তা থেকে ওর রোশনাই দেখা যায়। আ দেখ, এমন আলগা ভাবে আলো কেউ জ্বালিয়েরাখে ঘরের মধ্যে ঘরদোর সব না পুড়িয়ে ও ছাড়বে না।'

মহামুস্কিল হয়েছে মনোরমার বুড়ো শ্বশুরকে নি তার ঘরে আলো জ্বালালেও দোষ, না জ্বালালেও দোষ।

হ্যারিকেনটা নিয়ে নীরবে মনোরমা গিয়ে ঘরে ঢুব গাড়ু আর গামছা ছিল দরজার একটা পাল্লার আড়ালে, এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে আসুন। আমি পাকের যাচ্ছি।'

মনোরমা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই নবদ্বীপ বাধা বলল, 'শোন।'

মনোরমা ফিরে দাঁড়ালে নবদ্বীপ বলল, 'মেড়াটার আমাকে কি এখন দেশত্যাগী হতে বল তোমরা? আমি য

আছি ততক্ষণ। একবার চোখ বুজলে হাড়গোড় ভেঙে ওকে যদি লোকে রাস্তায় ফেলে না রাখে তো কি বলছি আমি।'

মনোরমা বলল, 'সে যা হবার হোক, আমি আর কিছুর মধ্যে নেই আপনাদের। আমাকে ফেলে দিয়ে আসুন রসুলপুরে। চোখের ওপর কতকাল আর মানুষ এসব সহ্য করতে পারে।'

নবদ্বীপ বলল, 'আমি করে যাচ্ছি কি করে? আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি, কত শান্তি আমার মনে।'

বহু দিন বাদে পুত্রবধূর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলবার অবকাশ এসেছে নবদ্বীপের। অনেক দিন ধরে মনোরমা যেন বহু দূরে সরে গিয়েছিল। স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে ইদানীং বেশ একটা বনিবনাই যেন করে নিয়েছিল মনোরমা। যা কোনদিন সারবে না তার জন্য ক্ষোভ করে আর অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না, এসব অনাচার কদাচারে কোনরকম আপত্তিই যেন মনোরমার নেই, এমনি সহিষ্ণুতাই সে অভ্যাস করছিল। এসব ঘটনা এক আধটু মাঝে মাঝে ঘটা সত্ত্বেও মনোরমা মুরলীকে আদর যত্নের ত্রুটি করত না, বরং ইদানীং তার সোহাগটা নবদ্বীপের কাছে যেন বেশ একটু বাড়াবাড়ি মনে হোত। কাল গেলে মাৎটামি সার। বয়সের সময় খুব মান অভিমান, কপাল চাপড়াচাপড়ি করে এখন পীরিতের জোয়ার এসেছে মনোরমার মনে। অথচ নবদ্বীপের এতে খুশি হওয়াই উচিত ছিল। প্রথম থেকে মনোরমাকে এই ধরণের নির্দেশ উপদেশই তো দিয়ে আসছে। 'আমি পুরুষ মানুষ, সব কথা তো তোমাকে বলতে পারিনে বউমা, তোমার শাশুড়ী থাকলে বলতে পারত শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারত। মেয়েমানুষের অত তেজ, অত জেদ কি ভালো বউমা, মেয়ে মানুষের মনের আগুন মনেই রাখতে হয়, বার করে দিলে তাতে নিজের কপালই আগে পোড়ে। পুরুষ মানুষ, বারটান যদি একটু থাকেই, তুমি যা করছ তাতে তো ও আরো ঘরের বার হয়ে যাবে। ওকে যদি ঘরমুখী করতে চাও, ঘরের দিকে ওর টান যাতে বাড়ে সেদিকে তোমার মন দিতে হবে। বরং সাধারণে যেমন করে তার চেয়ে বেশী আদর যত্ন করতে হবে, ওর খেয়াল মত, খুশি মত চলতে হবে। এসব তো আমার শিখাবার কথা নয়, আর নিতান্ত ছোটটি তো নও, শিখাতে তোমাকে হবেই বা কেন।'

কিন্তু শিখাবার প্রয়োজন তেমন না থাকলেও, শিখাবার দিকে বেশ ঝোঁকই ছিল নবদ্বীপের। ঘরে আর কোন লোক ছিল না। নবদ্বীপের এক বোন ছেলেপুলে নিয়ে নিজেই বর্ষার সময় নৌকো করে এখানে বেড়াতে আসত। এসে দু'একদিনের বেশী থাকতে পারত না! বড় সংসার, অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ। নবদ্বীপের পক্ষ থেকেও খুব যে বেশী গরজ দেখা যেত বোনকে রাখবার জন্য তা নয়। মুরলী যখন বাইরে বাইরে থাকত, বেশী রকম বাড়াবাড়ি করত, নবদ্বীপ মনোরমাকে নিজের কাছে ডেকে আনত। নানারকম কথা বলে বুঝাতে চেষ্টা করত, সান্ত্বনা ভরসা দিত। নিজের ছেলের ব্যবহারের জন্য মনোরমার কাছে লজ্জার যেন শেষ ছিল না নবদ্বীপের। মনোরমার স্বামীর ভালোবাসার অভাব নবদ্বীপ নিজের অগাধ স্নেহ দিয়ে এবং স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ কাপড় গহনা দিয়ে পুরাতে চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও নবদ্বীপের আন্তরিকতা মনোরমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একই দুঃখ এবং অশান্তিভোগের মধ্য দিয়ে পরস্পরের ওপর তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠত। ক্রমে ক্রমে এমন হোল যে, বয়সের বাধা ডিঙিয়ে নবদ্বীপ আর মনোরমার সম্পর্ক যেন বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পেঁছিল। সমস্ত বৈষয়িক পরামর্শ চলে মনোরমার সঙ্গে, এমন কি কিভাবে কতটুকু শাসনের দ্বারা মুরলীর স্বভাব চরিত্র বদলানো যেতে পারে, কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এ সম্বন্ধে সেসব পরামর্শও নবদ্বীপ করত মনোরমার সঙ্গে। এমন ভাবে কথা বলত নবদ্বীপ যে মুরলী তার নিজের কাছে যেমন শিশু মনেরমার কাছেও যেন তেমনি। নবদ্বীপের যেমন মুরলীকে শাসনের অধিকার আছে, আছে একান্ত মঙ্গল কামনার, মনোরমারও যেন তাই। সব সময়েই যেমন গরম হলে চলে না, এক আধটু ঢিলও দিতে হয় মাঝে মাঝে, স্নেহবশে একথা যেহেতু নবদ্বীপের মনে হোত, নবদ্বীপ ধরে নিত মনোরমার পক্ষেও তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। নবদ্বীপের এই ধরণের আরোপিত মনোভাব একটু একটু ক'রে মনোরমার মনেও স্থায়ী হ'তে আরম্ভ ক'রেছিল। নবদ্বীপের কথাবার্তায়, সস্নেহ ব্যবহারে দুঃখটাকে আর যেন তেমন দুঃখ বলে মনে হয় না মনোরমার। নবদ্বীপ তার সম অংশ গ্রহণ করায় দুঃখের ভার বরং অনেক লঘু হয়ে পড়ে। এত বড় যে দুর্ভাগ্য, তাও অনেক সময় উপভোগ্য হয়ে ওঠে মনোরমার কাছে। নবদ্বীপ মুরলীর ছেলেবেলার গল্প করে। তখন থেকেই যে কী অস্বাভাবিক দুরন্ত ছিল মুরলী, মাঝে মাঝে তার সরস বর্ণনা শোনায় নবদ্বীপ মনোরমাকে। 'ছেলেবেলা থেকেই ও অমনি। মাত্র সাত আট বছর যখন বয়স, তখনই লুকিয়ে লুকিয়ে ও হুঁকো টানতো। একদিন আমার চোখে পড়ে গেল। মনে ক'র না, মা মরা ছেলে ব'লে আমি কেবল আহ্লাদই দিয়েছি ওকে। মাঝে মাঝে এমন শাসন করতাম যে, পাড়াপড়শীর বউ-ঝিরা পর্যন্ত চোখের জল ফেলত। বল ত ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবে? একেকদিন সত্যিই আধমরা ক'রে শ্বাসমাত্র রেখে ছেড়ে দিতাম, এমন কড়া ছিল আমার শাসন। তামাক খাওয়ার জন্য কত শাস্তি কতবার ওকে দিয়েছি শুনবে? প্রথম প্রথম ধমক, চোখ রাঙানো, মারধোর খুব চলল, কিছুতেই কিছু হয় না, শেষে একদিন কাঠিতে ক'রে গোবর তুলে দিলাম ওর মুখে পুরে, তারপর হুঁকো আর কল্কি গলায় বেঁধে কান ধ'রে ঘুরিয়ে আনলাম পাড়া ভরে। তবু কি লজ্জা হোল?'

মুরলীর অপূর্ব বেশ মনে মনে কল্পনা ক'রে মনোরমা হেসে উঠেছিল, 'তবু তো তামাক খাওয়া ছাড়াতে পারেন নি!'

নবদ্বীপও সহাস্যে নিজের শাসনের ব্যর্থতা স্বীকার ক'রে বলেছিল, 'না, পারলাম আর কই, যা ও একবার ধরে, তা কোনদিনই ছাড়ে না; ওই ওর স্বভাব।'

দুজনের এই হৃদ্য সম্বন্ধ কেমন ক'রে যে চিড় খেয়ে গেল কেমন ক'রে একটু একটু ক'রে মনোরমা দূরে স'রে গেল, তা নবদ্বীপ বুঝে উঠতে পারল না। নদীর মত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যেও জোয়ার ভাঁটা খেলে। ভাঁটার টানে মনোরমা যখন দূরে সরে গেল, নবদ্বীপের স্নেহ সহানুভূতির প্রয়োজন তার পক্ষে যত কমে আসতে লাগল, নবদ্বীপ মনে মনে তত ক্ষুব্ধ হোল, ক্রুদ্ধ হোল, কিন্তু আর কিছু ক'রতে পারল না। মেয়ে হবার পর থেকে মনোরমার মনোনিবেশের আর এক বস্তু বাড়ল। মেয়েকে খাওয়াতে, পরাতে, সাজাতেই তার সময় কাটে, তেমন আর নিঃসঙ্গ বোধ করে না মনোরমা। মেয়ের মধ্যেই তার আনন্দ আর কল্পনা মুক্তিলাভ করে। তাছাড়া স্বামীর দিকেও বেশ ঘেঁষে এলো মনোরমা, মুরলীর উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ কমতে থাকায় মুরলীও অনেকখানি লভ্য হয়ে এল। তাছাড়া বাইরের টান যতই মুরলীর থাকুক, সে যখন ভালোবাসে, তখন গভীরভাবেই ভালোবাসে, একথা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। আদরে, উচ্ছ্বাসে সেইসব মুহূর্তে মনোরমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় মুরলী। নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য নিজের সঙ্গে সে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে মিশিয়ে ফেলবে মনোরমাকে, পিষে মেরে ফেলবে। কোন ফাঁক থাকতে দেবে না, কোন ব্যবধান থাকতে দেবে না, মনোরমা লীন হয়ে যাক মুরলীর অণু-পরমাণুর মধ্যে। এ সব সময় কি কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে, মুরলী আরো অনেক নারীকে এমন নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রেছে এবং ভবিষ্যতে ক'রতে পারে?

নবদ্বীপ কিছু বলে না, ভাবে, মেয়েমানুষ এমনি স্বার্থপর, এখন সময় পেয়েছে কি না, তাই বুড়ো শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষার কথা একবার মনেও পড়ে না, এখন স্বামী আর মেয়েই তার সব। কিন্তু এই যে আদর সোহাগ কার দৌলতে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে খাইয়ে বাঁচাচ্ছে কে, এত বাবুগিরি বিলাসিতা কার পয়সায়। একটা পয়সাও কি কোন-দিন আয় ক'রে দেখেছে মুরলী। তার নিজের এত সাজসজ্জার বহর, বউর গায়ের ভারি ভারি গহনা, এমন কি মেয়ের গলার ধুকধুকিখানা পর্যন্ত নবদ্বীপের টাকায়। অথচ সেই নবদ্বীপ আজ নিতান্তই একজন বাইরের লোক, কারো লক্ষ্য নেই, কারো মমতা নেই তার ওপর, সে কেবল টাকা জোগাবার যন্ত্র, আর কিছু নয়। এমনই হয়, এমনই সংসারের নিয়ম। কিন্তু আজ বহু-দিন বাদে শ্বশুরের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা যেন মনে পড়েছে মনোরমার। তার সতেজ অভিযোগের ভঙ্গিতে যে হতাশ এবং করুণ আর্তি ফুটে উঠল, তার মধ্যে সেই পুরোনো ঘনিষ্ঠতার যেন খানিকটা আভাস পেল নবদ্বীপ। তবু সহজে নবদ্বীপ ধরা দিল না, পরম উদাসীনভাবে বলল, 'সে কি কথা, ঘরদোর সংসার গেরস্থালী সবই তো এখন তোমাদের। আমি আর কে, আমারই বরং তোমাদের কোন কিছুর মধ্যে এখন আর থাকা উচিত নয়। বাকি কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হোল।'

এসব যে নবদ্বীপের অভিমানের কথা, তা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু কেন এই অভিমান। সাধ্যমত এখনো মনোরমা শ্বশুরের সেবা-পরিচর্যা করে, খোঁজখবর, তত্ত্ব-তল্লাস নেয়। তবু কেন যে নবদ্বীপের মন ওঠে না, তা বুঝতে পারে না মনোরমা। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বুড়ো হ'লে মানুষের স্বভাব এমনি খুঁৎখুঁতেই হয়ে পড়ে। সব সময়েই বুড়োমানুষের মনে আশঙ্কা থাকে, এই বুঝি তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না, অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করে চলে গেল। ছেলেমানুষ যেমন স্নেহের কাঙাল, বুড়োমানুষও তেমনি শ্রদ্ধা কুড়োতে ভালো-বাসে। না হলে নবদ্বীপ তো জানে, এখনো সংসারের সেই সর্বময় কর্তা, তাকে যত্ন ক'রবে না, তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাবে, এমন সাধ্যই কারো নেই, তবু তার মর্যাদা হারাবার এমন আশঙ্কা কেন, আদর-যত্নের জন্য কেন এমন কাঙালপনা।

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে তার প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে আসুন আমি ভাত বাড়ছি গিয়ে।'

খেতে বসে নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করে, 'মুরলী খেল না?' মনোরমা ঘাড় নেড়ে জানায়, মুরলী আগেই খেয়ে নিয়েছে। সাধারণত সন্ধ্যার একটু পরেই রাত্রের খাওয়া সেরে নেওয়া মুরলীর অভ্যাস। আর নবদ্বীপের ঠিক তার উল্টো। কারবার-পত্র, নানারকম দরবার পরামর্শ সারতে সারতেই তার অনেক রাত হয়ে যায়। তবু মনে মনে নবদ্বীপ প্রত্যাশা করে, মুরলী তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। কথা বলতে বলতে খেতে তার ভালো লাগে। কিন্তু মুরলী আর সে একই সময় পাশাপাশি বসে খাচ্ছে, এমন ভাগ্য নবদ্বীপের খুব কমই হয়। এ নিয়ে মনে মনে বেশ ক্ষোভও আছে নবদ্বীপের। মাঝে মাঝে মুরলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'পুরুষমানুষ যে অত সকাল সকাল কি ক'রে খায়, আমি ভাবতেই পারি না।' কিন্তু নবদ্বীপের এসব কথা আজকাল আর গায়ে লাগে না মুরলীর। বাপের প্রায় কোন মন্তব্যেই আর কান দেয় না মুরলী, প্রতিবাদও করে না, এই ঔদাসীন্যই নবদ্বীপকে সবচেয়ে বেশী আঘাত করে।

নবদ্বীপ বলল, 'আর ললিতা? সে খেয়েছে তো, না, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে?'

মনোরমা জবাব দিল, 'সেও খেয়েছে ওর সঙ্গে।'

নবদ্বীপের মনে পড়ল, মুরলীর ভারি বাধ্য মেয়ে হয়েছে ললিতা, বাপকে ভারি ভালোবাসে, ভাগ্য ভালো মুরলীর। সন্তান অবাধ্য হ'লে যে কি দুঃখ পেতে হয়, তা তাকে টের পেতে হোল না।

খেতে খেতে নবদ্বীপ বলল, 'তা হোলে তুমিই বুঝি শুধু বাকি আছ?'

মনোরমা কোন জবাব দিল না।

নবদ্বীপ বলল, 'আমার ভাত বেড়ে রেখে খেয়ে নিলেই পারো কাজকর্ম সেরে, কখন কোন্ সময় ফিরি, তার তো ঠিক নেই, অত কষ্ট করবার দরকার কি।'

মনোরমা জানে, এটা নিতান্তই নবদ্বীপের মুখের কথা। বাড়ির একজন মানুষ বাকি থাকতে যে কোন মেয়েমানুষ আগে খেয়ে উঠবে, একথা নবদ্বীপের পক্ষে ধারণায় আনাই কষ্টকর।

নবদ্বীপ এক ঢোঁক জল খেয়ে নিল, 'কিন্তু বললে কি হবে, ওটা তোমাদের মেয়েমানুষের স্বভাব। তোমার শাশুড়ীও এমনি ছিল। কতদিন বলে গেছি, আমার রাত হবে, তুমি খেয়ে নিয়ো; কিন্তু একদিনও আমার আগে সে খায়নি। কিন্তু তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমার খেয়ে নিলে তো কোন দোষ নেই।'

মনোরমার মনে হয়, নবদ্বীপ হঠাৎ যেন অত্যন্ত উদার এবং স্নেহশীল হয়ে উঠেছে।

'ছেলেমানুষ!' মনোরমা একটু হাসতে চেষ্টা করে।

'না, ছেলেমানুষ কিসের, তুমি একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েছ. বুড়ী বললেই বুঝি খুশি হও?'

খাওয়া শেষ ক'রে নবদ্বীপ উঠে পড়ে। জলের ঘটিটা শ্বশুরের হাতে তুলে দেয় মনোরমা। এই কিছুক্ষণ আগে যে লজ্জাকর ব্যাপারটা ঘটে গেল বিনোদের বাড়িতে, তার জন্য যতখানি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হবার কথা ছিল নবদ্বীপের, তার কিছুই তো তার কথাবার্তায় টের পাওয়া যাচ্ছে না। বরং নবদ্বীপকে বেশ খানিকটা খুশি বলেই মনে হচ্ছে। অথচ অতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবার, অমন খুশি হয়ে ওঠবার কী এমন ঘটল। মনোরমা অবাক হয়ে ভাবল।

মুখ ধুয়ে এসে নবদ্বীপ বলল, 'যাও আর দাঁড়িয়ে থেক না, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

মনোরমা বলল, 'আমি আর খাব না, ক্ষিদে নেই তেমন।' তারপর বোধ হয় একটু ইচ্ছাকৃত দরদ দেখিয়েই বলল, 'যাই আপনার বিছানা ঝেড়ে দিয়ে আসিগে।'

নবদ্বীপের কণ্ঠ আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল, 'পাগলী মেয়ে, ক্ষিদে নেই না আরো কিছু, রাগ ক'রে না খেয়ে থেকে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ওসব চালাকি হবে না, তুমি খেতে বসবে, তবে আমি যাবো, এই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার সামনে, যাও খেতে বস গিয়ে।'

একটু যে দেখানো বাড়াবাড়ি ভাব আছে নবদ্বীপের কথায়, তা বেশ বোঝা যায়। তবু এই স্নেহটুকু ভালো লাগল মনোরম। মিষ্টি কথা মৌখিক হলেও শুনতে তো মিষ্টিই লাগে। তাছাড়া একেবারে মৌখিকই বা হবে কেন, শাশুড়ী নেই, জা নেই, ননদ নেই; কিন্তু এসব যে মনোরমার নেই এবং এসবের অভাব যথাসম্ভব মিটানো দরকার, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, অমন বৈষয়িক পুরুষমানুষ হয়েও সেকথা যে নবদ্বীপের মনে রয়েছে এবং মনোরমার সুখসুবিধার জন্য চেষ্টাও ক'রেছে নবদ্বীপ এক সময়, সেকথা মনোরমার মনে পড়ল এবং তার সঙ্গে যে সত্যিই একটা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, এটা নতুন ক'রে যেন সে অনুভব ক'রল এবং অনুভব করতে তার ভালো লাগলো।

নবদ্বীপ দাঁড়িয়েই আছে দেখে মনোরমা বলল, 'আপনার আর কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, ঘরে যান।'

'খেতে বস আগে।'

'বললাম যে ক্ষিদে নেই।'

'আবার বলে ক্ষিদে নেই।' নবদ্বীপ সস্নেহে ধমক দিল।

মনোরমা একটু হেসে একখানা থালা নিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়তে বসল নিজের জন্য। (ক্রমশ)

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভূপর্যটক

(৩)

রাত্রি প্রভাত হল। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি তখনও মাও এবং যুবতী উভয়ে শুয়ে আছে। বাইরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে মাওকে জাগালাম। ঘুম থেকে ওঠার পর মাওএর মুখে লজ্জার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চোখ দুটোকে বেশ করে রগড়িয়ে গা-হাত ঝাড়া দিয়ে বিবস্ত্র শরীরে কাপড় পড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে নিয়ে পথে বের হলাম। যুবতী তখনও শুয়েই ছিল। মাও আমাকে পথের সন্ধান যা দিল তাতে সুখীই হলাম। মাও আমাকে জানিয়ে দিল—গোটা পচিশ মাইল যাবার পর আরও ফার্ম হাউস পাব। বিদায়ের বেলা মাওকে বললাম, তোমার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানিও। মাও হেসে বললে—

দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিত ধাত্রী দু'টি শিশু কোলে নিয়ে বসেছেন

"আমাদের বিয়ে হয়নি, বিয়ে হবে।"

"বিয়ে হবার পূর্বে তোমরা একত্রে শুতে পার?"

"কেন পারব না, আমরা ছেলেপিলে তৈরী করার মত কোন কাজ করিনা, আমাদের এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। এইত সবেমাত্র আমার বয়স কুড়ি হলো, যুবতীর বয়স মাত্র ঊনিশ। এর মাঝে বিয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না। ছাব্বিশ বৎসরের সময় আমার বিয়ে হবে, সেজনাই ত একটাও পেনী খরচ করছি না। এই মেয়েটার মা ভয়ানক লোভী। সে দুটো গাই না পেলে কিছুতেই আমার সংগে তার মেয়ের বিয়ে দিবে না।"

মাওএর কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চললাম। মাওএর কথাই ভাবছিলাম। এদের জীবন কত সহজ ও সরল। একবার ভেবেছিলাম, নিগ্রোদের স্বভাব অনেকটা পশুদের মতই। সে কথাও আমার ঠিক নয়। সমুদ্রতীরবাসী নিগ্রোরা ভয়ানক কামুক এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। যদের কামভাব নেই, তাদের বুদ্ধিরও বিকাশ কম বলেই মনে হল। তবে আমি এবিষয়ে কতদূর কৃতনিশ্চয় তা বলা বড়ই মুস্কিল। আমারও ভুল হতে পারে। আমি আফ্রিকার সর্বত্র বেড়াইনি।

পথে বের হবার পর দক্ষিণের ঠান্ডা বাতাসে ক্রমেই আমাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। পথ ক্রমেই উঁচু হতে উঁচু হয়ে চলছিল। পথের দুদিকে তারের বেড়া দেওয়া ফার্মএর পর ফার্ম আসছিল। আমি আপ্রাণ পরিশ্রম করে বার মাইল পথ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। হঠাৎ বাইসাইকেলটা যেন উল্টে গিয়ে আমার উপর ছিটকিয়ে এসে পড়ল—এই যা এখন মনে আছে; তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। চোখ খুলে যখন তাকালাম তখন দেখলাম আমার পাশে একজন বুয়র দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে বলল—কোথায় যেতে চাও? আমি তাকে জানালাম লুইসট্রিচার্ট (Luistricart) যেতে চাই। বিনাবাক্যব্যয়ে সে আমাকে তার ট্রাকে তুলে নিল এবং সাইকেলটাও টেনে নিয়ে গিয়ে আমারই কাছে রাখল। ঘণ্টা দুই চলার পর আমার শরীর সুস্থ হল। হাত দিয়ে সমস্ত শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দেখলাম কোথাও লাগেনি। আর একবার আমি সাইকেল হতে পড়ে গিয়েছিলাম। ডান পায়ের হাড়টাতে যখন কমপাউণ্ড ফ্রেকচার হয়েছিল তখন মোটেই ব্যথা পাইনি, পরে তিনমাস শয্যাশায়ী হতে হয়েছিল। যখন হাড় ভাংগে তখন ব্যথা হয় না, পরে ব্যথা হয় এই হলো আমার অনুভব।

বুয়র গাড়ি থামিয়ে জংগলের কাছে শুকনো কাঠ খুঁজতে লাগল। আমিও তাকে সাহায্য করলাম। কাঠ বোঝাই সমাপ্ত হবার পর সে আবার গাড়ি চালাল। আমরা একটা ছোট গিরিবর্ত্ম দিয়ে চলতে লাগলাম। খাইবার পাসের তুলনায় এখানকার পাহাড় অনেক খাড়া। ট্রাক এগিয়ে যেতে পারছিল না। মাঝে মাঝে পেছন দিকে নেমে আসছিল। আমরা যখন গিরিবর্ত্মর মধ্যস্থলে, তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছিল। দেখতে দেখতে অতি কাছের ছোট খাড়ি নালাটা বৃষ্টির জলে ভর্তি হয়ে প্রবল স্রোত নীচের দিকে চলে যাচ্ছিল। সে এক দৃশ্য বটে। নায়গ্রা অথবা ভিক্টোরিয়া প্রপাতের জলস্রোতের সংগে তার তুলনা হতে পারে। তবে আমি বৈজ্ঞানিক নই একথাও জানা উচিত। বুয়র অতি কষ্টে ট্রাকটিকে পাহাড়ের গায়ের কাছ দিয়ে রেখে আগিয়ে যাচ্ছিল। সুখের বিষয় ওপর হতে কোন মটর বা লরী আসেনি। আরও দুঘণ্টায় আমরা ছয় মাইল পথ পেরিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে পৌঁছেছিলাম। সমতল ভূমি শুরু হবার কয়েক মাইল দূরেই লুইসট্রিচার্ট। বুয়র আমাকে গাড়ি হতে নামিয়ে দিয়ে আংগুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল এদিকেই "কুলিরা" থাকে। গাড়ি হতে নামার পরই যখন বুয়রের মুখে কুলি কথাটা শুনলাম, আমি তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে কুলি অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের বাড়ির দিকে চললাম। কুলি কথাটা কিন্তু আমাকে বড়ই বেদনা দিয়েছিল।

একজন ইণ্ডিয়ানের দোকানের সামনে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আমাদের দেশের মত তাদের দরজা খোলা থাকে না। দরজায় করাঘাত করতে হয়। ঘরের সামনের জমিতে কয়েকজন লোক বসেছিলো। তাঁদের নমস্কার করে আমার পরিচয় দিলাম। যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মাঝে একজন বললেন, "আমি ত আপনার প্রবন্ধ পাঠ করেছি, বন্দেমাতরম সম্বন্ধে আপনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কি?" এই প্রবন্ধটি যদি আমার না লেখা হত তাহলে এ'দের কাছে কী ব্যবহার পেতাম তাঁরাই জানেন। প্রবন্ধটি আমার বলাতেও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ আমার প্রতি করুণা করতে চাইছিলেন না। নিজেই বলতে বাধ্য হলাম, এখানে আমি আজ থাকব এবং খাব। তখন ভদ্রমহাশয়দের যেন একটু হুঁস হল। এ'দের কাছে পথের দুঃখের কথা কিছুই বললাম না। এ'রা ঠিকঠিকই কুলিপ্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। পরিশ্রান্ত লোককে কি করে একটু আরাম দেওয়া যায়—এ'দের অজানা ছিল না। তাই নিজেই বললাম, 'আমার সাইকেলটা বাইরে পড়ে আছে, কোথায় রাখব বলে দিন।' একজন যুবক সাইকেল রাখার স্থান দেখিয়ে দিলেন। সেখানে সাইকেলটা

রেখে, গামছা এবং সাবান নিয়ে বাথরুম দেখাতে বললাম। স্নান সমাপন করে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে একটা বিছানাতে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। প্রত্যেকটি জিনিস আমাকে চাইতে হয়েছিল, অথচ ছিল সবই।

রাত্রি আটটার সময় দিপালী বা দেওয়ালীর আনন্দ করার জন্য কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁরা আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা না বলে অন্যত্র যাবার পূর্বে বলে গেলেন কাল দেখা হবে। মনে মনে বলেছিলাম 'কাল যদি শরীর ভাল হয় তবে আর এখানে থাকব না।' কিন্তু পরের দিন সকাল বেলাতেই জ্বর হয়েছিল। জ্বর নিয়েই আমি সাদা অর্থাৎ বুয়রদের পাড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং আগের দিন যিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আমার চাল চলন, কথাবার্তা অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মত ছিল না। আমাদের দেশে বেতনভুক্ত চাকর যেমন মনিবের সামনে হয় মাথা নত করে দাঁড়ায়, নয় মনিবকে খুশি করার জন্য হাসে, এদের চাল চলনও সেরূপই। কিন্তু আমার মাথা নীচু ছিল না, কারোকে খুশি করার জন্য দাঁত দেখিয়ে হাসিনি। অনেকক্ষণ খুঁজেও যখন আমার সাহায্যকারীর সাক্ষাৎ পেলাম না তখন একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলি বুয়র ছেলেমেয়েদের কাছে লেকচার দিতে লাগলাম। আমি তখন কি বলেছিলাম মনে নেই, কিন্তু প্রত্যেকটি লোক যেই আমার লেকচার শুনেছিল সেই মাথা নত করেছিল। আমি সেই লেকচারে বুর বেকারদের আক্রমণ করতেও কসুর করিনি। ধন্য শিক্ষিত সমাজ।

আমি চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি—কথাটা শুনেই, ইণ্ডিয়ানদের যেন চৈতন্য হল। তারা ভেবেছিল হয়ত আমি তাদের কাছে টাকা ভিক্ষা চাইব ফাণ্ড করার জন্যে। কিন্তু তা না করে তাদেরই পক্ষ হয়ে প্রকাশ্যস্থলে বুয়রদের কাছেই তাদের খারাপ ব্যবহারের কথা বলে তাদের উপকারই করেছিলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় পতাকা আমাদের জাতীয় পতাকার মতই। আয়র্লণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমাদের জাতীয় পতাকার তিনটি রংই সমান, তবে কেউ সবুজ রংটাকে উপরে রেখেছেন, কেউ মাঝে রেখেছেন আর কেউ রেখেছেন নীচে। আমি অনেক সময় দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় পতাকাকে ভুল করে অভিবাদন করেছি। সেজন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার লোক এখনও স্বাধীন হতে পারেনি।

বক্তৃতা সমাপ্ত করে একদম বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণ পরই একজন পুলিশ অফিসার এসে আমার সমাচার নিয়ে গেলেন। লোকটির আচার ব্যবহার ভাল ছিল। আমি তাকে আরও বলেছিলাম, তুমি যদি আমার দেশে গিয়ে আমার ঘরে যেতে, তবে তোমার কাছ হতে অন্তত কয়েক শত পাউণ্ড আদায় করে নিতাম, কারণ আমাদের দেশে তোমার জাতের লোক অছুত, তোমাদের ছুঁলেই আমাদের স্নান করতে হয়। একথা বলার আর কোন মানে নেই, শুধু বুঝিয়ে দেওয়া, তোমরা যেমন আমাদের ঘৃণা কর আমরা তেমনি তোমাদের ঘৃণা করি। এভাবটা জাগে, জাগা উচিত, যদি রক্ত মাংসের শরীর হয়। আমার সে ভাব অনেক সময়ই জাগত, তবে দাবিয়ে রাখতাম।

বিকালবেলা জ্বর নিয়েই স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে গেলাম। সেখানে আমাকে দুটি দলের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, একটি হিন্দু যুবক সংঘ এবং অপরটি মুসলিম যুবক সংঘ। সভাতে উপস্থিত হয়েই সভাপতি নির্বাচন হবার পূর্বেই আমি বললাম, আমাকে যে দুটি দল নিমন্ত্রণ করেছেন, তাদের কারো আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করব না। আমি কংগ্রেসের আমন্ত্রণ পাইনি, তবুও ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হতে ভারতীয় ট্রান্সভাল কংগ্রেস সভাদের সঙ্গেই ঘরোয়া কথা বলব। আপনারা হিন্দু মুসলমান করছেন, কিন্তু কেউ ত আপনাদের হিন্দু মুসলমান বলে না, আপনাদের বুয়ররা বলে কুলি। কুলিদের ধর্ম-জ্ঞানের দরকার হয় না। সকালবেলা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কুলি কথারই প্রতিবাদ করেছি। যদি আপনারা হিন্দু মুসলমান কথার উত্থাপন করেন, তবে আমিও বুয়রদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আপনাদের বলব আপনারা "কুলি।" আমাকে বুয়ররা কুলি বলতে আর সাহস করবে না, কারণ আমি কথায় এবং কাজে তার প্রতিবাদ করতে পারব বলেই মনে হয়। আমি এইমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকাতে এসেছি। বুয়রদের বুঝাতে সক্ষম হব ভারতের লোক কুলি নয়। হয়ত আমি বলতে বাধ্য হব, যে সকল লোক এখানে ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয়, তারা কোন্ দেশের লোক তারও ঠিক নেই। বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে দেশ-ভক্তি যদি থাকে, তবে সু-কে কু এবং কু-কে সু করতে বেশিক্ষণ লাগে না। গুজরাতী ধনীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার মত কোনই দরকার আমার ছিল না এবং যদি বিপদের সম্মুখীন হতে হত, তবে টাকার দরকার মোটেই হত না। এই পৃথিবীতে যত বিপ্লব সফল হয়েছে তার পেছনে টাকা নয়, স্বাধীন ভাব এবং শত্রুকে অবজ্ঞাই তার মুখ্য কারণ।

উপস্থিত যুবকবৃন্দকে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, তোমাদের বাড়ি ঘর কোথায় অবস্থিত তা দেখেও যদি তোমাদের আক্কেল না হয়, তবে তোমাদের মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া উচিৎ নয়। শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান বেছে তোমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য ভূমি বলেই জল ঢালু স্থানে চলে যায় নতুবা এসব স্থানে শুকরেই বাস করে। বাস্তবিক সেদিন যা বলেছিলাম তার মাঝে দেশ ভ্রমণের নাম গন্ধও ছিল না। ছিল প্রাণের মাঝের দারুণ ঘূর্ণী বায়ুর প্রতিধ্বনি মাত্র। আমি যা বলছিলাম তাই একজন ইণ্ডিয়ান সর্টহেণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি পেটের দায়ে এই কাজটি করে থাকেন। ইণ্ডিয়ানদের পেট, দারুণ পেট। এই পেটকে বোঝাই করতে সকল কাজই আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু এসব কথা তখন আমি চিন্তাও করিনি। স্বাধীন মানুষ, স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা হচ্ছিল তাই বলে যাচ্ছিলাম। আমি ভাল করেই জানতাম মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আমাকে শুধু তাড়িয়ে দিতেই সক্ষম হতেন, এর বেশী কিছুই করতে পারতেন না। এতে হয়ত আমার আমেরিকা দেখা হত না, তাতে আমার বয়ে যেত।

সেদিনের কথা শুনে অনেকেরই চৈতন্য হয়েছিল। আমি এই ছোট শহরটিতে আরও দুদিন থেকেছিলাম। অনেক বুয়র, বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, কোন ইউরোপীয় অথবা বুয়র কখনো ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি আসে না; দরকার হলে ডেকে পাঠায়। আমি ইণ্ডিয়ান জেনে আমাকে অনেকেই তাদের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি কারো বাড়িতে যাইনি এবং চিঠির পেছনে লিখে দিতাম, দরকার হয়ত এসে দেখা করবেন। ইউরোপীয় জাতের একটা সৎগুণ আছে। তাদের দরকার হলে তোমার বাড়িতে কেন তোমার দরজায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে, এতে একটুও অপমান বোধ করবে না। আমাদের দেশে পর্যটকের কোন মূল্য নেই, কিন্তু ইউরোপীয়দের কাছে পর্যটকের সম্মান আছে, সেইজন্য বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজেও অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। যে ডাচ ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করেছিলেন এবং কুলি বলে সম্বোধন করেছিলেন তিনিও হঠাৎ বিকালবেলা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কেন আমাকে কুলি বলেছিলেন সে কথাটা আমি বলতে সক্ষম হব না, কারণ এখন শুধু নির্দোষ কথাই বলব। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল যে, বাস্তবিকই আমরা টাকার বিনিময়ে যা তা করতে পারি।

অবধূতের গল্পের ঝুলি—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত। প্রকাশক—মধুচক্র, ১।১, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় নিজের চোখ ও মনকে সর্বদাই সজাগ রাখিয়াছেন দেখা ও জানার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি যে-দেশেই গিয়াছেন, সে-দেশের কিশোররা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি তাহাদের বীরত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা ও সৎসাহসের যে পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে গল্পের আকারে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পাঠকদের শুনাইয়াছেন। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার ইহা একখানি উপযুক্ত গ্রন্থ। 'মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালী সন্তান' —এই অপবাদ যে-দেশের বুকের উপর আজও জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া আছে, সে-দেশের ছেলেমেয়েরা এই বই পাঠে নিশ্চয় উৎসাহিত হইবে—ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

গানের বলাকা—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগদাধর শেঠ, প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও ১৪৫, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বরলিপি সমেত ৩১টি গানের সংকলন। গানগুলি রচনা করিয়াছেন গ্রন্থকার নিজেই, সুরে দিয়াছেন সুনীল দত্ত ও স্বরলিপি করিয়াছেন সুশীল সিংহ। মার্গ সংগীতের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গানগুলি রচিত; কথা ও সুরে আধুনিকত্বের ছাপ আছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

শরত-জীবনী—অরূপ প্রণীত। ভারতী সাহিত্য সভা, ৮৯, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিবেকানন্দ সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং পার্শীবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শরতচন্দ্র মিত্রের জীবনী। শরতচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত, অনন্য কর্মী ও নীরব সাধক ছিলেন। গল্প লিখিবার ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া বইখানি লিখিত। ভাষা সহজ ও সুলিখিত। মহৎ জীবনী পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এই পুস্তকে রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, তারাদাস চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদার—ইঁহাদের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। তৎপূর্বে এই আলোচনার ভিতর দিয়া গ্রন্থকার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের একটা ধারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্তমান বাঙলার জাতীয় জীবনকে বুঝিতে হইলে অতীত বাঙলার এই সব কৃতী সন্তান এবং হিতৈষী বিদেশী কয়েকজন বান্ধবের জীবনী আলোচনা একান্তভাবেই আবশ্যক। গ্রন্থখানা তথ্যানুসন্ধানমূলক এবং এই সব তথ্য সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহার সেই শ্রম স্বীকারের ফলে জাতীয় জীবন গঠনে বঙ্গের কয়েকজন কৃতীসন্তানের যে অবদান এতদিন লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, তাহা উন্মুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের এই সুদীর্ঘ সাধনা জাতির আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করিতে সাহায্য করিবে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কোন দেশ বা জাতিই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যোগেশবাবুর লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্যসেবা এবং স্বদেশসেবা উভয় দিক হইতেই মূল্যবান হইয়াছে। প্রত্যেক পুস্তকালয়ে এই গ্রন্থ থাকা উচিত।

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র:—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক। বাঙলা ভাষায় আধুনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার এই পুস্তকখানা যে বিশেষরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, অল্পদিনের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক সমর বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে এই পুস্তকখানা বিশেষ সাহায্য করিবে। বহু চিত্রের দ্বারা বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য করা হইয়াছে। বর্ণনাভঙ্গী কৌতুহল উদ্রেক করে। সহজ এবং সরল ভাষায় সমর-বিজ্ঞানের তথ্যরাজী এমন সরস করিয়া বলিবার ক্ষমতা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের চর্চা থাকায় লেখকের পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদে যাঁহারা আগ্রহশীল, তাঁহারা পুস্তকখানা পাঠ করিলে সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিতর হইতেও সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা ঠিক ধারণা করিতে পারিবেন এবং যুযুধান পক্ষদ্বয়ের সমরনীতি ও সমরাস্ত্র প্রয়োগ কৌশলের তাৎপর্য উপভোগের কৌতুহল নিবৃত্তিজনিত আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভিন্ন বিষয় জানিতে এবং বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দুই দম্পতি—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত; প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত বি, এ; ১০১নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তকখানি একটি সামাজিক নাটক—তিনশত পৃষ্ঠায় ইহার যবনিকা পতন হইয়াছে। নাট্যবস্তু আমাদের ভাল লাগিয়াছে এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি সখের নাট্য সম্প্রদায় মাত্রেই এই নাটকখানি অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিতে পারিবেন।

আবছায়া—শ্রীমহেন্দ্রলাল সেন; প্রকাশক—বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট।

আলোচ্য বইখানি লেখকের লেখা কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং গানের সমষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি রচনা আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

বিশ্ব ভারতী পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯)—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শান্তিনিকেতন পোঃ, বীরভূম। মূল্য প্রতি সংখ্যা ॥৵, বার্ষিক সডাক ৫।৹ টাকা।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে—"আমাদের বিশ্বভারতী পত্রিকা যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষভাবে অনুস্যুত, সে কথা আমরা প্রথম সংখ্যাতে বলেছি।...রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে (শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যই বা কি আদর্শই বা কি। নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকে—বিশেষ ক'রে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের—যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন সেই সব প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্রের কতকগুলি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করলুম।" রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান পত্রগুলি ছাড়া ইহাতে আছে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'শান্তিনিকেতন (আদিপর্ব)' "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের" 'আমাদের শান্তিনিকেতন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান ও তাহার স্বরলিপি। স্বরলিপি করিয়াছেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। সংখ্যাখানিতে দুইখানি ছবি মুদ্রিত হইয়াছে—একখানা আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ আর একখানা শান্তিনিকেতন অতিথি ভবনের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ (আনুমানিক ১৯০১ সালে)। কাজেই এই সংখ্যাখানাকে স্বচ্ছন্দেই শান্তিনিকেতন সংখ্যা বলা যাইতে পারে। শান্তিনিকেতনে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা যদি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন জীবনের এবং শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে সংখ্যাখানির বৈচিত্র্য বাড়িত এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিষয় বৈচিত্র্যের অভাবে এ সংখ্যাখানি আমাদের নিকট একঘেঁয়ে লাগিয়াছে।
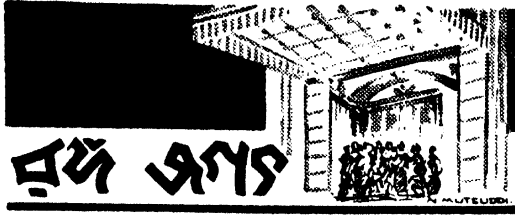
দেশের চিন্তাশক্তি ও শিল্প-প্রতিভা যে দিন দিন ভোঁতা হয়ে আসছে, তার প্রমাণ দেশী ছবি ও নাট্যাভিনয় দেখলে অনেকখানি উপলব্ধি করা যায়। গত ক'বছর ধরেই কোনদিক থেকেই প্রমোদ-জগতে মৌলিকতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যা কিছু হয়েছে, সবই বিদেশীর অনুকরণ এবং তাও অতি নিকৃষ্ট ধরণের। আমাদের ছবি কি নাটকে, দেশকালের বা সাময়িক ঘটনাপ্রবাহের কোন ছাপই থাকে না, আর তাই তা দেশের লোকের মনের সঙ্গে খাপ খেয়ে উঠতে পারে না। যে দু'চারখানি ছবি বা দু-একটি নাটক সুদীর্ঘকাল চলার সৌভাগ্য লাভ করে, সে-গুলো দেশের মনে খাপ খেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় না, সেগুলির অধিকাংশই চলে চুটকী রস সঞ্চারের জোরে। তাদের দ্বারা স্থায়ী কোন উপকার জনগণের হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনকে বিকৃত করে তোলার দিকেই টেনে নিয়ে যায়। সারবস্তু কিছু পরিবেশন করার দিকে কাহিনীকার, প্রযোজক, পরিচালক কাউকেই তেমন মাথা ঘামাতে দেখা যায় না।

* * * * *

আগে আমরা বম্বের ছবি ইংরেজি ছবির নকল বলে ঘৃণা করে এসেছি, অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে আমরা জোর গলায় নিন্দা করে এসেছি। এখন আমাদের ঘাড়ে সে-ভূত এসে চেপেছে। ইদানীং এখন বাঙলা ছবি খুব কমই দেখা গিয়াছে, যার মধ্যে কোন না কোন বিলিতী ছবির কিছু অংশ পাওয়া যায় নি, এমনকি, অনেক ছবিতে কোন কোন বোম্বাই ছবিরও অনুকরণ পাওয়া গিয়েছে। আচ্ছা, এমন করে 'শিল্প', 'শিল্প' বলে গলাবাজি করার দরকার কি, আর সে-শিল্প দেশের জনগণের সহানুভূতিই বা দাবী করতে পারে কিসের জোরে? দেশীয় জীবনের কিছু পাওয়া যাবে নাই যদি তাহলে নিকৃষ্ট দেশী ছবির বদলে বিদেশী ছবির পৃষ্ঠপোষকতা লোকে করবে নাই-বা কেন! দেশী ছবিতে সত্যি থাকে কি?—সেই একদল স্যুটেও-বুটেও বিলিতী কেতাদুরস্ত আজব চরিত্র, সাধারণের কল্পনা এবং বাস্তব ছাড়া সব ঘটনা, নক্কারজনক পরিস্থিতি ও পরিবেশ, এ-বাদে ছবি নির্মাতাদের দেবার কিছু নেই যেন!

* * * * *

এদেশের জনগণ যে Complex-এর প্রভাবে কতখানি চলে তার একটা পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন রাত্রে—কলকাতায় যেদিন শত্রুবিমান প্রথম বোমা ফেলে। রাত সাড়ে দশটা তখন, অর্থাৎ সিনেমাগুলি তখনও চলছে। সাইরেন বাজামাত্র আইনমতে ছবির

প্যারাডাইসে প্রদর্শিত 'নই দুনিয়া' চিত্রে শোভনা সমর্থ

প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায় এবং দর্শকরা সব জায়গাতেই সিনেমার আশ্রয়স্থলে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। বিপদ উত্তরোবার সঙ্কেতধ্বনি হয় প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, অর্থাৎ সে-রাত্রে পুনরায় ছবি দেখানোর সময় আর হাতে ছিল না। সিনেমার কর্তৃপক্ষরা পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সেই প্রদর্শনীর দর্শকদের ছবি দেখাবার আর একটা দিন ধার্য করে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশী ছবিঘরগুলিতে যে সমস্ত দর্শক ছিলেন, তাঁদের

অধিকাংশই সে-বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাঁরা দাবী করেন যে, হয় ছবি দেখানো হোক, না হয় পয়সা ফেরৎ দেওয়া হোক। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ পূরণীয় যা, অর্থাৎ প্রদর্শনীর পুনরারম্ভ, চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষরা তাতেই রাজি হয় এবং দেশী ছবিঘরগুলি ভাঙে সেদিন রাত দেড়টা থেকে দুটোয়, মানে ছবিঘর খোলা রাখার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। দর্শকেরা দেশী ছবিঘরগুলির উপর জুলুম করে এই বে-আইনী কাজটা করাতে চিত্রগৃহ কর্তৃপক্ষদের বাধ্য করেন। অথচ সেই দর্শকদেরই দেখুন, বিলিতী ছবিঘরগুলিতে কাউকে বলবার দরকার হয়নি, বিপদ সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্রই সুড়সুড় করে তাঁরা যে-যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। কোন বিদেশী ছবিঘরকেই সেদিন আর প্রদর্শনী পুনরারম্ভ করতে হয়নি। দেশী চিত্রগৃহগুলিকে নরম মাটি পেয়ে দর্শকদের এ দাপাদাপি সত্যিই অত্যন্ত নিন্দার বিষয়।

মিনারে ও ছবিঘরে 'বন্দী'

চিত্ররূপা লিমিটেডের প্রথম অবদান 'বন্দী' গত ১১ই ডিসেম্বর মিনার ও ছবিঘরে একত্রে মুক্তিলাভ করেছে। ছবিখানির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন সুসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে শৈলজানন্দ যে কাহিনীটি রচনা করেছেন, চলতি ধাঁচের বাঙলা ছবির কাহিনীর সঙ্গে তার একটু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। একটা মাত্র পুরুষ চরিত্র দিয়ে সমগ্র কাহিনীটিকে ভরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা তিনিই সম্ভবত প্রথম করলেন, আর এ-বিষয়ে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন অসামান্যরূপে। সাহিত্যিক বলে রস-পরিবেশনে তিনি সহজেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। ছবিখানি কলাকৌশলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও এক হিসেবে বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়—তা হচ্ছে চরিত্র ও ঘটনাবলীর জীবনীশক্তি প্রাচুর্যে। বাস্তব ছাড়া অদ্ভুত একটা কিছু করতে তিনি যান নি, যতটা সম্ভব খাঁটি দেশী রূপ দেবারই চেষ্টা তিনি করেছেন। তাতে অনেক কিছু crude এসে পড়লেও মনেপ্রাণে তাকে গ্রহণ করতে বাঙালী দর্শকদের বাধবে না কোথাও। প্রথম চিত্র 'নন্দিনীর' চেয়ে শৈলজানন্দ অনেক উন্নত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন; কলা-কৌশলাদির দিকটা আর একটু উন্নত করে তুলতে পারলে শৈলজানন্দ অনায়াসে একজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালকের আসন দাবী করতে পারবেন।

* * * *

'বন্দী'র সাফল্যে নামভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কৃতিত্ব অনেকখানি; ভূমিকালিপিতে ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান অভিনয়-শিল্পী থাকা সত্ত্বেও অতি সহজেই তিনি সকলকে ছাপিয়ে দর্শক-মনে প্রতিভাত হয়েছেন। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় অভিনয়-শিল্পী ছবি বিশ্বাস এতকাল প্রত্যেক ছবিতেই তাঁর প্রতিভার সামনে সকলকেই দাবিয়ে রেখে আসছিলেন, এ-ছবিতে জহর তাঁকেও দাবিয়ে দিয়েছে। জহরের অভিনেতা-জীবনের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব 'বন্দী'।

* * * *

ছবিখানির গানগুলি সুগীত হয়েছে। আধুনিক বাঙলা গান ছাড়া কাহিনীর আবহাওয়াকে আরও অন্তরঙ্গ করে তুলেছে তরজা ও কবির গান দুটিতে। 'বন্দী' নিঃসন্দেহে বাঙালী দর্শকদের অন্তর জয় করতে সমর্থ হবে।

আচার্য আর্টের 'উলঝন' চিত্রে সর্দার আখতার ও কৃষ্ণকান্ত

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের খেলা শেষ হইলে তাহার পর শেষ মীমাংসার খেলা আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতা শেষ হইতে এখনও এক মাসের অধিক সময় লাগিবে। এই এক মাসের মধ্যে দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। ...শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু ...মানে তাহা নাই। দেশের লোকের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে খেলা দেখা ও খেলায় যোগদান করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইবে কি না তাহা বর্তমানে কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। সুতরাং রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের খেলা বর্তমানে অনুষ্ঠিত হইলেও শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবেই ইহাও দৃঢ় ধারণা করা চলে না। ...এই কথা ঠিক যে, দেশের অবস্থা এখনও এইরূপ শোচনীয় হয় ...ই প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে শেষ হইবার এখনও সম্ভাবনা আছে।

বাঙলার পরিচালকগণের দায়িত্ব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের দায়িত্ব এখনও হ্রাস পায় নাই। বিহার দলকে প্রথম খেলায় পরাজিত করিয়া পরিচালকগণ যদি কল্পনা করিয়া থাকেন যে, পরবর্তী খেলাতেও সহজেই বিজয়ী হইবেন তাহা হইলে আমরা বলিব তাহা অতি ভ্রান্তিমূলক ধারণা। বাঙলা দল অনেকটা ...ভাগ্য বলেই বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছে। যেরূপ ক্রীড়া-কৌশলের অবতারণা বাঙলার দলের খেলোয়াড়গণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের জয়লাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিহার দলের দুর্ভাগ্য যে, খেলোয়াড়গণ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মারাত্মক ত্রুটি ...বাঙলা দলের জয়লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন! যাহা ...ক, যাহা হইয়াছে তাহা লইয়া অধিক চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। পরবর্তী খেলায় জয়ী হইতে হইলে যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস সেই বিষয় আলোচনা ...যাউক। বিহার দলের বিরুদ্ধে বাঙলার পক্ষে যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিলে ...েই আমরা দেখিতে পাই, দলে ওপনিং ব্যাটসম্যান অথবা প্রথম ...িবার উপযোগী খেলোয়াড়ের অভাব ছিল। জব্বর ও এম ...লী নামক দুইজন খেলোয়াড়কে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হইলেও ...র করিয়া বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা বোধ হইতেছে না যে, ...রা "প্রথম খেলোয়াড় হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।" উহাদের দুই-...ই বিহার দলের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ইনিংসে অতি ...চনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাটিং অথবা ফিল্ডিং কোন ...েই ইঁহারা এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই, যাহাতে ...চলে যে, পরবর্তী খেলায় ইঁহাদের দল হইতে বাদ দিবার কোনই ...জনীয়তা নাই। ইঁহারা বাঙলা দলের মত একটি বিশিষ্ট দলে ...রূপেই স্থান হইতে পারেন না। ইঁহাদের দুইজনের স্থানে ...জন নূতন খেলোয়াড় দলভুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

"টেম্পলিন একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং তিনি ...ক্ত হইলে বাঙলা দলের শক্তি বৃদ্ধি হইবে", এইরূপ মন্তব্য প্রচার ...া পরিচালকগণ তাঁহাকে দলভুক্ত করেন। কিন্তু বিহার দলের ...দ্ধে তিনি যেরূপ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ...কে পুনরায় পরবর্তী খেলায় বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ সমীচীন হইবে না। কি উইকেট রক্ষকতায় কি ব্যাটিংয়ে তিনি খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যের অধিকারী নন। তিনি যেরূপ খেলিয়াছেন, সেইরূপ খেলা প্রদর্শন করিতে পারেন, এইরূপ বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অভাব নাই। বাঙলা দলে যখন বাঙালী খেলোয়াড় লওয়া সম্ভব তখন অবাঙালী অথবা বৈদেশিক খেলোয়াড় দলভুক্ত করিবার কি স্বার্থকতা আছে? বিহার দলের বিরুদ্ধে ফাস্ট বোলারের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সকল দলের সহিত খেলিবার সময় প্রয়োজন হইবে না ইহা দৃঢ়তার সহিত কেহই বলিতে পারেন না। ক্রিকেট দল কখনও ফাস্ট বোলার ছাড়া চলে না। পরিচালকগণ পরবর্তী খেলায় বাঙলা দলে একজন ফাস্ট বোলার লইবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

সিন্ধু বনাম পশ্চিম ভারত রাজ্য দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের সেমিফাইন্যাল খেলায় সিন্ধু দল পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের সহিত মিলিত হয়। উভয় দলের খেলোয়াড়গণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সকলেই এক-বাক্যে বলিবেন, সিন্ধু দল বিজয়ী হইবে। খেলা যখন আরম্ভ হয় তখনও পর্যন্ত সকলে এই ধারণাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে সিন্ধু দলকে পরাজিত করিয়াছেন। ইহা কেবল সম্ভব হইয়াছে ঐ দলের বোলারদের জন্য। চিপ্পা ও শান্তিলাল গান্ধী ইতিপূর্বে বোম্বাই অঞ্চলে বিভিন্ন খেলায় বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহারাই এই বৎসর পশ্চিম ভারত রাজ্য দলে খেলিয়া সিন্ধু দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা সম্ভব করিয়াছেন। সিন্ধু দল একরূপ ইঁহাদের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য প্রথম ইনিংসে ১১৮ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৬ রান করিতে সক্ষম হন। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল তাহার প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে ২০০ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে এক উইকেটে ২৭ রান করিয়া খেলায় জয়লাভ করিয়াছেন। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল পরবর্তী খেলায় মহারাষ্ট্র ও বরোদা দলের বিজয়ীর সহিত খেলিবেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

সিন্ধু প্রথম ইনিংস:—১১৮ রান (কুমারুদ্দিন ৪৭; শান্তিলাল গান্ধী ৩৮ রানে ৪টি, চিপ্পা ৪১ রানে ৩টি উইকেট পান)

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রথম ইনিংস:—২০০ রান (ওমর ৪৬ কিষেনচাঁদ ৫৭ রান নট আউট, পৃথিরাজ ২২; হায়দার আলী ৩৯ রানে ৩টি, সামন্তনী ৪৯ রানে ৪টি উইকেট পান)

সিন্ধু দ্বিতীয় ইনিংস:—১০৬ রান (ইরানী ২৮, নওমল ২১; শান্তিলাল গান্ধী ২৭ রানে ৪টি, চিপ্পা ২৫ রানে ৩টি, নেয়াল-চাঁদ ৩৯ রানে ২টি উইকেট পান)

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দলের সাফল্য...

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল এখনও রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোন খেলাতেই যোগদান করে নাই। তবে এই দলটি যে শক্তিশালী করিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহা বোম্বাইর এক প্রদর্শনী খেলার ফলাফল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। এই প্রদর্শনী খেলাটি ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় মহারাষ্ট্র দলকে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। মহারাষ্ট্র দল খেলায় ২৫৩ রানে বিজয়ী হয়। মহারাষ্ট্র দলের তরুণ খেলোয়াড় সারভাতে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহারাষ্ট্র দল:—৯ই উইকেটে ৪৪২ রান (পণ্ডিত ৭৭,

নিম্বলকার ৪৮, সারভাতে ১০৫, গোয়ালী ৪১, রেগে ৪১; বোটা-ওয়ালা ১১০ রানে ৩টি, বিজয় মার্চেণ্ট ৯৩ রানে ৩টি উইকেট পান)

ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া:—১৮৯ রান (বোটাওয়ালা ৫৯, কনট্রাক্টর ৬১ রান নট আউট; সোহনী ২৯ রানে ২টি, সারভাতে ৫১ রানে ৫টি, সিন্ধে ৪৮ রানে ২টি উইকেট পান)

আমেরিকার টেনিস ক্রমপর্যায়

দেশের মধ্যে বিশৃংখল অবস্থা বর্তমান থাকায় ভারতের টেনিস ক্রমপর্যায় কমিটি এই বৎসর কোন তালিকা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমেরিকার টেনিস ক্রমপর্যায় কমিটি এই অজুহাতে নিজের কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন নাই। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম পালন করিয়াছেন। তাঁহারা আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ তালিকা প্রকাশিত হইল:—

পুরুষ বিভাগ

(১) ফ্রেড স্রোডার
(২) ফ্রাঙ্ক পার্কার
(৩) ফ্রান্সিস্কো সেগার অফ ইকুয়েডার
(৪) গার্দার মুলোর
(৫) উইলিয়াম ট্যালবার্ট
(৬) সিডনী উড

মহিলা বিভাগ

(১) মিস পালিন বেজ
(২) মিস লুইস ব্রাউ
(৩) মিস মার্গারেট ওস্বর্ন
(৪) মিস হেলেন বর্নড।

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বাত্যাবিধ্বস্তদের সাহায্যকল্পে আই. এফ. এ. প্রদর্শনী ফুটবল খেলার যখন আয়োজন আরম্ভ করেন, আমরা তখনই বলিয়াছিলাম এই আয়োজন আশাপ্রদ হইবে না। আই. এফ. এর পরিচালকগণ আমাদের সে উক্তি উপেক্ষা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর দুইদিন দুইটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করেন। প্রথম দিনে বাছাই বাঙালী দল অবশিষ্ট দলের সহিত এবং দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বাছাই দলের সহিত হিজ ম্যাজেস্টিস ফোর্স দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অসময়ের ফুটবল খেলার আয়োজনে যেরূপ ফল হইবে বলিয়া পূর্বে আমরা উল্লেখ করি, ফলত তাহাই হইয়াছে। এই দুইদিনে লোক সমাগম আশানুরূপ হয় নাই। মাত্র দুই সহস্র মুদ্রা দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এত কম অর্থ যে উঠিবে তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম। দুইদিনের খেলার একদিনও দর্শকগণ খেলা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করেন নাই। সকলকেই খেলার শেষে বলিতে শোনা গিয়াছে, "অসময়ে খেলা কখনও ভাল হয় না। তবে অতি সাধারণ শ্রেণীর খেলা যে দেখিব ইহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল।" এইরূপ উক্তি যে দর্শকগণ করিবেন তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম। আয়োজনের জন্য পরিশ্রম হইল অথচ উদ্দেশ্য সফল হইল না বড় দুঃখের বিষয়।

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলার প্রতিনিধিগণ অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়া কোন বিভাগেই সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই প্রতিযোগিতার সূচনাতেই বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। একমাত্র ম্যাডগাঙকার কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হন। পুণা ও পাঞ্জাবের খেলোয়াড়গণ অধিকাংশ বিষয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পুরুষদের সিংগলস

প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ১৫-৯, ১৫-৩ পয়েণ্টে কে বঙ্গলেকারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস

মিস তারা দেওধর (পুণা) ১০-১২, ১২-১০, ১১-৯ পয়েণ্টে মিস সুন্দর দেওধরকে (পুণা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

প্রকাশনাথ ও অশোকনাথ ১১-১৫, ১৫-১০, ১৮-১৩ পয়েণ্টে পটুবর্ধন ও মাগউইকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস সুন্দর দেওধর ও মিস তারা দেওধর ১৫-৮, ১৫ পয়েণ্টে মিস তলোয়ার খান ও মিস দাদীবুর্জরকে পরাজিত করে

সাহিত্য সংবাদ

আত্মশুদ্ধি ও শান্তিলাভের উপায়

বিগত ৪ঠা পৌষ, রবিবার অপরাহ্নকালে ৪৫নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে অধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ, পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের ভবনে সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিস্টার-এট-লয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী ধর্মসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি প্রভু জগবন্ধুর লোকোত্তর চরিত্র বর্ণাত্মক স্বরচিত একটি মধুর কবিতা পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করিয়া ফেলেন। ইহার পর ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রভু জগবন্ধুলীলাকীর্তন করিয়া বক্তৃতা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, এম-এ মহোদয় উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় প্রভুর চরণাশ্রয়ের মহিমা কীর্তন করেন। ভেদ-বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির অভিমানজনিত অধর্মকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় অপসারিত করিয়া প্রেম-পূর্ণ আত্মনিবেদনের পথে প্রভু জগবন্ধুর জীবনে এবং সাধনায় সত্য ধর্ম কিরূপে যুগোচিত আদর্শে বাঙলা দেশের লক্ষ লক্ষ অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, 'দেশ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, লোকসেবার জন্য তাপবোধই বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ত্যাগময় সাধনাতেই ধর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা। সেই পথেই আত্মশুদ্ধি ও শান্তিলাভ ঘটে। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর অনেক রাত্রিতে সভা ভংগ হয়।

বাঙলার মেয়ে

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশের মেয়েদের কর্মক্ষেত্র নানাদিকে বাড়িয়াছে। সংগে সংগে সমস্যাও বাড়িয়াছে। এই বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার সাফল্য সর্বাংশে দেশবাসীর সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। দেশের বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠান এবং অপরাপর যে-সব প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং আর কোন বিষয় জ্ঞাতব্য মনে হইলে, লিখিয়া পাঠাইলে, এই পুস্তকের সম্পাদকবর্গ অনুগৃহীত হইবেন। সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের কোনও কিছু জানা কিংবা জানাইবার থাকিলে তাহাও লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইতেছে।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা: ১২, ওয়াটারলু স্ট্রীট, সুটে ৫ কলিকাতা।

জয় জগবন্ধু

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

"জয় জগদ্বন্ধু বল" শুনিয়াছি প্রভাতী কীর্তন,
তখনও পূরবে রবি জাগে নাই রাঙায়ে গগন।
মধুর লেগেছে কানে মধুময় মহানাম গাথা,
কুলায় শুনেছে পাখী দুলায়ে নবীন কচিপাতা।
কুমার নদীর কূলে নীলজলে জেগেছে সে সুর,
প্রথম প্রভাতে নাম প্রাণে বড় লেগেছে মধুর।

আশৈশব বীণাপাণি, সঙ্গোপনে বহু সাধনায়
রাতুল চরণ তব সেবিয়াছি মনোবনছায়,
আরাধ্য দেবীর মূর্তি আঁকিয়াছি সুবর্ণ অক্ষরে,
অশ্রু অর্ঘ্য সমর্পিয়া প্রাণঢালা ভক্তিপুষ্পডোরে।
আমার লেখনী অগ্রে উর দেবী শ্বেত সরস্বতী,
ছন্দে নয়, বর্ণে নয়, সরলা অমলা মূর্তিমতী।
নিবেদিব শ্রদ্ধা যাঁরে, তাঁরি মত সহজ ভাষায়,
বর দেহ দেবী মোরে, লিখি যেন যাহা প্রাণ চায়।

নয়নে দেখিনি যাঁরে প্রাণে যাঁরে [illegible]রি অনুভব,
আঁকিব আলেখ্য তাঁর কোথা পাব চিত্তের বৈভব?
শিখেছি বিদেশী ধর্ম, চিনিয়াছি বিদেশী যীশুরে,
আমার অঙিনাতলে কে লুটায় চিনি না শিশুরে!
সরলতা মাখা প্রাণ গায়ে তাঁর লাগিয়াছে ধূলি;
অনাদরে উপেক্ষায় কেহ তাঁরে লইল না তুলি।

জন কত বুনো ছেলে জন কত অস্পৃশ্য মেথর,
এক প্রান্তে পড়ি' থাকে দূরে ত্যজি' সভ্যতা-শহর!
দেবতারে ভালোবেসে মানবের সেবারত সুখে,
হাতে করে যত কাজ, হরিনাম তত ক'রে মুখে।
সকলে যা ঘৃণা করে মহানন্দে করে সেই কাজ।
নররূপী ভগবানে সেবিবারে নাহি পায় লাজ।
সবার অধম তারা মূর্খলোকে এই কথা ভাবে,
প্রভু কহে, হেন ঠাঁই ত্রিভুবনে আর কোথা পাবে?
আমার সহজ প্রভু এলো সেই সরলতা মাঝে,
তর্কের ধূলির জালে পণ্ডিতের প্রকাণ্ড সমাজে—
নিল না আসন পাতি, একেবারে পথের ধূলায়,
দ্বিতীয় চৈতন্য এল, মুখে সদা হরিনাম গায়।

প্রথম শৈশব সেই জীবনের রক্তিম প্রভাতে,
জয় জগদ্বন্ধু ব'লে জাগিয়াছি নবীন শোভাতে।
আত্মহারা বৈরাগীর উদাত্ত সে মনোহর সুর,
এখনও শুনি যে কানে শুনিতে হৃদয় তৃষাতুর।
আমার সৌভাগ্য প্রভু, একে একে ভ্রমিলাম কত,
সভ্যতার লীলাভূমি ঐশ্বর্যের সমারোহ শত—
হেরিলাম, আলোছায়া ভোগতৃষ্ণা বিজড়িত ধারা,
অনেক মানুষ, মত, আয়োজন, আড়ম্বর ভরা।
তবু মনে হয় কেন কোথা হতে কোন্ আকর্ষণে,
মধুমাখা হরিণাম আজও সুধা ঢালে এ শ্রবণে।

আমি তব শিষ্য নহি, নহি আমি ভক্ত মহাজন,
নহি অনুরক্ত তব, নহি তবু অতি অকিঞ্চন।
নাম রসে রসিক যে, সেও নহি তবু মন জানে—
জয় জগদ্বন্ধু নামে কে যেন রে কোথা হতে টানে।
আমারে কি কোলে নেবে? আমারে কি বুকে দেবে ঠাঁই?
জনক জননী সম সতত সতর্ক দৃষ্টি চাই।
প্রিয়ার একান্ত প্রেম, পুত্রের পবিত্র স্নিগ্ধ মুখ,
ভগিনীর ভালোবাসা একাধারে রহি জাগরূক
আমারে লইবে টেনে প্রভু জগদ্বন্ধু প্রেমময়,
ঘুরে মরি খুঁজি পথ, আলোকের ভিখারী হৃদয়!

বহু পথ, বহু মত, কর্ম, ধর্ম, ভক্তিমার্গ নানা,
পড়েছি সংসারচক্রে সে সকল রহিল অজানা।
আজীবন ছন্দে সুরে পূজিয়াছি কোন্ অজানায়,
তারি মাঝে কোন সুর কোন ছন্দ কভু কি পৌঁছায়?
তর্কের এ বস্তু নয়, কোথা পাব একান্ত বিশ্বাস,
আত্মত্যাগী ভোলা মন—সর্বস্ব ত্যজিয়ে ক্রীতদাস—
হব তব শ্রীচরণে, এ সৌভাগ্য করি নাই প্রভু,
তোমার চরণপ্রান্তে মোরে তুমি টেনে নেবে তবু!

আমারে দেখাও পথ, আমার এ নয়নের আগে,
দাঁড়াও মোহন বেশে, মৃদু হেসে, কহ অনুরাগে—
আমি জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু বহু নাম ধরি'—
অকূল সাগর কূলে যুগে যুগে পারাপার করি।
একা আমি নহি বন্ধু জগদ্বন্ধু অনাথশরণ,
বহু লক্ষ নরনারী অনাদৃত যাচিছে চরণ।
বহু যুগ যুগান্তের অভিশাপে তারা প্রাণহীন,
বন্ধুহারা অসহায়, তিলে তিলে তারা দিন দিন
চলেছে মৃত্যুর পথে, উপেক্ষিত অস্পৃশ্য মানব
তুমি আনো জগদ্বন্ধু প্রেম-প্রীতি করুণা আসব।

তুমি এসেছিলে এই মরা দেশে জাগাতে মরারে,
নব নব রূপে রসে বিভূষিত করিতে ধরারে।
কে তোমার কণ্ঠ হ'তে সুধামাখা বাণী নিল কাড়ি,
মূক হয়ে গেলে কেন? মুখরতা কোথা গেল ছাড়ি?
মূকের মুখের ভাষা লিখিলে কি নীরব আখরে,
কথা কও, কথা কও, কথা কও, সুধামাখা স্বরে।
আমি শুনিয়াছি বাণী আমার এ বুকের ভাষায়,
মূকের মুখর বাণী, ক্ষণে ক্ষণে কভু শোনা যায়।
আমি জানি ও রহস্য ওগো বন্ধু, বোবার দেবতা,
তুমি কি আমার মুখে শুনিবারে চাও সেই কথা?
আমার ধমনী মাঝে আজো তার ধারা বহমান,
এ দেশের জলে স্থলে বিকশিত যে ললিত প্রাণ;
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্রে যে লালিত্য সুরে সুরে জাগে,
তাহারি প্রীতির টানে জাগিয়াছি আমি অনুরাগে।

এরা তো অস্পৃশ্য নয়, নয় এরা নরের অধম,
লীলাময় বিধাতার সৃষ্ট এরা অতি অনুপম!
সারল্যের প্রতিমূর্তি অল্পে তুষ্ট বৈরাগী হৃদয়,
বুকভরা ভালোবাসা, মুখে সদা হরিনাম গায়।
অজ্ঞ এরা? মূর্খ এরা? কে করেছে এ দেশ সুফলা?
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা রবিশস্যে নিয়ত শ্যামলা?
তাদের বুকের ব্যথা তোমারে করিল বাণীহারা,
নীরব অক্ষরে তুমি রেখে গেলে পথের ইশারা।

অবিশ্বাসী দীন আমি ক্ষমা মাগি রাতুল চরণে,
কি কহিতে কি কহিনু, লিখিলাম যাহা এল মনে।
শ্রদ্ধায় আনত চিত্তে, জগদ্বন্ধু, ভাব-রত্নাকর,
সতত আশ্রয় দাও, কর নিত্য তব অনুচর।
যদি সাধ থাকে প্রভু, আমার এ হৃদয় সরোজে
রাখো তব শ্রীচরণ অন্ধকারে যারা পথ খোঁজে—
তোমার আলোক-রশ্মি দেখাইবে পথ—
জয় জগদ্বন্ধু হোক্ মম পূর্ণ মনোরথ। *

---

*—গত ৪ঠা পৌষ রবিবার, ৪৫ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে অনুষ্ঠিত এক মহতী ধর্মসভার সভাপতিরূপে লেখক এই কবিতা পাঠ করেন।

১৬ই ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ১৫ই ডিসেম্বর সকালে জাপ জঙ্গী বিমানসমূহের পাহারায় দুই ঝাঁক বোমারু বিমান চট্টগ্রাম এলাকা আক্রমণ করে। ক্ষতি সামান্যই হইয়াছে এবং শহরে বোমা পড়িয়াছে বলিয়া কোন খবর নাই। হতাহতের সংখ্যাও সামান্য। বৃটিশ বিমান বহর আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেয় এবং তিনখানি বিমান ধ্বংস করে ও অপর কয়েকখানির ক্ষতি করে। বৃটিশ পক্ষের কোন বিমান নষ্ট হয় নাই। গতকল্যই সন্ধ্যার একটু পরে কয়েকখানি জাপানী বিমান পুনরায় উক্ত এলাকা আক্রমণ করে। কোন ক্ষতি বা হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী রজেভের পশ্চিমে আরও কয়েকটি সুরক্ষিত স্থান দখল করিয়াছে। হিটলার মস্কোর পশ্চিমে রজেভ এবং ভেলিকিলুকি রণাঙ্গনে দ্রুত অবিরামভাবে নূতন নূতন পানৎসের এবং পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি এপর্যন্ত লালফৌজের অগ্রগতি বন্ধ করিতে পারেন নাই।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, রোমেলের বাহিনীর অধিকাংশ সীমান্ত ধরিয়া তিউনিসিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গতকল্য অপরাহ্ণে জাপানী বিমান বহর চট্টগ্রাম ও ফেণীতে হানা দেয়। অতি সামান্যই ক্ষতি হয় এবং হতাহতের সংখ্যা নগণ্য বলিয়াই প্রকাশ। বৃটিশ বিমান বহর শত্রুপক্ষকে বাধা দেয় এবং কয়েকবার সঙ্ঘর্ষ হয়।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ লিবিয়ায় পশ্চাদপসরণকারী এক্সিস বাহিনীর সম্মুখ-সেনারা ইতিমধ্যে এল আঘেইলার দুইশত মাইল পশ্চিমে পৌঁছিয়াছে। সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, লিবিয়ার যুদ্ধ ত্রিপোলিতানিয়াতে আসিয়া মিলিয়াছে। এক্সিস বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হইবার পর রোমেলের যে সৈন্যদল বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টা করে, তাহাদের সঙ্গে ৮নং আর্মির সংঘর্ষ হয়।

১৮ই ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪ ঘণ্টায় সোভিয়েট বাহিনী রজেভ-ষ্ট্যালিনগ্রাদ-তুয়াপ্সে অঞ্চলে সহস্র মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে জার্মানদের একটি আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আরও অগ্রসর হইয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রোতে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, এক্সিস বাহিনী নোফিলিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। এক্সিস বাহিনী নোফিলিয়া ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তা ধরিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

ব্রহ্ম—নয়াদিল্লীর সম্মিলিত সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন বৃটিশ পক্ষের সৈন্যগণ আরাকানের সীমা হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম ব্রহ্মের দিকে যাইতেছে এবং বুথিয়াডাউং এলাকা দখল করিয়াছে। বৃটিশগণ চলিয়া আসিলে জাপানীরা উক্ত এলাকা অধিকার করিয়া ঐ স্থানে সামরিক ঘাঁটি করিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার বাধা না দিয়া তাহারা সরিয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম সীমান্তে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের সূচনা হইল।

২০শে ডিসেম্বর

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রো হইতে বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, রোমেলের পৃষ্ঠদেশরক্ষী পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী বৃটিশ বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এক্সিস পক্ষের মূল বাহিনী এক্ষণে এল আঘেইলা ও সার্তের মাঝামাঝি সুলতানের পশ্চিমে এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—এক বিশেষ সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হয় যে, লালফৌজ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ও ভরোনেজ এলাকায় জার্মান ব্যূহ ভেদ করিয়া দুইশতাধিক জনপদ দখল করিয়াছে; জনপদগুলির মধ্যে বেগুচোর শহর অন্যতম। দশ সহস্রাধিক জার্মান সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

নিউগিনি—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেডকোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বুনা এলাকায় এণ্ডাইডেরে অন্তরীপ দখল করা হইয়াছে।

২১শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ কলিকাতা অঞ্চলে হানা দেয়। রাত্রি ১০টা ১৭ মিনিটের সময় বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি করা হয় এবং উহা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এযাবৎ প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, অল্পসংখ্যক বোমা ফেলা হইয়াছিল; ঐগুলি বহু দূর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বেসামরিক অধিবাসী হতাহতের সংখ্যা যৎসামান্য এবং ক্ষতিও সামান্যই হইয়াছে। সামরিক কোন ক্ষতি হয় নাই বা সামরিক ব্যবস্থাদিও কোন ক্ষতি হয় নাই।

পূর্ববর্তী ইস্তাহারে গত রাত্রিতে কলিকাতায় জাপ বিমান হানার যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া দুইখানি শত্রু বিমান চট্টগ্রাম এলাকাতেও বোমাবর্ষণ করে। এপর্যন্ত হতাহতের বা কোনরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

২২শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, সোমবার (২১শে ডিসেম্বর) শেষ রাত্রে অল্প কয়েকখানা জাপ বিমান কলিকাতা অঞ্চলে পুনরায় হানা দেয়। কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য, হতাহতের সংখ্যাও বেশী নহে।

অদ্য মঙ্গলবার রাত্রি ১২টার পর অল্প কয়েকটি শত্রু বিমান পুনরায় কলিকাতা অঞ্চলে অল্পকালের জন্য হানা দিয়াছিল। অল্প কয়েকটি বোমা বর্ষিত হয়। ক্ষতি ও হতাহতের পরিমাণ সামান্য বলিয়া মনে হয়।

রুশ রণাঙ্গন—ডন রণাঙ্গণের কোন কোন স্থানে জার্মানরা সন্ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতেছে বলিয়া মস্কোতে খবর আসিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—সিস্রাটায় রোমেলের বাহিনীর পৌঁছিবার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর

ঢাকা জেলার নিম্নলিখিত আটটি মৌজায় মোট ২০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। যথা—সামসাবাদ, কলাকোপ-রাজারামপুর, কলাকোপা, হাসনাবাদ, পুয়াকৈর, বাগমারা, কাশিমপুর এবং গোবিন্দপুর।

বাঙলার নানা স্থানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, বরিশাল শহরে চাউলের দর প্রতি মণ ১৯, টাকায় উঠিয়াছে এবং এই দরেও বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। ফলে অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে।

ভারতে বিক্ষোভ—গোহাটীর খবরে প্রকাশ, বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের নলবাড়ি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। কামরূপ জেলার নলবাড়ি পোস্ট অফিসে একটি পটকা পাওয়া গিয়াছে। আমেদাবাদের খবরে প্রকাশ, শহরের পাঁচ স্থানে পুলিশের উপর প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিশের গুলীতে একজন আহত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী কমিটির উদ্যোগে আহূত সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের এক জরুরী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোম্বাইয়ের ৩৩ খানি সংবাদপত্রের প্রকাশ এক দিনের জন্য (১৮ই ডিসেম্বর) বন্ধ থাকিবে।

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা শ্রীযুত জ্যোতিঃপ্রকাশ ভট্টাচার্য ভবানীপুর শম্ভুনাথ হাসপাতালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা করিয়াছেন। অল্প কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শীলা তালদারের মৃত্যু হয়।

১৭ই ডিসেম্বর

কলিকাতা এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতবর্ষ এক। বৃহৎই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার এবং আইনসঙ্গত দাবীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার চিমুর গ্রামে এবং ওয়ার্ধা জেলার আষ্টি গ্রামে অশান্তি দমন প্রসঙ্গে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী যাহা করিয়াছে, তাহার তদন্ত দাবী করিয়া সেবাগ্রাম আশ্রমের অধ্যাপক ভানশালী অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার অনশনের ৩৫ দিন অতিবাহিত হইয়াছে।

১৮ই ডিসেম্বর

বরাহনগরে এক নৃশংস ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদল পাঞ্জাবী ডাকাত বরাহনগরে শ্রীযুত বাদলচন্দ্র শাসমলের বাড়ীতে হানা দেয় এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতরা বাদলবাবুর মাশকে ভোজালী দ্বারা নিহত করে।

লক্ষ্মৌয়ের সিটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীকে ভারতরক্ষা বিধানে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ অদ্য কলিকাতার ১০।১২টি স্থানে খানাতল্লাসী করে। খানাতল্লাসী করিবার পর পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত প্রমথনাথ গুহ এবং আর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

মুসলিম দৈনিক "আজাদ"-এর প্রকাশ বন্ধ রাখিবার জন্য যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, বাঙলা সরকার তাহার কার্যকাল চারি দিনের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। অদ্য চারিদিন উত্তীর্ণ হইবে।

১৯শে ডিসেম্বর

ডিব্রুগড়ের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি উত্তর লখিমপুরের আদালত গৃহে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ফলে কতকগুলি নথিপত্র এবং ফাইল ভস্মীভূত হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর

ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী প্রদত্ত আদেশ অমান্য করার অভিযোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং ভারতের শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে গতকল্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য কয়েকজন যুবক জনৈক মদ ও মনোহারী ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দিয়া কয়েকটি গ্লাসকেস্ ভাঙিগয়া ফেলে। তাহারা ছোরা দেখাইয়া বিক্রয়কারীদিগকে নিরস্ত করে।

২১শে ডিসেম্বর

হালসীবাগানের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আনন্দ আশ্রমের আচার্য ঠাকুর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, সভাপতি মিঃ এস কে গুপ্ত, সহকারী সভাপতি মিঃ এ সি সেন এবং আশ্রমের কালীপূজা ম্যানেজমেণ্ট কমিটির অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুত তুলসীভূষণ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী গত ১৮ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১৯৪১ সালে অক্টোবর মাসে তিনি হিজলী বন্দী নিবাস হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে নাদিয়াদের নিকট ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যাপৃত কয়েক ব্যক্তির উপর পুলিশ গুলী চালায়। প্রকাশ, এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে; অপর সকলে উধাও হইয়া যায়।

২২শে ডিসেম্বর

কলিকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন—অদ্য দ্বিপ্রহরে ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকটে লায়ন্স রেঞ্জে দুইটি হাত বোমা বিরাট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। উহার ফলে কেহ আহত হয় নাই বা কোন কিছুর কোনরূপ ক্ষতিও হয় নাই। অদ্য রাত্রে দক্ষিণ কলিকাতার টালীগঞ্জ সেক্সনের একখানি ট্রামগাড়ীতে আগুন ধরাইবার চেষ্টা হয়।

প্রকাশ যে, প্রতাপাদিত্য ও রসা রোডের মোড়ে যখন একখানি ট্রাম থামে, তখন উহার সম্মুখে সশব্দে দুইটি পটকা বিস্ফোরণ হয়। ট্রামখানির সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। গত রাত্রে পনেরজন যুবক শহরের দক্ষিণ অঞ্চলের রাসবিহারী এভেনিউস্থ একখানি বিলাতী মদের দোকানে হানা দেয়। তাহারা দোকানে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে, উহার ফলে বহু বোতল ও কাচের সার্সি নষ্ট হয়।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—আমেদাবাদে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সাব ব্রাঞ্চে বিস্ফোরণ হয়। গতকল্য মাদ্রাজ হাইকোর্ট ভবনে ফসফরাসের ন্যায় এক দ্রব্য হইতে ধূম উদ্গত হইতে দেখা যায়।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 2nd January, 1943 [৮ম সংখ্যা
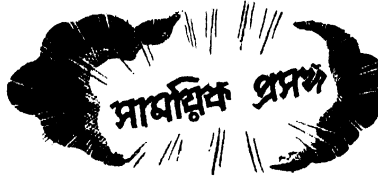
বিমান আক্রমণের শিক্ষা

কলিকাতা অঞ্চলের উপর জাপানীদের পর পর কয়েকবার বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই লেখা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আরও ঐরূপে আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণই আছে। কিন্তু আমরা এজন্য বিচলিত হইবার কোন কারণ দেখি না। কর্ম এবং সেবার ভিতর দিয়াই মানুষের জীবন স্বচ্ছন্দ এবং আনন্দময় হইয়া থাকে। আমরা এই বিপদে সেবার সেই প্রবৃত্তিকে যদি কর্মের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি তবেই আমাদের ভয় অনেকটা কাটিয়া যাইবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ জাতির বৃহত্তম স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হইলে পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় আমাদের অন্তরকে একান্তভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারিবে না। চিত্তের এই দুর্বলতাকে যদি পরিত্যাগ করিতে না পারি, তাহা হইলে কোন নিরাপদ স্থানে গিয়াই আমরা দুশ্চিন্তার হাত এড়াইতে পারিব না। বিপদই মানুষকে সত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, ভয়ে পড়িয়া এই সত্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় ভয়কে এড়াইতে গিয়া ভয়ের বেড়াজালের মধ্যে গিয়া না পড়ি। বিমান আক্রমণে কয়জন লোক মরে? এই কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি, তেমন ভয়ের বিশেষ কোন কারণই নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় দুর্বল থাকিয়া আমরা কতভাবে মৃত্যুর দিকেই আগাইয়া চলিয়াছি। এ দেশের লোক মরে পোকামাকড়ের মত, আধি-ব্যাধিতে মরে, দুঃখ কষ্টে মরে এবং সেই মরণের প্রধান কারণ বৃহত্তর স্বার্থবোধের অভাব। বর্তমান বিপদ সেই স্বার্থবোধ যদি আমাদের মধ্যে প্রতিবেশ প্রভাবের চাপেও সত্য করিয়া তোলে তবে ইহার একটা বড় রকমের মঙ্গলের দিক রহিয়াছে। আমরা দেশবাসীকে এ দুর্দিনে সেই দিকটা দেখিতে বলিতেছি এবং ধৈর্যসহকারে বিপদের সম্মুখীন হইতে অনুরোধ করিতেছি। বিপদের দিনে আমরা যেন সকলকে আপনার করিতে পারি, তবেই ব্যক্তিগত হানির গ্লানি হইতে আমরা মুক্ত হইতে সমর্থ হইব এবং মনুষ্যত্ব আমাদের মধ্যে জাগিবে। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে বাহিরের আঘাতে বৃহত্তর স্বার্থের বেদনা বোধ করিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বর্তমান বিপদ সেই বোধ জাগ্রত করিবার গুরুত্ব লইয়া যদি আসে তবে তাহাকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে যেন গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত না হই। রুদ্রের কল্যাণ লীলার নামে স্বার্থের উপাসনা আমরা অনেক দিন করিয়াছি, এবার তাঁহার রুদ্র লীলা আমাদের চিত্তের অবসাদ ভাঙ্গিয়া দিক। জড়তা ছাড়িয়া বীর্যময় জীবনের পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা আমাদের কর্মের মূলে শক্তি দান করুক। পশুর মত ক্ষুদ্র জীবনের আরামে আমরা যেন পড়িয়া থাকিতে না চাই। এ বিপদের বেদনা বহুর স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনে ঘৃণাবোধ আমাদের অন্তরে জাগাইয়া তুলুক।

সমস্যা ও প্রতিকার

বিমান আক্রমণের ফলে কলিকাতার এক শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা শহর ছাড়িয়া যাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের পক্ষে শহরে অবস্থান আবশ্যক নয়, অর্থাৎ বিশেষ কার্যের জন্য যাহারা শহরে থাকেন না, তাহাদের শহর হইতে যাওয়া সরকারও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। পদব্রজে যাহারা শহর হইতে যাইবে, তাহাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইতঃপূর্বেই বাঙলা সরকারের জনরক্ষা বিভাগ একটি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং শহর ত্যাগকারীদের জন্য কয়েকটি রাজপথে আশ্রয়স্থল এবং খাদ্যাদি সরবরাহের বন্দোবস্ত করেন। বাঙলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বর্ধমানে গিয়া এই ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন। তৎসম্পর্কিত সরকারী সংবাদে দেখা যাইতেছে, শহর ত্যাগকারীদের সংখ্যা বেশী নয় এবং কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কারণ নাই। গভর্নমেণ্ট এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুই শ্রেণীর লোক শহর হইতে যাইতেছেন, এক শ্রেণীর লোক হইলেন ধনী। ইঁহাদের টাকার জোর আছে; সুতরাং রেলের উচ্চ শ্রেণীর ভাড়া যোগাইবার সৌভাগ্যের ইঁহারা অধিকারী; ইঁহাদের জন্য আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু আমাদের চিন্তা যাহারা যানবাহনের সুবিধা না পাইয়া পদব্রজে শহর ছাড়িতেছে তাহাদের জন্য। ইহারা দরিদ্র। এই সমর-সঙ্কটের দিনেও দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিবার মত ঘৃণ্য জীবের অভাব এদেশে নাই। পদব্রজে শহর ত্যাগকারী এইসব দরিদ্রকে এই শীতের দিনে দীর্ঘপথ হয়ত অনেককে অতিক্রম করিতে হইবে। রাস্তায় ইহাদের যাহাতে খাদ্যের অভাব না ঘটে এবং মাঝে মাঝে আশ্রয়স্থলে ইহারা মানুষের মত ব্যবহার পাইয়া থাকিতে পারে, সরকার সেদিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। পথে দোকানী এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ইহাদের দুর্দশার সুযোগ পাইয়া নিজেদের লাভখোর প্রবৃত্তি পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে। সে বিড়ম্বনা যাহাতে ইহাদিগকে ভোগ করিতে না হয়, সেজন্য পথে পথে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে দোকান খোলা দরকার। পথিমধ্যে ক্লান্ত এবং বিপন্ন হইয়া পড়িলে যাহাতে ইহারা রেলে যাইবার সুবিধা লাভ করিতে পারে, তেমন পন্থাও থাকা প্রয়োজন। এ দেশের যুবক সম্প্রদায় মনব সেবাব্রতে সব সময়ই অগ্রণী হইয়াছেন, পথিপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এইসব পথিককে সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য যুবকদের দ্বারা স্বেচ্ছা-সেবক দল গঠিত হউক, আমরা ইহাই চাই।

শহরের খাদ্য সমস্যা

শহরের খাদ্য সমস্যা সমাধানের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমরা বহুদিন হইতেই আকর্ষণ করিতেছি; কিন্তু সরকার যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা এ-পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের মতে সেগুলির দ্বারা সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হয় নাই। গত ২৭শে ডিসেম্বর সরকার হইতে কলিকাতায় কয়েকটি চাউলের গুদাম তালাবদ্ধ করা হইয়াছে। যে সকল স্থানে চাউল মজুদ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই মজুদ চাউল যাহাতে আশাতিরিক্ত মূল্যে কেহ বেচিয়া ফেলিতে না পারে, সেইজন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা যাহাই হউক, তাহার কার্যকারিতা দেখিতে হইবে। সরকারপক্ষ নাকি শহরের বাজারে বাজারে ঘুরিয়া দেখিয়াছেন যে, চাউল, ডাইল প্রভৃতির অভাব নাই; শুনিতেছি কয়লাও নাকি শহরে বেশীই আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কথার এই সদ্ভাবে কার্যত অভাব হ্রাস করিতে পারিতেছে না। চাউলের দাম দশ টাকা হইতে ধাঁ করিয়া ষোল টাকার উপর উঠিয়াছিল, তদনুপাতে মূল্য কমিয়াছে খুবই সামান্য। আমাদের মতে চাউলের দামের এই এক টাকা দেড় টাকা কমতি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। গরীবের অভাব ইহাতে মিটে নাই। তরিতরকারির অভাব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সরকার জরুরী অবস্থায় খাদ্য সরবরাহের জন্য কলিকাতার ২১টি বাজার নির্দিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু গরীবের উহাতে সান্ত্বনা কি বুঝিলাম না। সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিনাক্লেশে জিনিস পাওয়াই গরীবের পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু সেদিক হইতে সমস্যার কোন সমাধান করা হয় নাই। গরীব এবং ধনী সমানভাবে যাহাতে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মিটাইতে পারে, কর্তৃপক্ষের এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস পাইতে হইলে গরীব এবং মধ্যবিত্তকে শহরে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা আমরা নিত্য দেখিতেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরকারী-হার-নিয়ন্ত্রিত দোকানে ধর্না দিয়া দুই সের চাউল কি আধ সের চিনি জোগাড় করা যে কতটা দুর্ঘট, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। শহরে আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে হইলে এই উদ্বেগ হ্রাস করিতে হইবে। অন্ন চিন্তা কমিলে অনেক ভাবনা কমে, মনোবল বাড়াইবার সবচেয়ে বড় উপায় হইল ঐ চিন্তা হ্রাস করা--কর্তৃপক্ষ যেন ইহা বিস্মৃত না হন।

বড় দিনের বাণী

ব্রিটিশরাজ বড়দিন উপলক্ষে ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বেতারযোগে একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। এই বাণীতে তিনি সৌভ্রাত্রের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগতে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করাই ব্রিটিশের সমরাদর্শ। রাজা বলেন, আপনারা সমুদ্রের দ্বারা পরস্পর হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও আপনারা পারিবারিক প্রতিবেশের মধ্যে আছেন। আপনাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তিরক্ষার যে বন্ধন মূল্যবান ছিল, বিপদের সময় তাহা সমধিক দৃঢ় হইয়াছে। রাজার এই সদিচ্ছার সার্থকতা আমরাও কামনা করি; কিন্তু রাজার যাঁহারা বর্তমানে পরামর্শদাতা তাঁহারা তাঁহার এই সদিচ্ছাকে সার্থক করিতে কতটা চেষ্টা করিতেছেন, ইহাই হইতেছে বিবেচনার বিষয়। তাঁহারা আন্তরিক সহযোগিতার চেয়ে সৈন্যশক্তির বলকেই বড় বলিয়া বুঝেন। স্পষ্টভাবেই এই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল

কিছুদিন পূর্বে কমন্স সভার সদস্যদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে বর্তমানে যত অধিক পরিমাণে ব্রিটিশ সেনা গিয়াছে, এত বেশী সেনা সেখানে কোনদিন যায় নাই। সুতরাং ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের উদ্বেগ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভারতসচিব আমেরীরর মুখেও আমরা সেই ধরণের কথাই শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মর্জি ছাড়া, তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত নীতিতে তাঁহারা ভারতের জনমতের কোন মূল্যদান করাই প্রয়োজন বোধ করেন না। রাজা তাঁহার বাণীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ব্যাপক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিসমূহের সঙ্ঘ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু রাজার মন্ত্রিবর্গের নীতিতে তাঁহার এই উক্তির প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হয় কি? ভারতের ৪০ কোটি লোক এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া এখনও পরাধীনের জীবনই যাপন করিতেছে। তাহাদের স্বাধীনতার দাবী উপেক্ষিত হইতেছে এবং সেই উপেক্ষা সহযোগিতার সূত্রকেই শিথিল করিতেছে। রাজা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দশ লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা ভারতভূমি রক্ষার জন্য ব্রিটিশের সহযোগিতা করিতেছে। সেনা-সংখ্যার এই হিসাবের জোর অবশ্যই আছে; কিন্তু সেনাবলই আধুনিক সংগ্রামে সার্থকতা লাভের একমাত্র উপায় নয়; জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতাও প্রয়োজন। কংগ্রেস ব্রিটিশের সঙ্গে সমগ্র ভারতের জনসাধারণের সেই আন্তরিক সহযোগিতাই কামনা করিয়াছিল এবং সেজন্য ভারতের স্বাধীনতা দাবী করিয়াছিল। রাজা বলিয়াছেন যে, সম্মুখে আরও কঠোরতর কর্তব্য রহিয়াছে। যুদ্ধের যে পর্ব অতীত হইয়াছে, তাহাতেই যে পরীক্ষার দিন কাটিয়া গিয়াছে, আমরাও ইহা মনে করি না। আমাদেরও মনে হয় যে, কঠোরতর দিন সম্মুখে আছে এবং আসন্ন সে সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। পীড়িত এবং আর্ত মানবের বেদনা রাজার পরামর্শদাতাদের অন্তরকে সাম্রাজ্য মোহ হইতে মুক্ত করিয়া ভারতবাসীদের স্বাধীনতা স্বীকারে এখনও তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে কি?

শিক্ষা ও রাজনীতি

সম্প্রতি ইন্দোর শহরে নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ডাক্তার এম আর জয়াকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার জয়াকরের অভিভাষণ সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার অভিভাষণে রাজনীতিকদের সমালোচনা করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। তিনি বলেন, "আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা কিরকম-ভাবে আমরা গড়িয়া তুলিব, কিসে আমাদের মধ্যে লোকহিতৈষণা এবং সমষ্টিগত কল্যাণবোধ জাগ্রত হইবে; আমরা ব্যক্তি-জীবনকেই সমাজের ভিত্তি করিব, না শ্রেণীর স্বার্থকে আশ্রয় করিব, এসব বিচারের ভার রাজনীতিকদের উপর দিলে ঠিক হইবে না। এই সব বিষয় দেশের মনীষী এবং শিক্ষাব্রতীদের পক্ষেই বিবেচ্য। আপনারা যদি রাজনীতিকদের উপর এইসব বিবেচনার ভার ছাড়িয়া দেন, তাহাতে বিপদ হইবে এই যে, তাঁহারা ভ্রান্ত বিদ্বেষ স্রষ্টা এবং কথার চালবাজই গড়িয়া তুলিবেন। কতকগুলি মৌলিক নীতি অবলম্বন করিয়া সর্বত্র সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইলে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সমুন্নত করিতে হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পর্কে জাতীয় সংস্কৃতির উপর ডাক্তার জয়াকর যে গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা সর্বাংশে স্বীকার করি; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, পরাধীন দেশে সেদিকে গুরুত্ব দানের ক্ষমতা আমাদের কোথায়? আমাদের সে চেষ্টা ব্যাহত হইবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা জানে যে, একটা জাতিকে স্থায়ীভাবে অধীন রাখিতে হইলে তাহার জাতীয় সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া আত্মপ্রত্যয়বুদ্ধি বিলোপ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জেতৃ-জাতির মহিমাকে অধীন জাতির অন্তরে একান্ত করিয়া তোলা। এ উদ্দেশ্যে শাসক-দের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সে নীতির প্রভাবকে রুদ্ধ করিবার উপায় কি? অন্য দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের স্বাভাবিক ক্রমাভিব্যক্তির ধারা ধরিয়া অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়; কিন্তু অধীন দেশে তাহা পায় না; সুতরাং অধীন দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করা আগে দরকার এবং সেজন্য রাজনীতিরও প্রয়োজন আছে; শুধু তাহাই নয়, রাজনীতিক স্বার্থ যদি জাতিকে সমষ্টিগত স্বার্থবোধে জাগ্রত করিতে না পারে, তবে জাতির মনীষী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাধনার সম্পদ হইতে জাতি বঞ্চিত হয় এবং বিশ্ব বঞ্চিত হইয়া থাকে। ভারতে চিন্তাশীল এবং মনীষী ব্যক্তির অভাব ঘটে নাই; তথাপি বিশ্ব-সভ্যতার অবদান ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা আজ অতি সামান্য; রাজনীতিক পরাধীনতা ইহার কারণ। সুতরাং পরাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের সার্থকতা রাজনীতিকদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে; এবং দেশের রাজনীতিক সাধনাকে শিক্ষা হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করা চলে না;

বাঙালীর সমর-স্পৃহা

অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে ভারতীয় সৈন্যদল, ভারতীয় নৌ-বহর এবং বিমানবহরের সম্পর্কিত কয়েকটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। অধ্যাপক সেন এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। অধ্যাপক সেন বলেন,—সর্বত্রই শিক্ষাকেন্দ্রের সামরিক অফিসাররা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বাঙালী শিক্ষার্থী যুবকদের সংখ্যা এত কম কেন? অধ্যাপক সেন এই

প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"ইহার বিশেষ কারণ আছে। ইংরেজ যুবক যেমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, এই সংগ্রাম তাহাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম—বাঙালী যুবকদের অন্তরে সেই অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা গভর্নমেন্ট করেন নাই। যুদ্ধের পূর্বে আমরা যেমন ছিলাম, পরেও তেমনই থাকিব, এমন বিশ্বাস বাঙালী যুবকদের প্রাণে আগুন জ্বালাইতে পারে না। বাঙালীর প্রাণে কোন বৃহত্তর প্রেরণার সৃষ্টি না হইলে তাহারা দলে দলে সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে উৎসাহী হইবে না। শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কোন কোন বিভাগে বাঙালী শিক্ষার্থীর একান্ত অভাব দেখা যায়। বাঙালী চরিত্রের কোন দুর্বলতা তাহার কারণ নহে। বাঙালী চিরকাল কলমপেশার জাতি ছিল না।" অধ্যাপক সেন যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত এ বিষয়ে বশেষ কিছু বলিবার নাই। বাঙালী যুবকদের সমর-স্পৃহা কেন নাই—এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে মহামতি গোখলের কথাতেই বলিতে হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের দোষে। ব্রিটিশ শাসনের প্রধান দোষ এই যে, ইহা ভারতবাসীদিগকে নিবীর্য করিয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে কায়েম করিবার নীতিরই এই পরিণতি। সে নীতির অনিষ্টকারিতার ষোল আনা চাপটা আসিয়া পড়িয়াছে বাঙালীদের উপর; কারণ বাঙালী জাতি স্বভাবতই মনস্বী, উদার ভাবপ্রবণ এবং স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি অনুরাগী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্কীর্ণ নীতিরই ফলে বাঙালী অসামরিক জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বাঙালী যুবকদিগকে যদি সমরশিক্ষার সুবিধা দেওয়া হইত এবং স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শ সাধনার উপযোগী প্রেরণা তাহারা লাভ করিত, তবে বর্তমান এই কূটনৈতিক সংগ্রামে বাঙালী ঐতিহাসিক অধ্যায় ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিয়া তুলিত। কারণ বুদ্ধির বলে বাঙালী জাতির ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং আধুনিক সংগ্রামে বুদ্ধির বলেরই প্রাধান্য।

বিপন্ন মেদিনীপুর

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাড়না এবং বেদনা হইতে মেদিনীপুর এখনও মুক্ত হয় নাই। তথাকার দুঃখ-কষ্ট এখনও সমানভাবেই আছে; কারণ মেদিনীপুরের যে ক্ষতি ঘটিয়াছে, তাহা বিহারের বিগত ভূমিকম্পের চেয়েও বেশী। নিদারুণ অন্নকষ্ট বস্ত্রকষ্ট এবং বিশেষভাবে পানীয় জলের সঙ্কটের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যে এই ব্যাধিতে চারটি ইউনিয়নে ৪৫৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খাদ্যের অভাব এবং পানীয় জল দূষিত হওয়াতে কলেরার এইভাবে প্রাদুর্ভাব হইবার আশঙ্কা পূর্বেই ঘটিয়াছিল। আমরা জানিতে পারিলাম বেসরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ব্যাধির প্রতীকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ; সুতরাং গভর্নমেন্টেরই অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসক এবং ঔষধাদির ব্যবস্থার দ্বারা ব্যাধির প্রতীকারে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। বিভিন্ন ইউনিয়নে এজন্য কতকগুলি চিকিৎসা কেন্দ্র তাঁহাদের স্থাপন করা উচিত। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব পূরণ করা এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন; সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত সংখ্যক টিউবওয়েল বসান উচিত। বঙ্গীয় হিন্দু-সভার ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে সেদিন একটি জরুরী সভায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের একটি প্রস্তাব এই যে, মেদিনীপুরের বিপন্ন অধিবাসীদের সাহায্যকার্যে সরকারের সহিত দেশবাসীর সহায়তার সূত্র দৃঢ় করিবার জন্য রাজনীতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা কর্তব্য। কংগ্রেসকর্মী বলিয়া যাহারা বিনাবিচারে বন্দী রহিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ত্যাগী কর্মী এবং স্বদেশসেবক, দেশের লোকদের প্রতি তাঁহাদের অন্তরের দরদ রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইলে তাঁহারা মরণপণ করিয়াও দীনের সেবায় অগ্রসর হইবেন এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই এবং এইদিক হইতে তাঁহাদের অভাব অন্য কোন ভাবে পূরণ করা সম্ভব হইবে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে প্রাণের প্রকৃত টান, আত্মোৎসর্গের আন্তরিক প্রবৃত্তি যদি না থাকে, তবে অনেক সুব্যবস্থাও অকেজো হইয়া পড়ে।

পরলোকে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে সকলেই মর্মাহত হইয়াছেন। স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান মধ্যপন্থী রাজনীতিক ছিলেন এবং সেই মধ্যপন্থায় মোস্লেম লীগের নীতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিবার চেষ্টার দুর্বলতাও তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার রাজনীতিক মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হওয়া সম্ভব নহে। তবে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই কথা স্বীকার করিব যে, স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান কৌশলপূর্ণভাবে তাঁহার অবলম্বিত নীতিকে লীগের অনিষ্টকারিতা হইতে মুক্তই রাখিয়াছিলেন' প্রত্যক্ষভাবে লীগের বিরুদ্ধতা করিবার সাহস তাঁহার নীতিতে ছিল না—ইহাও যেমন সত্য, তাহাতে লীগের আনুগত্য ছিল না—ইহাও তেমনই সত্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি যদি লীগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত হইত, অর্থাৎ তাঁহারা যদি লীগের পাকিস্থানী প্রস্তাবের স্পষ্টভাবে বিরুদ্ধতা করিয়া অখণ্ড ভারতের আদর্শের উপর জোর দিতেন, তবে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আপোষ-নিষ্পত্তির আবহাওয়া সৃষ্টির পক্ষে স্যার সেকেন্দারের অবদান অধিকতর উদার হইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনে স্যার সেকেন্দার অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার সংস্কার হইতেও তাঁহার মন মুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি ঘটিয়াছে।

ব্লক্
লাইন·হাফটোন·কলার ব্লক্
সুন্দররূপে তৈয়ারী হয়
★ পরীক্ষা করুন
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং
ফোন:- বি·বি·১৭০২
৫,শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

		১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	এক সংখ্যার জন্য
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	৩০,	৩৫,	৪০,	৪৫,
অর্ধ পৃষ্ঠা	...	১৬,	১৮,	২২,	২৪,
সিকি পৃষ্ঠা	...	৯,	১০,	১২,	১৪,
⅛ পৃষ্ঠা	...	৫,	৬,	৭,	৮,

এক বৎসর ছয় মাস তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে" পেঁাছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনি-অর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাশুল সহ ৬৷৷° সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩।° টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশেঃ—৮, টাকা; ষাণ্মাসিক ৪, টাকা ও ভরতের বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১১, টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷° টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পেঁাছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৵° দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।
টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ"

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

(শ্রীযুক্ত রণজিৎ লাহিড়ীকে লিখিত)

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। সময় অল্প শক্তিও ক্ষীণ—তাই উত্তরে বেশি কিছু লিখতে পারব না—তোমার দিদিকে যে চিঠি লিখেছি, তাতে তুমি ভাগ বসিয়ো। দেখতে পাচ্চি তোমার দিদির ছোঁয়াচ লেগেছে তোমাকে—চিঠিতে প্রশ্ন পাঠিয়েছ। এমন হলে আমার পত্র পরীক্ষাপত্র হয়ে উঠবে। মৌখিক প্রশ্নোত্তরই ভালো, চিঠিতে কথা বেড়ে যায়। এই সুদীর্ঘকাল লিখে লিখে এখন লিখতে বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে—বরঞ্চ গাড়িভাড়া করে লোকের বাড়িতে গিয়ে বক্তব্য শোধ করে আসা সহজ মনে হয়, তবু লিখতে বসতে ইচ্ছা করে না। এখানে বসন্তকাল তার আসর জমিয়ে বসেছে—বাতাসে গন্ধ আসছে ভেসে, অনেক সময় তার পরিচয় জানিনে, অচেনা ফুল ফুটছে গাছে, তাদের নতুন নতুন নামকরণ করছি। সকালে উঠেই গাছতলায় গিয়ে বসি—বেলা বয়ে যায়, কাজের তাড়া আসে, উঠতে ইচ্ছে করে না, সকল দেহমন কুঁড়েমিতে অভিভূত, অকর্মণ্যতার স্রোতে প্রহরগুলিকে ভাসিয়ে দিই যেন খেলার নৌকার মতো। এহেন মানুষকে এ সময়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না, চিঠি যত খুশি লিখো উত্তরের আশা রেখো না, কেননা, সংসারে আশা করাটাই নিরাশ হবার সদর রাস্তা।

ইতি—২৫শে মার্চ, ১৯৩৪। দাদু

ওঁ

"Uttarayan",
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ছোড়দিদি আমার ঘরে যে অজস্র বড়ি-বৃষ্টি করেছেন, তা দেখে আশঙ্কা হচ্ছে বরনগরধাম নির্বড়ি হয়ে গেছে। তোমাদের পাতে যদি বড়ির দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে, আমার প্রতি ঈর্ষা কোরো না—বরঞ্চ শনি-রবিবারে ছুটির দিনে এখানে এসে দুটো-চারটে বড়িভাজা খেয়ে যেয়ো। তোমার ছোড়দিদি আমার কবিতা পড়ে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর বড়ি ভেজে খেয়ে দেখলুম, তাতে কর্কশতা পাওয়া গেল না, মিলিয়ে গেল মুখের মধ্যে।

আমার আশীর্বাদ জানবে। ইতি— ১৮।১।৩৭

শুভার্থী,
রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

এবার আমি রণজিৎ উপাধি গ্রহণ করবো। জীবনের একটা চরম রণে আমার জিৎ হয়েছে। কিন্তু তোমার দিদি যদি আমাকে ভাইফোঁটা দিতে আসেন তো চিনতে পারবেন না; কেননা, যমদূত আমার অনেকখানি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পুরো ভাইফোঁটা তুমিই পেতে পারো ভাইফোঁটার ভগ্নাংশমাত্রে আমার অধিকার। আমার আশীর্বাদ। ইতি— ২০।১০।৩৭

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয় রণজিৎ,

প্রথম আহ্বান আজি লভিয়াছে নব আলোকের
নবীন জীবন তব, লহ তুলি মানবলোকের
রণশঙ্খ, যাত্রা করো মৃত্যুঞ্জয় ভৈরবের নামে,
হানো অস্ত্র অধর্মেরে জয়ী হও জীবন সংগ্রামে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবরাণী আমাকে চিঠি লিখেছে এবং তার উত্তর দাবী করেছে—চিঠিতে নামও দেয়নি, ঠিকানাও দেয়নি—ঠিকানা মনে রাখবার মতো স্মরণশক্তি যদি থাকত, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পরীক্ষায় আমি ডাক্তার উপাধি পেতে পারতুম—বিনা সাধনার ফাঁকা উপাধির ফাঁকি বইতে হোত না।
৬।২।৩৮

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু,

তুমি দেখচ জাপানের স্বপন আমি শুনচি চীনের কান্না—আমিও এক সময়ে স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে জাপানী উড়োজাহাজের বোমা লেগে।

স্বর্গোদ্যানেও শয়তান প্রবেশ করে সাপের মূর্তি ধরে, সুন্দরকে করে দেয় বিষাক্ত। তাই ওরি সঙ্গে লড়াই করতে কোমর বাঁধতে হয়, ফুটন্ত পারিজাতের ডালে চোখ পড়ে না। ইতি—২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৫।

দাদু

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

ভালো খবর। ফোঁটা আসবে এগিয়ে আমার কপাল যাবে পিছিয়ে, আশা করি, আমার কপাল এত খারাপ হবে না কিন্তু অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, ততদিনে কোথায় আমার অবস্থিতি হবে, নিশ্চিত বলতে পারিনে। যদি যথাসময়ে এখানে আমার থাকা হয়, তুমিও নিশ্চিত আসবে; কেননা, ভাইফোঁটায় তুমি তো আমার শেয়ার হোলডার। ইতি—১।১০।৩৮।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

রণজিৎ, এবার আমার কপালে ফোঁটা নেই। চলেছি হিমগিরির অভিমুখে। আমার অংশ তুমিই গ্রহণ কোরো। ইতি ৬।১০।৩৮।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

শৈলযাত্রা পথে অবশেষে ফিরে এসেছি। গিরিশৃঙ্গে পেঁাছতে পারলুম না। ইতি—১১।১০।৩৮।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুশি হলুম। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো, আর তোমার দিদিকে দিয়ো। আমরা এখান থেকে স্বস্থানে নেমে যাব ৫ই নবেম্বর নাগাদ। দু-চারদিন কলকাতায় থেকে দৌড় দেব শান্তিনিকেতনে। ঐ দুটো জায়গার মধ্যে যেখানে খুশি দেখা দিয়ো—প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ পাবে।

এখানে সূর্যালোকহীন দিন কুয়াশার কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। ইতি—২৪।১০।৩৯।

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি তোমার দেওয়া ভোগেরই মতো আমার কাছে এসে পৌঁছল। মিষ্টি লাগল। কিন্তু তুমি যদি আমার বইপড়া আর আমাকে চিঠিলেখা নিয়ে তোমার ঘরের কাজ কামাই করো তাহলে নিন্দে হবে তোমার দাদুরই। জানো তো আমার কোন্ একটা দুর্মুখ গ্রহ আছে কথায় কথায় সে আমার নিন্দে বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখে। কিন্তু তাও বলি এত বড়ো কাজ তোমার ঘাড়ে কে চাপায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যার প্রহর। সুযোগ পেলে তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে রাজি আছি। আমিও আছি কাজের সাতবাঁও তলায় তলিয়ে। কতকগুলো আছে ভারি ভারি কাজ, যা আপন ভারেই অনেকটা গড়গড়িয়ে চলে যায়, কিন্তু খুচরো খুচরো বাজে কাজগুলো ঝুড়ি বোঝাই করে কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে বসে, তাদের খালাস করতে করতে দিন কাবার হয়। বাড়া কাজের মধ্যে তবু একটা সান্ত্বনা আছে, কিন্তু ক্ষুদে কাজগুলো অতিষ্ঠ করে তোলে —এক ঝাঁক যখন শেষ করি তখন সেই অবকাশে আর এক ঝাঁক এসে হাজির হয়। অথচ আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে মজ্জাগত কুঁড়েমিতে আবিষ্ট করে সৃষ্টি করেচেন কিন্তু গ্রহ যিনি আছেন তিনি কাজে অকাজে খাটিয়ে মারেন। হাতের কাছে দুটি একটি নাৎনী আছে তাদের বলি সেক্রেটারীগিরি কর পঁচিশ টাকা করে দরমাহা দেব, অবশ্য আপ-খোরাকি। যদি বুড়ো দাদু না হতুম, চেহারাটা কাঁচা থাকত তাহলে দরমাহার প্রস্তাবটাও অনাবশ্যক হোত। কিন্তু নাৎনীদের মন অন্যত্র থেকে ফেরাতে পারি, এমন টান দেবার শক্তি এখন আর নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলি স্মরণ করে যখন বয়স ছিল পঁচিশ। কিন্তু তখন বর্তমান নাৎনীরা ছিল সম্পূর্ণ অব্যক্ত। দুটি-একটি মনের মতো বৌদিদি ছিলেন কিন্তু তাঁদের সেক্রেটারীগিরি আমাকেই করতে হোতো। আমি ছিলুম সব ছোটো দেওর। আমিও যে তাঁদের মনের মতো ছিলুম সে কথা আমার সামনে প্রকাশ করতেন না, পাছে আমার অহঙ্কার হয়।

সিংহলের পথে যাব কলকাতা হয়ে। কিন্তু এবার রাণী শয্যাগত, অতিথি হয়ে তার ভারবৃদ্ধি করতে পারব না। জোড়াসাঁকোতেই আশ্রয় নেব। কোনো একদিন তোমার বাবাকে সহায় করে দেখা করতে এসো। এবারে রবিঠাকুরের নৈবেদ্য না জোগালেও তিনি প্রসন্ন থাকবেন। ইতি—১২ বৈশাখ ১৩৪১।

দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু,

আবদার করবার অধিকার তুমি জয় করে নিয়েছ, সেটা পাকা হয়ে গেল বলেই মনে হচ্চে। সেদিন রেঁধে খাইয়েছিলে সেইটে দিয়েই ভূমিকা হয়েছিল। তার পরে পায়ের মাপ চেয়েছ, বোধ হচ্চে আমার পদমর্যাদা রক্ষার আয়োজন করবে। তোমার রাণীদিদি বসন্ত-উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে এসেছেন তাঁর হাত দিয়ে পায়ের মাপ পাঠিয়ে দেব।

আমার পত্র লেখার একটা যুগ ছিল তখন পল্লবিত করে লিখতে পারতুম। এখন ঝরাপত্রের পালা—তুমি বিলম্বে এসেচ—পত্রের আশা করো যদি তার শীর্ণতা দেখে দুঃখ পাবে। আমার নাৎনীরা এখন নিঃস্বার্থতার সাধনা করচে, সেবা করে, ফল কামনা করে না।

রক্তকরবীর অর্থ জানতে চেয়েছ—পরের বারে যখন দেখা হবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করব—লিখে বোঝাবার মতো সময় নেই।

বসন্ত-উৎসবের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

যে কলমে ছবি এঁকেছি, সেই কলম একটা রাণীর হাত দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার লেখার কলম একে একে অন্তর্ধান করেছে। যা বাকী আছে, তা নিয়ে কাজ চালাতে হয়। লেখার কাজ কমিয়ে দিয়েছি, লেখনীর সংখ্যাও গেছে কমে— আরও কমাবার সময় এখনও আসে নি। এক সময়ে কলম দিয়েই ছবি আঁকতুম, সেই ছবিতে খ্যাতিও পেয়েছি। আশা করে আছি, সময় পেলে আর একবার ছবি আঁকতে বসব। রাণীর সঙ্গে একজোড়া চটী জুতো পাঠিয়ে দিয়েছি। গোড়-তোলা জুতো পরা অনেককাল ছেড়েচি—আমার ত্বক ঘর্ষণ সইতে পারে না।

রাণীরা শীঘ্র যে বিলেতে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই—বাধা আছে অনেক। কলকাতায় আমার যাবার যখন দরকার হয় ওদের আশ্রয় নিই—জোড়াসাঁকোয় অত্যন্ত লোকের ভিড়—তাছাড়া ওদের যা যত্ন পাই, তারো দাম আছে। ওদের অনুপস্থিতিতে যদি কখনো ওখানে যেতে হয়, তাহলে তোমার সেবার দাবী করব। আমার বয়স যত বাড়চে, আমার নাৎনীর সংখ্যাও ত বেড়ে চলেছে, এতে বুঝতে পারচি আমি ভাগ্যবান বটে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বনতলে বসন্তের আসর জমে উঠচে। অনেক ফুল আছে, যাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই তার মধ্যে একটি ফুল বাসন্তী—ত্রিপুরার পাহাড় থেকে আনিয়েছি—সোনার রঙ, কচি পাতাগুলি লাল টুকটুক করচে, গ মিষ্টি। আর একটি ফুলের নাম দিয়েচি বন-পুলক, গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা ফুল, গন্ধে বাতাস মাতিয়ে তোলে। পলাশ ফুটে শে হয়ে গেছে। শিমুল এখনো কিছু বাকি আছে, ফুলগুলো ঝরে ঝরে গাছের তলা ছেয়ে গেছে—ফুলের মধু খাবার জন্যে ত ডালে ডালে পাখির ভিড়। বেল ফুলের গাছে কুঁড়ি দেখা দিয়েছে, আর ফুটতে দেরী নেই—কাঞ্চন গাছ আগাগোড়া ফুলে আচ্ছন্ন শালের মঞ্জরী ধরবে বসন্তের শেষের পালায়। এ-বছর আমের শাখায় কৃপণতা—মধুভিক্ষুর দল হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

সকাল বেলা শেষ হল—মধ্যাহ্নের দিকে ঘড়ির কাঁটার ইসারা দেখা যাচ্চে—এবার স্নানের চেষ্টায় চললুম। ইতি

১২ই মার্চ, ১৯৪৩।

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু,

আমার নাৎনীদের সংখ্যা এবং অত্যাচার ক্রমেই বাড়চে, আমার বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেচে তারা। মিষ্টিক চিঠি লেখ সেটা খুব ভালোই, কিন্তু তার মধ্যে শক্ত শক্ত প্রশ্ন ভরে দাও কেন? সুখের চেয়ে দুঃখ, মিলনের চেয়ে বি ভালো কিনা জিজ্ঞাসা করেচ, এ সব কথার জবাব একটা নয়। কোনো ক্ষেত্রে ভালো, কোনো ক্ষেত্রে ভালো নয়, অব বুঝে তার বিচার। অনেক সময়ে আমরা সুখের সত্যকার যাচাই করতে পারিনে, তখন, যেটা চেয়ে বসি সেটা পাওয়াই বাঁচোয়া, যেটা হাতে পাই সেটা হারালেই রক্ষে। অনেক সময়ে মিলনে আমরা মানুষকে সম্পূর্ণ জানতে পারি জানি তার খুটিনাটিগুলো—বিরহে সেই সমস্ত অবান্তর জিনিসগুলো বাদ দিয়ে আসল সত্যটিকে সহজে উপল করতে পারি। পরিপূর্ণ করে পেয়েছি বলে যখন মনে করি তখন ঠিক; আমাদের কাছে যা প্রত্যক্ষ, যা বর্তমা মধ্যে বদ্ধ সত্য তার চেয়ে অনেক বেশি, সেই জন্যেই আনন্দের মধ্যে চির-অতৃপ্তি থাকে। পাবার মতো জিনি নিঃশেষ করে পাওয়া যায় না, তার অনেকখানিই রয়ে যায় না-পাওয়ার মধ্যে, বিরহে সেই পাওয়া এবং না পাওয়াকে মি দেখতে পারি, মিলনে সবটা চোখে পড়ে না।

তুমি মনে করচ তুমি প্রশ্ন করবে আর আমি তার উত্তর দেব, সে হবে না। এবারকার মতো ভালোমানুষী কর কিন্তু এরকম ভালোমানুষির খ্যাতি বরাবর বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। যদি উৎপাত করতে থাকো তাহলে অ যতগুলো কলম আছে সব নাৎনীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিয়ে আদালতে কলমের ইন্‌সল্‌ভেন্সির দাবী দায়ের ক এতদিন ধরে লিখেছি অনেক, এখন সহজে কথাও জোগায় না, ইচ্ছেও হয় না। এখন এ বয়সের দস্তুর হচ্চে নাৎ কথা কয়ে যাবে আর দাদু স্মিতহাস্যমুখে মাঝে মাঝে নীরবে মাথা নাড়বে মাত্র। দেখেচি আমার নাৎনীরা মুখরা, অনর্গল কথা কয়ে যেতে পারে; তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হলে পিতামহ চতুরানন পর্যন্ত হাঁপিয়ে পড় তোমাদের সঙ্গে আমার এই সর্ত রইল তুমি যতখুশি এবং যাখুশি কথা কইবে আমি শুনতে আলস্য করব আমার কাছ থেকে কথা ফিরে চেও না। যদি চাও তাহলে তোমার নিঃস্বার্থ উদারতার অপযশ ঘটবে। অহংকার করে তোমার দৃষ্টান্ত আমার সব নাৎনীর কাছে দেখাব, বাগবাদিনী নাম দেব তোমার। আর যদি তুমি আমার সঙ্গে আবদার করে ঝগড়া করতেই থাক তাহলে তোমার উপাধি দেব বাগ্‌বিবাদিনী সেটা তোমার পক্ষে ল এবং আমার পক্ষে ক্ষোভের বিষয় হবে। চিঠিপত্র বেশি লিখতে পারব না এতে যদি দুঃখ পাও তাহলে তো স্মরণ করিয়ে দেব সুখের চেয়ে দুঃখ ভালো, পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার দাম বেশি। ইতি ২৫ মার্চ ১৯৩৪

দাদ্

ধূসর বসন্ত

নিরঞ্জন চক্রবর্তী, এম এ

যাক্, এতোদিন পরে তবুও মাসিমার অনুরোধ রক্ষা করা গেল, ভবানীপ্রসাদ ভাবলে।

সত্যি, মাসিমার ভিতরে স্নেহের মাত্রা যেন একটু বেশী। না হলে তার বাইরের দৈন্যের মূর্তিটা দেখেই তিনি এতো উদ্বিগ্ন হবেন কেন? ভবানী হাসল, মাসিমা চান তার দারিদ্র্যকে মুক্তি দিতে। তিনি সমুদ্র ক'খনো দেখেন নি বোধ হয়।

সে এসে মাসিমার বাড়িতে ঢুকতেই একেবারে রৈ রৈ কাণ্ড। এতোদিন সবাই যেন তার প্রতীক্ষা করেই বসেছিল, এমনি সবার মুখের ভাব। মাসীমাকে প্রনাম করে ভবানী বলল, 'আমার আগমনটা যে তোমাদের কাছে এতদূর অভাবনীয়, সে কথা ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে।'

মন যখন স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে তখন মাসিমার ভাষা মুক্তি পায় না। তিনি জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোরা হলি পুরুষ, নিষ্ঠুর তোদের প্রাণ, সহজে আঘাত লাগে না। হোতিস যদি আমাদের মতো সেকেলে বুড়ি......।'

পুনরায় মাসিমার চরণ-ধূলি নিয়ে ভবানী বলল, 'আমার কাছে তোমরা যেন চিরকাল সেকেলে বুড়িই থাকো, তাতে লাভ আমারই বেশী।'

তার কথায় বাধা দিয়ে মাসিমা বললেন, 'নে, বাজে কথা এখন রাখ, জামা কাপড় ছেড়ে বোস্—দুটো ভালো কথা বলা যাক্।—ও রতন, দাদাবাবুর জিনিসপত্রগুলো ভিতরে নিয়ে যা' তো।'

ভবানী মাসিমার হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বলল, 'এগুলো ভাই-বোনদের ভাগ করে দাও তো। কই, সতু গেলো কোথায়—এই যে রুণা, নাও তো ভাই।'

'এই দ্যাখো! এ কি কাণ্ড করেছিস বল তো? তোর পয়সা বেশী হয়েছে নয়?'

জিব কেটে ভবানী উত্তর দিল 'ষাট ষাট, কি যে বলো! পড়ো বাড়িতে কখনো লক্ষ্মীর বাহন বাস করে না, সে তো জানো? আর ভয় পাবার মতো কিছুই নয়। জানোই তো, স্বর্গের নন্দন কাননে আমাদের প্রবেশ নিষেধ, অমৃত ফল পাবো কোথা থেকে?'

এ নিয়ে আর বেশী কথা কাটাকাটি করলে ভবানী পাছে দুঃখ পায় তাই মাসিমা আর কিছু বললেন না। সবাইকে ডেকে খাবার ভাগ করে দিতে দিতে বললেন, 'বাণী, ঠিক সময়েই তুই এসে পড়েছিস, তোর পথ চেয়েই যেন বসে ছিলেম।'

'তোমার কথা শুনে আনন্দিত হলেম, মাসি।'

'দ্যাখ, বহুদিন থেকে ভাবছি যে, তোদের মতো ছেলেরা লক্ষ্মী-ছাড়া হয় কেনো। কারণও অবশ্য একটা খুঁজে পেয়েছি। আরে লক্ষ্মীই তোদের নেই তবে বর পাবি কি করে?'

'রক্ষে করো মাসিমা। যে ঐশ্বর্যের ভিতরে আছি তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত; তার উপরে বর লাভ আরও ঐশ্বর্য পেলে চাপা পড়ে মারা যাবার ভয় রয়েছে যে।'

মাসিমা যেন একটু দমে গেলেন। তবুও বললেন, 'যাক, এসব কথা পরে হবে। এক কথায় এর মিমাংসা হবার নয়। কারণ, গুরুজনের কথার মূল্য তুই কতটুকু দিবি তা তুই-ই জানিস। তারপর একটু থেমে হঠাৎ তিনি বললেন, 'এইরে, তোর সঙ্গে তো মিনুর আলাপ হয়নি, নয়? আমিও যেমন—ও মিনু, মিনু।'

কিছুক্ষণ পরে একটি ব্রীড়াবনতা মেয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। তখন হেমন্তের বৈকালের গৈরিক রশ্মিরেখায় মিনতিকে করে তুলেছে আপ্লুত। সেদিকে চেয়ে ভবানী কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাসিমাই তাদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন, বললেন, 'বাণী—চিনতে পারলি নে ওকে? আরে—ও যে তোদের সেই মিনু মিনতি।'

এতক্ষণে সে অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে পারল। ওমনি এক-খানা মুখ যেন মনে পড়ছে—পড়ছে। ছাই, ও সব কি আর মনে থাকে, ভগবান যে ঘানি টানাচ্ছেন দিন রাত।

'কি এখনো পারলিনে চিনতে? আরে—ওযে চাঁদপুরের শরৎ-বাবুর মেয়ে।'

'ও হোঃ, এতক্ষণে মনে পড়েছে। মনের আর দোষ কি বলো? ছেলেবেলায় হয়তো ওকে দেখে থাকবো ফ্রক পরা, টিন্‌টিনে ছিলো চেহারা। আর সেই মিনু যে এখন মিনতি হয়েছে তা কি করে জানবো? মিনু, তুমি যাই বলো, তোমার এখনকার চেহারার সঙ্গে সেদিনকার চেহারা মিলালে কিন্তু আকাশ পাতাল প্রভেদ; মনে হয় তুমি যেন নবজন্ম লাভ করেছ।'

'তোর ওই ভারি বদ অব্যেস, বাণী। ওরা ছেলেমানুষ, ওদের সঙ্গে খুনসুটি না করে যেন তুই পারিস না।—নে মিনু, তুই তোর বাণীদাকে প্রণাম কর।'

মিনতি তাড়াতাড়ি ভবানীকে একটা ঢিপ্ করে প্রণাম করে কোনও কথা না বলে ভিতরে চলে গেল। বেশ বুঝা গেল যে, সে রাগ করেছে। মাসিমা বললেন, 'দিলি তো ওকে চটিয়ে?'

'বেশ, আমিই আবার ঠাণ্ডা করে দেবো'খন।'

'তুই আসবি জেনে ওর কতো আনন্দ। ওর মা-ও এসেছিল, উঠেছিলো আমাদের এখানেই। ওর মা বাবা বেরিয়েছে তীর্থে—ও চাইলো না যেতে, তাই রয়ে গেছে। কেন যেতে চাইলো না জানিস?'

'জানি। আমি আসবো বলে।'

মাসিমা হাসলেন, বললেন, 'এই মিনুর মা ও তোর মা হলো গঙ্গাজল। মাত্র তাতেই তোর মা হলো না খুসী, সেই বন্ধুত্বের বাঁধনটা আত্মীয়তা দিয়ে করতে চাইলো দৃঢ়—'

মাঝখানে বাধা দিয়ে ভবানী যোগ দিল, 'ফলে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, হলো মিনুর জন্ম। মাসিমা, ভাগ্যিস মিনু মেয়ে হয়ে জন্মেছিলো, না হলে—

'তোর ফাজলামো এখন রাখ। দ্যাখ, তোর মায়ের সে অঙ্গীকার তুই রাখবি কি না। তোর মা এখন বেঁচে থাকলে সে-ই সব করতো, আমার আর কিছু করতে হতো না।'

একটু ভেবে ভবানী বললে, বুঝেছি মাসি, 'তোমাদের লক্ষ্মী-লাভের ব্যবসাটাই না শেষ পর্যন্ত আমাকে দেশছাড়া করে।'

'অমন অলক্ষুণে কথা বলিসনে। বাণী, জোর করবার কিছু নেইরে, যা ভালো বুঝিস করবি।'

ভবানী আরও কি কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাসিমার মেঘম্লান মুখখানা তাকে বাধা দিল। তাকে নিরাশার ব্যথার থেকে বাঁচাবার জন্যই যেন ভবানী বলল, 'এ সব গুরুতর ব্যাপার কি এক কথায় শেষ হয়, মাসিমা? যাক্ আপাতত কালকে আমার বাড়ি যেতে হচ্ছে কিন্তু।'

'কেন রে, ব্যাপার কি? এই দ্যাখ, কথায় কথায় বাড়ির খবরটা তোকে জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত ভুলে গেছি।'

'সে শুনে আর কাজ নেই, মাসিমা। চাঁদের এক দিকটাই মাত্র থাকে অন্ধকার—কিন্তু আমার কাছে দুই দিকই। এদিকে নিজেকে নিয়ে তো এই টানা হিঁচরে, ওদিকে বাড়িতে যে কি হয়ে আছে

ভগবানই জানেন। এক বিধবা বড়দির হাতেই সংসারের ভার—তাতে আবার সেই সংসারে কতো বৈচিত্র্য! বাবা অন্ধ, একটা বোন পাগল, ছোট তিন চারটে ভাই বোন খেলছে সব সময়ে আলোর ফুলঝুরি নিয়ে। দুটো উপযুক্ত ভাই—নিজেদের ক্ষুদ্র সংসারের জন্য তাদের বিরাট প্রাণ কাঁদেনা, তাই বিরাট দেশের চিন্তা নিয়েই পড়ে আছে তারা। ওকি মাসিমা, চোখ মুচছো যে, তবে থাক্ আর বোলব না। নাও, তুমি তোমার কাজ করো, আমি দেখি ওদের আর কাকে চটাতে পারি।'

মাসিমাকে কথা বলবার আর অবকাশ না দিয়ে ভবানী পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

তার পরের তিনটে দিন জ্বর এমনি চেপে এলো যে ভবানীকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ল। বিছানা ছেড়ে উঠে বসা তো দূরের কথা, জ্ঞানই অনেক সময়ে থাকতো না। তৃতীয় দিন বিকেল বেলার দিকে শরীরটা একটু ভালো বোধ হতেই ভবানী উঠে বসার চেষ্টা করলো।

মাসিমা এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন। ভবানীকে উঠে বসতে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'ওকি করছিস্ বাণী, এক্ষুণি যে আবার মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। কারো কথা যদি তোরা শুনিস্।'

মলিন হেসে ভবানী বলল, 'সে কি মাসিমা? এমন অপবাদ অন্তত আমার নামে তুমি দিও না—'

'হয়েচে হয়েচে, এখন চুপ করে তুই শুয়ে পড় তো। কি ভাবনাতেই যে তুই ফেলেছিলি। এখন কি রকম লাগছে, গা' হাত পায়ে আর ব্যথা আছে?'

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি, অনেক সেরে গেছে। কিন্তু আমি ভাবছি আর এক কথা, এত আদর যত্ন আতিথেয়তা পেয়েও কি না অসুখ চলে গেল! না না, তুমি হেসো না মাসিমা, একবার মেসে থাকতে হলো আমার নিউমোনিয়া। মেসের চাকর ব্যাটা হলো নার্স। তুমি হেসো না মাসিমা, একদিন আমার গা' ভীষণ গরম দেখে নিউমোনিয়ার মধ্যে সে আমায় বরফ সরবৎ পথ্য দিতে চেয়েছিল। বলল, খেলেই বাবু গা' ঠান্ডা হয়ে যাবে!'

মাসিমা ধমকে উঠলেন, 'রাখ, তোর যতো সব উদ্ভট্টি কথাবার্তা। হবে না, তোদের ওই সব হ্যাংলামা হুজ্জোত না পেলে কি শিক্ষা হয়? বললাম, তোকে চিরকাল দেখতে পারে এমনি একটা ব্যবস্থা করে দি। তোর মাথায় যেন একেবারে বজ্র ভেঙে পড়ল, যেন গন্ধমাদন ঘাড়ে নিতে বলেছি। আরে লক্ষ্মীছাড়া, তোর না হলে কিছু নয়, কিন্তু মেয়েটার দিকেও তো একবার দেখতে হয়? রাত জেগে জেগে তোর পরিচর্যা করে মেয়েটার চোখ কালসে হয়ে বসে গেছে—তুই একেবারে অন্ধ।'

'অন্ধই বটে মাসিমা! কিন্তু মাত্র দু' রাত্রি জেগেই যে মেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে তেমন পোষাকি মেয়েকে পোষ মানাবো কি করে আমি বলো? সোনার চামচে মুখে দিয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি মাসি।'

মাসিমা তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পাশের টিপয় থেকে বেদানা এনে রস করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর রস হয়ে গেলে ভবানীকে দিয়ে বললেন, 'নে খেয়ে নে, তারপর একটু চোখ বুজে থাক, আমি ওদিকটার কাজ সেরে আসছি।'

ভবানী বেদানার রস খেয়ে গ্লাসটা মাসিমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আর তোমার ওই মিনু না কি,—ওকে একবার ডেকে দিও তো মাসি। দেখি—সত্যি ও কতোটা কাহিল হয়ে পড়েছে।'

মাসিমা কোনও উত্তর দিলেন না। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। যাবার সময়ে মাসিমা ঘরের নীল আলোটা জেলে দিয়ে গেছেন। ভবানী সেই থেকে দরজা পর্দাটার দিকে চেয়ে—কখন মিনতি আসে। কিন্তু সে আসছে না। ভবানী ভাবলে সত্যি তাঁরি অন্যায় হচ্ছে। মিনতিকে এবার দুটো ভালো কথা বলতে হবে। এসে অবধি এ পর্যন্ত তো একবারও সে তাকে আঘাত না করে কথা বলেনি। কিন্তু রাত্রি বেড়ে চলল, তবুও মিনতি এলোনা। মাসিমা এর ভিতরে বার তিনেক এসে ভবানীর খোঁজ নিয়ে গেছে। তার কাছে মিনতির কথা বারে বারে জিজ্ঞেস করতে ভবানীর এই প্রথম যেন সঙ্কোচ বোধ হলো।

যাক গে। আপাতত মাসিমার স্নেহচ্ছায়ায় কিছুদিন তো নিজেকে জুড়িয়ে নেয়া যাবে। ছিলেন তো শহরের এক ঘিঞ্জি পাড়ায় এক এঁধো মেসে। প্রাণ ও তথাকথিত সম্মান বাঁচাবার জন্য দু' মাইল হেঁটে অফিস করে আসা, তার উপরে নিজের পড়াশুনো। আইনটা পাশ করে নিতে পারলে বাবার পশারটা নিয়ে বসা যাবে। ওঃ, সংসারের এতগুলো অসহায় ভাইবোন তার মুখ চেয়ে! নাঃ, সে ঠিক সময়েই মেস ছেড়ে মাসিমার বাসায় উঠে এসেছে। আর কিছুদিন অঘোর মুখুজ্যের মেসে থাকলে তাকে চোখে ঘোর দেখতে হতো। আর তার মানে, ভাইবোনগুলো সব অকূলে ভেসে পড়ত।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই মিনতিকে নিয়ে। না-বলা কথার ভিতর দিয়ে সব কিছু বলে ফেলার আর্ট সে জানে এবং জানে বলেই হয়েছে বিপদ। অভাগার বিপদ যায় সঙ্গে সঙ্গে। নাঃ, এই মিনতির জন্যই না শেষ পর্যন্ত আবার অঘোর মুখুজ্যের স্মরণাপন্ন হতে হয়।

যা হোক মিনতি শেষ পর্যন্ত এলো এবং এলো অনেক রাত্রে, একেবারে রাত্রির খাওয়া দাওয়া শেষ করে। ঘরে ঢুকে কোনও কথা না বলে সে ভবানীর মশারীটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ভবানী বাধা দিয়ে বলল, 'থাক্, একটু পরেই না হয় মশারী ফেলে দিও, মিনু। বস তুমি একটু। হাঁ, আমার যে মাথা ব্যথা করছে, কি করি বলতো?'

মিনতি নীরবে উঠে অডিকোলনের শিশি, জল ও ন্যাকড়া নিয়ে এসে ভবানীর মাথার পাশে বসল। সে ভাবলে, আমি যা দেখছি আমার জীবনে তা কি সম্ভব? মিনু আজ হেমন্তের নিশীথ নিস্তব্ধতার ভিতরে, যখন আকাশের চাঁদ তার জ্যোৎস্নাকে বিকীর্ণ করে ফেলেছে ঘরের ভিতরে, যখন শেষ শরতের স্পর্শটুকু বাতাসে বাতাসে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনি সময়ে মিনু কিনা তার শিয়রে বসে তার মাথায় অডিকোলনে ভিজানো ন্যাকড়ার পট্টি দিচ্ছে। ভবানীর মনেও যেন লাগল একটু আমেজ, কিন্তু সে আমেজটুকু যেন মিনুর ভালো-বাসার মতো ভরসাহীনভাবে কাঁপছে। মিনু আমাকে ভালোবাসে এ-কি সম্ভব হতে পারে? ভালোবাসা না পেয়ে না পেয়ে এই স্থূল জগতে ওদের রোমাঞ্চের নদী যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে।

আবার, মিনতির বাইরে যেন নেই ঢেউয়ের পরে ঢেউ—ও যেন ফাল্গুনী পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কম্প চাঁদ। ওর প্রাণের প্রাচুর্য যেন বিদ্যুতের মতো—অন্তরে ওর বাসা, অন্তরেই ও বাস করে। ওর আলো-ছায়ার খেলা মাত্র ক্ষণিকের, তাও মাত্র নিবিড় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

নাঃ, ওকে এই অবচেতন জীবন থেকে জাগাতে না পারলে যেন ভবানীর আশা মিটবে না। বলল সে, মাথায় তো অডিকোলন দিচ্ছ, এদিকে যে পায়ের বেদনায় অসহ্য বোধ হচ্ছে।

মিনতি নীরবে উঠে পায়ের কাছে গিয়ে বসল। পা' টিপে দেবার জন্য হাত দিতেই আবার ভবানী বলল, 'তার আগে জল দাও, জল খাবো।'

মিনতি নীরবে উঠে জল এনে দিল। আবার সে পায়ের কাছে বসতে যাচ্ছিল, ভবানী বলল, 'শোন মিনু, তুমি একটা কাজ করতে পারো?'

মিনতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

ভবানী বলল, 'দ্যাখ, বহুদিন দিদির কাছে পত্র দিচ্ছি না। বাড়ির জন্য মনটা বড্ড খারাপ হচ্ছে। তুমি কাগজ কলম নিয়ে এসো তো, দুটো কথা দিদিকে লিখে দাও দিকিন।'

মিনতি নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে রাইটিং

প্যাড ও কলম নিয়ে ফিরতেই ভবানী বলল, 'দ্যাখো মিনতি, আজ এই রাত্রে ওই পত্র লেখা-টেকা ভালো লাগবে না। তার চেয়ে তুমি ওই বাগান থেকে দুটি রজনীগন্ধার শীষ নিয়ে এসো তো। এই যে এই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কি আশ্চর্য! আচ্ছা মিনু, হেমন্তেও রজনীগন্ধা ফোটে?'

মিনতি একটু ছোট্ট উত্তর দিল, 'জানি না।' তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাগান থেকে গোটা কতক রজনীগন্ধার শীষ নিয়ে এসে ভবানীকে দিল।

ভবানী হাত বাড়িয়ে সেগুলোকে নিয়ে বলল, মিনু, তুমি রজনীগন্ধা ভালোবাস? আঃ, কি সুন্দর গন্ধ।'

মিনতি নীরব।

'কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?'

মিনতি মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, 'ফুল আমার ভালো লাগে।'

'আর রজনীগন্ধা?'

'তাও ভালো লাগে।'

এই বাসায় আসার পরে মিনতির মুখ থেকে এতগুলো কথা বোধ হয় সে প্রথম শুনলো। কিন্তু কি অদ্ভুত এই মিনু, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রতিঘাত নেই।

ভবানী পুনরায় তাকে আদেশ করল, 'নাও এই ফুলগুলো, দেয়ালে টাঙানো তোমার ওই ফটোটার উপরে রেখে দিয়ে এসো। এগুলো তোমাকে আমি প্রেজেন্ট করলেম, বুঝলে?'

প্রথমটায় ফুলগুলো ভবানীর হাত থেকে মিনতি নিতে পারল না। কিন্তু পুনরায় যখন আদেশ এলো তখন আর কি করে। কম্পিত হস্তে সেগুলো যথাস্থানে রেখে এসে সে বসল ভবানীর পায়ের কাছে।

এতক্ষণ পরে যেন ভবানীর মনে করুণা হলো। এবার সে কোমল হয়ে বলল, 'মিনু পায়ের কাছে নয়। এখানে এসে তুমি বস।'

প্রথমটায় মিনতি উঠতে পারলো না। কিন্তু আবার আদেশ আসবে সুনিশ্চিত জেনেই যেন সে উঠে এসে ভবানীর পাশে বসল ব্রীড়াবনত হয়ে। সে কতক্ষণ মিনতির অবনত করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কেন এমন কাজ করলে মিনু?'

মিনতি নিরুত্তর।

ভবানী পুনরায় বলল, 'কেন ভালোবাসতে গেলে মিনতি? জানো আমার মতো ছেলেকে ভালোবাসা অন্যায়, ভীষণ অন্যায়? যার পরিণতিতে অকল্যাণ তাকে তো কোনমতেই আমি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারি না, সে তোমরা যতোই স্বর্গীয় বলে আখ্যা দেও না কেন।'

মিনতি নিরুত্তর।

ভবানী বলল, 'তোমার জীবন এখনো আরম্ভই হয়নি বলতে গেলে, এখনি তুমি ভুল করোনা, মিনু। দীর্ঘনিঃশ্বাসকেই শুধু জীবনের সম্বল করবে কেন? দারিদ্র্য ভূষণ নয়, ও জীবনের ক্লেদ। ওকে যারা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে, তাদের মতের সঙ্গে অন্তত আমার মিল নেই। দুদিনেই এ রঙিন নেশা তুমি ভুলতে পারবে, মিনু। আমিই তোমার বিয়ের জন্য ছেলে খুঁজে দেবো, কোন চিন্তা নেই।'

এবার মিনু জড়িত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মাসিমা যে সব ঠিক করে স্বর্গে চলে গেছেন।'

'তা ঠিক। তা বলে একটা মুখের কথা রাখার জন্য দারিদ্র্য দিয়ে তোমাকে বরণ করতে আমি পারবো না।'

'তা আর কি করা যায়। বহুদিন পূর্বেই যা ঠিক হয়ে গেছে সে নিয়ে আর তর্ক করা চলে না।'

মিনতির কথা শুনে ভবানী কতক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলো। একটা বিষয় জানবার জন্য তার মনে ভয়ানক কৌতূহল হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'মিনু, একটা কথা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলতো, শুধু আমার মার কথার বাঁধন দিয়েই কি তুমি আমায় বাঁধতে চাও, না আরও কিছু আছে?'

মিনতি লজ্জায় একেবারে ঘেমে উঠল, কোনও উত্তর দিতে পারল না।

'কি বলো, উত্তর দাও।'

ভবানীর পুনঃপুন আদেশের পরে মিনতি বলল, 'মানুষের ভালোবাসা তো কাহারো আদেশের অপেক্ষায় স্থির হয়ে থাকে না।'

সাধারণ কথার কি অসাধারণ জবাব! ভবানী একেবারে স্তম্ভীত হয়ে গেল। ঠিকই তো, মানুষের দেহের উপরেই শুধু মানুষ অধিকার বিস্তার করতে পারে, কিন্তু মনের উপরে অধিকার কেউ জোর করে বিস্তার করতে পারে না। সে আপনিই আসে, যেমন আমাদের জন্ম আসে মৃত্যু আসে।

ভবানী শুধু বলতে পারলো, 'মিনু, তুমি ভুল করে আমাকেও বোধ হয় ভুল করালে।'

আরও দু'দিন ভবানীকে বিছানায় আবদ্ধ থাকতে হলো। তারপর আরও দুদিন লাগল একটু সবল হতে। তারপরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরবার পথে কেমন এক খেয়ালে ভবানী কিনে নিয়ে এলো কতকগুলো রজনীগন্ধার শীষ।

বাসায় ফিরে মিনতিকে সে আবিষ্কার করলো তারই ঘরে, গৃহকর্মরতা। ভবানী ঘরে ঢুকতেই সে লজ্জা পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তার পথরোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে ভবানী বলল, 'মিনু, এই তোমার পুরস্কার, আমাকে বাঁচিয়ে তুলবার পুরস্কার।'

কম্পিত হস্তে মিনতি ফুলগুলোকে নিয়ে ভবানীর পড়বার টেবলে রাখতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে সে বলল, 'না, ওখানে নয়। এগুলো তোমার নিজস্ব, তুমি তোমার কাছে রেখে দাও।'

মিনতি ফুলগুলো হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। ভবানী দরজায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে, তাই বেরিয়েও যেতে পারল না।

কতক্ষণ নীরবে মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভবানী বলল, 'মিনু, তুমি কি ঠিক করলে? আমি তো আজ বাড়ি যাচ্ছি।'

'কোন্ বিষয়ে বলুন।'

'তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না। তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমিও আমায় মুক্তি দাও।'

'আপনাকে তো আমি বেঁধে রাখতে চাই না। কিন্তু যে জিনিষটা হয়ে গেছে তাকে অস্বীকার করি কি করে?'

এ কথার উত্তর দেবার মতো ভাষা খুঁজে হঠাৎ ভবানী পেলো না। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকার পরে বলল, 'আজ আমার কিরকম যেন ভয় হচ্ছে মিনু। যে ট্রাজেডীর যবনিকা আজ এখানে উঠল, তার শেষ কোথায় কে জানে।'

মিনতি ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'আপনারা পুরুষ মানুষ, আপনারাই এতো হতাশ হয়ে গেলে আমাদের দাঁড়াবার যায়গা কোথায় বলুন।'

সত্যি, মিনতির এই ভাঙা ভাঙা ছোট ছোট কথাগুলোর মধ্যে যে এতো সঞ্জিবনী শক্তি সে কথা ভবানী এর আগে জানতো না। সে যেন এবার অনেকটা সাহস পেয়েই বলল, 'বেশ, তাই হবে মিনু। দেখি জীবনের চক্রটাকে ঘুরাতে পারি কিনা। ততোদিন কিন্তু তোমায় অপেক্ষা করে থাকতে হবে।'

মিনতির কোনও উত্তর ছিলো কি না কে জানে। সে কথা না শুনেই ভবানী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নীচের বারান্দায় মাসিমা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে কোনওরকমে একটা প্রণাম সেরেই সে ছুটল স্টেশনের দিকে। গাড়ির এখনো অনেক দেরি। তা হোক, এটা ওটা

কিছু কিনেও নিতে হবে। ছোট ভাইবোনগুলোও রয়েছে আবার তারই মুখ চেয়ে।

প্রায় মাঝ রাত্রিতে সে এসে পেঁছিলো বাড়িতে। দিদি এসে দোর খুলে দিতেই তো অবাক। সে কি-রে বাণী, একটা খবরও দিতে হয়। আয় আয়—ইস্, কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছিস। অসুখ বিসুখ করেছিলো না কি রে?'

'ধরো তুমি আগে এই জিনিসপত্রগুলো। প্রণামটা সেরে নি' তারপরে বলছি।' হাতের জিনিসগুলো দিদির হাতে দিয়ে তাকে প্রণাম করে উঠে ভবানী বলল, 'অসুখ একটু করেছিল বটে কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, আরও কিছুদিন ভুগলাম না কেন।'

দিদি তার কথার নিগূঢ় অর্থটা বুঝল না, বলল, 'ছিঃ কি যে তুই বলিস, সব তোর হেঁয়ালী ভরা কথা।'

ভিতরে এসে হাতের জিনিসগুলো সব প্যাক খুলে দিদিকে এটা ওটা দেখাতে দেখাতে ভবানী জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা সব কেমন আছ, দিদি?'

একটু ইতস্তত করে দিদি বলল, 'কি আর বলব, বল? সুমিত্রা এবার বিছানা নিয়েছে, কিছু খেতে চায় না। মাথার দোষটাও যেন বেড়েছে একটু।'

ভবানীর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মার মৃত্যুর পরে এই সুমিত্রা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে গেল। ভবানী আর্দ্র গলায় বলল, 'তুমি না হাসলে একটা কথা বলতে পারি দিদি।'

'বল্ না, হাসবো কেন?'

'শোন, আমাদের ওখানে এক ঠাকুর আছে, সে না কি সিদ্ধপুরুষ। হিমালয় থেকে সিদ্ধি লাভ করে এসেছে। তাঁর কাছ থেকে একটা মাদুলী এনেছি সুমিত্রার জন্য। দেখো, ও এবার ঠিক ভালো হয়ে উঠবে। না, তুমি হেসোনা দিদি। বলাতো যায় না, বিশ্বাসই সব, আসলে অসুধ কিছুই না।'

'বেশ তো, কালকে ওকে ধারণ করিয়ে দেবো।'

'কালকে কেন? আজ রাত্রেই ওর হাতে একটু লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দাও না। এখন ঘুমিয়ে আছে, জাগলে হয়তো আর পরতে চাইবে না। আর হাঁ, বাবা কেমন আছেন।'

'হাঁ, বাবার কথাই তো তোকে লিখবো ভেবেছিলাম। কোনও আশা আর দেখছি না ওঁর। ক্রমশই যেন অসার হয়ে পড়ছেন।'

কথা শুনে ভবানী একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাবা চিরতরে বিদায় নেবেন, একথা যেন সে ভাবতেই পারে না। যেদিকে সে তাকাতে চায় সেইদিকই মরুময়, আশাহীন। ভয়ে ভয়ে আর সে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করল না যে, বাবার কি অসুখ। প্রসঙ্গের মোড় ফিরাবার জন্য সে জিজ্ঞেস করল, 'ছোটরা কিরকম আছে দিদি, টুনি মণি ওরা?'

'ওরা ভালোই আছে।'

যাক্, তবুও কতকটা ভরসা যেন পেল সে। বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি, তুমি কিছু ভেবো না। তবে তোমারই যতো কষ্ট। তা আর কি করবে, বড়ো হলে অনেক কষ্টই পেতে হয়।'

বাইরে এসে হাত মুখ ধুতে ধুতে ভবানী অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দিদি, খাবার কিছু আছে? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

দিদি একটু ভেবে বলল, 'আছে খান কতক রুটি।'

'সে তো মণিদের ভোর বেলার খাবার। থাকগে, ভোর তো হয়ে এলো, শুয়ে পড়ি গে।'

'না না, তুই চল খাবি। ওদের না হয় ভোরবেলা মুড়ি কিনে দেবো। তুই মুখ ধুয়ে আয় রান্না ঘরে, আমি যাচ্ছি।'

দিদি চলে গেলে ভবানী ফিরে এলো নিজের ঘরে। হাত-মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছে সে টেবিলের নীচ থেকে একটা প্যাকেট বের করল। দিদির চোখে এখনো এ প্যাকেটটা পড়েনি। তা হলে নির্ঘাত বকা খেতে হতো। প্যাকেট খুলতেই একটা বড় ডল বেরিয়ে এলো। সেটাকে নিয়ে ভবানী এলো পাশের ঘরে, যেখানে ছোট দুটি ভাইবোন শুয়ে আছে। তাদের পাশে পুতুলটাকে শুইয়ে দিয়ে নীরবে ভবানী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

একটু পরেই দিদির ডাক শুনা যেতেই সে রান্না ঘরে এলো। দিদি বলল, 'আর কিছু যে নেইরে। এই গুড় আর নারিকেল কোরা দিয়ে খেতে পারবি তো? না হলে বল, চারটে ভাত রেঁধে দি, কতক্ষণ আর লাগবে।'

'কি যে বলো দিদি, এ তো আমার কাছে অমৃত। হাঁ দিদি এই দুটো লেবু এনেছি তোমার জন্য, তুমি লেবু ভালোবাস।'

পকেট থেকে দুটো লেবু বের করে ভবানী দিদিকে দিল।

'বাণী, তুই যেন কি! এখন কি লেবুর সময় না কি যে, এই দাম দিয়ে তুই আমার জন্য লেবু আনতে গেলি?'

ভবানীর মুখখানা আঁধার হয়ে এলো দেখে দিদি হেসে আবার বলল, 'বেশ ভালোই করেছিস্। আজ আমার একাদশী গেল কিনা বেশ ভালোই হলো। একটা কিন্তু রেখে দেবো, কালকে ওদের দেবো।

ভবানী কোনও কথা না বলে তৃপ্তির হাসি হেসে খাবারে মনোযোগ দিল।

ভবানী যখন বাড়ি এসেছিল, তখন তো মাত্র ছিল ঝড়ের সূচনা। তারপর তার প্রচণ্ড বেগ যখন দুর্নিবার হয়ে উঠল, তখন তাকে একেবারে দিশেহারা করে ফেলল। সেই যে সে বাড়ি এসেছে আর ফিরে যেতে পারেনি। সুমিত্রা ও বাবার অসুখ যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। ওদিকে অফিস থেকে জোর তাগিদ আসছে ফিরে যাবার জন্য—এখন ফিরে না গেলে হয়তো চাকরিই থাকবে না। কিন্তু এই বিপদ দিদির ঘাড়ে ফেলে সে যাবেই বা কি করে। দু' ভাই, তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—তারা বেঁচে আছে কি নেই, তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

যাক্, এতো সব চিন্তা করে তো আর লাভ নেই। কারণ জীবন আগে, তারপরে তো আর সব। কিন্তু মেঘের ফাঁকেও কখনো কখনো রৌদ্র ওঠে, ভবানীর মনও মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে চঞ্চল। তার খবর নেবার জন্য মাঝে একখানা পত্র দিয়েছে মিনতি। সেখানা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও বড় মধুর। ওরা জলপাইগুড়ি চলে গেছে—ওর বাবার কর্মস্থানে। সেই ঠিকানায় তাকে পত্র দেবার জন্য মিনতি জানিয়েছে। পরিশেষে লিখেছে, ভবানীর দেওয়া সেই রজনীগন্ধা গুলো যদিও এখন শুকিয়ে গেছে, তবুও সে সেগুলো তার বাক্সে অতি যত্নে রেখে দিয়েছে।

ভবানীর হাসি পেলো—কণ্টকিত কুসুমশয্যা আর কি!

যতোই দিন যেতে লাগল, ততই যেন বিপদ লাগল বাড়তে। অবশেষে আরও দিন পনের পরে সুমিত্রা নিজেকে মুক্ত করে ভবানীকে দিল মুক্তি।

শ্মশান থেকে বাসায় ফিরে এসে ভবানী দেখল, শোকে বাবা আরও কাতর হয়ে পড়েছেন। চোখে ভালো দেখতে পান না তিনি। তাই শোকের বেগ রোধ করবার জন্য যখন তিনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন, তখন তাঁর মূর্তি যেমনি ভয়াবহ, তেমনি করুণ।

এদিকে দিদি ভবানীকে প্রবোধ দেবে কি ভবানী দিদিকে প্রবোধ দেবে, তার ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। তার উপরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে চাইলে আর প্রাণে জল থাকে না। দু' মাসের প্রায় উপরে হয়ে গেছে ভবানী বাড়ি এসেছে। আর কতদিন ছুটি পাওয়া যাবে? দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে সে দিয়েছে চাকরি ছেড়ে! যাক্, বাড়িঘর বিক্রি করেও যদি এ যাত্রা প্রাণগুলো বাঁচানো যায়।

কিছুদিন পরে বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। ভবানী যেন কতকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দিদিকে ডেকে বলল, 'দিদিভাই, তোমা

দিকে যে আর চাওয়া যায় না, তুমিও কি আমার উপরে অভিমান করবার চেষ্টা করচো নাকি?'

'চুপ কর, তোর আর অত পাকামো করতে হবে না। তোর চেহারাটাই বুঝি দিন দিন কার্তিক হচ্ছে? এই মালতী শোন তোর বড়দাকে নিয়ে ওই ঘরে গিয়ে খেলা করগে যা'। ঘর থেকে যদি বেরুতে চায় তবে আমাকে ডাকবি, বুঝলি।'

ভবানী ম্লান হেসে বলল, 'সে না হয় যাচ্ছি কিন্তু এদিকে সংসারের একটা একটা করে সব জিনিস গেল। তারপরে কি এই বাড়িটা—

দিদি ধমকে উঠল, 'ফের আবার? আমি বড়ো, এসব চিন্তা আমার। তুই যা তো এখন।'

ভবানী নীরবে চলে গেল।

কিন্তু যেটুকু রৌদ্র উঠেছিল, সেটুকু আষাঢ়ের রৌদ্র। আকাশ আবার ছেয়ে গেল মেঘে। দিন দুই পরে ভবানীর ছোট ভাই জেল থেকে এলো ফিরে দেশকে ভালোবাসার পুরস্কার নিয়ে—এ পুরস্কার হলো টি বি। যাক্, বুদ্ধি করে দিদি ও ভবানী তাকে সংসারের কোনও অবস্থাই জানতে দিলে না। অগত্যা শেষ পর্যন্ত বাড়িখানা বাঁধাই দিতে হলো এবং সেই টাকায় ছোট ভাইকে পাঠানো হলো কার্শিয়াং স্যানাটোরিয়ামে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ছোট ভাইয়ের অসুখের কথাটা যেন কিরকম করে পৌঁছল গিয়ে বাবার কানে। দুপুরবেলা খাবার নিয়ে দিদি বাবার ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'আমি করুণা, বাবা।'

'আয় তো মা, আমার পাশে বোস একটু।'

বাবার গলার স্বর শুনে করুণা যেন কিরকম ভয় পেয়ে গেল' এ রকম গলার স্বর তো ইতিপূর্বে সে আর কখনো শোনেনি। খাবারের থালা মেঝের উপরে নামিয়ে রেখে করুণা এসে বাবার পাশে চৌকির উপরে বসল। তিনি বললেন, 'মেজ ছেলেটাও এবার বুঝি গেল, কি বলিস করুণা?'

'না বাবা, ও ভালোই আছে। জেলে থেকে ওর স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, তাই ওকে পাঠালেম চেঞ্জে।'

'ও বেশ করেছিস, কিন্তু দেখিস ও আর বাঁচবে না। যক্ষ্মা হলে কি লোকে আর বাঁচেরে?'

উত্তর দেবার মতো ভাষা করুণার মনে এলো না। তিনি করুণার হাতখানা নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে বললেন, 'অন্ধ হয়ে ভালোই হয়েছে, এ-সব চোখে দেখতে হয় না।'

করুণা বাধা দিয়ে বলল, 'ও-সব কথা থাক বাবা, তুমি এবার খেতে চলো, খাবার এনেছি।'

নিজেকে কিছুক্ষণ পরে একটু সম্বরণ করে তিনি বললেন, 'হাঁ খাবো বই কি। তার আগে তুই একটা কাজ কর তো। আমার গীতাখানা কোথায় আছে নিয়ে আয় তো।'

করুণা উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘর থেকে গীতাখানা নিয়ে এ-ঘরে এসে ঢুকতেই সে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'বাণী, শীগগির আয়।'

ভবানী ছুটে এলো। এসে বাবার অবস্থা দেখে সে নির্বাক পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি চৌকির পাশেই বসেছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে যে তিনি নীরব ও অসাড় হয়ে গেছেন, আর তাঁর ভিতরে স্পন্দন নেই।

করুণা ছুটে গিয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়ল। ভবানী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে, ভাষাহীন নিষ্পলক চোখে কিছুমাত্র অশ্রু নেই। কতক্ষণ পরে সে দিদিকে তুলে বলল, 'কাঁদছো কেন দিদি, আনন্দ করো। বাবা যে মুক্তি দিয়ে গেলেন।'

তারপরে ভবানী এমনভাবে হাসল যেন পাগল হয়ে গেছে। ছোট ভাই-বোনগুলোও তখন এসে দিদির সঙ্গে সমান তালে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে, যেন পাল্লা দিচ্ছে। সে দৃশ্য না দেখতে পেরে ভবানী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাড়ির কোনওরকম একটা ব্যবস্থা করে ভবানী যখন আবার কলকাতা ফিরে আসতে পারল, তখন প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে। ভবানী যে অফিসে কাজ করত, সে অফিসে গিয়ে সাহেবকে সব অবস্থা বলাতে, সে সহানুভূতি জানিয়ে তাকে আবার বহাল করলে।

ভবানী এবার যেন পৃথিবীর কথা ভাবতে পারলে পুনরায়। সত্যি, চিরকাল কি আর অন্ধকার থাকতে পারে? মেঘের ওপারেই থাকে সূর্য, একদা সে উঠবেই উঠবে। কিন্তু তবুও যেন পৃথিবীটা কিরকম ফাঁকা, ফাঁকা! ওরা চলে গেল—এই সুমিত্রার কথাই মনে পড়ে বেশী। ও-যেন ছিলো বহ্নিশিখা বাইরে, ওর অন্তরে যেন ছিলো বাসন্তী সন্ধ্যার কোমল নমনীয় শীতলতা। মায়ের মৃত্যুর শোক যেন ওর প্রাণে বিঁধেছিল শেলের মতো। মানুষের দুঃখে মানুষ মরে যেতে পারে, জীবনে এই সে প্রথম দেখলে।

এই ওরা সব দুঃখ পেয়ে গেল। যাক্, মরে গিয়ে ওরা বেঁচেছে। এবার সে নিজের দিকে চেয়ে ভাবলে, 'আমার তো তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। মৃত্যু জীবনের রূপান্তর, ও হয়েই থাকে। তাকে রোধ করবার মতো শক্তি আমার আছে কোথায়? যারা চলে যায়, তারাই দুঃখ পেয়ে যায়। যারা পড়ে থাকে, তাদের আর দুঃখ কি?

তার মনের কথা শুনে বিধাতা হয়তো হাসলেন।

এবার ভবানী ভাবলে, আর এই মিনতিও তো রয়েছে। ওঃ, তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হাঁ, এখন মনে পড়ছে, মাঝখানে সে একখানা পত্র দিয়েছিল বটে যে তারা কলকাতা চলে এসেছে। যাক্, খুঁজে তার ঠিকানাটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে,—সেই চিঠিটার উপরে নিশ্চয়ই লেখা আছে।

হাঁ, মিনতিকে বরণ করবার এই তো শ্রেষ্ঠ সময়। চারদিক একেবারে ফাঁকা, ঝড়ের কোনও লক্ষণই আর নেই আকাশে। আর দিদি বেচারীও আর পেরে উঠছে না একা একা।

সেদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে দিদির একখানা চিঠি পেল ভবানী। চিঠিখানা খুলে পড়তেই সে একেবারে লাফিয়ে উঠল। দিদি লিখেছে, 'বাণী, তোকে একটা সুখবর দিচ্ছি। ছোট ভাইটা এতদিন পশ্চিমে চাকরি করতো, এবার দেশে ফিরেছে।'

মরুভূমির পথিক যেন দেখেছে ওয়েসীস, এমনি ভবানীর ভাব। যাক্, আর দেরি নয়। কালকেই একটা ছুটির দিন আছে, কালকেই যেতে হবে মিনতির কাছে।

পরদিন সারাদিন ঘুরে ভবানী রজনীগন্ধা ফুল যোগাড় করল। সে ভালোবাসে বলে মিনতিও এই ফুল ভালোবাসে। সন্ধ্যাবেলা ভবানী ফুলগুলো নিয়ে এসে মাসিমাকে প্রণাম করল। কিছুই বুঝতে না পেরে মাসিমা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ভবানী বলল, 'ফিরে এসে সব তোমায় বলব, মাসি। লক্ষ্মী আপনি আসেন না, তাঁকে আরাধনা করে আনতে হয়।'

কিছুই না বুঝে মাসিমা নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভবানীদের বাড়িতে নানা বিপদ-আপদ ঘটে যাওয়ায় তিনি আর মিনতির কথা তোলেন নি এর ভিতরে। মাসিমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য ভবানীও কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ঠিকানা খুঁজে যখন সে মিনতিদের বাড়ি এলো, তখন একটু রাত্রি হয়ে গেছে। বাসার দোর ছিলো ভেজানো। দোর ঠেলে সে ভিতরে ঢুকতে যাবে, এমনি সময়ে বাইরে এসে একখানা মোটর দাঁড়াল। সেই মোটর থেকে যে দুজন নেমে এলো, তাদের একজন মিনতি, আর একজন ভদ্রলোক, ভবানী তাকে চেনে না।

(শেষাংশ ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(৯)

সাদা চাদর পাতা নরম বিছানা, মাথার কাছের খোলা জানালা গলিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না এসে প'ড়েছিল তার ওপোর ; তেপায়া টেবিলের ওপোর যে আলোটা জ্ব'লছিল, সেটাকে নিভিয়ে দিয়েছিল অজন্তা ইচ্ছে ক'রেই, তার পরে এসে উপুড় হ'য়ে প'ড়েছিল বিছানায়।......

খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মাথামাখি হ'য়ে ভেসে আসছিল বাগানে ফোটা ফুলের গন্ধ ; হয়তো এ গন্ধ চেনা। অনেকদিন আগে অনেক নিঃসঙ্গ দিন কি নিস্তব্ধ রাত্রের হাওয়া ওকে বুকে নিয়ে ভেসে এসেছে অজন্তার প্রাণের দরোজায়। কিন্তু আজকের মত এমন নিবিড় অনুভূতি নিয়ে নয় ;—এই কথাই বারম্বার মনে প'ড়ছিল অজন্তার।

হঠাৎ সে চ'মকে উঠলো কার নীরব করস্পর্শে ! কে যেন ডাকছে মাথায় হাত রেখে!......

সান্ত্বনাময় সে স্পর্শ, তবু অজন্তা মুখ তুলে তাকাতে ভরসা ক'রলো না,—যদি এ শান্তিটুকু তার ভেঙ্গে যায়! আবার যদি আঘাত লেগে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যায় ওর মনে মনে গড়া সান্ত্বনাটুকু!......

"অজন্তা—"

অজন্তা উত্তর দিল না, নির্বাকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ ক'রলো পার্থর হাতখানাকে। উত্তর না পেলেও পার্থ বুঝলে অজন্তার হাতখানা কাঁপছে। ঝড়ে ডানা-ভাঙা পাখীর মত,—হয়ত এ তার এতটুকু সান্ত্বনা এতটুকু আশ্রয়ের আশা নিয়ে ঐ করস্পর্শের মৃদু কম্পন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে কাতর অনুরোধ—মিনতি।

পার্থ ব'ললে ঃ—

"তোমাকে যে আমি মাঝে মাঝে কেমন ক'রে আঘাত ক'রে ফেলি, সে কথা তখন বুঝিনে অজন্তা, যখন বুঝি তখন আর ফেরাবার উপায় থাকে না!......

অজন্তা নির্বাক। নিঃশ্বাসটা ওর দ্রুত হ'য়ে উঠেছে, নয়তো হাতখানার কম্পন থেমে গেছে। পার্থ একটা নিঃশ্বাস ফেললে জোরে।

জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছিল বিছানার ওপোর থেকে, ওরই এতটুকু রেশের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল অজন্তার অস্পষ্ট মুখ, ছায়াময় অবয়ব ; পার্থ যেন একবার সে মুখ দেখবার চেষ্টা ক'রলো প্রাণপণে ; তারপরে ব'ললে ঃ—

জানি তোমার বেদনা কোথায়! অবশ্য এর জ'ন্যে তোমায় কি আমায় কারুকেই দায়ী করা চলে না ; কারণ তুমি চেয়ে আমাকে বাঁধতে, আমিও চেয়েছি বাঁধা প'ড়তে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিতে একলা তোমারই হাতের মুঠোয় ; তবু এ চাওয়া আর পাওয়ার বাইরে যে বিরাট পৃথিবী আমাদে দুজনকেই দুদিকে নিয়ত আকর্ষণ ক'রছে দুর্নিবার শক্তিতে তাকে অস্বীকার করি কেমন ক'রে অজন্তা?

[illegible]মিই কি তোমার দুই হাতে তাকে ফিরিয়ে দি পারবে[illegible]

"না—।"

"তবে?"

"কিছু না :—আমি জানিনা—কিছু জানিনা......

আশ্রয়প্রার্থী ভীরু পক্ষিণীর মত ও মুখ লুকালো পার্থ বিস্তৃত বক্ষে। পার্থ তাকে সরালে না,—সাগ্রহে চেপেও ধরে না দুই হাতে,—নির্বাকে ব'সে রইল শুধু বাইরের দি তাকিয়ে। আজিই সে খানিক আগে বেড়াতে বার হ'য়ে দে এসেছে মনুষ্য সভ্যতার সীমা কাটিয়েও অসভ্য জংলীরা কে ঘরে বেঁধে স্ত্রীপুত্র পরিবারের মধ্যে সংসার গঠন করে বাসও করে ওরই গণ্ডীর মধ্যে সুখে-দুঃখে। ওদেরও মাথ ওপোর দিয়ে চলে যায় কত বর্ষা—কত বসন্ত ; তার মধ্যে প্রাণের বন্ধন হ'য়ে ওঠে কি নিবিড়, কি দৃঢ়!...

হিন্দুর সংস্কার পরজন্মে বিশ্বাস ; তাই শুধু এজন্মে নয় ; স্বামী-স্ত্রীর এই প্রাণের বন্ধন—হিন্দু শাস্ত্রকারেরা দেহে ভিত্তি রেখেই টেনে নিয়ে গেছেন—দেহাতীত ক'রে,—অপ জীবনের পরপার পর্যন্ত। জীবনের ওপারে পৌঁছেও না এ বন্ধন শিথিল হয় না, এই তাঁদের বিশ্বাস,—আর এই বিশ্বাসে ওপোর অসহায় নির্ভর করেই চলে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন, প্র বৎসর, আর তার প্রতি পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে যতখ হারাচ্ছে,—যতখানি লাভ করছে তার বিচার করছে— জীবনের—একেবারে শেষ মুহূর্তে উপনীত হয়ে।—

কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা!......

পার্থ হাঁপিয়ে উঠলো!......

মনে পড়লো কিন্তু এ আদর্শ তো শুধু আজ নয়, অ দিন ধরেই দেখে এসেছে সে মা দিদিমা—ঠাকুরমার মধ্যে। আজ দেখছে সৌম্যের স্ত্রী মায়াকে। সৌম্যকে সে চিনে অনেক দিন, কিন্তু মায়াকে চেনেনি, চিনছে আজ।...সৌম্য ত তার রুচি অনুযায়ী যতরকম হালফ্যাশানেই দুরন্ত করে তু না কেন—তবু তার ঐ সৌম্যকে ঘিরেই এই আবর্তন, এই

পদ্মিনী উপাখ্যান

১৮৫৮ খৃস্টাব্দে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিরচিত হইয়াছিল। এই পদ্মিনী উপাখ্যান রচনার একটু ইতিহাস আছে। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে 'ভার্ণেকুলার লিটারেরি সোসাইটি' নামে একটি সভা বাঙলা সাহিত্যে সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি বঙ্গসাহিত্যে কোন লেখক জীববিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি, শ্রমশিল্প, জীবনচরিত নৈতিক আখ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে কোনও সদ্‌গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা হইলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবেন। লং সাহেব লিখিয়াছেন:—

'The Vernacular Literature Society of Calcutta desirous of encouraging original composition, offered standing prizes of Rs. 200 for any new original works in Bengali, approved by the Society of not less than 100 printed page 12 M.O. when printed, on any of the following subjects—Natural History and Science, Topography and Geography, Commerce and Political Economy, Popular and Practical Science, the Industrial Arts, Education, Biography, Didactic fiction. Out of 10 Mss. submitted for prizes, only two obtained it, viz. The *Shushila Upakhyan* by Madhu Sudan Mookerjea, a moral tale pointing out the defects and requisites for native girls and *Padmini Upakhyan* by Rangalal Banerjee, a tale of Rajputana in verse, both are admirable models."*

কাজেই দেখা যাইতেছে পদ্মিনী উপাখ্যান রাজপুতানার কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত এবং তিনি এই কাব্য রচনা করিয়া The Vernacular Literature Society হইতে ২০০, দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেম জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নি-নিঃস্রাব। ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য অপূর্ব তেজব্যঞ্জক। ইহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও এই কবিতাটি অনবদ্য। এক সময়ে রঙ্গলালের নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি শিক্ষিত জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হইত।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়—
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।

একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়,
নিবাইতে সে-অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?

অই শুন, অই শুন, ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার।
সর্বাঙ্গ বহিয়া ঝরে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার!'

বাঙলা সাহিত্যে এই সত্য সত্যই নবযুগের সঞ্চার করিয়াছিল। এই স্বদেশানুরাগদীপ্ত কবিতা যখন প্রকাশিত হয়, তখন মধুসূদন বীরনাদে মেঘনাদকে লইয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করেন নাই।

রঙ্গলালের জীবনী লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বলেন,—'পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল সর্বপ্রথমে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন যে, ইংরাজী কাব্যের আদর্শ ও প্রাচ্য কাব্যের আদর্শের সংমিশ্রণে বাঙ্গলার নবযুগের উপযোগী এক নূতন আদর্শ গঠিত হইতে পারে। তাঁহার অসাধারণ সাফল্যে মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ ইংরাজী সাহিত্যে বিভোর সাহিত্যরথিগণের দৃষ্টি 'মাতৃকোষে রতনের রাজি'র দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রঙ্গলাল যেমন মুর, স্কট, বায়রণ প্রভৃতি কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মাইকেল তেমনই কবিগুরু মিলটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিলোত্তমা ও মেঘনাদ বধ প্রকাশ করিলেন। পদ্মিনী ও কর্মদেবী প্রকাশের মধ্যে মাইকেল তাঁহার তিলোত্তমা ও মেঘনাদ প্রকাশ করিলেন।' * * যখন সাহিত্য-সমাজে ঈশ্বর গুপ্তের অতুলনীয় প্রতিপত্তি, বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার আদর্শের অনুকরণে প্রযত্নবান, তখনও রঙ্গলাল গুপ্ত কবির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিয়া মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন'

মাইকেলের উপর রঙ্গলালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে মাইকেলের জীবনচরিত লেখক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—"কাশীরাম দাসের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় আরও একজন কবির নিকট প্রমীলা চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন ঋণী আছেন। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশিত হইবার পূর্বে মধুসূদনের বাল্য সুহৃদ বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্মিনী উপাখ্যান সম্বন্ধে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে মধুসূদনের অনেক সময় কথোপকথন হইত। নিজের মনঃকল্পিতা প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীম সিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ, পরিবর্তিত আকারে, তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের উপযোগী হইয়াছিল।"

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যে দেশপ্রেমের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, যে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতাবলী তাহাতে আছে, তাহা বাস্তবিকই দেশবাসীকে স্বদেশানুরাগে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই মহোদয় বাঙলা সাহিত্যের

---

* Selections from the records of Bengal Government published by authority. John Gray, General Printing Department, 5½, Council House Street, 1859. P. xiv.

*'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ২১শ বর্ষ—১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৩৮৪ পৃ। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম.এ, লিখিত 'রঙ্গলাল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে ইতিহাস 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রঙ্গলালের কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Rangalal Banerjea is a living poet and a Deputy Magistrate, and has written three spirited poems on Episodes from Rajput history. His 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' কর্ম দেবী and শূরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and heroism. No authentic history perhaps affords to the poet such stirring tales of heroism and valour as that of Rajasthan and our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse."

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খৃ অ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে বাঙলায় জাতীয় সাহিত্যে অপূর্ব মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি বীরনাদে অম্বুনাদে মেঘনাদকে লইয়া বাঙলার সাহিত্য মন্দিরে অবতীর্ণ হইলেন। প্রারম্ভেই বলিলেন ঃ—

উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরসে! গাইব, মা, বীর রসে ভাসি,
মহাগীত; উরিদাসে দেহ পদছায়া।

আমরা যখন রক্ষ-রাজসভায় দূত কর্তৃক বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ রক্ষরাজকে দিতে শুনি, তখন রাবণের যে বীরব্যঞ্জক মূর্তি আমাদের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠে, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব। রাবণ পরে যখন বীরবাহুর পতনস্থল দেখিতে গেলেন। দেখিলেন—

'পড়িয়াছে বীরবাহু বীর চূড়ামণি।'
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা,
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।'

সেই দৃশ্য দেখিয়া রাবণের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তখন মহাশোকে শোকাকুল রাবণ বলিলেন ;—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে!

এ কয়টি পংক্তির মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ও বীরত্বের ভৈরববাণী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই। তারপর 'শোকে অধোমুখে বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা যখন পুত্রকে স্মরণ করিয়া শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, তখন রক্ষরাজ তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ—

'এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দু নিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?'

বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সান্ত্বনা বাক্যে যে উত্তর দিলেন, তাহা বীরবাহুর জননীর উপযুক্ত বটে। চারুনেত্রা দেবী চিত্রাঙ্গদা বলিলেন ;—

দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলি মানি;
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।

মেঘনাদবধ কাব্য বীর রসে পূর্ণ। আমরা মেঘনাদের বীরত্ব, রাবণের অপূর্ব তেজ ও সাহসিকতা, তাঁহার স্বদেশ সেবায় লঙ্কা প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ যেমন হৃদয়কে অভিভূত করে, তেমনি বীর-বাহুর মৃত্যুতেও শোককাতর হৃদয় রাবণের মুখে যখন শুনিতে পাই—

কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে?

মধুসূদন সুবর্ণ লঙ্কাপুরীর বর্ণনার দ্বারা আমাদের সম্মুখে রাবণের দেশপ্রেমের প্রতি গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। মধুসূদন প্রায় এগারখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশ পদাবলী ও নাটক প্রভৃতির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি সর্ববিধ রচনার মধ্য দিয়াই স্বদেশপ্রেমের মহিমাকে সুপ্রকাশিত করিয়াছেন।

মধুসূদনের লিখিত 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার পূর্বে অন্য কেহ জননী বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সেই—

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো নাগো, তব মনঃ কোকনদে।

কবিতাটি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠস্থ, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা এই প্রবন্ধে যে তিনজন কবির কথা আলোচনা করিলাম, তাঁহারা তিনজনেই যে সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেমের মহত্ত্বসূচক বাণী কবিতায় ও কাব্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, সেকথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙলার মধ্য যুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি। তাই তাঁহাতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের আভাসও আছে। আবার যে কবিতা ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও পূর্বাভাষ তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখা দিয়াছিল।' 'বঙ্গবীণার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিমত আমাদের স্মরণীয়।

স্বদেশপ্রেমের ভাব মন্দাকিনী ধারা ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙলা সাহিত্যের বুকে প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহাই ধীরে ধীরে রঙ্গলাল ও মধুসূদনের প্রবল ভাবানুরাগে বর্তমান কাল পর্যন্ত কিভাবে, কেমন করিয়া পুরিপুষ্টি লাভ করিয়া বাঙালীর জীবন স্বদেশপ্রেমের পুণ্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শত শত কবির বীণার স্বরলহরীতে সারা ভারতবর্ষকেই প্লাবনের ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে, সেকথা একে একে আলোচনা করিব।
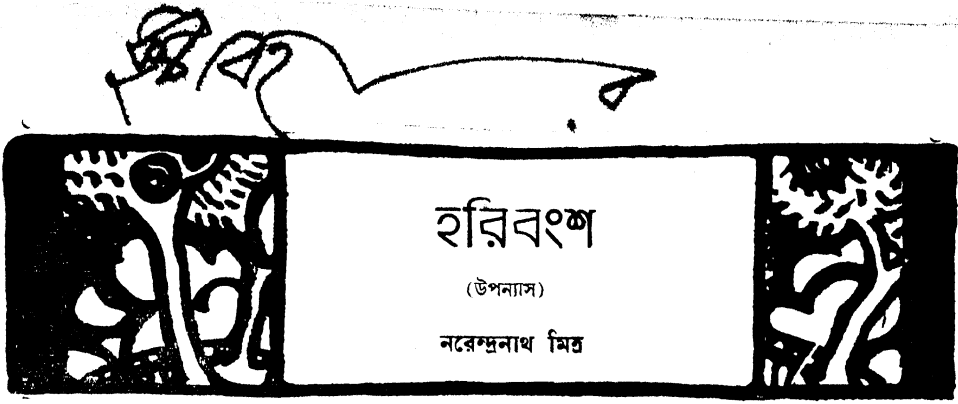
১১

খেয়ে দেয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে মনোরমা একবার নিজের ঘরে ঢুকল, তারপর আস্তে একটা পান মুখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মুরলী চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করল আর মনে মনে একটু হাসল। যেদিন এসব কাণ্ড করে বসে মুরলী সেদিন স্বামীর প্রতি ঔদাসীন্য আর শ্বশুরের ওপর মনোযোগ বেড়ে যায় মনোরমার। যেন এমনি করেই মুরলীর ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করতে চায়। মুরলী চুপ করে থাকে, বিন্দুমাত্র ঈর্ষাও সে প্রকাশ হতে দেয় না। সে জানে তা হ'লে মনোরমা আরও সুবিধা পেয়ে যাবে। যদি সে জানতে পারে এতে মুরলী মনে মনে ঈর্ষা বোধ করে তা হলে এই উপায়টা মনোরমা আরও বেশী করে অবলম্বন করবে। তার চেয়ে চুপ-চাপ থেকে ঔদাসীন্যের জবাব ঔদাসীন্যে দেওয়া অনেক ভালো। মনোরমাকে বুঝতে দেওয়া ভালো যে তার রাগে অনুরাগে অবজ্ঞা আদরে কিছুই এসে যায় না মুরলীর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে মনোরমার মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামাবার সত্যিই মুরলীর অবসর ছিল না। মনোরমা কখন নেপথ্যে সরে গিয়েছিল তার স্থানে রঙ্গীর উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বলতর হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছিল মুরলীর। কী অদ্ভুত উত্তেজনাময় অনুভূতি। এমন তীব্রতর স্বাদ বহুদিন যেন মুরলী ভুলে ছিল, কিংবা কোনদিনই যে এ স্বাদ সে পেয়েছে এই মুহূর্তে সে কথা মুরলীর মনে পড়ল না।

মনোরমা যাই বলুক মুরলী সত্যি সত্যিই বুড়ো হয়ে পড়েনি, এমন কি দেহে মনে সামান্য প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণও দেখা যায়নি এখনো মুরলীর। কামনার এই উগ্র উন্মত্ততাই তার প্রমাণ। অপরিণামদর্শী উচ্ছৃংখলতার মধ্যে নিজের যৌবনকে যেন আবার নতুন করে অনুভব করল মুরলী।

কোন সম্মানহানির ভয় ভবিষ্যৎ কেলেঙ্কারীর ভয়ই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। এমন কি মেয়েটির কাছ থেকে তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যে যায়নি, তার সম্মতির অভাব থাকতে পারে এসব ভেবে দেখবার কোনদিনই মুরলীর সময় হয় না, আজও হয়নি। অত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম হিসাব করে, ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে পারে না মুরলী, মেয়েদের মন বুঝবার তার সময় হয় না, দরকার হয় না, এই যে কোন রকম অবকাশ না দিয়ে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে রঙ্গীকে সে নিজের বুকের মধ্যে উন্মত্তভাবে জড়িয়ে ধরেছিল এর মধ্যে যে দুঃসাহসিকতা আছে, মন বোঝাবুঝি করতে গেলে তা পাওয়া যেত না। শুধু কামনার উগ্রতাই নয় এর মধ্যে নিজের শারীরিক শক্তির পরিচয় পেয়েও খুশী হয় মুরলী। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় সলজ্জে এসে তার কাছে আত্মনিবেদন ক'রেছে এমন ভাগ্য খুব কমই ঘটেছে মুরলীর। অত সময় নেই, অত সহিষ্ণুতা নেই তার। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ঠিক প্রথমেই তার কাছে কেউ করেনি। সে ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে জোর ক'রে। আজও রঙ্গী যখন ছোট পাখীর মত তার দৃঢ় বাহু বেষ্টনীর মধ্যে ঝটপট ক'রছিল তখন চমৎকার লাগছিল মুরলীর। নিরীহ আত্মসমর্পণের চেয়ে এ অনেক ভালো। আত্মসমর্পণ তো শেষে ওরা এক সময় করেই কিন্তু তার আগে ওদের এই ক্ষণিক বিদ্রোহীতা দেখবার মত।

রঙ্গী কিন্তু বেশ চালাক মেয়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লোকের কাছে সে করল বটে কিন্তু নিজের জাত মান বাঁচিয়ে। মুরলী তাকে বুকের সঙ্গে গাঢ়ভাবে জাপ্‌টে ধরেনি, কেবল হাত ধরেছিল, এতে রঙ্গীর নিজের মানও বেঁচেছে, মুরলীর অপরাধও অনেকখানি লঘু হয়েছে। মুরলী মনে মনে হাসল। আর একটু বেশী চালাক যদি মেয়েটা হোত তাহ'লে ওটুকুও আর বলত না। সম্ভবত স্বামীর কাছে এটুকু গোপনই করবার মত বুদ্ধি তার হবে।

হঠাৎ রঙ্গীর স্বামী অজিত ছোকরার কথা মনে পড়ে গেল মুরলীর। এ গ্রামের জামাই। বেশ বড়লোকের ছেলে, কলকাতায় থেকে ডাক্তারী পড়ছে। এক ছুটিতে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল সেবার। অজিত যে তার কথাবার্তায় বেশ মুগ্ধ হয়ে গেছে একথা মুরলীর বুঝতে মোটেই বাকি ছিল না। বিশেষ ক'রে তার অনিয়মিত, উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের আভাস পেয়ে অজিত যেন আরো উল্লসিত এবং আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু আভাস ইঙ্গিতেই সে তৃপ্ত থাকতে চায় না, বিশদ বিবরণ শোনবার জন্য কী আগ্রহ, কী ঔৎসুক্য তার। আজ যদি এ কাহিনী তার কানে যায়—নিশ্চয়ই যাবে—মুরলীর ওপর তার কি তেমন সপ্রশংস মনোভাব থাকবে, ভক্তজনোচিত আকর্ষণ থাকবে তেমনি, যেমন থাকে বিনোদের প্রতি বিনোদের ভক্তদের?

কিন্তু বিনোদের যেমন ভক্ত আছে তেমন কি একজনও আছে মুরলীর? বিনোদের চারপাশে যারা ভিড় ক'রে থাকে তারা যেভাবে শ্রদ্ধা করে বিনোদকে, মুরলীর সাকরেদের দলের কি তেমন মনোভাব আছে মুরলীর ওপর? মুরলীর মনে হোল আর যাই করুক তারা তাকে শ্রদ্ধা করে না, সমবয়সী ইয়ার বলেই

মনে করে। এই মুহূর্তে বিনোদের মত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবার আকাঙ্ক্ষাটা মুরলীর মনে তীব্র হয়ে উঠল।

আর এই মেয়েটি, এই রঙ্গী? সেই বা তাকে কী চোখে দেখবে এরপর? মুহূর্তের জন্য জোর ক'রে তাকে মুরলী বুকে চেপে ধরেছিল বটে কিন্তু সব সময়েই তো আর তাকে এমন ক'রে কাছে টানা যাবে না। তার আয়ত্বের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে যদি সে অনুকম্পা এবং অবজ্ঞার হাসি হাসেই তাহোলে কী ক'রতে পারবে মুরলী? মুহূর্তের দৈহিক সান্নিধ্য লাভ করতে গিয়ে এই মেয়েটির মনে চিরকাল তাকে ঘৃণ্য হয়ে থাকতে হবে।

জীবনে আরো অনেকবার এই ধরণের অনুশোচনায় মুরলী ছটফট ক'রেছে। কিন্তু অনুশোচনায় যথার্থ কোন লাভ হয় না, কোন শিক্ষা হয় না। অনুশোচনাও এক রকমের বিলাস ছাড়া কিছু নয়, নিজেকে নিপীড়ন করবার অদ্ভুত আনন্দ, নিজের দাদ চুলকানোর মত, যন্ত্রণা আর আরাম যাতে মেশামেশি ক'রে থাকে। বিশেষত এই ধরণের অনুশোচনা মুরলীকে খানিকক্ষণের জন্য মনমরা করে রাখবার পরেই তাকে আরো হিংস্র উন্মত্ত ক'রে তোলে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা যখন সে পাবেই না তখন এই মাংসল আরাম যত বেশী সে পারে, আদায় করবে। একটা মেয়ে দূরে থেকে বহুদিন পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কী ভাব মনে পোষণ করবে, সে ভাবনা ভেবে কী লাভ মুরলীর? ঘৃণাই হোক আর ভালোবাসাই হোক, স্থান কালের খানিকটা ব্যবধান ঘটলে কোন ভাবই যে আর শেষে থাকে না এ অভিজ্ঞতা বহুবারই হয়েছে মুরলীর। তবু কেউ অশ্রদ্ধা করবে, ঘৃণা করবে এ ধরণের আশঙ্কা প্রথম প্রথম যেন সহ্য করা যায় না। একেক সময় মুরলীর মনে হয় খুব বড় রকমের একটা আত্মোৎসর্গ কি কোন মহৎ কাজ ক'রে তার মনের প্রতিকূল ভাবকে সে জয় করবে। সেই সব মুহূর্তে কোন একটি মেয়ের মনে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার চিরস্থায়ী আসন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষাই যেন মুরলীর একমাত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে আর সেকথা মনে থাকে না। বরং আত্মোৎসর্গ ক'রে যার কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবে মনে করেছিল, তাকে দেখামাত্র যে কোন প্রকারে তার দৈহিক ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য লাভের জন্য পূর্ববৎ সে তীব্র উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। নিজের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুল হয়ে যায়। না, অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই, অনুশোচনারও কোন দাম নেই মুরলীর কাছে। অন্যান্য জিনিসের মত অনুশোচনাও একটা মানসিক অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়।

শ্বশুরের পরিচর্যা সেরে অনেকক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল মনোরমা। এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা, আলাপ পরামর্শের আওয়াজ মাঝে মাঝে মুরলীর কানে আসছিল। নিজেকে এভাবে অন্যের আলোচ্য বিষয় হিসাবে দেখতে একেক সময় মন্দ লাগে না। মন্দ লাগে না নিজেকে অন্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে। শ্বশুর আর পুত্রবধূতে মিলে তার চরিত্র সংশোধনের ভার নিয়েছে ভেবে মুরলীর হাসি পায়। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই যদি মুরলী হঠাৎ একদিন সচ্চরিত্র হয়ে ওঠে, বাপের মত বৈষয়িক হয়ে বিষয় কর্মের দিকে গভীর মন দেয়, তাহলেই নবদ্বীপ কি অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করে? তাহ'লে এত রাত পর্যন্ত আর কোন বিষয় নিয়ে নবদ্বীপ এমন করে মনোরমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে? মনে মনে কৌতুক বোধ করে মুরলী। শুধু কৌতুক, ঈর্ষা নয়, অহঙ্কার নয়। কারণ, মুরলী জানে সব বিষয়েই ভারী হিসাবী নবদ্বীপ। বেহিসাবী কিছু করে বসবার মত তার বয়সও নেই, সাধ্যও নেই। কার কাছ থেকে কতটুকু পাওয়া যাবে, তা নবদ্বীপ জানে, সবটুকু হারাবার ভয়ে তার বেশী সে চাইতে পারে না। লাভের লোভকে হারাবার ভয় দিয়ে সে ঢেকে রাখতে পারে। এইখানেই মুরলীর সঙ্গে পার্থক্য। মুরলীর মনে হয়, না হ'লে এ ছাড়া তার সঙ্গে তার বাবার আর কোন প্রভেদ নেই।

ঘরে ঢুকে মনোরমা নিজের বিছানা একটু ঝাড়ল, খাটের এক পাশে একেবারে বেড়া ঘেঁষে কোলবালিশ জড়িয়ে ধ'রে ললিতা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওদিকের খাটে মুরলী এই মাত্র পাশ ফিরে যে ঘুমের ভাণ করল, তা বেশ বুঝতে পারল মনোরমা। আসলে মুরলী যে একটুও ঘুমায়নি, তা সে জানে। মুরলী যাতে ঘুমাতে না পারে এই জন্যই তো সে খাওয়া দাওয়ার পর এতক্ষণ এত কষ্ট করে ওঘরে গিয়ে জেগে বসেছিল। কিন্তু মুরলী যে জেগেই ছিল হাতে হাতে তা প্রমাণ করতে না দিতে পারলে মনোরমার রাত জাগার কষ্ট যেন বৃথা হয়ে যায়।

মশা গুন গুন করছে ঘর ভরে। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে দিতে দিতে মনোরমা নিজের মনেই যেন বলল, 'আচ্ছা নবাবের বেটি হয়েছে, নিজের মশারিটাও নিজে ফেলে নিতে পারবে না। ওর আর দোষ কী। আদর দিয়ে দিয়ে একজন যদি মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কি করতে পারি।'

কিন্তু অভিযোগ সত্ত্বেও মুরলীর কাছ থেকে কোন জবাব মিলল না। মনোরমা একটু চুপ করে রইল। মশারির মধ্যে হাঁটুগাড়া দিয়ে দিয়ে চার পাশ ঘুরে ঘুরে বেশ করে গুঁজে দিল। তারপর হঠাৎ এক সময় মশারির মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো মনোরমা। মুরলীর খাটের কাছে গিয়ে আবার সে পাখা দিয়ে মশা তাড়াতে আরম্ভ করল। দেখা গেল, মুরলীও মশারি টানিয়ে শোয়নি। কাপড়ের খুঁটটা জড়িয়ে মশার কামড় থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করছে, তবু মশারি টানাচ্ছে না।

মশারিটা ফেলে দিয়ে মনোরমা বলল, 'পড়ে পড়ে মশার কামড় খাবে তবু মশারিটা টাঙ্গিয়ে নেবে না। কেন, এক আধদিন নিজহাতে টাঙ্গিয়ে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

মুরলী বলল, 'একজন যদি আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কী করতে পারি।'

মুরলীর কথার ভঙ্গিতে হাসি চাপতে চাপতে মনোরমা বলল, 'মরণ আমার, বয়ে গেছে মানুষের অমন মানুষকে আদর জানাতে। কত মর্যাদা রাখতে পারে আদরের। এরচেয়ে গাছ-পাথরকে ভালোবাসলেও শান্তি পাওয়া যায়।'

(শেষাংশ ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

সুধীর বসু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এদেশের রাজনীতিক চিন্তাধারার যেরূপ ধারক ও বাহক, বিজ্ঞানক্ষেত্রে তেমনি 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস' এদেশের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিপোষক ও বিভিন্ন বিজ্ঞান-কর্মীদের মিলন-তীর্থ। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশ বিজ্ঞানে আজও তেমন উন্নতি লাভ করেনি বটে, কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানসাধকদের আশা আকাঙ্ক্ষা যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তা' থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত ভবিষ্যৎ ভারতের গৌরবোজ্জ্বল রূপ আমরা কল্পনা করতে পারি। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বয়স এবার মাত্র ৩০ বছর পূর্ণ হল। এ-ক' বছরেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারকল্পে বিজ্ঞান কংগ্রেস যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছে, বর্তমান ভারতের বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের প্রাক্কালে সংক্ষেপে তাই এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করব।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু বৈজ্ঞানিক-কর্মী নানাবিধ গবেষণা কার্যে বহুদিন যাবৎ নিরত আছেন। নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের এই গবেষণা পরিচালিত হত; এই সুবৃহৎ দেশের এক প্রান্তের বৈজ্ঞানিকদের সহিত অন্য প্রান্তের বিজ্ঞানীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। ফলে পরস্পরের চিন্তা ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদান করার সুযোগ অতি অল্প বৈজ্ঞানিকই লাভ করতেন। ১৯১০ সালে অধ্যাপক পি এস ম্যাকমোহন লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজের রসায়নাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। অধ্যাপক মিঃ জে এল সাইমনসেনও ঐ বৎসর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের পদে নিযুক্ত হন। তাঁরা উভয়েই ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগের অভাব ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনার অসুবিধার বিষয় উপলব্ধি করেন। বিলাতের বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর এডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স-এর আদর্শে এদেশের বিজ্ঞান-কর্মীদের সকলকে সমবেত করবার ব্যবস্থা করলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁদের ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাই এবিষয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মতামত জানবার জন্য তাঁরা দুজনে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তদনুযায়ী ১৯১২ সালে ১৭ জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হয় এবং প্রস্তাবিত বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার ভার তাঁদের উপর অর্পিত হয়। উক্ত সমিতির উদ্যোগে ১৯১২ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে ডাঃ এইচ এইচ হেডেন-এর সভাপতিত্বে এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে একটি সভার অধিবেশন হয়। তাতে এশিয়াটিক সোসাইটীর উপরেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করার ভার প্রদত্ত হয়। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় যাদুঘরের শতবার্ষিকী উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন যাতে সুসম্পন্ন হতে পারে, তজ্জন্য এশিয়াটিক সোসাইটী বিশেষ তৎপর হন এবং এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করে তার উপর সমস্ত কার্যভার ন্যস্ত করেন। ১৯১৩ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে এই কমিটি বাঙলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক, স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উহার সভাপতি এবং মিঃ ডি হুপারকে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১৫ই হইতে ১৭ই তারিখ পর্যন্ত স্যার আশুতোষ মুখার্জি'র সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে ১০৫ জন সদস্য যোগদান করেন। ভারতীয় যাদুঘরের শতবার্ষিকী উৎসবও ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ হয়নি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, রসায়ন ও জাতিতত্ত্ব—এই ছয়টি শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং সর্বশুদ্ধ ৩৫টি মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনের বিবরণ নির্বাচিত সভাপতির অভিভাষণসহ এশিয়াটিক সোসাইটীর 'প্রসিডিংস'এ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আদর্শে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস গঠিত হয়; সুতরাং বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন কোন একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ না হয়ে এক একবার পর্যায়ক্রমে যাতে উহার অধিবেশন এক এক জায়গায় হতে পারে, তার ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে দ্বিতীয় অধিবেশন পরবৎসর (১৯১৫) মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ জানা যায়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিদের নিকট হতে ৮৮৩৲ টাকা চাঁদা বাবদ পাওয়া যায় এবং প্রথম অধিবেশনের ব্যয় নির্বাহের পর ৩৭০৲ টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

পরে দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য উক্ত টাকা মাদ্রাজে প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে মাদ্রাজে সদস্যসংখ্যা দেড়শত হয়। পূর্বের ছয়টি শাখার স্থলে "কৃষি ও ফলিত বিজ্ঞান" নামে অপর একটি অতিরিক্ত শাখার অধিবেশনও এই সময় হয়েছিল। বিভিন্ন শাখায় সর্বশুদ্ধ ৬০টি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন এলাহাবাদে ১৯১৬ সালের জানুয়ারীতে হবে বলে স্থির হয়। পরে অবশ্য উহার স্থান পরিবর্তন করে লক্ষ্ণৌতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান নগরগুলোতেই এই পর্যন্ত এই বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আহূত হয়েছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্থ হতে সপ্তম অধিবেশন (১৯১৭ হতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত) যথাক্রমে বাঙ্গালোর, লাহোর, বোম্বাই এবং নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সাল হতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টম হইতে চতুর্দশ অধিবেশন আবার পর্যায়ক্রমে কলিকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, বেনারস, বোম্বাই এবং লাহোরে হয়। ১৯২৮ হতে ১৯৩৪ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আবার কলিকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, নাগপুর, বাঙ্গালোর, পাটনা ও বোম্বাই-এ অধিবেশন হয়েছে। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৭ পর্যন্ত আবার কলিকাতা, ইন্দোর ও হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৫ বৎসরকাল পূর্ণ হওয়ায় ঐ বৎসর জানুয়ারীতে কলিকাতায় মহাসমারোহে উহার রজত জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। কারণ, বৃটিশ এসোসিয়েশনের সহিত সংযুক্তভাবে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং তদুপলক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে একদল প্রতিনিধিও এই উৎসবে যোগদান করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও এই অধিবেশনে যোগদান ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি করেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ডকে এই জয়ন্তী অধিবেশনের সভাপতিপদে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই অকস্মাৎ তিনি পরলোকগমন করেন। পরে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেমস জীন্সের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লর্ড রাদারফোর্ড মৃত্যুর পূর্বে যে অভিভাষণ রচনা করে গিয়েছিলেন তাহাও এই অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জীন্সও পৃথক এক অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়; ১৯৩৮ সালে উহার জয়ন্তী উৎসবের সময় আমরা দেখতে পাই যে, পঁচিশ বছরে এই কংগ্রেস দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণের নিকট কম সমাদর লাভ করেনি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় উহার সভাসংখ্যা বিভিন্ন সরকারী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ও বৈজ্ঞানিক সার্ভে বিভাগের কর্মী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ উহার সভাসংখ্যা এক হাজারের উপরে দাঁড়িয়েছে। ১৯১৪ সালে মাত্র ছয়টি বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয় এবং বিভিন্ন শাখায় সর্বশুদ্ধ ৩৫টি মৌলিক প্রবন্ধ আসে। আজ কিন্তু সেখানে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার সংখ্যা ১৩ হইতে ১৪টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মৌলিক প্রবন্ধও বিভিন্ন শাখায় মোট এক হাজারের কম হয় না। প্রতি বছর বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ শাখা অধিবেশনের সভাপতিত্ব করে থাকেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখায় আলোচনা বৈঠক বসে; সকল শাখার সমবেত আলোচনা বৈঠকেও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা কম হয় না।

এইভাবে বছরের পর বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে এসেছে। ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত উহার অধিবেশন যথাক্রমে লাহোর, মাদ্রাজ, বেনারস ও বরোদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম অবস্থায় অন্য সময় উহার তেমন কাজ পরিলক্ষিত হত না; শুধু বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করাই একমাত্র কাজ বলে পরিগণিত হত। গোড়াতে এসিয়াটিক সোসাইটীর উপরে এ কাজের ভার ছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিচালনার নিমিত্ত নানারূপ নিয়মকানুন রচিত হয় সবং অধিবেশনের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও যাতে কাজের ধারা বজায় থাকে, তজ্জন্য পৃথক অফিস খোলা হয়েছে এবং উহার কার্যবিবরণাদি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান-কর্মীদের সহিত যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ কার্য পরিচালনার নিমিত্ত যেমন

বর্তমান সভাপতি ডি এন ওয়াদিয়া

কার্যকরী সমিতি নিযুক্ত আছে, তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখার কাজগুলিও যাতে সুসম্পন্ন হয়, তা' দেখবার জন্য শাখা সমিতি গঠন করে তাদের উপর বিভিন্ন শাখার ভার দেওয়া হয়েছে। এরূপ কার্যবিভাগ ও শৃঙ্খলার ফলে বিজ্ঞান কংগ্রেস আজ এদেশের সকল রকম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এসিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যেই বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রধানত গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে এই সহযোগিতার ধারা তাই আজ পর্যন্তও বজায় আছে। বলা বাহুল্য এই সাফল্যের মূলে বহু বৈজ্ঞানিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে। এ সম্পর্কে এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাঃ হুপার প্রথম অধিবেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পরে ১৯১৫ সাল হ'তে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কংগ্রেস সংগঠনের উদ্যোক্তা অধ্যাপক সাইমনসেন ও অধ্যাপক ম্যাকমোহন উহার সাধারণ সম্পাদকরূপে কাজ করেন। স্যার ভেঙ্কটারামণ, অধ্যাপক আঘরকার, ডাঃ নরিস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও কিছুকাল ইহার সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় এসিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জোহান ভ্যান ম্যাননও এই প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। মিঃ ডব্লিউ ডি ওয়েষ্ট ও বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক জে এন মুখার্জি বিজ্ঞান কংগ্রেসের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্ত কম সচেষ্ট নহেন।

এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রথমত কয়েকজন সহৃদয়

বিদেশী বৈজ্ঞানিকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলেও প্রধানত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যমের ফলেই বিজ্ঞান-জগতে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। উদ্যোক্তাগণ সত্যিই উপলব্ধি করেছিলেন যে, "যে পরিমাণে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণকে এ সম্মেলনে যোগদানের সুবিধা দেওয়া হবে, এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ততই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।" বলা বাহুল্য, আজ ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বহু প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি পদ অলংকৃত করেছেন। তন্মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, স্যার জেমস্ জীন্স, স্যার এলফ্রেড গীবস্ বোর্ন, ডাঃ চন্দ্রশেখর রামন্, অধ্যাপক বীরবল সাহনী, স্যার বিশ্বেশ্বরায়া, মিঃ ডি এন ওয়াদিয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * * *

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন এদেশের বিজ্ঞানসেবীদের নিকট জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের মতই আকর্ষণীয়। উহা শুধু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করেনি, দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের পথও সুগম করে তুলেছে। অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র ও অবনত ভারতকে উন্নত ও স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করতে হবে; সুতরাং বিজ্ঞানীদের এই সম্মেলন দেশের পুনর্গঠনে কম সাহায্য করবে না।

বিজ্ঞান ও রাজনীতির সমন্বয়েই এই দেশ সত্যিকার সংগঠনের পথ পাবে মনে করে বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত ঊনত্রিংশ অধিবেশনে ডাঃ ওয়াদিয়ার সভাপতিত্বে বরোদায় পণ্ডিত জওহরলালের নাম এইবারের (জানুয়ারী ১৯৪৩) অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল আজ কারারুদ্ধ। তাঁর লিখিত অভিভাষণ অধিবেশনে পাঠ করার অনুমতি পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট দিতে রাজী নহেন। নানারূপ গোলযোগের দরুণ গতবারের অধিবেশনে নির্ধারিত স্থান লক্ষ্ণৌতেও এবার অধিবেশন সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বর্তমান বৎসরের সভাপতি ডাঃ ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে কলিকাতা নগরীতেই ১৯৪৩ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছেন। যদি অন্য কোনও বাধাবিঘ্ন না ঘটে, তবে এখানেই এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪১ সালে বেনারসে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখাধিবেশনের সংখ্যা নূতনভাবে নির্ধারণ করে ১৪টির স্থলে ১২টি স্থির করা হয়। তদনুযায়ী এবারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নিম্নলিখিত বারটি শাখার অধিবেশন বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে আশা করা যায়।

সাধারণ অধিবেশন—সভাপতি ডাঃ ডি এন ওয়াদিয়া।

১। গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান—নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস সি ধর
২। পদার্থবিজ্ঞান—বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনস্টিটিউটের ডাঃ এইচ জে ভাভা
৩। রসায়ন—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস্ এস্ যোশী
৪। ভূতত্ত্ব ও ভূগোলবিজ্ঞান—দেরাডুন সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বিভাগের লেঃ কর্নেল ই এ গ্লিনি
৫। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান—শিবপুর রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাঃ কে বিশ্বাস
৬। প্রাণী ও কীট বিজ্ঞান—জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডাঃ সি এন চোপরা
৭। নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—ডাঃ এন চক্রবর্তী, আর্কিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী
৮। চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান—মুক্তেশ্বর ইম্পিরিয়াল ভেটেরেনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাঃ এফ সি মিলেট
৯। কৃষিবিজ্ঞান—রাও বাহাদুর রামচন্দ্র রাও, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ, নয়াদিল্লী
১০। প্রাণতত্ত্ব (Physiology)—পাটনা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি এন আত্রেয়
১১। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বি নারায়ণ
১২। পূর্তবিজ্ঞান ও ধাতুবিজ্ঞান—বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক কে অ্যাস্টন
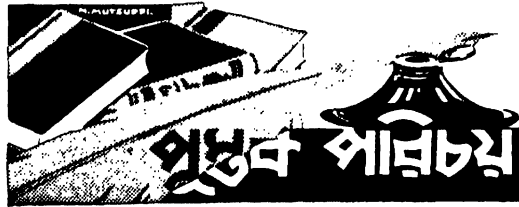
সমাজ ও সাহিত্য—গোপাল ভৌমিক [পূর্বাশা সিরিজের তৃতীয় পুস্তিকা—মূল্য ৵০ আনা। প্রকাশক—পূর্বাশা, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা]।

সমাজের সঙ্গে যে সাহিত্যের নিবিড় যোগাযোগ আছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাঙলা সাহিত্যের অনেক সমালোচকই অস্বীকার করে থাকেন। এতে যে তাঁরা শুধু বর্তমানকে ঘোলাটে করে তুলছেন তা নয়, ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথও তাঁদের এই বিরোধিতায় অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। গোপালবাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সমাজে শ্রেণী-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্যও তার রং বদলায় এ তথ্য বাঙালীর কাছে নূতন মনে হলেও তার বয়েস নেহাত নূতন নয়। তবু বাংলা সাহিত্যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাঁরা প্রবেশ করছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁরা ধন্যবাদভাজন। গোপালবাবুর সাহসিকতাকে ধন্যবাদ, কেননা তিনি মুখ ফুটে এমন অনেক কথা বলতে পেরেছেন যা আমরা মনে মনে উপলব্ধি করেও মুখ ফুটে বলতে পারি নে। তাঁর বিচারশীল মন যে যুক্তির আঘাতে অনেকের অনেক ভুলের ইমারৎ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে তার জন্যেও তিনি প্রশংসার্হ। সাহিত্যের প্রগতি সত্যি সত্যি কি করে সম্ভব একথা যাঁরা জানতে চান, এ পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে তার আদ্যোপান্ত তাঁদের পড়া উচিত।

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো গত ২৭শে ডিসেম্বর একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "প্রকৃত যুদ্ধ এইবার আরম্ভ হইল। যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন, বৃটিশ এবং মার্কিন বিমানবহর বলিতে গেলে একরকম প্রতিদিনই ইউনান এবং পূর্ব-ভারত অঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশের উপর বিমানযোগে হানা দিতেছে। সলোমন দ্বীপে শত্রুপক্ষের ভাল বিমান-ঘাঁটি রহিয়াছে, সুতরাং জাপানীদের পক্ষে সেখানে রসদপত্র এবং সমরোপকরণ নামানো কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনদেশে জাপানী বাহিনীকে চুংকিং বাহিনীর প্রায় ৩০ লক্ষ সেনার সঙ্গে ছোটবড় নানারকম সংগ্রামে অবিরত ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে। চীনাদের সঙ্গে প্রায় ৬ লক্ষ কমিউনিস্ট সেনাও রহিয়াছে।"

আগাইয়া ভিতরে ঢুকিবার ব্যবস্থা করা আধুনিক সমরনীতির একটা কৌশল। জাপানীরা এই শেষোক্ত নীতি অবলম্বন করিতেছে বলিয়া এখনও আমাদের মনে হয় না। যাঁহারা সামরিক বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাই এ সম্বন্ধে পাকা কথা বলিতে পারেন। কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বিমানবহরের এই আক্রমণ ব্যাপারে অনেকের মনে আর একটি প্রশ্নও উঠিয়াছে, তাহা এই যে, জাপানীরা কোথা হইতে এই সব বিমানবহর সঞ্চালন করিতেছে। তাহারা যেমন ঘন ঘন আক্রমণ চালাইতেছে এবং চতুর্থ আক্রমণের বেলা একসঙ্গে দুই ঝাঁকে আসিয়া তাহাদের উড়োজাহাজ যেভাবে কলিকাতা অঞ্চলের উপর হানা দেয়, তাহা হইতে কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতেছেন যে, বঙ্গোপসাগরে তাহারা হয়ত উড়োজাহাজবাহী কোন রণতরী লইয়া আসিয়াছে এবং সেই

একটি বিল্ডিংয়ের বাহিরের ঘরের সম্মুখে ধ্বংসস্তূপ

বৃটিশ বাহিনী আরাকান অঞ্চলের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, পাঠকগণ সংবাদপত্রে এই সংবাদ পাঠ করিয়া থাকিবেন। কলিকাতা অঞ্চলে ২৭শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রি পর্যন্ত পর পর এই যে পাঁচবার জাপানীদের বিমান আক্রমণ হইয়া গেল, ইহা বৃটিশ বাহিনীর সেই অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ করিবার উদ্দেশেই কি না বলা যায় না। জাপানীরা হয়ত মনে করিতেছে যে, তাহারা যদি বৃটিশ বাহিনীর পিছনের ঘাঁটিগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সাহসের সঙ্গে আগাইতে পারিবে না। আমাদের মতে, জাপানীদের কলিকাতা অঞ্চলে বিমান আক্রমণের ইহাই মুখ্য কারণ; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি মত আছে। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা অঞ্চলের উপর জাপানীদের এই বিমান আক্রমণ তাহাদের ভারত-অভিযানের উদ্যোগপর্বও হইতে পারে। শত্রুর কেন্দ্রঘাঁটিকে দুর্বল করিয়া সীমান্তে তাহার সমরব্যবস্থাকে শিথিল করিয়া ক্রমে ক্রমে

রণতরী হইতে উড়োজাহাজ ছাড়িয়া দিতেছে। গত বৎসর জাপানীরা যখন সিংহল আক্রমণ করে, তখন তাহাদের উড়োজাহাজবাহী একখানা বড় রণতরী বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু এবার তাহাদের সেরূপ কোন রণতরী বঙ্গোপসাগরে আসিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, আকিয়াব বা ব্রহ্মের সীমান্তবর্তী কোন বিমানের ঘাঁটি হইতেই তাহারা বিমানবহর পাঠাইতেছে। এই কয়েকদিনের বিমান আক্রমণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শত্রুর বিমান কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া পড়িবার যথেষ্ট সময় পূর্ব হইতেই সংকেতধ্বনি করা হইতেছে। শহরের রক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালকদের পক্ষে ইহা খুবই প্রশংসার বিষয়; কিন্তু গতিশীল রণতরীর উপর হইতে জাপানীরা যদি উড়োজাহাজ ছাড়িত, তবে এত আগে সবক্ষেত্রে সংকেতধ্বনি করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িত।

কলিকাতা অঞ্চলে পর পর কয়েকবার জাপানীরা হানা দিয়াছে। এই বিমান আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য হইয়াছে। জাপানীরা সামরিক কোন লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলিতে পারে নাই। যে কিছু ক্ষতি অসামরিক নগরবাসীর উপর দিয়াই গিয়াছে। তাহারা যে ধরণের বোমা ফেলিয়াছে সেগুলিকে এণ্টি-পার্সনেল বোমা বলে। আশ্রয়ের তলে অবস্থান করিলে এই সব বোমাতে প্রাণহানির ভয় নাই। কলিকাতা অঞ্চলে যে অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, তাহারা আক্রমণকালে পাকা বাড়ির মধ্যে ছিল না; এজন্য অসামরিক অঞ্চলে পড়িয়াও বোমাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটে নাই। একটি ক্ষেত্রে একজন মহিলা এবং শিশুর প্রাণহানি ঘটিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, জাপানীরা ভারতীয়দের উপর বোমা ফেলে না, এই কথা যে সত্য নহে, এই ব্যাপারেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। প্রকৃতপক্ষে জাপানীরা যে ভারতবাসীদের প্রাণের জন্য দরদ করিবে, এমন ধারণা আমরা কোনদিনই করি নাই। শত্রুপক্ষকে কাবু করাই হইল আধুনিক রণনীতির প্রধান লক্ষ্য; এক্ষেত্রে মানবতার কিছুমাত্র বিচার করা হয় না। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য দরকার হইলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা শিথিল করিবার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে নির্দোষ এবং নিরীহ নারী ও শিশুদের উপর মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ধনুর্বেদ শাস্ত্রে এইভাবে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগকে অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—যাহারা এইরূপ নিষ্ঠুর রণনীতি প্রয়োগ করে, তাহারা বর্বর এবং কূটযোধী। কিন্তু আধুনিক সভ্য সামরিকদের এমন লজ্জার কোন বালাই নাই। তাহারা দরকার হইলেই নির্দোষকে হত্যা করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে। কখনও স্বেচ্ছাপূর্বক বিমান হইতে বোমা ফেলিয়া এই হত্যাযজ্ঞ উদ্‌যাপন করা হয়, কখনও বা শত্রুপক্ষের লড়াইকারী বিমানের তাড়ায় পড়িয়া আক্রমণকারী বোমারু বিমানকে নিজের বোঝাই খালি করিয়া হাল্কা হইবার জন্য যেখানে সেখানে বোমা ফেলিয়া প্রাণ লইয়া ছুটিতে হয়। আক্রমণকারীদের সঙ্গে যদি ফাইটার বা লড়াইকারী বিমান বেশী না থাকে, তবে এমন ব্যাপার ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তারপর এইভাবে বোমাগুলি মাটিতে ফেলিয়া পলাইবার বেলায় বিমান হইতে যেরূপ দ্রুততার মধ্যে বোমাগুলি ফেলা হয়, তাহাতে কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানেই বোমাগুলি অনেক দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং শত্রুপক্ষের দয়ামায়া বা মানবতার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করা এক্ষেত্রে কাজের কথা নয়। তাহাদের নিষ্ঠুরতাকে সর্বাংশে স্বীকার করিয়াই রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে হয়। কলিকাতা অঞ্চলের রক্ষাব্যবস্থা খুবই সুদৃঢ় বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এই কয়েকদিনের বিমান আক্রমণ সম্বন্ধীয় সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, শহরঅঞ্চলরক্ষী বিমানবহর শত্রুবিমানগুলিকে তাড়া করিয়াছে এবং তাহাদিগকে পলাইতে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাদের কতকগুলি বিমান জখম হইলেও এ পর্যন্ত মাত্র একটি বিমান ভূপাতিত হইয়াছে; অথচ চট্টগ্রাম, ফেণী এবং ডিগবয়ে বৃটিশপক্ষের প্রতিরোধের বেশী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; তাহারা কয়েকখানি শত্রুবিমানকে ভূপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, গত বৎসর সিংহলে হানা দিতে গিয়া জাপানী বিমানবীরেরা প্রথম আক্রমণেই যেমন শক্ত ঘা খাইয়াছিল, কলিকাতায় আক্রমণ করিতে আসিয়াও যদি তাহারা সেইরূপ শক্ত ঘা খাইত, তবে রক্ষাব্যবস্থা অধিক ফলোপধায়ক হইত; এ সম্বন্ধে সামরিকদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

সাম্প্রতিক এই সব বিমান আক্রমণে কলিকাতা শহরবাসীরা যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে; এজন্য চারিদিক হইতে সুখ্যাতির কথা শুনিতেছি; ইহা খুবই সুখের বিষয়; কিন্তু মনোবল বস্তুটির বিচার এদেশে সবক্ষেত্রে ঠিক রকম হয় না। আমাদের এই মনোবল যেন গা-ছাড়া ভাব বা যা থাকে অদৃষ্টে, এমন মতিগতিতে না দাঁড়ায়। আত্মরক্ষার জন্য শহরবাসীদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র সকলের প্রথম কর্তব্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলে স্থান গ্রহণ করা। বাড়ির নীচের তলার কোন কক্ষ, পথের এ আর পি শেল্টার এবং অভাবে ছাদযুক্ত যে কোন গৃহাভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করা উচিত। বসিবার রীতি হইল—কোন দেওয়ালের সঙ্গে গা ঠেকাইয়া না রাখা বা কাচের শার্সির কাছে না থাকা; কাচের শার্সি এইরূপ ঘরে একেবারে না থাকাই ভাল। দরজার হুড়কোর সোজাসুজিও থাকা উচিত নয়। আশ্রয় প্রকোষ্ঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য আওডিন, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি উপকরণ; জল, দুধ প্রভৃতি পানীয় পূর্বে হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। একথা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আক্রমণের সময় শব্দই অনেক ক্ষেত্রে বেশী আতঙ্কের কারণ ঘটায়। বোমারু বিমান হইতে বিক্ষিপ্ত বোমা এত দ্রুতবেগে পড়িতে থাকে যে, তাহার ফলে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া একটি তীব্র আর্তনাদের মত শব্দ উঠে। অতি-বিস্ফোরক বোমা মাটিতে পড়ামাত্র চতুর্দিকে ইহার টুক্‌রা ও চূর্ণগুলি ছিটকাইয়া পড়ে। এই নিক্ষিপ্ত টুক্‌রাগুলির আঘাতে আহত লোকের মৃত্যু ঘটা খুবই স্বাভাবিক। অতি-বিস্ফোরক বোমা হইতে সবচেয়ে ভয়ের কারণ হইল ইহার ঝাপটা। বোমার টুক্‌রার চেয়ে এই ঝাপটার ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে; সুতরাং এই ঝাপটা না লাগে, আশ্রয়স্থল রাস্তা হইতে এইরূপ সুরক্ষিত দেওয়ালে ঘেরা বা ভিতরের ঘর হইলে ভাল হয়। শুইয়া পড়িলে ঝাপটার হাত হইতে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়া যায়।

এই ধরণের আক্রমণের ক্ষেত্রে মনোবল খুব একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। অনেক ক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণের ফলে যতটা বিপর্যয় না ঘটে, মনোবলের অভাবে তদপেক্ষা অধিক বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই মনোবল জিনিসটা একটা সিদ্ধান্ত নয়, যুক্তিবুদ্ধি আঁটিয়া ঠিক করিলেই মনোবল পাওয়া যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তেমন চেষ্টায় বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে। মনে ঐ চিন্তা অনবরত করিলে, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণভাবে মানুষের মনকে জড় বস্তুই বলিতে হয়। দার্শনিক বা সাধকদের শুদ্ধ মন বাহিরের অপেক্ষা না রাখিতে পারে কিংবা মুক্তাশ্রয় হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ লোকের মনের বল তাহার জড় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় মনোবল বজায় রাখিবার পক্ষে প্রধান উপায় হইল জীবনের গতিকে যথাসম্ভব সহজ এবং স্বাভাবিক রাখা। বুদ্ধিমান লোক বিচার-বিবেচনার সঙ্গে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাদের পক্ষেও সুদীর্ঘকাল এই বলকে টানিয়া বুনিয়া বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠে। অশিক্ষিত যাহারা, যাহাদের অন্তরে কোন বড় আদর্শের জোর নাই, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটু ওলটপালট দেখিলেই তাহাদের মন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মনের ঘাঁটি যদি একবার নড়িয়া উঠে, তবে তাহাকে শক্ত করা খুবই কঠিন, ক্রমেই মন ফাঁকা হইয়া পড়িতে থাকে; এবং মানুষ যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখে। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় করাই কর্তৃপক্ষের একমাত্র কর্তব্য নয়; লোকের মনোবল যাহাতে শক্ত থাকে, সেজন্য জীবনধারণ ব্যাপারের যাহাতে বিপর্যয় না ঘটে, তৎপ্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিগত কয়েক মাসে কলিকাতা শহরে অন্ন-সমস্যা এবং বস্ত্র-সমস্যার জন্য সাধারণ লোকের জীবনধারণের রীতিতে অনেক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চাউলের দুর্মূল্যতা, ময়দার অনটন, তরিতরকারীর অভাব, ইহাই তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার উপর দেখা দিল বোমা বর্ষণের আতঙ্ক। এই আতঙ্ক গত বৎসরের হুজুগের চেয়ে এখনও কম আছে, ইহা ঠিক; কিন্তু প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়া কোন লাভ নাই। কর্তৃপক্ষের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, শহরবাসীর একটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিয়ৎপরিমাণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা নানা-

শ্রেণীর শ্রমিক, ছোটখাট দোকানদার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অফিসের দরোয়ান পিওন মজুর গোয়ালা প্রভৃতির কথা বলিতেছি। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সম্প্রতি একটি আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, ধাঙগড়ের অভাব ঘটাতে বস্তি ও অলিগলিতে আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং শহরবাসীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মেয়র মহাশয় শহরের যুবকগণকে ছোট ছোট দল গঠন করিয়া বস্তি ও গলি হইতে আবর্জনা অপসারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং শহরের একশ্রেণীর মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতাবাসীদের মনোবলের প্রশংসা করিয়া ভারত সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জে জে শ্রীবাস্তব সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে গত ২৫শে ডিসেম্বরের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে দলে দলে লোক রেলপথে এবং পদব্রজে চলিয়া যাইতেছে, এমন কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। ২৫শে ডিসেম্বর রাস্তায় বড়দিনের উৎসব আমোদ উপভোগের জন্যই ভিড় জমিয়াছিল। স্যার শ্রীবাস্তব বড়দিনের এই আনন্দ-উৎসব কোথায় দেখিলেন, আমরা জানি না, আমরা শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, এই সংবাদ ঠিক নয়; তিনি ভুল খবর পাইয়াছেন; এই ধরণের ভুল খবরের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়; ইহাতে প্রকৃত সমস্যাই উপেক্ষিত হইতে পারে। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, কলিকাতার খাদ্য সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা অটুট রাখিবার দিকে কর্তৃপক্ষের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মেথর ধাঙগড় ঝাড়ুদার প্রভৃতি যাহাতে নিজেদের পোষ্যবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব নিয়ত বোধ না করে, সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন, পাড়ার ছোট ছোট দোকানগুলি যাহাতে বন্ধ না হয় এবং খাদ্যদ্রব্য সব জায়গায় মিলে এমন বন্দোবস্তও রাখিতে হইবে; কেবল উপরে উপরে ঘুরিয়া সব ভাল, এমন বিবৃতি দিলেই চলিবে না; ভুক্তভোগী গরীবদের দুঃখ-কষ্ট বুঝিবার মত দরদ দিয়া কাজ হওয়া প্রয়োজন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যেন সেদিকে দৃষ্টি রাখেন। সকল দিকে একটা আস্থার ভাব অটুট রাখিতে হইবে।

ইহার পর আর একটি সমস্যা রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে কিয়ৎ অংশে লোকাপসরণ গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করেন। বিশেষ কাজের জন্য কিংবা জীবিকা নির্বাহের জন্য যাহাদের থাকার প্রয়োজন নাই, তেমন লোক যত সত্বর শহর ত্যাগ করে, ততই মঙ্গল। ইহাতে পৌর রক্ষার কর্তব্য অনেক অংশে লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতেছি, এ সম্বন্ধে সরকার গত বৎসর ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এখনও সুনির্দিষ্টভাবে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কোন পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন না। শহরের যে সব লোক বাহিরে যাইতে চাহে এবং যাহাদের যাওয়াই আবশ্যক, তাহাদের শহর ত্যাগের যথাসম্ভব সুব্যবস্থার ভার গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্তব্য। অন্যথায় বাহিরে গমনেচ্ছু ও গমনোদ্যত ব্যক্তিগণ শহর ত্যাগ করিবার সুযোগ না পাইলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা সংক্রামক হইয়া শহরবাসীদের মনোবলকে শিথিল করিয়া তুলিবে। কারণ চিন্তা শুধু মনেই থাকে না, তাহা কথা এবং কাজেও ব্যক্ত হয়। এমন অবস্থায় লোকে যদি নিশ্চিন্ত থাকে যে, ইচ্ছামত তাহারা শহর হইতে যাইতে সুবিধা পাইবে, তাহাতে আস্থার ভাব অনেক বাড়িবে। গভর্ণমেণ্ট এখন চাহেন যে, কতক লোক শহর ত্যাগ করাই ভাল এবং শহর রক্ষার দিক হইতে তাহা যখন বাঞ্ছনীয়, এরূপ ক্ষেত্রে তদুপযুক্ত যান বাহনের ব্যবস্থা করা সামরিক প্রয়োজনের মতই গুরুতর। সামরিক প্রয়োজনের গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু কয়েক দিনের জন্য অতিরিক্ত যানের ববস্থা করিলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহর পর কলিকাতা শহরে বিমান হানা সম্বন্ধে সরকারী প্রচারবিভাগ যেভাবে সংবাদ প্রচার করিতেছেন, তৎসম্বন্ধেও আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আমরা দেখিলাম

এক বহির্বাটীর নিকটবর্তী উন্মুক্ত স্থানে বোমার আঘাতে গহবর হইয়াছে

সম্মিলিত বাহিনীর পূর্বাঞ্চল বিভাগের দপ্তর হইতে এই সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা বলিয়াছেন,—"সাম্প্রতিক আক্রমণগুলি সামান্য ধরণের হইলেও কলিকাতা অঞ্চলে জাপানীদের বিমান হানায় জনসাধারণের মধ্যে সম্ভবত কিছু উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত আধুনিক রক্ষা-ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে জানার ইচ্ছার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি বোধ করিলেও বলা চলে যে, কোন অঞ্চলের রক্ষাব্যবস্থা সাধারণভাবে ব্যতীত বিশদভাবে আলোচনায় শত্রুপক্ষকে মূল্যবান্ তথ্য জানানো হয়। সংক্ষেপে বলা চলে যে, নৈশ বিমানহানার বিরুদ্ধে সযত্নে প্রস্তুত রক্ষা-ব্যবস্থার ফলেও প্রথম দুই একটি প্রতিরোধে শ্রেষ্ঠ দক্ষতা আশা করা যায় না। যদিও কলিকাতার সাম্প্রতিক বিমান আক্রমণ কোনমতেই নগণ্য ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না, তথাপি আমাদের প্রতিরোধ ক্রমেই সফলতর হইতেছে। কলিকাতার বিমানহানা সম্পর্কিত সরকারী ইস্তাহারে জানা যায় যে সর্বশেষ আক্রমণের সময় শত্রুপক্ষীয় একখানি বোমাবর্ষী বিমান ধ্বংস ও অপর কয়েকখানি ক্ষতগ্রস্ত হইয়াছে।" সামরিক বিভাগের এই বিজ্ঞপ্তি আশাপ্রদই বলিতে হইবে; কিন্তু কলিকাতার এই বিমান-হানা সংবাদ সম্পর্কে এতৎসম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহা সন্তোষজনক মনে করি না। সহযোগী 'স্টেটসম্যান' এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন। সহযোগী বলিয়াছেন যে শহরের সংবাদপত্রগুলি জানিয়া শুনিয়াও ঠিক সংবাদ সরকারী প্রচার বিভাগের অনুমতি ব্যতীত দিতে পারেন না। সরকারী প্রচার বিভাগ ৮ শত মাইল দূরস্থিত দিল্লী শহর হইতে বহু বিলম্বে অসম্পূর্ণ সংবাদ দেন, এরূপ অবস্থায় যে নানারূপ অমূলক জনরব রটিয়া লোকের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা সহযোগী 'স্টেটসম্যান'-এর এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। সরকারী সংবাদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এই অব্যবস্থার জন্য একটু বেশী রাত্রিতে কলিকাতা অঞ্চলে যে বিমানহানা ঘটিয়াছে সকালের কাগজে তাহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহাতে লোকের মনে নানাবকম উদ্বেগই বাড়ে। সামরিক ব্যাপারে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা বুঝিয়া উঠা সংবাদিকদের পক্ষে সহজ নহে, আমরা ইহা বুঝি; আমাদের মতে, এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে এতৎসম্পর্কিত সংবাদ দেখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং ব্যাপক করা কর্তব্য।

হরিবংশ

(২৭০ পৃষ্ঠার পর)

মুরলী কোন জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে মনোরমা নিজেই আবার বলল, 'রাগ করলে?'

মুরলী বলল, 'না, রাগ তো তোমারই করবার কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো যাবার কথা নয়। আজ হোল কি?'

হ্যারিকেনটা খাটের নীচে মিট মিট করে জ্বলছিল। মনোরমা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে সেটা একেবারে নিভিয়ে দিল। স্বামীর গা ঘেঁষে মনোরমা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'রাগ করেছ, সত্যি?'

মুরলীর মনে হোল রাগ তো মনোরমারই করবার কথা এবং এত সহজে তা যাবার কথাও নয়, কিন্তু আজ হোল কি? নবদ্বীপের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এমন কী আনন্দ লাভ করল মনোরমা যাতে তার হিংস্র বিদ্বেষের লেশমাত্রও আর টের পাওয়া যাচ্ছে না, বরং চাপা খুশিতে মন তার টগবগ করা আরম্ভ করেছে? **(ক্রমশঃ)**

"সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ"

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর প্রতিবাদ-উত্তরে শ্রীযুক্ত অমল হোমের প্রত্যুত্তর]

মাননীয় "দেশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আমার বহুদিনের মিত্র, বঙ্গবাসী কলেজের 'আধা-অধ্যাপক' "অমৃতবাজার পত্রিকার" 'অ-পদস্থ Editor' * শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু যে মহদাশয় ব্যক্তি, তাহা আমি বহুপূর্বেই অবগত ছিলাম; কিন্তু তিনি যে একজন 'অতিবুদ্ধি মনুষ্য', এই তথ্য আপনার ৩রা পৌষের সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার পত্র পাঠে জানিয়া পরম পুলকিত হইলাম। আমি অমল হোম যে একজন "অপরিমেয় নীচাশয়" ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যমূলক বাদানুবাদ প্রসঙ্গে এরূপ একটি একান্ত প্রয়োজনীয় ও নিতান্ত সত্য সংবাদ তিনি উদ্ঘাটিত না করিলে, তাঁহার মহত্ত্ব নিশ্চয়ই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। আমার চরিত্রের আরও যে দুই চারিটি ত্রুটি আছে, তাহার উল্লেখ না করাতে মৃণালবাবুর প্রতিবাদ-উত্তর কিছু অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ মৃণালবাবু যদি কোন উপায়ে সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারেন ত, আমার নিকটে আসিলে, আমি তাঁহার কর্ণমূলে আরক্তিম করিয়া তুলিতে পারি। তাঁহার অবসরমত তিনি একবার আমার সহিত দেখা করিলেই হয়। বহুদিন দেখা শোনাও নাই।

মৃণালবাবুকে কেন 'অতি-বুদ্ধি মনুষ্য' বলিলাম, তাহার কারণ তাঁহার প্রতিবাদপত্রেই আছে; তবে তাঁহার স্বভাবে যাহা প্রকাশ, তাহা যাঁহারা তাঁহার শ্রমিক-আন্দোলন-পেশার সংবাদ না রাখেন, তাঁহারা অবগত না-ও থাকিতে পারেন। কিন্তু মৃণালবাবু তাঁহার পত্রে যেরূপ আশ্চর্য কৌশল ও সুচতুর মুন্সীয়ানার সহিত সত্য গোপন করিয়া চোখ-রাঙানিকে পাল্টা যুক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাংবাদিক মাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন; তিনি তাঁহাদের সকলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আমি আমার পূর্ব পত্র মৃণালবাবুর অনেক ভুলের মধ্যে মাত্র দুইটি অতি বড় রকমের ভুলের উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং প্রসঙ্গত বলিয়াছিলাম যে, কবির দেহত্যাগের পর প্রকাশিত "ক্যালকাটা ম্যুনিসিপল গেজেট"-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার রবীন্দ্র-জীবনপঞ্জী [Tagore Chronicle] হইতে মৃণালবাবু তাঁহার 'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের যতখানি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ততখানি ঠিকই আছে, কিন্তু যেখানেই তিনি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানেই অদ্ভুত ভুল করিয়া বসিয়াছেন। সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মৃণালবাবুর ভুলের নির্দেশকালে কল্পনাই করিতে পারি নাই যে, অবাঞ্ছিত বস্তুতে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়াছি। এখন পূতিগন্ধে বিরত হইয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত বোধ করিতেছি; প্রতিবাসীরা ক্ষমা করিবেন।

সে যাহা হউক, মৃণালবাবু যে তাঁহার দুইটি ভুলের বিচিত্র কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা যেমনই নির্লজ্জ তেমনই কৌতুকপ্রদ। তিনি "অমৃতবাজার পত্রিকা"র পাঠকসম্প্রদায়কে তাঁহার বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রজ্ঞান করিয়া, প্রতিদিন যে সুচতুরভাবে নিজের অজ্ঞতা ঢাকিয়া থাকেন, এ-ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশে সকলেই তাঁহার ছাত্র বা পাঠক নহেন। রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি আজগুবি গল্প চালাইয়া তিনি প্রথমে রবিবাসরের সরলমতি সদস্যদের ও পরে "দেশ"-এর পাঠকবর্গকে বিস্মিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার অপরাধ, আমি কিছুমাত্র বিস্ময় বোধ না করিয়া—"গীতাঞ্জলি"র প্রথম গানটির ['আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে' ।] রচনাকাল ধরিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, মৃণালবাবুর গল্পবর্ণিত ঘটনা আদৌ সম্ভব নয়। কেন অসম্ভব, তাহার পক্ষে অতি সহজ যুক্তিই দিয়াছিলাম; —যে ১৯০৬।৭ খৃষ্টাব্দে রচিত একটি ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্গীত, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথবাবুকে বয়স্য-সুলভ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া রবীন্দ্রনাথ কখনই গাহিয়া উঠিতে পারেন না। আমার সে-কথার উত্তরে, মৃণালবাবু আমাকে ধমকাইয়া বলিতেছেন—

> কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই বলিবেন যে, স্থান ও কালের পরিচয় থাকিলেই যে কবি তৎকালে ও তৎসময়ে ঐটি রচনা করিয়াছিলেন, তার পূর্বে, এমন কি বহুপূর্বেও, ঐভাবের কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই বা ব্যক্ত করিতে পারেন না ইহা বলা যায় না।

আমি বলি—খুবই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীত রচনার ধারা পদ্ধতির সহিত কিছুমাত্র পরিচয় যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, কোনও গানের বা কবিতার ভাব বহুপূর্বে তাঁহার মনে উদিত হইলেও, কোন গান বা কবিতা মুখে মুখে বা মনে মনে রচনা করিয়া, তাহা পড়িয়া বা গাহিয়া শুনাইয়া রচনার তেইশ বৎসর পরে [১৯১০—১৮৮৭=২৩] তাহা প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন,—এমন দৃষ্টান্ত নাই। তাঁহার রচনার গতিবেগ প্রকাশের সঙ্গে চিরদিন সমতালেই চলিয়াছে। আর একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত দুই একটি সঙ্গীতকে ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে কদাচিৎ ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকিলেও কখনও কোন ভগবদপ্রসঙ্গ-সঙ্গীতকে সে-ভাবে কোনদিন ব্যবহার করেন নাই। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে জানেন তাঁহারা জানেন যে, তাহা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার পর মৃণালবাবু বলিতেছেন:—

> "'গীতাঞ্জলির' প্রথম গানটির সহিত আমার উদ্ধৃত গানের পার্থক্য আছে।"

নিশ্চয়ই আছে। এবং তাহা যে থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি! "গীতাঞ্জলির"র গানটি রচনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর মৃণালবাবুর উদ্ধৃত গানটি রচনা করিয়াছেন "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সহযোগী সম্পাদক! তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

> "আমার মাথা নত করে
> দাও হে তোমার
> চরণধূলার তলে"—

---

* মৃণালবাবুর মৎপ্রদত্ত উপাধি দুইটির একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন বোধ হয়। তাঁহাকে 'আধা-অধ্যাপক' বলিয়াছি, কেননা তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাস পড়ান কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তারপর তিনি করেন সৌখীন শ্রমিক আন্দোলন আর খবরের কাগজে চাকুরী। তবে তাঁহাকে যে 'অ-পদস্থ Editor' বলিয়াছি, সে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নহে, সে শুধু ইতিহাসের খাতিরে। ব্যাপারটা এই। শ্রদ্ধেয় মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর মৃণালবাবু "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক পদ লাভ করেন। তাঁহার নামেই "পত্রিকা" বাহির হইত। সহসা একদিন দেখা গেল, মৃণালবাবুর নাম অপসৃত হইয়াছে। সম্পাদক ঘোষিত হইয়াছেন গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়। গোলাপবাবুর মৃত্যুর পর তরুণ তুষারকান্তি বসিলেন সম্পাদকের গদীতে। মৃণালবাবু কিছুদিন "ফরোয়ার্ড"-গোসাঘরে গোপন থাকিয়া "পত্রিকা"য় পুনর্মূষিক হইলেন শ্রীমান তুষারকান্তির অধীনস্থ সহকারীরূপে। সম্প্রতি তাঁহার প্রোমোশন হইয়াছে; তিনি হইয়াছেন 'সহযোগী সম্পাদক' (Associate Editor)! কাগজ অবশ্যই তুষারকান্তির নামে বাহির হয়। —লেখক॥

আর মৃণালবাবু বানাইলেন ঃ—

"আমার মাথা নত করে
দাও হে সখা
তোমারই চরণধূলার তলে"—

মৃণালবাবুর উধৃত গানটি যে মৃণালবাবু ছাড়া আর কেহ রচনা করিতে পারে না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত তাহার শেষ দুই ছত্রেই রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে যে ঐরূপ কুৎসিৎ ছন্দপতন অসম্ভব তাহাও কি কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে? একমাত্র মৃণালবাবুর পক্ষেই ঐরূপ পঙ্গু ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আরোপ করা সম্ভব। আবার বলি,—"মৃণালবাবুর কান নাই, সুতরাং সে বালাইও নাই।" খণ্ডিত-ছন্দ খণ্ডিত-কর্ণকে পীড়া দেয় না দেখিতেছি!

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক চন্দ্রনাথ বসুকে "সখা" সম্বোধন বিসদৃশ এবং শুধু সেই কারণেই সম্ভব মনে না করায়, মৃণালবাবু আমার "অজ্ঞতা" ও "অহমিকা" দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিস্তর গানে ঈশ্বরকেও সখা বন্ধু প্রভৃতি সম্বোধন আছে।" অতএব রবীন্দ্রনাথ যে চন্দ্রনাথবাবুকে "সখা" বলিয়া ডাকিবেন ইহা আর অসম্ভব কি? অকাট্য যুক্তি! মৃণালবাবুর যুক্তির বহর দেখিয়া রঙ্গমঞ্চের সেই খঞ্জ ঔরংজেবের কথা মনে পড়ে,—যিনি দর্শকদের উপহাস উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—'ঔরংজীব যে খোঁড়া ছিলেন না, ইহা কোন ইতিহাসে লিখিত আছে?' কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে জানিতেন, তাঁহার নিকটে আসিবার পরম সৌভাগ্য লাভ যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানেন যে, বয়োজ্যেষ্ঠ "চন্দ্রনাথের দুই হাত ধরে" ঐরকম নাটকীয় ভঙ্গীতে সহসা গান গাহিয়া উঠা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব। ঐরূপ আচরণ তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য, তাঁহার মর্যাদাবুদ্ধি ও শালীনতা-বোধের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। চন্দ্রনাথবাবুর পুত্র হরনাথবাবু যদি এই গল্প মৃণালবাবুকে বলিয়া থাকেন তবে বলিব—"দ্বি-সপ্ততি বর্ষ বয়স্ক" হরনাথবাবুর স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে; বাহাত্তর বৎসর বয়সে তাহাই স্বাভাবিক; কিম্বা ভাবিব,—হরনাথবাবু এক সময়ে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতেন, পাগল লইয়াই ছিল তাঁহার কারবার, তিনি হয় ত মৃণালবাবুকে ক্ষেপাইয়া দিয়া মজা দেখিয়াছেন। তবে মৃণালবাবু চিরকাল দৈনিক কাগজে দিনগত পাপক্ষয় 'লীডার' লিখিয়াছেন, গল্প ত কখনো লেখেন নাই, তাই তিনি হরনাথবাবু-প্রদত্ত গল্পের প্লটটি লইয়া তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁহার কল্পনার লাগাম আর একটু ছাড়িলেই, তিনি 'সখা'-ভাবে হাতধরাধরি রবীন্দ্র-চন্দ্রনাথ মিলনের ছবি না আঁকিয়া, বুড়া চন্দ্রনাথের সম্মুখে হাত নাড়িয়া যুবা রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই সখি-সম্বাদ গাওয়াইতে পারিতেন—"যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারিনি।" বলুন, গল্পটি তাহা হইলে আরও কত জমিত, কত রসাশ্রিত হইত!

(২)

এই গেল মৃণালবাবুর প্রথম জবাবদিহির আলোচনা। তাঁহার দ্বিতীয় জবাবদিহি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত "সবুজ-পত্র" মাসিকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্প 'স্ত্রীর পত্র' ও তাহার পাল্টা জবাবে চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত "মৃণালের পত্র" গল্প সম্পর্কে। মৃণালবাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ "সবুজ-পত্র" কাগজে 'লোকহিত' ও 'বাস্তব' প্রবন্ধ দুইটিতে বিপিনবাবুর গল্পের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম যে, ইহা তাঁহার নিছক কল্পনা। ইহার উত্তর দিতে গিয়া তিনি অতি প্রকাণ্ড একটি মিথ্যাচারণ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতেই তাহা প্রমাণ করিব। মৃণালবাবু লিখিতেছেন ঃ—

'হোম মহাশয় বলিতেছেন যে, বিপিনচন্দ্র পালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'মৃণালের পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটি ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিবার কথা সঠিক; কারণ উহা 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট হইতে সংগৃহীত'। কিন্তু রবিবাবু 'সবুজ পত্রে' 'লোকহিত' ও 'বাস্তব' প্রবন্ধে বিপিনবাবুর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন এ বিষয়টি আমার নিছক কল্পনা। হোম মহাশয় লিখিয়াছেন, "মৃণালবাবু শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কি যে, ঐ দুটি প্রবন্ধের সহিত 'স্ত্রীর পত্র' বা 'মৃণালের পত্র' কোনটিরই কোন সম্বন্ধ নাই!" বটে? 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' যে সংখ্যা হইতে আমি সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, হোম মহাশয় বলেন, তাহাতেই এই প্রসঙ্গে আছে ঃ—

"The 'Narayan' criticises Tagore for lacking in realism and exotic writings that had no root in the soil; the *Poet replies* in the 'Sabuj Patra' with two *essays Bastab* and *Lokahit*, deploring in the latter essay, the tendency on the part of those engaged in social service to patronise the common people while dealing with the problem of poverty and social uplift."

'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদককে তারিফ করিতে হয়। তাঁহার কাগজে কি বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া দেখিবার অবসর হয় নাই—'সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের লেখককে গালি দিবার ব্যগ্রতা এত অধিক!

'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' সম্পাদকের পক্ষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অপদস্থ সম্পাদকের তারিফের প্রয়োজন নাই। "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে"-এর রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যায় মদ্‌সংকলিত Tagore Chronicle-এ উপরি উদ্ধৃত প্রসঙ্গে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলেই মৃণালবাবুর অসাধুতা ধরা পড়িবে; কোন ব্যাজস্তুতির অবান্তর কথায় তিনি তাহা চাপা দিতে পারিবেন না। আমি লিখিয়াছিলাম ঃ—

1912—1918

"SABUJ-PATRA" AND SANTINIKETAN

Pramatha Chaudhuri ("Birbal"), lawyer and man of letters, starts (May 8, 1914) the *Sabuj-patra* (green leaves) a Bengali periodical; the Poet contributes every month poems, essays, stories to this new journal which emphasises the characteristic Indian values, satirizes conventionality, hollow snobbery and hazy romanticism, * * * * contributes to *Sabuj-patra, Strir patra* (Letter from a Wife), a short story in which rings the conflict then gradually awakening Indian womanhood to the tragedy of their position; it creates a furore and Bipin Chandra Pal caricatures the story by

writing in the *Narayan* (a paper started by C. R. Das, *Mrinaler patra* (Letter from Mrinal); the *Narayan* criticises Tagore for lacking in realism and indulging in exotic writings which had no root in the soil; the Poet replies in the *Sabuj-patra* with two essays, *Bastab and Lokahita*, deploring, in the latter essay, the tendency on the part of those engaged in social service to patronise the common people while dealing with the problem of poverty and social uplift.

উপরি-উদ্ধৃত ইংরেজী অংশে মৃণালবাবু সুকৌশলে মাঝের কয়েকটি পংক্তি (যাহার নীচে আমি লাইন টানিয়াছি) বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন। মৃণালবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত অংশের সহিত আমার 'স্ত্রীর পত্র'-বিষয়ক মন্তব্যের যে কোনই সম্বন্ধ নাই, যে কোন সাধু ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা বুঝিবেন। মৃণালবাবুর অন্য রূপ বলিয়াই তিনি 'ধাপ্পা' দিয়া "দেশ"-এর পাঠকসম্প্রদায়কে অন্যরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই মিথ্যাচারণ তাঁহার 'অতি-বুদ্ধির' ফল। তারপর মৃণালবাবু লিখিয়াছেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' প্রবন্ধটি পড়ি নাই। ঠিক কথা। যিনি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ও বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের পত্র' গল্প দুইটিকে প্রবন্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন, তিনি এই কথা বলিবার স্পর্ধা নিশ্চয়ই রাখেন।

(৩)

এই পর্যন্ত গেল তথ্যের ব্যাপার। ইহার পর মৃণালবাবু তাঁহার পত্রের শেষ প্যারাগ্রাফে ১৯৩৫ সালের যে-ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ অবান্তর হইলেও, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। ঐ সালের ১৮ই অগস্ট তারিখে কলিকাতার টাউন হলে, এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ Leader দৈনিকের বিখ্যাত সম্পাদক, অধুনা-পরলোকগত স্যার চিরভুরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির সভাপতিত্বে যে নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাংবাদিক-বৃত্তি শিক্ষাদানের যে প্রস্তাব মৃণালবাবুর উদ্যোগে উপস্থাপিত হয়, সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার "সে চেষ্টা ব্যর্থ করা।" বিনয়ের আতিশয্যে মৃণালবাবু এইখানে কিছু অনুক্ত রাখিয়াছেন! তাঁহার "চেষ্টা ব্যর্থ করা" শুধু আমার **উদ্দেশ্য ছিল না**,—আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলাম; মৃণালবাবুর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছিল। সত্য কথা,—আমারই রচিত ও টাউনহলে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন দিবসে বিতরিত পুস্তিকায় সাংবাদিকবৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিষয়ভুক্ত করার অসমীচীনতা সম্বন্ধে যে বিশদ আলোচনা ছিল, তাহার যৌক্তিকতা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সমবেত প্রতিনিধিগণ স্বীকার করিয়া লওয়াতেই, মৃণালবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও, সভায় সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। তিনি তাঁহার সেই পরাজয়ের কথাটি সুচতুরভাবে গোপন করিয়া গিয়াছেন। সত্য আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়া আংশিকভাবে গোপন করা বিদ্যায় মৃণালবাবু আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; তিনি গোপনসিদ্ধ মহাপুরুষ। একটি গল্প মনে পড়িতেছে। রামমোহন রায়ের কোন এক বন্ধু একবার তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে, আপন যুক্তির সপক্ষে, কোন একটি চতুস্পদীর দুইটি পদ মাত্র উল্লেখ করিয়া, বাকী দুইটি পদ,—যাহা তাঁহার যুক্তির বিপক্ষে যায়,—একেবারে চাপিয়া গেলে, রামমোহন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ—"বেরাদার, তোমার দুই 'চরণ' শুধু দেখাইলে, আর দুইটি গোপন রাখিলে কেন? বাহির কর, তোমাকে চিনিয়া লই।" আমার বন্ধুকেও সেই কথা বলি।

মৃণালবাবু আমার উপর আরোপ করিয়াছেন "বিদ্বেষের জ্বালা"। ১৯৩৫ সালের নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনে মৃণালবাবুর প্রস্তাব যদি আমার চেষ্টাতেই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, তবে তাহার "জ্বালা" ত আমার থাকিবার কথা নয়। পরাভবেই মানুষ দেখি জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। নহিলে, এতদিন পরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, মৃণালবাবুর সেই "প্রধূমিত" জ্বালা "বহ্নিমান" হইয়া উঠিবে কেন? তবে কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকবৃত্তি অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া, যখন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে সদস্যপদ কামনা করেন, তখন আমি কুমিল্লা অভয় আশ্রমের নিরহঙ্কার নিরলস কর্মী, শ্রমিকের নিঃস্বার্থ সুহৃৎ, অধুনা-কারারুদ্ধ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ভোট সংগ্রহে সাহায্য করিয়া নির্বাচনদ্বন্দ্বে মৃণালবাবুকে পরাজিত করায়, বসুজার যে নিদারুণ মর্মদাহ ঘটিয়াছিল, সেই দাহ এতদিনেও ঘুচে নাই? সেই জ্বালা কি মৃণালকান্তি বসুকে এখনও জ্বালাইয়া মারিতেছে? এতদিন পরে কি মহদাশয়ের সেই দাহমুখ হইতে বিষ ঝরিয়া পড়িল? ইতি—

ভবদীয়
অমল হোম

"হোমভিলা", বারগণ্ডা, গিরিডি।
বড়দিন, ১৯৪২।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি মাত্র খেলা শেষ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কোন খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তবে এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিশালী দল গঠনের প্রচেষ্টা সমানেই চলিয়াছে। বাঙলা প্রদেশে জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিলেও পরবর্তী খেলায় দল যাহাতে আরও শক্তিশালী হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। প্রতিদিনই প্রায় দুইটি বাছাই দল লইয়া কলিকাতার ময়দানে খেলা হইতেছে। এই সকল খেলায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেও কয়েকজন খেলোয়াড়কে দেখা গিয়াছে। তরুণ খেলোয়াড় ধ্রুব দাসের ব্যাটিংই ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইনি বিহার দলের বিরুদ্ধে বাঙলা দলে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিলেন। পরবর্তী খেলায় ইঁহাকে পরিচালকগণ দলে স্থান দিবেন বলিয়াই মনে হয়। ফাস্ট বোলারের অভাব বাঙলা দলের পূরণ হইবার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যে কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন ফাস্ট বোলার ছিলেন না। কলিকাতার বিশিষ্ট দলসমূহ অনুসন্ধান করিয়া একজন এইরূপ শ্রেণীর বোলার জোগাড় করিবার জন্য পরিচালকগণ যে কেন ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। উইকেটরক্ষক হিসাবে ইউরোপীয় খেলোয়াড়কে দলভুক্ত না করিলেই ভাল হয়। পূর্বে যাঁহাকে দলভুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহার স্থানে মোহন বাগানের এ দেবকে লইলে খুব অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় তিনি ব্যাটিং ও উইকেটরক্ষায় বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। কে ভট্টাচার্য বিহার দলের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী খেলায় তিনি বাঙলা দল হইতে বাদ পড়িবেন বলিয়াই আশংকা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় তিনি ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্থান বাঙলা দলে অটুট থাকিবে বলিয়া ধারণা। প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে কোন্ দুইজন খেলোয়াড়কে পরিচালকগণ গ্রহণ করিবেন, জানা যায় নাই। জি ভট্টাচার্যকে লইলে জব্বর অথবা এস গাঙ্গুলী অপেক্ষা ভাল ফল প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সম্প্রতি যে কয়েকটি খেলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশতেই তিনি প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে ভালই খেলিয়াছেন। বাঙলা দলকে পরবর্তী খেলায় বিশেষ শক্তিশালী দলের সহিতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। সুতরাং বাঙলা দল শক্তিশালী করিয়া গঠিত হউক, ইহাই সকলের কামনা।

মহারাষ্ট্র দলে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন, ইতিপূর্বে জানা যায় নাই। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ দলের খেলোয়াড়গণের নাম সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। দলে কয়েকজন নূতন খেলোয়াড় স্থান পাইলেও তাঁহারা বিভিন্ন খেলায় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দল যে সকল খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাতে বোম্বাই দলের অবর্তমানে এই দলকে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোন দল পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে মহারাষ্ট্র দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ অধ্যাপক ডি বি দেওধর (অধিনায়ক); এস ডব্লিউ সোহনী, সি টি সারভাতে, কে এম যাদব, এম এন পারাঞ্জাপে, বি নিম্বলকার, এম কে মন্ত্রী, এস আর আরোলকার, ভি এম পাণ্ডিত, গজলী, রেগে, ডি এস ডক্টর, সি ভি চারী ও এস জি সিন্ধে।

যুক্তপ্রদেশ ও হোলকার দল

বাঙলা দলকে যুক্তপ্রদেশ ও হোলকার দলের বিজয়ীর সহিত খেলিতে হইবে। যুক্তপ্রদেশ দল বেশ শক্তিশালী করিয়া গঠিত হইয়াছে। পি ই পাইয়া এই দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। হোলকারের দলও শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় মেজর সি কে নাইডু এই দলের অধিনায়কতা করিবেন।' মুস্তাক আলী, ইস্তাক আলী, জে এন ভায়া, কে ভাণ্ডারকার, এম এম জাগদেল, এস কাথারে, সুরেন্দ্রসিং, ডি কে যার্দে, আর সুব্রামনিয়া, এম এম মুখার্জি প্রভৃতি হোলকার দলে খেলিবেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা

মাদ্রাজে সম্প্রতি ভারতীয় ও ইউরোপীয় দলের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে ৮ উইকেটে ইউরোপীয় দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। ভারতীয় দল প্রথম খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২৬৭ রান করে। ইহার পর ইউরোপীয় দল খেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২৪২ রান করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়ায় অনেকেই আশা করেন যে, ভারতীয় দল বিজয়ী হইবেন। কিন্তু সেই আশা নিরাশায় পরিণত হয়, যখন ভরতীয় দল মাত্র ১১৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নের অল্প পরেই ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ইহাতে ধারণা হয় যে, খেলা অমীমাংসিতভাবে

শেষ হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়াই ভীষণ পিটাইয়া খেলিতে থাকেন। মাত্র দেড় ঘণ্টা খেলা চলিবার পর ইউরোপীয় দল দুইটি উইকেট হারাইয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোপালন ও ইউরোপীয় দলের অধিনায়ক উভয়েই ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় দলের স্বামীনাথম, রামসিং এবং ইউরোপীয় দলের রবিনসন, মিসলার প্রভৃতির ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য হয়। বোলিংয়ে রবিনসন, রামসিং, রঙ্গচারী প্রভৃতি সাফল্যলাভ করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ভারতীয় দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৬৮ রান (স্বামীনাথম ৫৬, রামসিং ৫৪, গোপালন ৮৭; রবিনসন ৪৫ রানে ৩টি, ওয়েমাউথ ৫৪ রানে ৪টি, ব্রাণ্ট ৫৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয় দলঃ—প্রথম ইনিংস ২৪২ রাণ (জনস্টন নট আউট ৭৫, ডিক্রেস্টার ৪৩, রবিনসন ৩২, মিসলার ৩৮, ওয়েমাউথ ১৪ রান আউট; রামসিং ৬০ রানে ৪টি, রঙ্গচারী ৬৮ রানে ৩টি, স্বামীনাথম ৫১ রানে ১টি, পরাণকুসুম ২৬ রানে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ১১৭ রান (স্বামীনাথম ১৫, রামসিং ২৭, শ্রীনিবাসম ২৩ পরাণকুসুম ২৭; রবিনসন ২৭ রানে ৫টি, ব্রাণ্ট ২৮ রানে ২টি, ওয়েমাউথ ২৩ রানে ১টি, ব্রাউন ৩১ রানে ১টি উইকেট পান)।

ইউরোপীয় দলঃ—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইঃ ১৪৪ রান (জনস্টন ৫১, এজ ৩১, রবিনসন নট আউট ২৭, নেলার নট আউট ৩১; রামসিং ৩০ রানে ১টি ও পরাণকুসুম ২৪ রানে ১টি উইকেট পান)।

পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতা সাউথ ক্লাব পরিচালিত পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান গত বৎসর অপেক্ষা আকর্ষণীয় ও দর্শনযোগ্য হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু ফলত তাহা হইল না। বর্তমানে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা যেরূপ হইতেছে এবং যে সকল খেলোয়াড়গণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, তাহাতে ইহাকে অতি সাধারণ শ্রেণীর অনুষ্ঠান বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। পরিচালকগণের দোষ ইহাতে মোটেই নাই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিই এই শোচনীয় পরিণতির কারণ। পরিচালকগণ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যে অনুষ্ঠান চালাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এইজনাই ধন্যবাদ দিতে হয়। আমরা কোনরূপেই আশা করি নাই যে, প্রতিযোগিতা চলিবে। ভারতীয় বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণ যাঁহারা প্রথমে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একরূপ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই সকল খেলোয়াড় এইরূপ ভাবে হঠাৎ চলিয়া না গেলে প্রতিযোগিতার এই অবস্থা হইত না। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল কি হইবে, নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তবে আমাদের যতদূর ধারণা দিলীপ বসু পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস ও ডাবলস উভয় বিষয়েই সাফল্যলাভ করিবেন। সিঙ্গলসে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যে কয়েকজন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় বর্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র এইচ এন কুপার ব্যতীত কেহই খেলায় প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। উক্ত খেলোয়াড় যদি দিলীপ বসুর নিকট পরাজিত হন, জিম মেটা, হল সারফেস, কৃষ্ণপ্রসাদ অথবা সুমন্ত মিশ্র কেহই দিলীপ বসুর সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। হল সারফেস আমেরিকার একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়। কিন্তু ইতিপূর্বে সিন্ধু টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি দিলীপ বসুর বিরুদ্ধে খেলিয়া পরাজয় বরণ করিয়াছেন। সুতরাং দিলীপ বসুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া হল সারফেস বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবেন, ইহা আমাদের কল্পনাতীত। ডাবলসের খেলায় দিলীপ বসুর জয়লাভের সম্ভাবনা আছে এইজন্য যে, তিনি জিম মেটার ন্যায় একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা খেলোয়াড়কে পার্টনার পাইয়াছেন। দিলীপ বসু এই প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ও ডাবলস উভয় বিভাগে সাফল্যলাভ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বোম্বাইতে বিশেষ প্রদর্শনী ব্যাডমিণ্টন খেলা

টেনিস অথবা ব্যাডমিণ্টন খেলার আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে পেশাদার খেলোয়াড়দের সহিত এমেচার বা সৌখিন খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিষিদ্ধ। আমেরিকার টেনিস উৎসাহিগণ এই আইন পরিবর্তন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হন নাই। গত বৎসর কেবল মিশ্র টেনিস পরিচালকমণ্ডলী এই আইনের একটু পরিবর্তন করিয়াছেন। রেড ক্রস সোসাইটির অর্থ সংগ্রহের জন্য যদি কোন খেলা হয়, তবেই পেশাদার খেলোয়াড়গণ এমেচার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। ইহার ফলেই আমেরিকায় ও ইংলণ্ডের কয়েক স্থানে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে এমেচার খেলোয়াড়দের খেলিতে দেখা গিয়াছে। ব্যাডমিণ্টন খেলায় এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে হয় নাই। সম্প্রতি বোম্বাইতে এক বিশেষ প্রদর্শনী ব্যাডমিণ্টন খেলা হইয়াছে, তাহাতে পেশাদার খেলোয়াড়গণ এমেচার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলিয়াছেন। এই খেলাটি রেড ক্রস সোসাইটির অর্থসংগ্রহের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় এমেচার খেলোয়াড়গণ সকল খেলাতেই বিজয়ী হইয়াছেন। নিম্নে বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

সিঙ্গলস্

জি লুইস (এমেচার) ১৫—৩, ১৫—৩ গেমে সরযূ প্রসাদকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

দেবীন্দর (এমেচার) ১৮—১৫, ১৫—৫ গেমে গণপৎ রামজীকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

প্রকাশনাথ (এমেচার) ১৫-৬, ১৫-১১ গেমে পপৎলালকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

ডাবলস

দেবীন্দর ও অশোকনাথ ১৫-১২ গেমে সরযূপ্রসাদ ও গণপৎ রামজীকে পরাজিত করেন।

প্রকাশনাথ ও জি লুইস ১৫-৯ গেমে পপৎলাল ও সালুকে পরাজিত করেন।

২৩শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—গত মঙ্গলবার (২২শে ডিসেম্বর) মধ্য রাত্রে কলিকাতা অঞ্চলে পুনরায় জাপ বিমান হানা হয়। সঙ্কেতধ্বনি প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অল্প কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কলিকাতা এলাকায় ইহা তৃতীয় আক্রমণ। বিমান আক্রমণের সময় বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ জাপ বিমানগুলিকে বাধা দেয়। জাপ বোমারু বিমানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বোমা বর্ষণ করে। একটি বাজার ও দুটি বস্তীর উপর বোমা পড়ে। সামান্য হতাহত হইয়াছে। দুইখানি জাপ বোমারু বিমান ঘায়েল হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, লালফৌজ যে সকল লোকালয় পুনরুদ্ধার করিয়াছে, তন্মধ্যে মিলেরোভো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহা একটি বড় রেলওয়ে জংসন। ভরোনেস হইতে উহার দূরত্ব কুড়ি মাইলের বেশী হইবে না।

উত্তর আফ্রিকা—ফরাসী হেড কোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ২১শে ডিসেম্বর তিউনিসের পং দু ফয়ের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে যে ফরাসী বাহিনীটি প্রবেশ করে, উহাদের অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

২৪শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গতকল্য পূর্ব বঙ্গ অঞ্চলের দুই স্থানে জাপ বিমান হানা দেয়। অপরাহ্ণে তাহারা ফেণী অঞ্চল আক্রমণ করে। অল্প কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। গত রাত্রে জাপ বিমান চট্টগ্রাম এলাকায়ও অল্প কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে। ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের সংখ্যা সামান্য।

ভারতীয় সমর বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, কলিকাতা অঞ্চলে তিনবার বিমান হানায় ২৫ জন লোক মারা গিয়াছে এবং প্রায় ১০০ জন আহত হইয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, গতকল্য (২৪শে ডিসেম্বর) মধ্য রাত্রির কিছু পূর্বে প্রতিপক্ষের কয়েকখানি বিমান কলিকাতা অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। নির্বিচারে কয়েকটি বোমা বর্ষিত হয়। তিন ঘণ্টাব্যাপী বিমান আক্রমণ চলে। জাপ বিমানগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আসে। বৃটিশ জঙ্গী বিমানগুলি প্রতিপক্ষকে বাধা দেয় এবং উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়। একখানি জাপ বোমারু বিমান আগুন লাগিয়া ধ্বংস হয় এবং অপর কয়েকখানি গুরুতররূপে ঘায়েল হয়। হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। কলিকাতা অঞ্চলে ইহা চতুর্থ বিমান আক্রমণ।

গত সন্ধ্যায় আলজিয়ার্সে ফরাসী উত্তর আফ্রিকার হাই কমিশনার এডমিরাল দার্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট সৈন্যদল উত্তর ককেশাসে নালচিকের দক্ষিণে এক আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

ব্রহ্ম—গতকল্য বৃটিশ বিমান মাগুই বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

২৬শে ডিসেম্বর

ব্রহ্ম—ইণ্ডিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আরাকান অঞ্চলে টহল দেওয়া হইতেছে। তথায় আর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। উত্তর-পূর্বে চিন পাহাড় অঞ্চলে ২৪শে ডিসেম্বর উভয়পক্ষে এক যুদ্ধ হয়। উহাতে শত্রুপক্ষ আমাদের টহলদার সৈন্যগণ কর্তৃক তাহাদের হস্ত হইতে অধিকৃত স্থানসমূহ পুনরাধিকারের চেষ্টা করে। তাহাদের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহারা পার্শ্ব আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু উহাও নিষ্ফল হয়। উভয় সংঘর্ষে শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ হতাহত হয়। আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। গতকল্য রাজকীয় বিমান বাহিনী উংগু ও আকিয়াবে আক্রমণ চালায়।

রুশ রণাঙ্গন—গত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সোভিয়েট বাহিনী ইউক্রেন প্রদেশে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা রষ্টোভ-ভরোনেজ রেলওয়ের পশ্চিমে কয়েকটি শহর পুনরধিকার করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রোর সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা সার্ভি দখল করিয়াছে। আলজিয়ার্স বেতারে প্রকাশ, এক্ষণে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী তিউনিসের ১২ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রতিদিন ১৫ হইতে ২০ মাইল করিয়া অগ্রসর হইয়া সোভিয়েট ট্যাঙ্কশ্রেণী এবং মোটরবাহিত সৈন্যদল এক সপ্তাহেরও কম সময়ে ডনের মধ্য এলাকা হইতে ষ্ট্যালিনগ্রাদ-লিখায়া রেল লাইন পর্যন্ত ডনের প্রায় একশত মাইল ষ্টেপ ভূমি অতিক্রম করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ জার্মাণ সৈন্যদের মুক্ত করার জন্য কোটেলনিকোভোর নিকটে জার্মানরা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রুশ বেষ্টনীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু ১২ দিন সংগ্রামের পর লালফৌজ জয়লাভ করিয়াছে। চীর নদী যেখানে ডনে মিলিত হইয়াছে, উহার ১২ মাইল দক্ষিণস্থ এক স্থান হইতে রুশ বাহিনী ডন নদীর পশ্চিমে ৬ হইতে ৮ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। লালফৌজ চিলিকভ এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। চিলিকভ উত্তর ককেশাস রেলপথে কোটেলনিকোভোর ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট সৈন্যেরা ভরোনেজ-রোষ্টভ রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

জেনারেল জিরো উত্তর আফ্রিকার হাই-কমিশনার এবং ফরাসী সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ মনোনীত হইয়াছেন।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "এখন হইতে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইবার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ব্রহ্মদেশের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইউনাস এবং পূর্ব ভারতের ঘাঁটিসমূহ হইতে বৃটিশ ও মার্কিন বিমানবহর প্রত্যহই ব্রহ্মদেশে আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

২৮শে ডিসেম্বর

ভারতবর্ষ—২৭শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে অতি অল্প সংখ্যক শত্রু বিমান পুনরায় কলিকাতা এলাকায় আক্রমণ চালায়। বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ আকাশে উঠে এবং শত্রুপক্ষের সহিত সংঘর্ষ হয়। বিমান হানা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। শহরের বহির্ভাগে অতি অল্প-সংখ্যক বোমা বর্ষিত হয়। একটি বোমায় বসতিপূর্ণ বস্তীতে সামান্য আগুন লাগিয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা দশ জনেরও কম হইয়াছে।

উক্ত রাত্রিতে চট্টগ্রাম ও ফেণীতেও বিমান হানা হয়। চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সামান্য রকমের বিমান হানা হইয়াছিল এবং নদীর নিকটবর্তী এলাকায় অতি অল্পসংখ্যক বোমা বর্ষিত হয়। কোন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। ফেণীর উপর সামান্য রকমের বিমান হানা হয়।

২৩শে ডিসেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য পুলিস তিন স্থানে গুলীবর্ষণ করে। ৪টি গোলা ছোড়া হয়। ১১টি স্থানে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। ৪জন পুলিস কনেস্টবল ও একজন দারোগা আহত হইয়াছে। আমেদাবাদ রেলস্টেসন ভবনের নিকটে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়।

বাঙলায় বিক্ষোভ—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে নরিন্দা থানায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমার টুকরা ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। কেহ আহত হয় নাই, কিংবা জিনিসপত্রের ক্ষতি হয় নাই।

গত রবিবার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত কোপনুগর ইউনিয়নে একজন ট্যাক্স আদায়কারী চৌকীদারী আদায় করিতে গিয়া প্রহৃত হইয়াছে এবং তাহার খাতাপত্র ও টাকার থলিয়া কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। ঢাকার অপর সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অদ্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ৪২তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ভারতের নানাস্থান হইতে অনেক অভ্যাগত এবং বিশ্বভারতীর বহু প্রাক্তন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৪শে ডিসেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে ওয়ার্লিতে পুলিশ চৌকীর নিকট একটি অবিস্ফোরিত বোমা দেখা যায়।

কলবাদেবীতে এক শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাদোলী তালুকের বরাদ গ্রামের উপর ৪০০০ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুতাহাটা এলাকায় কলেরার প্রকোপ সম্বন্ধে মেজর পি বর্ধন এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ৭, ৮, ৯ ও ১১নং—এই চারটি ইউনিয়নের ১৩৫০০ লোকের ভিতর কলেরায় ৪৫৫ জন মারা গিয়াছে।

সাময়িক পত্র "লাইফে" জেনারেল স্মাটস লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ যদি ইচ্ছা করে, তবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মতই উহা স্বাধীন হইতে পারে। ভারতের পক্ষে ইহা শোচনীয় দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এতদিন তাহাদের নেতৃবৃন্দ বা সেখানকার জনসাধারণ একমত হইতে পারেন নাই।"

২৫শে ডিসেম্বর

কলম্বোর সংবাদে প্রকাশ যে, সিংহলের জাতীয় কংগ্রেসের ২৩তম অধিবেশনে ওয়েস্টমিনিস্টার স্ট্যাটুটের অধীনে ঔপনিবেশিক শাসনাধিকারের পরিবর্তে সিংহলের জন্য "স্বাধীনতা" লাভই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সর্বাধিক সংখ্যক ভোটে একটি প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেরও একটা পরিবর্তন করা হইয়াছে। মিঃ জে আর জয়বর্ধন উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বৃটেনের বাহিরে প্রবাসী ইংরেজগণ কর্তৃক অধ্যুষিত দেশগুলিতে "ঔপনিবেশিক" এই কথাটি প্রযোজ্য হইতে পারে; কিন্তু ভারত ও সিংহলের ন্যায় নিজস্ব সভ্যতাবিশিষ্ট দেশগুলির সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

নাগপুরের স্পেশ্যাল জজ মৌদা গ্রামের হাঙ্গামা মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় ৫ জন আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং ১৫ জন আসামীর প্রতি তিন হইতে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—নওগাঁর (আসাম) সংবাদে প্রকাশ, নওগাঁ জেলার তিনটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই সম্পর্কে কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কতকগুলি বালক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিলে পুলিশ গুলী চালায়। ফলে একজন আহত হইয়াছে।

বাঙলায় বিক্ষোভ—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে জনসন রোডের একটি রেস্টুরেন্টের নাচঘরের দক্ষিণ দিকের দরজায় একটি পটকা নিক্ষেপ করা হয়।

৫ জন সৈন্য এবং একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করার অভিযোগে সারণের স্পেশ্যাল জজের এজলাসে ১২ জন আসামীর বিরুদ্ধে এক মামলা চলিতেছিল। স্পেশ্যাল জজ এই ১২ জন আসামীকে উক্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

গত বড়দিনের দিন রাত্রে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পুনরায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফলে ৪৭৪ জন লোক নিহত ও ৬০৫ জন লোক আহত হইয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা পুনরায় বিজ্ঞাপিত না করা পর্যন্ত অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ভোর ৪ ঘটিকা পর্যন্ত শব দাহের জন্য চিতা জ্বালিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। কর্পোরেশনের সেক্রেটারী এই সম্পর্কে এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, রাত্রিকালে চিতার আলোকে শত্রুর বিমান শ্মশান ঘাটগুলির অবস্থিতি স্থানের হদিস পাইবে এবং ঐগুলিকে কারখানা বলিয়া ভ্রম করিতে পারে ও শত্রুর বোমারু বিমানগুলির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হইতে পারে।

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন।

ভারতে বিক্ষোভ—আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কয়েক স্থানে পুলিশের প্রতি প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পুলিশ গুলী চালায়। স্থানে স্থানে পুলিশ লাঠি চালনা করে। দুইটি স্থানে পুলিশের প্রতি এসিড নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দুইজন পুলিশ কনেস্টবল সামান্য আহত হয়। অদ্য স্থানীয় এক ছায়াচিত্র গৃহে একটি দেশী বোমা বিস্ফোরণ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর

ভারত গভর্নমেন্ট খাকসার প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। আল্লামা মাশরিকীকে মাদ্রাজ প্রদেশে অন্তরীণ করিয়া ভারতরক্ষা বিধানে যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—পুণার সংবাদে প্রকাশ, রাজারাম কলেজের সায়েন্স বিল্ডিংয়ে যে দেশী বোমা পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল, বিল্ডিংয়ের মালী সেটিতে হাত দিলে তাহা ফাটিয়া যায় এবং তাহার ফলে মালী আহত হয়। শিবাজী পেটে শ্রীযুক্ত বাবু রাও মাহদকের বাড়িতে এক বিস্ফোরণ হয়; উহার ফলে এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ অদ্য প্রাতে ফোর্ট এলাকায় বর্দা হাইস্কুলের নিকট পুলিশ একটি দেশী বোমা দেখিতে পায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র হাজি আদম ওসমান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন • সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ২৪শে পৌষ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 9th January, 1943 [৯ম সংখ্যা

বিজ্ঞান কংগ্রেস ও পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহর, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী এখন কারারুদ্ধ আছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিখ্যাত খনিজ-তত্ত্ববিদ মিঃ ডি এন ওয়াদিয়ার সভাপতিত্বে কলিকাতা শহরে উক্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজীর অনুপস্থিতির কথা সভাপতি প্রথমেই তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দান সাধারণের নিকট তেমন সুপ্রকট নয়। তবে জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর ভিতর দিয়া পণ্ডিতজীর দানের প্রভাব দেশবাসী কতকটা উপলব্ধি করিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সাল হইতে ঐ প্রতিষ্ঠানটি শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সংগঠন সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদন শিল্পের সহিত ফলিত বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মহৎ কার্য চালাইয়া আসিতেছে।' দেশবাসী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতজীর দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ সম্যকরূপে লাভ করিতে পারেন নাই, মিঃ ওয়াদিয়ার একথা সর্বাংশেই সত্য। এদেশ পরাধীন; এদেশে পণ্ডিতজীর গঠনমূলক সে দান রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হওয়া সুকঠিন। দেশ যদি স্বাধীন থাকিত, তবেই এক্ষেত্রে পণ্ডিতজীর প্রতিভার সার্থকতা পরিস্ফুট হইত। কারণ পণ্ডিতজীর দান শুধু থিয়োসিদ্ধান্তমূলক নয়, দেশের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন সাধনে তাহা বিপ্লবমূলক। গবেষণাগারের পুঁথিপত্র কিংবা সংবাদপত্রে বা পুস্তকের মধ্যেই তাহা নিবদ্ধ থাকিয়া পাণ্ডিত্যগত প্রশংসা পাইবার বস্তু নয়, ব্যবহারিক জীবনে সংস্কারমূলক পরিবর্তন সাধনের পক্ষে তাহা সক্রিয়। পরাধীন এদেশে তাহা সুপ্রকট হইবার সুবিধা পায় নাই। জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে ভারতীয় কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শাসকেরা সে প্রচেষ্টাকে প্রীতির চোখে দেখেন নাই। বিদেশীর স্বার্থের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এবং বিদেশীর মূলধন প্রয়োগে ভারতের শিল্প-সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যেই মুখ্যত যে সব পরিকল্পনা হইয়াছে, সেইগুলিই সাধারণত এ দেশের শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। এ দেশের বৈজ্ঞানিকগণ পণ্ডিতজীর অবদানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনে পণ্ডিতজী যেভাবে বাধ্য হইয়া সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেনারেল কমিটি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার অভিভাষণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া এই প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। বিজ্ঞান কংগ্রেস আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী অধিবেশনে অবশ্য পণ্ডিত জওহরলালই বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। পণ্ডিত জওহরলাল ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আজ বিনা বিচারে বন্দী; কিন্তু সেজন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি স্বরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে দিতে কোন বাধা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না বরং তাঁহার পাণ্ডিত্যকে সম্মান প্রদান করিলে এদেশের জনগণের সমর্থনই গভর্নমেণ্ট লাভ করিতেন।

কিন্তু ততটা দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিবার মত মতিগতি গভর্ণমেণ্টের নাই, ইহা আমরা বুঝি; এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গকৃত পণ্ডিতজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই প্রস্তাবের ভিতর দিয়া ভারতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী স্বাধীনতা লাভে ভারতের আন্তরিকতাকে জগতের কাছে অভিব্যক্ত করাতে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়া এদেশের বিজ্ঞান সাধনার সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এদেশের বিজ্ঞান সাধনা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও জনগণের জীবন যাপনের ধারণার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাপন-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে এবং সামাজিক প্রয়োজনে কার্যকর হওয়ার দিকে এদেশের বিজ্ঞান সাধনার গতিকে ফিরানো দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের গ্রাম-জীবন যাত্রার মোটর-বাস, রেডিও বা রেলগাড়ীর প্রচলনকে এদেশের বিজ্ঞান সাধনার উন্নতি বলা যায় না। বিজ্ঞান কেবল কলকব্জা নহে অথবা মানবের প্রয়োজনে বাস্তব প্রয়োগই ইহার শ্রেষ্ঠ অবদান নহে। সত্য ও প্রকৃতির মূল তথ্য নির্ধারণে মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করাই বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান। শ্রীযুক্ত ওয়াদিয়ার এই উক্তি আমরাও সমর্থন করি; কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল সত্যকে উপলব্ধি করাই যেখানে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সেখানে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনার কোন পার্থক্য নাই; পক্ষান্তরে সেই মূল সত্যকে উপলব্ধি না করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজনে ভেদ এবং বিরোধ ও শোষণের প্রেরণা যেখানে বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে প্রকাশ পায়, বিরোধ সেইখানেই। ভারতের সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সেবা ও ত্যাগের আদর্শে পরিনিষ্ঠিত হইলে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে প্রযুক্ত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই হিসাবে যাহারা বিজ্ঞান-সাধনার নাম করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকে অবৈজ্ঞানিক বলেন, আমরা তাঁহাদের যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। আমাদের মতে ভারতীয় সভ্যতার ত্যাগ এবং সেবামূলক আদর্শের উপরই বিজ্ঞান সাধনা জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ এবং সরল ও কল্যাণের পথে সত্য হইয়া উঠিতে পারে; পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পথে নয়। বিজ্ঞান যেখানে মানবের কল্যাণ সাধনে প্রযুক্ত হয় না, সেখানে উহা বৈজ্ঞানিকভাবে বিজ্ঞান নহে; অর্থাৎ বিজ্ঞানের মূলগত সার্বভৌম সত্যের দিক হইতে উহার সার্থকতা থাকে না; সে বস্তু নামে বিজ্ঞান হইলেও উহা সত্য হিসাবে মোটের উপর অনিষ্টকর হইয়াই দাঁড়ায়।

বোমা বর্ষণের পরে

বোমা বর্ষণের পর কলিকাতা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে, শহর ত্যাগের ভিড় কমিয়াছে। যাহারা শহর হইতে গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই অ-বাঙালী; কিন্তু শহরের স্বাভাবিক অবস্থাতে কর্তৃপক্ষকে এখনও কতকগুলি কাজের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জাপানীরা দিনের বেলায় এ পর্যন্ত শহরে হানা দেয় নাই, শহরের রক্ষা ব্যবস্থার জন্যই হয়ত তাহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই। তাহারা কয়েকদিন রাত্রিতে হানা দিয়াই যাহা কিছু উপদ্রব করিয়াছে। রাত্রিতে হানা দিবার পক্ষে তাহারা জ্যোৎস্নার আলোকের সাহায্য পাইয়াছে, পুনরায় শুক্ল পক্ষে জ্যোৎস্নার আলোক আসিতেছে; সুতরাং বিগত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা হইতে কর্তৃপক্ষকে এবার সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; কিন্তু এসব বিষয় সামরিক কর্তৃপক্ষেরই বিবেচ্য; কলিকাতার স্বাভাবিক অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার সম্বন্ধে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও কোন অংশে কম নহে, বরং অনেকাংশে অধিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়; পুরাপুরি রকমে শহরের বিরুদ্ধে সামরিক ভাবে আক্রমণের সুবিধা জাপানীরা এখনও পায় নাই, বে-সামরিক ব্যবস্থায় ত্রুটি ঘটাইয়া শহরের অবস্থার বিপর্যয় ঘটাইবার দিকেই তাহাদের সমধিক লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। বে-সামরিক সেই দিক হইতে শহরের স্বাস্থ্য বিধান এবং খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের এখনও অনেক প্রয়োজন রহিয়াছে। কর্পোরেশনের মোটর লরী চালকদের ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়াছে; কিছু শ্রমিক সমস্যা অন্য দিক হইতে এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে। দীর্ঘ দিন হইতে চলিল, বলিতে হয়, কলিকাতার জনবহুল এবং যানবহুল রাস্তায় এক বিন্দু জল পড়ে না; আবর্জনা এখনও অনেক স্থানে জমা রহিয়াছে এবং সেইসব শুষ্ক আবর্জনার ধূলিরাশি বাতাসে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা জনসাধারণকে কলেরা ও টাইফয়েডের টীকা লইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কর্পোরেশন হইতে অবিলম্বে এই দিককার অব্যবস্থা দূর করা প্রয়োজন। এই অবস্থা আর কিছু দিন চলিলে শহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যানবাহনের অসুবিধা বিশেষ রকমেই রহিয়াছে। ইহার পর জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সমস্যা। বাঙলা সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিধানের উপর বিধান জারী করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেসব বিধান প্রতিপালন অপেক্ষা লঙ্ঘনের দিক হইতেই সমধিক কার্যকর হইতেছে। বাঙলা সরকারের কৃষি শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর আমাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে, কলিকাতাবাসীদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব ঘটিবে না; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি সর্বত্রই অভাব। বাঙলা সরকার কলিকাতার ২১টি বাজারে সরকারী নিয়ন্ত্রিত হারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি হইতে ইহা জানা যায়; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁহাদের বাঁধা দরে কোথায়ও জিনিস পাওয়া যায় না। যে কয়েকটি দোকান পূর্বে ঠিক করা ছিল, সেগুলির দরজায় দীর্ঘ লাইন বাঁধিয়া এক সের আধ সের চাউল বা চিনির জন্য নর-নারীকে হা-প্রত্যাশায়

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পশুর পালের মত কাটাইতে হয়। সরকারী নির্দিষ্ট দরে চাউল, তেল, আটা শহরের শ্রেষ্ঠ বাজারগুলিতেও মিলিতেছে না, অথচ যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সরকারী নির্দিষ্ট মূল্যে যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলিতে চাহেন, তাঁহারাও কর্মচারীদের নিকট হইতে সে সুযোগ বা অনুমতি পাইতেছেন না। এইভাবে দুর্দশার একটা দুর্নিবার পাকচক্রে পড়িয়া সরকারী কল্যাণ বিধানসমূহ শুধু নিরর্থকই নয়, অনেক স্থলে অনর্থক হইয়া পড়িতেছে, এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। নানারূপে গরীবের দুর্দশার সুবিধায় হীন স্বার্থসিদ্ধ করিবার হিংস্রতার পরিচয় আমাদিগের চিত্ত ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে শুধু ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, আইনের ভিতর কোথায় কি ফাঁক আছে অসাধু ব্যক্তিদের তাহা জানা আছে এবং তাহারা ইহাও জানে যে, এসব ক্ষেত্রে তাহাদিগকে হাতে হাতে ধরা বড়ই শক্ত। একমাত্র ধর্মবুদ্ধি বা দেশের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি বা ঢাকার নবাব বাহাদুর যাহাকে জনসেবার আদর্শ বলিয়াছেন, তাহাতেই সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। কিন্তু এ দেশের যে অবস্থা, তাহাতে ধর্মবুদ্ধির সম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রান্তিই নাই। গরীবকে শোষণ এবং পীড়ন করার মধ্যে এ দেশের খুব কম লোকই অধর্ম দেখিয়া থাকেন, সুবিধার মধ্যে সে কাজ করাই ধর্ম এবং অসুবিধার মধ্যে করিতে যে চায় সেই এদেশে অধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। ইহার পর দেশের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি; সে বুদ্ধিও বিত্ত এবং প্রতিপত্তিশালীদের মধ্যে প্রখর নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এরূপ ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধানে সরকারী ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ধর্মবুদ্ধি এবং কর্তব্যবুদ্ধির কথার আড়ালে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করিবার অসততার ফাঁক কোনদিক হইতে না থাকে। দেশের এই দুর্দিনে দশজনের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া যাহারা নিজেদের স্বার্থই বড় করিয়া দেখে, জনগণের জীবন মরণ স্বরূপ অন্ন লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলে তাহারা, এদেশে পেটের দায়ে যাহারা চুরি ডাকাতি করে, তাহাদের চেয়েও ঘৃণার্হ জীব। মান এবং প্রতিষ্ঠার দিকে না তাকাইয়া এই জীবগুলোকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কর্তৃপক্ষ যদি আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তবেই আমরা সুখী হইব এবং দেশবাসীর মনোবল বৃদ্ধির পক্ষেও তেমন কার্য সহায়ক হইবে। অসাধু ব্যক্তিদের অপকৌশলের ফলে অকেজো সরকারী উক্তি এবং বিবৃতির চেয়ে তাহা বহু গুণে সমধিক ফলদায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিবেকানন্দ কন্যা শিল্পপীঠ

আমরা বিবেকানন্দ কন্যা শিল্পপীঠের ১৯৪১-৪২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট পাইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতার বাগবাজারের অন্তর্গত ৭বি মারহাট্টার ডিচ লেনে অবস্থিত। শিল্প শিক্ষার ভিতর দিয়া সহায়হীনা মেয়েদিগকে স্বাবলম্বিনী করিয়া তোলা এবং এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে সাহায্য করাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ শুশ্রূষাকারিণীর কার্য করেন এবং তাঁহারা এই কার্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। অর্ধোদয় এবং চূড়ামণি-যোগ উপলক্ষ্যে উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কলিকাতার বিভিন্ন ঘাটে সেবাকার্য করিয়া গত পাঁচ বৎসরে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার শিল্প অনুষ্ঠানের কয়েকটি মহতী সভায় ইঁহারা প্রতিনিধিদের সেবাকার্য করিয়াছেন। যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ প্রাথমিক শুশ্রূষার কার্য পরিচালনার জন্য ইঁহারা একটি কর্মকেন্দ্র খুলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত সহস্র সহস্র নরনারীদের সেবাকার্যে রত থাকিয়া এই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উচ্চ প্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙালার বীর সন্যাসী বিবেকানন্দ ৫০ বৎসর পূর্বে মরণোন্মুখ বাঙালী জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হাজার হাজার পুরুষ চাই, হজার হাজার নারী চাই, যাহারা আগুনের মত হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী, উত্তর-মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু দুনিয়াময় ছড়াইয়া পড়িবে।" স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "ভারতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে ঘটিবে না। এক পক্ষ পক্ষীর উড্ডয়ন সম্ভব নহে।" স্বামীজীর বাণী এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সার্থকতা লাভ করিবে, আমরা ইহাই কামনা করি।

যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

ইংরেজি নববর্ষ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন, মিত্রপক্ষ এইবার আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। রুশিয়ায় সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ক্যালিনিন বলিয়াছেন যে, জার্মানি রুশিয়ার কাছে গুরুতর রকমে পরাজিত হইয়াছে, সে ক্ষতি সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। হিটলার বলিয়াছেন, শীতের সময়টা জার্মানরা তেমন কিছু সুবিধা করিতে পারিবে না; কিন্তু শীতের অবসানে তাহারা পূর্ণোদ্যমে পুনরাক্রমণ আরম্ভ করিবে এবং তখন একটি শক্তি এলাইয়া পড়িবে। সে শক্তি নিশ্চয়ই জার্মানি নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তমহাসাগরীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ এডমিরাল হালসী বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে সম্মিলিত বাহিনী সর্বত্র বিজয়লাভ করিবে। মিত্রপক্ষের আক্রমণের যে কামান গর্জন বর্তমানে সুদূর হইতে শ্রুত হইতেছে, জাপানের উপর উড়ো জাহাজ হইতে বোমা পড়িবার শব্দের সঙ্গে মিশিয়া সেই কামানের ধ্বনি প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। অপরপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন প্রভৃতি কয়েকজন অন্য সুরে কথা বলিতেছেন। মিঃ কার্টিন বলেন, জাপান ভিতরে ভিতরে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যেই শুধু শক্তি সঞ্চয় করিতেছে না, প্রতিরোধ করিবার শক্তিও অর্জন করিতে চেষ্টা করিতেছে। টোকিওর ভূতপূর্ব মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জোসেফ গ্রো বলেন, জাপানকে সহজ মনে করিও না।

সে ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর শত্রু। এ যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এই পৃথিবীব্যাপী সংগ্রামের গুরুত্বকে যদি আমরা উপলব্ধি না করিয়া চলি, তবে আমাদের পক্ষে ভয়ের কারণ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর সম্পর্কিত আর্থিক বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ পার্কিন্স বলেন, জাপান সমরসঙ্গতি পূর্ণ অনেক জায়গা আয়ত্ত করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের মধ্যে জার্মানির আর্থিক অবস্থা এলাইয়া পড়িবে, এমন সম্ভাবনার কোন কারণই দেখা যায় না। জার্মানির সমরসম্ভার উৎপাদনের ক্ষমতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছিয়াছে। বিদেশী সামরিক এবং রাজনীতিকদের সমর-সম্পর্কিত এই ভবিষ্যদ্বাণী বৃষ্টির মধ্যে সেদিন নিখিল ভারত গোরক্ষা প্রচারমণ্ডল কর্তৃক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর ৮২তম জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পণ্ডিতজী সংগ্রামের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেড় বৎসর পরে এই যুদ্ধ শেষ হইবে এবং গণতন্ত্রের পক্ষই জয়লাভ ঘটিবে। পণ্ডিত মালব্যজী কিছুদিন হইল রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন; তাঁহার এই উক্তির মূলে যোগবল হইতে উপলব্ধ জ্ঞান আছে কিনা আমরা বলিতে পারি না। তিনি যে গণতন্ত্রের জয়ের কথা বলিয়াছেন, সেই জয়ে অমাদের দেশ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের পক্ষে উপযুক্ত শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে কিনা, আমাদের ইহাই প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে।

ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি

নববর্ষের প্রারম্ভে যুদ্ধের অবস্থা কেমন ইহা লইয়া গবেষণা অনেক হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ এই সম্পর্কে ভারতের কথাও তুলিয়াছেন। লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্র বলিয়াছেন,—ভারতে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কমিয়াছে; কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে অবস্থা ক্রমাগত খারাপই হইতেছে। মিঃ চার্চিল এবং আমেরী ভারত সম্বন্ধে প্রাণহীন বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যিনি নরমপন্থী, সেই শ্রীযুত রাজাগোপালআচারীকে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দান করা হয় নাই। ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে জনৈক ইংরেজকে ভারতের প্রধান বিচারপতি করা হইয়াছে। সর্বোপরি লর্ড লিনলিথগোর কার্যকালের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রিটিশ সংবাদপত্রের অভিমত অনুসারে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতিতে ভারতের জনমতের বিরুদ্ধাচরণই চলিতেছে। অথচ ভারতীয় সমস্যার জন্য ব্রিটিশ প্রভুরা দোষ চাপাইতেছেন ষোল আনা ভারতবাসীদেরই উপর। মাদ্রাজের ডাক্তার সুব্বারাওন ইহার জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন, "ভারতের কি অবস্থা? জাপ অভিযানের আশঙ্কা এখনও দূরীভূত হয় নাই। রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন আকার ধারণ করিতেছে। কিন্তু মার্শাল স্মাট্স ও মিঃ চার্চিলের ন্যায় দায়িত্বশীল নেতারা ভারতীয় নেতাদের স্কন্ধে দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া নির্বাক। যদি সমাধান প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে, তবে ব্রিটিশের এইরূপ কথা দেওয়া উচিত যে, তাঁহারা সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতাচরণ করিবেন না এবং তদুপযোগী নীতিরও পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় মিঃ স্মাট্স বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র গান্ধীজীর দ্বারাই ভারত সম্পর্কে রাজনীতিক মীমাংসা সম্ভব, এমন কি, ক্রীপস্ দৌত্যের সময়ও স্যার স্ট্যাফোর্ড মীমাংসার জন্য কংগ্রেসেরই মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন। অথচ এখন তাঁহারা কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুবিধা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়া ভারত সম্পর্কে মীমাংসার জন্য তাঁহাদের ঔৎসুক্যের কথা বলিতেছেন।" ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের ঔৎসুক্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের কিছুই বাকী নাই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম করাই তাঁহাদের বর্তমান নীতির উদ্দেশ্য। এ দিক হইতে তাঁহাদের মতিগতির পরিবর্তন না ঘটিলে, শুধু সদিচ্ছাপূর্ণ ফাঁকা কথায় ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না। এই সত্য তাঁহারা যত সত্বর উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ততই মঙ্গল।

পরলোকে বিজয়চন্দ্র মজুমদার

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুপণ্ডিত অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমনে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। বাঙলা দেশের বহুশ্রুত পণ্ডিতদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, পালি ও উড়িয়া ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এসব বিষয়েও বিজয়চন্দ্র একজন প্রামাণিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁহার সুগভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি নানাভাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। দার্শনিকের নিভৃত জীবন তিনি ভালবাসিতেন; অনেকটা সেই কারণেই আধুনিকগণ অনেকে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার অবদানের গুরুত্ব অবগত নহেন। নব্য ভারত, প্রবাসী, ভারতী, প্রদীপ, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে মজুমদার মহাশয়ের অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতা তরুণ সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সারগর্ভ তথ্যমূলক প্রবন্ধাদি ব্যতীত কবিতা ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। বিদ্রূপ, বিকল্প, ফুলশর, কথা ও বীথী, যজ্ঞভস্ম, উদানম্, হেয়ালী, থেরী গাঁথা, তপস্যার ফল, গীত-গোবিন্দ, পঞ্চকমালা, কথানিবন্ধ, কালিদাস, প্রাচীন সভ্যতা, জীবনবাণী, ছিটেফোঁটা, খেলাধূলা, রুচীরা তাঁহার পুস্তকাবলীর মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্য ভারতের আদিম অধিবাসী, শোণপুর রাজ্যের চৌহান শাসকবৃন্দ, প্রাচীন বঙ্গ ভাষার ইতিহাস এবং উৎকল সাহিত্য ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষাতেও তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন; কিন্তু সে অবস্থাতেও বিদ্যাচর্চা এবং সাহিত্য-সেবা হইতে তিনি বিরত হন নাই। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত একজন সুধী সাহিত্যিককে হারাইয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাধারণভাবে বাঙলা দেশের মনীষি-সমাজের যে ক্ষতি ঘটিল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অপ্রকাশিত

[শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

লংকাদ্বীপে ঘুরে খেয়ে বেড়াচ্ছিলুম, উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আদর অভ্যর্থনা, মাল্যদান, অভিনন্দন প্রভৃতির মধ্যে ফাঁক ছিল না। তোমাকে চিঠি লিখব বলে বসেচি অনেকবার, কিন্তু বাধা পেয়েচি তখনি। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে এই কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আজ দেশে ফিরেছি। স্নানাহার শেষ করেই তোমাকে আমার আগমনের খবরটা দিতে বসেচি। আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই বেলা চারটের সময় রওনা হব শান্তিনিকেতনে। তোমার প্রতিবেশিনী এখন আছেন আলমোড়া পাহাড়ে। তিনি স্বস্থানে থাকলে দুই-একদিনের জন্যে তোমাদের পাড়ায় দেখা দিয়ে আসতে পারতুম। কলকাতা অঞ্চলে আজকাল আমার থাকার ব্যবস্থা সংকীর্ণ—বস্তুত এখন আমার বাসস্থান শান্তিনিকেতনেই। যদি কখনো ওদিকে তোমাদের যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে আমাকে আমার স্বক্ষেত্রে দেখতে পাবে। হয়তো শ্রাবণে কোনো এক সময়ে কলকাতার দিকে আমার আগমন ঘটবে—সেই উপলক্ষ্যে একদিন তোমার স্বহস্তপক্ক খেচরান্ন সেবা করতে পারব এই আশা মনে রইল। আমাকে পেটুক বলে কল্পনা কোরো না—কিন্তু তোমাদের হাতের সেবা আমার কাছে লোভনীয়।

দেখা হলে নানা বিষয়ে আলোচনা হতে পারবে—আজ আর সময় নেই। এখনি খবরের কাগজের রিপোর্টারের দল এসে পড়বে। ইতি—২২ জুন ১৯৩৪।

দাদু

ওঁ

"Uttarayan."
Santiniketan, Birbhum.

কল্যাণীয়াসু,

যে পুরাতন কালটা ছিল ভাবরসে অভিষিক্ত, তোমার কলমটির সংগে যোগ সেই কালের। আধুনিক কালটা অত্যন্ত কড়া—তার ব্যবসা মনস্তত্ত্ব নিয়ে—মাধুর্য সে পছন্দ করে না, সে চায় প্রাখর্য। তুমি এ-কালের মন রাখতে পারবে না। তোমার দাদুর বাসা দুই কালের সীমানায়। মনটায় যদি-বা রসাধিক্য হয়, সেটা ছেঁকে আসে চিন্তার ভিতর দিয়ে, কলমটার মুখে যখন পৌঁছয়, তখন অনেকটা ঝরঝরে হয়ে আসে।

তোমার দেওয়া রঙীন রাখী পড়লুম; খুশি হলুম। নাৎনীরা না থাকলে আমার এই জীর্ণ বয়সে রং লাগবে কী করে? একটা শুকনো গাছে ঝুমকো লতা উঠেচে—ফুলে আলো করে আছে। কিন্তু ফুল তো গাছের নয়, সে তার নাৎনীরই, লতা তার জরা আচ্ছন্ন কোরে এই খেলা খেলচে। ইতি ২৫ আগস্ট ১৯৩৪।

দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের পাড়ায় আমার নিমন্ত্রণের খবর তোমাকে দেবদেব করচি এমন সময়ে তোমার আবেদনপত্র হাতে এল।

সমস্তদিন এতরকম কাজে ও অকাজে জড়িয়ে পড়ি যে তোমাদের দাবী মনে এলেও হাতে কলমে সেটাকে রক্ষা করতে পারিনে।

পর্শু শনিবারে সকালের গাড়িতে যাত্রা করব। রবিবারে আমার কর্তব্য পালনের দিন। দাদুর সংবাদ নিয়ো তোমার প্রতিবেশিনীর ঘরে। যদি কোনো কারণে সেদিন যাওয়া না ঘটে তার পরদিনে যেতেই হবে। এবার আমার মেয়াদ বোধহয় অল্প দিনের হবে।

ঘনঘোর মেঘ করে বর্ষণ চলেচে, বাতাস বইচে বেগে। ছায়াচ্ছন্ন দিন—প্রহরগুলো যেন চলা বন্ধ করে চুপচাপ করে রয়েছে—আকাশের ঘাড়িতে দম দেওয়া হয় নি, বেলা যে কত বাইরে চেয়ে বোঝা যায় না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের মনটাও আজ কাজের দাবী মানতে চায় না। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

দাদু

ওঁ

Adyar
Madras

কল্যাণীয়াসু,

মাদ্রাজে যাত্রার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এই আমার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি কর্মজালে জড়িত। শেষ দিন পর্যন্ত আমি সময় পাইনি; এমন কি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব তারো অবকাশ ছিল না। তার শাস্তিও পেয়েছি—মনে আশা ছিল তোমার হাত থেকে পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসব; তার থেকেও বঞ্চিত হলুম। ভালো লাগচে না। যেদিন বেলা আড়াইটার সময় শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলুম সেইদিনই সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে দক্ষিণমুখে রওনা হয়েচি। ঐ অল্প সময়টুকুর জন্যে বরানগরে যাওয়া ঘটল না। সেখানে যাঁর আতিথ্য অবলম্বন করে থাকি তিনিও খুব সম্ভব অনুপস্থিত ছিলেন—তাঁর গিরিডিতে যাওয়ার কথা—হয়তো গেছেন। তিনি এবার দীর্ঘকাল সেই প্রবাসেই কাটাবেন এই রকম জনশ্রুতি। আমি আজ সকালে এসেছি মাদ্রাজে স্টেশনে বিপুল ভিড়, ভেদ করে বেরতে প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত উঠেছিল। স্টেশনের বাইরের রাস্তা বহুদূর পর্যন্ত মানুষের নিরেট পিণ্ড। কোনোমতে ঠেলেঠুলে সামনে একটা গাড়ি দেখেই উঠে পড়লুম—সে অন্য কার গাড়ি। অল্পদূরেই আমাদের গাড়ি ছিল—বহুকষ্টে ঠেলাঠেলি করে সেই গাড়িতে উঠেছি—তার পরে হুঙ্কার দিতে দিতে মন্থর গমনে কোনোমতে যথাস্থানে আসতে পারলুম। আমি স্বভাবত কুনো মানুষ—এমনতরো বিরাট অভ্যর্থনা আমার ভালোই লাগে না। এখানে আমার মেয়াদ বোধহয় দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত। তার পরে তেসরা আবার ফেরবার চেষ্টা করব। পথে ওয়াল্‌টেয়রে দিন দুইতিন থাকবার কথা। তার পরে স্বস্থান। বরানগরের গৃহস্থ ও গৃহিণী যদি প্রবাসে থাকেন তাহলে সে বাড়িতে ওঠা হবে না। চেষ্টা করব তোমাদের দুয়ার থেকেই আমার পার্বনী সশরীরে আদায় করতে। আমার পুরাতন সারথি ছুটিতে আছে, নূতন লোক তোমাদের বাড়ির পথ জানে না। তবু যদি বিঘ্ন না ঘটে তবে পাওনা আদায় করে আসব। আমার নাৎনি-ভাগ্য ভালোই, তৎসত্ত্বেও গ্রহ প্রসন্ন নয়, এই জন্যেই আশঙ্কা করি। ইতি ২১ অক্টোবর ১৯৩৪

তোমাদের দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ভাই ফোঁটার মিষ্টান্ন কবিতা আকারে আমার হাতে এসে পৌঁছল। যথেষ্ট মিষ্টি লেগেচে। কিন্তু শুধু কথায় পুরো তৃপ্তি হবে না। যত দেরিই হোক বাসিভাই ফোঁটার জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। আপাতত তার দিন স্থির করতে পারচিনে। সম্প্রতি কলকাতার অভিমুখে যাত্রা আমার কুষ্টিতে লিখচে না। নভেম্বরের ২৭শে তারিখে যাত্রা করব কাশীতে। সেখানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কিছু বলবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছি।

দাদুর নাৎনী-ভাগ্য খুবই ভালো, কিন্তু শনিগ্রহের চক্রান্তে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা আদায় করতে পারিনে— দূরে দূরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মিষ্টান্ন পড়ে থাকে সংকল্প আকারে, জুতো যদি বা তৈরি হয় তবু পায়ে উঠতে চায় না। মিষ্ট সম্ভাষণ জোটে ডাকঘরের যোগে, মিষ্ট কণ্ঠ থাকে শত যোজন ব্যাবধানে। সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে এমন দ্বন্দ্ব আর কারো দেখা যায় না।—এবার তো গিয়েছিলেম মাদ্রাজের দিকে—সেখানেও যে অপ্রত্যাশিত শুভলগ্নে নাৎনীসমাগম হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি, মাদ্রাজ থেকে ফেরবার পথে ওয়াল্‌টেয়র স্টেশনে যেই নেবেছি একটি মেয়ে এসে গলায় মালা পরিয়ে দিলে। সুন্দর দেখতে, পাঞ্জাবী রীতিতে জামা পায়জামা পরা—সে বল্‌লে আমি আপনার grand daughter। বিজয়নগ্রামের মহারাজার মেয়ে। আমি ওঁদের অতিথি ছিলেম। আমার নতুন নাৎনীর নাম উর্মিলা। আমি তার নানা, ওদের ভাষায় দাদুকে বলে নানা।

যাই হোক আপাতত যেতে হবে কাশীতে। ফিরে আসব ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে। তার পরে আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসব ৭ই পৌষে। সে জন্যে ব্যস্ত থাকতে হবে। তার পরে কোন্‌দিকে কোথায় গতি জানি নে। এই ঘূর্ণিপাকের মাঝখানে কোনো এক মুহূর্তে আমার বরানগরের নাৎনীর কাছ থেকে আমার মুলতবী পাওনা আদায় করে নিতে হবে। কাশীতেও নাৎনীর আশা আছে—হয়তো দর্শন ও দর্শনী মিলবে। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ। ইতি ১৩ নভেম্বর ১৯৩৪

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার দাদুর মতো কুঁড়ে জগতে নেই। ছেলেবেলা থেকে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়াই অভ্যাস করেছে। যতই বয়স হচ্চে এই স্বভাবটা ততই প্রশ্রয় পাচ্চে। অতএব চিঠিপত্র না পেলেও তার স্নেহের সম্বন্ধে সন্দেহ রেখো না। তোমার ভাই রণজিতের যে একটি কবিতা কিছুকাল আগে পেয়েছিলুম, সেটা ভালো লেগেছিল। ভয় হচ্চে পাছে একদা সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বাইরের মহলে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক জুটেচে, নাতিদের মহলেও যদি আবির্ভাব হতে থাকে, তবে তা নিয়ে মাসিক কাগজে ঝগড়া করাও যে চলবে না। তা হোক সাহিত্যক্ষেত্রে সে রণজিৎ হয়ে উঠুক, এই কামনা করি। পিতামহ ভীষ্ম যেমন অর্জুনের কাছে হার মেনেছিলেন, তেমনিই যদি দাদুকে হার মানতে হয়, তাতেই বা দোষ কী।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারিতে বেনারস মেলে কাশীতে গিয়ে পৌঁছব। ৮ই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কর্ম। ৯ই পর্যন্ত সেখানে থেকে ১০ই কোনো এক সময়ে এলাহাবাদে যেতে হবে। সেখান থেকে লাহোর, ফেরবার পথে দিল্লী। তারপরে যখন ছুটি পাব ফিরব স্বস্থানে।

ইতিমধ্যে কাশী অবস্থানকালে যদি কোনো ফাঁকে দেখা দিতে পারো খুশি হব। আমি থাকব হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায়। তোমাদের বাসা থেকে নিশ্চয়ই অনেক দূরে। যদি আসতে বাধা পাও, কিছু মনে করব না। ওখানে অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী থাকেন, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ভার নেবেন। তাঁরই মেয়ে রাণুর আমি ভানুদাদা। ৮ই তারিখে মধ্যাহ্নে আমার বক্তৃতা, ইত্যাদি। ১০ মাঘ ১৩৪১।

তোমার দাদু

ওঁ

নাৎনী,

কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করছি। তাই বেশি কিছু লিখব না, লিখবার সময়ও নেই। শরীরটাও ভালো বোধ হচ্চে না।

বরানগরে আমার বাসা শূন্য। হয়ত দুই-একদিনের জন্যে বোটে গিয়ে বরানগরের ঘাটে থাকতে পারি, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারিনে। তোমার মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করেচি। ইতি—১০ মে ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

নাৎনী,

সেই পুরানো বোটে আশ্রয় নিয়েছি—এই বোটে যৌবনের দিনে সোনার তরীর কবিতা লিখেছিলুম, গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পই এই বোটে লেখা। অনেককাল শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে নদীতে এসেছি—দীর্ঘকাল এরি জন্যে যেন প্রতীক্ষা করেছিলুম। নদী আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। ছেলেবেলায় একসময়ে এই চন্দননগরে ঐ সামনের বাড়িটাতে বৌঠানের আদরে কাটিয়েছিলুম—তখন আমার বয়স হবে আঠারো—সন্ধ্যা-সংগীতের কবিতা লিখছিলুম এইখানেই—মন উড়ে বেরিয়েছে রঙীন স্বপ্নের মেঘলোকে। সেদিন নেই, কিন্তু সেই গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটার উপর সকাল সন্ধ্যার আলোছায়া তেমনিই দুলচে, দক্ষিণের হাওয়ায় ছোটো ছোটো ঢেউগুলি উঠচে চঞ্চল হয়ে। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের নিষ্ঠুর নীরসতা অনেকটা নরম হয়ে আছে—মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপও দুঃসহ নয়—রাত্রিটা স্নিগ্ধ। এই গরমের দিনে এখান থেকে বোলপুরে যাবার সংকল্প নেই। নব মেঘ যখন আকাশে দেখা দেবে তখন সেখানকার কথা চিন্তা করে দেখব। তার আগে কোনো একসময়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার আশা রইল মনে।

তোমার বোনের আঙুলের ক্ষত সেরেছে আশা করি। বেদনায় তার চোখ ছলছল করা মুখচ্ছবি দেখে এসেছি, ভালো লাগেনি। তোমার মীরা পিসির সঙ্গে হয়তো এখন মাঝে মাঝে দেখা হবে। ইতি—৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার দাদুর মেজাজ রাগী নয় একথা মনে নিশ্চয় জেনো। তুমি আমাকে রাগাতে পেরেছ এ অহংকার মনে রেখো না। আমি এখনো অবিচলিতচিত্তে আছি—দেখা হলে হেসে কথাই কব, এবং না দেখা হলে চিঠিতে তাপের মাত্রা এ বছরের জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো চড়ে যাবে না। এই কথা রইল। আমাদের এখানকার পালা শেষের দিকে আসচে—৩০শে জুন পর্যন্ত এই বাড়িতে থাকবার মেয়াদ—তার পরে তোমাদের পাড়ায় কয়েকদিনের জন্যে আশ্রয় নেব। সেই সময়ে তুমি আমার সঙ্গে যত পারো ঝগড়া কোরো, কিন্তু রাগাতে পারবে না—বিশেষত যদি সঙ্গে থাকে ক্ষীরসরনবনীর আয়োজন।

ক্রমেই এখানে লোকজনের উপসর্গ বেড়ে উঠচে—সুতরাং এ শহরটা আর বাসযোগ্য রইল না। রাত্রে গুমট ছিল, সকাল বেলায় ক্লান্ত আছি। ইতি—২১ জুন ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

চন্দননগর
on Board
Houseboat, "Padma."

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে শীঘ্রই। পূর্বেই তো জানিয়েছি মঙ্গল কিম্বা বুধবারে বরানগরে যাব। কিন্তু বেশি দিন থাকবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে শান্তিনিকেতনে রওনা হব। অনেকদিন সেখানে অনুপস্থিত, কাজ আছে বহুৎ। বউমারা ফিরে আসচেন বিলেত থেকে—তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।
২৬ জুন ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

শরীর মন অত্যন্ত অলস হয়ে পড়েছে—কিছু কাজ করতেই হয়, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায়। চিঠিপত্র প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আছি। অতএব এখন থেকে কথাবার্তা জমতে থাক, তার পরে যখন দেখা-সাক্ষাৎ হবে তখন মন খোলসা করে নেওয়া যাবে। এমন দিন ছিল যখন চিঠি লেখার উৎস ছিল অবারিত—মন ছিল তাজা, কলম ছিল ক্ষিপ্রগতি—তখন তোমরা ছিলে কোথায়? এসেছ বিলম্বে—ভোজ হয়ে গেছে নিঃশেষে, ভাণ্ডার হয়েছে শূন্যপ্রায় তাই তোমাদের নিরাশ হতে হয়। স্বভাব আমার কৃপণ নয়, শক্তি আমার ক্লান্ত। স্নেহ করি তোমাদের, কিন্তু যথোচিত প্রকাশ করবার মতো সম্বল কোথায়? নদীর খাত রয়েছে গভীর কিন্তু নদীর ধারা হয়েছে ক্ষীণ—তাই স্রোতের চেয়ে বালিই দেখা যায় বেশি।

জুতোর কথা লিখেছ। সেই জুতো পরেই তো চলাফেরা করচি—জানবে কী করে? আমার পা দুটো রয়েছে বোলপুরে তোমার চোখ দুটো রয়েছে বরানগরে—তোমার জুতোজোড়া যে অনাদৃত হয়নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। অতএব যখন দেখা হবে তখনকার জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

আমার বয়সে শরীরের কথাটা না তোলাই উচিত। তহবিল যার তলায় ঠেকেছে তার আর্থিক অবস্থা আলোচনা করাটা ভদ্রতা নয়—কিন্তু তোমাদের বয়স অল্প, শরীর খারাপ করাটা তোমাদের পক্ষে অকর্তব্য। অতএব যত শীঘ্র পারো সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে।

এ বৎসর বর্ষা মুখভঙ্গী করচে কিন্তু বর্ষণ করচে না—চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইতি—২৯ জুলাই ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমি রাগও করচি নে, শোকও করচি নে, ঝগড়া করাও আমার স্বভাব নয়। সংসারের এক প্রান্তে বিশ্বধরণীর কোলের কাছে সরে এসে বসেছি। মেঘ ঘনিয়ে ঘনিয়ে আসচে, বৃষ্টি ঝরচে, নতুন কচি পাতায় রোমাঞ্চিত গাছগুলোর ডাল দুলে উঠচে পূবে হাওয়ায়। বারান্দায় একলা বসে চেয়ে চেয়ে দেখি, মনটা ভরে ওঠে, জীবনের অপরাহ্নের ছায়ায় মুলতানের সুর লাগে—অন্তরে অন্তরে মুক্তি কামনা করি। কয়েদীরা যখন জেলখানার বাইরে কাজ করতে আসে, তখনো সেই অপেক্ষাকৃত ছুটির মধ্যেও তাদের পায়ে বেড়ি থাকে—জীবনযাত্রার গোলকধাঁধা থেকে বাইরে এসেও যদি পায়ের বেড়ি সঙ্গে করে আনি তাহলে কয়েদীর পক্ষে খোলা আকাশও জেলখানার সামিল হয়ে দাঁড়ায়—সে আমি চাইনে। ইতি—১২ অগস্ট ১৯৩৫।

দাদু

(ক্রমশ)

বিযুক্ত

সমীর ঘোষ

কাজ শেষ হোয়ে গেছে। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে রোদের ঢেউ তখনও লেগে আছে। সমস্ত দিনের পরও মনে হয় সূর্যের তেজ কিছুমাত্র কমেনি—সামান্যমাত্র সৌম্যভাব নেমে এসেছে।

আকাশের দিকে এ সময়ে চোখ তুলে কেউ তাকায় না—মানে তাকাবার অবসর কারুর নেই। সুমন্তরও ছিল না। তার চোখ কল্পনা করে দেখছিল মুক্তা এসেছে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর তার সত্যি ভালো লাগে যেদিন মুক্তা এসে কারখানার গেটে দাঁড়ায়।

গেটের বাইরে আসতে আসতে সুমন্ত চারপাশের জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। মুক্তাকে সে দেখতে পেলো না। তার বদলে ছকু মিস্ত্রীর সংগে তার দেখা হোলো। সুমন্ত উৎফুল্ল হোয়ে উঠলো—ছকুও তাই। বহুদিনের ভাব দুজনের—একসংগে অনেক কাজের কাজী তারা।

—কিরে সুমনত্ হোঁচট খাস কেন? ছকু ভাঙ্গা বাঙলায় সুমন্তকে অভ্যর্থনা করলো।

—নেহিরে, আমার লেড়কীটা—

—হ্যারে রে, কৌন মুক্তা, নেহি আয়া তো। বহুত আচ্ছা, চল। পগার কতো হোল?

—চল্লিস রুপেয়া।

—বহুত আচ্ছা হুয়া, চল।

বহুদিন পরে সুমন্তকে সঙ্গী পেয়েছে, ছকু মিস্ত্রীর চোখে যেন মদের নেশার রং এখন থেকে ধরে গেল। প্রাণভরে আজ মদ টানা যাবে। দুজনে ভাগাভাগি করে ভাঁড় থেকে মদ খেতে যে কি আরাম, মনে মনে সে কথা ভেবে নিয়ে ছকু গুন্ গুন্ করে গানের সুর ভাঁজতে আরম্ভ করলো,...লালে লাল হো ৬

সুরের ছোঁয়াচ সুমন্তরও লাগলো—সোহাগীর চোখের জল দিতে লাগলো। হো...লালে লাল অথবা মরুক, যা হবার হোক

দুজনের এমন মিলিত গা যাবেই, যে পাড়ায় ভরত আছে,
সুর কাটলো। কলে রেখে যাবে না।

ভাটিখানা যাবার প জল কিন্তু শুকোলো। সুমন্তর
ছোট মেয়ে হন্ হন্ কদন সে পার হোয়ে গেল। কিছুদিন
হবে। এদের দুজনের ন্ত তখন এই কারখানায় একটা কুলীর
উঠলো, ক্যারে মুক্তা? প্রথম প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত লাগলেও
পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মসৃণভাবে

গভীর কালো চোপরে পরিবর্তনের পালা এলো। এখান
বললো, বাপুজীকো পাশআর রূঢ়ভাব, সোহাগীর ভীরু আর
জড়িয়ে ধরলো। নবরত ঘা মারতে লাগলো নির্দয়ভাবে।

সুমন্ত হা হা করে সোহাগীর ভেতর থেকে বিদায় নিলো,
জামাকাপড় সব নষ্ট হোয়ে সত্তা আর শক্তি নিয়ে। যতোই গ্লানি
লাগা— আমার কিন্তু এইজন্যেই এখানকার

আরো নিবিড় করে শিক্ষায় যারা সমুন্নত নয়, সংস্কৃতি
বাধা দিলো, যানে দেও বাপর নি, পেটের অন্ন জোগাড়ের জন্যে

মুক্তার স্বভাব সুমন্ত জানে। আর কোনো কথা না বলে দুহাত দিয়ে সে মুক্তাকে কোলে তুলে নিলো।

সুমন্তর গলায় ডান হাত লাগিয়ে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর তেলকালি মাখা গালের ওপর নিজের স্মিতগাল রেখে মুক্তা জিগ্যেস করলো, পগার হয়নি বাপুজী?

—হোয়েছে মা।

—আমার পুতুল কই, কাঁচের চুড়ি? টক্‌টকে লাল ঠোঁট দুটো মুক্তার ফুলে উঠলো, কালো গভীর চোখের তীক্ষ্ন ভ্রূর নীচে গাম্ভীর্য মাথা চাড়া দিলো।

সুমন্ত হাসলো, মুক্তার রাগ করার ধারাই এই। সাত বছরের মেয়ে, আঘাত পেলে এ কাঁদে না, অভিমান করার সময় মুখ ঘুরিয়ে নেয় না, রাগলে একবারে কথা কয় না। সুমন্ত ভেবে পায় না—কার কাছ থেকে মুক্তা এই নিঃশব্দ বিদ্রোহ শিখেছে।

সারাদিনের লোহা কাটায় ক্ষতবিক্ষত, তেল আর কালিতে নোংরা হাতের তালু দিয়ে সুমন্ত মুক্তার মুখখানা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে বললো, ভুলে গেছি মা, চল্ না এখনি কিনবো।

মুক্তা কোনো কথা বললো না।

ছকু এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের এই কার্যকলাপ দেখছিল। রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। এই মেয়েটাকে সে মোটে দেখতে পারে না। মেয়েটা হোয়েছে যেন তার আর সুমন্তের বন্ধুত্বের শত্রু। আজ বোধ হয় এক বছরেরও বেশী মেয়েটা সুমন্তকে আগলে বেড়াচ্ছে। অনেক করে ছকু ভেবে দেখলো, তার মনে হোল—বোধ হয় মাত্র একটা দিন সে এই এক বছরের মধ্যে সুমন্তকে তার ভাটিখানার আমোদে সঙ্গী পেয়েছে। মাত্র একটা দিন। তাও সেদিন সুমন্ত বেশিক্ষণ থাকেনি। সবে নেশা জমতে শুরু হোয়েছে, এমন সময় সুমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় দেখে ছকু চীৎকার করে ওঠে,—এই কোথা গ্তা?

না, পেছন দিকে মুখ না ফিরিয়ে সুমন্ত উত্তর দয়, ঘর যাতা,
অধিক মুক্তার বেমার হুয়া। —তারপরে সুমন্ত বেরিয়ে যায়।
পৃথিবী ও সুমন্ত চলে গেল মুক্তাকে নিবিড় করে বুকের সংগে
জন্যে যে জাব্বার পকেট থেকে মাইনের সমস্ত টাকা বের করে
কোনো চিন্তা র দিয়ে, ছকুকে সে হাসি মুখে বললো, যাতা
হলেও আমি পাকড়ায়া—
সোহাগীর সম্বন্ত কথার ওপর গম্ভীর গলায় একটা
প্রথম থেকেই আমার থাবার্তা শেষ করলো। তারপরে হন্ হন্
নায়িকা না হোতে পারে ল গেল। সমস্ত পৃথিবীটার ওপর
থাকবে। গল্প-লেখক হি। তার নিজেরো তো তিনটে ছেলে,
সুযোগ দিও না, বাহবা নি র জন্যে তো সে এই এক ভাড় মদ
অসময়ে সমর্পণ করো না। বন্ধ করে নি।
তাই স্থির করেছি, কোনে ড়—ছকু বোধ হয় সেইজন্যে
না, কোথাও পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে
সোজা কথায় সেই জন্যে আগে বলে

কারখানার গেটের বাজারে এসে সুমন্ত মুক্তার পছন্দ মতো পুতুল কিনলো, চুড়ি কিনলো। চুড়ি হাতে নিয়ে মুক্তা সুমন্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল চুড়ি পরিয়ে দেবার জন্যে।

সুমন্ত বললো, ঘরে চল্, তোর মা পরিয়ে দেবে।

—না, তুমি দাও বাপুজী।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সুমন্ত হাতে চুড়ি নিলো, কিন্তু কি যে সে করবে কিছু ভেবে পেলো না। মেসিনে সে লোহা নিয়ে খেলা করতে মোটেই বিপদে পড়ে না, কিন্তু এই পলকা কাঁচের চুড়ি নিয়ে সে বিপদে পড়লো। শক্ত লোহার কাজ তার কাছে জলের মতন পরিষ্কার, কিন্তু দুর্বল কাঁচের চুড়ি কেমন করে পরাতে হয় ছোট হাতে, এটা তার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

হঠাৎ সুমন্তর বিপদ কাটলো। চুড়িওয়ালী মুক্তার দিকে এগিয়ে এলো, আধ-ভাঙ্গা বাঙলায় বললো, হামি দিচ্ছি গো।

সুমন্তর মুখের দিকে চেয়ে মুক্তা কি বুঝলো, কে জানে, চুড়িওয়ালীর কাছ থেকে সে আর কোনো কথা না বলে, ছোট ছোট দু'হাতে চুড়ি পরে নিলো।

ঘরে এসে মুক্তা আরো নিবিড় করে সুমন্তকে জড়ালো। চান সেরে, খাবার খেয়ে সুমন্ত খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো এক পয়সার একটা চুট্টা ধরিয়ে। মুক্তা তার মাথার ভিজে চুল নিয়ে খেলা করতে করতে অজস্র কথা বলে চললো, সমস্ত দিনে তার জীবনে কি ঘটেছে, তার কাহিনী শোনাতে লাগলো। মুক্তার এই ছোট ছোট হাসি আর কথার কাকলী শুনতে শুনতে সুমন্তর কেমন যেন নেশা ধরে গেল। মুক্তাকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কপালে একটা চুমো খেলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সুমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। সোহাগী মুক্তার কাছ থেকে আজকের বাজারের শেষে মাইনের যে সমস্ত টাকা ছিলো ধমকে কেড়ে নিচ্ছে। অবশ্য সে ধমক চাপা গলায়, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যাতে সুমন্তর ঘুম না ভাঙ্গে। মুক্তার যে কোন আপত্তি আছে তা নয়, তবে ব্যাপার হোচ্ছে, ওই থেকে তার দুটো পয়সা চাই, সে কাঠিবরফ খাবে। সোহাগীর আপত্তি হোচ্ছে দুটো পয়সা দিতে। একেতো পুতুল আর চুড়িতে মেয়ে কতকগুলো পয়সা খরচ করে এসেছে, ওপর আবার দুটো পয়সা কাঠিবরফের জন্যে -এক পয় কাঠিবরফ কেনা যায় না!

মুক্তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটা পয়সা নিয়ে পয়সা সে অনায়াসে আদায় করতে পারতো সুমন্তর ঘুম ভাঙ্গিয়ে। কিন্তু সে তা কর করে না। এইটাই হচ্ছে মুক্তার মস্ত বড় এই জন্যেই মুক্তাকে অতো বেশী প্রশ্রয়

অনেকদিন আগে যেসব অ একসঙ্গে সাজিয়ে নিলে ইতিহাস বুকে মানুষের ইতিহাস যদি তবে প্রত্যেক মানুষের জীব না কেন, সে যে তার স্থান না।

সুমন্তর জীবনেও তাই কিছু ইতিহাস তৈরী হয়েছে ছেলেবেলায় বিশেষ কিছু না ঘটলেও, তার যৌবনের প্রথম ধাপটা বেশ স্মরণীয়। শক্তিমত্ততা আর উচ্ছৃঙ্খলতা তখন সুমন্তকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল। সেই সীমানাহীন খেলার ঝোঁকেই সুমন্ত সোহাগীকে বিয়ে করে আনে।

সোহাগীর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ভরতের। সবই ঠিকঠাক ছিল। বিয়ের আয়োজন যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় টাকাকড়ি নিয়ে একটা সামান্য কথায় কি যেন গণ্ডগোল বাধলো। পরিণামে সোহাগীর বাপ বেঁকে বসলো ভরতের সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। সুমন্তরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। ভরতের সঙ্গে পারিবারিক ঝগড়া সুমন্তদের বহুদিনের। আজ সেই ঝগড়ায় তারা বিজেতার ভূমিকা গ্রহণ করলো। সামান্য একটা দাঙ্গার পর ভরতদের স্বীকার করতে হোল—তারা বিজিত। ভরতের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলার, ভরতের বৌ হওয়ার কল্পনাকে ঘরের দেয়ালে চুণকাম করে সাদা রং দিয়ে সমস্ত ময়লা মোছার মতন করে মুছে ফেলে সোহাগী সুমন্তর ঘর করতে এলো।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা যদি সুমন্তর পক্ষে সম্ভবপর হোত, তবে সে বিয়ে হবার পরই ধরতে পারতো, সোহাগী তার দুহাতের বাঁধুনীর ভেতর থেকে পিছলে যায়, ধরা দেয় বটে, সে ধরা দেওয়ায় কোন প্রাণ নেই, যেন জরুরী আইনে বন্দী ধরা পড়েছে মাত্র।

কিন্তু আগেই বলেছি, মনস্তত্ব নিয়ে সুমন্ত মাথা ঘামায় না। লড়াই জেতার জন্য তার সোহাগীকে বিয়ে করা দরকার ছিল। সেই কাজ যখন হোয়ে গেল, তখন কাকে নিয়ে জয় হোল সে কথা অনায়াসে সুমন্ত ভুললো। তবে একদিন নেশার আসরে বন্ধুবান্ধবদের আলোচনায় তার মনে জাগলো ঃ যদি সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা না যেতো, তবে আজ সোহাগীর ভরতেরই বৌ হওয়ার কথা। ছেলেবেলা থেকেই সে নাকি তার জন্যে প্রস্তুত

ধীদের অবস্থা

র চোখে রংএর চশমা পরিয়ে দিয়েছে

য গেছে, ভরতের সঙ্গে

সাড়া পেয়ে সে ফিরে এলে

না, তার কাছে যে যুক্তি

াবশ্যক। সুমন্ত সোহাগী

৬

চারের ইতিহাস এই এ

রের আবেষ্টনীতে নিজে

মন্তর শাসন বা অত্যাচা

সে যে মুহূর্তে সম

রের মুহূর্তে তার

য়ে করার কাহিনী। নেশ

য়ে বুঝতে পারতো, রাত্রি

বিড় করে বুকে চেপে ধর

সে যতোই আধিপত্য বিস্ত

াচি নে, ঝগড়া করাও আমার স্বভাব নয়। সংসারের এক প্রান্তে ঘনিয়ে আসচে, বৃষ্টি ঝরচে, নতুন কচি পাতায় রোমাঞ্চিত া বসে চেয়ে চেয়ে দেখি, মনটা ভরে ওঠে, জীবনের অপরাহ্নের করি। কয়েদীরা যখন জেলখানার বাইরে কাজ করতে আসে, থাকে—জীবনযাত্রার গোলকধাঁধা থেকে বাইরে এসেও যদি পায়ের আকাশও জেলখানার সামিল হয়ে দাঁড়ায়—সে আমি চাইনে। ইতি—১২

করুক না কেন, সমস্ত সমর্পণ করেও সোহাগী তাকে আশ্চর্য-রকম ফাঁকি দিচ্ছে—কে একজন যেন সোহাগীর আপনার লোক হয়েছে, সুমন্ত সেখানে বাইরের লোক মাত্র। বিদগ্ধজনেরা সুমন্তর এই অনুভূতিকে কোন্ পর্যায়ে ফেলবেন অথবা কি আখ্যা দেবেন জানি না, সুমন্ত কিন্তু একটা রুদ্ধ আক্রোশ বুকের মধ্যে পুষে সোহাগীর কাছে ফিরে আসতো, তারপর যতক্ষণ না নেশার রং বৈচিত্র্য তার চোখ থেকে মুছে যেতো, ততক্ষণ সোহাগীর দেহটাকে সে যেন অত্যাচারে অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো। তের থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে সোহাগী মুখ বুজে সেটা সহ্য করেছে। এমনি অত্যাচার হয়তো আরো বহুদিন ধরে সোহাগীকে সহ্য করতে হোত। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ যদি সুমন্তদের কিছু পরিমাণের থাকতো, তবে সোহাগীর সহজে নিস্তার মিলতো না। তা ছিল না বলেই সোহাগীর এক্ষেত্রে পরিত্রাণ মিললো। সুমন্তকে তার ঘরের লোকেরা বুঝিয়ে দিলো, ভরতদের হারিয়ে দিয়ে সোহাগীকে ঘরে আনা হয়েছে বলে, তার ভারও যে ঘরের লোক বইবে, তার কোন মানে নেই। সুমন্তর মতো জোয়ানের কাজ হোচ্ছে উপায় করা, বৌকে খাওয়ানো।

অনেক রাগারাগি, হাতাহাতির পালা শেষ হোয়ে গেলে, একদিন সুমন্ত বুঝলো, সোহাগীর ভার তাকেই বইতে হবে। সোহাগীর ওপর অত্যাচার করতে সমস্ত পরিবারের মধ্যে তার যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনি তার দায়িত্বও আছে সোহাগীকে বাঁচিয়ে রাখার।

যেদিন সুমন্ত এই কথা বুঝলো, সেদিনই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। অন্য সকলে এক্ষেত্রে যা করে, সুমন্ত তা করলো না। অর্থাৎ সোহাগীকে সে সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে সঙ্গে নিয়ে গেল।

সোহাগী সেদিন সুমন্তর সঙ্গে আসতে চায়নি। তার আপত্তি, অজস্র কান্না যে তার সঙ্গে শত্রুতা করলো, সে কথা বোঝবার বয়স তখনও তার হয়নি। সোহাগীর চোখের জল দেখে সুমন্ত ঠিক করেছিল, বাঁচুক অথবা মরুক, যা হবার হোক সোহাগীকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেই, যে পাড়ায় ভরত আছে, সেখানে সে কখনই তাকে ফেলে রেখে যাবে না।

সোহাগীর চোখের জল কিন্তু শুকোলো। সুমন্তর অত্যাচারে ভয় পাবার দিন সে পার হোয়ে গেল। কিছুদিন এপাশ ওপাশ ঘুরে সুমন্ত তখন এই কারখানায় একটা কুলীর কাজ জোগাড় করেছে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য অদ্ভুত লাগলেও সোহাগী চারপাশের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মসৃণভাবে খাপ খাইয়ে নিলো। তারপরে পরিবর্তনের পালা এলো। এখানকার আবহাওয়ার ঋজু আর রূঢ়ভাব, সোহাগীর ভীরু আর সঙ্কুচিত মনের ওপর অনবরত ঘা মারতে লাগলো নির্দয়ভাবে। অবগুণ্ঠিতা কিশোরী সোহাগীর ভেতর থেকে বিদায় নিলো, জাগলো নারী, পরিপূর্ণ সত্ত্বা আর শক্তি নিয়ে। যতোই গ্লানি আর যতোই কুৎসা থাক, আমার কিন্তু এইজন্যেই এখানকার আবহাওয়া ভালো লাগে। শিক্ষায় যারা সমুন্নত নয়, সংস্কৃতি যাদের সংস্কৃত, সভ্য করে নি, পেটের অন্ন জোগাড়ের জন্যে যাদের দিনের উদয়, অস্ত কেটে যায়, তাদের এই বে-পরোয়া ভাব মনের ওপর সত্যি আঁচড় টানে। আমার শিক্ষা, আমার সংস্কৃতি আমাকে যে আলো দান করেছে, তার চাইতে অনেক বেশি আলো ওদের আছে। নিজেদের দাবী বজায় রাখতে বার বার ওরা জেহাদ ঘোষণা করেছে। সেই যুদ্ধে যে সকল সময় জিতেছে তা নয়, তবুও ওরা নিজেদের মান বজায় রেখেছে, জানিয়ে দিয়েছে ওদের উপেক্ষা করা চলে না, যেমন আমার মতোন শিক্ষিত, সভ্যকে করা যায়। আজকের ঘূর্ণাবর্তনে এই শ্রমিক উপনিবেশের হাতুড়ীর দাম, আমার কলমের চাইতে শুধু বেশি নয়, বেশ বুঝতে পারি, যদি বাঁচা যায় তো ওই হাতুড়ীর সাহায্যে বাঁচতে হবে।'

কাজেই এইখানে এসে যে সোহাগীর চোখের জল শুকোলো, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কোমল মাটিতে, সবুজ গাছের ঘন শ্যামল ছায়ায়, পুকুরের কাকচক্ষু কালোজলে, যে নমনীয়তা জড়িয়ে ছিল, সোহাগীর ওপর যারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা মিলিয়ে গেল। এখানকার কারখানার সকালে কাজে ডাকার তীব্র বাঁশী, প্রচণ্ড রোদে পাথরের উত্তাপ, লাল ধুলোর আবিলতা মনের সমস্ত গোপনকেন্দ্রে অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের চিন্তাধারাকে চোখের সামনে এনে দাঁড় করার সমস্ত ইঙ্গিত শেষ হয়, যতোই রূঢ় হোক না কেন, প্রকাশ্য-ভাবে চলবার পথ মানুষ বেছে নেয়। কোমল মাটি, সবুজ ছায়া, কালোজলে সে যেমন অভিভূত হোত, নিজেকে ছুঁতে পারতো না, এখানে তা হয় না।

সেই জন্যেই একদিন নেশার রঙীন চশমা পরে, সুমন্ত সোহাগীর ওপর অত্যাচার করতে এসে ঠোক্কর খেয়ে গেল। সেই-দিন সোহাগী শুধু মুখে নিষ্ক্রীয় প্রতিবাদ জানালো না, সক্রিয় হোয়ে সুমন্তকে বাধা দিলো, যেন বুঝলো--অত্যাচার সহ্য করার দিন তার চলে গেছে—আত্মপ্রতারণা সে করুক না করুক, আত্মরক্ষা সে করবে।

সোহাগী কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারলো না। স্বাধীনতা কেউ তাকে দেয়নি, স্বাধীনতা সে উপার্জন করেছিল। ঠিক জানি না, সেই জন্যেই বোধ হয় সে মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেল—নিজের অধিকারের সীমানা পার হোয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হোয়ে পড়লো। পৃথিবীর জনারণ্যে সোহাগী হোচ্ছে অত্যন্ত সাধারণ সত্ত্বা। তার জন্যে যে এতো কথা লেখবার কোন প্রয়োজন আছে, কোনো চিন্তাশীল তা মানবেন না। চিন্তাশীল না হলেও আমি নিজে সে কথা মানি। কিন্তু মানি বলেই সোহাগীর সম্বন্ধে এতো কথা বলছি। কেননা, প্রথম থেকেই আমার মন বলে দিয়েছে, তোমার গল্পে সোহাগী নায়িকা না হোতে পারে, কিন্তু অনেকখানি জায়গা তার দখলে থাকবে। গল্প-লেখক হিসাবে সেই কারণে তুমি তাকে অল্প সুযোগ দিও না, বাহবা নিতে গিয়ে তার চরিত্রকে মৃত্যুর কবলে অসময়ে সমর্পণ করো না।

তাই স্থির করেছি, কোনো কথা চাপবো না, কম করবো না, কোথাও পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে গল্পের গতি বেঁকাবো না। সোজা কথায় সেই জন্যে আগে বলেছি, স্বাধীনতা সোহাগী

উপার্জন করলো, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারলো না। শরত কি বসন্ত নয়, হেমন্তের একটা ম্লানায়মান অপরাহ্নে, কুয়াশার পর্দার ভেতর দিয়েই সুমন্ত আবিষ্কার করলো, সোহাগী তার মন অন্যত্র সন্নিবেশ করেছে।

মুক্তার বয়স তখন এক বছরের কিছু বেশী। অতিরিক্ত সময় কাজ করে সুমন্তর ফেরার কথা প্রায় সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি। বেশির ভাগ দিনই কিন্তু সে কাজ থেকে বেরিয়ে ভাটিখানায় যায়। সেদিন কাজ থেকে পালাবার সুযোগ সে করে নিয়েছিলো। তাই টিকিট ফেলার ব্যবস্থা করে পাঁচটার কিছু পরেই সে ঘরে ফিরে চললো। সময়টা হোচ্ছে হেমন্তর শেষের দিককার দিন। অপরাহ্নের শেষে অন্ধকার না নামলেও কুয়াশা জড়িয়ে যে সন্ধ্যা নেমে আসে, তাকে অনায়াসে অন্ধকারের পর্দা বলে ধরে নেওয়া যায়।

সুমন্ত ঘরে ঢুকতে গিয়ে যেন ধাক্কা খেলো। বিছানায় সোহাগী অত্যন্ত শিথিল আর অসংযত ভঙ্গীতে পড়ে আছে, আর তারই বুকে বুক মিশিয়ে সামনের ঘরের জীবন মিস্ত্রী কিসের গল্প বলছে। দুজনেই হাসছে, দুজনের ভঙ্গীতে বোঝা যায় সাধারণ আলাপের চাইতে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেশী।

সুমন্তকে দেখে জীবনের মুখ সাদা হোয়ে গেল। একটা অস্ফুট শব্দ করে সোহাগী বিছানার ওপর উঠে বসলো।

চোখে সেদিন নেশার রঙীন চশমা ছিল না। থাকলে কি হতো বলা যায় না। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু 'জীবনে' বলে সুমন্ত সামনের দিকে এগোতেই দরজা ফাঁক পেয়ে সুমন্তকে এক ধাক্কা মেরে জীবন বাইরে চলে গেল। সুমন্ত তার পেছন ধরতে গিয়ে কি মনে করে থমকে দাঁড়ালো। তারপরে কোনো কথা না বলে দরজায় খিল তুলে দিলো।

সোহাগী ততক্ষণে কাপড় সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে কোনো কথা বলার আগে সুমন্ত তাকে সজোরে এক লাথি মেরে ঘরের কোনে পাঠিয়ে দিলো। অনেকদিন সে জীবন আর সোহাগীর ব্যাপার শুনছে। কিন্তু এমন সামনাসামনি ভাবে আগে সে কোনোদিন কিছু দেখে নি। আর একটা লাথি সুমন্ত মারলো। তারপর আর সুযোগ পেলো না। সোহাগী কোমরে কাপড় জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, মুখর হোয়ে সে সুমন্তকে আক্রমণ করলো।

আগেই বলেছি, সুমন্তর চোখে সেদিন নেশার রঙীন চশমা ছিল না। থাকলে বোধ হয় সোহাগীকে সে খুন করতো। বর্তমানে ব্যাপার হোল অন্যরকম। সোহাগীর আক্রমণে সে থমকে দাঁড়ালো সূর্যোদয়ের আগে থেকে কারখানায় ছোটার ক্লান্তি আর সূর্যাস্তের পর অবসরের এই মুহূর্তে সোহাগীর এই আক্রমণের রূঢ়তায় সে যেন সমস্ত শক্তি, রাগের আতিশয্যে কাজ করার মতো স্নায়ুর উত্তেজনা হারিয়ে ফেললো। ঘুমন্ত মুক্তা ততোক্ষণে জেগে উঠে কান্না লাগিয়েছিল, সেই কান্নার আওয়াজ যেন তাকে অবসাদগ্রস্ত, অভিভূত করে ফেললো। সে আর কোনো কথা সোহাগীকে না বলে এগিয়ে গিয়ে মুক্তাকে কোলে তুলে নিলো। তার দুহাত তখনও কালিমাখা।

এর পরে বোধ করি বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই যে, সোহাগীকে সুমন্ত জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এ গল্প যারা পড়বেন শুধু তারাই নয়, আমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হই, কেমন করে সুমন্ত আর সোহাগীর জীবনে এটা সম্ভবপর হোতে পারে।

সে যাই হোক, সেদিন সেই হেমন্তের মলিন অপরাহ্ন থেকে মুক্তা সুমন্তকে ঘিরে আছে।

সুমন্তও ধীরে ধীরে অনেক বদলেছে। বদল হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হোলে চারপাশের আবহাওয়া খাপছাড়া হোয়ে যায়। সেদিন হেমন্তের সেই শেষ-বেলায় সমস্ত শক্তি হারিয়ে, সুমন্ত যখন মুক্তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার কান্না থামিয়ে দিয়েছিল, সেই দিনের সেই মুহূর্ত থেকে সুমন্ত কেমন যেন বুঝলো, মুক্তা যদি পৃথিবীতে বাঁচবার অবকাশ পায় তো, তারই ছায়ায় পাবে। সোহাগী মুক্তার মা হোতে পারে, কিন্তু মাতৃত্ব দিয়ে মুক্তাকে সে আগলাবে না। সেই জন্যেই যে কাজটা অনেক দেরিতে হোত, সেইটা খুব শীঘ্র আরম্ভ হোল; অর্থাৎ সুমন্ত বদলাতে লাগলো।

নবোন্মেষিত চেতনা আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে সোহাগী অনায়াসে সুমন্তর এই পরিবর্তন ধরে ফেললো। ধরে ফেলে সে সেইখানে থামলো না, সেই পরবর্তনকে নিজের কাজে লাগালো।

অন্যান্য দিনের কথা ছেড়ে দিলেও মাইনে যেদিন মিলবে, সেদিন মিস্ত্রী আর কুলীদের ভাটিখানায় যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। ভিতরের ব্যাপার কি বলতে পারি না, বাইরে থেকে যতোবার দেখেছি, ততোবার মনে হোয়েছে, এ যেন অভিশাপ। কে এই অভিশাপ এদের দিয়েছিল জানি না, আর কেন এই অভিশাপ-শান্তির ব্যবস্থা হয় না, তাও বলতে পারি না। পুরাণ খুলে দেখি, অভিশাপ কাটানোর জন্যে অনেক যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা হোয়েছে, কিন্তু এদের ওপরের এই অভিশাপ এড়ানোর জন্যে কারখানার কিছুদূরের ভাটিখানা যে কেন তুলে দেওয়া হয় না, তা কোন সভ্য সরকার মানুষকে খুলে বলবে? বিজ্ঞানীরা বোধ হয় এখানে একদম অসহায়, শান্তির সদিচ্ছা নির্বাপিত।

পকেটে টাকার অভাব মাইনের দিনে মিটলে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সুমন্তও ছুটতো। অন্যান্য দিনও সে যেতো, তবে এই দিনটার বিশেষত্ব ছিল, যতো ইচ্ছে খেয়ে জুয়াখেলা চলতোঃ পয়সার জন্যে কিছু আটকাতো না। রঙ্ বেশী গাঢ় হোয়ে জমতো যদি ছকু সঙ্গে থাকতো। ছকুই তাকে প্রথম দিনে পথ দেখিয়ে এনেছিল কি না।

যতো ইচ্ছে ভাঁড় খেয়ে আর অন্যান্য স্ফূর্তি করে সুমন্ত যখন ঘরে ফিরে যেতো, তার পকেটে তখন টাকার পরিমাণ যথেষ্ট কমে যেতো। যা থাকতো, তার সঙ্গে অতিরিক্ত খাটুনীর পাওনা মিলিয়ে নিলে সংসারটা মোটামুটি একরকম চলে যেতো, কিন্তু সোহাগীর বিলাসিতা করার অথবা প্রসাধনের জন্যে কিছু খরচ করার পয়সা বেরোত না।

এমন করে পয়সার জন্যে ছটফটিয়ে সোহাগীর দিন যখন কেটে চলেছিল, সেই সময় জীবনকে নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটলো, তাতে সুমন্তর সঙ্গে তার সকল সম্বন্ধের শেষ হোয়ে গেল বললেই

হয়। সুমন্তর কাছে কোনোদিন কিছু চেয়ে আবদার সে করে নি, বা আদর নেয় নি বটে, কিন্তু আজ সে বুঝতে পারলো—আবদার বা আদর যেদিন না ছিল, সেদিন তার সুমন্তর ওপর যে জোর ছিল, আজ তাও নেই। আজ যদি সুমন্ত বলে—খেতে দিতে সে পারবে না, তবে সোহাগীর কোনো কথা বলবার বা প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। একথা সোহাগী মনে প্রাণে জানলো বটে, তাই বলে দমে সে গেল না; কেননা, ভয় পাওয়ার দিন সে পেরিয়ে গেছে। তবুও সুমন্তর কাছে কোনো কিছু চাইতেও সে পারলো না।

অবস্থা যখন এই, সেই সময় একদিন সে লক্ষ্য করলে, মাইনের দিন হোলেও কারখানা থেকে সুমন্ত আজকাল সোজা-সুজি ঘরে চলে আসে, মদ খেতে ভাটিখানায় যায় না।

বিস্ময়ে সোহাগী অভিভূত হোয়ে গেল। নিজেকে সে কিছুতে বিশ্বাস করতে পারলো না—তার এইখানকার দু' বছরের জীবনে সে এমনটি দেখে নি। বার বার সে অস্ফুটস্বরে বললো,—ভুল, তার দেখার ভুল। সুমন্ত নিশ্চয়ই ভাটিখানা থেকে ঘুরে এসেছে, আজ বোধ হয় সে সকাল সকাল ছুটির ব্যবস্থা করেছিল।

আস্তে আস্তে সোহাগী বুঝলো, সত্যই আজকে মাইনে পেয়ে সুমন্ত কোথাও যায় নি, সোজা বাড়ি এসেছে। কেমন করে এ হওয়া সম্ভবপর, তাও সোহাগী জানতে পারলো। স্নান শেষ করে দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে লাউয়ের তরকারি দিয়ে সুমন্ত রুটি খাচ্ছে, আর মুক্তা তার জানুতে মাথা রেখে অনর্গল বকে চলেছে, তার হাতে দুটো আলুর পুতুল, গলায় পুঁতির একটা হার। এগুলো আজ কারখানার গেটের বাজার থেকে বিকেল-বেলায় কেনা হোয়েছে।

সাড়ে চারটের 'ভোঁ' বাজার সময় মুক্তা তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে কারখানার গেটে চলে গেছল। আগে সে কোনোদিন যায় নি—যাওয়ার মানে যে কি, তা সে অবশ্য জানতো না। আজ সে গিয়ে দেখলো লোকসান কিছু নেই—লাভই বরং হোয়েছে। সুমন্ত তাকে দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে যায়। রেললাইন পেরিয়ে এমন করে আসার জন্যে বকতে গিয়ে, যখন দেখলো মুক্তার চোখ ছলছল করছে, তখন আর কোনো কথা না বলে মুক্তাকে কোলে তুলে নিলো। তারপর সদ্য পাওয়া মাইনের টাকা থেকে ওই পুতুল আর পুঁতির হার সে কিনে দিয়েছে। ছকু মিস্ত্রী বরাবর সঙ্গে ছিল। সুমন্তকে সে পরামর্শ দিয়েছিল, রেল লাইনের ওপারে মুক্তাকে নামিয়ে দিয়ে একটু মৌতাতের আয়োজনে যেতে। সুমন্ত কিন্তু রাজী হয়নি। সমস্ত দিনের পর আজকে কারখানার গেটে মুক্তাকে পেয়ে তার এতো ভাল লাগছিল যে, এক মুহূর্তের জন্যে সে মুক্তাকে চোখের আড়াল করতে চাইলো না। কারখানার গেটে অন্যান্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসে, তারা যে তাদের বাবার কাছ থেকে মাইনের টাকা ঘরে নিয়ে যেতে অথবা মদ খেয়ে টাকা নষ্ট করার আগে অন্তত আবশ্যক মতো কাপড়-চোপড় কিনিয়ে নিতে আসে, সেকথা সকলে জানে। সে কিন্তু কোনোদিন ভাবতেও পারে নি, তার মুক্তা একদিন এই দলের একজন হোয়ে আসতে পারে!

মুক্তা অবশ্য তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে ভিড়ে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হোয়ে এসেছিল। কোনো কিছু সে চায়নি, সুমন্তকে দেখামাত্র 'বাপুজী' বলে জড়িয়ে ধরেছিল—সুমন্তর তেলকালিমাখা ছেঁড়া জামা প্যান্তালুনকে সমীহ করে নি।

তা না করুক, সুমন্তর ভারি ভালো লেগেছিল মুক্তার এই আসা। বকতে গিয়েও তাই মুক্তার গভীর চোখ দেখে বকতে পারি নি, নিজে নিয়ে গিয়ে মুক্তার পছন্দমতো পুতুল কিনে দিয়েছে—ছকুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে।

আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে সোহাগীর চোখ চকচক্ করে উঠলো। ভাতের জ্বালটা নেড়ে দিয়ে বাইরের উঠোনে উঁকি মেরে সে দেখলো রুটি খাওয়া শেষ করে সুমন্ত খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে, আর তার বুকের কাছে এলিয়ে আছে মুক্তা।

সোহাগী শুধু এইটুকুন দেখলো। আরো বেশী দেখার প্রয়োজন যদি তার থাকতো, তবে সে দেখতো আকাশটা আজ অন্ধকার নয়, জ্যোৎস্নায় ভর্তি! বাতাস বেশ জোরে জোরে বইছে, উঠোনের কোণের ছোট আমগাছটা সেই বাতাসে জোরে জোরে মাথা নাড়ছে আর মুক্তার বাঁ হাতের ছোট্ট মুঠির মধ্যে সুমন্ত তার আজকের মাইনের সব টাকা নোট গুঁজে দিয়েছে।

সেদিন ভালো করে না দেখলেও, কিছুদিন পরে অবশ্য সোহাগী জানতে পেরেছিলো, সবদিন ভাটিখানায় না গেলেও সুমন্তকে নেশা ঠিকই ধরে আছে ঃ সে নেশাটা বড়োই অদ্ভুত রকমের। যা কিছু সুমন্ত উপায় করে, মুক্তার পেছনে তা খরচ করে, মুক্তার ছোট্ট দুটি হাতের মুঠিতে সেই টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে সুমন্ত বড়ো আনন্দে থাকে, মুক্তার অনর্গল কলোচ্ছ্বাসে সে ডুবে যায়। সঙ্গীদের সঙ্গে মেশার অভ্যাসে মুক্তা যখন বাঙলার চাইতে হিন্দী বেশী বলতে থাকে, সুমন্ত তখন শুধু মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বাঙলা বলার চেষ্টা করে—তাও এরকম বাধা মুক্তা খুব কমই পায়।

এইভাবে দিন কেটেছে—মুক্তার বয়স বেড়ে গিয়ে আজ সাত বছর হোয়েছে। সুমন্তর অবসর তাকে নিয়েই কাটে। ভাটিখানায় সে যে যায় না, একথা বলতে পারি না, তবে আগেকার মতন নিয়মিতভাবে তার যাওয়া হোয়ে উঠে না। বেশীর ভাগ দিনই কারখানার গেটে মুক্তা এসে দাঁড়ায়, সুমন্ত তার সঙ্গে বাজার শেষ করে ঘরে চলে আসে। ছকু মিস্ত্রীর এজন্যে মুক্তার ওপর ভীষণ রাগ—মুক্তাও তাকে দেখলে তার ছোট ভ্রু-দুখানি বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চায়, সুমন্তকে মোটেই অবসর দেয় না ছকুর সঙ্গে কথা বলার। মাইনের সমস্ত টাকা মুক্তার হাত থেকে সোহাগী নিয়ে নেয়,—সুমন্ত তা জানে। সে আরও জানে সোহাগীর বিলাসিতা কেন এতো বেড়ে গেছে, প্রায়ই নূতন রং বেরংয়ের শাড়ি সোহাগী কোথা হতে পরে? সব জেনেও কিন্তু সুমন্ত কোনো কথা বলে না। খাওয়া পরা আর বিড়ির পয়সা পেলেই সে সন্তুষ্ট, আর সন্তুষ্ট মুক্তার মুখে হাসি থাকলে। বাজারের পয়সা যদি বাঁচে, তবে মুক্তাকে ফাঁকি দিয়ে মাতাল হোতেও তার ভালো লাগে। কিন্তু মাতাল হোলে তার মুক্তার সামনে যেতে লজ্জা করে। মুক্তা কিছুতে তার কাছে আসতে চায় না, ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকায়।

গল্প যদি এইখানেই শেষ হোত, তাহোলে নাকি বেশ ভালো হোত। অনেকে একথা আমায় জানিয়ে দিয়েছিলো, বলেছিলো, উপসংহার কি পরিশিষ্ট হিসাবে বলে দাও, সুমন্ত আজকাল মদ খায় না, সোহাগীর সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই, সুমন্ত ঠিক করে ফেলেছে, আসছে বছরে মুক্তার বয়স বারো হোলেই তার বিয়ে দেবে। তারপর এই কারখানা, এই দেশের অসম প্রকৃতির মায়া কাটিয়ে অভিশপ্ত মিস্ত্রীর জীবনে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে দেশের দিকে, যেখানে সে জন্মেছিলো, বড়ো হোয়েছিলো যেখানকার কোমল মাটিতে, ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশের নীচে, সবুজ ধানক্ষেতের গায়ে। না হয় সমস্ত সংসারের ওপর সুমন্তর বিতৃষ্ণা আসবে, বৈরাগীর বেশে সে এক তীর্থ হোতে সে অন্য তীর্থে যাবে, গাইবে গুণ গুণ করে, দিন শেষ হোয়ে এলো—এ পৃথিবীর মায়া হোতে সে পরিত্রাণ পেয়েছে!

আমিও ভেবেছিলুম সেই রকম একটা কিছু করবো। পাপপুণ্য, উত্থানপতন, পৃথিবীর আবিলতা, আকাশের অনন্ত বিশালতার বিলাসিতা নিয়ে ভাবমগ্ন হোয়ে যাবো, দেখাবো, সুমন্তর ভাটিখানা, সোহাগীর স্বেচ্ছাচারিতা শেষ পর্যন্ত কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করলো।

তা কিন্তু হোলো না। নিরপেক্ষভাবে যখন গল্প বলবো ঠিক করেছি, তখন যা হোয়েছিলো তাই বলে যাই। হাল্কা হাওয়ায় যেমন কিশোরী মেয়ের আঁচল উড়ে যায়, সেইভাবেই সুমন্ত আর মুক্তার দিন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন হাল্কা হাওয়া থামলো, আকাশের গায়ে এসে দাঁড়ালো রুদ্র কালবৈশাখী। কালো মেঘের গায়ে ঝাপটা মেরে বাতাস আবার বইলো বটে, কিন্তু সে বাতাসে আঁচল ওড়ানোর স্বপ্ন নেই, নেই পৃথিবীকে ভালোবাসার আয়োজন।

জীবন বা সোহাগীর কথা সুমন্ত ভাবতো না। তাদের সে ভুলে গেছিলো বললেও অপ্রকৃত কিছু বলা হবে না। কিন্তু একদিন আবার তাদের মনে করতে হোল, ভাবতে হোল তাদের সম্বন্ধর কথাটাকে।

বেশীর ভাগ দিনের মতো কারখানার গেট থেকে সুমন্তর হাত ধরে মুক্তা ঘরে ফিরছিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস মতো অনর্গলভাবে বকে চলেছিলো। সুমন্ত কখনো তার কথার উত্তর দিচ্ছিলো, কখনো বা দিচ্ছিলো না। হঠাৎ তার কানে গেলো মুক্তা বলছে, বাপুজী, জীবন চাচা মার সাথে অমন করে কেন? ওরকম হুড়যুদ্ধ করে কেন? ঐসা মাফিক চুম দেতা কেওঁ? তুমভি তো কুচ নেহি করতা!

একটা ভারি চলন্ত কমপেসারের নীচে সুমন্তর মাথা যদি কেউ গুঁজে দিতো, তাহোলেও সুমন্তর অতো লাগতো না—যতখানি আঘাত তাকে জখম করলো মুক্তার এই প্রশ্নে আর মন্তব্যে।

থমকে দাঁড়িয়ে সুমন্তর মনে হোলো ঘরে ফিরে গিয়ে আর দরকার নেই, মুক্তা তার সঙ্গে আছে, এখান থেকে সামনের বাঁদিকের রাস্তায় বেঁক নিয়ে এ জীবনটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া যাক। পেছনে থাক সোহাগী, থাক জীবন। কিন্তু তারা এমনই বা থাকবে কেন, তাদের খুন করে রেখে গেলে কেমন হয়? খুন? না, সুমন্ত মনে মনে ভালো করে ভেবে দেখলো, খুন করতে সে তো পারবে না—আজকাল সে বড়ো দুর্বল হোয়ে গেছে। সেদিন রেললাইনে একটা মেয়ে কাটা পড়েছিলো। তার ছিন্নভিন্ন দেহ আর রক্তে লাল লাইনের রেল আর পাথর দেখে সুমন্তর মাথা ঘুরে গেছিলো। ছকুকে সেকথা বলতে ছকু হেসেছিলো, বলেছিলোঃ সুমন্ত আজকাল মেয়েমানুষ হোয়ে গেছে, তা না হোলে রক্ত দেখলে মাথা ঘোরে, মদ খাওয়া বন্ধ করে?

সুমন্তর আর একবার মনে হোলো ভাটিখানায় সে চলে যায়। পকেটে পয়সা না থাকুক, ছকু সেখানে আছে, দুভাঁড় অনায়াসে মিলবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমন্তর ভাটিখানায় যাওয়া হয়নি। মুক্তার টানাটানিতে চমক ভাঙতে সে দেখেছিলো, রাস্তায় সে চুপ ঘরে চলো না বাপুজী, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি হবে।

ঘরে ফিরে সোহাগীর সঙ্গে সুমন্ত তুমুল ঝগড়া করলো। সে ঝগড়ার ভাষা এখানে লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। বার বার দোহাই পেড়ে সুমন্ত সোহাগীকে বললোঃ যেন সে জীবনকে আর বাড়িতে ঢুকতে না দেয়,—মুক্তা এখন বড়ো হোয়েছে। যদি কোনোদিন সে এ বাড়িতে জীবনকে দেখতে পায়, তবে জীবন অথবা সোহাগী কারুকে খুন করতে তার বাধবে না—সুতরাং সোহাগী যেন সাবধানে থাকে!

যতোই ঝগড়া হোক, সোহাগীর ভাবভঙ্গীতে দেখা গেলো, সুমন্তর কথা সে গায়ে মাখে নি। যতবার জীবনের নামে সুমন্ত তাকে অভিযুক্ত করলো, সোহাগী ততবার সেই অভিযোগ অস্বীকার করলো, বললো, জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ বহুকাল চুকে গেছে। সুমন্তর নোংরা মন মুক্তার নাম করে মিথ্যা এসব বলছে।

সোহাগীর যুক্তির বহরে সুমন্ত অসাড় মেরে গেলো। একবার তার মনে হোলো মুক্তার মুখ থেকে যা শুনছে, মুক্তাকে ডেকে সোহাগীকে তাই শুনিয়ে দেয়, পরমুহূর্তে সমস্ত মনটা তার কুঁচকে গেলো, মন বললে, সোহাগী যাই করুক, মুক্তার মুখ থেকে দ্বিতীয়বার সেকথা না শোনাই ভালো।

দিনরাত্রির আসা-যাওয়া বড়ো অদ্ভুতভাবে চলছিলো সুমন্ত বেশ বুঝতে পারে ঃ মুক্তা আজকাল ঘরে অনেক কিছু দেখে, কিন্তু সুমন্তকে কিছু বলে না। সেদিনের সেই ঝগড়া দেখে সে বড়ো ভয় পেয়ে গেছে, কারুকে কিছু বলতে সে সাহস করে না।

দুঃখে ক্ষোভে সুমন্তর বুক ফেটে যায়। এক-এক সময় সে উন্মাদ হোয়ে ওঠে, মনে করে আজই সে সোহাগীকে খুন করবে, না হয় ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু মুক্তার মুখের দিকে চাইলে তার সব কিছু গোলমাল হোয়ে যায়। মনে হয় মুক্তার গভীর চোখের সামনে সে খুনে হোয়ে দাঁড়াতে পারে না। অথবা মুক্তা যদি কখনো গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে সোহাগী কোথায়—সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সে পারবে না। কিন্তু সোহাগী যদি একদিন পালিয়ে যায়—সুমন্তর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে—সে আর ভাবতে পারে না.........

শুয়োর যেমন তার ধারালো দাঁত দিয়ে মাটি তুলতে থাকে খুড়ে খুড়ে, তেমনি এই চিন্তা সুমন্তর সমস্ত শরীরটাকে খুড়ে চললো। মেশিনে কাজ চাড়িয়ে সুমন্ত চুপ করে ভাবতে থাকে। কাজে তার আজকাল অজস্র ভুল হয়। একদিন চার্জহ্যান্ড তাকে গালাগালি দিলো। দিন কয়েক পরে ফোরম্যান তাকে নোটিশ দিলোঃ একটা কাজ খারাপ হওয়াতে তার পাঁচ টাকা জরিমানা হোয়েছে! সুমন্ত তবু বদলালো না। ছকু বলে, এই সুমন্ত, হামার কথা শুন, একটু একটু দারু খা, লেকিন নেহিতো জানে বাঁচবি না। সব ছোড়কে বুড়বাক্‌, তোমকো সাঁচ্‌ হোনে কোন বোলা? —লেড়কী তোকে জানে মেরে দেবে!

সুমন্ত ছকুর কথা শোনে, হাসে, কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। সুমন্তর হাসি দেখে ছকু যখন সত্যি রাগে, সুমন্ত আর হাসে না। এই অবস্থার মধ্যে একদিন একটা প্রচন্ড এ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে সুমন্ত বেঁচে গেলো। সেদিন বিকেলে ফোরম্যান নিজে থেকে ডেকে সুমন্তকে কিছুদিনের ছুটি দিলো, বললোঃ এ ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার পর, সুমন্ত ইচ্ছে করলে আরো ছুটি নিতে পারে। তবে ছুটির পর এবার যখন সুমন্ত ফিরে আসবে, তখন যদি তার কাজে ভুল হয়, তবে তাকে বরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

কিছুদিন থেকে বর্ষা নেমেছিলো। আকাশ মেঘে টইটুম্বুর। কারখানার গেট দিয়ে ছুটির বাঁশীর পর বেরিয়ে আসতে আসতে সুমন্তর হঠাৎ মনে হোলো এই তার শেষ যাওয়া। জীবনে বোধ হয় আর কোনোদিন সে কারখানার কাজে আসবে না।

গেটের বাইরে সুমন্তর কিনে দেওয়া ছোট্ট ছাতি মাথায় দিয়ে একটা হলদে রঙের জামা পরে মুক্তা দাঁড়িয়েছিলো। সুমন্তকে দেখে ছাতি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাপুজী, জলদি, পানি আয়ে গা।

হেসে সুমন্ত বললো, দাঁড়া, বাজার করি।

নেহি, নেহি, মুক্তা কালো চুলেভরা মাথা নাড়লো, বাজার করতে হবে না, ঘরে চলো।

রাত্তিরে খাবি কি রে পাগলী! মুক্তার হাত ধরে ঘুরে ঘুরে সুমন্ত বাজার শেষ করলো। পথে কিন্তু জোরে বৃষ্টি নামলো। মুক্তার ছোট্ট ছাতি কোনো কাজে লাগলো না। দুজনে যখন ঘরে পৌঁছালো, বর্ষার ধারা তখন তাদের গা বেয়ে নামছে।

ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, সুমন্ত মনে মনে আজও ভাবেঃ সেদিন যদি সে মুক্তার কথা শুনতো। সত্যি, একদিন বাজার না করলে মানুষ তো না খেয়ে মরে না। সেদিন যদি সকাল সকাল বাড়ি চলে আসতো, তবে নিশ্চয়ই জলে ভেজার দরুণ মুক্তার পরের দিন জ্বর হোতো না। জ্বর শুধু হোল তা নয়, সেই জ্বর টাইফয়েডের রূপ ধরলো। তারপর সোহাগীর যত্ন, সুমন্তর ব্যাকুলতা, ডাক্তারের ওষুধ, সব কিছু উপেক্ষা করে মৃত্যু যখন এলো, তখন সেই জ্বর সেই মৃত্যুর হাতে মুক্তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

গল্প শেষ হোয়ে গেছে। শুধু এবার পরিশিষ্ট লিখবো। তারপরে আমার ছুটি। সুমন্তর কথাই আগে বলিঃ কেন না, সোহাগী আজও তার সঙ্গে আছে, এখনও কোথাও যায়নি।

সেদিনের ছুটির পর আসতে অসতে সুমন্তর যে ধারণা হোয়েছিলো যে, এই যাওয়া তার শেষ যাওয়া, আর সে কাজে আসবে না—সুমন্ত দেখলো সেটা ভুল। ছুটি ফুরোবার আগেই সুমন্ত কাজে ফিরে গেলো। ফোরম্যান জিজ্ঞেস করলো, হ্যালো সুমন্ট্, তবিয়েৎ আচ্ছা তো?

সেলাম দিয়ে সুমন্ত জানিয়ে দিলো হ্যাঁ।

সুমন্ত কাজে লেগে গেলো। আগেকার চাইতেও নির্ভুল আর পরিষ্কার কাজ সে আজকাল করে। গুজব শোনা যায়, তার নাকি পদোন্নতি হবে।

পদোন্নতি হোক না হোক, অত্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীরও কাজ সে হাসিমুখে করে, কেউ কিছু বললে, বলে না না এমন কি আর কাজ, বেশ আরামেই চলছে!

আরাম শুধু সে হারিয়ে ফেলে যখন কারখানার বাঁশী বেজে ছুটি হয়। গেটের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ দেখলে তার বুকের ভেতরটা কড় কড় কর ওঠে চোখ দুটো মুক্তাকে খুঁজে বেড়ায়। মন বলে, একদিন তো না জানিয়ে সে এখানে এসেছিলো, বলা যায় না আজও তো আসতে পারে।

মাঝে মাঝে তাই বাজারের কোন একটা দোকানে কিছুক্ষণ বসে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমন্ত দু-একটা আনাজপাতি কিনে ঘরে ফিরে যায়। শুধু বৃষ্টি যেদিন পড়তে থাকে, আকাশটাকে কালো মেঘ ঢাকা দেয়, সেদিন সে ভাঁটিখনার পথ ধরে। কেউ জিজ্ঞেস করলে, মুখে বলে, আজ বড্ড ঠান্ডা—একটু গাটা গরম করা দরকার.........

মনে মনে কিন্তু সে ভাবে, কি হবে এখন ঘরে ফিরে। মুক্তার সমস্ত জামা-কাপড়, খেলনা-পুতুল জড়ো করে, তার ওপর পড়ে পড়ে সোহাগীটা কাঁদছে!

সুমন্তর সে কান্না দেখতে মোটেই ভালো লাগে না।

কর্ণের পরাভব

ভবানী পাঠক

বহ্ পরিচর্যার ফলে ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে মানব-শিশ্‌র আবির্ভাব হ'ল। সেই শিশ্‌ই বড় হয়ে আমাদের কাছে সত্যকাম নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই প্রাচীন আশ্রমিক সভ্যতার দিনেও এক জ্ঞান-গরীয়ান্ গর্ সত্যকামকে তাঁর শিষ্য বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। সেই পিতৃ-পরিচয়হীন বালককে তিনি 'দ্বিজোত্তম' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

এই আখ্যায়িকা যদি নিছক কপোল-কল্পনাও হয়ে থাকে, তব্ও এর পেছনে সমাজ-ইতিহাসের যে এক করুণ সমস্যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার নিবৃত্তি আজিও হয়নি। সেই প্রাচীন সভ্য-জীবনের নীতি, তত্ত্ব ও আদর্শবাদের জটিল সমাজ-মনে 'পরিচয়হীন' শিশ্‌র প্রতি যে নিষ্ঠুর মূঢ়তা সঞ্চিত হয়েছিল আধ্নিক সভ্য-জীবনের সর্বত্র সেই সমস্যা এখনও তার সকল গ্লানি মিথ্যা ও অহিতের ভার নিয়ে সজীব হয়ে রেয়েছে। এই সমস্যাকেই আধ্নিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়—'অবৈধ সন্তান' সমস্যা।

সামাজিক সদ্বুদ্ধি ও বিচারের বিভ্রান্তি যুক্তি-দরদ বিসর্জন দিয়ে কতখানি অ-সামাজিক হয়ে উঠতে পারে, এই সমস্যা তার একটা বড় দৃষ্টান্ত। এই সমস্যার সঙ্গে সভ্য-সমাজের অনেকগুলি নীতি, রুচি ও আদর্শ, লৌকিক আইন ও মান-অপমানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কাজেই সমাধানের কথা তোলবার আগে বলতে হয়—সামাজিক পরিপার্শ্ব ও তার মানসিক ভিত্তির পরিবর্তন।

প্রথম বিশ্লেষণে এই সমস্যা আমাদের মনোদৃষ্টির একটা বিশিষ্ট অথচ বিকৃত রূপ ধরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের জীবনকে ঠিক জীবনের গৌরবের জন্য মূল্য দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকারবাদের দৃষ্টি নিয়েই জীবনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অবৈধ-সন্তান সমাজের চক্ষে অপবিত্র, তার জননী কলঙ্কিনী মাত্র। লৌকিক আইন ও লোকের মনোভাব কোন অবৈধ-সন্তানকে মানুষের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। এই কুল-গোত্র-বর্ণের বন্ধনে শাসিত সমাজ অবৈধ মানবশিশুকে চোর-ডাকাতের মত অপরাধী বলে মনে করে। এই মনোভাবের কারণ কি? উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই একটা সত্য ধরা পড়ে। অবৈধ মানবশিশুর আবির্ভাব আমাদের সমাজের অর্থনীতিক ব্যবস্থা, চারিত্রিক আদর্শবাদ এবং বিবাহ ও দাম্পত্যের রীতি-নীতির ওপর উপদ্রব সৃষ্টি করে। এই গোত্রহীন মানুষকে কিভাবে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা যায়—তার কোন দিশা পাওয়া যায় না। সামাজিক চিত্তসুস্থতা ও গতানুগতিক মনোবৃত্তির মধ্যে এরা যেন দুর্বৃত্তের মত শান্তিভঙ্গ করে।

মেনে নিতে হবে যে, ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট আমাদের সামাজিক মন স্বভাবত রক্ষণশীল। সামান্য চেতনা বেদনা ও বিপর্যয়ে এই রক্ষণশীলতা ভাঙে না। নতুনের দাবী ও বৈপ্লবিক চেতনা যেমন শক্তিশালী, এই রক্ষণশীলতার শক্তিও তেমনি। রক্ষণশীলতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তার কারণ এই নয় যে, তার ওপর বৈপ্লবিক আক্রমণ বড় বেশী শক্তিশালী। ঐতিহাসিক নিয়মেই রক্ষণশীলতার নিজের মধ্যেই বিনাশের বীজ লুকিয়ে থাকে। তাই দুর্মর হলেও, তাকে একদিন মরতে হয়। অবৈধ সন্তান সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক সমাজ-মনের প্রতিক্রিয়া ও আচরণের স্বরূপ জানতে হলে, আমরা আবার সেই পরিদৃশ্যের মুখোমুখি এসে পড়ি—রক্ষণশীলতা বনাম বর্তমানের দাবী। এই দুই মনোবৃত্তি ও চেতনার পেছনে ইতিহাসের স্বীকার ও সমর্থন আছে। সেই ঐতিহাসিক কারণগুলি একে একে বিচার করা উচিত।

সামাজিক প্রয়োজনের দাবীতেই মানুষের ইতিহাসে একদিন নর-নারীর যৌনসম্পর্ককে কোন-না-কোন ভাবে বিধিগত করার চেষ্টা হয়েছিল। সামাজিক নর-নারীর যৌনসম্পর্কের পেছনে সমাজের সমর্থন থাকতে হবে। যৌনসম্পর্কের এই বিধিগত রূপেই হলো বিবাহ। কিন্তু এই বিধান ও বিবাহের রীতি-নীতি সর্বক্ষেত্রে, সর্বসময়ে ও সর্বদেশে একই রকম হয়নি। এখনও পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য নামধেয় সর্বজাতির বিবাহের আদর্শ দেখলে তার বহুবিধ বৈচিত্র্য বোঝা যায়। বোর্ণিওতে যে বিবাহপদ্ধতি সমাজসমর্থিত, য়ুরোপে তা সমাজ-বিগর্হিত। তিব্বতে ও ভারতের টোডা সম্প্রদায়ে নারীর পক্ষে বহুবল্লভ গ্রহণ করা স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতের অন্য একটি প্রদেশে সেরকম বিবাহকে ব্যভিচার বলেই ধরে নেবে।

দেশে দেশে এবং যুগে যুগে নর-নারীর বিবাহপদ্ধতিতে এই বৈচিত্র্য কেন? এইখানে বিশেষ সাবধানে বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। নর-নারীর যৌনসম্পর্কের কলাকুশল এবং জৈবিক আচরণ প্রায়শ সর্বদেশে একই প্রণালীর। কিন্তু বিবাহ বা দাম্পত্যের প্রকৃতি ও ধর্ম এক নয়। সুতরাং বুঝতে হবে, কোন একটি কারণ নিশ্চয় আছে, যা এই বিবাহ ও দাম্পত্যের রকমারি প্রণালী সৃষ্টি করেছে। হেতুহীন ভাবে কখনো কোন সমাজাদর্শ স্থাপিত হয় না। তার পেছনে প্রয়োজন অভীপ্সা এবং চেতনা ছিল।

আনুক্রমিক বিচারের ফলে আমরা দ্বিতীয় একটি তত্ত্বের সামনে এসে দাঁড়াই—সম্পত্তি। সম্পত্তির সঙ্গে ভোগ স্বত্ব ও অধিকারবাদের সব উপজ বিধানগুলি সংযুক্ত হয়ে আছে। জীবন থেকে জীবিকা—জীবিকা থেকে স্বত্ব ও সম্পদ—স্বত্ব থেকে অধিকারবাদ—অধিকারবাদ থেকে উত্তরাধিকারবাদ—উত্তরাধিকারবাদ থেকে পুরুষানুক্রম বা গোত্রানুক্রম এবং সঙ্গে সঙ্গে বংশাভিজাত্য। সুতরাং মানুষের সামাজিক পরিচয় প্রথম তৈরি হলো বংশে এবং বংশের পরিচয় পূর্ব বা আদিপুরুষের মধ্যে।

সম্পত্তির অধিকারবাদ পুরুষানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ালো এই বিত্তভোগের ব্যবস্থা সমাজে কায়েমী হলে, সমাজের নীতি ধর্মও সেইভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। বর্ণ বা রক্তের সাঙ্কর্য

দূষণীয় বিষয় হ'ল। যে ব্যক্তি যার উদ্বৃত্তবিত্ত ভোগ করবে, তার দেহে এবং ঊর্ধ্বতন বিত্তবানের দেহে একই শুদ্ধশোণিত প্রবাহিত থাকবে। এই শোণিতসাম্য পুরুষানুক্রমিক বিত্ত-ভোগের অধিকারী নির্দিষ্ট করে দিল। শোণিতসাম্যের দিক দিয়ে পিতা ও তার ঔরসজাত সন্তান—এদেরই মধ্যে সবচেয়ে বেশী শোণিতসাম্য বর্তমান; সুতরাং পিতার সম্পদে সেই একমাত্র শুদ্ধাধিকারী, যে হ'ল তার আপন ঔরসজাত শুদ্ধশোণিত সন্তান।

বিত্ত উপভোগ ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে একমাত্র তারই দাবী গ্রাহ্য হলো, যে শুদ্ধশোণিত সন্তান। সুতরাং পিতা-সম্প্রদায়ও সতর্ক ও নিশ্চিন্ত থাকতে চায় যে, সন্তান নামে অভিহিত মানুষটি যেন সত্যিকারের আত্মজ হয়।

সমাজে এই বিত্ত উপভোগের পুরুষানুক্রম ও 'আত্মজ' থিওরী থেকেই পৌরুষ পর্বের সূচনা। পুরুষের সঙ্গিনী নারী একপতিব্রতা হবে। যৌনব্যাপারে নারীর অধিকার এইখানে এসে সীমাভুক্ত হ'ল। নইলে আত্মজ সম্পর্কে পুরুষ নিঃসংশয় হতে পারে না। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ও সামাজিক আদর্শে পুরুষের পক্ষে বহুপত্নী গ্রহণ চলতে পারে। পুরুষ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার আত্মজ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। বহুবিবাহের (Polygamey) সামাজিক সমর্থন রয়েছে। খৃষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের পর য়ুরোপে এই আদর্শকে আর এক স্তরে নিয়ে এসে পৌঁছেছে—একবিবাহ (Monogamy)। য়ুরোপীয় সমাজের পরিবার গঠন, বিত্তের উত্তরাধিকার ও উপভোগের রীতিনীতির সঙ্গে এই একবিবাহের আদর্শ প্রয়োজনের দাবীতেই স্বীকৃত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক অনুশাসনে নারীর উপর একদফা একপতিনিষ্ঠার কঠোর দায়িত্ব চাপানো হয়। তার গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে তার 'স্বামী' পুরুষের শোণিতসাম্য অবশ্যই রক্ষিত হয়। এই দায়িত্ব নারীর—এই থেকে সতীত্বের আদর্শ।

এখন বোঝা যায়, কেন এখনো অবৈধ সন্তানের জননীর লাঞ্ছনা ও শাস্তি সামাজিকভাবে দূষণীয় নয়। অবৈধ সন্তানের জনকের সামাজিক পদবী ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না বা কেড়ে নেওয়া হয় না। অসামাজিক মিলনের পরিণাম যখন প্রাণপূর্ণ হয়ে একটি মানবশিশুর রূপ নিয়ে পৃথিবীর আলোতে দেখা দেয়, তখন এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে মাত্র দুটির ওপর সামাজিক শাসন ও নিপীড়নের দণ্ড নেমে আসে- জননী ও সন্তান। পুরুষ অব্যাহতি লাভ করে; তার মনুষ্যত্বের অধিকার অদৃশ্য হয়ে যায় না। বড় জোর তার ওপর একটা সাময়িক ও লৌকিক শাস্তিবিধান করা হয় এবং এর পর সে শুদ্ধভাবেই সমাজে বাস করে। কিন্তু কুমারী মাতা ও তার সন্তানের মনুষ্যত্বের অধিকারটুকুই আগে কেড়ে নেওয়া হয়!

কিন্তু নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও অর্থহীন কোন্ ক্ষেত্রে? যদি সামাজিক অনুশাসনকে একটি চরম সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে কুমারী-মাতার শাস্তি অবশ্য বিচারসহ। সমাজগর্হিত কাজের জন্য তার একরকম শাস্তি হতে পারে। কিন্তু নারীর স্খলন পতন দুর্বৃত্তের জন্যই হোক্, বা পরকীয়া অনুরাগ বা মুহূর্তের আবেগের ভ্রমেই হোক্, যে নতুন জীবনের কুঁড়ি জীবনের প্রভাতী আলোতে স্মিত বিকশিত হয়ে ওঠে, বর্তমান সমাজের পেনাল কোডের কোন ধারা অনুসারেও তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। কিন্তু সমাজে পুরুষ-সংহিতার শাসন—মানুষের পরিচয়ের নিরূপণ শুধু পিতার নামে। এর কারণ কি? জীবন সৃষ্টির যজ্ঞে পুরুষের ব্রত কতটুকু? এর সহস্র বেদনা উৎকণ্ঠায় ভরা যৌবনের শ্রদ্ধা ও দেহের পুষ্টি ক্ষয় করে জননীর তিনশত দশ দিনের জীবধারিণী কীর্তির তুলনা হয় কি? তবু মাতৃনামে পরিচয় সমাজে অচল; কারণ নারী দাম্পত্য সম্পর্কে অধমর্ণ মাত্র।

মানুষ মানুষের মত হাত পা মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে—শুধু এই প্রাণময় মনুষ্যত্বের জন্যই তাকে মানুষ বলা হচ্ছে না। সমাজ দেখছে, এই মানুষ বৈধ না অবৈধ। অর্থাৎ তার পিতৃ-পরিচয় আছে কি না? শুধু তাই নয়, সেই পিতৃ-পরিচয় সামাজিক আইনসঙ্গত কি না? মানুষের মনুষ্যত্বকে এইভাবে বৈধ বা অবৈধ করার অদ্ভুত মতবাদ বিশ্লেষণ করে আমরা দুইটি কারণ অন্ততপক্ষে খুঁজে পাচ্ছি—সমাজে পুরুষ-শাসনের আধিপত্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপভোগ ও উত্তরাধিকার।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে যদিও একবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু সে সমাজেও অবৈধ সন্তানের প্রতি সামাজিক অবিচার ছিল না। আধুনিক খৃষ্টীয় একবিবাহের আদর্শের সঙ্গে যে বিত্তভোগের ব্যবস্থা বর্তমান, সেই ব্যবস্থায় অবৈধ সন্তানের ওপর সবচেয়ে বেশী কলঙ্ক ও ঔদাসীন্য আরোপ করা হয়। চীনা ও ইহুদী সমাজে মানুষের অবৈধ সন্তানের ওপর এই সামাজিক নিগ্রহ ছিল না এবং এখনও বলতে গেলে নেই। আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও কুমারী-মাতার সম্মান অন্যের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। ব্রিটিশ পাপুয়ার মিকিও উপজাতির মধ্যে কোন বিবাহেচ্ছু যুবক কুমারী-সন্তানবতীকেই বধূরূপে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

আমাদের মহাভারতের কর্ণের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সেই সঙ্গে তার জন্মরহস্যের সামাজিক গ্লানি তার জীবনে এই সমস্যার এক বেদনাকর নাটক সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদে কর্ণের প্রত্যেকটি অভিযোগ এই সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জ্বালায় উজ্জ্বল।

> আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
> নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
> আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী—
> দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে।

কর্ণের এই পরাভব—মানবতার পরাভব। সভ্যতার ক্ষতি।

১০

কিন্তু সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য এই যে, বনবিহারী তরঙ্গকে কোনও প্রশ্নই করলো না।

রান্না-বান্না দেওয়া-থোওয়া, এমন কি আদর-আপ্যায়ন সমস্ত তরঙ্গ যেমন আগেও করতো, এখনও করে চলেছিল ঠিক সেই রকমই, নিয়মবাঁধা ঘড়ির কাঁটার মত; কোথাও কোনো গাফিলতি কি ত্রুটী ছিল না তার মধ্যে।

তবু মনে হলো বনবিহারীর ভাবভঙ্গি কি কথাবার্তায় আগের সে কৌতুক—সে উচ্ছ্বাসের মাত্রা যেন একটু কমে গেছে, একটু ছাঁটাই করে দিয়েছে, নিজে ইচ্ছে করেই। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ একটা কান্ড ঘটে গেল—না জানা না শোনার ভেতর দিয়ে।

কান্ডটা এই ঃ—প্রতিদিনের মত বেলা সাড়ে বারোটায় মাথার রোদ পায়ে নামতেই আটচালার আসন ছেড়ে বনবিহারী উঠলো,—হিসেবের খাতা আর সিঁদুরমাথা কাঠের হাতবাক্সটা চাবি বন্ধ করে মাথার টাকে তেল ঘসতে ঘসতে বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলে—প্রতিদিনের রান্নার পর্ব শেষ করে তার অপেক্ষায় তরঙ্গ যে বারান্দাটায় বসে থাকতো, সে জায়গাটায় আজ তরঙ্গ নেই, তার জায়গায় বসে আছেন পাড়ার বড় খুড়ী।

বড় খুড়ী পাড়াপড়শী,—ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো!

গ্রামে—এর ওর তার সময় অসময় রেঁধে সেবা সুশ্রূষা করে দিন কাটায় ;—

আজ এবাড়ীর হেঁসেলেও তাঁর শুভাগমন দেখে বনবিহারী সচকিত হয়ে উঠলো ঃ—

"ব্যাপার কি,—বড় খুড়ী যে?—"

বড় খুড়ী সদুঃখে জানালেন —

"আর বাবা, যে কয়টা দিন বেঁচে আছি,—তোমাদের কাজে লাগতে পারলেও সার্থক মনে করবো; কি করবো, চোখ থাকতে তো আর বুজিয়ে থাকা যায় না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সময়-অসময় দেখতে হয় বৈকি,—তাতে তোমরা আমায় দেখো আর না দেখো,—কর্তব্য আমায় করতেই হবে।"

এর গোড়ার খবরটা অতি সামান্য হলেও উল্লেখ করা উচিত। বড় খুড়ীর একমাত্র পুত্র সবেধন নীলমণি বিশেষ—শ্রীমান অঘোরনাথ এর গোড়া। অঘোরের প্রকৃতি ছিল, আজ এখানে কাল ওখানে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, যাত্রা থিয়েটারে বীরত্বের পাট করা—আর তাস দাবা খেলা। এ কাজ সে করতো বরাবরই অর্থাৎ বালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই; এরই খরচ যোগাতে যোগাতে বড় খুড়ী যখন প্রায় সর্বস্বান্ত, তখন একদিন এসে বনবিহারীর হাতে পায়ে ধরে ছেলের জন্যে মাসিক কয়টাকা মাহিনায় যে কাজটি যোগাড় করলে সেটা হচ্ছে—গ্রামান্তরে নতুন কেনা জমি-জমার হিসেবপত্তর—খাজনা আদায় ইত্যাদির—। এক কথায় গোমস্তা।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রুদ্রমূর্তিতে দেখা গেল বনবিহারীকে: বড় খুড়ীর সামনা-সামনি—দাঁড়িয়ে—

সে বলছে—

ওকে আমি জেলে দিয়ে ঘানি টানাব তবে আমার নাম—!...

সব সইতে পারি, ঐ জোচ্চুরী আর ধাপ্পাবাজী আমার কিছুতেই সইবে না। বিশ্বাস করে ওকে দিলাম টাকা পয়সার কাজ, ও কিনা সেই তবিল তছরূপ করলে অনায়াসে! না এ আমার দ্বারা সহ্য করা চলবে না।......

কিন্তু ব্যাপারটা মিটাতেই হলো শেষ পর্যন্ত, আর তাও ঐ অঘোরেরই মায়ের চোখের জলে।...

তবু সে আজ অনেকদিন আগের কথা হলেও ব্যথাটা বনবিহারী আজও ভুলতে পারেনি সেই তবিল তছরূপের। আজ বড় খুড়ী যে কথায় কথায় সেই ব্যাপারটারই প্রত্যুত্তর কথায় প্রকাশ করতে ভুলল না, একথা বনবিহারী বুঝলো, তাই সে কথা পাল্টে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—

"ছোট বৌ কোথায় বড় খুড়ী?"......

বড় খুড়ী অম্লান মুখে উত্তর দিলে ঃ—

"তার জন্যেই তো তোমার বাড়ি হেঁসেল ধরতে আসা বাছা; শরীরের গর্ব কেউ তো চিরদিন করতে পারে না; তাই সেও গিয়ে শরীর খারাপ বলতেই ছুটে এলাম হাঁড়ি ধরতে; ভাবলাম, তারা নয় আমায় নাই মনে রাখলো, তা বলে আমি বেঁচে থাকতে আমারই সামনে বনবিহারী কিনা শেষে দুটি চাল ডাল সেদ্ধ করার অভাবে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে দিন কাটাবে? তা হয় না!....."

বনবিহারীর বোধ হয় আর সেখানে দাঁড়িয়ে খুড়ীর খেদোক্তি শুনবার ইচ্ছে হলো না বলেই পেছন ফিরছিল হয়তো; খুড়ী কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"চানের তেল দেব বাবা?—

মুখ ফিরিয়ে বনবিহারী বললে—

"তেল ? দেবে দাও—"

খুড়ী একটা বাটি করে খানিকটা সরষের তেল এনে দিলে; তারই খানিকটা হাতে গায়ে বুকে পেটে ঘসতে ঘসতে কাঁধে গামছা ফেলে বনবিহারী চললো স্নানের উদ্দেশ্যে।

স্নানাহার সেরে পান চিবাতে চিবাতে কি মনে করে একবার তরঙ্গর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজা ভেজানো ছিল, ওরই একটুখানি ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বনবিহারী দেখলে তরঙ্গ শুয়ে আছে—

খাটের ওপোর মাথার কাছে দক্ষিণের জানালা খোলা; ওরই সামনা সামনি বরাবর এসে পড়েছে হেলে ফালি পড়া সূর্যের এক উজ্জ্বল রৌদ্র।

রোদটা এসে পড়েছে তরঙ্গর মুঠো করা হাতের ওপোর; দেখতে দেখতে ওটা ঘুরে গিয়ে হয়তো তরঙ্গর মুখে মাথায় পড়বে। কিন্তু ও কি ঘুমুচ্ছে ?

বনবিহারী একটু সচকিত হয়ে উঠলো, তারপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে জানালাটা দিলে ভেজিয়ে।

কিন্তু যাবার বেলা আসার মত নিশব্দে ফিরতে পারলে না; বাটি না ঘটি কি একটায় পা ঠেকে ঝন্ ঝন শব্দে ছিটকে যেতেই তরঙ্গ চমকে উঠলো তন্দ্রা থেকে—

"কে, কে এ ঘরে ?"

কম্পিত কণ্ঠে বনবিহারী উত্তর দিলেঃ—

"আমি ছোট বৌ, জানালাটা বন্ধ করে দিতে এসেছিলাম।"

উঠে বসে অসংলগ্ন গায়ের মাথার কাপড় যথাস্থানে গুছাতে গুছাতে বিদ্রূপের স্বরে তরঙ্গ বলে উঠলোঃ—

"তাই নাকি চক্কোত্তি মশায় ? আমি কিন্তু আর একটু হলে অন্য রকম ভেবে ফেলতাম; অবশ্য সে দোষটা আমার নয়, তোমার—"

বনবিহারী হঠাৎ একথার জবাব দিতে পারলো না, কেমন যেন একটা অদ্ভুত লজ্জা আর সঙ্কোচে বিবর্ণ হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্যে।

যেন তার দীর্ঘ জীবনে আজ এই বিমূঢ় অবস্থা এই স্তম্ভিত ভাব কোনও স্ত্রীলোকের সামনে এই প্রথম; এই প্রথম সে তরঙ্গর কথায় পরাজয়ের বিস্ময় মেনে নিলে নিজের অনুভূতিতে, তাই ও তাকাতে পারলো না মুখ তুলে, কিন্তু অপ্রস্তুত হলো না তরঙ্গ, বরঞ্চ বেশ সপ্রতিভভাবেই প্রশ্ন করলে—

"দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বসবে না একটুও ?—"

বনবিহারী মুখ তুলে তাকালো; এ আবার কি বলে ও? ঠাট্টা করছে নাকি ? ও তা পারেও। কিন্তু না, তরঙ্গর মুখে চোখের কোথাও ঠাট্টার বিন্দুবিসর্গও আঁকা ছিল না, বরঞ্চ বেশ প্রশান্ত মুখেই সে চেয়েছিল বনবিহারীর দিকে।

বনবিহারী কিন্তু কিছুতেই যেন আজ তরঙ্গর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজেকে নির্দোষ বলে মেনে নিতে পারছিল না, আর পারছিল না বলেই কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিলেঃ

"না, বসবো না—কাজ আছে।"

খিল্ খিল করে তরঙ্গ হেসে উঠলো আগের মতঃ—

"কাজ আর কাজ—চক্কোত্তি মশায়ের কাজ যেন আর এ জীবনে শেষ হবে না। আমি কিন্তু অত কাজের ল্যাঠায় জড়িয়ে থাকতে পারিনে, পছন্দও করিনে কোনও দিন—"

জোর করেই যেন সমস্ত জড়তাটা ঝেড়ে ফেলে বনবিহারী বললে—

"তুমি মেয়েমানুষ—তাই কাজ না করার এ খেয়াল তোমার খাটতে পারে তরঙ্গ, কিন্তু আমি বেটাছেলে, আমার ইচ্ছা মানবে কে ?"

"মানা না মানা লোকের মতামতের ওপোর নির্ভর করালেই হলো ? নিজে মানলেই যথেষ্ট; আর কে আছে তোমার যে তার জন্যে এই দিন নেই রাত নেই খেটে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। তার চেয়ে যাদের জিনিস—"

বনবিহারী চমকে উঠলো; কিন্তু তরঙ্গ হয়তো ইচ্ছে করেই সে কথা গ্রাহ্য করলো না ; হয়তো ইচ্ছে করেই কৌতুকের হাসি হেসে বললে—

"অন্তত আমার তো মতামত তাই ; যাদের জিনিস তাদের দিয়ে এই বয়সে কাশী কি বৃন্দাবন গেলেই মিটে যায় ল্যাঠা।"

বনবিহারীর অপ্রস্তুত জড়ত্বভাব কেটে গেল এক মুহূর্তে; কে যেন অজানিতে ওকে ছোরা মেরেছে এমনিভাবে চমকে উঠে তাকালো তরঙ্গর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে যে হাসিটুকু বাঁকা তলোয়ারের মত ওর অধরোষ্ঠে বারেকের জন্যে ভেসে উঠলো, সে দিকে তাকিয়ে তরঙ্গ না শিউরে পারলো না।...

বনবহারীর মনের কোন অতলে তলিয়ে থেকেও যে কথাটা হঠাৎ একটা সূত্র ধরে মুখের ওপোর ইঙ্গিতে ভেসে উঠেছিল, সেদিকে তাকিয়ে তরঙ্গ যেন হঠাৎ কোনও কথা খুঁজে পেল না বলবার মত; কিছুক্ষণ বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—

"রাগ করলে ?"

"রাগ ? তোমার ওপোর ?"

হঠাৎ বনবিহারী হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। যেন সে এতদিনের বন্ধ হাসির বাঁধ খুলে দিয়েছে মন থেকে, এ হাসির উৎসও খুঁজে পেয়েছে যেন আজ নতুন করে।

তরঙ্গ নির্বাকে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, ওর সমস্ত মুখের ওপোর ভেসে উঠেছিল মুমূর্ষুর মত বিবর্ণতা। সেদিকে লক্ষ্য না রেখে বনবিহারী বলে চললো—

"রাগ করবো ? তোমার ওপোর ? কেন ?

একটু থেমে বললেঃ—

"হয়তো করেছিলাম কোনও দিন—কিন্তু সেদিন যে ভুল আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল, আজ তা না করাও তো আশ্চর্যের কথা নয়। বরঞ্চ স্বাভাবিক; কারণ আমি তোমায় চিনেছি। এই চেনার মূল্যটুকুই এখন আমার তোমার প্রাপ্য, আর কিছু নয়।"

বনবিহারী তাড়াতাড়ি, একটু তাড়াতাড়িই বার হয়ে হয়ে গেল ঘর ছেড়ে ; তরঙ্গ ওকে বাধা দিল না, যেমনভাবে

বসেছিল, তেমনিভাবে বসেই তাকিয়ে রইল দরজার দিকে, যে দরজা দিয়ে বনবিহারী এখনি চলে গেছে।

বাইরে কার পায়ের শব্দ হলো ;

একটু পরে দরজা পথে যাকে দেখা গেল সে বনবিহারী নয়, বড়খুড়ী।

বড়খুড়ী বনবিহারীকে এই ঘর থেকে একটু দ্রুত পায়ে বার হতে দেখে মনে মনে যাই আন্দাজ করুক, মুখে বিন্দু বিসর্গও প্রকাশ করার উপায় ছিল না তার।

তাই মুখে চোখে অপার সহানুভূতি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো খানিক পরে; বললে—

"বেলা যে পড়ে এলো বৌমা, মুখে কিছু দেবে না? সেই সকাল থেকে জলটুকু পর্যন্ত তো মুখে দাওনি বাছা—"

বড়খুড়ীকে দেখেই মুখভাবের পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তরঙ্গর; অন্তরের তিক্ততা যতখানি সম্ভব চাপা দিয়ে জানালে—না, সে কিছু খাবে না আজ।

খুড়ী চলে যাচ্ছিল; তরঙ্গ ফিরে ডাকলো—

"খুড়ী, শোনো—"

খুড়ী ফিরলে জিজ্ঞাসা করলো—

অঘোর ঠাকুরপো কি বাড়ি আছে আজ?"

খুড়ী জানালেন—

"থাকবে না কোথায় যাবে বাছা? টাকা চুরীর মিছে অপবাদে কি চাদ্দিকে ওর মুখ দেখাবার উপায় রেখেছ তোমরা? আমার মন মানে না, তাই তোমাদের কাছে বার বার ছুটে আসি। অন্য কেউ হলে—"

তরঙ্গ উঠলো; চৌকীর ওপোরে পাড়ের ঢাকনায় ঘেরা হাত বাক্সটা খুলে নতুন চকচকে একটা টাকা বের করে খুড়ীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—

"কিছু মনে করো না যেন; জানো তো, সংসারে থেকেও সংসারের ওপোর আমার কোনও হাত নেই।"

সহানুভূতি উছলে উঠলো খুড়ীর—

"আহা, সত্যিই তাই; তুমি কি করবে বাছা, কি হাত আছে তোমার বাছা!...নইলে এ বাড়ির সর্বময়ী কর্তৃ হয়েও কেউ নও, একি যা তা কথা! কত জন্মের অভিশাপ—"

যে ইঙ্গিতটা খুড়ীর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তরঙ্গ সেটা ইচ্ছে করেই ঝেড়ে ফেললে গা থেকে; বললেঃ—

"অঘোর ঠাকুরপোকে একবার ডেকে দিও তো খুড়ী, বলো যে আমি ডেকেছি তাকে; বুঝলে?"

"সে আর বলবো না? এখুনি বলছি গিয়ে। হাজার হোক ও তোমাদেরই নিজের লোক, দোষ ঘাট যাই করুক তোমরা না ক্ষেমা দিলে কে ক্ষেমা দেবে মা? জগতে তোমরা ছাড়া আর ওর কে আছে মা?"

টাকাটা আঁচলের খুঁটে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

তরঙ্গ বহুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে বসে রইল, তারপরে ক্যাশবাক্স খুলে একে একে বার করতে লাগলো কতকগুলো পুরানো কাগজপত্র, খামে মোড়া চিঠি।...খানিক পরে দরোজার পাশে দেখা গেল অঘোরচন্দ্রকে।

দোহারা চেহারা, বাবরী ছাঁটা চুল, পায়ে জরীর নাগরা।

সমস্ত অবয়ব ঘিরে কেমন একটা ক্রুর ভাব জড়ানো, মুখে চোখেও ফুটে উঠেছে ওরই কেমন একটা অস্পষ্ট ছায়া। ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই তরঙ্গ ডাকলেঃ—

এস ঠাকুরপো; একখানা চিঠির ঠিকানা ইংরেজীতে লিখে দিতে হবে তোমায়, তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

অঘোর ঘরে এসে বসলো ; পকেট থেকে পান নিয়ে মুখে পুরে বললেঃ—

"চিঠির ঠিকানা? ইংরেজীতে? এত দিন পরে আবার কাকে কোথায় দরকার পড়লো বৌদি?"

মুখের কথা আর চোখের ইসারায় ওর যে কৌতুক ভেসে উঠলো তরঙ্গ তার জবাব দিলে না ; এরই আগে বার করা এক-গাদা চিঠিপত্রের মধ্যে থেকে একখানা বহু পুরাতন রংধরা খাম বা'র করে একপাশে রাখলে, তারপরে একখানা খামে মোড়া চিঠি আর একটা দোয়াত কলম এনে রাখলে সামনেঃ—

"এই ঠিকানাটা লিখতে হবে খামের ওপোর, বেশ স্পষ্ট করে, ঝরঝরে করে।"...

একটু থেমে যেন নিজের মনেই বললেঃ—

"অনেক দিন হয়ে গেছে কিনা তাই ঠিকানাটা একটু ময়লা হয়ে এসেছে।...তা হোক, তবু ঐ ঠিকানাতেই একখানা চিঠি দিয়ে দেখি, কেউ কোথা থেকেও যদি জবাব দেয়! নিজের তো কেউ আজ বেঁচে নেই, খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোনের একজনও যদি আজও বেঁচে থাকে, যদি খোঁজ নেয় এ চিঠি পেয়ে—তাহলে......"

কালি কলমে ধরে ধরে খামের ওপোর ঠিকানাটা লিখতে লিখতে অঘোর মুখ তুলে তাকালে; ওর মুখে সেই রহস্যময় হাসি : প্রশ্ন করলেঃ—

"তা হলে কি?—"

অন্যমনস্ক তরঙ্গ বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেঃ—

"এক জায়গায় একটানাভাবে থেকে সব মানুষেরই বিরক্তি ধরে, আমারও ধরেছে অঘোর ঠাকুরপো, তাই ভাবছি দিন কতক নয় ঘুরে আসিগে কোথাও থেকে।"

"ও—"

বলে অঘোর আবার লেখায় মন দিলে।

(ক্রমশ)

মৃত রজনী

শ্রীঅমিয়া সেন

পাশের বাড়ির ওয়াল-ঘড়িতে সশব্দে রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল।

রান্নাঘরের কাজ সারিয়া উৎসা এইমাত্র উপরে আসিল। রান্নাঘর নয় ত যেন বয়লারের ঘর। একে বৈশাখ মাসের গরম তার উপর আগুনের তাত...বাপরে......শয়নকক্ষও প্রায় তথৈবচ ......আলো নাই......বাতাস নাই......ঘরে ঢুকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।

উৎসা মশারি তুলিয়া নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া মৃদু পদসঞ্চারে ছাদে উঠিয়া আসিল।

রাস্তার অপরদিকে উৎসার বাড়ির ঠিক সম্মুখের বাড়িটাতেই আজ বিবাহ......সারাদিন ধরিয়া এ বাড়ির উৎসব-কোলাহল কর্মরতা উৎসার মনটাকে কেবলই বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে।

ঐ বাড়ির বড়মেয়ে লিলির বিবাহ। লিলিদের উৎসা নামে চেনে,—ধনীলোক। প্রথম মেয়ের বিয়ে, খরচ করিবে খুব। আজ চার-পাঁচ দিন ধরিয়া দোকানদাররা শুধু দামের জিনিসই সরবরাহ করিতেছে। ফার্নিচার—টি-সেট, কাপড়-চোপড়, গয়না—কত জিনিসই যে মোটরে মোটরে আসিতেছে, তার অন্ত নাই। লিলির মা নিজে সব জিনিস দেখিয়া শুনিয়া ঘরে তুলিতেছেন।

রাত্রি দুইটায় লগ্ন।

বর বোধ হয় আসিয়া গিয়াছে।

উৎসা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। ......সে কতদিন! সাত বৎসর......চুঁচুড়ার বিশিষ্ট ডাক্তার দেবকুমার রায়ের মেয়ের বিবাহ ......কত ধুমধাম—কত কোলাহল......সে-ও এমনি—সেদিনও বর আসিয়াছিল।......

ও বাড়িতে সানাইয়ের মধুর আওয়াজ......আলোক মালায় ও পুষ্পসজ্জায় সুসজ্জিত একখানি হুডখোলা মোটর ধীরে ধীরে আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে......মাঝখানে ফুলের মালা গলায় দেওয়া ঐ বুঝি বর!

বাঃ—কী সুন্দর! উৎসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দেবকুমার রায়ের জামাই দেখিয়াও সেদিন শহরশুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, একবাক্যে বলিয়াছিল, বাঃ—কী সুন্দর! সেদিন কি উৎসা জানিত, ঐ সুন্দর ললাটের অন্তরালে এমন অদৃষ্ট!

উৎসা শুনিয়াছে, লিলি নাকি এখন শ্বশুরবাড়ি যাইবে না। দ্বিরাগমনের পর হইতে আবার এখানেই থাকিবে। ওর সেকেণ্ড ইয়ার চলিতেছে, আই এ-টা পাশ না করিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইবার ইচ্ছা নাই।

উৎসাও বিয়ের পর এক বছর চুঁচুড়ায় ছিল। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ও চিত্রবিদ্যা শিখিতেছিল। ছেলেবেলা হইতে ছবি আঁকার দিকে ওর দারুণ ঝোঁক।

সেই দিনগুলির রমণীয় চিত্র যেন আজ ঐ লিলির বিবাহের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

ছুটিতে ছুটিতে সোমনাথ চুঁচুড়ায় আসিত—সোমনাথ তখন এম এস সি পড়িতেছিল।

সেই আনন্দ ঘন মধুর দিন......

উৎসা নিমীলিত নেত্রে সুদূর অতীতের দিকে একবার চাহিল।

আসিয়াই সোমনাথ উৎসার স্টুডিওতে চুপি চুপি প্রবেশ করিত। হয় ত উৎসা নূতন একখানা চিত্রের পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে, সোমনাথ আস্তে তুলিশুদ্ধ হাতখানা পিছন হইতে চাপিয়া ধরিত; চমকিয়া উৎসা পিছন ফিরিত—

চাহিয়াই তার লাজনম্র শির নিঃশব্দে স্বামীর বাহুমূলে লুটাইয়া পড়িত।

সোমনাথ মৃদু স্বরে তার কানে কানে বলিত,

তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশ,
একটি করে পাপড়ি মেলে প্রেমের বিকাশ।

বিয়ে বাড়িতে বাজনার বিরতি পড়িয়াছে, বোধ হয় সাময়িক। উৎসার সেদিকে মন ছিল না, সে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল,—সেই স্বর্গ আজ কোথায় গেল!

জীবন সম্বন্ধে কী সুন্দর ধারণাই না ছিল মনে! দুটি তরুণ তরুণীর প্রেমপূর্ণ সুন্দর সংসার! সংসারের কাজের ফাঁকে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিবে......

সোমনাথ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তার পিছন পিছন আসিবে—আস্তে খোঁপাটি ধরিয়া দুটি ফুল হয়ত পরাইয়া দিবে ......

সেদিন কি উৎসা জানিত, জীবনটা শুধুই কাব্যময়! কোথায় সেই স্টুডিও! পনের টাকা ভাড়ার বাসা বাড়িতে শয়ন-স্থানই ভালোরকমে সঙ্কুলন হয় না,—তায় স্টুডিও!

আর গান! পিতা অর্গান একটা দিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানাভাব বশত সোমনাথ সেটা বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে মুখে গানও উৎসা আর করে না ; বাস্তবিক তার গানের উৎস শুকাইয়া দিয়াছে।

আর সোমনাথ!

বিয়ে-বাড়িতে আবার বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ আজ ৬০, টাকা মাহিনার কেরাণী। তার সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—বিদ্যার সুউচ্চ গৌরব ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে।

রাস্তার ওপারে উৎসার মনে হইল, জীবনের অতীত কালের তীর ভূমিতে বাঁশরী অর্তস্বরে কাঁদিতেছে। এত কাছে তবু সোমনাথ বোধ হয় উৎসার মুখখানাও ভুলিয়া গিয়াছে। সকাল আটটায় নাকে মুখে গুঁজিয়া আপিসে ছোটে, ফেরে সন্ধ্যা

সাতটায়। আসিয়াই খাওয়া, ক্ষুধায় সে দাঁড়াইতে পারে না। টিফিনের পয়সাটা সে সংসারের জন্য সঞ্চয় করে। নহিলে কুলাইয়া উঠে না। খাওয়ার পরে দুটি চোখ জড়াইয়া নামে ঘুম।

দীর্ঘ সাত বৎসর এই একই ভাবে চলিয়াছে। প্রথম প্রথম উৎসা কবরীতে পুষ্প রচনা করিত—হরিণীর মত দুটি আয়ত আঁখিতে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা লইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত...কিন্তু ক্লান্ত সোমনাথ...পরিশ্রান্ত সোমনাথ সেদিকে তাকাইবার অবসর করিয়া উঠিতে পারিত না। দুঃসহ বেদনায় উৎসার সকল সজ্জা মলিন হইয়া গিয়াছে।

রবিবার দিনটি অবসর, কিন্তু সেদিনও কি সোমনাথকে ধরিবার ছুঁইবার উপায় আছে। তার আত্মীয় বন্ধু, তার সমাজ, তার কর্তব্য তাহাকে উৎসার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া নেয়।

বিয়ে বাড়িতে ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছে। বোধহয় বর প্রদক্ষিণ করা হইতেছে।

অমনি করিয়া সাতবার ঘুরিয়া বর বন্দনা করিয়া উৎসাও পরম নির্ভরতায় গিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তার নয়নেও এমনি আশা আকাঙ্ক্ষার শত দীপ সেদিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

সে দীপ কে নিবাইল।

উৎসা যেন অস্থির হইয়া উঠিল......

ঐ যে মেয়েটি আজ সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ওকি সত্যই সুখী হইতে পারিবে? উৎসার মত ওর জীবন ত এমনিভাবে বাস্তবের কঠিন চক্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে না!

হে ঈশ্বর, ও সুখী হোক—জগতের সকল কুমারী মেয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হোক, প্রত্যেক নববিবাহিতা মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

এ ছাড়া উৎসার আজ যেন আর কামনা করিবার কিছু নাই।......চোখে তবু জল আসে।......ছাদ হইতে সে নামিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া মশারির এক পাশ তুলিয়া রাখিয়া শয্যার একাংশে বসিল।

পরিশ্রান্ত সোমনাথ ঘুমাইতেছে। কোটরগত দুটি চক্ষুর নীচে অপরিসীম ক্লান্তির কালি।

উৎসা নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। দশ বৎসর পূর্বের সেই স্বাস্থ্যবান যুবক আজ কোথায় গেল! চোখে মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার সেই সোনার স্বপ্ন কই!

ঘুমের ঘোরে সোমনাথ পাশ ফিরিল। একখানা হাত আসিয়া উৎসার কোলের উপর পড়িল।

উৎসা ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, জাগো, ওগো, একবার জাগো—

তন্দ্রাচ্ছন্ন সোমনাথ শুধু কহিল, উঁ—

– একবার জাগো না, চল একটু ছাদে যাই—উত্তরে আর একবার উঁ—বলিয়া সোমনাথ ওপাশ ফিরিয়া ঘুমাইল।

পাশের বাড়িতে তখন পুরোদমে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। সোমনাথের তন্দ্রাবচেতন চেতনার মধ্যে তার শব্দ প্রবেশ করিতে পারিল না।

উৎসা তার একখানা হাত মুঠার মধ্যে ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ঘড়িতে দুইটা বাজিল।

উৎসা চমকিয়া স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘুম কিছুতেই আসে না।...

লিলির বিবাহের আলো আর বাঁশী কেবলই যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে,—আয় ওরে আয়!

কিন্তু নাঃ, ছাদে আর উৎসা যাইবে না।

কী হইবে দুঃখ করিয়া! মানুষের জীবনে সব ইচ্ছাই কি পূর্ণ হয়! হয় না। তবুও বাহিরের আলোকপ্লাবন আজ অন্তরে বিপ্লব আনিতে চায়...হৃদয় বেদীর পাদমূলে নির্বাণ প্রায় প্রদীপ শিখাটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া ওঠে...মনের মধ্যে অনাদিকালের বঞ্চিত বুভুক্ষু প্রেম বিলাপ স্বরে সকরুণে ডাকে, জাগো, ওগো জাগো—

জানালার পাশে মাথা নোয়াইয়া উৎসা চোখ বোজে... মুদিত চোখের কোণ বাহিয়া টস্ টসে দুফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ে।......

১২

কিন্তু বিষয়টা যত সহজে নবদ্বীপ বিনোদের ঘরে বসে মিটিয়ে দিয়ে এসেছিল আর খানিকটা মান অভিমানের পর যে মুরলী আর মনোরমার মধ্যে যত অল্প সময়ে মিটে গিয়েছিল পাড়ায় তত সহজে আর তত তাড়াতাড়ি এর শেষ হোল না। ভোরে উঠে খালের ঘাটে হাতমুখ ধুতে গিয়ে নবদ্বীপ দেখতে পেল, এরই মধ্যে সেখানে এক জটলা বেঁধেছে। কারো হাতে গাড়ু, কারো হাতে ঘটি, সুবল একটা নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করছিল আর মাঝে মাঝে এক একটা মন্তব্য করছিল। কিন্তু দূর থেকেই নবদ্বীপ লক্ষ্য করল, সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং এদের মধ্যে বিষ্টু সা'র হাতমুখ নড়ছে সবার চাইতে বেশি, অথচ যার কথায় উত্তেজনাটা সঞ্চারিত হচ্ছে সেই সুবলের মনে যে কিছুমাত্র বিক্ষোভ, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য আছে তা বোঝবার উপায় নেই। নবদ্বীপ যখন একেবারে কাছে এল, তখন দেখা গেল, সুবল অত্যন্ত নিরীহভাবে কেবল দাঁত মাজছে আর বিষ্টু সা বলছে, "শুধু কি বাজারেই আগুন লেগেছে সুবল, খালের জলেও আগুন লেগেছে। কাল বিকাল থেকে জাল ফেলে ফেলে দুটো হাত আমার অবশ হয়ে গেছে; এক বেলার মাছও যদি পেয়ে থাকি। আমার আর কি।—মাছের জন্য আমার খাওয়া ঠেকে থাকে না, কিন্তু নাতি কয়টি যা হয়েছে- পায়তো কাঁচা মাছ চিবিয়ে খায়।—ওরে, ভোগে যদি তোদের থাকবেই এমন হবে কেন। বেশি দিনের কথা নয়, তোমারও মনে পড়তে পারে সুবল, হাটে বাজারে তখন তুমি যাওয়া আরম্ভ করেছ, জলে নামলে মাছ গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উঠে আসতে চাইত, এমন মাছ ছিল এই খালে। আর এখন মাছের গন্ধও কি পাও জলের কাছে আসলে? কী করে পাবে সুবল, এত পাপ, এত অনাচার, কদাচারে মানুষের ভোগের জিনিস নষ্ট হবে না তো, হবে কিসে?"

ইঙ্গিতটা বুঝতে নবদ্বীপের বাকি রইল না। আর আলোচনাটা যে অত্যন্ত অকস্মাৎ বিষয়ান্তরিত হয়েছে সে কথাও অনুধাবন করা শক্ত নয়। বিষ্টু যাই বলুক, তার হাতমুখ নাড়া আর লাফালাফিতে নবদ্বীপের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সবচেয়ে আহত হোল সে সুবলের ব্যবহারে। এত নির্ভর করে সে সুবলের ওপর, আর সেই সুবলই কিনা তাদের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকিয়ে তোলে, জব্দ করার ফাঁক খুঁজে বেড়ায়; কিন্তু ভেবেছে কি সুবল ; নবদ্বীপ একটু ঢিল ছেড়েছে বলে নিজেকে সে একটা হোমরা চোমরা বলে ভেবে রেখেছে বুঝি! বুড়ো হোলেও এখনো শুকনো হাড়ে নবদ্বীপের ভেলকি খেলে যায়, এখনো ওঠ্ বল্‌লে লোকে তার কথায় ওঠে, 'বোস্' বললে সবাই বসে পড়ে—যা দিয়ে যা করে গেল নবদ্বীপ ততখানি করতে অনেক দেরি সুবলের।

নবদ্বীপকে যেন এইমাত্র দেখতে পেল বিষ্টু। তাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'তুমিই বলনা নবুদা, মাছ,—মাছের এরা দেখেছে কী, আমাদের তখনকার কথা যদি বলি, এরা ভাববে গল্প করছে—'

নবদ্বীপ একটু হাসল, 'তা তো ভাবতেই পারে। তুমি তখনো গল্প করতে এখনো তাই কর, সারাজীবন গল্প ছাড়া তুমি আর কী করেছ ভেবে দেখ দেখি।'

হঠাৎ নবদ্বীপের এই আক্রমণের ভঙ্গিতে বিষ্টুর মুখে কথা জোগাল না। একটু পরে বিষ্টু কি বলতে যাচ্ছিল, সেদিকে লক্ষ্যই করল না নবদ্বীপ। মুখ ধোয়া শেষ করে যেতে যেতে সুবলকে লক্ষ্য করে বলল, 'বাজারে যাওয়ার আগে একবার আমাদের বাড়ি হয়ে যেও তো সুবল।'

সুবল বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু আমার যে বড় তাড়াতাড়ি ছিল জেঠামশাই। আচ্ছা দেখি, যদি পারি তো আপনাদের বাড়ির ওপর দিয়েই যাব।'

এ কী করে বসল নবদ্বীপ? কেন সুবলকে নিজে বাড়িতে ডাকতে গেল? লোকে ভাববে কী? নিশ্চয়ই মনে করবে—অনুনয় বিনয় করে হাতে পায়ে ধরে সুবলকে তা বিরোধিতা থেকে নিরস্ত করেছে। নাহোলে প্রতিপক্ষকে সে এমন করে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল? নবদ্বীপ যদি শাসিয়েও দেয় সুবলকে, তাহোলেও হয়তো লোকে আজকাল আর সে কথা বিশ্বাস করবে না। কারণ নবদ্বীপ যে একটু ঢিল ছেড়ে দিয়েছে, সে যে আজকাল খাতির করতে চায় সুবলকে একথা সবাই জানে। তাই, কোন রকম শত্রুতাই যদি সুবল আর না করে, লোকে ভাববে, নবদ্বীপই যেচে তার সঙ্গে আপোষ করে ফেলেছে। নবদ্বীপের মনে হোল—এর চেয়ে সুবল যদি আজ না আসে, এক আধটু বিরোধিতা করে তার সঙ্গে—সেই বরং ভালো। নিজের ওপর কেমন একটু রাগই হোল নবদ্বীপের। সত্যিই কি এত অল্পতেই আজকাল ভয় পেয়ে যায় নবদ্বীপ, এত এড়াতে চায় ঝামেলাকে? বিনয় করে করে দৌর্বল্য এবং নির্ভরতার ভাণ করে করে সে কি সত্যিসত্যিই শেষে অসহায় শক্তিহীন হয়ে পড়ল?

হালোটের পথ দিয়ে যেতে যেতে হরিখোলার কাছে এসে নবদ্বীপ দেখল গোবরের ধামা কাঁকে নিয়ে নসুর মা চোখ মুখ নেড়ে কী যেন বলাবলি করছে। দু'চারটি করে পাড়ার নানা বয়সী মেয়েরা এসে জমছে সেখানে। কালকের আলোচনা যে এখানেও চলছে, দেখা মাত্রই একথা মনে হোল নবদ্বীপের। কিন্তু নবদ্বীপ যেন তা লক্ষ্য করেনি, এমনিভাবেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এ ধরণের আন্দোলন আলোচনা আজ নতুন নয়। সামান্য কিছু একটা ঘটলেই সমস্ত পাড়াটা বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই ঘটনার আলোচনাই কিছুদিনের জন্য একমাত্র হয়ে থাকে। সৃষ্টি হয়তো দু'একজনেই করে; কিন্তু উপভোগ করে সকলে মিলে। নবদ্বীপ জানে, অন্যান্য ব্যাপারের মত এটাও আপনা থেকেই থেমে যাবে। যে যত লাফালাফি করুক, নবদ্বীপ বেঁচে থাকতে তার ছেলের গায়ে কেউ হাত তুলতে সাহস করবে না। বিশেষ করে মধু সা অত্যন্ত গরীব, তার সাহসই হবে না নবদ্বীপের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ বাধাতে। পরোক্ষে যে যাই বলুক, যে যত গাল মন্দই করুক তাতে কী এসে যায় নবদ্বীপের। সামনাসামনি কেউ কিছু বলুক না, তাকে নবদ্বীপ দেখে নেবে।

তবু, কি ভেবে গাড়ুটা হাতে করেই নবদ্বীপ ঘুরতে ঘুরতে মধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হোল। মধুর মেয়ে রঙ্গী উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল, নবদ্বীপকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, 'তালুই মশাই যে, এত সকালে।' নবদ্বীপ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ মা, এলাম, মধু বুঝি এখনো বাড়ি আসেনি, মা কোথায় তোমার।' রঙ্গী বলল, 'মা? ঘরের মধ্যেই আছে, আপনি বারান্ডায় বসুন এসে, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ মা, একটু ডেকেই দাও। দু'একটা কথা বলবার দরকার আছে নাত বউর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি সেরে নিই। বেশি দেরি করবার তো উপায় নেই। এখনি আবার দোকানে ছুটতে হবে।'

নবদ্বীপকে দেখেই সুলোচনার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। ভিতরে ভিতরে কোন একটা মতলব না এঁটে নবদ্বীপের মত লোক তার বাড়িতে এমন অযাচিতভাবে ছুটে আসেনি। কি ফন্দি সে এঁটে এসেছে সেই জানে। সুলোচনা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মানদাও বাড়ি নেই এই সময়, সাত সকালে উঠে কোথায় ফুল তুলতে বেরিয়েছে। রাজ্যের ফুল জড়ো করে না আনতে পারলে তার আর সন্ধ্যাপূজো হয় না। চোখের ইসারায় মেয়েকে কাছে থাকতে বলে ঘরের বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়াল সুলোচনা।

রঙ্গী বলল, 'মা এসেছে। আপনি কী বলবেন বলছিলেন যেন তালুই মশাই।'

নবদ্বীপ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'কথা এমন কিছু নয়। আচ্ছা মা, তুমি আমার জন্য এক ছিলুম তামাক সেজে নিয়ে এসো দেখি আগে।'

ইঙ্গিতটা রঙ্গী তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল, নবদ্বীপ তাকে সরিয়ে দিতে চায়, তার সামনে কোন কথা বলবার তার ইচ্ছা নেই। কিন্তু সরে যেতে বললেই সরে যাবে রঙ্গী অত সহজ মেয়ে নয়। বেশ একটু অপ্রতিভতার ভাণ করে বলল, 'ভারি লজ্জা দিলেন তালুইমশাই। বাবা বাড়ি না থাকলে তামাকের সাথে কোন সম্বন্ধই থাকে না আমাদের। আর এমন কুঁড়ে মানুষ আমার বাবা এক ছিলিম ঘরে থাকতে আর তামাক মাখতে বসবে না। একজন লোক এলে যে এক ছিলিম তামাক সেজে দেব এমন জো' থাকে না।'

অতটুকু মেয়ে, কিন্তু ডেঁপোমি দেখ। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোল নবদ্বীপ। কিন্তু তেমনি সস্নেহে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তা মা লজ্জা তো পেতেই হয়। গেরস্থর ঘর এমন হলে চলবে কেন। আর আমাদের পাড়াগাঁয়ে পান, তামাকে মধ্যেই যত ভদ্রতা। আমার জন্য নয়, আমি তো আপনা আপনির মধ্যে; কিন্তু দূর থেকে অতিথ কুটুম কেউ যদি আসত কি অসুবিধায় পড়তে হ'ত বল দেখি। মধু যখন বাড়ি না থাকবে তুমি বরং আমার বাড়ি থেকে দু'এক গুলি তামাক আনিয়ে রেখ।' রঙ্গী বলল, 'এখন থেকে তাই করব তালুই মশাই।' নবদ্বীপ বুঝতে পারল মেয়েটি এখান থেকে কিছুতে নড়বে না। ক্রুদ্ধবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নবদ্বীপ অগত্যা ঘরের মধ্যে সুলোচনাকে সম্বোধন করে কথা আরম্ভ করল। রঙ্গী এখানে দাঁড়িয়ে আছে কি নেই তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না নবদ্বীপ, এই মুহূর্তে নবদ্বীপের কাছে তার কিছু মাত্র অস্তিত্ব নেই।

নবদ্বীপ বলল, 'খুব ফেঁদে টেঁদে কথা বলা তো আমার অভ্যাস নেই নাত বউ, তা বলতে পারে আমার নাতি মধু। কিন্তু বুড়ো মানুষের কাছ থেকে তা কেই বা শুনতে চায়, কেই বা আশা করে। কালকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে এসেছি নাত বউ। অতি তুচ্ছ ব্যাপার, তা আবার নিতান্ত আপনাআপনির মধ্যে। তা তো কালই মিটে গেছে কিন্তু পাড়ায় এমন কুচক্রী লোকের অভাব নেই যারা এই ব্যাপার নিয়ে একটা হৈ চৈ করবার চেষ্টা করবে। তুমি মেয়ে মানুষ, খবরদার, না জেনে শুনে কোন চক্রান্তে পা দিয়ে বস না যেন। ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্কে মুরলী যাই করে থাকুক শত হোলেও সে পুরুষ মানুষ। কিন্তু বাইরের লোকে, তোমার মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকে তো আর এসব ঠাট্টা-তামাসার কথা বুঝবে না। এ নিয়ে এমন আন্দোলন হৈ চৈ যদি চলে তারা হয়তো নানা রকম কিছু ভাবতে পারে। এখন মেয়ে তো আর তোমার নয় নাত বউ, পরের, অনেক দেখেশুনে, অনেক হিসাব করে চলতে হয়। তোমাদের ভালোমন্দ আমি যতটা দেখব, অন্যে তা দেখবে না, ওপর ওপর যত আত্মীয়তা যত সোহাগই দেখাক, একথা জেনে রেখ, সব চেয়ে নিকট আত্মীয় তোমাদের আমরাই। তোমার কোথাও লাগলে আমার যতটা বাজবে, আর কারো তেমন বাজবেনা।'

রঙ্গী কী বলতে যাচ্ছিল, নবদ্বীপ বাধা দিয়ে বলল, 'বুড়ো মানুষের কথায় তোমার তো থাকবার দরকার নেই মা! আচ্ছা আসি তবে নাতবউ।'

নবদ্বীপ চলে যেতে রঙ্গী বলল, 'তুমি বড় ভয়কাতুরে মা। দোষ করবে নিজেরা, আবার শাসিয়েও যাবে। আর তুমি তার জবাবে একটা কথাও বলতে পারলে না। বড়লোক আছে তো আছে, কারো রাগের মাথা তামাক খাই না কি আমরা।' হঠাৎ কি

পড়ে যাওয়ায় রঙ্গী খিল খিল করে হেসে উঠল, 'ঠিক কথা, তামাক তো কিছু আমাদের খাওয়াবেন বলে গেছেন ঠাকুরমশাই। দেখি, কত মাথা তামাক ঘরে আছে বুড়োর। তা আমি বুড়োর কাছ থেকে আদায় করে তবে ছাড়ব।'

সুলোচনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায় রঙ্গী। সব কিছু নিয়েই খেলা, না? তুই কখন কি সর্বনাশ ঘটিয়ে বসবি, আমার কেবল সেই ভয়। তার ন দরকার নেই বাপু। যার যার নিজের ঘর-বাড়িতে এখন যাও; আমি কারো ঝক্কি পোয়াতে পারব না। আজই জতকে চিঠি লিখে দিবি বুঝলি?'

রঙ্গী বলল, 'আমার বয়ে গেছে, অত ভয় আমার নেই। মি এই তামাক আনতে চললুম, দেখি কত তামাক আছে ড়োর ঘরে।'

সুলোচনাকে ভয় দেখাইবার জন্যই রঙ্গী দু' এক পা গিয়ে গেল, কিন্তু যা দেখতে পেল তাতে তার আর এগুনো ল না। বুড়ো নবদ্বীপ আবার গুটি গুটি পা ফেলে কি মনে রে ফিরে আসছে এদিকে। শুকনো কালো ঠোঁট দুটিতে তার দ্ভুত একটু হাসি লেগে রয়েছে।

যাতে সুলোচনাও শুনতে পায় গলার আওয়াজটা তখানি বড় করে নবদ্বীপ বলল, 'এই যে মা, তোমার তামাকের থাই ভুলে যাচ্ছিলাম, বুড়ো মানুষ বড় ভুল হয়ে যায়। ভদ্র-লোকের বাড়ি, এক আধগুলি মাখা তামাক না রাখলে কি চলে! ল, দু' একগুলি তামাক তুমি এখনই গিয়ে নিয়ে আসবে।'

রঙ্গী বিস্মিত হোল, ভীতও হোল একটু। বুড়ো কি ম শয়তান। নিশ্চয়ই আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা নেছিল। একটু বিব্রতভাবেই এবার রঙ্গী বলল, 'থাক তালুই-শাই, তামাকের এখন তো আর দরকার নেই। যখন দরকার হবে য়ে চেয়ে নিয়ে আসব।'

নবদ্বীপ নাছোড়বান্দা, 'কখন কোন জিনিসের দরকার বে গেরস্থের ঘরে তা কি বলা যায় মা। আগেই সব ঠিকঠাক রে রাখতে হয়। বেশ তুমি না যেতে পারো, মুরলীকে দিয়ে মিই বরং কিছু তামাক পাঠিয়ে দেব। শুধু মাখা তামাক লেই চলবে, না নাতবউ আবার মিশিটিশি ব্যবহার করে?'

কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই নবদ্বীপ গুটি গুটি পা ফেলে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। কিন্তু পথে নামতেই আবার সুলোচনায় পেয়ে বসল নবদ্বীপকে। না সত্যিই নবদ্বীপ বুড়ো য়ে গেছে, বড় ভুল হয় আজকাল, চালে তাঁর বড় ভুল হয়। কী দরকার ছিল তার যেচে এ বাড়িতে আসার। পাড়া সুদ্ধ সবাই একদিকে, আর নবদ্বীপ যদি একা একদিকে যায় তাতেও সে ভয় করে না। যতদিন বেঁচে আছে নবদ্বীপ কাউকে ভয় করে চলবে না। কিন্তু সবাই যখন শুনবে যে নবদ্বীপ সকালে এসেছিল মধুদের বাড়িতে তারা কি একথাই মনে করবে না যে নবদ্বীপ ভয় পেয়ে গেছে এবং আগে থাকতেই মধুর স্ত্রী-কন্যাকে দলে টানতে চেষ্টা করছে? তারপর, এও না হয় গেল। গিয়েছিলই যখন, ওদের সাবধান করে দিয়ে এলেই হোত। কিন্তু ছোট একটু মেয়ের কথায় সে এত ক্ষেপে গেল, এত রাগ হয়ে গেল তার যে বোকার মত সেই রাগটুকু না জানিয়ে এলেই তার চলল না? রঙ্গীকে এক ফোঁটা মেয়ে দেখলে কি হয়, ভিতরে ভিতরে ঝানু। নবদ্বীপের রাগও নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে। আর এক মাথা পাকা চুল নিয়েও এমন কাঁচা কাজ করে বসল নবদ্বীপ যে ওই এক ফোঁটা মেয়ের কাছে নিজেকে ধরা না দিয়েই সে পারল না? এতে কি ওরা আরও বিগড়ে যাবে না? এর ফলে এতটুকু বিশ্বাস, এতটুকু নির্ভরতাও ওরা রাখতে পারবে নবদ্বীপের ওপর?

বাড়িতে এসে হাতের গাড়ুটা নামিয়ে রাখতেই চোখে পড়ল মুরলী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নবদ্বীপ ছেলেকে ডেকে বলল, 'এই মুরলী, শোন, যাচ্ছিস কোথা।'

'যাচ্ছি না কোথাও। কেন।'

'তামাক মাখা আছে আমাদের বাড়িতে? নিশ্চয়ই আছে খবর তো কিছু রাখবি না, কালই আমি নিজে হাতে তামাক মেখেছি। বড় খুঁটিটা ভরতি আছে দেখ গিয়ে আমার ঘরে। তার কয়েক গুলি তামাক নিয়ে গিয়ে মধুদের বাড়িতে দিয়ে আয়। ওদের তামাক নেই ঘরে। আর শোন, এক বিড়ে সাদা তামাকও নিয়ে যাবি মধুর বউর জন্য। আমার শিয়রের কাছে তাকের ওপর আছে দেখ গিয়ে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাঙলা ভাষা বুঝিস না? আমি এই ওদের বাড়ি ঘুরে এলাম। ওদের ঘরে তামাক নেই। বলে এসেছি আচ্ছা, তামাক আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই গিয়ে শুধু বলবি, বাবা তামাক পাঠিয়ে দিলেন। রঙ্গীর হাতেই দিবি, বুঝলি?'

মুরলী বিস্মিত হয়ে নির্বোধের মত নবদ্বীপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নবদ্বীপের? না মুরলীর সঙ্গে সে ঠাট্টা করছে, পরীক্ষা করে দেখছে মুরলীকে?

(ক্রমশঃ)
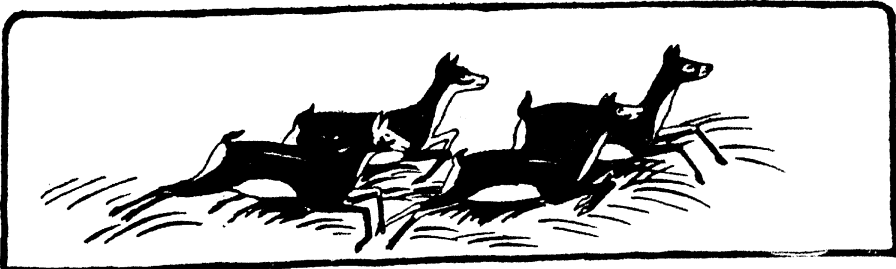
অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক রূপকলার ক্ষেত্রে যে নূতন আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, নন্দলাল সেই আন্দোলনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত ছিলেন। নন্দলালের প্রভাবে এই আন্দোলনের রূপ এতই পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে আধুনিক রূপকলার সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। এই নূতন অধ্যায়ের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তার আলোচনার চেষ্টা করব।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মধ্যে পার্থক্য কেবল অঙ্কন রীতি বা চিত্রের আঙ্গীকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই পার্থক্য প্রকৃতিগত। স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের পরিণতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ব্যবধান এনেছে। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের মানুষ। বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁর মন পরিপুষ্ট। সর্বোপরি প্রগতিশীল নব্যভাবাপন্ন ঠাকুর পরিবারের প্রভাব স্বীকার করতে হয়।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় নন্দলালের প্রথম জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজের যে অংশ তখনও [illegible] গ্রহণ করেনি, যেখানে প্রাচীন সংস্কার ও সংস্কৃতি কেবল মাত্র অতীতের ধ্বংসাবশেষ মাত্র নয়, যে সমাজে হিন্দু ধর্ম সংস্কার তখনও প্রাণবান, সেই ভাল-মন্দ সংস্কারে জড়িত সমাজে নন্দলালের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে প্রাচীন ভারতীয় রূপকলার মূল্য অতীতের ইতিহাস ও দেশের সম্পদরূপে, কিন্তু তাঁর মন কোনদিনই এই তথাকথিত প্রাচীন ভারতীয় রূপ সৃষ্টির আদর্শে মুগ্ধ হয়নি। নন্দলালের কাছে প্রাচীন ছিল অনেক নিকটের, তাই তাঁর পক্ষে সংস্কারগত মন নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় রূপকলাকে দেখতে পারা স্বাভাবিক। এই জন্যই আমরা দেখব অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক মন নিয়ে প্রাচীনকে দূরের থেকে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। নন্দলাল প্রাচীন মনোভাব নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে আধুনিক কালে প্রবেশ করলেন। আধুনিক রূপকলার এই আন্দোলনের সূচনায় দেখি অবনীন্দ্রনাথের মনের গতি চলেছে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে, নন্দলালের মনের গতি অতীত থেকে বর্তমানে। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মধ্যে মূল পার্থক্য এই। নন্দলালের অতীত থেকে বর্তমানে আসবার চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের আদর্শকে কিভাবে পরিবর্তিত করেছে দেখাবার চেষ্টা করব।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুবক নন্দলালের সাক্ষাৎ ১৯০৫ সালে। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ছবি নন্দলালকে আকৃষ্ট করেছিল এবং অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে নন্দলাল দীর্ঘকাল অনুসরণ করতে পারেননি। কারণ দুজনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। এই জন্যই অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব নন্দলালের মধ্যে স্থায়ী হতে পারেনি। পূর্বেই বলেছি নন্দলালের মন ছিল প্রাচীনের প্রতি আস্থাবান, এই জন্যই তাঁর চিত্র রচনার মূল প্রেরণা ছিল পৌরাণিক। পুরাণ আখ্যানকে অবনীন্দ্রনাথের
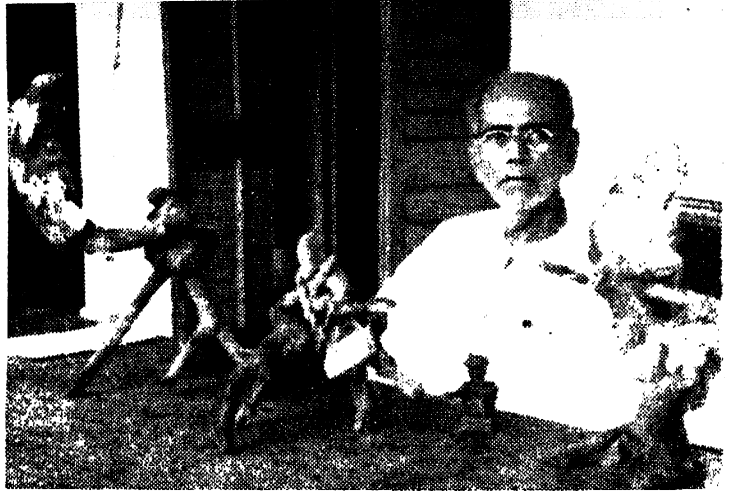
অবনীন্দ্রনাথ

নন্দলাল

আদর্শের মধ্য দিয়ে তিনি দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করলেন। নন্দলালের **এই চেষ্টার দ্বারা** ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত **সুখ দুঃখের** অনুভূতি প্রকাশিত হল। নন্দলালের অঙ্কিত **'সতী দেহত্যাগ'**, 'শিব ও সতী', 'তাণ্ডব নৃত্য' প্রভৃতি চিত্রে দেখা যায় পৌরাণিকের আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা।

পৌরাণিকের প্রতি আকর্ষণ নন্দলালকে প্রাচীন মূর্তি-শিল্পের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ভারতীয় মূর্তির প্রভাব নন্দলালের মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী হয়েছে। এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হননি, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মোগল চিত্রকলার প্রতি। নন্দলালের ভারতীয় মূর্তির দিকে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে কারণ ইতিপূর্বে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই সঙ্গে নন্দলালের আর একদিকের কথা উল্লেখ করতে হয়—তাঁর আলংকারিক প্রতিভা এবং রূপের (Form) প্রতি আকর্ষণ। এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের আর একবার তুলনা করা যাক।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ বর্ণময়, বর্ণের আশ্রয়ে তিনি রূপকে প্রকাশিত করেছেন তাঁর ছবিতে। নন্দলালের কাছে জগৎ বিচিত্ররূপে গড়া, বর্ণ সেই রূপকে বৈচিত্র্যময় করে মাত্র। এই কারণে নন্দলালের মন সহজে ভারতীয় মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ভারতীয় মূর্তির আলংকারিক গুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি যে ভারতীয় আলংকারিক গুণকে প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন, তার পরিচয় তাঁর প্রথম জীবনের কাজে আমরা পাই। নন্দলালের এই আলংকারিক বোধ Realistic Moghal চিত্রের চেয়ে রাজপুত চিত্রের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং রূপের (Form) প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন অজন্তার চিত্রের অনুকরণের মধ্যে। এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারব অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকে এবং অবনীন্দ্রনাথের আদর্শকে অনুকরণ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ থেকে তিনি কত দূরে চলে এসেছেন। এই পার্থক্য সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন রীতি (Wash) নন্দলালের রচনাকে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শের গণ্ডির মধ্যে টেনে রেখেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের পার্থক্য কোথায় এবং তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা হোলো। এখন নন্দলালের দ্বারা আমাদের চিত্রে কি পরিবর্তন ঘটেছে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় অবনীন্দ্রনাথ থেকে যেমন Aesthetic আন্দোলন শুরু, তেমনি নন্দলালের মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের Aesthetic আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হোলো ভারতীয় ক্লাসিক রূপ সৃষ্টির আদর্শ। অবনীন্দ্রনাথের Atmosphere effect-এর পরিবর্তে নূতন করে দেখা দিল ছবির আলংকারিক রূপ। অর্থাৎ Space-এর পরিবর্তে Surface দেখা দিল। বর্ণকে অতিক্রম করে রূপ প্রধান হল।

শিবের বিষপান —শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

অবনীন্দ্রনাথ থেকে দেখা দিল দিয়েছিল Aesthetic revival, নন্দলাল থেকে দেখা দিল, Classical Expression. প্রাচীন রূপকলার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে আধুনিক ভারতীয় চিত্রের দুই অধ্যায়। বলা বাহুল্য অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের মধ্যে এই পার্থক্য আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়নি, অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং তাঁর স্টাইলকে আশ্রয় করে তারি গণ্ডিকে অতিক্রম করার চেষ্টা নন্দলালের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

নন্দলালের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য যে কারণে ঘটেছে, তাঁর নিজের সতীর্থদের সঙ্গে মূলগত পার্থক্যও সেই কারণে। চিত্রকর নন্দলালের প্রভাব প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা দেয় Indian Society-র প্রথম ছাত্রদের মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল উভয়েরই প্রভাব এই সময়ের চিত্রকরদের

ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে। অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রথম ছাত্রদের হাতে Indian Society of Oriental Art-এর চিত্রকরদের শিক্ষা হয়েছিল, সে কথা 'দেশ' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেছি। এই সব চিত্রকরদের মধ্যে ছবিকে আলংকারিক রূপ দেবার যে চেষ্টা তার মূলে নন্দলালের প্রভাব রয়েছে। রূপ (Object)কে আলংকারিক গুণ দিয়ে প্রকাশিত করার চেষ্টা এই সব চিত্রকরদের চিত্রের আলংকারিক বাঁধনের মধ্যে (Surface) শৈথিল্য এনেছিল। যেমন অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গি তাঁর ছাত্রেরা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি নন্দলালের মধ্যে দিয়ে ছবির আলংকারিক গুণ ও পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি চিত্রকরদের দৃষ্টি ফিরেছিল। পৌরাণিক বিষয়ে যেমন নন্দলালের প্রভাব জনপ্রিয় হয়েছিল তেমনি অজন্তার চিত্র সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা নন্দলালের চিত্রের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে আমরা এমনিভাবে ধীরে ধীরে নন্দলালের প্রভাবের পরিচয় পাই। ১৯১১ সালে নন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্রনাথ এবং ভেঙ্কটাপ্পা লেডি হেরিং হামের সহকারীরূপে অজন্তা চিত্র অনুলেখন করেন। অজন্তা থেকে ফেরবার পরেই নন্দলালের ছবিতে অজন্তার প্রভাব দেখা দিয়েছে। অনেকেরই বিশ্বাস অজন্তার গুহার চিত্রের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের পূর্বে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এবং দময়ন্তীর স্বয়ংবরা অঙ্কিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে যেমন জাপানী প্রভাব আছে, নন্দলালের চিত্রে তেমনি অজন্তার প্রভাব আছে এইটিই প্রচলিত বিশ্বাস।

একথা সত্য যে, অজন্তার ক্লাসিক রূপ নন্দলালকে আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের রূপ তাঁকে কিছু মাত্র কম আকৃষ্ট করেনি। অর্থাৎ ভারতীয় Traditional গঠন ভঙ্গী (Form) মাত্রই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু মোগল, জাপানী এবং অজন্তার মত ভারতীয় ভাস্কর্য আজও শিক্ষিত সাধরণের মধ্যে জনপ্রিয় হতে পারেনি। এই কারণেই নন্দলালের রূপ (Form)-এর প্রকাশ মাত্রেই অজন্তার প্রভাব ব'লে মনে করা হয়।

ক্লাসিক বস্তুরূপের (Object Form) ভারতীয় প্রকাশভঙ্গীর আদর্শ যেমন নন্দলালের চিত্রের প্রকৃতি বদলিয়েছে তেমনি রাজপুত ছবির আলংকারিক রূপ নন্দলালকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। দেশী ছবির এই বিশেষ আলংকারিক গুণ অবনীন্দ্রনাথকেও একদিন নূতন প্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী এমনি ভিন্ন ছিল যে, দীর্ঘকাল তিনি এই আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন নি। এই কারণেই দেশীয় চিত্র অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সাময়িক প্রভাবের মত এসেছিল, তা স্থায়ী হয়নি। নন্দলালের মধ্যে দিয়া দ্বিতীয়বার অবনীন্দ্রনাথের আদর্শের মধ্যে ভারতীয় চিত্রের আলংকারিক বর্ণ সংযোগের রীতি দেখা দিল; ছবির রূপই (Form) প্রধান হোলো। নন্দলালের আলংকারিক মন অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন ভঙ্গীকে গ্রহণ করতে পারে নি, কারণ আলংকারিক গুণকে পরিবর্তন করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গীর উদ্ভব; নন্দলাল আলংকারিক গুণের দিকে দৃষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গীকে অতিক্রম করতে বাধ্য হলেন। অবনীন্দ্রনাথের ভঙ্গীর পরিবর্তে রাজপুত বা মোগল তথা দেশীয় করণ কৌশল Tempara পদ্ধতির প্রবর্তন নতুন করে নন্দলালের মধ্য দিয়ে প্রচলিত হয়েছিল। নন্দলালের প্রভাব পরবর্তী চিত্রকরদের মধ্যে ভারতীয় ভাবের চেয়ে ভারতীয় অঙ্কন বৈশিষ্ট্য তথা ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন করেছে, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যন্ত নন্দলালের মধ্য দিয়ে পুরাতন রীতির প্রবর্তন কি কারণে হয়েছে আমরা সেই আলোচনাই করেছি। এইবার নন্দলালের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং নন্দলালের প্রতিভার পরিণতির ইতিহাস আমরা আলোচনা করব।

স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র জাতীয়তাবোধ চিত্র সংস্কৃতির নতুন ভাব ধারাকে জনপ্রিয় করেছিল, আমরা দেখেছি। তারপর স্বদেশী যুগের তীব্রতা হ্রাস হলেও আধুনিক চিত্রের আদর্শ, জাতীয় শিল্প আদর্শরূপে জনপ্রিয় হল এবং অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র পরম্পরায় বিশেষ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। এক সময়ে সম্প্রদায় রূপে এই আন্দোলনে নিজেরা শক্তি পেয়েছিলেন এবং প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যেও এই নতুন পথের চিত্রকররা নিজেদের স্থান করতে পেরেছিলেন। সম্প্রদায়ের গন্ডীই অবনীন্দ্রনাথের নতুন আদর্শের অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে আধুনিক চিত্রের সংস্কৃতি সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ পেল।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের কলাকেন্দ্র (কলাভবন)এর ইতিহাস সুপরিচিত; ১৯১৮ সনে বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র আকারে কলাবিভাগের কাজের সূচনা হয়। এই সময় নন্দলাল তাঁর দুই ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে অতি অল্পকালের জন্য আসেন এবং অল্পকালের মধ্যে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। অসিতকুমার হালদারের অধ্যক্ষতায় কলাবিভাগের কাজের সত্যকারের সূচনা। এই সময়ে নন্দলালের সঙ্গে শান্তিনিকেতন কলাবিভাগের যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি। ১৯১৯ থেকে অসিতকুমার ও নন্দলালের সহযোগিতায় কলাভবন নামে এই কেন্দ্র নূতন পথে অগ্রসর হয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং শান্তিনিকেতনের কলাবিভাগের ছাত্রদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য ছিল অনেক। নন্দলালের ব্যক্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দুএর সম্মিলিত প্রভাবের দ্বারাই পরবর্তী চিত্রকরদের স্বকীয়তা সম্ভব হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল অসিতকুমার নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের আদর্শকে। নিজেদের শিক্ষা এবং আদর্শ-মত সকল দিকেই এই নতুন কেন্দ্রে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শেরই প্রকাশ দেখি। স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেবল ভিন্ন। সে সময়ে ছাত্র যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের পূর্বের শিক্ষার ছাপ ছিল না। এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র ও নন্দলালের এই সকল ছাত্রের সঙ্গে অবস্থার আশ্চর্য রকম মিল ছিল। ঠিক যে কারণে যে অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথকে

(শেষাংশ ৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমাদের ক্যাপিটেল মার্কেট

শ্রীঅনিলকুমার বসু, এম এ

পূর্ব প্রকাশিত "আমাদের টাকার বাজার" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, আমাদের মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৎসরে দাঁড়ায় আনুমানিক ১৬০ কোটি হইতে ৩০০ কোটি টাকা এবং ১৯২৯—৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে উপরোক্ত সঞ্চয়ের মধ্যে মাত্র ২৩·২৮ কোটি টাকা দীর্ঘকালের জন্য বিভিন্ন কারবারে প্রতি বৎসর খাটিতেছে। এই দীর্ঘকাল স্থায়ী বা প্রসারী লেনদেনের কারবারকে ইংরেজীতে capital-market নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশের ক্যাপিটেল-মার্কেটএর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উহাকে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। উপরোক্ত বাজারে বাড়তি ও মন্দা, উত্থান ও পতন চক্রাকারে দেখা দিয়াছে। ১৯১৪ সালে আমাদের দেশীয় যৌথ কোম্পানীগুলির মেয়াদী-কৃত মূলধনের (paid-up capital) পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি টাকা। উহাই পরে বাড়িয়া প্রায় ৩০৩ কোটি টাকায় ১৯৩৫—৩৬ সালে পৌঁছিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ১৯২০—২৩, ১৯৩২—৩৩ এবং ১৯৩৫—৩৭ এই তিন ভাগকে উত্থানের সময় (Boom period) বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। উপরোক্ত সময়ে বহু দেশীয় নূতন নূতন কোম্পানী ও কারবারের আবির্ভাব হয় এবং বাণিজ্য জগতে নূতন আশার আলো সঞ্চারিত হয়। ১৯২০—২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় কারবারে মোট ১০৭ কোটি টাকা দীর্ঘকালের জন্য নিয়োজিত হয়। নিম্নপ্রদত্ত ১৯২০—২৪ সালে ও ১৯৩৪—৩৭ সালের মধ্যে ঐ সকল কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন শত করা যে হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে উপরোক্ত টাকার মোটা অংশই লৌহ-ইস্পাত, সিমেণ্ট, কয়লা, তুলা ও কাগজ শিল্পে খাটে :—

ঐ সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হয় এবং ইহাতে অজস্র অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু ঐ মোহের ঘোর যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখা গেল যে অনেক কোম্পানী মারা পড়িয়াছে ও অনেক অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারপর দীর্ঘকালের জন্য ঐ সব শিল্পকার্যে মন্দা দেখা দেয়।

১৯৩২—৩৩ সালে আবার ব্যবসায় জগতে একটু সাড়া পাওয়া যায়। কেবল ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্ক, লৌ-ইস্পাত, চিনি ইত্যাদি ব্যবসায়ে ঐ নব জাগরণের প্রভাব বেশী করিয়া অনুভূত হয়। এমন কি শর্করা শিল্পের ১৯৩০ হইতে ১৯40 সালের মধ্যে ন্যূনাধিক ১০ কোটি টাকার মত অর্থ অতিরিক্ত নিয়োজিত হয়। তারপর ১৯৩৫—৩৭ সালে যে জাগরণ সূচিত হয়, তাহার ফলে ভারতের ও ব্রহ্মদেশের যৌথ কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধন দাঁড়ায় ৩১১½ কোটি টাকা এবং অনেক নূতন নূতন কোম্পানী গড়িয়া উঠে। এই দুই বৎসরের মধ্যে ঐ সব কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ২০০% করিয়া বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে ১৯১৪—১৫ সালের কোম্পানীগুলির মূলধনের সহিত ১৯৩৩—৩৪ সালের মূলধনের তুলনা করিলেই আমাদের ক্যাপিটেল-মার্কেটএর তদানীন্তন প্রসারতা অনুমান করা যাইবে।

আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা বৃদ্ধির হার

১৯২০—২১ ও ১৯২৩—২৪এর মধ্যে

শিল্পের নাম	শতকরা বৃদ্ধি
সিমেণ্ট	১১৪·০%
লৌহ, ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ	৯৬·৮%
কাপড়ের কল	৬৫·৮%
কাগজের কল	৫৫·৩%
কয়লা	৪২·৩%
পাটের কল	২৮·০%

১৯৩৪—৩৫ ও ১৯৩৬—৩৭ সালের মধ্যে

শিল্পের নাম	শতকরা বৃদ্ধি
সাবান, মোম	২৩২·৫%
চিনি	৪২·৮%
কেমিক্যাল	২০·৬%
রবার	১৪·০%
সিমেণ্ট	১০·৪%
চাউলের কল	৮·০%
পাটের কল	৫·২%

(বর্মার কোম্পানীও উপরোক্ত হিসাবের অন্তর্গত)

কোম্পানীর নাম	১৯১৪—১৫ সংখ্যা	১৯১৪—১৫ আদায়ীকৃত মূলধন লক্ষ টাকা	১৯৩৩—৩৪ সংখ্যা	১৯৩৩—৩৪ আদায়ীকৃত মূলধন লক্ষ টাকা
ব্যাঙ্কিং ও লোন	৪৩৬	৭,৮০	১,৭৯৬	২৯,১৫
ইনসিওরেন্স	১৮২	৫০	৫৯১	৩,০৩
নেভিগেশান	২৪	১,২৮	৩৮	২,৭২
রেলওয়ে, ট্রাম	৪৪	৮,৩০	৪৭	১৫,১০
অন্য যানবাহন কোং	... ...	... .	২৮১	৩,৯৮
ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং ...	৭৫৪	১১,৩২	৩,৩৮৮	৯৪,২১
চা	২০৮	৪,৩১	৪৮৫	১৩,৭২
কাপড়ের কল	২০৫	১৬,৭০	৩০৬	৩২,১৭
পাটের কল	৩৪	৭,৬১	৬৯	১৮,৭৫
জমি, সম্পত্তি, দালান	৩২	২,১৭	১৫৯	১০,৭০
চিনি	২২	৮০	১৫৩	৪,২২

১৯৩৫ হইতে ১৯৪১ পর্যন্ত যে সকল নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যাও নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

বৎসর	সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন কোটি টাকা	প্রতি কোম্পানী পিছু গড়পরতা অনুমোদিত মূলধন লক্ষ টাকা
১৯৩৫—৩৬	৯৯৩	৪৯·২	৪·৯৫
১৯৩৬—৩৭	১১৭৫	১০৯·০	৯·২৮
১৯৩৭—৩৮	৯৮৬	৫৩·২	৫·৩৯
১৯৩৮—৩৯	৯৯৬	৪২·৩	৪·৫৪
১৯৩৯—৪০	১০০৫	৩৫·৮	৩·৫৬
১৯৪০—৪১	৯৭৮	৪৬·০	৪·৭

বর্তমান মহাযুদ্ধেও ভারতীয় শিল্পগুলি কার্যপ্রসারের জন্য অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে লাভবান হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই সকল শিল্প শতকরা কত লভ্যাংশ দিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলেই মোটামুটি একটি লাভের অঙ্ক পাওয়া যাইবে। ১৯৩৮ সালে কাপড়ের কলগুলি গড়পড়তা বার্ষিক ১১·৪৭% লভ্যাংশ বণ্টন করিয়াছিল। কিন্তু কার্য বৃদ্ধির ফলে ১৯৪১ সালে উক্ত লভ্যাংশের হার ১৪·৪৪%এ উন্নীত হয়। এইভাবে পাটের কলগুলি ১৯৩৮ সালে শতকরা ৫·৭৯% লভ্যাংশ (dividend) প্রদান করে। এক বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত লভ্যাংশ শতকরা ৪% বর্ধিত হয় এবং ১৯৪১ সালে লভ্যাংশ ১৮·৯৯% হারে দেওয়া হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই মোটা লাভ আরম্ভ করে। ১৯৪১ সালে উঁহাদের লভ্যাংশ গড়পড়তা বার্ষিক ১৩·৫৪% হারে ঘোষণা করা হয়। টাটা আয়রণ ও স্টীল কোম্পানী ১৯৪১ সালে শতকরা ৩৮⅓% হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করে। এইবারকার যুদ্ধে চা-বাগানগুলিও লাল হইয়া যায়। ১৯৩৮ সালে যেখানে তাহাদের লভ্যাংশের হার ছিল ১৩·৫৬% ১৯৪১ সালে উহা শতকরা ১৮·৭১%এ বর্ধিত হয়। ভারতীয় শিল্পগুলি যে বর্তমান যুদ্ধে প্রভূত লাভ করিয়াছে তাহা উপরোক্ত হিসাব হইতেই অনেকটা অনুমান করা যায়। অত্যধিক লাভের ফলে আমাদের শিল্প জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে ভারতীয় ক্যাপিটেল-মার্কেট যে অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

উপরে শেয়ার ক্রয় বাবদ যৌথ কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। শেয়ার ব্যতিরেকে ডিবেঞ্চার সাহায্যেও দীর্ঘকালের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা হয়। ডিবেঞ্চার সাধারণত কোন নির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট সুদে বাজারে ছাড়া হয়। ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ অন্যান্য পাওয়ানাদারের মধ্যে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তির উপর প্রথম অধিকার (first charge) প্রাপ্ত হন। আমাদের ক্যাপিটেল-মার্কেটএ ডিবেঞ্চারের প্রচলন এখন পর্যন্ত জনপ্রিয় হয় নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ডিবেঞ্চার সাহায্যে মূলধনের ২০% তোলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেই তুলনায় ডিবেঞ্চার গৃহীত মূলধন মোট মূলধনের মাত্র শতকরা ৯%। ১৯৩০—৩১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে পাটের কলে ডিবেঞ্চার দ্বারা মাত্র ১৪% মূলধন তোলা হইয়াছে। কয়লা শিল্পে ৭০টি কয়লা কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৫টি এ পর্যন্ত ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়াছে এবং ১২৮টি চা কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৯টি কোম্পানী ডিবেঞ্চার মারফৎ টাকা তুলিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ডিবেঞ্চার প্রচলন আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাহারাই ডিবেঞ্চার ইস্যু করিয়াছে, তাহাদিগকেই অনেক উচ্চ সুদে ঐ সব ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়িতে হইয়াছে। এমন কি ঐ সুদের হার শতকরা ৭% হইতে ৮% পর্যন্ত উঠাইতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া কমিশন, স্ট্যাম্প ফি, দালালি ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়ও বরাদ্দ করিতেই হইয়াছে। এ পর্যন্ত যে সকল ডিবেঞ্চার ছাড়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী যখন প্রথমে ৬০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে বাজারে বাহির হইল, তখন এক গোয়ালিয়রের মহারাজাই সমস্ত ডিবেঞ্চার ক্রয় করেন। ফলে এই সকল ডিবেঞ্চার ধনী সম্প্রদায়ের হাতেই জমা হইল। অন্যান্য জনসাধারণ ইহার কোন ফল ভোগই করিতে পারিল না। এমতাবস্থায় ডিবেঞ্চারের চাহিদা যে খুবই বিরল হইবে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। ইহা ছাড়া আমাদের দেশের ডিবেঞ্চারগুলির কোন আকর্ষণযোগ্য বৈচিত্র্য নাই। অন্যান্য দেশে ডিবেঞ্চারের জাতিভেদ আছে যথা—কোন কোন ডিবেঞ্চার শেয়ারে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা আছে এবং কোন ডিবেঞ্চার দেয় (mature) হইলে, তাহা প্রিমিয়ামে ভাঙ্গাইবার রীতি আছে। আমাদের দেশেও ডিবেঞ্চারের অনুরূপ প্রকারভেদ থাকা উচিত। তাহা হইলে জনসাধারণ ঐ সব ডিবেঞ্চার কিনিতে আকৃষ্ট হইবে। ডিবেঞ্চার ক্রয় ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সহযোগিতারও বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে সকল কোম্পানী ডিবেঞ্চার বাহির করে, তাহাদের ধার পাইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কগুলি সন্দিহান হয়। এই সন্দেহ মনোবৃত্তি ব্যাঙ্কগুলির কাছ হইতে দূরীভূত না হইলে ডিবেঞ্চারের প্রচলন কোন দিনই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতা পাইলে আমাদের দেশের capital-market অনেকখানি পুষ্ট হইতে পারে।

এই ত গেল নিজেদের মূলধনের কথা। আমাদের দেশে নিজেদের ছাড়াও বৈদেশিক মূলধন যাহা খাটিতেছে তাহার পরিমাণ প্রায় ৮০ কোটি পাউণ্ড ও ১২০ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বৃটিশ মূলধন। মাত্র ১৫ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ ছাড়া অন্য দেশীয় মূলধন। ভারতে ঈদৃশ বৈদেশিক মূলধনের আধিক্য কেহই ভাল চক্ষে দেখেন না। ফলে আমাদের ক্যাপিটেল-মার্কেট যে বৈদেশিক পুঁজিদারীর অঙ্গুলী হেলনে উঠে ও নামে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমাদের দেশে ১৯১৪ সালে ও ১৯৩৪—৩৫ সালে বৈদেশিক মূলধনে পুষ্ট যে সকল কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

	১৯১৪—১৫		১৯৩৪—৩৫	
	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (£ পাউন্ড)	সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (£ পাউন্ড)
ব্যাঙ্কিং ও লোন	১৩	২৪,৫৫১,১০৮	২৯	৯৪ ২৪৬,৩৭০
ইন্সিওরেন্স	৮৯	২৮,০৬৫,৭৩৮	১৪৩	৭২,৫৬২,৪৭০
স্টিমার ইত্যাদি	১২	১৫,০০১,৮৬৫	২০	৪২,৬৪২,০৫৩
রেলওয়ে, ট্রাম	১৮	৮০ ৮১১,৯১৫	১৮	২৫,০৯৪,৯০৯
অন্যান্য যানবাহন কোং			১২	২,১১০,২৫৭
ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ...	১১৩	১১৪,২৫৪,৩৩৩	৩৬৫	২৩৭,৯৫২,৯৫১
চা	১৬৬	১৭,৫৭৩,২৮৪	১৭৪	২৬ ৪৩০,৫৩৭
অন্যান্য প্ল্যানটিং কোং	২২	১,১৬৫,৮৪৪	২৯	৩ ৩০০,২৫৯
কয়লা	৬	১৩৯,১৩৪	৪	২৪০,০০০
স্বর্ণ	৩	৩৮৯,৮৩০		
অন্যান্য খনন কোং	১৩	৫,০৩০,৯৯৯	৩০	২৪,০৪৪,৪০৪
কাপড়ের কল	৩	৪০০,০০০	৪	২০০,০০০
পাট	৯	২,৪২৮,৮৯৪	৫	২,৭৫২,৪৫০
তুলা স্পিনিং ও প্রেসিং	১	১০০,০০০	২	১৫০,০০০
ভূমি, দালান			৫	৩৭২,৭৭৪
চিনি	২	৩০৬,৬৫৬	১	২৮০,০০০
অন্যান্য কোম্পানী	৯	৫৫৪,৪৫১	৩০	৪০,৬৭৯,৩৫৫
মোট (ব্রিটিশ ভারতে)	৪৭৯	২৯০,৭৭৩,৮৭১	৮৭১	৫৭৩,০৫৮,৭৮৯
মোট (ভারতীয় করদ রাজ্য)	৩৮	৭,৬২৭,৩২৬	৪৬	১৩,৩৬০,৪৭৩
মোট	৫১৭	২৯৮,৪০৯,১৯৭	৯১৭	৫৮৬,৪১৯,২৬২

১৯১৪ সালে আমাদের নিজস্ব কোম্পানীগুলির দায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল, ৮০ কোটি টাকা। উহাই ড়িয়া ১৯৩৫—৩৬ সালে ৩০৩ কোটি টাকায় পৌঁছে। পরোক্ত বৈদেশিক মূলধনের তুলনায় আমাদের নিজেদের মূলধন সিন্ধু মাঝে বিন্দুবৎ। বৈদেশিক মূলধনের যে উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐ বৈদেশিক মূলধনের আধিক্য ও প্রাধান্য যদি সর্বগ্রাসী হয়, তবেই বিপদ। কাজেই বৈদেশিক মূলধনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবার মত ক্ষমতা জাতির হাতে থাকা চাই।

অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

(৩১২ পৃষ্ঠার পর)

ন্দলাল প্রমুখ অনুবর্তীরা সকল দিক দিয়ে আদর্শ রূপে গ্রহণ রেছিলেন, ঠিক একই কারণে নন্দলালকে এই সময়ের শক্ষার্থীরা আদর্শ রূপে নিলেন। শান্তিনিকেতনের কর্ম চেষ্টায় নন্দলাল কেবল মাত্র শিক্ষাদানের মধ্যেই আবদ্ধ রইলেন া। সকল দিক দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশিত করবার বকাশ তিনি পেয়েছিলেন। শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ, তাঁর অঙ্কন ভঙ্গী, শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রমে নতুন ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হোলো। আগামী সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী আদর্শের রূপান্তর ও নন্দলালের পরবর্তী চিত্র সংস্কৃতির ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

(ক্রমশ)
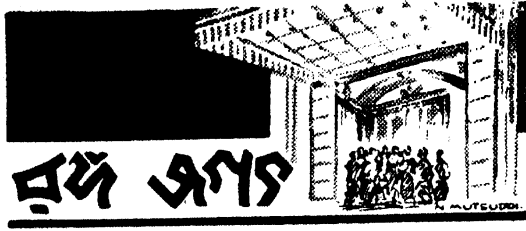
পরিণীতা

(পি আর প্রডাক্সন্সের নূতন ছবি)

কাহিনী—শরৎচন্দ্র, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান ভূমিকা—ছবি বিশ্বাস, প্রমোদ গাঙ্গুলী, প্রভা, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি।

'পরিণীতা' ছবিটি গৃহীত শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বাঙলা দেশে অনেকগুলি ছবি তোলা হয়েছে—আজ পর্যন্ত তার কোনটাই ব্যর্থ হয়নি। তার কারণ শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে এমন কতকগুলি চরিত্র ও এমন সব সমস্যাকে তিনি ডেকে আনেন যা বাঙলার ভাবপ্রবণ দর্শকের মনকে অভিভূত না করে পারে না। পরিচালকের কৃতিত্ব সেইখানেই, যেখানে তিনি এই সব চরিত্র ও ঘটনা-বৈচিত্র্যকে দর্শকদের সামনে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'পরিণীতার' পরিচালক সাফল্য লাভ করেছেন সেই কারণেই। 'পরিণীতা'র কাহিনীকে তিনি পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে পর্দায় রূপান্তরিত করেছেন, চিত্রনাট্য রচনায় তিনি কোথাও নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করেননি। তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মাঝে মাঝে গান না দিলে দর্শকরা খুশি হন না এই মনে করে পরিচালক ছয়টি গান এই ছবিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তররূপে টেনে এনেছেন, ফলে কাহিনীর গতি বাধা পেয়েছে, কাহিনীর ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে ছুটে চলা মন প্রত্যেকটি গানের কাছে এসে হোঁচট খেয়েছে। ছবিটির মধ্যে আর একটি অভাব দৃশ্য-বৈচিত্র্যের। সঙ্কীর্ণ স্টুডিয়ো সেট-এর মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মন হাঁপিয়ে উঠবার কথা, বহির্দৃশ্যের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ছবিটি দেখলেই মনে হয় পরিচালক সংক্ষেপে ও কম সময়ে কাজ সারতে চেয়েছেন। অবশ্য আমরা তার নিন্দা করি না, সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতাকে আমরা সমর্থন করি, কিন্তু সমর্থন করতে পারি না অবহেলাকে। পূর্বেই বলেছি, পরিচালক শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করেননি। অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবির পরিচালনার মধ্যে শিল্পী-মন ও নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে বলে 'পরিণীতা'র প্রশংসা না করে পারি না।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই নাম করতে হয় সন্ধ্যারাণীর। আতিশয্য নেই, চাপল্য নেই, বাড়াবাড়ি নেই,—অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে অভিনয় করে ললিতার শান্ত স্নিগ্ধ চরিত্রটি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন। মাতৃরূপের একটি সুন্দর চরিত্র পেলাম প্রভার অভিনয়ে। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ভালই; নিরাশ করেছেন প্রমোদ গাঙ্গুলী। আড়ষ্টতার জন্য তার অভিনয় স্বাভাবিক হয়নি এবং মনে হোলো তিনি একটু বেশী আত্মসচেতন হয়ে পড়েছেন। জীবেন বসু ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় আমাদের নিরাশ করেনি। কালীর ভূমিকায় বিজলীর অভিনয় প্রশংসনীয়।

গানগুলি কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করলেও স্বতন্ত্রভাবে আমাদের ভাল লেগেছে, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের 'এপারে মুখর হোলো কেকা ঐ' গানটি শ্রুতিমধুর হয়েছে।

চিত্র গ্রহণ আশানুরূপ হয়নি, শব্দ গ্রহণও তথৈবচ।
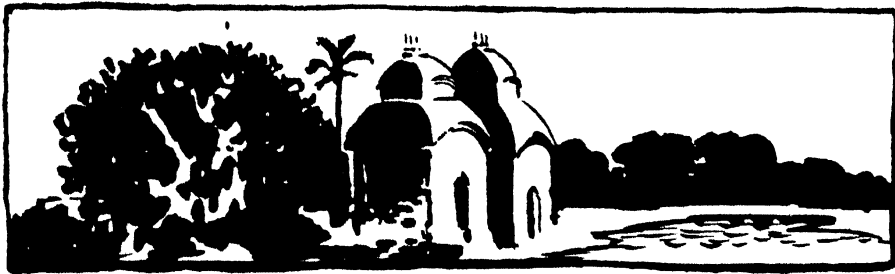
পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতা সাউথ ক্লাব পরিচালিত পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। প্রতিযোগিতার সকল বিভাগের সকল খেলা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। মহিলা ও পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়গণ খেলায় যোগদান করেন নাই। পুরুষদের সাধারণ বিভাগ ও প্রবীণদের বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষদের বিভাগে দিলীপ বসু সিংগলস ও ডাবলস উভয় খেলাতেই বিজয়ী হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। সিংগলসে দিলীপ বসু ফাইন্যাল খেলায় হল-সারফেসের নিকট শোচনীয়ভাবে স্ট্রেট সেটে পরাজিত হইয়াছেন। দিলীপ বসুর শোচনীয় ব্যর্থতা দর্শকগণকে ও ক্রীড়ামোদিগণকে বিশেষভাবেই হতাশ করিয়াছে। খেলার সূচনাতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকান খেলোয়াড় হল-সারফেসের বিরুদ্ধে সুবিধা করিতে না পারিলেও দর্শকগণ আশা করিয়াছিলেন খেলার শেষভাগে তিনি নিজ অবস্থার পরিবর্তন করিবেন। কিন্তু ফলত তাহা হয় নাই। দিলীপ বসু খেলার কোন সময়েই হল-সারফেসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। মাত্র এক মাস পূর্বে সিন্ধু টেনিস প্রতিযোগিতার খেলায় সিংগলস সেমি-ফাইন্যালে দিলীপ বসু ৮-৬, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হল-সারফেসকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই বাঙালী ক্রীড়ামোদিগণ ধারণা করিয়াছিলেন—দিলীপ বসু সিন্ধু টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি করিবেন। বিজিত খেলোয়াড়ের নিকট পরাজয় বরণ প্রকৃতই দুঃখের কারণ হইয়াছে।

হল-সারফেস আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ক্যানসাস শহরের একজন খেলোয়াড়। ১৯৩৭ সালে ইনি আমেরিকার ন্যাশনাল টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকায় সপ্তম স্থান লাভ করেন। ১৯৪০ সালে আমেরিকার ক্রমপর্যায় তালিকায় দ্বাদশ স্থান অধিকার করেন। সুতরাং তিনি যে একজন কৃতি খেলোয়াড় সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলসে চ্যাম্পিয়ান হইয়া তিনি পূর্ব অর্জিত খ্যাতির সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দিলীপ বসু সিংগলসে বিজয়ী হইতে না পারিলেও ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইনি ডাবলসে জে এম মেটার সহযোগিতা লাভ করেন। ফাইন্যালে ইঁহাদের পি, এল মেটা ও সুমন্ত মিশ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। দিলীপ বসুর এই দিনের খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একরূপ নিজ শক্তিবলেই ডাবলসে জয়লাভে সক্ষম হইয়াছেন। দিলীপ বসুর এই সাফল্যও বাঙালী টেনিস খেলোয়াগণকে অনেকাংশে উৎসাহিত করিবে। পরবর্তী কোন ভারতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় দিলীপ বসু আমেরিকান খেলোয়াড় হল-সারফেসকে পরাজিত করিয়া পূর্ব অর্জিত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

খেলার ফলাফলঃ—

সিংগলস ফাইন্যাল

হল সারফেস ৬-৩, ৬-০, ৬-৩ গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল

দিলীপ বসু ও জে, এম, মেটা ৬-৪, ৬-৮, ৬-৩, ৬-৩ গেমে সি, এল, মেটা ও সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডাবলস

এল ব্রুক এডওয়ার্ডস ও কৃষ্ণপ্রসাদ ৬-৪, ৬-৩ গেমে এস, সি. এইচ, মেয়ার্সকে পরাজিত করেন।

সিংগলসের পূর্ববর্তী

বিজয়ীগণঃ—১৯২৩-২৪ সাল এস ওকোমটো। ১৯২৫ সাল এস এ ইউসুফ, ১৯২৬ সাল জে রবসন, ১৯২৭ সাল এস ওকোমটো, ১৯২৮ সাল এ মদনমোহন, ১৯২৯ সাল ই ভি বব, ১৯৩০ সাল এইচ ডবলিউ, অস্টিন, ১৯৩১ সাল জে ফিজিকুরা, ১৯৩২ সাল জি ডি স্টেফানী, ১৯৩৩ সাল এ মদনমোহন, ১৯৩৪ সাল জে পালাডা, ১৯৩৫ সাল এল হেক্ট, ১৯৩৬ সাল এ সি স্টেডম্যান, ১৯৩৭ সাল গউস মহম্মদ, ১৯৩৮ সাল ডোনাল্ড ম্যাকনীল ১৯৩৯ সাল এফ পুনচেক্, ১৯৪০ সাল এস এল আর সোহানী ১৯৪১ সাল গউস মহম্মদ।

তরুণ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধার সাফল্য

ওহিও বক্সিং কমিশন হ্যারী বোবো নামক একটি তরুণ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাকে পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হ্যারী বোবো এই গৌরব মুকুট যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিনই মস্তকে ধারণ করিতে পারিবেন। এইরূপ নির্দিষ্ট করিবার কারণ পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই বর্তমানে যুদ্ধ কার্যে ব্যস্ত আছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য হেভী ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধাগণও যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছেন। তাহাদের সহিত হ্যারী বোবো এখনও লড়েন নাই। যুদ্ধের শেষে ঐ সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাগণের সহিত হ্যারী বোবোকে লড়িতে হইবে। ঐ সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি যদি বিজয়ী হন তবেই তিনি প্রকৃত

পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। হ্যারী বোবোর বর্তমান বয়স মাত্র ২১ বৎসর। ইনি পিটার্স-বার্গে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় ই'হার বিশেষ উৎসাহ ছিল। যৌবনে পদার্পণ করিবার সংগে সংগে ইনি নিয়মিতভাবে মুষ্টিযুদ্ধ বিষয় লইয়া সাধনা আরম্ভ করেন। প্রথমে কয়েকটি সাধারণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। গত বৎসর মার্চ মাসে ইহার ভীষণ ইচ্ছা হয় হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হইবার। ইহার ফলে এপ্রিল মাসে আমেরিকান মুষ্টি-যুদ্ধ এসোসিয়েশনের অনুমতিক্রমে ইনি লেন ফ্রাঙ্কলিন নামক একজন হেভী ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফ্রাঙ্কলিন একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা হইলে কি হয়, হ্যারী বোবো তাঁহাকে প্রথম রাউণ্ডেই ভূতলশায়ী করেন। ইহাতে আমেরিকার বিশিষ্ট মুষ্টিযুদ্ধ প্রবর্তনকারিগণ চমৎকৃত হন। ইহার ফলে গত ডিসেম্বর মাসে বাড্ডী ওয়াকারের সহিত হ্যারী বোবোর লড়িবার ব্যবস্থা করা হয়। হ্যারী বেবো এই প্রতি-যোগিতাতেও ১০ম রাউন্ড পর্যন্ত লড়িয়া পয়েন্টে বিজয়ী হইয়াছেন। বাড্ডী ওয়াকার বর্তমানে জো লুই প্রভৃতির অবর্ত-মানে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং তাঁহাকে যে পরাজিত করিয়াছে, তাহাকে পৃথিবীর হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বলা যাইতে পারে। ওহিও বক্সিং কমিশনের এই ঘোষণার ফল ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে। জো লুইর স্থানে একজন তরুণ নিগ্রো অধিষ্ঠিত হইল ইহা খুবই সুখের বিষয়। নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাগণ গত দেড় শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া যে গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, হ্যারী বোবো তাহাই অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইলেন।

নিখিল ভারত টেবিল টেনিস

সম্প্রতি লাহোরে নিখিল ভারত টেবিল টেনিস ও পঞ্চম বার্ষিক আন্তঃপ্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় বোম্বাই, বাঙলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে খেলোয়াড়গণ যোগদান করেন। বোম্বাই প্রদেশের খেলোয়াড়গণ উভয় প্রতি-যোগিতায় প্রাধান্য প্রমাণিত করিয়াছেন। বোম্বাইর কে এইচ কাপাদিয়া নিখিল ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বোম্বাই প্রদেশ প্রথম ও বাঙলা প্রদেশ মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। বাঙলা দেশের খেলোয়াড়গণ টেবিল টেনিস খেলায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ভবিষ্যতে তাঁহারা নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিবেন বলিয়া আশা হয়। চার পাঁচ বৎসর পূর্বেও টেবিল টেনিস খেলাটি ঘরের ভিতরের খেলা বলিয়া অনেকেই বিশেষ প্রীতি চক্ষে দেখিতেন না। অনেকেরই ধারণা ছিল, ইহা আয়েসী লোকদেরই চিত্তবিনোদনে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ডাচ্ খেলোয়াড়দ্বয় বার্নো ও বালাক্ ভারতে আগমন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিবার পর হইতে সকলের এই ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়। সাধারণ টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার ন্যায় ইহাতেও ছুটাছুটি করিতে হয়। তীব্র প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে খেলোয়াড়গণকে রীতিমত পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা বার্নো ও বালাকের খেলা দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারেন। তাহার পর হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে টেবিল টেনিস খেলার কদর বাড়ে। বর্তমানে নিখিল ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা বার্নো ও বালাকের ভ্রমণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা:—

বোম্বাই ৬, বাঙলা ৫, পাঞ্জাব ৩, মাদ্রাজ ৩, মহীশূর ২, হায়দরাবাদ ১ ও দিল্লী ০ পয়েন্ট লাভ করেন।

পুরুষদের সিংগলস

কে এইচ কাপাদিয়া (বোম্বাই) ২১-১৩, ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েন্টে ডি এইচ কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

কে এইচ কাপাদিয়া ও চন্দ্রানা (বোম্বাই) ২১-১৩, ১৪-২১, ২১-১১, ২১-১৯ পয়েন্টে শিবরাম ও নাইডুকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করে।

মিক্সড ডাবলস

কে এইচ কাপাদিয়া ও মিস্ এফ ম্যাডন (বোম্বাই) ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১৩, ২১-১৯ পয়েন্টে চন্দ্রানা ও মিস্ কুদেবকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস

মিস্ কুদেব (বোম্বাই) ২১-১৯, ২১-১৮, ২১-২৩, ২৪-২৬, ২১-১১ পয়েন্টে মিস্ ব্রোডিকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস্ ব্রোডি ও মিস্ ম্যাডন (বোম্বাই) ২১-১৩, ২১-১৩, ২১-১৭ পয়েন্টে মিসেস্ প্রতাপ সিং ও মিসেস্ ইন্দ্র ওয়াদাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ক্রিকেট দল

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণের পালা এখনও শেষ হয় নাই। সম্প্রতি বাঙালোর হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গেল, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ক্রিকেট এসো-সিয়েশন রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবে না বলিয়া ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নিকট জানাইয়াছেন। এই এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ দল গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দল না খেলার দক্ষিণাঞ্চলের ফাইন্যালে মহীশূর দলকে হায়দরাবাদ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

৩০শে ডিসেম্বর

রুশ রণাঙ্গন—এক বিশেষ সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হয় যে, ২৯শে ডিসেম্বর সোভিয়েট সৈন্যদল কোটেলনিকোভো রেলওয়ে স্টেশন ও শহর পুনরধিকার করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—নিউইয়র্ক বেতারে বলা হয় যে, মার্কিন বাহিনী তিউনিসিয়ার সর্ব-দক্ষিণ-প্রান্তবর্তী গাবেস বন্দর হইতে মাত্র দুইশত মাইল দূরে আছে।

লণ্ডনের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে বলা হয় যে, বৃটিশ ও দ্য গল সৈন্যেরা ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

৩১শে ডিসেম্বর

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—মিত্রপক্ষের ইস্তাহারে বলা হয় যে, গতকল্য ওয়াদি এল-চেবিরের পশ্চিমে উভয়পক্ষের টহলদারবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় নাই। তিউনিসিয়ার সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তবর্তী গাবেস বন্দর হইতে মার্কিন বাহিনী মাত্র ৪০ মাইল দূরে আছে। মরক্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, বুধবার আরও মার্কিন সৈন্য দাকারে আসিয়া অবতরণ করিয়াছে।

১লা জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—এক সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ৩১শে ডিসেম্বর সোভিয়েট সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে ও মধ্য ডন এলাকায় এবং মধ্য রণাঙ্গনে আক্রমণ চালায়। এই দিন সোভিয়েট সৈন্যেরা ওবলিভস্কায়া শহর ও রেল স্টেশন এবং জেলা কেন্দ্র লিজনেভস্কায়া ও প্রিউটনায়া দখল করে। প্রচুর সমরসম্ভার হস্তগত করা হয়। মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, কোটেলনিকোভো এলাকায় বহু ট্যাঙ্ক, পদাতিক সৈন্য ও বিমান লইয়া জার্মানেরা পাল্টা আঘাত করিবার চেষ্টা করে। কোন কোন স্থানে তাহারা অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া সোভিয়েট ব্যূহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে; কিন্তু লালফৌজের সৈন্যদল তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েটবাহিনী রুশিয়ায় হিটলারের তিনটি শ্রেষ্ঠ ঘাঁটির অন্যতম রোস্টভের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান মঃ কালিনিন অদ্য রাত্রিতে বেতারে যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, লালফৌজ দুই হাজারের অধিক শহর ও গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছে।

২রা জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট প্রচার বিভাগের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে, মধ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ শহর ও রেলওয়ে কেন্দ্র ভেলেকিলুকি পুনরায় দখল করিয়াছে। জার্মানেরা সেখানে অস্ত্র ত্যাগে অসম্মত হওয়ায় তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে সোভিয়েট সৈন্যেরা কালমুক রিপাবলিকের রাজধানী এলিস্তা দখল করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে টার্মোসিনের কেন্দ্রীয় শহরও পুনরধিকৃত হইয়াছে। উত্তর ককেশাসে সোভিয়েট সৈন্যেরা সিকোলার কেন্দ্রীয় শহরটিও দখল করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সৈন্য বন্দী ও সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

৩রা জানুয়ারী—

নিউগিনি—মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় হেড কোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বুনা গভর্নমেণ্ট স্টেশন দখল করিয়াছে এবং সমগ্র এলাকায় শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে ব্যাপৃত আছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর আঘাতে বুনা এলাকায় জাপ প্রতিরোধ বিপর্যস্ত হইয়াছে।

মার্কিন বিমান রাবাউল বন্দরে জাপ জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়।

৩রা জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, মধ্য ডন রণাঙ্গনে ডোনেৎস উপত্যকার শিল্পপ্রধান শহরগুলির জন্য সংগ্রামে সোভিয়েট সৈন্যদল আরও সাফল্য অর্জন করিয়াছে। লালফৌজ আরও কয়েকটি জনপদ হইতে জার্মানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। লালফৌজ কোটেলনিকোভো হইতে ২৬ মাইল এবং সালস্ক হইতে ১০০ মাইল দূরস্থ দুরোভস্ক এবং রেমটনায়া পর্যন্ত কোটেলনিকোভো-সালস্ক রেল লাইন শত্রু কবলমুক্ত করিয়াছে। ককেসাসে নালচিক রণক্ষেত্রে জার্মানেরা পুনরায় পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গতকল্য ককেসাসের প্রধান রেলপথে অবস্থিত এল কোটোভো নামক শহরটি লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর বাম বাহু নালচিকের দিকে এবং দক্ষিণ বাহু মজদক অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সোভিয়েট সৈন্যগণ নালচিক হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে ছিল। ইতিমধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে অবরুদ্ধ জার্মানদের অবস্থা দিন-দিনই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে।

৪ঠা জানুয়ারী

নিউগিনি—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষের বাহিনী জাপ অধিকৃত বুনা মিশন এলাকা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনে—মস্কোর এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যগণ মোজদক শহর ও রেল স্টেশন দখল করিয়াছে। তাহারা মালগোবেক শহরটিও অধিকার করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—মেজেজ-এল-বারের পূর্বদিকে অবস্থিত জার্মান ঘাঁটিগুলির উপর বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী ৯০ মিনিট ব্যাপী এক আক্রমণ চালায়। মেজেজ-এল-বারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পর্বতের উপর হইতে হানা দিয়া তিউনিসগামী প্রধান রাস্তা অতিক্রম করিয়া জার্মান অধিকৃত উচ্চভূমি বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হয়। ফরাসী বাহিনীকে হটাইয়া দিবার চেষ্টায় জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী গতকল্য ফরাসী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় এবং ফরাসী বাহিনীকে কিছুটা হঠাইয়া দেয়। পরে মার্কিন ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী বাহিনীর সহযোগিতায় পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া ফরাসী বাহিনী জার্মান বাহিনীকে হঠাইয়া দেয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে ডিসেম্বর

কাণপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৪তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৫ হাজারের অধিক লোক এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "ঠিক আমেরিকা, জার্মানী, চীন এবং রাশিয়া সমেত অন্যান্য দেশের মতই হিন্দুস্থানেও হিন্দুগণ তাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের জন্য নেশনরূপে পরিগণিত এবং মুসলমানগণ একটি সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতই অবিম্বোদিতরূপে তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সুতরাং ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যে সব ন্যায়সঙ্গত রক্ষা কবচের অধিকারী, তাহাদেরও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারে উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত"

কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য ৬ লক্ষাধিক টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কর্পোরেশনের নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা দান সম্পর্কে শ্রমিক কমিশনার যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্যই অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। কর্পোরেশনের ১৫০ টাকা এবং তাহার কম বেতনের কর্মচারীরা এই মাগ্‌গী ভাতা পাইবে।

৩০শে ডিসেম্বর

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিগণ পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পাঞ্জাবের গভর্নর মেজর মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ তিউয়ানাকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে পদত্যাগী অন্যান্য সকল মন্ত্রিকে পুনর্নিয়োগ করেন।

বিশিষ্ট বাঙালী গ্রন্থকার, আইন ব্যবসায়ী এবং নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কাণপুরে ডাঃ মুঞ্জের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের এক অধিবেশন হয়। হিন্দু ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা লাভের এবং ভারতের অখণ্ডতা বিরোধী প্রচেষ্টা প্রতিহত করিবার উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ের নির্দেশ দিয়া এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্যার নেভিল হেণ্ডারসন লণ্ডনে মারা গিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কালে তিনি বার্লিনে বৃটিশ রাজদূত ছিলেন।

৩১শে ডিসেম্বর

কাণপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে ভারতের অখণ্ডতা নাশক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া এবং ক্রীপস্ প্রস্তাবে ভারত ব্যবচ্ছেদের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহা সংশোধন করিয়া লওয়ার দাবী করিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার জন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী।

১লা জানুয়ারী

বুধবার অপরাহ্ণে পুলিশ হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গায় এক হাট লুট সম্পর্কিত হাঙ্গামা নিবারণের জন্য গুলীবর্ষণ করে। ফলে এক ব্যক্তি নিহত এবং ১০।১২ জন লোক অহত হইয়াছে।

২রা জানুয়ারী

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুপস্থিতি হেতু বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি সিংহল গভর্নমেণ্টের খনিজ তত্ত্ববিদ্ মিঃ ডি এন ওয়াদিয়া বর্তমান অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

৩রা জানুয়ারী

বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়ার" থানার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গত শনিবার কারজাত অঞ্চলে এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং একদল লোকের মধ্যে গুলী বিনিময়ের ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। গত শনিবার প্রাতে থানার ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী কয়েক মাইল গভীর জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ঐ দলটিকে তাহাদের প্রধান আড্ডায় অতর্কিতে পাকড়াও করে। এই আড্ডাটি কারজাত তালুকের ভালিবাদি গ্রামে একটি খাড়া পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত। পুলিশ অতর্কিতে আসিয়া পড়ায় তাহারা পুলিশের উপর গুলী চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাতে পুলিশও গুলী চালায়। প্রকাশ, এই স্থান হইতে পুলিশ অনেক বোমা, রাইফেল, বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি উদ্ধার করিয়াছে।

৪ঠা জানুয়ারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যা বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধন করিবার জন্য যখন অদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে উপস্থিত হন, তখন ৪।৫ যুবক তাঁহাকে মারপিট করার চেষ্টা করে। ডাঃ রায় যখন তাঁহার মোটর গাড়ী হইতে নামিতে যাইতেছিলেন, তখন তাহার নিকটে একটি পটকা বিরাট শব্দে বিদীর্ণ হয়; পটকাটি ডাঃ রায়ের পশ্চাৎদিকে অবস্থিত একটি 'বিফল দেওয়ালে' লাগিয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময় সম্মেলনের সভাপতি ভারত গভর্নমেণ্টের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের মোটর গাড়ীর উপরও ২।৩ জন যুবক উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার গাড়ীর সম্মুখেও একটি পটকা সশব্দে বিদীর্ণ হয়।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ]   শনিবার, ২রা মাঘ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 16th January, 1943   [১০ম সংখ্যা

জীবনধারণের সমস্যা

ধনীদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং দরিদ্র জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে যাহাদিগকে লইয়া সমাজ, জাপানীদের বোমার ভয় তাহাদের পক্ষে তত সমস্যা সৃষ্টি করে নাই। প্রাচীন কবির ভাষায় তৈল-লবণ-বস্ত্রেন্ধন চিন্তায় তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা বর্তমানে চূড়ান্ত রকমে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙলা সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য এ পর্যন্ত যত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কোনটিই উপযোগী হয় নাই। এখনও কলিকাতা শহরে পয়সা দিয়া সামান্য পরিমাণ চাউল, চিনি প্রভৃতি পাইবার জন্য লোককে প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। শুনিতেছি, এইবার এই সমস্যার একটা মীমাংসা আর না হইয়া যায় না; ভারত সরকারের ঘাঁটি নড়িয়া উঠিয়াছে। সামরিক ব্যবস্থা পাকা করাই যে একমাত্র সমস্যা নয়, বর্তমান অবস্থায় বে-সামরিক ব্যাপারের গুরুত্বও যে কম নহে কর্তৃপক্ষ এতদিনে তাহা নাকি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকারের পরিষদের গুণী এবং জ্ঞানিগণকে লইয়া ঘন ঘন পরামর্শ চলিতেছে। আমরা পূর্বেই একথা বলিয়াছি যে, শুধু প্রাদেশিকভাবে বর্তমানের এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতের উৎপাদন এবং খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত না করিয়া খাদ্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে চোরাই কারবারের চাপে দরিদ্রদের পক্ষে অনর্থই বৃদ্ধি পাইবে। বাঙলা সরকারের অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থায় আমাদের সেই উক্তির সত্যতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতের বাহিরে সিংহলে এবং ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে ভারত হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার আবশ্যকতার কথা এখন শুনিতেছি এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর কথাও শুনা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত দিন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহারা কেবল এই ধরণের কথাই বলিয়াছেন যে, খাদ্যের জন্যও কোন ভাবনা নাই এবং বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সরবরাহের জন্য মালগাড়ীর জন্যও কোন চিন্তা নাই; কিন্তু এই ধরণের আশ্বাস সত্ত্বেও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব অবস্থার চাপে অন্নচিন্তা উত্তরোত্তর একান্ত এবং অনিবার্য আকার ধারণ করিয়াছে, ফলে জনসাধারণের কাছে গভর্নমেন্টের বিবৃতি এবং বিজ্ঞপ্তি লঘু হইয়া পড়িয়াছে; শুধু তাহাই নহে, সেই লঘুতাকে জনসাধারণ তাহাদের দুঃখ-কষ্টে গভর্নমেন্টের সহানুভূতির অভাব বলিয়া বুঝিয়াছে। এজন্য সাধারণকে দোষ দেওয়া চলে না। জনসাধারণের মনের এইরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য গভর্নমেন্টের নীতিই দায়ী। গভর্নমেন্ট যদি বলেন যে

বাজারে বাজারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উথলিয়া উঠিয়াছে, আমাদের ব্যবস্থা এমনই সুন্দর; অথচ দুই সের চাউল যোগাড় করিবার জন্য লোকের যদি একদিনের কাজকর্ম বন্ধ করিতে হয়; পয়সা দিয়াও দোকানে দোকানে ভিক্ষুকের মত লাঞ্ছনা সহিয়া ফিরিতে হয়, তবে সরকারী বিজ্ঞপ্তি এবং বিবৃতির অন্তর্নিহিত আত্মশ্লাঘা লোকের অন্তরে উত্তেজনারই সৃষ্টি করে। নিজেদের উচ্চপদের আরামপূর্ণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা ঐ সব বিবৃতি বা বিজ্ঞপ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহাদের সহৃদয়তা সম্বন্ধেও এ অবস্থায় জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারে না। আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, কথার জোরে বর্তমান সমস্যা কাটিবে না, কথার সঙ্গে আবশ্যক কাজের; কথা অনুযায়ী যদি কাজ না হয় তবে তেমন কথা অনর্থেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। ভারত সরকার যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কৃপায় প্রাদেশিক সরকার নিজেদের কথা অনুযায়ী কাজ করিবার কিছু সুবিধা লাভ করেন তবেই ভাল। আমেরিকাতেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ ফিলিপ মারে সম্প্রতি তথাকার খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধানের সমালোচনা করিয়া উহাকে 'জাতীয় কলঙ্ক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই নীতির ফলে চোরা বাজারের বেসাতি যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, একথাও বলিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা ধনীর দেশ। সে দেশে সবই খাটে। আমাদের অবস্থার সঙ্গে সে দেশের লোকদের অবস্থার কোন তুলনা হয় না। জাতির কলঙ্কের বোঝা তো আমরা কত রকমেই মাথায় করিয়া বহিতেছি, কিন্তু বর্তমানের এই সমস্যা আমাদের জীবন-মরণের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে।

খুচরা বিভ্রাট

অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, ইহার উপর খুচরা পয়সা বা রেজগীর অভাবে বাঙলা দেশের শহর এবং মফঃস্বল সর্বত্র লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে, ট্রামে, বাসে, ডাকঘরে, হোটেলে এমন কি বড় ব্যাঙ্কেও নোট বা টাকার ভাঙ্গানী পাইবার উপায় নাই। পয়সার অদর্শন তো অনেক দিনই ঘটিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানী, সিকি, আধুলী এই সব মুদ্রাগুলিও রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। টাকা দিয়াও জিনিস পাইবার উপায় নাই; সঙ্গে সঙ্গে অন্যভাবে, টাকা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে অনর্থক লাঞ্ছনা এবং উপেক্ষা ভোগ করিতে হইতেছে। পৃথিবী টাকার বশ, এই কথা শুনিতাম। সরকারের মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ কৌশলে কিংবদন্তীগত সে সত্যও মিথ্যা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকার কি? পয়সা আর ফিরিল না; কিংবা তাহার অভাব পূরণ করিবার জন্যও এ পর্যন্ত কেহ আসিল না, ভাঙ্গানীর ব্যাপারেও কি অবশেষে তাহাই ঘটিবে এবং টাকাই নিম্নতম মুদ্রার আসন অধিকার করিবে? সরকারের এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ বাঁধাই রহিয়াছে। চাউল, ডাইলের বেলা--পয়সার বেলায় তাঁহারা যে কথা বলিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাহাই বলিতেছেন। সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,--লোকে খুচরাগুলি সঞ্চয় করিতেছে, তাহার জন্যই বর্তমান অসুবিধার সৃষ্টি। কথা হইতেছে এই যে, খুচরা সঞ্চয় করিবার একটা ঝোঁক দেশের লোকের মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? পয়সা জমাইবার একটা কারণ বুঝা যায়; তাম্রমূল্যে সে ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বাড়াইবার সম্ভাবনা আছে। রৌপ্য মুদ্রা মজুত করিবারও একটা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে বুঝা যায়; কারণ দুর্দিনে তাহারও একটা নিজস্ব বস্তুমূল্য অন্ততঃ আছে; কিন্তু ডবল পয়সা, আনি-দুয়ানী--এগুলি জমা করিবার মূলে কোন্ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? সরকার এ সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার মূলে একটি মাত্র কারণ থাকা সম্ভব। পয়সার অভাবে কত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় লোকে তাহা দেখিয়াছে, ভবিষ্যতে সেই ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া দুর্ভোগ পোহাইতে না হয়, এই ভয়েই তাহারা যে যেমনভাবে পারে খুচরা জমাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এক্ষেত্রে কারণ হয়ত ইহাই। পয়সার সম্বন্ধে সরকারী নীতি লোকের আস্থাকে নষ্ট করিয়াছে, সেই অনাস্থাই ভাঙ্গানীর অন্তর্ধানে গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যন্ত লোকে যখন ভাঙ্গানীর অভাব দেখিতেছে, তখন এ সম্বন্ধে অনাস্থা তাহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার সঞ্চয়কারীদের আইনের ভয় দেখাইয়াছেন; কিন্তু সে পথে কার্যকরভাবে এই সমস্যার সমাধান হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। আইনের ভয় দেখানো সত্ত্বেও তামার পয়সা জমার কোঠা ছাড়িয়া বাজারে দেখা দেয় নাই, ভাঙ্গানীও দিবে কিনা সন্দেহ। গোয়েন্দা পুলিশের কেরামতি গোপন বেসাতীর ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যর্থ হইয়াছে, এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত সেইরূপ ব্যর্থতা লাভ করিবে। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে খুচরার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সেগুলি জমাইবার অনর্থক ঝোঁক বন্ধ করিতে হইবে। অন্নসমস্যা এবং বস্ত্রসমস্যার চেয়েও এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল; কারণ এই সমস্যার সমাধান না হইলে জাতির সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তামার পয়সার অভাব-সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিয়া সরকার এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি, এখন এই সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিয়া তাঁহারা জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের সমস্যাকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিবেন না।

কলিকাতার অবস্থা

শহর ত্যাগের ভীড় কমিয়া যাওয়াতে শহর হইতে বাহিরে যাতায়াতের সমস্যা অনেকটা কমিয়াছে; কিন্তু এই সহজ সুবিধার ধারাটি যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় কর্তৃপক্ষের এ জন্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কয়েক দিন হইল, জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ের চেষ্টায় শহরের ভিতরকার যান-বাহনের সমস্যা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। বাস চালকদিগকে কিছু বেশী পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের সুবিধা দেওয়াতে জীবন বিপন্ন

রয়া সন্ধ্যার আগে ট্রাম বাসে উঠিবার সঙ্কট কিছুটা টিয়াছে। ট্রাম কোম্পানীর কর্মচারীরাও রাত্রি সাতটা পর্যন্ত চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা আমরা থষ্ট বলিয়া মনে করি না। আমাদের মতে বাসের সংখ্যা রও বাড়ানো দরকার এবং অন্তত রাত্রি নয়টা পর্যন্ত যাহাতে য ট্রাম পাওয়া যায় এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙলা সরকারের নিকট এই স্তাব করিয়াছেন যে, সরকার যদি মাল গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে রেন, তবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক দরে তাঁহারা কলিকাতার ড়ারগুলিতে কয়লার ডিপো খুলিতে প্রস্তুত আছেন। প্রস্তাব বেশই ভাল; কিন্তু গোড়াতে যে গলদ রহিয়াছে। বহুদিন ইতেই কয়লার দর অসম্ভব মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত ভর্নমেণ্টের যান-বাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার ডওয়ার্ড বেন্থল এ সম্বন্ধে মালগাড়ীর ব্যবস্থা করিবার শ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত দর কমিবার কোন লক্ষণই দখা যাইতেছে না অর্থাৎ তাঁহার কথা অনুযায়ী কাজ হইতেছে না; সুতরাং কর্পোরেশন গাড়ি পাইলে শহরবাসীদিগকে লভ দরে কয়লা পাইবার যে সুবিধা দিতে চাহিতেছেন তাহাও কার্যে পরিণত হইবার মত কোন আশা আমরা দেখিতেছি না। ঙলা সরকারের চেষ্টার ফলে শহরবাসীর এই অসুবিধার প্রতি- র হইবে কি? অতীতের নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মরা এই আশায় থাকিলাম।

ত্রুটি কোথায়

'আপাতত কিছু সময়ের জন্য ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়া এই উভয় দেশ জাপানীদের আক্রমণের আশঙ্কা হইতে নিরাপদ হইয়াছে' বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্র আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। এই আপাতত বলিতে কতদিন, আমরা জানি না; কিন্তু আমাদের পক্ষে জাপানীদের আক্রমণের ভয় আপাতত তেমনভাবে বাস্তব জীবনকে বিপর্যস্ত করে নাই; আপাতত অন্ন-সমস্যাই আমাদের বড় সমস্যা এবং এই সমস্যাই আমাদের গায়ের রক্ত শুষিয়া লইতেছে। এই সমস্যার কিছু সমাধান হইলেই আমরা বাঁচিয়া যাই; কিন্তু তেমন কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। সেদিন বিলাতের 'রেনাল্ড নিউজ' পত্রের প্রতিনিধির নিকট ভারতের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বলেন,—"কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত জাতীয় গভর্নমেণ্টই ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারিবেন; কারণ, ঐরূপ গভর্নমেণ্টের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকিবে।" ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত জি এল মেটাও সম্প্রতি ঐরূপ বলিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ের একটি বক্তৃতায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'যুদ্ধের সময় দেশের জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনের দিক হইতে অন্যান্য দেশের গভর্নমেন্টসমূহ জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য-সরবরাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। এদেশের গভর্নমেন্ট এ বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দান করেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রিটিশ এবং মার্কিন গভর্নমেণ্ট শত্রু-অধিকৃত ইউরোপীয় দেশ সমূহে এবং তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশে পর্যন্ত খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সব দেশের গভর্নমেণ্টের পক্ষে ইহাই হইল প্রাথমিক কর্তব্য। দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও এ বিষয়ে সমভাবেই কর্তব্য রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থার সুবিধা লইয়া কেহ অন্যায়ভাবে যাহাতে অর্থসংগ্রহ করিতে না পারে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা দরকার; কারণ গভর্নমেণ্ট যাহাই করুন না কেন, ব্যবসায়ীদের এই কথা বুঝা দরকার যে, যাহারা খাদ্য-সমস্যার জন্য দুঃখ-কষ্ট পাইতেছে, তাহারা তাহাদেরই দেশের লোক। জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গভর্নমেণ্ট যদি আমাদের দেশে থাকিত, তাহা হইলে দরিদ্রকে শোষণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনও করিত।' অধ্যাপক গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুত মেটা আমাদের বর্তমান সমস্যার মূলীভূত ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরাও এ সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

ফাঁকা কথার পাণ্ডিত্য

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে বর্তমানে সম্মিলিত-পক্ষের মণ্ডলেশ্বর বা মাতব্বর ব্যক্তি বলা চলে। নববর্ষের প্রারম্ভে তিনি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে সমরাদর্শের সম্পর্কে একটি বড় বার্তা পাঠাইয়াছেন। বিশ্ববাসীদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, ভদ্র জীবনের সংস্থান প্রভৃতিকে সম্মিলিতপক্ষের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাস্বরূপে উপস্থিত করিয়া এই বার্তায় রুজভেল্ট প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে এই সব রাজনীতিকের বড় কথা আমাদের অন্তরে আদৌ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। পক্ষান্তরে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, তাঁহাদের ঐ সব কথা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিবার আবরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রুজভেল্ট সাহেব মানবজাতির স্বাধীনতা চাহেন। সে স্বাধীনতাও আবার একরকম নয়, চতুর্বিধ—কায় মন বাক্য, তাহার উপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সকলকে তিনি দিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। সে সংকল্পকে তিনি মার্কিন জাতির সহযোগিতার পথে সম্মিলিতপক্ষের সমরাদর্শে সত্য করিয়া তুলিবেন, এমন কথা বহুদিন হইতে তাঁহার মুখে শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে তাঁহার এই আদর্শ সম্বন্ধে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র আভাসও আমরা পাই নাই। ভারতের ব্যাপারে মার্কিন গভর্নমেন্ট যে একেবারে নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ আছেন, এমন কথাও তো বলা চলে না। মার্কিন গভর্নমেণ্ট এদেশের সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহারা যে ভারতবাসীদিগের পরমবন্ধু ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন এবং সে বন্ধুতা শুধু কথায় নহে কাজেও যে তাঁহার দেখাইতেছেন, ইহাও তাঁহারা জানাইতে কসুর করিতেছেন না তাঁহাদের প্রদত্ত কয়েকটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—"মার্কিন যুক্ত

রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী ভারতবাসীদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছে" এবং "যে সর্বগ্রাসী শক্তি মানুষকে দাস রাখিতে চায়, তাহাদের আক্রমণ হইতে এসিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিনবাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" পরাধীন আমরা ভারতবাসী, মার্কিন গবর্নমেন্টের এই সব ফাঁকা কথার মধ্যে আমাদের কিছুমাত্র সান্ত্বনা নাই। রুজভেল্ট সাহেবের চতুর্বিধ স্বাধীনতার তত্ত্ব কথাও আমাদের মনে কোনই রেখাপাত করে না। মার্কিন গভর্নমেন্ট এবং রুজভেল্ট ভারত সম্পর্কে আসল কথাটি এড়াইয়া যত কথা বলিতেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা তাঁহারা কেহই বলিতেছেন না। স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি রুজভেল্ট সাহেবের এবং মার্কিন গভর্নমেন্টের আন্তরিক অনুরাগই যদি থাকিত, তবে কেবল শত্রুপক্ষের অধীনে যে সব দেশ দিয়াছে সেই সব দেশের স্বাধীনতাকেই তাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেন না। মানুষকে অধীন করিয়া রাখা দাস করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যদি নিন্দনীয় হয়, তবে মার্কিন গভর্নমেন্টের শত্রুদের পক্ষেই শুধু তাহা নিন্দনীয়, আর তাঁহাদের যাঁহারা মিত্রশক্তি, তাঁহাদের পক্ষে সেই একই কার্য বন্দনীয় বা প্রশংসারযোগ্য, এই ধরণের কথা রুজভেল্ট সাহেব নিশ্চয়ই বলিবেন না। রাজনীতিকদের কথায় এবং কাজে এই শ্রেণীর ব্যবধানের ফলে লোকের মনে এইরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে যে, যুদ্ধান্তে মার্কিন এবং বৃটেনের অভিভাবকত্বের আড়ালে অভিনব আকারে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মতলব চলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতাকে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করাই তাঁহাদের নীতি মার্কিন গভর্নমেন্ট কিংবা রুজভেল্ট যদি এই কথা স্পষ্টভাবে বলেন, তবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্তমান সন্দেহের নিরসন হইতে পারে।

মিঃ ফিলিপসের দৌত্য

মার্কিন গভর্নমেন্টের দূতস্বরূপে মিঃ ফিলিপস্ সম্প্রতি ভারতে পৌঁছিয়াছেন। সেদিন নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের কাছে মিঃ ফিলিপস্ সংক্ষেপে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহার এই দৌত্য কার্যের সঙ্গে ভারতের রাজনীতির সম্পর্ক বিশেষভাবেই রহিয়াছে। কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ফিলিপস আপাতত সে প্রশ্নের জবাব দিতে চাহেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরের ভঙ্গীতে এটুকু অন্তত বুঝা গিয়াছে যে, কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের বিষয়টি তাঁহার বিবেচনার বাহিরে নয়, অর্থাৎ তাঁহার অধিকারের গণ্ডী ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। শুনিতেছি বাজেট বিতর্ক উপলক্ষে আইন-সভার অধিবেশন কালে নয়াদিল্লীতে যে সব নেতা সমবেত হইবেন মিঃ ফিলিপস তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের রাজনীতিক জনমত নূতন করিয়া জানিবার কিছুই নাই। এদেশের স্বাধীনতাই যে সকল দলের দাবী ইহা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতের জনসাধারণের অন্তরের কথা যদি জানিতে হয় তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই মিঃ ফিলিপসের সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন এবং সেই পথে অগ্রসর হইলে তিনি ভারতের সকল দলের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রটি সহজ-ভাবে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হার্বার্ট মরিসন ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-নীতি সম্পর্কে সম্প্রতি একটি বড় বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলীভূত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, বহু দেশ দখলের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যগত সেই স্বার্থের দিকটা এখনও যে প্রবল রহিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মিঃ মরিসনের মতে বাণিজ্য স্বার্থ ছাড়াও ব্রিটিশের সাম্রাজ্য নীতির আরও একটি দিক আছে, তাহা এই যে, ব্রিটিশের সংস্রবে আসিয়া বহু দেশের লোক সভ্য হইয়াছে। এই পথে দেশে জন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সমাজ-সেবা এবং নাগরিক বোধের বিকাশ হইয়াছে। আত্মশ্লাঘায় উদ্দীপ্ত হইয়া মরিসন সাহেব ব্রিটিশ জাতির শাসন-মহিমার কীর্তন করিয়া বলেন,—"আমাদের তত্ত্বাবধানে যে সব অনুন্নত দেশ আসিয়াছে, আমরা সেই সব দেশের লোকদের প্রতি মানবোচিত, ভদ্র ও ন্যায়সঙ্গত আচরণই করিয়াছি। আমরা এই বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিয়াছি এবং পৃথিবী আমাদের আদর্শই গ্রহণ করিতেছে। মিঃ মরিসন এবং তাঁহার ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শাসনের এই ধরণের সুখ্যাতি করিয়া নিজেরা স্ফীত হইতে পারেন; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, আমাদের মনে এই সব স্পর্ধিত উক্তি বিক্ষোভেরই সঞ্চার করে। আমরা দেখিতেছি, ব্রিটিশ জাতির সভ্য-শাসনে সুদীর্ঘকাল থাকিয়াও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের দুই বেলা অন্নের সংস্থান হয় না; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সকল দিক হইতেই ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের মধ্যে পশ্চাৎপদ এবং দুর্দশাগ্রস্ত। ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি সে দেশের লোকের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিক হইতে সার্থক হইয়াছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু ভারতের দারিদ্র্যজনিত সমস্যার সমাধানের দিক হইতে সে নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এ কথা আমরা বলিবই। ইংরেজের কৃপাতেই ভারতবাসীরা মানুষ হইয়াছে, এই ধরণের একঘেঁয়ে অসত্য প্রচারের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য স্বার্থ পাকা করা যাইবে না। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য কূট কৌশলে অপরকে নিজেদের দলে ভিড়াইতে গেলে ভারতের সমস্যা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিবে এবং তাহাতে ব্রিটিশের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থই বিপন্ন হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ইংলন্ডের স্বরাষ্ট্র-সচিবকে আমরা এই সহজ সত্যটি জানাইয়া দিতেছি।

অপ্রকাশিত

[শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমরা চলে গেলে, কেউ রইল না সকালে সন্ধ্যেবেলায় উৎপাত করতে। খাবার সময়টাও নিঃশব্দে নির্জনে কাটে। লিখেচ আমাকে অন্যমনস্ক দেখেছিলে। তার করণ আমার মনটাকে তার ঘাটের বাঁধন থেকে মুক্ত করে অকূলসমুদ্রে ভাসান দেবার সাধনায় আছি। রসি কাটচি, নোঙর তুলচি, নিজের যে স্বরূপটা সকল সম্বন্ধের বাইরে, তার আবরণটা সরাচ্চি। অনেকদিন সে তার সুখ-দুঃখ বাসনা কামনা নিয়ে এই দেহটার সঙ্গে বিজড়িত ছিল, কিন্তু দেহটা তো অতলে ডুববেই, তার পূর্বেই আপনাকে খালাস করে নিতে চাই, সেই কাজে আছি। মাঝে মাঝে সেই মুক্ত আমির জ্যোতির্ময় পরিচয় পাই, আনন্দে থাকি। এখন আমার অন্যমনা হবারই সময়—কিছুতে মন লেগে থাকতে চায় না—যা কিছু আমাকে আড়াল করে, তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময় এসেছে। কেননা আমার মর্ত্যলোকের মেয়াদ তো আর বড়ো বেশি নেই। এই অল্প একটু-খানি সময়কে আলোকিত করতে চাই। সে যে প্রদোষের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে উঠবে এ আমি চাইনে।

দশটা বাজল। সকালের হাওয়া এখনো ঠাণ্ডা হয়েই বইচে। আমার সেই কোণের খোলা ঘরটায় বসে লিখচি। চারদিকে গাছপালা ঝলমল করচে শরৎ-প্রভাতের আলোয়। দরজার সামনে দিয়ে সাঁওতাল মেয়েরা যাতায়াত করচে মাথায় ঝুড়িভরা মাটি নিয়ে—আমার ঘরের কাজে। মাঝে মাঝে কানে আসচে গাঙ্গুলীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

এইমাত্র গাঙ্গুলী খবর দিলেন আহারের চেষ্টায় গা তুলতে হবে। অতএব ইতি—২৩ আশ্বিন ১৩৪২।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার ক্লান্তি ও দুর্বলতা বেড়ে চলেছে। তাই চিঠিপত্র লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি।

তুমি পঞ্চমীর দিনে এখানে আসবে—সমাদর করেই নেব। এখান থেকে কোথাও যাব না। ইতি—১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার বাণীময় পাত্রে ছন্দেগাঁথা ভাইফোঁটার অর্ঘ্য পাঠিয়েছ—খুশি হয়ে তা গ্রহণ করেছি মনে মনে। ছন্দেই উত্তর পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু অগাধ কুঁড়েমির মধ্যে তলিয়ে আছি। সাংসারিক সকল কর্তব্যেই অবহেলা করে চলেছি দিনের পর দিন। এ চিঠিও হয়ত ভুলে যেতুম—হঠাৎ বেহারা এসে জিজ্ঞাসা করলে, ডাকে চিঠি দেবার আছে কি? একবার বললুম, না,—তার পরে হঠাৎ মনে পড়ল, আছে। কেদারায় পা মেলে বসেছিলুম—ধড়ফড় করে উঠে পড়েছি। ডাক যাবার সময় সংকীর্ণ। তার মধ্যে তোমাদের আশীর্বাদ পাঠাই। কার্তিকের অপরাহ্ণ পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে। শাখায় শাখায় দোলা লেগেছে আম গাছে। আজ আমার এই একখানি মাত্র চিঠি যাবে ডাকে—অনেকগুলো চিঠির দাবি উপেক্ষিত হয়ে রইল। অনেককাল পরে অভদ্রতার আরামে নিবিষ্ট হয়েছি। ইতি—১ অক্টোবর, ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আজ সমস্ত দিন কাজের এবং লোকের ভিড়। এলে দেখা করবার ফাঁক পাব না।

পর্শু যদি স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন রেঁধে আনতে পার, তাহলে যারা ভোগের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে আছে, তাদের ডেকে খাওয়াতে পারি। তারা তোমার মিষ্টান্নের স্বাদ পেয়েই বুঝেছে, আমিষেও তোমার হাত পাকা। মধ্যাহ্নে খাওয়াবে কিম্বা সায়াহ্নে, সেটা তুমিই ঠিক করে জানিয়ো।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

এ যাত্রা দেখা হোলো না। আজই আর কয়েক ঘণ্টা পরে এলাহাবাদ যাত্রা করতে হবে।

তোমার স্বস্থানে যখন ফিরবে তখন আশা করি তোমার হাতের অর্ঘ্য আমার ভোগে লাগবে। আমার ফিরতে এখনো মাসখানেক দেরি হতে পারে।

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

সামনে যেতে যেতে পিছন পানে তোমাদের দিকে আমার আশীর্বাদ পাঠাই, দিনান্তের সূর্য যেমন অস্তসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে পিছনে তার রশ্মি বিকীর্ণ করে। তোমাদের অল্প বয়স, তোমাদের জীবনের সকল ফলের বোঁটাই সংসক্ত হয়ে রয়েছে সংসারের ডালে ডালে, যেটিতে টান পড়ে, সেইটিতেই ব্যথা লাগে—তোমরা কিছুতে বুঝতেই পারবে না শিথিলবৃন্ত প্রাণের বৈরাগ্য। পৌষে পাকা ধানের ক্ষেতে ভিতরে ভিতরে একটা মুক্তির আনন্দ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে—সার্থকতা আপন সীমায় এসে নিষ্কৃতির মধ্যে ছুটির রস ভোগ করে। পাকা ধান যে কাটা যায়, তাতে দুঃখ নেই—সেই অবসানে তার পূর্ণতা।

তুমি আমার বিশ্রামের কথা ভেবো না—কাজের ধারা আপনিই তো কমে এসেছে—বৈশাখ মাসের অজয় নদীর জলের মতো। বিশ্রামটাই ধূ ধূ করছে যেন বালুর চর। আমার খবর পাবার জন্যেও ব্যস্ত হোয়ো না—নানা খবর থাকে জীবনের মধ্যাহ্ন দিনে—এখন প্রদোষের একটানা প্রহরে খবর আজও যেমন কালও তেমন। আমার ঘরগুলো তো দেখে গেছ—কল্পনা কোরো এই মাটির নীড়ে সকাল সন্ধ্যায় শান্ত হয়ে আছি। অনেককাল বই পড়বার সময় পাইনি—এখন বই পড়ি, লেখা বন্ধ করবার দিন এসেছে। জীবনে শরৎকাল এসেছে, এই আমার শুভ্র শান্ত ছুটির কাল। ইতি—১৯ অক্টোবর ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু,

সন্ধ্যাবেলায় সূর্য তার আলো গুটিয়ে আনে। তখন তার নীরবতার এবং গোপনতার সময়। আমার মন জীবনের দিনাবসানে নিস্তব্ধ হয়ে আসচে—সংসারের ভালোমন্দ লাগার ঘাটের থেকে আমার চিত্ত প্রতিদিন ভেসে চলেছে দূরে। জীবনের যে অংশ পিছনে রইল পড়ে তার সঙ্গে আমার যোগ শিথিল হয়ে আসচে। সেই জন্যেই ঐ পরিচ্ছেদটা সমাপ্ত করে দেওয়াই ভালো—টানাটানি করে ওটাকে বাড়িয়ে রেখে দেওয়া এ অবস্থায় অস্বাভাবিক। আমার যথার্থ ভাষা এখন মৌনের ভাষা।

আমি তো কিছু উপহার রেখে গিয়েছি, ভাবী যুগের ভোগের জন্যে রইল সে সমস্ত। তোমাদের কাছে আমার যেটুকু স্থায়িত্ব সে আমার ঐ বাণীর মধ্যে। একদিন তারো দীপ্তি হয়তো ম্লান হয়ে আসবে—তখন রূপ মিশোবে মাটিতে, নাম মিলোবে হাওয়ায়। আমরা গত যুগের অতিথি, নতুন যুগের জায়গা জুড়ে থাকব কেন?

রাজা অভিনয়ের রিহার্সাল চলচে—ব্যস্ত হয়ে আছি। এই উপলক্ষ্যে কলকাতায় যেতে হবে, তখন দেখা হতে পারবে। ইতি—২৬ নভেম্বর ১৯৩৫।

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

আজকাল চিঠিপত্র লিখতে কাজকর্ম করতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা হয়েছে। শরীর মন বিশ্রাম করতে চায়। পাকা ফল এখন পড়বার দিকে ঝুঁকেছে তাই তার বোঁটা আলগা হয়ে এসেছে—সংসারের গাছটাকে আর সে আঁকড়ে থাকতে চায় না।

জানুয়ারির শেষভাগে হয়তো কলকাতার দিকে যাওয়া ঘটতেও পারে তখন মিষ্টান্নের দাবী সহজ হবে কিন্তু জুতোর দরবার করা চলবে না কারণ পূর্বতন জুতোজোড়া এখনো জীর্ণ হয় নি। তারও দিন ফুরোবে তখন তোমার শরণাপন্ন হব। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯৩৬

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

জীবনটা প্রথমে ছিল ঝরণা, তার পরে হয়েছিল নদী, এখন এসে দাঁড়িয়েছে সরোবর রূপে। এখন না আছে গতিবেগ, না আছে ধ্বনিবৈচিত্র্য, চুপচাপ আছি আপন গভীরতার মধ্যে। বাইরেকার চঞ্চল বিশ্বের ছোটো বড়ো নানা ধারা এসে এখানে পৌঁছয়—তাদের গ্রহণ করি বক্ষতলে, কিন্তু নিঃশব্দে। ছায়া পড়ে সকালে বিকালে বাইরের আকাশের—তাদের স্তব্ধভাবে ধারণ করি, এই পর্যন্ত। তোমরা নিজের অনুভূতিতেই আমাকে অনুভব করবে, তোমাদের আপন ভাষায় আমার মৌন ব্যাখ্যা করে নেবে—তোমাদের সঙ্গে এখন আমার এই রকম সম্বন্ধ। চুপ করে থাকারও ভাষা আছে, সেই ভাষা যদি স্বীকার করে নিতে পারো তাহলে নৈরাশ্যের কোনো কারণ থাকবে না।

নাৎনীর বিবাহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল চুকে গেছে। এখন নতুন সংসারে তাদেরই ব্যস্ততার দিন এল।

জন্মদিন আসন্ন কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো সমারোহ করবার ইচ্ছা নেই। ৭৫ বছর বয়স হোলো এ কথাটা লোক ডেকে ঢাক পিটিয়ে বলবার দরকার কী আছে? ইতি ৩ মে ১৯৩৬

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

আমার নিরামিষ আহারের পবিত্র ব্রত পাছে তোমার হাতের প্রস্তুত মাছের ঝোলের গন্ধ পেয়েই যেত ভেঙে এই ভয়ে আমার বিধাতা ঠিক সেই সময়টাতে তোমাকে এত ব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এই পুণ্যের অংশ তোমাদের নতুন জামাই দাবী করতে পারেন। তোমাদের ভগ্নীপতির যে রকম সহজে পোষমানা ধাত দেখতে পাচ্চি তাতে আশা করচি ওকে বশ করবার কাজ দেবরাণীর পক্ষে অত্যন্তই সহজ হবে। এত বেশি সহজ হওয়াও ভাল নয়—তাতে এই ভালোমানুষ প্রাণীটির দর কমে যাবার আশঙ্কা আছে। আমি কাছে থাকলে পরামর্শ দিতুম, ধরা দেবার পূর্বে বেশ একটু দাপাদাপি করা কর্তব্য। যাই হোক খুশি হলুম শুনে যে নতুন লোকটিকে তোমাদের পছন্দ হয়েছে।—ঝড়বৃষ্টি এখানেও খুব চলেছে—এত বড়ো জ্যৈষ্ঠ মাসও তোমাদের জামাইয়ের মতোই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কবে যাব কলকাতায় কী জানি—জুলাই মাসের পূর্বে নয়। ইতি ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

দাদু

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

তোমার দাদু তোমাকে ফাঁকি দিতে চায় না। খুবই সম্ভব জুলাই মাসের মধ্যে কলকাতায় যাব, তুমি শ্বশুর-বাড়িতে অন্তর্ধান করবার পূর্বে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। অচলতার জালে জড়িত আমি—জরুরী তাগিদ না পড়লে কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ ঘটে না। আমার বয়সটা একটা খাঁচার মতো—দৈবাৎ বিশেষ করে দরজা ফাঁক না হলে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব হয়।

বৃষ্টিতে রোদ্দুরে মিলে পরস্পর পাল্লা দিচ্চে শরৎকালের মতো।
ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪৩

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

সোমবারে আমি কলকাতায় যাব। জোড়াসাঁকোয়। কারণ বরানগরের বাড়ির গৃহস্থেরা এখন সিমলা শৈলশিখরে উধাও। কার্যবশত মঙ্গলবার থেকে কয়েকদিন আমাকে থাকতে হবে বালিগঞ্জে। বুধবারে আমার বক্তৃতা টাউনহলে। প্রশান্তরা ফিরবেন ২১শে জুলাই নাগাদ। তখন দুই একদিন সেখানে থেকে চলে আসব এইরকম সংকল্প। গৃহস্থের অনুপস্থিতিতেও হয়তো উদ্দেশে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতেও পারি। এই রকম সুযোগে তোমার স্বহস্ত পক্ক অন্ন

আস্বাদনের অবকাশ ঘটবার আশা আছে। বরানগরে যদি না থাকাও হয় তাহলে জোড়াসাঁকোয় যদি আসো কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।

বর্ষা নেমেছে, কিন্তু ধীর মন্দ ভাবে। মেঘের ঘটা যত, বর্ষণের প্রবলতা তত নয়। ক্ষণে ক্ষণে গুমট এসে আকাশ চেপে ধরে। এক একবার ক্ষণকালীন রৌদ্র দেখা দেয় অনিচ্ছাকৃত অনুগ্রহের মতো। চারিদিকে শ্যামশ্রী। আমার এই বেড়া দেওয়া বাগানে একটি গাছে আছে কেবল কাঞ্চন; গোলক চাঁপার অজস্রতা কমে গেছে, কিন্তু পল্লবস্তবকে প্রাণের প্রাচুর্য। আজকাল আমার মন বাঁধা পড়ে আছে তরুরাজির আতিথ্যে। কাজ কিছু না কিছু করতেই হয় কিন্তু ভালো লাগে না। ছেলেমানুষের মতো দায়িত্বহীন ছুটি পেতে ইচ্ছা করে। ইতি ২৭ আষাঢ় ১৩৩৬

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রবিবার অপরাহ্ণে বরানগরে পৌঁছব। সেদিন পাঁচটার পর সেখানে আমার নতুন লেখা একটা গল্প পড়বার কথা। যথাসময়ে তোমরা যদি আসতে পারো শুনতে পাবে। মঙ্গলবারেই আমার ফেরবার কথা। ইতি ২৮ আষাঢ় ১৩৪৩

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

এবারে কলকাতায় আধমরা হয়েছিলুম। ভয় হোলো পাছে মরণদশাটা সম্পূর্ণ হয়। মরতে ভয় নেই—কিন্তু কলকাতা শহরে দিন শেষ করতে আপত্তি আছে। তোমার সঙ্গে দেখাকরা অসাধ্য হয়েছিল। হয়তো মাসখানেক পরে কলকাতায় যাওয়া ঘটবে—তখন দেখা হবে। এখন আর কিছু নয় শরীরটাকে কোনোমতে শুধরিয়ে নিই। ইতি ৩০ জুলাই ১৯৩৬

দাদু

কল্যাণীয়াসু,

রাগ করা আমার স্বভাব নয়—মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। কী কী বই পাওনি তা আন্দাজ করতে পারচিনে। পত্রপুটের পরেই তো ছন্দ ছাপা হয়েছে। যাই হোক কয়েকদিন পরেই কলকাতায় যাব তখন বোঝাপড়া হবে। ইতিমধ্যে শান্ত হয়ে অপেক্ষা কোরো। ইতি ৩০।৮।৩৬

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

সেদিন পরিতৃপ্তি লাভ করেছি সে কথা তুমি নিজেই অনুভব করেচ। পুনশ্চর জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম।

শরতের রৌদ্র চারিদিকে বিকশিত। পারুল বনেও বোধহয় তার কিরণ বিকীর্ণ। ব্যস্ত আছি। ইতি ৬ আশ্বিন ১৩৪৩

দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতা শহরের উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠল—এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। বেঁচে গেছি। যখন বরানগরে আশ্রয় ছিল তখন আত্মরক্ষার উপায় ছিল—এখন কলকাতার ব্যূহের মধ্যে ঢুকে সপ্তরথীর মার খেতে হয়। জানিনে ভবিষ্যতে রাণীদের প্ল্যান কী। ভাইফোঁটার সময় এখানে যদি আসতে পারো তো ভালোই। এখানেই থাকব। ঠাণ্ডা পড়ে আসচে। কাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা—এটা কেটে গেলেই হেমন্তের প্রভাব দেখা দেবে। আমার এখানকার নতুন বাসা প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। ২ কার্তিক ১৩৪৩

দাদু

(১১)

বেলা গেলে বাড়ি ফিরলো শৈলজা; যেমন রোজ ফেরে, ও তেমনি ফিরছিল, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে একটি অচেনা য়েকে। মেয়েটি বালিকা নয়, কৈশোরও পার হতে চলেছে, তু সাজ-পোষাক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেহ ও মুখে খে এমন একটা ক্লিষ্টতা, এমন একটা দৈন্যের চিহ্ন সুপরি- ট যে দিকে তাকালে শুধু দয়া কি সহানুভূতি জাগাতো দূরের —কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় প্রাণের মধ্যে।......

এই মেয়েটিকেই পেছনে নিয়ে পল্লীপথের হাঁটু ন্ত ধুলো বালি ঠেলে শৈলজা যখন বাড়ির ভেতর এসে পস্থিত হলো, তখন বেলা প্রায় দুটো। ভেতরবাড়ি প্রায় স্তব্ধ, শুধু দুই একটা চড়াই উঠানের এধার থেকে ওধার র্যন্ত ওড়াউড়ি করছে, আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে বেড়ায় াধা সজনে গাছের পাতাগুলো।

শৈলজা এদিক ওদিক তাকালে তরঙ্গর উদ্দেশ্যে; কিন্তু না দিনের মত বারান্দায় শুধু নয় কোথাও দেখতে পেলে া। অগত্যা বনবিহারীর মত সেও এ-ঘর ও-ঘর খোঁজাখুঁজি রে অবশেষে আবিষ্কার করলো তাকে।

অন্য সময় হলে তরঙ্গ তার পদশব্দ অবশ্যই শুনতে পত, কিন্তু এখন পেল না।

ঘরের ভেতর এসে শৈলজা দেখলে, তরঙ্গ বিছানায় উপুড় য়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নিজের চোখকেও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারলো না শৈলজা, আবার তাকাল সেই দিকে।......

সত্যিই তরঙ্গ কাঁদছে!

তরঙ্গ,—যে তরঙ্গকে শৈলজা নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন বলেই জানে শৈলজা, তার মনের কোথায় কতটুকু ফাঁক থাকতে পারে যে, সে পথে চোখের জল বার হওয়াও নিষিদ্ধ নয়?

একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখলে সে, তারপরে কয়েক পা এগিয়ে ডাকলে "মামি!—"

তরঙ্গ বারেকের জন্যে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই আবার মু ঢাকলে—।......

অনেকদিনের বাঁধা-ধৈর্যের বাঁধ আজ বুঝি তার কোন অসতর্ক মুহূর্তে পেয়ে খুলে গেছে, তাই চোখের জলের স্রোত ছুটেছে আকুল হয়ে,—ছোট বড় বাধাকে ভাসিয়ে।......শৈলজাকে দেখেও সে চাপা দেবার চেষ্টা করলে না তাকে।

শৈলজা ক্ষণিকের জন্য কি ভাবলে, তারপরে এগিয়ে এসে দুইহাতে উঁচু করে তুলে ধরলে তরঙ্গর মাথাটাকে; পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেঃ—

"কাঁদছো?......"

তরঙ্গ উত্তর দিলে না, মাথাও সরিয়ে নিলে না শৈলজার হাতের মধ্যে থেকে; শুধু চোখের পাতা দুটো এক হয়ে গেল—চোখের জলের মধ্যে দিয়ে, উত্তর দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঠোঁট দুটো একবারই কেঁপে উঠলো যেন!

শৈলজা চমকে উঠলো; মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলে ঃ—"মামি!"

ধীরে, খুব ধীরে ধীরে বললেঃ—"বল।"

এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যেন শৈলজার পরিচয় ছিল না—তাই শিউরে উঠলো সে; তরঙ্গর মাথাটাও খসে পড়লো অজ্ঞাতে। শৈলজা দেখলে—সে মুখখানা শুধু জলে ভাসছে, শিশিরে ভেজা স্থলপদ্মের মত।......

শৈলজার কম্পিত হাত থেকে তরঙ্গর মুখখানা লুটিয়ে পড়েছিল বিছানা বালিশের মধ্যে।

শৈলজা স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তার-পরে যেমনভাবে এসেছিল তেমনি ভাবেই বার হয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

এই অবসন্নভাব মন ও দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলে তরঙ্গ যখন উঠে দাঁড়ালো, বাইরে তখন দিনের শেষ হয়ে এসেছে।...... উঠোনের একপাশে পড়ে একটুকরো রোদ লুটোপুটি খাচ্ছিল ধুলো-বালির সঙ্গে। ওধারের বেড়ায় বাঁধা সজনে গাছের পীত পাতাগুলো ঝরে পড়ছিল—হাওয়ার স্পর্শে।......

কোথা থেকে একটা ঘুঘুর করুণসুর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছিল যেন।...... ঘড়া কাঁখে ঘাটের পথে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ালো তরঙ্গ, নজর পড়ল বারান্দার দিকে—। একপাশে জড়ো-সড়ো অবস্থায় হাঁটু দুটো বুকে বেঁধে বসে ও মেয়েটি কে? মনে হয় ও মুখ যেন তরঙ্গের চেনা-চেনা! কোথায়,—কতদিন আগে দেখেছিল যেন!......হঠাৎ ও চমকে উঠলো......; মনে

পড়েছেঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে,......তরঙ্গ ওকে চেনে।—ও তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর আগের পক্ষের মেয়ে......ও সেই সিন্ধু!

কাঁখের কলসীটাকে তরঙ্গ নামিয়ে রাখলে বারান্দার একপাশে, তারপর পায়ে পায়ে এলো এগিয়ে ঃ

"কে ও? সিন্ধু নয়?......"

যে নিস্পলকে এইদিকে তাকিয়ে চুপ করে বারান্দার এক-পাশে বসেছিল, সে এইবার রুদ্ধস্বরে জবাব দিলে ঃ—"হ্যাঁ, আমি; আমিই ছোটমা,—আমিই এসেছি আজ তোমার আশ্রয়ে। কেউ জায়গা দিলে না, একমুঠো খাবারেরও সংস্থান হলোনা কোথাও,—তাই এসেছি; আমায় তাড়িয়ে দিও না ছোটমা, তোমাদের পায়ের কাছে থাকবার এতটুকু জায়গা দিও ছোট মা, তাড়িয়ে দিও না—"

সে উপুড় হয়ে পড়লো তরঙ্গর পায়ের ওপোর—মুখ-খানা পায়ের ওপোর চেপে ধরে কেঁদে উঠলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ঃ "অমায় দেখবার জগতে বুঝি আর কেউ নেই।"

তরঙ্গ পা দুখানা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে পারলে না, উত্তরও দিতে পারলে না হঠাৎ শুধু সমস্ত অন্তরটা কিসের একটা অজানা অস্থিরতায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো যেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো—পা দুখানা মুক্ত করে, তারপরে বললেঃ—"ভুল বুঝেছো প্রার্থনা তোমারও যা, প্রার্থনীয় আমারও তাইই, তবে তুমি এসেছো দুদিন পরে, আমি এসেছি দুদিন আগে; পার্থক্য আমাদের মধ্যে এইটুকুই, নইলে আর এক ফোঁটাও ভিন্ন ভেদ নেই তোমার আমার মধ্যে, যাতে তাড়াবার বা রাখবার মত দাবী-দাওয়া আমার থাকতে পারে।—"

সিন্ধু উত্তর দিলে না একবার, কিন্তু ওর বড় বড় চোখের কাতরদৃষ্টি অসহায়ের করুণ নিবেদনে যেন একবার দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে দিলে —না, না।......

তরঙ্গ গ্রাহ্য করলে না সে অনুনয়,—কলসীটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে বার হয়ে চললো ঘাটের পথ ধরে।

এঁকা বেঁকা পুকুরের পথ। দুপাশে গাছ-গাছড়ার ঝোপ-ঝাড় যেন বুক দিয়ে পথটাকে ঢেকে রাখতে চায় উন্মুক্ত আকাশ আর আলো থেকে। এরই নীচে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে' বংশাবলী বিস্তীর্ণ করে চলেছে আস্‌শ্যাওড়া, ঘেঁটু, আর ফেনিমনসার দল।......

তরঙ্গ চলেছিল এই পথ ধরেই, কিন্তু প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছিল, পা দুটো যেন তার দেহের ভার বহন করতে পারছে না, তাই জবাবদিহি ওর ফুটে উঠছে অবসন্নতায়।......উপবাসের জন্য নয়, এমন উপবাসে তার অনেকদিনই কেটে গেছে গোণা-গাঁথা জীবনের মধ্যে, অনেক ছোটো-খাটো স্পর্শ, অনেক ছোট-খাটো আঘাতও অনুভব করেছে অনেকদিন, কিন্তু আজকের মত আচ্ছন্নতা একদিনও আসেনি তার জীবনে। আজকের এই মুহূর্তগুলো সুখে না দুঃখে, বেদনায় না তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ তা যেন এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না, শুধু মনে হচ্ছে—এ যেন একটা অভিনয় চলেছে তার আসপাশ ঘিরে, আর তার প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে সে নিজে।

পায়ে পায়েই হেঁটে এসে তরঙ্গ দাঁড়ালো ঘাটের চাতালে। বহুকালের ঘাট। কবে কে এই গ্রামবাসীর উপকারের উদ্দেশে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে ঘাট বাঁধিয়েছিল, অতীতের ইতিহাসে তার নাম ধূলিমলিনতায় লেখা থাকলেও এখানে আজ তার নাম গন্ধও কারো খুঁজে পাবার উপায় ছিল না। তবে তরঙ্গ জানে বেশীদিন নয়,—মাত্র বছরখানেক আগের কি একটা মামলা মোকদ্দমায় পাওনা-গণ্ডার দায়ে ডিক্রি জারি করে' বনবিহারী এই পুকুর আর এর চারপাশের জমি-জায়গা দখল করে নিয়েছে।......

যেদিন বনবিহারী এই পুকুর দখল করে সেদিন চন্দ্র মুখুজ্জে ওর গলার আধময়লা পৈতে তুলে সকরুণ-সুরে অভিসম্পাত দিয়েছিল; বলেছিলঃ—"দিন-রাত আজও হচ্ছে, ভগবানও আছেন। কলিকাল হলেও তাঁর বিচার মাথার ওপোরে তোলা রইল; বনবিহারী পুকুর জায়গা নিয়েছে, নিক; কিন্তু সত্যিই যদি এ ওর পাওনা হতো তাহলে কথা ছিল না; কিন্তু ও নিলে মিথ্যে করে, ফাঁকি দিয়ে; সেইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ আমার, আর সেই জন্যেই বলছি—এ সম্পত্তি যেন ওর ভোগে না লাগে।"

বনবিহারী হেসেছিল ওর উত্তরে; পরম উপেক্ষায় হাতের হুঁকোটায় পর পর গোটাকতক টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল ঃ—

"পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে হলে এমন হৃদয়হীন প্রত্যেককেই করতে হয় মুখুজ্জে মশায়, স্বয়ং ভগবানও বাদ থেকে বাদ পড়েন না, আমি তো কা কথা! আর পাওনা বা তা সে ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক—তার দাবী ছেড়ে দেবার মত মহত্ত্ব আমার নেই—।"

এ সেই পুকুর; এর আসপাশে জমি-জায়গাও অনেক আর সেই জায়গাভরা তাল, নারকেল বাগান। দু'ই চারটে আম জাম ক পেয়ারা গাছও আছে হয়তো, নজরে পড়ে না। এদের সবগুলোর ছায়া এসে পড়েছে পুকুরের জলে, সে ছায়া হাওয়া লেগে মাঝে মাঝে কাঁপছে, আবার স্থির হয়েও থাকছে ওর মধ্যে।

কলসী নামিয়ে রেখে তরঙ্গ শান-বাঁধা ঘাটে বসলো পা ছড়িয়ে।

বেশ লাগছে বসতে।

গ্রামের আর কোনও মেয়ে এখনও গা-ধুতে আসেনি, জলও ভরে নিয়ে যায়নি এখনও, সুতরাং এই নির্জন সময়টা সে বেশ স্বস্তি অনুভব করলে বাড়ির গণ্ডি পার হয়ে। করুণসুরে কোথায় ঘুঘু ডাকছে একটা, আকাশে মেঘের নীচে পাখা মেলে শ্রান্ত বক্ষ বেয়ে উড়ে চলেছে অচেনা পাখীর দল, এলোমেলো হওয়ার স্পর্শে নারকেলের পাতাগুলো কাঁপছে সর্‌সর্‌ করে'।

কতক্ষণ কেটে চললো এইভাবে।......

হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে মুখ ফিরালে তরঙ্গ; দেখলে সেই চন্দ্র মুখুজ্জের স্ত্রী।......

নিরলঙ্কার হাতদুখানি শাঁখায়-সমাদৃত, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত খাদি একখানি ময়লা লালপাড় সাড়ী পরণে।......

মাজা-ঘসা ঝক্‌ঝকে একটা পেতলের কলসী কাঁখে হাত ধরে সে জল নিতে এসেছে ঘাটে।—তরঙ্গকে দেখে থমকে দাঁড়ালো,—তারপর দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণ কাছ হয়ে ...াসতে প্রশ্ন করলেঃ—

"কে ও ছোটগিন্নী না?—"

তরঙ্গ জবাব দিল ঃ—

"

চন্দ্রগিন্নীর মুখে কৌতূহলের সঙ্গে বিদ্রূপ ফুটে উঠলো ...ঃ—"তুমি যে আজ ঘর-সংসার ছেড়ে এখানে উদাসীনী বসে আছ হঠাৎ?—"

"হঠাৎই বটে!"

তরঙ্গর হাসি এলো এত অবসন্নতার ভেতরেও; মনের ...র সামলে নিয়ে শান্তস্বরে জবাব দিলেঃ—

"মানুষের মনতো, তাই তার ঘরই থাক, আর সংসারই —তার বাঁধনও সময়ে সময়ে অসহ্য হয়ে ওঠে বৌকি!—...ষেরই গড়া নিয়ম-শাসন ভাঙবার, ডিঙোবারও অধিকারও মানুষেরই একার দিদি, তাই এই ভালো না লাগা, এই ...!"

চন্দ্রগিন্নীর মুখের বিদ্রূপ মুছে গেল নিশ্চিহ্নে, স্বামীর ...া অভিসম্পাতের রূঢ়তারই এক অংশ যেন ভেসে উঠলো দৃষ্টির কঠিনতায়। বললেঃ—

"বিরক্তি?—তোমারও বিরক্তি ধরে, ভালো না লাগবার ...য়ং থাকে ছোটবৌ,—আশ্চর্য বটে; আমি কিন্তু ভেবে-...ম"

একটা কি কথা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল: শুকনো ...টা একটা ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিয়ে বললেঃ—...ক—ওকথা—।......মানুষ মনে মনে অনেক ভাবে, অনেক ...ও করে ফেলে অজান্তে—তার জন্যে ত্রুটি ধরো না!...।......"

...ও চলে গেল জল নিয়ে। তরঙ্গ তবু বসে রইল সেইখানে, ...করে।......

অন্যদিন হলে সে হয়তো ঐ এক কথাতেই চন্দ্রগিন্নীর চোখে জল না বইয়ে ছাড়তো না কথার বন্যায়; কিন্তু আজ সে নির্বাক; কথার উৎস, বচসার শক্তি যেন তার মন থেকে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে—।......

জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে—চন্দ্রগিন্নীর স্পর্শে জলের সে স্থৈর্য ভেঙে ছায়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

ঐদিকে তাকিয়ে নিজেরও তার মনে হলো এতদিনের জমা করা যা তার একাগ্রতাই হোক, আর নিষ্ঠাই হোক—সব ভেঙে চুরে ঐ জলে-ভাসা ছায়ার মতই কোথা থেকে কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে একেবারে,—আর সে যাওয়া—এমন যে, তরঙ্গ আর হয়তো কোনও দিনই ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ঐ জলের স্থৈর্য, ও আবার কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসবে হয়তো কিন্তু তরঙ্গর মনের স্থৈর্য আর ধরা দেবে না তার কাছে; সে আজকের এই দিনটার শেষ-আলোর মতই মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে! দিগন্ত সীমায়—ঐ তার এতটুকু রক্তিমতা, এতটুকু স্পর্শ তরঙ্গকে ইঙ্গিতে জানাচ্ছে ওর বিদায় বার্তা, কিন্তু তরঙ্গ আর তাকে ফিরিয়ে ডাকতে পারছে না; খুঁজেও পাচ্ছে না মনের মধ্যে সে শক্তিকে, সে সাহসকে।...

কম্পিত বাহুবন্ধনে সে চেপে ধরলো কলসীটাকে বুকের মধ্যে; শুনলো ওর নিজেরই বুকের দ্রুত শব্দ যেন প্রতিশব্দায়িত হয়ে উঠছে শূন্য কলসীটার মধ্যে, জন-মানবশূন্য পুকুরঘাটে। আতঙ্কভরা চোখে সে তাকালো দূরের দিকে......

এই জল, ঐ ওর তীর, তার ওপাশে বাঁশবাগান ডিঙিয়ে মাঠ, পায়ে চলার পথ।......উঁচু, নীচু, এবড়ো, খেবড়ো।......ঐ পথে গরু তাড়িয়ে আনছে রাখালেরা; ওদের বেতালা বেসুরো গলায় আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠছে—মেঠো গানে গানে। তরঙ্গ তাকিয়ে রইল ঐদিকে অন্যমনে......।

সামনে—জলরেখায় অঙ্কিত চন্দ্রগিন্নীর পদরেখা শুকিয়ে উঠতে লাগলো ক্রমে ক্রমে।......

ক্রমশ

তলার হাওড়ের মাঝি

শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার

বিয়ের পর সুজন কোন মতেই আর শ্বশুরালয়ের তৈরী অন্ন-ব্যঞ্জনের লোভ ও মোহ ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে আসতে পারলে না। প্রথম কয়েকটা দিন নানা তালবাহানা করে কাটিয়ে নতুন-জামাইএর রঙিন ছাপটাকে একটু অস্পষ্ট করে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচে গেল। অবিশ্যি এভাবে বেঁচে যাওয়া ভিন্ন তার আর অন্য কোন আকর্ষণীয় পন্থাও ছিল না। কারণ, নিজের বাড়ি বলে গর্ব করবার মত সুজনের কিছুই ছিল না। ছিল, তলার হাওড়ের পাড়ে দীঘলী গ্রামের সরকারবাবুদের একখন্ড লাখেরাজ ভূমির উপর একখানি চালা ঘর। ভূমিখন্ডের জন্য খাজনা বাবদ কিছু তাকে দিতে না হলেও সরকারবাবুদের বাড়িতে পূজা-পার্বণে, বিবাহে-শ্রাদ্ধে বেগার খেটে দিতে হত। সরকারবাবুদের কৃপায় এক থালা ভাত সে রোজ পেত বটে, কিন্তু এই কষ্টলব্ধ একথালা ভাতের লোভে শ্বশুর বাড়ির তৈরী ভাত ফেলে চলে আসবার পক্ষে সে কোন রকম সুযুক্তিই খুঁজে পেল না। একটা ঘর আর একটি মাত্র ছোট ডিঙি নৌকো সে পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছিল। মাঘ মাসের প্রথম হতে জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তাকে প্রায় বেকার বসে থেকেই দিন কাটাতে হত। অপর বাকী কয়েকটি মাসের মধ্যে সারাটা বর্ষা-কালই কাটতো ডিঙির উপর বসে থেকে। বর্ষাকালটা তার মন্দ লাগত না—বেশ একটা উন্মাদনার ভিতর দিয়ে সময়টা পার হয়ে যেত। পৌষ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হাওড়ের কোথাও এক ফোঁটা জল থাকে না। সমস্তটা ফাঁকা হাওড়ের বুকখানা শুকিয়ে একেবারে পাথরের মত হয়ে উঠে। চারদিকের দিগন্ত ব্যাপে শুধু ধূ-ধূ করে শূন্য বালুভূমি। ফাল্গুনের নব-বসন্তের ছোঁয়া কোথাও যেন সামানামাত্র পড়ে না। শুষ্ক বিদগ্ধ মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে ডাহুক শ্যামা, কোকিল ভীত-সন্তস্ত্র-ভগ্ন কণ্ঠে ডেকে যায় ক্ষণিকের তরে। সে ডাকে সাড়া জাগে না, জাগায় ভয়। প্রান্তরের বুকে একটা গাছও নেই। পাখী সেখানে নীড় বাঁধে না। আমের শাখায় বোল ধরে না, ফুল ফোটে না রজনীতে রজনীগন্ধার কোমল শাখায়। চৈত্রে ঝরে না ঝরাপাতার সঙ্গে কোন বিরহীর বিদেহী আত্মার অশ্রু-নির্ঝর বাণী। হাওড়ের তপ্ত ধূলি-কণা ঘূর্ণি হাওয়ায় এলোপাথারীভাবে উড়ে যায় আকাশে আবার ধীরে ধীরে হাওড়ের বুকেই নেমে আসে। খন্ড খন্ড ধূসর বর্ণের মেঘ উড়ে যায় সুদূরে আকাশের গা বেয়ে ঃ শুধু যায়ই, কিন্তু হাওড়ের বুকে এক ফোঁটা জলও নেমে আসে না।

সুজনের এই দীর্ঘ দিনগুলি শুধু ব্যর্থ আশার ভিতর দিয়ে পার হয়ে যেত। সারা মন তার হাওড়ের দিকে চেয়ে থেকে থেকে শূন্য হয়ে যেত। উদাস নয়নে ডিঙির দিকে চেয়ে থেকে ভাবত কবে জলে জলে ভরে উঠবে হাওড়ের শুকনো বুকখানি। তারপর একদিন হঠাৎ ঝুর্ ঝুর্ করে তপ্ত হাওড়ের বুকে নেমে আসত সোহাগী মেয়ের চোখের জলের মত মেঘের জলধারা। জল পেয়ে ধূলিকণা হেসে উঠত, বুকে জমে উঠত নূতন দূর্বাদলের সবুজ শীষ্।

এতদিনে আসে বুঝি বসন্ত। তারপর মাস যেতে না যেতেই সারা হাওড়ের বুকে শিশু দিয়ে যেন কথা বলত শালীধান্যের সবুজ শীষ। এলো হাওয়ায় গা এলিয়ে দিত ধানের ছড়া একে অন্যের পরে। তারপর একদিন আকাশের বুক ভেঙে নেমে আসত অবিশ্রান্ত জলের ধারা। বর্ষায় পাহাড়ী নদীগুলো কাণায় কাণায় ভরে গিয়ে প্রবলবেগে একসময় নেমে আসত হাওড়ের বুকে। সেই জলের ধারায় সুদূর দেশ দেশান্তরের বুকে বর্ষার যে ভুর্ণি জমে তাহাও প্রায় নেমে আসে। দেখতে দেখতে সমস্ত হাওড়খানি পূর্ণ হয়ে যায়। দিনের আলোতে হাওড়ের বুকের দিকে চেয়ে চোখের সীমানায় ধরা পড়ে না কিছুই। শুধু জল আর কোথাও হয়তো দু একটা ডিঙি ভেসে যায়। তারি চালানোর খল্ খল্ তালে তাল রেখে গান গেয়ে যায় মাঝি। হা কূলে অজানা গাঁয়ের কোন কিশোরী বধূ হয়তো কলসী ভাসিয়ে উদাসভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। হয়তো ভাটির ভেসে যাওয়া ডিঙির কাউকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

সুজনের ডিঙির উপর বসে থেকেই কেটে গিয়েছে এই গুলো। বৎসরের পর বৎসর তার এই একই নিয়মে পার হ নিঃসঙ্গ জীবন ঃ আপন জন শূন্য সুজন বেভুলের মত এ কাটিয়েছে জলের বুকে ভেসে ভেসে। অকূলের বুকে ভাসিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠেছে সে,

"পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও
কইবা গেল সুন্দর কইন্যা মনু পবনের না'ও।"

কিন্তু সুন্দরী কইন্যাকে সত্যিই যখন একদিন পেল সুজন ভুলে গেল তার চিরকালের বন্ধু এই তলার হাওড়কে।

সুজনের শ্বশুরের অবস্থা ভাল। গ্রামটাও অনেকটা উজা দেশে। বর্ষাকালে এখানে কারো ঘরে-বাড়িতে জল উঠে না। ত দেশের মত কথায় কথায় নৌকোয় চড়ে বসতে হয় না। সুজন সব দিক দেখে শুনেই শ্বশুর বাড়িতে লজ্জাসরমের মৌখিক বা কাটিয়ে ফেলে নিজের অবস্থাকে বেশ সহজ করে আনল।

শ্বশুরের কোন্ জমিতে লাঙল পড়েনি, কোথায় কাম কাজে ফাঁকি দিয়ে শুধু গল্প আর তামাক টেনে সময় কাটচ্ছে সকলের খবরদারী করবার ভার সে নিজেই বুদ্ধি খরচ করে গ্র করলে। কিন্তু ভার যতই সুজন কাঁধে নেয় ততই মনের দিক থে সে হালকা হয়ে উঠে। বিয়ের পর আজ প্রায় তিনটি মাস পার হ চলল, অথচ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও তার সেই 'সু কইন্যা' হেসে তাকে দুটো ভাল কথা বলে নি। সুজনের স চাঁপার যেন বিয়ের পর হতেই এ জন্মের জন্য আড়ি হয়ে গে চাঁপাকে খুব কাছে পেয়েও সুজন একটা কিছু কথা বলতে পা না। চোখ তুলে চাইলেই তার সুন্দর কইন্যা মুখ ঘুরিয়ে ম যায়। সুজন খুঁজে পায় না কোথায় তার অন্যায়। তার ত মনের তলায় যেন করুণ সুরে কি একটা রণিয়া রণিয়া বেজে যা গভীর রাত্রে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে সুজন লুব্ধদৃষ্টিতে চে থাকে ঘুমন্ত চাঁপার মুখের দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন ব যেন সে ভুলে যায় নিজের অবস্থার কথা। বাইরে তখন চাঁ আলো। সারাটা আকাশের বুক ভরে গিয়েছে তা তারায়। ঘরের গায়ে গায়ে কমিনীফুলের গাছটার কচি পা যেন পুবালী হওয়া এসে মৃদুমর্মর ধ্বনি তোলে—ঝির্—ি —ঝির্।

সুজন হাত বাড়িয়ে ঠেলে তুলে দেয় ঘুমন্ত চাঁপাকে। বাইরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, দেখো কি সুন্দর...কাঁচা ঘুম হঠাৎ জেগে উঠে চাঁপা সুন্দরের রহস্যটা বুঝতে পারে না। নেত্র করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিগ্গেসা করে-সুন্দর?

কিন্তু কি যে সুন্দর তা সুজনও বলতে পারে না, কেমন যেন তো বোকা হয়ে যায়। রূপসী স্ত্রীর মুখখানির দিকে মুহূর্তের একবার চেয়ে দেখেই ফিরিয়ে আনে চোখের দৃষ্টি; বলে নিজের থেকেই আবার, খুব সুন্দর, না?

চাঁপা কিন্তু খুব তুখর মেয়ে, সহজেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে, বলে, কি সুন্দর—আমি?

সুজন আরও হকচকিয়ে যায়, ভীরুকণ্ঠে জানায়, না—ঐ ...নের মাঠ।

—সত্যিই তো খুব সুন্দর, এতদিন কিন্তু আমার চোখেও পড়েনি গো!

চাঁপার সাড়া পেয়ে সুজনের মনের ভাঁজগুলি এক এক করে খুলে যায়। ঝলমলিয়ে উঠে মনের ভিতর সহস্র কথা, অথচ গুছিয়ে একটা কথাও সে চাঁপাকে বলতে পারে না। নিজের এই অক্ষমতার জন্য আক্রোশে তার দুচোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে যেন বললে, তুমি ঘুমিয়েছিলে আর আমি চেয়ে-ছিলাম—

"আমার মুখের দিকে তো? খুব সুন্দর লাগছিল, না?" চাঁপা যোগ করে দেয়।

বোকার মত সুজন বলে—তা—তা—হেঁ—

চাঁপা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু এই যে বললে ঐ মাঠটা খুব সুন্দর?

সুজন এবারও সায় দেয়, হেঁ। ঐ দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দুই চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায় যেন। আমাদের দীঘলা গাঁয়ের চারদিকে কেবল জল আর জল। মোটে ভাল লাগে না। চল না গো ঐ মাঠে গিয়ে—

—ঘাস খাই, না! চাঁপা ক্রমে স্বরূপ প্রকাশ করতে লাগল। —তা এত সখ যখন হয়েছে তখন যাও না, একটা ভাগীদারও নেই ওখানে, বেশ পেট ভরে খেতে পারবে।

—তার মানে? তুমি আমাকে গরু বললে! রাগে দুঃখে সুজন প্রায় কেঁদে ফেললে।

—তা বলবো কেন গো? পোষা বানর যে ঘাস খায় না তা তো আমি জানি, কিন্তু বানরের গলায় মুক্তোর মালা থাকলে এমন একটা উৎকট সখ হতেও তো পারে!

তার মানে আমি বানর?

—বানর নয়, পোষা বানর এবং গলায় একটা মুক্তোর মালা।

—দেখ, আমি তোমার এমন প্যাঁচের কথা বুঝি না, কিন্তু আমাকে বানর ডাকা তোমার উচিত হচ্ছে না। রাগ আমারও হয় মনে রেখ।

—পোষা বানর যে শুধু নাচেই না মাঝে মঝে দাঁতও খিঁচায় তা আমি দেখেছি।

চুপ কর চাঁপা, এক কথা বারবার ভাল লাগে না। সুজন এবার গলা বাড়ালে একটু।

চাঁপা বিছানার উপর বসে বললে, এত ভাল লাগার দরকার কি তোমার? গোলামের মত শ্বশুরে বাড়িতে পড়ে আছ, তাতে তো মন্দ লাগছে না দেখছি! তোমার গলা দিয়ে ভাত উঠে কি করে? তোমার লজ্জা করে না কথা কইতে! এক থালা ভাতের জন্য—

—যাক্। সুজন ভিতরের সমস্ত রাগ একটা কথার মধ্যেই ঢেলে দিলে যেন। দুঃখও তার কম হয়নি। শুধু মাত্র এক থালা ভাতের জন্যই কি সে এখানে পড়ে আছে! চাঁপাকে যে তার এত আদর পেয়েও ভাল লেগেছিল সেটা কি কোন কারণই নয়! অভিমানের বাষ্পে তার সমস্তখানি মন পূর্ণ হয়ে উঠে। সারারাত্রে সে আর একটুও ঘুমাতে পারে না। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলে সে যে এখানে থাকা আর হয় না। এর চেয়ে তার তলার হাওড় ঢের ভাল।

(দুই)

পরদিন ঘুম থেকে উঠে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের গ্রামের দিকে চুপি চুপি রওনা হয়ে গেল। চৈত্র মাসের কাঠফাটা রৌদ্র মাথায় করে অভুক্ত অবস্থায় অনেকখানি পথ ঘুরে সে যখন নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছুলে তখন আর তার গায়ে সামান্য মাত্রও যেন বল ছিল না। চিরকালই সে একটু আরামপ্রিয় বা কুঁড়ে গোছের লোক। হাঁটাপথে বেশী দূরে চলা তার অভ্যাস নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত আহারের কথা মনে ছিল না, হঠাৎ যেন তাকে ক্ষুধাটা পেয়ে বসলে। এর জন্যে চাঁপাকেই সে দায়ী করলে। বিয়ের পর থেকে এই ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত ছিল, সময় মত দিনে তিনবার করে থালা ভর্তি ভাত খেতে সে পেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আজ থেকে দিনে তিনবার কেন তিনদিনে একবারও যে জুটবে না!......নিশ্চয়ই চাঁপা তাকে তাড়াতে চায়, অন্য কারো সঙ্গে ওর একটা সম্বন্ধ আছে! কথাটা মনে পড়তেই সুজনের সারা দেহ কেঁপে উঠল মন জয় করবার অক্ষমতার লজ্জায় ও ক্ষোভে। ভাবতে ভাবতে এক সময় অবসন্ন দেহভার মাটির উপর ছেড়ে দিয়েই সুজন ঘুমিয়ে পড়লে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেহুঁসের মত পড়ে ঘুমালে সুজন। দিন গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এরপর আরো কিছুক্ষণ হয়তো ঘুমাত, কিন্তু হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। সুমুখে দাঁড়িয়ে তার শ্যালক বিপিন ও চাঁপা। সুজন যেন একেবারে স্কন্ধকাটা ভূতের সামনা সামনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপিন স্মিতহাস্যে বললে, ভায়া ভয় পেলে নাকি?

—না—তবে—

—তবে একটু বেকায়দায় পড়েছ, না? কিন্তু বেশ লোক তুমি! বলা নাই, কওয়া নাই, না খেয়ে না দেয়ে বউয়ের সঙ্গে চুপি চুপি যুক্তি করে চলে এলে—

—যুক্তি করে!

—তা নয় তো কি? তুমিও চলে এলে এদিকে তোমাদের যুক্তিমত বোনটি আমার কাঁদিতে বসলেন—

চাঁপা প্রতিবাদ করলে চাপা গলায়, কখন?

—শোন কথা! দেখ ভায়া সুজন, তোমাদের যদি এখানে চলে আসবার ইচ্ছেই হয়েছিল তবে খুলে বলতে দোষ ছিল কি? তা নয়, করলে একটা কেলেঙ্কারী কান্ড। শুধু শুধু আমাকে হয়রাণ করে মারলে। দুপুর বেলায় মাঠ থেকে মাত্র বাড়ি এসেছি মা এসে বললে, চাঁপাকে নিয়ে দীঘলা যেতে হবে এখুনি। নিয়ে এলাম; এবার আমার ছুটি। রাত হচ্ছে, অনেকটা পথ আবার যেতে হবে—

সুজন এতক্ষণে একটা ভরসা পেল, বললে দুহাত তুলে, এটা আবার কোন কথা হলো বিপিন দা? এই এলে আবার এখুনি যাবে কি!

—বাড়ি যাচ্ছিনে ভাই, যেতে হবে সোণারপুর একবার হালের দুটো গরু কিনতে হবে, এলামই যখন এতখানি পথ, একা কাজও করে যাই।

—সে হবে পরে। একটুক্ষণ বসতেই হবে দাদা। গরীবের ঘরের সামান্য একটা কিছু মুখে দিয়ে না গেলে বড় মুস্কিল হবে বলে দিচ্ছি।

বিপিন বললে, মুস্কিল হলেও দুঃখ নেই ভাই। ফিরবার পথে কাল তোমার বাড়িতে খেয়ে যাব, কিন্তু আজ নয়। আমি উঠি এখন।

বিপিন ছল করেই চলে গেল, সে জানে সুজনের অবস্থা চাঁপার অতি মাত্রার জেদাজেদির জন্যই তাকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। বোনের কপালে যে আজ থেকে অশেষ দুঃখ লেখা আছে

তা সে জানে। কিন্তু চাঁপা কোন উপদেশই শুনতে চায়নি; তার ধারণা, দুঃখের দিন তার শেষ হয়ে গিয়েছে, আজ থেকে সুখের দিন শুরু হয়েছে।

বিপিন চলে গেলে পর চাঁপা প্রথম কথা কইলে, আমাকে এবার তাড়াবে নাকি গো?......কথা কইছ না কেন?

সুজন হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল, তাড়াব না খুন করবো।

—তা করো, এখন তো ঘরে নিয়ে গিয়ে বসবার জায়গা দাও আর যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না! পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে এসেছি, দুপায়ে আর বল নেই।

বলতে বলতে চাঁপা নিজেই দুহাতে বেতের পোর্টম্যানটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর উঠে গেল। সুজন বাইরে থেকে বললে, এই অন্ধকার ঘরে তো গেলে, কিন্তু সাপে কামড়ালে আমার দোষ নেই বলে রাখলাম।

—দোষ কাটাতে চাওতো দয়া করে একটা পিদিম জ্বেলে দিয়ে যাও।

হুঃ আমার এক সুহৃদ এলেন এবার। শুধু শুধু পিদিম জ্বেলে দিয়ে গেলেই যেন হবে! বলি দুটো মুখেও তো দিতে হবে?

—হবে বই কি!

—তবে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলে না কেন? বলি, কিছুক্ষণ ঘরে বসে থাকতে পারবে তো?

—কেন?

—আমার শ্রাদ্ধ করবার জন্য, আর কেন! দয়া করে একটু বসে থাক, ভয় নেই, ঘরে সাপও নেই, ভূতও নেই। আমি চট করে কিছু নিয়ে আসছি আজকের জন্য।

—দরকার নেই আমার কিছুর, একটা রাত কোনমতে কেটে যাবে। কোথাও তোমার যেতে হবে না।

—তোমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার পেটে আজ সারাদিন এক ফোঁটা জলও পড়েনি। বলতে বলতে সুজন বা'র হয়ে গেল।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা বসে থেকে চাঁপা যেন নিরাশ হয়ে উঠতে লাগল। একটা সন্দেহও হল, হয়তো শেষ পর্যন্ত সুজন নাও ফিরতে পারে সারারাত্রের মধ্যে। দুশ্চিন্তাও কম হল না। একা তাকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে মিথ্যা ফাঁকি দেওয়ার জন্যই শুধু একটা মানুষ দেরী করতে নিশ্চয়ই পারে না। একটা কারণ নিশ্চয়ই ঘটেছে। অথচ কি যে কারণ ঘটতে পারে তা চাঁপা ঠাওর করে উঠতে পারে না। এদিকে রাত অনেকখানি গড়িয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদ আকাশে উঁকি দিয়ে উঠেছে। চাঁপা ক্রমেই বুঝতে পারল, সুজন ফাঁকি দিয়েই গিয়েছে, সারারাত্রেও এদিকে ফিরে আসছে না। সময় যতই পার হয়ে যাচ্ছিল, চাঁপা ততই স্বামীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। এর একটা শিক্ষা তার দিতেই হবে। এবাড়ি ছেড়ে সে তো যাবেই, যাবার আগে একবার শেষ বোঝাপড়া একটা করে তবে যাবে। আবার ভাবলে, সুজন এক সময় তো নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, কিন্তু তার আসবার আগেই সে যদি গলায় দড়ি বেঁধে ঘরের চালের সঙ্গে ফাঁসি লাগিয়ে মরে থাকে ত বেশ হয়। বেশ জন্মের মত জব্দ হয়ে যায় মানুষটা। চাঁপা তারপর অনেক কথাই পরপর ভেবে নেয়। দুঃখে—অভিমানে-ক্ষোভে সমস্তটা বুক তার ভারী হয়ে উঠে।......

রাত্রি অনেকখানি হয়েছে তখন। সমস্ত গ্রামটা নিঝুম হয়ে উঠেছে। চাঁপার মনে ভয় ছিল না, ছিল একটা অভিমানের ঝড়। হঠাৎ তার কানে গেল সুজনের গলা। সে যেন বেশ নিশ্চিন্ত মনেই গান গাইতে গাইতে আসছিল।

"কাজল মেঘে সজল হাসিরে
বিজুলীর ঝলা,
আন্ধার ঘরে থাকলে সোনাইগো
আন্ধার ঘর উজলা—"

সুজন গাইতে গাইতে একেবারে উঠানের উপর এসে দাঁড়াল। চাঁপা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সুজন একেবারে চমকে উঠল, বললে,—একি! তুমি এখনও বসে রয়েছ যে! আমি ভেবেছি তুমি এতক্ষণে তলার হাওড়ের মাঠ পার হয়েছ! বলি পড়ে রয়েছ কোন্ আশায়?

—তোমার ভাত-কাপড়ের আশায়। তুমি মানুষ না আর কিছু!

—জানোয়ার। সুজন যোগ করে দিলে।

—তোমাকে তাই বলা উচিত। একটা মেয়েমানুষকে একা অন্ধকার ঘরে মিথ্যা কথা বলে রেখে গেলে, আবার তার উপর চোখ রাঙাতে তোমার লজ্জাও হয় না।

—সে কথা যদি বল তবে জানোয়ার তোমার দাদাকেও বলা উচিত। সেও তো ফেলে গিয়েছে।

—সে ফেলে দিয়ে যায়নি, তোমার কাছে রেখে গিয়েছে।

—তুমি তো আর টাকা পয়সা নও যে রেখে গিয়েছিল। ... এবার মানে মানে সরে পড়।

—মান আমার নেই। এতখানি রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি?

নাইবা শুনলে! এত সখ কেন?

—আমি টের পেয়েছি কিন্তু।

—কলা পেয়েছ।

—আচ্ছা কলাই না হয় পেলাম, বলি সোনাই ঠেরাইনটি তোমার কোন্ পুরুষের কে হন্?

প্রশ্ন শুনে সুজন থ' হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর উষ্ণ হয়ে জবাব দিলে, সোনাই আমার মনের মানুষ।

—তোমার মন থাকলে তো! বলি অর্ধেক রাত তো কাটিয়ে এলে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, এবার রাধার কুঞ্জের একটা ব্যবস্থা কর। সারা ঘর খুঁজে তো একটা পিঁড়িও পেলাম না, খাবার কথা নাই আর তুললাম—শোবার ব্যবস্থা একটা করতে হবে তো?

—আহা রে কি আমার মনের মানুষ এলেন-রে! তোমার ব্যবস্থা তুমি করে নাও, আমি চললাম।

বলেই সুজন যে পথে বাড়িতে ঢুকেছিল সেই পথেই পুন বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালে। চাঁপা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করে প্রশ্ন করলে, এত রাত্রে 'চললাম' মানে! কোথায় চললে?

—যমের বাড়ি—

চাঁপা ন্যাকামীর সুরে বললে, একা এতখানি পথ এই ভরারাত্রে কেমনে যাবে গো? এর চেয়ে আমাকে সঙ্গে নাও না, দুজনে গিয়ে উঠি। আর আমাকে পছন্দ না হয় সোনাইকে নিও—কিন্তু আমার মাথার দিব্যি, একা তুমি ঐ পথে যেতে পারবে না।

সুজন আর কথা না বলে পুন পা বাড়ালে, চাঁপা এসে তার একটা হাত ধরে ফেললে, বললে, তোমার পায়ে পড়ি, আমি মিথ্যা বলেছি। আমার মোটে ক্ষিধে পায়নি। এত রাত্রে তোমার কোথাও যেতে হবে না। সুজন হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে, তোমার খাবার আনবার জন্য যাচ্ছিনে। পুবের বাড়িতে রাতটা কাটাতে যাচ্ছি।

চোখ পাকিয়ে চাঁপা বললে, সোনাইএর ঘরে নাকি?

—চুপ কর, সব সময় তামাসা ভাল লাগেনা।

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। কিন্তু ঐ পুবের বাড়িতে যাবে কেন শুনি?

—এখানে আমি ঘুমাবো কোন্ চুলায় শুনি?

—তা যদি বল তবে একটাও নেই।

চাঁপা এবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে সুজনের হাতটাকে

আরো জোরে টেনে নিয়ে বললে, আর একটা কথাও বলতে পারবে না। চল ঘরের ভিতর।

চাঁপা এক রকম জোর করে ঘরের ভিতর টেনে আনলে।

সুজন বললে, না—

–কি আবার 'না'? পাগলামি করো না বলছি! দেখ, আমার দিকে চাও—চাওনা বলছি—। শোন, শত হলেও এই গাঁয়ের আমি একেবারে নয়া-বউ। লোকে শুনলে কইবে কি?

সুজন এতখানি তলিয়ে দেখলে না। চাঁপার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ এক লাফে ঘর থেকে বাইরে পড়ে অন্ধকারের ভিতরে দৌড় দিলে। চাঁপা হতভম্বের মত শুধু চেয়ে রইলে। পেছন ডাকতে আর শক্তি পেল না। রাগে, অভিমানে তার দুচোখ ফেটে জল আসছিল। উদ্গত কান্নার দুরন্ত বেগকে সে কোন মতেই রুখে রাখতে পারলে না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদিলে অনেকক্ষণ; তারপর একসময় মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের মধ্যে বারবার স্বপ্ন দেখলে সুজনকে। চাঁপা যেন মরে পড়ে আছে ঘরে আর সুজন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। শত চেষ্টা করেও আর সে যেন চোখ মেলে সুজনের অশ্রুসিক্ত মুখখানার দিকে চাইতে পারছে না। একটা কথাও বলতে পারছে না, কত কথা যেন তার বলবার ছিল! এর জন্য কত দুঃখ যে তার মনে রয়ে গেল। চাঁপার ঘুম ভেঙে যায়—আবার ঘুমায়।

পরদিন খুব ভোরে সুজন ফিরে এল, তখনও সামান্য একটু অন্ধকার ছিল। চাঁপার চোখে ঘুম ছিল না, তবে সামান্য মাত্র তন্দ্রাব মত লেগেছিল। সুজন ঘরের ভিতরে এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বললে, কি রকম ঘুম হলো গো?

কথা শুনে চাঁপার সারা গা জ্বলে উঠল। কিন্তু কোন কথা না বলে পুন চোখ দুটো বন্ধ করলে মাত্র। সুজন বললে, তুমি আজ যাবে তো?

থাকবার সাধ চাঁপার আর এর পর থাকবার কথা নয়, একটি রাত্রেই সকল সাধ তার মিটেছে। স্বামীর কথার জবাবে কথা বলতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবুও একটা কথা বলতেই হলো, হেঁ! কিন্তু সুজন এবার প্রায় সব কয়টি দন্ত বিকশিত করে বললে, এই তো এতক্ষণে দেখছি মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি তো ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকছিলাম, হয়তো খুন করতেই ছুটে আসবে। যাক বাঁচালে। কিন্তু মেলা পথ হাঁটতে হবে—কালকের সারারাতে কিছুই পেটে পড়েনি, আজকের দিনটাও পালন দিলে তো চলবে না। একটা কাজ কর, দুটো চাল ফুটিয়ে নাও, আমি দেখে শুনে একটা পালকী নিয়ে আসি। চাঁপা তপ্তকণ্ঠে বললে, থাক আর কাজ নেই, অনেক শিক্ষা হয়েছে। ভালবাসা দেখাতে হবে না—অনেক দেখিয়েছ। পালকীর দরকার নেই, শুধু একটু সঙ্গে থেকে হাওড়টা পার করে দিয়ে এলেই বাকী পথটুকু একা হেঁটে যেতে পারবো। আর খেতে হয় কিছু, খাব না হয় ভিক্ষে করে ঃ তোমার দেওয়া ভাত আমার গলা দিয়ে নামবে না।

—আরে আমার ভাত দেখলে কোথায়? চাল-ডাল তো চেয়ে চিন্তেই যোগাড় করে আনবো।

—আমার দরকার নেই।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু কিছু না খাইয়ে দিলে বাপের বাড়ি গিয়ে যে এই গরীবের তিন পুরুষের ছেরাদ্দ করবে তা বুঝি টের পাইনে? আর হেঁটে তুমি যেতে পারবে স্বীকার করি...হাজার হলেও কেমন ঘরেব মেয়ে!

চাঁপা চোখ পাকিয়ে বললে, দেখ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবার সাধ আর নেই। আমার বাপ-মাকে গাল দিও না বলে দিচ্ছি।

হেসে ফেললে সুজন, বললে, আরে চটে যাও কেন এত। বললাম বাপের বাড়ি থে ্ না হয় হেঁটেই এলে, তা বলে শ্বশুর বাড়ি থেকে যাবার সময় হেঁটে গেলে মান-ইজ্জৎ থাকে? তুমিই ভেবে দেখ না, সত্যি কিনা? নেও; তুমি উনুনটা জ্বালাও, আমি চাল-ডাল পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আসবার সময় পালকীও নিয়ে আসছি।

সুজন আর দাঁড়াল না, খুব ব্যস্ততার ভাণ করে বেরিয়ে গেল।

চাঁপা বোকার মত বসে রইল, স্বামীর প্রতি তার যে সামান্য একটু দুর্বলতা অবশিষ্ট ছিল তাই তাকে যেন কঠিনভাবে পেয়ে বসল। তারপর এক সময় একটি মেয়ে এসে তাকে রান্না করবার সমস্ত কিছু দিয়ে গেল। চাঁপা এক সময় সমস্ত মান-অভিমান তুলে রেখে অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করে উনুন জ্বালালে। সুজন কিন্তু বেলা প্রায় পড়ে গেলে বাড়ি ফিরে এল। কোন রকম ভনিতা না করে একেবারে সহজ স্বাভাবিক সুরে জিগ্গেসা করলে, কি গো স্বর্ণ এসেছিল?

চাঁপা কিন্তু গম্ভীর মুখে উলটো প্রশ্ন করলে, পালকী কৈ? সুজন বললে, পালকী বললেই তো আর পালকী আসে না। সময় লাগে......

......অথচ পালকীটা পাঁচটা দিনের মধ্যেও একবার সময় করে আসতে পারল না। শেষে একদিন রহস্য করে চাঁপা বললে, দেখছি, শেষ নাগাৎ হাঁটতেই হলো! শ্বশুর বাড়ির মান আর রাখা গেল না।

সুজন রহস্যটা কিন্তু বুঝতে পারল না, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জানিয়ে গেল যে একদণ্ডের মধ্যেই যেমন করে হোক্ পালকী নিয়ে আসছে। স্বামীর কথা শুনে চাঁপা শুধু মুচকি হাসলে।

তপ্ত কড়াতে মাত্র তখন চাঁপা তেল ঢেলেছে সুজন সেই সময়টাতে এসে জানালে, পালকী এসেছে এখনই এসে উঠুক।

চাঁপা বিশ্বাস করলে না, বললে, উঠছি গো উঠছি, মানুষের মুরাদ জানতে আর আমার বাকী নেই।

সুজন ঘরে ঢুকে চাঁপার একটা হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে এনে বললে, দেখে নিক্ মুরাদ আছে কিনা।

সুজন আজ সত্যিই কথা রেখেছে। চাঁপা বাইরে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুরন্ত এক অভিমানের বাষ্পে তার অন্তরতলে যেন ঝড় উঠে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। সে তো এ চায়নি, দুঃখকে সে মাথার মণি করে নিতেই চেয়েছিল কিন্তু অন্তর্দাহকে সইবার মত শক্তি যে তার নেই। স্বামীর এই আঘাত তার মন-বিশ্বাসকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল। সব কল্পনা তার এক নিমেষেই ফুরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চাঁপা ঘরে গিয়ে তার ভাঙা পোর্টম্যানটা দুহাতে তুলে নিলে। পা দুটো যেন তখন সামনের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না; তার দু চোখে যেন লেগেছে পচা পেঁয়াজের ঝাঁঝ।

চাঁপা পালকীতে এসে যখন বসলে মুখ তুলে কারো দিকে চেয়ে দেখবার শক্তি তার আর মোটে ছিল না। হঠাৎ যেন খেয়াল হওয়ার মত সুজন বললে, উনুনের উপরে কড়াটা তো রইলো, এখন ওটাকে কার জিম্মায় রেখে যাওয়া হচ্ছে?

চাঁপা উত্তর না দিয়ে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে পালকীতে বসলে।

সুজন পুন বললে, যাচ্ছে তো নাচতে নাচতে কিন্তু মনে থাকে যেন এই যাওয়াই যাওয়া। আর ফিরে আসবার নাম যেন মুখে না আসে।

—আচ্ছা।

—জিদ তো পুরোমাত্রায় আছে। কিন্তু জিগ্গেসা করি, এইটা কি একা আমার সংসার? মানুষে তো বলে সুজন মাঝি বিয়ে করেছে, সংসারী হয়েছে, এখন একবার দেখুক এসে! কপালে আছে

জীবনভর পরের বাড়িতে চাল ফুটবে, তায় বিয়ে করলেই কি আর না করলেই বা কি! মরুকগে ছাই।

সুজনের কথা শুনে চাঁপা কি ভাবলে সেই জানে, কিন্তু কোনরূপ কথা না বলে হঠাৎ পালকী থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে চলে গেল। সুজন যেন অবাক হয়ে গিয়েই বললে,

—আরে, নেমে গেল কেন?

ঘরের ভিতর থেকে চাঁপা উত্তর দিলে, আমার খুশি। এখন সময় ভাল নয়, তেরস্পর্শ, দিক্‌শূল। দয়া করে পালকী থেকে বাক্সটা নামিয়ে রাখুক আর পালকীওলাকে যেতে বলুক। আজ যাওয়া হবে না।

—আজ হবে না, কাল হবে না, বলি এই সংসারটা কি একা আমার? একটু বুঝে-সুঝে কাজ করলেই হয়। মরুকগে ছাই!

(চার)

একটা গ্রহ যেমন করে অন্য একটা গ্রহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তেমনি এরাও ভাঙা ভাঙা কথার ফাঁকে ফাঁকে, ক্ষণিকের বিরহ-মিলনের মাঝে একে অন্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলে।

বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে তখন। শুক্‌ক মাঠ আর নেই। হাওড়টা জলে কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। সারাক্ষণ জলোচ্ছ্বাস কানে আসে। বাতাসের সঙ্গে ঢেউগুলি খেলা করে, সন্ সন্ সুরে গান গায়। ...সুজন ভোর সকালে ডিঙিজাল নিয়ে হাওড়ে যায়, সারাদিন মাছ ধরে, হাটে যায়, বাড়িতে ফিরে আসে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেলে পর। চাঁপা সারাটা দিনমান একা বাড়িতে বসে থেকে শুধু স্বামীর কথাই ভাবে; কত ভয়ে ভয়ে যে দিন কাটায়! ভাবে এত জলে একটা ছোট ডিঙি নিয়ে মানুষটা ভেসে বেড়ায়; হঠাৎ এক সময় যদি ঝড়-তুফান উঠে? সর্বনাশ! ডুবে যাওয়ার কথাটা চাঁপার বার বার কেন যেন মনে উঠে! চাঁপা তখুনি ঠিক করে ফেলে, এবার ফিরে এলে আর ডিঙি নিয়ে হাওড়ে যেতে দেবে না, কিছুতেই সুজন তাকে রাজি করাতে পারবে না! সুজন কিন্তু চাঁপার কথা শুনে হাসে, বলে, কথা শোন্ পাগলের! তলার হাওড়কে আবার ভয়! এতো আমার সাতপুরুষের হাওড়।

চাঁপা রেগে উঠে, বলে, আহা-রে, কি আমার সাতপুরুষের সুহৃদ গো। তোমার সাতপুরুষের বাপের ঠাকুর থাক্ আমার মাথায়। কাজ নাই বাপু আমার এমন আহ্লাদের। হাওড়টার পানে চাইলে সারাটা বুক ভয়ে কাঁপে। কি সর্বনাশা হাওড় গো!

তুই থামতো পাগলী! হাওড়ে যাবে না ত কি সারাদিন চাঙায় পড়ে গড়াব? জানিস বউ, এই তলার হাওড়ের তলাতেই আছে আমার সাতপুরুষের হাড়। তলার হাওড় তো আমার বাড়িঘর। তলার হাওড়ের তল আমি খুঁজে বেড়াই রোজ। বলতে বলতে সুজন সুর ধরে,—

"তলার হাওড়ের তল পাইরে বন্ধু,
আসমানের পাই চাঁদ,
কেবল তল পাই না সোনাইয়ের মনের,
এমনি বিষম ফাঁদ।......"

গান শুনে চাঁপা কৃত্রিম ক্রোধে বলে,—আবার সোনাই? মুখপুড়ি থাকে কোন্ চুলায়? এত কই মর্ মর্, তবুও মাগীর মরণ নাই গা?

সুজন হেসে জবাব দেয় গানে,—

"আন্ধার ঘরে থাকলে সোনাই গো
আন্ধার ঘর উজলা......।

জানিস্ আমার সোনাইকে?

—কও না একবার শুনি?

চাঁপা এ প্রশ্নটা বহুবার করেছে, আরও হয়তো করবে। উত্তরে সুজন শুধু মাথা নাড়ে, আর বলে 'না' তারপর এগিয়ে যায়, চাঁপার দুটি হাত টেনে নেয় নিজের হাতের উপর। চাঁপা শুধু হাসে, আর হাসে—কথা বলা হয় না।

সুজন আবার পরদিন ডিঙি নিয়ে হাওড়ে যায়।

সুন্দরী চাঁপাকে বাড়িতে একা পেয়ে সরকারদের ছোট ছেলে সুকুমার ঘন ঘন সুজনের খোঁজে বাড়ির অন্দরে ঢুকে চোরা-দৃষ্টিতে চাঁপাকে দেখে। সুকুমার দেখতে সুশ্রী এবং তার অধিক সে যুবক। তার ধৈর্য অল্প, কিন্তু চেষ্টায় একাগ্রতা অধিক। মন জয় করবার চেয়ে মন হরণ করবার দিকে নজরই বেশী। ফলে চাঁপা তার লজ্জা কাটিয়ে দু-একটা কথার জবাব দিয়েও ফেলে। সুকুমার আশার আলো দেখতে পায়। ফলে রোজই ভুল করে কিছু না কিছু উপহার অথবা পুরস্কার চাঁপার ঘরের সামনে ফেলে যায়। চাঁপা সময় সময় ঘরের মধ্যে সিকিটা, আনিটা কুড়িয়ে পায়। কোনদিন মাত্রাটা বেড়েও যায়। চাঁপা হাসে আর স্বামী ঘরে ফিরে এলে গলা জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত আব্দার করে গুন্ গুন্ করে গান ধরে,—

"আমার বাড়ি যাইওরে বন্ধু
উজান পথ বাইয়া
নয়নজলে ভিজাইয়া রাখছি
তোমার পথ চাইয়ারে বন্ধু।"

সুজন এর কারণ খুঁজে পায় না। কিন্তু খুব ভাল লাগে তার। চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে থেকে শুধু বোকার মত হাসে। চাঁপা হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে বনহরিণের মত পালায়।

একদিন সুকুমার একটা রঙিন শাড়ি ভুল করে চাঁপার ঘরের সামনে ফেলে চুপি চুপি বললে, কি গো সুন্দরী, কথাই যে কও না বড়......একটু আশা-ভরসা দাও।

চাঁপা কোন কথা না বলে শুধু এক সময় ঘরের ঝাঁটাটা দরজার সামনে রেখে দিল। সুজন তার পর মুহূর্তেই বাড়িতে ঢুকলে। তাকে দেখতে পেয়েই সুকুমার সরে গেল। শাড়িটা তখন পর্যন্ত দরজার সামনে পড়েই ছিল। সুজনের সারাদেহের রক্ত মুহূর্তের মধ্যে ফিনিক দিয়ে মাথার ভিতর যেন উঠে গেল। হুঙ্কার করে উঠল, খালি বাড়িতে থেকে এই কাজ কর মাগী! পিরিত করা তোমার আজ বের করছি। আজই খাল পাল না করে আসি তো আমি গগন মাঝির ব্যাটা নই।

চাঁপা দরজার কাছে এসে জিগ্গেসা করলে, কারে খাল পার করবে গো?

—মাগী তোর সাতগোষ্ঠীকে। চল্ এখুনি ডিঙি ভাসাচ্ছি। সুকুমার ব্যাটাকে আমি খুব চিনি। গেল বছর নন্দুর ব্যাটার বৌটাকে ঘর থেকে টেনে বের করেছে, আর একটা দিন সবুর করলে আমার ঘরের চৌকট আর থাকছে না। চল্ আমার সঙ্গে। চাঁপা কোন প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত পারল না।

ঠিক পনেরোটা দিনও তারপর পার হয়নি সুজন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে চাঁপাকে বললে, "চল্ আমার সঙ্গে।"

চাঁপা জানালে, প্রাণ থাকতে আর এই ছোটলোকের বাড়িতে যাবে না। সুজন শেষটায় লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে চাঁপার পা দুটি চেপে ধরে ফেলে বললে, আমার চৌদ্দপুরুষের পাপ হয়েছে, না হয় আমার দুই কান মলে দে বউ, তবুও চল্। জানিস তো, ছোটলোকের রাগটা একটু বেশী থাকে—চল্ এখন। তুই না গেলে আমি সন্ন্যেসী হয়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকব।'

চাঁপা হাসি গোপন করে বললে, হও না সন্ন্যেসী, আমার কি? এখন মা আমাকে যেতে দিলে তো!

—কেন, শুনি?

—আহা, যেন কিছুই বোঝেন না; ন্যাকা যেন, জানি না যাও।

হেসে ফেলে। কিন্তু সুজন কারো আপত্তি গ্রাহ্য না করেই নিয়ে ডিঙিতে উঠলে।

ভাটির স্রোতে ডিঙি ভাসিয়ে দিয়ে সুজন চাঁপাকে বলে, যেন পাগলা হাওড়টা একেবারে ঠান্ডা হয়ে পড়েছে রে!

চাঁপা উত্তর দেয়, থাক্ বাপু ঠান্ডা হয়েই। তেল মজাবার আর নেই। হাওড়টাকে আমার যা ভয় গো! যেন আমার আর জন্মের ...সেই তোমার "আওলা বাতাসের" সোনাই মুখপুড়ি যেন!

চাঁপা দু-হাত জোড় করে বার দুই কপালে ঠেকিয়ে বলে, সাতপুরুষের বাপের ঠাকুর গো, দয়া করে কের দিনটা একটু ঠান্ডা হয়ে থাক, দোহাই তোমার!

সুজন বলে, আমি রয়েছি ডিঙির মধ্যে ভয়টা এত কিসের রে? ভয় পাস তো দিই মাঝ-হাওড়ে ডিঙি উপুর করে।

চাঁপা অল্পেতেই রেগে যায়, বলে, সে জনাই বুঝি জোর করে এনেছ? দেওনা উপুর করে, মিটুক তোমার সাধ।

সুজন এত কথা জানে না, বলে, ডিঙি ডুবে গেলেও জলে তোমার কপালে নেই ঠাকরুণ। এই সুজন মাঝি তোর মত টা চাঁপাকে পিঠে করে তলার হাওড়ের মত দশটা হাওড় পাড়ি পারে। আমার চোখের সামনে এই তলার হাওড়ের জলে দিন একটা পোকাও ডুবে যেতে পারে নি। আমার সাতপুরুষের হাওড়। আমার বাপ-ঠাকুরদার হাড় এর জলের তলায় শুয়ে আছে। আমাকে ঐ হাড়গুলো ডাকে যেন রে।

—তোমার এই রসের কথা শুনেতেই আমার বুকটা কাঁপে!

সুজন গম্ভীর হয়ে গিয়ে হঠাৎ গান ধরে,—

'এই গহীন জলে ডুব দিয়েছে
আমার সাত জনমের মাণিক রে
আমার সাত...........'

চাঁপাও ধীরে ধীরে এক সময় স্বামীর কোলে মাথা গুঁজে ডিঙির উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। হাওয়ার দোলায় তার চূর্ণ কুন্তলগুলি মুখের উপর এসে যেন খেলা করে তার চোখের পাতার পে। ......ছাঁৎ ছাঁৎ শব্দে ডিঙি ভাটির টানে ভেসে চলেছে। তারি দ মন্থর দোলা এসে লাগে চাঁপার সারা দেহমনে। সূর্য তখন প্রায় ছে ঐ দূরের হাওড়ের জলে।

বাতাস হঠাৎ এক সময় জোরে বইতে লাগল, তারি টানে ডিঙিটা তীরের মত ছুটে যেতে লাগল। হাঁড়িয়া মেঘ ভেসে আসছিল হাওড়ের দিকে। ঐ মেঘকে চাঁপা চেনে না, সুজন চেনে। ডিঙির কাছেই আরেকটা বড় 'দুই মালাই' নৌকাও চলেছে। সেই নৌকার মাঝিকে উদ্দেশ করে সুজন চীৎকার করে বললে, কানাই শক্ত করে হাল ধর, নৌকা টাল খাচ্ছে...পাল নামিয়ে দে ......।' তারপর চাঁপাকে বললে, ঐ নৌকোয় যাচ্ছে সুকুমারবাবু, তার বউ নিয়ে। পরশু বিয়ে করেছে হতভাগাটা। চাঁপা ম্লান হেসে বললে, সেজন্যই বুঝি ভরসা পেয়েছ আমাকে নিয়ে যেতে। তুমিও কম শয়তান না বাপু! চাঁপার কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ চারিদিকে উঠল পাগলা ঝড়। তলার হাওড়ের জলে উঠল চিরকালের সেই রাক্ষুসে বুভুক্ষা রব। চাঁপা আর্তনাদ করে দুহাতে জড়িয়ে ধরলে সুজনকে। সুজন হালটাকে শক্ত করে ধরে চেঁচিয়ে বললে, ভয় কিরে বউ, এমন ঝড়ে আমি অনেক খেলেছি এই হাওড়ের জলে। ডিঙি ডুবে গেলেও তোকে পিঠে করে নিয়ে পার হয়ে যেতে পারব আমি। এ আমার সাতপুরুষের ঘরবাড়ি, এর তলায় আমার বাপ-ঠাকুর্দার হাড় ঘুমিয়ে আছে.....একে আবার ভয় কিসের।

সুকুমারদের নৌকা তখন প্রায় ডুবে যাচ্ছে। সুজন চেঁচিয়ে উঠল,—কানাই করছিস কি? সবগুলিকে ডুবিয়ে মারবি যেয়ে! হুঁসিয়ার কানাই, হুঁসিয়ার। কানাই হুঁসিয়ার হওয়া সত্ত্বেও নৌকা একদিকে কাৎ হয়ে গেল। সুকুমার তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সুমুখে। নৌকা কাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও গড়িয়ে পড়ল জলে। সুজন দেখতে পেয়ে উন্মাদের মত সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডিঙি থেকে লাফিয়ে পড়ল তাদের উপর। ডুবন্ত স্বামী-স্ত্রীকে টেনে নিলে নিজের পিঠের উপর......উত্তাল তরঙ্গের বুকে সাঁতার কেটে চললো পাড়ের দিকে।

হঠাৎ সুজনের মনে পড়ল চাঁপার কথা, চাঁপা সাঁতার জানে না। কোথায় চাঁপা? ডিঙির চিহ্নও চোখে পড়ে না। শুধু ঢেউ, আর জলের দুরন্ত উচ্ছ্বাস বেয়ে চলেছে সারা হাওড়ের বুকে। চাঁপা যেন কাঁদছে অভিমানে হাওড়ের জলে উঠেছে সেই কান্নার রোল। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চাঁপা যেন খিল খিল করে হেসে উঠল......দূরে অনেক দূর থেকে যেন বলছে,—আমাকে ধরতে পারবে না, আমি অনেক দূরে......হি-হি...। সুজন তাকে ধরতে যাচ্ছে, সে আরো দূরে সরে যাচ্ছে......আরো।

ঝড় থেমে গিয়েছে। সুকুমার তার স্ত্রীকে কোনমতে টেনে নিয়ে পাড়ে উঠল। সুজন নেই, সে চাঁপাকে ধরতে যাচ্ছে।

* * * *

তলার হাওড়ের জলে আবার ঢেউ উঠেছে। এমনি রোজই উঠে, উঠবেও।

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৩

তামাক খেয়ে হুঁকোটা সাবধানে বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে সুবল কেবল উঠে দাঁড়িয়েছে; মঙ্গলা পিছন থেকে কৌতূহলী কণ্ঠে বল্‌ল, 'ও বাড়ি যাচ্ছ বুঝি?'

বিরক্ত হয়ে একটু ঝাঁজিয়েই উঠল সুবল, 'হুঁ, আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, আমি কেবল ও-বাড়ি এ-বাড়িই করি। মেয়েমানুষ নাকি তোর মত, যে কেবল ওই একটা জিনিসই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। পুরুষ মানুষ আরো অনেক ভাবনা ভাবতে হয়, কেবল রঙ তামাসা নিয়ে থাকলে চলে না।'

মঙ্গলা এক মুহূর্ত থ হয়ে থেকে বল্‌ল, 'সক্কাল বেলা! ওঠার সময় তুমি কি ঝগড়া মুখে ক'রেই ওঠ। আমি আর মানুষ পেলাম না রঙ তামাসা করবার। —কপাল আমার।'

'সে দুঃখ তো আছেই, এতই যদি আফশোষ, ভালো দেখে রঙ তামাসার মানুষ একজন খুঁজে নিলেই পারিস্।'

'শোন কথা।'

সুবল বল্‌ল, 'কথা আবার কি শুনবে। মেয়েমানুষ থাকবে ঘরের কাজ কর্ম নিয়ে; সব ব্যাপারেই নাক ঢুকাতে কেন আসবে সে। আর কাল রাত থেকে এক দণ্ডও যদি একটু চোখ বুজতে পেরে থাকি। কেবল কে কি করল আর না করল, সেই কুচ্ছা আর সেই আলোচনা। আরে শালী, তুইওতো ছিলি সেখানে, নিজের চোখে কানেই দেখে শুনে এসেছিস। আমার চেয়ে তুই কি কিছু কম জানিস, না কম জানবার পাত্রই তুই। পরের মেয়ের হাত ধরে টেনেছে তাতেই এই ফুর্তি, আর নিজের হাত ধ'রে টানলে না জানি কী-ই করতি।'

মঙ্গলা বল্‌ল, 'দেখ, একবার ছিরি দেখ কথার। আমার হাত ধরে টানতে আসবে এমন পুরুষ নেই তোমাদের গাঁয়ে, ঝাঁটা মেরে দিইনা মুখে?'

মঙ্গলার দিকে চেয়ে সুবল একটু হাসল এবার, 'ঈস্, ও শুধু মুখেই। মেয়েমানুষের স্বভাব আমার জানা আছে।'

মঙ্গলা বল্‌ল, 'তাই নাকি? এত জানা শোনা হোল কবে থেকে? আসল কথা তো তা নয়, আসল কথা আমি জানি, পুরোনো হয়ে গেছি কিনা, ভালোলাগে না আর, এখন হাত ধরে কেউ টেনে নিয়ে গেলেই বাঁচো।'

অভিমানের সুরটা একটু নতুন মনে হয়, কেমন একটু মিষ্টিই লাগে সুবলের, মঙ্গলার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে হেসে বলে, 'সে ভরসাই বা কই। এই আড়াই মণি বস্তা টেনে তোলা তো দূরের কথা, হাত দিয়ে একটু সরাতে পারে এমন ক্ষমতাও আছে না কি মুরলীর?'

সুবলের কথায় একটু আদরের আমেজ পাওয়া যায় তবু স্থূলত্বের প্রতি এই কটাক্ষে মঙ্গলা যেন তত খুসি হ'তে পারে না, বলে, 'তুমি তো আমাকে মোটাই দেখলে, আমার চেয়ে মোটা মেয়েমানুষ কি নেই নাকি পৃথিবীতে?'

ঘরের পিছনে কৃত্রিম কাঁসির শব্দ শোনা গেল। 'বা... আছ নাকি সুবল বাবাজী?'

মাথার কাপড় টেনে মঙ্গলা তাড়াতাড়ি উঠে গেল ঘরের মধ্যে।

সুবল বল্‌ল, 'বাজারে বেরুচ্ছিলাম, এসো বিষ্টু খুড়ো।'

বিষ্টু আর নবদ্বীপ প্রায় সমবয়সীই। নবদ্বীপকে সমী... করে কথা বল্‌লেও বিষ্টুকে 'এসো, বসো' বলতে সুবলের সঙ্কো... হয় না। বয়সে বড় হলেই যে সব সময়, 'আসুন, বসুন' মুখে আসে তা নয়। বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে, আর্থিক অবস্থায়, স... বিষয়েই বিষ্টুকে এমন হাল্কা আর সাধারণ বলে মনে হয় সুবলের যে, তাকে আপনি বলে সম্বোধন করার কথা যেন ভাবাই যায় না। তেমন সম্বোধন বিষ্টুর নিজেরই হয়তো কানে বাজত, হয়তো নিজেই সে ঠাট্টা মনে করত।

বিষ্টু বারান্ডায় উঠে নিজেই জলচৌকিটা টেনে বসল। তারপর হুঁকো থেকে কল্কেটা নামিয়ে মুখের কাছে নিয়ে তা... পরীক্ষা করতে করতে বল্‌ল, 'আছে নাকি কিছু?'

সুবল বল্‌ল, 'না—দাও, আগুন দিয়ে দিচ্ছি ভালো ক'রে।'

বিষ্টু বল্‌ল, 'তারপর, কী খবর, ডেকে নিয়ে গিয়ে ক... বল্‌ল তোমাকে।'

সুবল বল্‌ল, 'ভালো জ্বালা, আমার আর কোন কাজকর্ম নেই, ঘরের খেয়ে কেবল বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াব। আমি তো বাজারে বেরুচ্ছিলাম এখনই।'

পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই যাতে উৎসাহ পায়, আন্দোলন আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠে—সুবলের কাছে ত যে নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার, বিন্দুমাত্র আকর্ষণও যে সে তাতে বোধ করে না এইটে দেখাতে সুবল বেশ ভালোবাসে। সকলের মত অত হাল্কা লোক নয় সে, যে—এসব ব্যাপার নিয়ে সবাইর মত অমন মেতে উঠবে। একটু দূরত্ব রেখে একটু ঔদাসীন্য দেখিয়ে রাশ ভারী হওয়া বরং সুবল পছন্দ করে। পাঁচজনের একজন হতে হলে পাঁচজনের সঙ্গে অমন গলাগলি ভাব চলে না সব সময়। নবদ্বীপকেও সে এমন দূরত্ব রাখতে দেখেছে। এক সঙ্গে বসে তাস-পাশা খেলছে, ঠাট্টা তামাসা করছে নবদ্বীপ সকলের সঙ্গে, তবু সকলের চেয়ে সে যে আলাদা তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। সকলের সঙ্গে নানা হাল্কা বিষয়ের আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও সে তার রাশিভারি

অক্ষুন্ন রাখতে পারছে। কখনই গলে জল হয়ে সকলের সঙ্গে সে মিশে যাচ্ছে না। নবদ্বীপের এই ক্ষমতাটার ভারি প্রশংসা করে সুবল, মনে মনে অনুকরণ করতে চায়। এখনো অনেক জিনিস শেখবার আছে বুড়োর কাছ থেকে।

সুবলই কি যেচে যায় কোন ব্যাপারের মধ্যে। সবাই টানাটানি করে, ধরাধরি করে—তাকে না হলে চলে না, তাই বাধ্য হয়ে যেতে হয় সুবলকে।

বিষ্টু কল্কেটা আর একটু ফুঁ দিয়ে নিয়ে হুঁকোর মাথায় বসাতে বসাতে বল্‌ল, 'আমিও তো তাই বলি। ডাকামাত্রই হুস করে চলে যাবে, সুবল সা'র আর সে দিন নেই। নবদ্বীপ সা'র চেয়ে আজকাল কম কিসে তুমি। না হয় দুখানা ইঁটই পোতা আরম্ভ করেছে বাড়িতে, কিন্তু তাই বলে লোকে কি তোমাকে কম ডাকে তার চেয়ে। আর দালান দেওয়া আরম্ভ করেছে বলেই ও কি ওই দালানে বাস করে যাবে তুমি ভেবেছ না কি? যে কৃপণ মানুষ, যে কয়েকখানা পুঁতেছে তা বোধ হয় এখন তুলে ফেলতে পারলে বাঁচে। আমার কি মনে হয় জানো, বেচাকেনা যেদিন একটু মন্দা থাকে, সেদিন এ কাজে হাত দেওয়ার জন্য মনে মনে নিশ্চয়ই আফশোষ করে, না হলে একতলা একটা কোঠা তুলতে কত দিন সময় লাগে আর?'

সুবল মনে মনে হাসে। বিষ্টু সা'র মত লোককে তার চিনতে বাকি নেই। নবদ্বীপের বাড়িতে যখন যাবে তখন তার কাছে সুবলের বিরুদ্ধেই আবার এমন পাঁচখানা বলে আসবে। এই এক অভ্যাস বিষ্টুর। তবু জেনে শুনেও বিষ্টুর এই নিন্দা-তোষামোদের আতিশয্য নিতান্ত মন্দ লাগে না সুবলের। হ্যাঁ, কথা বলতে পারে বিষ্টু। যার স্বপক্ষে যখন বলবে তাকে একেবারে স্বর্গে তুলে দেবে, আর যার নিন্দা করা আরম্ভ করে, তাকে নরকে ডুবিয়ে তবে ছাড়ে। কিন্তু লোকের ভালো করবার শক্তিও যেমন নেই, তেমনি সত্যি সত্যি কারো গুরুতর রকমের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও যে রাখে তা নয়। তেমন ধরণের খুব একটা ইচ্ছাও যে আছে বিষ্টুর তাও মনে হয় না। কারো নিন্দা প্রশংসা করাটা যেন বিষ্টুর একটা নেশা। সেই নেশাতেই সে চুর হয়ে থাকে, নিজের কথা বলবার কায়েদা সে যেন নিজে নিজে উপভোগ করে, অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা তার মনে থাকে না।

সুবল বলে, 'বাজারে যাবে নাকি খুড়ো, না কেবল গল্পই করবে?'

বিষ্টু ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'না না চলো চলো। এ কি পাড়ার নিবারণ সা যে বসে বসে গালে হাত দিয়ে কেবল পেঁচাল শুনবে, তোমার কাজ কর্ম কত আমি কি জানি না? ভাবলাম বাজারে তো যাবই, সুবল বাবাজীর বাড়ি হয়ে এক সঙ্গেই যাই।'

কিন্তু বিষ্টু তবু ওঠে না, গলা নামিয়ে বলে, 'যাওনি ভালোই করেছ, গেলে নবুদার দেখা পেতে না।'

সুবল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

সুবলের কথায় একটু ঔৎসুক্যের আভাস পেয়ে বিষ্টু চৌকির ওপর আরো ভালো করে শক্ত হয়ে বসে। তবে আর বলছি কি। দাদা আমার আগে থাকতেই এবার আঁট ঘাট বেঁধে রাখতে চাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। যেতে যেতে দূর থেকে দেখলাম, ঘাট থেকে সোজা বাড়ি না গিয়ে নবুদা যেন মধুসার বাড়ির পথ ধরল।'

সুবল হেসে বল্‌ল, 'বেশ তো, ব্যাপারটা তো আসলে তাদেরই। বুজিয়ে সুজিয়ে তাদের যদি খুশি করতে পারে, আপোষ নিষ্পত্তি করতে পারে তাদের সঙ্গে, তবে আর অনর্থক হাঙ্গামার মধ্যে কে যেতে চায় বিষ্টু খুড়ো।'

বিষ্টু যেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'তুমিও যদি এই কথা বল সুবল তবে আর আমরা যাই কোথা। পাড়ায় মোড়ল বলে সবাই আজকাল একডাকে তোমাকেই চেনে। পাড়ার ভালোমন্দ ন্যায় অন্যায় তুমি যদি না দেখবে বাবাজী তো দেখবে এসে কি সেখের কান্দির দুধবেচা মইজদ্দি?' নিজের রসিকতায় বিষ্টু নিজেই এমন ভাবে হেসে উঠল যে, সুবলের মনে হোল পাড়ার ন্যায় অন্যায়ের চেয়ে নিজের রসিকতার দিকেই বিষ্টুর লক্ষ্য বেশী।

হাসি থামলে সুবল বল্‌ল, 'আচ্ছা সে যা হয় পরে হবে, বেলা হয়ে গেছে, চলো উঠি এখন।'

মঙ্গলা কান পেতে এদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবলই যেন বিষ্টুকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। আলোচনাটা মাঝখানে এমন ভাবে বন্ধ করে দেওয়ায় সুবলের ওপর বেশ একটু রাগই হোল মঙ্গলার। আসলে সুবলের ইচ্ছা নয় যে, মঙ্গলা কিছু শোনে। নিজে তো কিছু বলবেই না সুবল, অন্য কারো কাছ থেকেও যে দু'একটা কথা শুনবে মঙ্গলা তারও জো নেই, তাতেও সুবল বাদ সাধবে। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই কেবল বলবে, 'সে সব দিয়ে তোর দরকার কি।' ভাত রাঁধা আর সুবলের ঘর আগলানো ছাড়া যেন আর কোন বিষয়েই মানুষের দরকার থাকতে পারে না। স্বামীর এই স্বার্থপরতায় অত্যন্ত রাগ হয় মঙ্গলার। সুবলের ভাবখানা এমন যেন মঙ্গলা তার সম্মানে, তার সম্পত্তিতে ভাগ বসাচ্ছে। পাড়ার বউঝিরা যে বেশ একটু মানে গণে মঙ্গলাকে, এক আধটা পরামর্শ নেয়, গোঁসাই গোবিন্দ কি কোন আত্মীয় কুটুম্ব কারো বাড়িতে এলে মঙ্গলাকে দিয়ে নানা রকম খাবার তৈরী করিয়ে নেয়, কি নেমন্তন্ন রাঁধবার জন্য এসে সাধাসাধি করে—এ সব যেন সুবল সহ্য করতে পারে না। কত পাঁচ রকম ব্যাপারে মানুষে মানুষকে ডাকে, মানুষেরই দরকার হয় মানুষকে। কিন্তু সুবল এ সব মোটেই পছন্দ করে না। মঙ্গলার কাছে দু'একজন লোকজন আসতে দেখলেই সে যেন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, বলে, 'ভালোরে ভালো। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তুইও কি মোড়লী করবি নাকি। ঘরে বাইরে দুজনেই যদি এমনি মোড়ল হয়ে উঠি তাহোলে সংসার চলবে কী করে? না হয় বল্ দোকানপাট, দরবার সালিশীর ভার তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে আমিই এসে ভাত রাঁধতে বসি। আমার বাড়ি বসে এত আমদানী চলবে না।'

অনেক সময় দু'একজন লোকের সামনেই সুবল এভাবে অপমান করে বসে মঙ্গলাকে। জবাব দিতে গেলে তক্ষুনি ঝগড়া বেধে যায়। কিন্তু পাড়ার লোকের সামনে স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়া করলে লোকে যে হাসবে এ জ্ঞান মঙ্গলার আছে বলেই

সুবল বেঁচে যায়। লোকে হাসবার আগে মঙ্গলা তাই নিজেই হাসে, 'বুঝলে ঠাকুরঝি, সহ্য হয় না, তোমরা যে দয়া করে একটু খোঁজ খবর নাও, তত্ত্বতালাস করো এটা মোটেই সহ্য হয় না তোমার দাদার।'

ঠাকুরঝি হাঁ করে থাকে। এর মধ্যে অসহনীয় কী আছে, তা সে বুঝতে পারে না।

মঙ্গলা বলে, 'পুরুষ জাত বড় ছোট জাত ঠাকুরঝি। ভাবে, জিনিস যখন একলা তার, ঠেঙাবার আর আদর করবার অধিকারও তার একেবারে একচেটে। বরং অন্যে ঠেঙিয়ে গেলে ওদের সয়, কিন্তু আদর করে গেলে সয় না। ওসব বাজে কথা। আসল কথা কি জানো—তোমার দাদা মনে মনে ভয়ে ভয়ে থাকে; পাছে তার ইন্দ্রত্ব কেউ কেড়ে নেয়। আমাকে দিয়েও বিশ্বাস নেই, কি জানি, যদি তার মোড়লের গদির ওপর উঠে বসি।'

ঘরের কানাচে খানিকটা জায়গায় শাক-সব্জীর ছোট্ট একটু বাগানের মত করেছে মঙ্গলা। এ তার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। এ সব দিকে সুবলের তেমন সখ নেই। মঙ্গলা নিজেই মাটি কুপিয়েছে, চারা গাছে জল দিয়েছে, গরুর মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজেই বাঁশের কঞ্চি কেটে চারপাশ ঘিরে বেড়া দিয়েছে বেঁধে। সুবলকে একবার বলেছিল বেড়া বেঁধে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সুবল তত গা না করায়, জেদ করে এক দিনের মধ্যেই মঙ্গলা বেড়া দিয়ে নিয়েছিল। কোন পুরুষের চেয়ে কম শক্তি, কি কম বুদ্ধি রাখে না কি মঙ্গলা?

দু'একটা আনাজ তুলবার জন্য সবে বাগানে ঢুকেছে মঙ্গলা, বাড়ির নীচ থেকেই কে ডাকতে ডাকতে এলো, 'সুবলদা বাড়ি আছ নাকি, ও সুবলদা?' মঙ্গলা গলা বাড়িয়ে দেখতেই মুরলীকে চোখে পড়ল। বুকের মধ্যে যে কাঁপছে তা বেশ বোধ করল মঙ্গলা। একটু লজ্জাও নেই লোকটির। কাল এমন কাণ্ড করেও আজ সকালেই আবার পাড়ায় ঘুরতে বেরিয়েছে। অন্য কেউ হলে তো মুখ দেখাতেই পারত না। কিন্তু একবার মার্কামারা হয়ে গেলে আর লজ্জার বালাই থাকে না।

মুরলী বাড়ির ওপর উঠতে উঠতে বলল, 'কি বউদি, দেখেই যে একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। সুবলদা কোথায়?'

পাড়ার বউঝিরা মুরলীর সঙ্গে কথা বলে না বড় একটা। গোপনে গোপনে তাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু নিষেধ করবার মত শাশুড়ী ননদ মঙ্গলার কেউ নেই ঘাড়ের ওপর। তা ছাড়া বয়সেও আশেপাশের বাড়ির বউঝিদের চেয়ে বড়। মোটা হওয়ায় বয়স তার আরো বেশী দেখায়। মুরলীর সঙ্গে সে কথা বলে অনেক দিন থেকেই। ভয় যারা করে করুক, মঙ্গলা মোটেই ভয় করে না মুরলীকে। নিজে খাঁটি থাক, আর মানুষটিকে চিনে রাখ। বাস্, তাহলে আর তোমার কে কি করতে পারে। মুরলী এ বাড়িতে এলে মঙ্গলা যেন নেপথ্যের লোকদের দেখিয়ে জেদ করেই তার সঙ্গে কথা বলে, বসতে দেয়, এমন কি হাসি তামাসা পর্যন্ত করে। মুরলীও নিতান্ত নিরীহ ভদ্রলোক হয়ে ওঠে। মঙ্গলা মনে মনে গর্ব বোধ করে নিজের কৃতিত্বে। একি আর কেউ? এ মঙ্গলা।

মুরলী আর যেখানে যাই করুক একবার মাথা তুলে তাকা[illegible] পারে নাকি মঙ্গলার দিকে, সে সাহস আছে নাকি মুরলীর?

মুরলী আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কথা বলছেন না যে, বা[illegible] আছে নাকি সুবলদা?

মঙ্গলা বলে, 'এত বেলায় বাড়ি সে কোন দিন থাকে[illegible] আজ থাকবে?'

'যাক, বাড়ি নেই তো, বাঁচলুম। বাড়ি যে নেই তা আপ[illegible] মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল।'

'কি রকম কখন থাকে আর কখন না থাকে তা কি আ[illegible] মুখে লেখা থাকে নাকি? আর লেখাই যদি থাকে, তবে আ[illegible] জিজ্ঞাসা করছিলে কেন?'

'অনেক সময় জানা কথাও জিজ্ঞাসা করতে ভালো ল[illegible] তা জানেন না।'

'অত জানাজানির দরকার কি আমার। দাদার খো[illegible] করছিলে কি জন্য শুনি?'

মুরলী একটু হাসল, 'আসলে কি আর দাদার খো[illegible] করছিলাম বউদি?'

ঠাট্টা তামাসা করতে মুরলীর যেন আর বাধে না। সক[illegible] সঙ্গেই ওর যেন কেবল ঠাট্টার সম্পর্ক। আর যে সব সম্প[illegible] ঠাট্টা তামাসা চলবে না সে সব সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন উৎসা[illegible] নেই মুরলীর, সে সব সম্বন্ধ সে যেন স্বীকার করতেই চায় ন[illegible] তবু মঙ্গলার মুখ একটু আরক্ত হয়ে ওঠে, বলে, 'তবে কার খো[illegible] করছিলে?'

'এই দেখুন, আপনিও তো জানা কথা জিজ্ঞাসা করা আর[illegible] করলেন।'

মঙ্গলা যেন বেশ একটু ধমক দিয়ে ওঠল, 'বুড়ো মানু[illegible] সঙ্গেও তোমার ঢং? আচ্ছা ধরেই নিচ্ছি না হয় এই আড়[illegible] মনি মোটা বউদির খোঁজেই তুমি এসেছ। তাই কি?' কথা[illegible] বলে ফেলেই মঙ্গলার নিজেরই খারাপ লাগতে লাগলো। প্র[illegible] মুহূর্তে আশা করতে লাগল মুরলী এর প্রতিবাদ করবে। কি[illegible] তেমনভাবে মুরলী মোটেই না না করল না, কানেও আঙু[illegible] দিল না. হেসে বলল 'শরীরটা মোটা হলে কি হয় বউদি, বু[illegible] তো আপনার সুক্ষ্ম।'

ছাই বুদ্ধি। শরীরটা কি এতই মোটা মঙ্গলার, [illegible] ভদ্রতা করেও মুরলী একটু প্রতিবাদ করতে পারল না এ কথাটার[illegible]

মুরলী বলল, 'কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ভেঙে গেল[illegible] বসতে দেবেন না নাকি ঘরে?'

মঙ্গলা বলল, 'দায় পড়েছে আমার। পাড়া সুদ্ধ মানু[illegible] যাকে এক ঘরে করবার মতলব করছে তাকে ঘরে নিয়ে কি জা[illegible] খোয়াব?'

মুরলী বলল, 'তাই বলুন, সুবলদার পেটে পেটে এত[illegible] এদিকে আর একজনের পেটে যে কথা থাকে না তাতো আর [illegible] জানে না, কিন্তু মতলবটা যখন প্রায় ফাঁস করেই ফেললেন, তখ[illegible] সবটা না শুনে আর যাচ্ছি না। আসুন ব্যাপারটা কি খু[illegible] বলবেন।' ক্রমশ

জীবজন্তুর মনোবৃত্তি

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এস-সি

স্নেহ, মমতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সুকুমার বৃত্তিগুলি হইতে যদি কোন লোক বঞ্চিত হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে হৃদয়হীন পশুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি। আমাদের আজিকার জগৎ শুধু বাহির লইয়া কারবার করে না—অন্তর্লোকের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠতা রাখিয়া চলে। মানুষের বাহিরের রূপটাই আমাদের কাছে আজ আর বড় নয়—তাহার নৈতিক চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া আমরা তাহাকে যাচাই করিয়া থাকি। অন্তরের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সমন্বয়ে তাহার নৈতিক চরিত্র গড়িয়া উঠে। নীতি-জ্ঞান-বিবর্জিত ব্যক্তিকে আমরা পশুর পর্যায়ে নামাইয়া আনি। কারণ, আমাদের ধারণা এই সব সদ্‌গুণ অথবা মনোবৃত্তির অধিকারী একমাত্র মানুষই হইতে পারে। সামাজিকতা, কর্তব্যবোধ, স্বার্থত্যাগ, উচিতানুচিত জ্ঞানের বিকাশ মানুষ ব্যতীত নিম্নতর প্রাণীর মধ্যে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সত্যই কি তাই? যদি তাহাই হইবে তবে কেমন করিয়া কোথা হইতে ইহাদের আবির্ভাব হইল? বিশ্ব-বরেণ্য মনীষী ইমানুয়েল কান্টের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন :

"Duty! Wondrous thought, that workest neither by fond insinuation, flattery, nor by any threat, but merely by holding up thy naked law in the soul, and so extorting for thyself always reverence, if not always obedience; before whom all appetites are dumb, however secretly they rebel; whence thy original "

কান্টের এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, ডারুইন বলিয়াছেন, নিম্নতর প্রাণীর অনুশীলন মানুষের এই শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তির উপর কিছু আলোকপাত করে কিনা তাহাই আগে দেখিতে হইবে। যদি নিম্নতর প্রাণীর মধ্যেও ইহা কিয়ৎ-পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে মানুষের এই প্রকার বৃত্তি নিম্নতর প্রাণী হইতে স্তরে স্তরে ক্রমবিবর্তনের ফলে আধুনিকতম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে। হাউজু (Houzeau), হুকার (Hooker), জীগার (Jeager), ব্রেম (Brehm), বক্সটন (Buxton), ব্রাউবাক (Braubach) প্রভৃতি নিসর্গবিদ্‌গণের অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে যে, নিম্নতর প্রাণিগণও একেবারে নীতি-জ্ঞান বিবর্জিত নহে। নানা জীব-জন্তুর মধ্যে এই মানবসুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলির কিছু কিছু আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। সুতরাং হৃদয়হীন মানুষকে পশুর সহিত তুলনা করিলে পশুর প্রতি একটু অবিচার করা হয় না কি? তাই জীবজন্তুর সম্বন্ধে সাধারণের ধারণাকে পরিবর্তিত করিবার মানসে আমাদের আজিকার আলোচনা সুরু করিতেছি।

দয়া, মায়া, পরার্থপরতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কেবলমাত্র তখনই অর্জন করিতে পারা যায় যখন সমগ্র চিন্তা শুধু আপনারই স্বার্থে কেন্দ্রীভূত না থাকে। অপত্য-স্নেহের মধ্যেও কিছু স্বার্থ জড়িত থাকে, তাই সন্তানের জন্য আত্মত্যাগকে সহজাতবৃত্তি অপেক্ষা উন্নততর মার্গে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি না। কোন সমাজ অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে পরের জন্য ভাবিতে পারা যায় না। যে মায়া এবং যে কর্তব্যবোধ আপনার প্রাণের মমতা না রাখিয়া পরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে তাহার মূলে রহিয়াছে সমাজ। সমাজের প্রতি আকর্ষণ হইতে সহজাতবৃত্তির ন্যায় ধীরে ধীরে নীতি-জ্ঞান ও উচ্চতর বৃত্তিগুলির জন্ম হইয়াছে। সিংহ-ব্যাঘ্র সামাজিক জীব নহে, তাই তাহারা এই সকল বৃত্তির অধিকারীও নহে। প্রত্যেক সামাজিক প্রাণীই আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং এই কর্তব্যবোধকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের নৈতিক জীবন ফুলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের ভালবাসা ও বন্ধু-প্রীতির দৃষ্টান্তে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু জীবজন্তুর মধ্যেও যে প্রীতি-ভালবাসা থাকিতে পারে সে-কথা কি সহসা আমাদের মনে উদিত হয়? বাড়িতে যদি পোষা কুকুর থাকে তাহা হইলে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, উঠানে বসিয়া কুকুর নিবিষ্টচিত্তে আপনার বা আপনাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। বৈঠকখানায় কয় বন্ধুতে মিলিয়া হয়ত তর্কের তুমুল ফোয়ারা ছুটাইতেছেন, দেখিবেন, আপনার পায়ের কাছে কেমন শান্তভাবে আপনার কুকুরটি পড়িয়া আছে। অথচ কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে দৃষ্টির অন্তরালে বাঁধিয়া রাখুন, দেখিবেন, ঘেউ ঘেউ শব্দে সে বাড়ি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ কি? সে আপনাদের ভালবাসে। আপনাদের সঙ্গ—মানুষের সমাজ—তাহার একান্ত কাম্য। মানুষের সঙ্গে থাকিয়া সে এই সমাজেরই একজন হইয়া উঠিতে চায়। আপনাদের সব কিছুকেই সে ভালবাসে। বাড়ির পুষি

শিম্পাঞ্জীর বন্ধু-প্রীতি

বিড়ালটার সহিতও তাহার দিব্য ভাব। এই বন্ধু-প্রীতির নিদর্শনস্বরূপে ডারুইন লিখিয়াছেনঃ

"I have myself seen a dog, who never passed a cat who lay sick in a basket, and was a great friend of his, without giving her a few licks with his tongue, the surest sign of kind feeling in a dog."

বিড়ালের সহিত সিম্পাঞ্জীর সখ্যতার কথা ভাবিতে পারেন? নিম্নে এক চিড়িয়াখানায় গৃহীত আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। এই চিত্রে বুঝিতে পারা যাইবে, ছোট্ট বিড়ালটিকে বন্ধুরূপে পাইয়া শিম্পাঞ্জী যেন বর্তাইয়া গিয়াছে এবং বিড়ালও শিম্পাঞ্জীর ভালবাসায় গর্ব অনুভব করিতেছে।

আমেরিকা দেশীয় একটি ক্ষুদ্র সার্কোপিথেকাস বানর পশুশালার একটি পরিচারককে বড় ভালবাসিত। একদিন সহসা সেই পরিচারকটি এক অতিকায় হিংস্র বেবুন কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বন্ধুকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র বানরটি তাহার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসে এবং বেবুনটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ও চীৎকার করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে পরিচারককে ছাড়িয়া বেবুন বানরটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে লোকজন আসিয়া পড়িয়া পরিচারকটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করে।

ব্রেম লিখিয়াছেন, একদল সার্কোপিথেকাস বানর একটি কাঁটা-ঝোপ অতিক্রম করিবার পর প্রত্যেকে বৃক্ষশাখায় আপনার হাত পা ছড়াইয়া বসিল এবং প্রত্যেকটি বানরের পাশে আর একটি বানর আসিয়া বসিয়া তাহার লোম পরীক্ষা করিয়া যে সকল কাঁটা ফুটিয়াছিল সেগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

এদেশীয় কাকের মধ্যেও স্বজাতি-প্রীতির অভাব নাই। কাক অন্ধ হইয়া গেলে আপনি খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিলেও খাদ্যাভাবে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয় না। এইরূপ দুই তিনটি অন্ধ কাককে ব্লিথ্ সাহেব (Blyth) দেখিয়াছেন অন্য কয়েকটি কাক আসিয়া খাওয়াইয়া যায়। ক্যাপ্টেন স্টানসবেরিও (Capt. Stansbury) পেলিকান পাখীদের মধ্যে এই প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকাংশ প্রাণীই সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে পারস্পরিক প্রীতি ও কর্তব্যবোধ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। মন্ত্রণাসভা, শান্ত্রী-সমিতি, শাসনতন্ত্র, এমনকি স্বৈর-নায়কত্ব প্রভৃতি সব কিছুই স্তন্যপায়ী প্রাণিগণের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। দল বা সঙ্ঘের প্রত্যেককে কতকগুলি বিধিনিষেধ এবং অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। পারস্পরিক সহযোগিতাই এই দলের বিশেষত্ব। দলের একজন সহসা বিপদগ্রস্ত হইলে সবাই মিলিয়া তাহার সাহায্যার্থ আগাইয়া আসে।

সঙ্ঘবদ্ধ পার্বত্যমেষের মধ্যে যুদ্ধদানের এক প্রকার রীতি আছে। মেষশাবকগুলিকে কোন কুকুর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে মেষগণ তৎক্ষণাৎ একটি ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলে। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে স্ত্রী মেষগণ শাবকগুলিকে আগুলিয়া রাখে আর পুরোভাগে শক্তিশালী দলপতির নেতৃত্বাধীনে পুরুষ মেষগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে একযোগে মাটিতে সজোরে পা ঠুকিতে ঠুকিতে ধীরে ধীরে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। নিম্নে পার্বত্তীয় পাহারাদারী এক মেষের চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রে শান্ত্রী মেষের মুখাবয়বে যে উৎকর্ণতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে সে আপন কর্তব্য সম্বন্ধে যে কতখানি সচেতন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উত্তর আমেরিকার বাইসনেরাও অনুরূপভাবে আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

পার্বত্য শান্ত্রীমেষের কর্তব্যনিষ্ঠা

একবার আবিসিনিয়ায় একদল বেবুন একটি উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিল; কতকগুলি ইতঃমধ্যেই পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিল এবং কতকগুলি তখনও পর্বতের পাদদেশেই রহিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সহসা একদল কুকুর সেই উপত্যকাস্থিত বেবুনগুলিকে আক্রমণ করিল। ইহা দেখিয়া বর্ষীয়ান বেবুনগুলি তৎক্ষণাৎ পর্বতশীর্ষ হইতে নামিয়া আসিতে লাগিল। অবতরণকালে তাহারা সমস্বরে এমন ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিল যে কুকুরের দল ভীত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিল।

প্রভুর প্রতি কুকুরের মমতার কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আপনাকে যদি কেহ কৃত্রিম প্রহারের অভিনয় করেন, দেখিবেন, আপনার কুকুর নিতান্ত ভীরু প্রকৃতির না হইলে প্রহারকারীর প্রতি সে ক্ষিপ্রবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিবে এবং পরিশেষে আপনার অঙ্গের প্রহৃত স্থানে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া তাহার সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে। আমাদের 'পপি' নামে একটি ফক্স-টেরিয়ার কুকুর ছিল, দীর্ঘ পনের বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া সম্প্রতি কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে সে আমার ছোট ভাইকে অতিরিক্ত ভালবাসিত এ

দের্তাকে খুব ভয় করিয়া চলিত। মায়ের ত্রিসীমানায় সে যেত না। তবে মা কোনদিন আদর করিয়া তাহাকে ডাকিলে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে অতি সঙ্কুচিতভাবে কর্তিত লেজের শেষ অংশটুকু মৃদু মৃদু নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার কাছে সর হইত। সেই মাও যখন অশোককে কোন কারণে প্রহার বা প্রহারের অভিনয় করিয়াছেন, তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপি সংকোচ বিস্মৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মায়ের প্রতি ধাবিত হের প্রয়াস পাইয়াছে এবং ঘেউ ঘেউ শব্দে তাহার তীব্র রোষ জানাইয়া দিয়াছে। পরে তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন রিয়া দিলে অথবা অশোক তাহার নিকটে গেলে সে বহুক্ষণ রিয়া অশোকের সর্বাঙ্গ চাটিয়া চাটিয়া তাহার গভীর সহানু- ও সোহাগ নিবেদন করিয়াছে।

এতক্ষণ ধরিয়া জীব-জন্তুর স্নেহ-মমতা ও সমাজ-প্রীতির আলোচনা করিলাম। এইবারে তাহাদের নীতি-জ্ঞান বেক ও পরার্থপরতার কিছু উল্লেখ করিব। ডারুইন লিয়াছেন ঃ

"Besides love and sympathy, animals exhibit other qualities connected with the social instincts, which in us would be called moral; and I agree with Agassiz that dogs possess something very like a conscience."

কুকুরের প্রকৃতই কিছু আত্ম-সংযম এবং আত্ম-মর্যাদা বোধ আছে। এই আত্মসংযম যে শুধু ভয় হইতে উদ্ভূত তাহা নহে। ব্রাউবাক বলিয়াছেন, প্রভুর অনুপস্থিতি বা অসাক্ষাতে কুর কখনও কোন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, এবং সেকথা আমরাও জানি। চুরি করাকে কুকুর অত্যন্ত ঘৃণা করে। প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও প্রভু নিজে যতক্ষণ না ডাকিয়া তাহাকে খেতে দিতেছেন ততক্ষণ সে বহু সুযোগ সত্ত্বেও খাদ্য অপহরণ করে না। কুকুরকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক বলা যাইতে পারে।

কোন্‌টা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় এই ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান কুকুরের বেশ আছে। মায়ের কড়া হুকুমে আমাদের পাপির ঘরে ও দালানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সে কিন্তু ঘরে আসিতে বড় ভালবাসিত। যদি কোনদিন কোলে করিয়া তাহাকে দালানে আনিতাম সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেত। অথচ আমরা তাহাকে বহুবার ঘরে ও দালানে উঠিয়া আসিতে বলিলেও সে কিছুতেই আসিত না, যদিও আমাদের অন্য সকল আদেশই সে অতি আগ্রহের সহিত পালন করিত। আমরা তাহাকে ভিতরে আসিতে ডাকিলে সে দালানের দরজার চৌকাঠিতে দাঁড়াইয়া ছোট্ট লেজটি ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে করিতে চোখের ভাষায় যেন বুঝাইতে চাহিত—কি করিব বন্ধু, উপায় নাই! মা যে অসন্তুষ্ট হইবেন।

কুকুরের ন্যায় হস্তিগণের মধ্যেও কর্তব্যবোধ ও ন্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু অথবা মাহুতকে তাহারা দলপতি বলিয়া মনে করে। ডাঃ হুকার বলিয়াছেন, তিনি দেশের একস্থানে একবার এক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে এক পঙ্কিল জলাভূমিতে হাতীর পা চারিটি সহসা এমনভাবে আটকাইয়া গেল যে পরদিন যে পর্যন্ত-না স্থানীয় লোকেরা আসিয়া দড়ি-দড়ার সাহায্যে পঙ্কনিমজ্জিত হাতীকে টানিয়া তুলিল সে পর্যন্ত সে এক-ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। সাধারণত এই প্রকার বিপদে পড়িলে হাতীরা কাঠ, গাছ অথবা যে কোন শক্ত দ্রব্য সম্মুখে দেখিতে পায় তাহাই শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া লইয়া জানুর তলদেশে স্থাপন করে যাহাতে আরও গভীরভাবে ডুবিয়া যাইতে না হয়। হুকারের নিমজ্জমান হাতীটিও আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হইলে হুকারকে তাহার পদতলে পিষ্ট হইতে হইত। কিন্তু দারুণ বিপদেও এইরূপ সহনশীলতা প্রভুভক্তি ও পরার্থপরতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক নহে কি?

পূর্বেই বলিয়াছি সামাজিক প্রাণিগণকে তাহাদের দল-পতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। আবিসিনিয়ায় বেবুনেরা দলবদ্ধভাবে নিঃশব্দে বাগানে ঢুকিয়া ফল চুরি করিয়া থাকে, সেই সময় যদি কোন অল্পবয়স্ক বেবুন অসতর্কতা বশত সামান্য মাত্রও আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া ফেলে তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বস্থিত বেবুনের প্রবল চপেটাঘাতে তাহার অসংযমের ফল ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আনন্দ এবং বেদনা মাত্র এই দুইটি অনুভূতি হইতেই অপর সকল মনোবৃত্তির জন্ম হইয়াছে। আমাদের মতে কিন্তু তাহা সর্বতোভাবে সত্য নহে। আনন্দ ও বেদনার ফলে স্নেহ-মমতার উদ্রেক হইতে পারে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া আত্মক্লেশ ও আত্মত্যাগ কি সম্ভব? আমাদের মনে হয় সমাজ-প্রীতি হইতেই ধীরে ধীরে সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু এইখানে একটা কথা আছে। সমাজ-প্রীতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি আকর্ষণ কি সহজাত? আমরা জানি কোন সামাজিক প্রাণীকে তাহার দল ছাড়া করিয়া একাকী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করে এবং দলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বিচরণ করিতে পাইলে সুখী হয়। এই প্রকার সমাজ বা সঙ্ঘ-প্রীতি কেমন করিয়া জন্মিল তাহা একটু না বলিলে গোড়ার কথাটাই বাদ পড়িয়া যাইবে। ডারুইন বলিয়াছেন, ক্ষুধার অনুভূতি যেমন করিয়া সকলকে খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে, ঠিক তেমনি করিয়াই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিবার স্পৃহা আনয়ন করিয়াছে। একাকী থাকিলে শত্রু কর্তৃক সহজেই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দলের মধ্যে থাকিলে অনেকটা নিরাপত্তা বজায় থাকে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য যেমন কিছু পরিশ্রম বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তেমনই কোন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইলে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে সমাজ প্রীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত অথবা অর্জিত গুণ বলিয়া মনে হইলেও আসলে এই সমাজ-প্রীতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছে এবং পরে ক্রমবিবর্তনের দ্বারা প্রতিপাদ্য হিসাবে এই সমাজ-প্রীতি হইতে অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

লটারী

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

সংসারের কথা উঠিলেই মোক্ষদা বলিত, পাঁচটি প্রাণী লইয়া তাহার সংসার। প্রাণী পাঁচটি যথাক্রমে সে নিজে, স্বামী ভৈরব, ছেলে মঙ্গল, মেয়ে শ্যামা এবং গরু জয়দুর্গা। মোক্ষদা গ্রামের জমিদার ভবতারণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ির ঝি। ভৈরব চৌকিদার। মঙ্গল গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। সংসারের কাজকর্ম দেখিতে হয় আট বৎসর বয়স্কা শ্যামার।

মোক্ষদার বয়স যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া গেলেও প্রৌঢ়ত্বের দরজা পার হয় নাই। তাহার চেহারার মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য আছে যাহার জন্য অনেকেরই মনে হয়—ভৈরবের সংসারযাত্রার সঙ্গিনী হওয়া তাহার যেন মানায় নাই। বয়স, চেহারা এবং বুদ্ধি কোন দিক দিয়াই ভৈরব তাহার উপযুক্ত নয়। মোক্ষদারও এমনি একটা ধারণা এবং তজ্জনিত নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে খানিকটা অভিযোগ বরাবরই তার ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র বাক্য-যন্ত্রণা ছাড়া ভৈরবকে সে আর কোন কষ্ট দিয়াছে বলিয়া কাহারও জানা নাই।

প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক সত্য কথা বলিতে মোক্ষদার কখনও আটকাইত না। সেজন্য কাহারও সহিত তাহার বড় একটা মিল ছিল না। তবে কাজের দিক দিয়া তাহার মত লোক পাওয়া কঠিন। জমিদার বাড়িতেও একমাত্র কাজের জন্য তাহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাই কারণে অকারণে উচিত কথা বলা সত্ত্বেও ভবতারণবাবু মোক্ষদাকে কখনও জবাব দেন নাই।

মোক্ষদার জীবনযাত্রা ধরা-বাঁধা, প্রতিটি দিন যেন পূর্ববর্তী দিনেরই পুনরাবৃত্তি। শেষ-রাতে শয্যা ত্যাগ করা, ঘরের কাজকর্ম সারিয়া তুলসী-তলা পরিষ্কার করা, তৎপর ছেলেমেয়েকে জাগাইয়া দেওয়া এবং জয়দুর্গাকে মাঠে বাঁধিয়া দিয়া জমিদার বাড়িতে আসিয়া কাজে লাগা। তাহার পর দুপুরে বেলা নিজের ভাত বাড়িতে আনা, গরুর গা ধোয়ান, শ্যামার সঙ্গে আহার করা ইত্যাদি। ভৈরব এবং মঙ্গলের আহার আগেই শেষ হইত। আহারান্তে মাটিতে আঁচল বিছাইয়া তাহার বেশিক্ষণ বিশ্রাম করা হইত না, তাড়াতাড়ি জমিদার বাড়িতে আসিতে হইত। সন্ধ্যার দিকে মোক্ষদা এক ফাঁকে আসিয়া গরুকে যথাস্থানে তুলিয়া রাখিত এবং তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে করিয়া প্রণাম করিত। সন্ধ্যার সময়টি নির্দিষ্ট ছিল—জমিদার গৃহিণীর পায়ে তেল দিতে দিতে নানা বিষয় গল্প করার জন্য। রাতে তাহার বাড়ি ফিরিবার আগেই ছেলে মেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িত। ভৈরব কোন কোন দিন আহার সারিয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত, আর কাজ না থাকিলে মোক্ষদার জন্য অপেক্ষা করিত। দুই জনে আহার করিয়া যখন উঠিত তখন গ্রামের প্রান্ত হইতে হয় কোন নিঃসঙ্গ কুকুরের ডাক নতুবা বাড়ির দক্ষিণ দিকের তেঁতুল গাছ হইতে পেঁচার ডাক শুনা যাইত।

জমিদার বাড়ি হইতে নিজের বাড়ি আসিবার রাস্তায় একটি বিপুলাকার প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল, গাছটি সম্বন্ধে গ্রামে নানা কথার প্রচলন ছিল। রাতে তাহার তলা দিয়া কেহ একাকী যাইতে ভরসা করিত না। তবে মোক্ষদার কোন ভয় ছিল না। সে বলিত, ঠাকুরের নাম করিলে তাহার কাছে কোন অপদেবতার ঘেঁসিবার সাধ্য নাই।

মোক্ষদা নিজের কাজ যথারীতি করিত, কিন্তু সব কিছুতেই তাহার ঘোরতর অতৃপ্তি ছিল। মেয়েটিকে সে অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দিতে পারিবে না, জমিদার পুত্রের মত মঙ্গলকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিবে না, নিজের ঝি-গিরি করা একেবারেই পোষায় না—ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাহার ভাগ্য মন্দ। তাহার পর ভৈরব যখন চৌকিদারের পোষাক পরিয়া সগর্বে বাহির হইত তখন সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

দিন হয়ত এমনি করিয়াই কাটিত, কিন্তু মোক্ষদার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। পাশের গ্রামে একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি লটারিতে কিছু টাকা পাইল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল এবং সকলেই এইরূপ অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির লোভে লটারীর টিকিট কেনা সুরু করিল। মোক্ষদা জমিদার বাড়ি হইতে লটারি সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করিল এবং জমিদারের নায়েব রমণী সরকারের নিকট নগদ দুই টাকা দিয়া একখানি লটারির টিকিট কিনিল।

নায়েব মহাশয়কে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তাহার নামে কত টাকা উঠিবে। নায়েব মহাশয় বলিয়াছিলেন—পনের হাজার। পনের হাজার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না হওয়ায় সে জানিতে চাহিয়াছিল—কয় কুড়ি। কয় কুড়িতে পনের হাজার,—রমণী সরকার তাহার একটি হিসাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য মোক্ষদা সে হিসাব বুঝিতে পারে নাই। তবে এটুকু সে বুঝিয়াছিল, অনেক টাকা—যাহার সাহায্যে সে তিনখানি নূতন ঘর তোলা, ছেলেকে শহরে রাখিয়া পড়ান, অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া, নিজের জন্য সোনার গহনা তৈরী করা—এক কথায় তাহার আকাঙ্ক্ষিত সব কাজই সম্ভব হইবে। টিকিট কেনা হইল জয়দুর্গার নামে। মোক্ষদা টাকার রসিদখানি সযত্নে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে রাখিয়া দিল।

সেই দিন হইতে মোক্ষদা বেশি তেল দিয়া তুলসীতলার প্রদীপ জ্বালিতে লাগিল এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা বেলায় লক্ষ্মীর পূজা আরম্ভ করিল। দৈবশক্তির উপর তাহার বিশ্বাস রাতারাতি বাড়িয়া গেল। আগে অন্ধকার রাতে অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়া যাইবার সময় অপদেবতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে যে ঠাকুরের নাম করিত, এখন হইতে সে উঠিতে বসিতে তাঁহার নাম করিতে লাগিল।

একদিন গ্রামে এক জ্যোতিষ উপস্থিত হইলেন, তিনি নাকি হাতের রেখা দেখিয়া যাহা বলেন, সূর্য চন্দ্র মিথ্যা হইলেও তাহা কখনও মিথ্যা হয় না। নিজের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি নানা নজির দিলেন। গ্রামবাসী অবাক্ হইয়া গেল। তিনি একে একে সকলের হাত দেখিলেন। কাহার পিতামহের ডান পায়ের কোথায় তিল ছিল, রাহু কাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যাকে তাড়াইয়া একেবারে জমিদার বাড়ির দীঘীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল ইত্যাদি আশ্চর্য ব্যাপার তিনি অনায়াসে বলিয়া গেলেন। মোক্ষদার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে সকলের সামনে হাত দেখাইল না, কেননা তাহার আশু ভাগ্য পরিবর্তনের কথা শুনিয়া সকলের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়, ইহাতে তাহার আপত্তি ছিল। মোক্ষদা জ্যোতিষিকে নিজের বাড়ি লইয়া গেল। সেখানে কি হইল বলা নিষ্প্রয়োজন, মোটকথা জ্যোতিষী মোক্ষদাকে এবং তাহার সংসারের অপর চারিটি প্রাণীকে বারবার আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

ক্রমে মোক্ষদার অদ্ভুত পরিবর্তন সকলের নজরে পড়িল। কোন কাজে তাহার মন লাগে না। কেহ কিছু বলিলে সে হাসিয়া উত্তর দেয়,—কাজ তো এতদিন করিয়াছে এখন হইতে আর কিছু করিবে না। একদিন জমিদার-গিন্নীকে বলিল, তাহার এভাবে পরিশ্রম করা মানায় না, দশজন দেখিলে কি বলিবে! জমিদার-গিন্নী অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরেই মোক্ষদা কাজ ছাড়িয়া বাড়িতে আসিয়া বসিল।

কিছুদিন পরে মোক্ষদা নায়েব মশায়ের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল লটারির টাকা আসিয়াছে কিনা। তিনি কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না তাহার নামে টাকা উঠে নাই। বার বার বিরক্ত করায় তিনি বলিয়া দিলেন টাকা তাঁহার কাছে আসিবে না, টাকা যদি আসে পোস্ট অফিসেই আসিবে। সুতরাং এ সম্বন্ধে পোস্ট মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করাই ভাল।

গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা অল্প-বিস্তর লেখাপড়া জানে তাহাদের সারাদিনের বর্ণবৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝে একমাত্র বৈচিত্র্য পোস্ট অফিসে ডাকের সময় আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়ান। চিঠি খুব কম লোকেরই আসে; যাহাদের নামে আসে তাহারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। যাহাদের নামে আসে না তাহারা দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ চাপিবার জন্য খবরের কাগজ লইয়া বেশি কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে। এমনি করিয়াই তাহাদের দিনের পর দিন কাটে। এই পোস্ট অফিসের বারন্দায় বসিয়া তাহারা পৃথিবীর কত পরিবর্তনের কথা খবরের কাগজে পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই কিন্তু পৃথিবীর কোন পরিবর্তনই তাহাদের জীবনের ধারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে ধারা বরাবর ঠিকই একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে।

পোস্ট অফিসের বারান্দার ভীড়ের মাঝে একদিন মোক্ষদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একটু অবাক হইল। মোক্ষদা কোন-দিকে না চাহিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া পোস্ট মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নামে কোন টাকা আসিয়াছে কিনা। মোক্ষদার মাথা খানিকটা খারাপ হইয়াছে তাহা সকলেই জানিত, কাজেই এ প্রশ্নে প্রত্যেকেই হাসিয়া উঠিল। মোক্ষদা পুনরায় প্রশ্ন করিল তাহার নামে যে টাকা আসিবার কথা তাহা আসিয়াছে কিনা। সহাস্যে পোস্ট-মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ টাকা?' মোক্ষদা ভাবিল পোস্ট মাস্টার বোধ হয় তাহার সঙ্গে রসিকতা করিতেছেন, কোন্ টাকা তাহা কি তিনি আর জানেন না! এ হইতেই পারে না। চাপা হাসিতে মোক্ষদার সারা চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হাসি চাপিয়া মোক্ষদা বলিল, 'মাস্টারবাবু, আপনি কি আর জানেন না? ঐ যে লটারির টাকা।' মোক্ষদা আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সকলের হাসিতে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার পর হইতে মোক্ষদা প্রত্যহ ডাকের সময় পোস্ট অফিসে আসে এবং একবার করিয়া টাকার খবর করিয়া যায়। বাড়ি ফিরিয়া সে লটারির টাকার রসিদখানি বারে বারে মাথায় ছোঁয়ায় এবং ঠাকুরকে ডাকিয়া বলে তিনি যেন দয়া করিয়া টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেন। টাকা না আসিলে সে কিছুই করিতে পারিতেছে না আর লোকে ভাবিতেছে মোক্ষদা বুঝি সত্যই ছোটলোক।

পোস্ট অফিসে ইন্সপেক্টর আসিয়াছেন। তিনি যখন পুরু চশমা আঁটিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন এবং পোস্ট মাস্টার ঘর্মাক্ত কলেবরে তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম করিতেছেন তখন মোক্ষদা আসিয়া উপস্থিত হইল। মোক্ষদা ঠিক করিয়া আসিয়াছিল ইন্স-পেক্টর সাহেবের কাছে সে টাকা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ লইবে, কেননা তাহার ধারণা মাস্টারবাবু তাহার নিকট সত্য কথা বলেন না। তাহার প্রশ্নে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পোস্ট মাস্টারের মুখের দিকে চাহিলেন। পোস্ট মাস্টার খাট গলায় ইংরেজিতে বলিলেন, 'ইনসেন'। মোক্ষদার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ও! তোমার টাকা? সে তো চৌধুরী মশায় জানেন, অত টাকা আমরা কি আর এখানে রাখতে পারি?'

ভবতারণবাবুর জীবনও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সময় নাই অসময় নাই যখন তখন আসিয়া মোক্ষদা উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহার টাকা জমিদারবাবু কেন দিতেছেন না, সে তো টাকা রাখিবার জন্য মেঝেতে গর্ত করিয়া কাঠের বাক্স বসাইয়াছে ইত্যাদি মোক্ষদার কথার অন্ত নাই। মোক্ষদার দৃঢ় বিশ্বাস জমিদারবাবু ইচ্ছা করিয়াই তাহার টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছে।

সকলেই দেখিল মোক্ষদা বদ্ধ পাগল হইয়াছে। সে পাগল হউক্ বা না হউক্ তাহাতে কাহারও কিছু যায় আসে না, কিন্তু যত বিপদ হইল তাহার সংসারের অবশিষ্ট চারিটি প্রাণীর। মোক্ষদার নিজের কাজ নাই, একা ভৈরবের রোজগারে সংসার চলিবে কেন। এদিকে ভৈরবের সহিত মোক্ষদার প্রত্যহ গোলমাল, সে ভৈরবকে কাজ ছাড়িবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সে এত টাকার মালিক আর তাহার স্বামী করে চৌকিদারী। লোকের কাছে সে কি করিয়া মুখ দেখায় তাহা নীরেট ভৈরবের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। মোক্ষদা বলে ভৈরবের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য লোকে তাহাকে কত নিন্দা করে। সেদিন দীঘির ঘাটে স্নান করিবার সময় হরির মা তো স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে মোক্ষদার লজ্জা হওয়া উচিত।

সংসার প্রায় অচল। ঘরের চালে খড় নাই, এবারকার বর্ষায় সমানে ভিজিতে হইবে। জয়দুর্গার পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গলের ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বর হয়, মুখে কিছু ভাল লাগে না। পাঠশালায় বেতন দিতে না পারায় তাহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়াছে। তাহার মায়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপার লইয়া পাড়ার ছেলেরা নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, কাহারও সঙ্গে যে খেলা করিবে তাহারও উপায় নাই। শ্যামার প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে জ্বর আসে, সকালে বিছানা থেকে উঠিতে ইচ্ছা করে না। মুখে ঘা, ক্ষুধা লাগিলেও কিছু খাওয়া যায় না, জ্বালা করে। আর খাইবেই বা কি! এক বেলা অন্ন জুটিলে আর এক বেলা জোটে না। অথচ এই শরীর লইয়াই সব কাজ করিতে হয়।

মোক্ষদা ঘর সংসারের কোন কাজই করে না, উপরন্তু একটা না একটা ব্যাপার লইয়া স্বামী ও ছেলেমেয়ের সহিত তাহার গোলমাল লাগিয়াই আছে। কাহারও সহিত তাহার বনে না। মোক্ষদার কথা বলার বিরাম নাই, দুনিয়ার সকলের বিরুদ্ধেই তাহার অভি-যোগ। তাহারও দিন আসিবে তখন দেখাইয়া দিবে সে কি রকম ঘরের মেয়ে। কয়েক মাসের মধ্যে তাহার চেহারারও অনেক বদল হইয়াছে। আগের মাধুর্য আর নাই, বয়স কত যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার চোখ দুইটির দিকে চাহিলে ভয় হয়, সে দৃষ্টি যেন বর্তমানের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কল্পিত ভবিষ্যতের প্রতি স্থিরভাবে নিবদ্ধ।

ভৈরব সমস্তই নীরবে দেখে এবং গোপনে চোখের জল ফেলে। ছেলেমেয়ের কষ্টে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে থাকে। অথচ কিছুই করিবার উপায় নাই। মোক্ষদার সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াও সে কোন মতে চাকুরি বজায় রাখিয়াছে। চাকুরি আছে বলিয়াই তবুও যা হোক কিছু জুটিতেছে।

গ্রামের অনেকেই মোক্ষদার চিকিৎসার কথা বলে। ভৈরব বুঝিতে পারে না যে, সে কি করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবে। তবুও সে সাধ্যমত চেষ্টা করে। একদিন পাশের গ্রামের চৌকিদারকে ধরিয়া সে বহু কষ্টে একটি মাদুলী সংগ্রহ করিল। তাহার বিশ্বাস এই মাদুলিটি ধারণ করিলেই মোক্ষদার রোগ সারিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করিবে।

মাদুলিটি মোক্ষদার হাতে দিয়া ভৈরব বলিল উহা ধারণ করিলেই লটারির টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাইবে। মাদুলিটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়াই পর মুহূর্তে মোক্ষদা উহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভৈরব কি যেন বলিতে যাইতেছিল মোক্ষদার তাড়ায় তাহা আর বলা হইল না। মোক্ষদা তীব্র কণ্ঠে ভৈরবকে জানাইয়া দিল এত টাকা যে পাইয়াছে সে কি কখনও তামার মাদুলী পরিতে পারে তাহার কপালের দোষ তাই তাহার বোকা স্বামীর এ বুদ্ধিটুকু হয় নাই।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভবতারণবাবু নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন সে টাকা পায় নাই এবং পাইবার সম্ভাবনাও আপাতত দেখা যাইতেছে না। কিন্তু মোক্ষদা যখন কিছুতেই টলিল না, তখন ভবতারণবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মোক্ষদার টাকা পয়সার কথা তিনি কিছু জানেন না। তাহার টাকা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা সরকারের ট্রেজারিতে আছে। মোক্ষদা ট্রেজারি কাহাকে বলে বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবু কাহার কথা বলিতেছেন। ভবতারণবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, ট্রেজারি অর্থাৎ যেখানে রাজ্যের টাকা থাকে শহরে সেইখানে যেন মোক্ষদা যায়।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরিয়া মোক্ষদা সকলকে জানাইল সে টাকা পাইয়াছে। তাহার সংসারের তিনটি প্রাণী অবাক হইয়া গেল। তাহাদের কাছে মোক্ষদা যে কাহিনী বিবৃত করিল, তাহা মোটামুটি এই রূপঃ—জমিদারবাবুর কাছে টাকা কোথায় আছে শুনিয়া সে যখন সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, তখন দেখিতে পাইল গাছটি হঠাৎ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ভয় পাইয়া ঠাকুরের নাম করিতে করিতে দ্রুত পদে চলিয়া আসিতেই শুনিতে পাইল কে যেন সুমধুর কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল এক অপূর্ব সুন্দর সন্ন্যাসী গাছ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে তাহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার সারা দেহ দিয়া অদ্ভুত আলো বাহির হইতেছে। সেই আলোই গাছটিকে আলোকিত করিয়াছিল। সন্ন্যাসী দীর্ঘকায় মাথায় জটা, পরণে বাঘছাল এবং হাতে ত্রিশূল। মোক্ষদা প্রণাম করিতেই তিনি হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাহার টাকা সত্যই আসিয়াছে, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেই সে টাকা পাইবে। টাকা পাইলে সে যেন প্রথমেই মহাদেবকে পূজা দেয়। এই কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী কোথায় মিলাইয়া গেলেন। শুনিতে শুনিতে শুনিতে মঙ্গলা ও শ্যামার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, কেবল ভৈরব স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মোক্ষদা পরদিনই শহরে যাইবে স্থির করিল. ভৈরব বহু কষ্টে সেদিন তাহার যাওয়া স্থগিত রাখিল। কিন্তু স্থগিত রাখিয়া লাভ হইল এই যে. সারাদিন ধরিয়া মোক্ষদা সকলের উপর নানা অত্যাচার করিল। ভৈরবও আর কোন মতে ধৈর্য রাখিতে পারিল না; ভাবিল যাহা হয় হইবে, সে আর মোক্ষদাকে আটকাইবে না।

পরের দিন সকালে মোক্ষদা শহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে শুনিয়াছিল লটারির টাকার রসিদখানি সঙ্গে না থাকিলে টাকা পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু যাইবার সময় রসিদখানি কোথাও পাওয়া গেল না। মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়িতে যেন প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ হইল। পাড়ার লোকে ভাবিল মোক্ষদার পাগলামি আজ বোধ হয় খুব বাড়িয়াছে।

মোক্ষদা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, তাহার সঙ্গে ভৈরব এবং ছেলেমেয়েও খুঁজিতে ত্রুটি করিল না। ছেঁড়া কাঁথা দশবার করিয়া ঝাড়া হইল, লক্ষ্মীর ঝাঁপি কতবার করিয়া যে দেখা হইল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু রসিদ কোথাও মিলিল না। মঙ্গল ও শ্যামা প্রহার খাইল। ভৈরবও কিল চড় হইতে রেহাই পাইল না। অবশেষে মোক্ষদা যাত্রা করিল। রওনা হইবার সময় বলিয়া গেল, বিনা রসিদেই সে টাকা আনিবে এবং সকলকে বুঝাইয়া দিবে তাহার মত বড় ঘরের মেয়ের তেজ কম নয়।

শহরে পৌঁছিতে মোক্ষদার অনেক বেলা হইল। সে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বলিয়াছে আদালতে গেলেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা হইবে। তথায় একজন কনস্টেবলকে সে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইল। পাগল দেখিয়া কনস্টেবলের কৌতুক করিবার ইচ্ছা হইল। সেই সময় সাহেবী পোষাক পরিহিত জনৈক ভদ্রলোক মোটর গাড়িতে উঠিতেছিলেন, কনস্টেবল তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, উনিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

মোক্ষদা গাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং করজোড়ে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিল। ভদ্রলোকটি ভাবিলেন উন্মাদকে তাড়া দেওয়া কাজের কথা নয়। তাই সব শুনিয়া বলিলেন জমিদারবাবুকে ভাল করিয়া ধরিলেই তিনি টাকা পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। অত টাকা শহরের মধ্যে স্ত্রীলোকের হাতে দেওয়া ঠিক হইবে না, আর অত টাকা সে লইয়া যাইবেই বা কি করিয়া। জমিদারবাবুকে বলিলেই তিনি গাড়ি পাঠাইয়া টাকা লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

মোক্ষদা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কাছে সামান্য কয়টি পয়সা ছিল তাই দিয়া সে খাবার কিনিয়া খাইল। ছেবেলায় একবার কোন মেলায় সে মিষ্টি বরফ খাইয়াছিল। দেখিল শহরে সেই বরফ বিক্রয় হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বরফওয়ালাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বরফের জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। হাতে আর একটি পয়সাও ছিল না, কাজেই এ মিষ্টি বরফ আর তাহার খাওয়া হইল না। হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুইটির কথা মনে করিয়া মোক্ষদার চোখে জল আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল টাকা পাইলেই সে মঙ্গল ও শ্যামাকে এই বরফ পেট ভরিয়া খাওয়াইবে।

মোক্ষদা যখন বাড়ি পেঁছিল, তখন অনেক রাত হইয়াছে. সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। তাহার পদশব্দে দুই-চারিটি কুকুর বারকয়েক ডাকিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিয়া মোক্ষদা দেখিল, শ্যামা প্রবল জ্বরে ছটফট করিতেছে, মঙ্গল তাহার মাথায় বাতাস করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভৈরব থানা হইতে তখনও ফেরে নাই। মোক্ষদা বেশিক্ষণ ঘরে থাকিতে পারিল না, বারান্দায় আসিয়া বসিল। বসিতেই গভীর ক্লান্তিতে তাহার দেহ এলাইয়া পড়িল।

পরদিন রোদে যখন সারা বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে, তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা লইয়া মোক্ষদার ঘুম ভাঙিল। উঠিয়া বসিতেই কোমড়ের মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিল, মনে হইল কে যেন তাহার দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলি টানিয়া ধরিয়াছে। অদ্ভুত শব্দ করিয়া মোক্ষদা অচেতন হইয়া পড়িল।

যথাসময় সরকারি ডাক্তার আসিয়া মোক্ষদার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ঔষধে তাহার কোন উপকার হইল না, বরং অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই চলিল।

মোক্ষদার শেষ সময় যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে একটি গভীর পরিতৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মোক্ষদার চোখের সম্মুখে এক-একটি দৃশ্য ভাসিয়া উঠিত। সে বেশ দেখিতে পাইত, গাড়ি বোঝাই করা টাকা তাহার বাড়িতে আসিয়াছে। সে নূতন করিয়া বাড়িঘর তৈরী করিয়াছে, তাহার কত দাসদাসী। বড় ঘরে শ্যামার বিবাহ হইয়াছে, মঙ্গল শহরে থাকিয়া পড়ে। তাহার সারা গায়ে গহনা। জমিদার বাড়িতে তাহার এখন কত আদর। ভৈরব লাল জামা-কাপড় পরিয়া বোর্ডে হাকিমি করে। তার অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও দুই-একটি বিষয়ে তাহার চৌকিদারী বুদ্ধি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য কত লোকের কাছে মোক্ষদার লজ্জিত হইতে হয়! তাহাদের এত বড় ঘর, লোকে কোন কারণে নিন্দা করিবে, ইহা সে কোনমতেই ভাবিতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসী বেদীমূলে প্রণাম করিয়া মোক্ষদা যখন মাথা তুলিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল, সেদিনের সেই সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হঠাৎ মোক্ষদার মনে পড়িল, মহাদেবের পূজা দেওয়া হয় নাই। হাত জোর করিয়া ক্ষমা চাহিবার উপক্রম করিতেই মোক্ষদা দেখিল, সন্ন্যাসীর পরিবর্তে স্বয়ং মহাদেব তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অল্পবয়সে মায়ের মুখে মহাদেবের যে

(শেষাংশ ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

রামনাথ বিশ্বাস

চার

লুইসত্রিচাট থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু হয়েছে। মধ্য আফ্রিকার সমতল ভূমি হতে হঠাৎ যেন ঝাকানি দিয়ে এক খণ্ড পার্বত্য ভূমি স্বগর্বে মাথা উঁচু করে আবার হঠাৎ দক্ষিণ সাগরে ডুব মেরেছে। এখান হতেই শস্য শ্যামলা পার্বত্যভূমি ক্রমেই ঢেউ খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে আসার পর থেকেই মনে হয়েছিল আমি যেন আমার বহুদিনের ঈপ্সিত স্থানে এসে পৌঁছেছি। দেশ বড়ই সুন্দর। চারি দিকে সবুজ দৃশ্য বড়ই মনোরম। বাজারের ফল সুমিষ্ট। ঝরণার জল উপাদেয়। স্নিগ্ধ বাতাস মনের আনন্দ বর্ধক। কিন্তু সেই অসমতা মনকে দমিয়ে দেয়। সকল সুন্দরের মাঝে পরাধীনতার দুর্বলতা ছাই ঢেলে দেয়। হাসতে ইচ্ছা হয় না। চারিদিকের সৌন্দর্য ভাল লাগে না, শুধু মনে হয় কি কুক্ষণে আমার জন্ম হয়েছিল পরাধীন দেশে।

শহরের দক্ষিণ দিকে একটা ফাঁকা মাঠের পথের পাশে একখানা নিগ্রো চায়ের কেবিন। সেখানে এক পেনীতে এক পেয়ালা নিগ্রো চা বিক্রি হয়। নিগ্রোদের এখানে কাফেরও বলা হয়। আমি সাধ করেই সেই চায়ের দোকানে গিয়ে একটি পেনী ফেলে দিয়ে বললাম এক পেয়ালা চা দেবার জন্য। চায়ের দোকানের বয় অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে কি ভাবল, তারপর এক পেয়ালা চা দিল। চায়েতে কোন গন্ধ নেই। চিনি যা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় না যে, চিনি মোটেই দেওয়া হয়েছে। কনডেন্স মিল্ক গুণে পাঁচ ফোঁটা মাত্র দেওয়া হয়েছে। অতি কষ্টে চায়ের পেয়ালা শেষ করে উঠবার সময় বললাম ভাল চা আন না কেন? পার্শ্বে উপবিষ্ট স্ত্রীলোকটি বললে, তা কি করে হবে? বিদেশীরা যে চা এবং কফি ব্যবহার করে তা আমরা কিনতে যেমন অক্ষম, তেমনি আমাদের কাছে ওসব ভাল জিনিস বিক্রি করাও নিষেধ। মেয়েটি যেভাবে কথা বলল, তাতে মনে হল, তার মনে প্রবল বাসনা আছে ভাল জিনিস ব্যবহার করতে কিন্তু শ্বেতকায়রা তাতে বাদ সাধছে। ভাষায় যা বলা যায় না, একবার চোখ ফেরালে তার চেয়ে আরও ভালভাবে বুঝান যায়। নিগ্রো রমণীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আপনা হতেই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বের হয়েছিল। মানুষ চায় মানুষের উন্নতি, কিন্তু এখানে দেখলাম সাদার দল কালোকে দাবিয়ে রাখতে চায়। এখানকার সাদারা কালোদের বোধ হয় পিঁপড়েদের মত হত্যা করত, কিন্তু সেরূপ হত্যা না করার একমাত্র কারণ হলো কালোদের গরু ছাগলের মত যদি ব্যবহার করতে পারে, তবে কালোদের মৃত্যুতে সাদাদের শুধু ক্ষতিই হবে।

শহরে ফেরবার সময় লক্ষ্য করে দেখলাম, যতদূর দেখা যায় কোথাও কোন বসতি নেই। আছে শুধু পার্বত্যভূমি আর তারই ওপর স্থানে স্থানে সুন্দর সাজানো বাগান। বাগানে যে সকল মজুর কাজ করে তারা কেনা গোলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনত দক্ষিণ আফ্রিকাতে দাস প্রথা নেই, আমাদের দেশেও নেই, কিন্তু মজুরদের এমনিভাবে ঋণ দায়ে আবদ্ধ করা হয়েছে যে, মনে হল দাস প্রথা বর্তমান ঋণজাল হতে সহস্র গুণে ভাল।

পথে ইউরোপীয় পাড়া পড়ল। পার্কে যত বোর্ড আছে, তার প্রত্যেকটাতে লেখা "ওনলি ফর ইউরোপীয়ান" শুধু ইউরোপীয়ানদের জন্য। পথের মাঝে জলের কল আছে, তাতেও লেখা রয়েছে এই কলে হাত দিও না; এটা ইউরোপীয়দের জন্য। যেখানে যাও সর্বত্র ইউরোপীয়দের জন্য সবই রক্ষিত। আমি পথে কোথাও দাঁড়ালাম না, বরাবর নাইডু পরিবারের বাড়িতে চলে এলাম। মিঃ নাইডু লম্বা গোঁফে তা দিয়ে তাঁর বাবু ধরণের এক-ঘোড়ার গাড়িটাকে নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করছিলেন। আমাকে দেখে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। মিঃ নাইডু বোধ হয় মদের দোকান হতে ফিরছিলেন,—তাঁর মুখ হতে গন্ধ বের হয়ে আসছিল। দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইণ্ডিয়ানরা ইউরোপীয় মদের দোকানে মদ খেতে পারে না। সেজন্যই তাকে ছাব্বিশ মাইল দূরে একটা দোয়াসলা'র দোকানে গিয়ে মদ খেয়ে আসতে হয়।

ঘরে গিয়ে দেখলাম, নাইডু গিন্নী টেবিল সাজিয়ে বসে আছেন। মাংস, সব্জি, উত্তম ভাত, দই, ফল সবই টেবিলে সাজান। মিঃ নাইডু পকেট হতে একটি হুইস্কি বোতল বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। নাইডু গিন্নী তা দেখে একটু চোখ ঘুরিয়ে আবার সাম্যভাব ধারণ করলেন। আমার দৃষ্টি হতে তা বাদ পড়েনি। আমি উপস্থিত

নিগ্রো মা ও ছেলে

ছিলাম বলেই বোধ হয় ঝগড়া বাধেনি, অন্যথায় কি হত বলতে পারি না। দেখলাম মিঃ নাইডু স্ত্রীকে বেশ ভয় করেই চলেন। এখানে ইউরোপীয় সভ্যতা তাঁদের পরিবারে পুরোপুরিভাবেই মেনে চলা হচ্ছে।

মিঃ নাইডু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভ্য নন, তিনি কলোনিয়েল বর্ন এবং ইণ্ডিয়ান সেটেলার্স এসোসিয়েশনের সভ্য, সেই জন্যই তিনি সভাতে যোগ দেন নি। তাঁর ছেলেরা সেই সভাতে উপস্থিত হতে পারেনি বলে বড় ছেলেটি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। সে কতকগুলি কথা বলল, যা আমার মনে বেশ একটা বড় দাগ কেটে দিয়েছিল। সে দাগটি আমার মন হতে এ জীবনে মুছবে না।

খাবারের টেবিলের কথা, প্রায়ই মিথ্যা হয় না। খেতে বসে মিথ্যা কথা বলতে নেই। এটাই হল নাইডু পরিবারের নিয়ম। মাস্টার নাইডু যা বলেছিলেন সেই কথাগুলি অন্যের কাছ হতেও শুনেছিলাম। মাস্টার নাইডু বলে যাচ্ছিলেন আর আমি শুনছিলাম। মিঃ নাইডু দেখলেন আমি তাঁর ছেলের মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছি, কিছুই খাচ্ছি না, তখন তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, এ ভদ্রলোক নতুন লোক, কেন তাঁকে এসব কথা বলে মনে কষ্ট দিচ্ছ এখন খেতে দাও। মিঃ নাইডুকে লক্ষ্য করে বললাম খাওয়াটা আমি সকল সময়ই পছন্দ করি, তা বলে আপনার ছেলে যা বলছেন, আমার মনে হয়, আমার খাবার চেয়েও এটা বড়। মাস্টার নাইডু যা বলেছিলেন, তা বারান্তরে উল্লেখ করব। আমরা ঘরে বসে সময় না কাটিয়ে তাঁদেরই মটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মটর চলছে। শীতে শরীর ঠক ঠক করছে। নাইডু পরিবারের নিজস্ব তৈরী দ্রাক্ষারস ফ্লাস্ক হতে বের করে কাপে কাপে খাচ্ছিলাম। মাস্টার নাইডু তিন ঘণ্টা পুরা বেগে মটর চালিয়ে আমাকে একটি গ্রামে পেঁছে দিলেন। সেই গ্রামে শুধু নিগ্রো মজুরেরাই থাকে। এখানে একটা কথা পরিস্কার করে বলতে চাই নতুবা আমার সমূহ বিপদ হতে পারে। জুলু, হটেনটট, সোয়াজী এবং অন্যান্য জাতের লোক যাদের চুল উলের মত তাদের সবাইকে আমি নিগ্রো বলব। ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি আমি মানব না। কতকগুলি বোকা নিগ্রো আছে তারা নিজেদের নিগ্রো বলতে রাজি নয়, যেমন জুলু। মাইনরিটি কনসেসন যদি তারা পেত তবে না হয় তাদের আমি নিগ্রো না বলে জুলুই বলতাম, কিন্তু তারা তাও পায় না। ইউরোপীয় লেখকগণ নিগ্রোদের একটু পৃথক করে রাখতে চান সেজন্যই কথাটা সংক্ষেপে বললাম। তারপর এর মাঝে আরও বিষয়বস্তু আছে যা এখানে বলা দরকার মনে করলাম না। গ্রাম ছোট। কয়েকখানা ঘর মাত্র। ঘরগুলি লম্বা। এতেই ত্রিশ হতে চল্লিশজন স্ত্রী-পুরুষ বাস করে। এরা সবাই সভ্য। এদের মাঝে অনেকেই বর্তমান সময়ের পলিটিক্স ভাল করেই বুঝে। বই এবং সংবাদপত্র পাঠ করতে পারে। কিন্তু এদের দাস জীবন বড়ই কষ্টের। ভারতের মজুর যেমন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে অসহ্য যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করে যায়, এখানকার শক্তিমান মজুর মদের কৃপায় কাবু হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'নিগ্রো' ওয়াইন তাড়ির মতই একটা জিনিস।

এরা সকাল বেলা কাজে যাবার সময় ভুট্টার আটা সিদ্ধ করে নুন দিয়ে খেয়ে কর্মস্থলে হাজির হয়। দ্বিপ্রহরে তাদের এক প্রকার তরল জিনিস খেতে দেওয়া হয়, তাতেও প্রায় দশ পারসেণ্ট এলকোহল থাকে। এই খেয়ে যখন তারা জমির কাজে লেগে যায়, তখন কাজ করে হাতীর শক্তি নিয়ে, বিকাল বেলা আবার ঐ আটা সিদ্ধ আর দুটুকরা মাংস। এতে করে নিগ্রো মজুরগণ চল্লিশ বৎসরের মাঝেই হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যায়। এদের মরার জন্য কেউ দায়ী হয় না। দ্বিপ্রহরে মাদকপূর্ণ তরল পদার্থ না খাওয়ার জন্য মাস্টার নাইডু রাত্রের বেলা যতদূর পারেন মজুরদের বুঝান এবং অনেকদিন গভীর রাত্রে ফিরে আসেন।

মজুরদের এরূপ সর্বনাশা জীবনযাপন দেখে আমার মন কেঁপে উঠল। ভাবলাম এই পৃথিবীতে টাকার জন্য ধনীর দল না করতে পারে এমন কাজ নেই। মানুষের মাঝে রং-এর বিভেদ আচার ব্যবহারে পার্থক্য, ধর্মের বিভিন্নতা এসব হল ধনীদের অস্ত্র। এদের হাত হতে এসব অস্ত্র কখন চলে যাবে তাই ভাবছিলাম ফেরবার বেলা গাড়িতে বসে।

পরদিন সকাল বেলাই প্রিটোরিয়ার দিকে রওয়ানা হলাম। ইণ্ডিয়ানদের দোকানের সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমি চলছিলাম সদর রাস্তার ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে। ইণ্ডিয়ানরা কখনও সাইকেল পথের মাধ্যস্থল দিয়ে চালাতে পারে না। তাদের সাইকেল চালাতে হয় গলির ভেতরে। সদররাস্তায় ইণ্ডিয়ানরা বাইসাইকেল নিয়ে আসলেই বয়স্ক যুবকগণ তাদের ওপর ঢিল ছোড়ে। আমার ওপর যাতে কেউ ঢিল না ছোড়ে সেজন্য একজন মুসলমান এসে আমার সামনে দাঁড়াল এবং বলল, একটু ঘুরে গেলে বিপদ নাও হতে পারে। আমি তাকে বললাম, এরূপ বিপদকে আমি বিপদ বলে গণ্য করি না, আমাকে যদি একটা সাদাছেলে ঢিল ছোড়ে আমি তার ওপর তিনটা ঢিল ছুড়ব, আপনারা এরূপ করে দেখুন আর কখনও বিপদ হবে না। এই কথাটা বলেই কয়েকটি নুড়ি পাথর পকেটে রেখে বের হয়ে পড়লাম। এই শহরেই শুধু এরূপ হয় শুনলাম, অন্যত্র কেউ আমাকে এরূপ ভাবে সাবধান করে দেয়নি। সুখের বিষয় কোন সাদা ছেলে আমার ওপর ঢিল ছোড়েনি। তারা বোধ হয় টের পেয়েছিল, এ লোকটা অন্য প্রকৃতির, একা হলে কি হবে।

বান্দিয়ারকর আজ আমাকে পেঁছিতে হবে। গন্তব্য স্থলে পেঁছিতে কত সময় লাগবে তা আমার জানা ছিল না, তবে ছাব্বিশ মাইল যেতে হবে তা জানতাম। পথ ভালই। দুদিক পরিষ্কার। যতদূর দেখতে পাওয়া যায় ততদূর শুধু সুন্দর সবুজ ঘাস আর ঢেউ খেলান পাহাড়। পথের সৌন্দর্য দেখে পথ চলছিলাম। কোথাও কোনরূপ হিংস্র জীব দেখব বলে আশা করিনি, কিন্তু পনর মাইল চলার পর একখানা ছোট বুয়র গ্রামে এসে একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হল। তাই গ্রামের একমাত্র হোটেল, রেস্টটুরেণ্ট এবং মুদির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকানের বাইরে বসবার জন্য কয়েকখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, তারই একখানার পাশে সাইকেলখানা দাঁড় করিয়ে বেঞ্চে এসে বসলাম। দোকানে কয়েকজন লোকই ছিল। তারা সবাই আমার দিকে তাকাতেই আমি দাঁড়িয়ে বললাম, বন্ধুগণ আমাকে আপনারা বিদেশী বলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি একজন ভূপর্যটক। আমার কথা শুনে দোকানী বলল, আমরা আপনাকে পেয়ে বড়ই সুখী হয়েছি সত্য কথা; কিন্তু আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি এই বেঞ্চগুলিতে বসতে পারবেন না। বুঝলাম আমি সাদা নই সেজন্যই এরূপ ব্যবস্থা। আমি বললাম, এই বেঞ্চগুলি কি ক্রেতাদের বসবার জন্যই?

হাঁ।

আমি না হয় কিছু কিনব এবং বসব।

কিছু কিনলে কি হবে, আপনি ত ইউরোপীয় নন?

নিশ্চয়ই না, আমি একজন ইণ্ডিয়ান।

অহো, কুলি যে!

না হে কুলি নই, ইউরোপীয়দের পিতৃপুরুষ।

কথা আর বেশি হল না। বেশি কথা হলেই তখন হাতে কথা বলতে হত। আমি একা আর এরা বহু। তাই গম্ভীরভাবে একটা বেঞ্চ লাথি মেরে উলটিয়ে দিয়ে সাইকেলে এসে বসলাম। আমি সামনে এগিয়ে চললাম আর এরা পেছনে থেকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবছিল তারাই জানে। তবে লক্ষ্য করেছিলাম, এদের মাঝে অনেকেই আমাকে আক্রমণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। মুদি শ্রেণীর লোক সকল সময়ই হিংসুক হয়, যখনই মুদিশ্রেণী লোকের জনবল এবং অস্ত্রবল হয় তখনই তারা হয় রাষ্ট্র পরিচালক। তখন তারা স্বদেশে বিদেশে সমান ভাবে শাসন এবং শোষণ করতে থাকে। মুদিবৃত্তিই হল জনসমাজের উন্নতির পরিপন্থী।

এখান থেকেই পথটা একটু উঁচু নীচু মনে হতে লাগল। দুদিকেই একটু একটু জংগল পেতে লাগলাম। জংলী মোরগ এবং তিতির পাখী আমার সাড়া পেয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে পালিয়ে যেতে লাগল। এক এক দলে দুতিনটি করে নগ্ন নিগ্রো রমণী আমাকে দেখতে পেয়ে ঝোপে ডুব দিতে লাগল। বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকায় এরূপ নগ্ন রমণীরা কিন্তু পালিয়ে যেত না, তারা দাঁড়াত, সিগারেট চাইত, কথা বলত। আমি এরূপ অসহায় রমণীদের দিকে কখনও হাসিমুখে চাইতাম না। উগ্রমূর্তি দেখে বোধ হয় সুখীই হত। অনেক সময় দাঁড়াত তারপর পালিয়ে যেত।

...ার পর আমার সে ভাব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শুধু ভাবতাম ...দের নগ্নতা কি করে দূর করা যেতে পারে।

চারিদিকে কোথাও মানুষের থাকবার ঘর দেখছি না, অথচ ...দের মেয়ে কোথা হতে আসে আর কোথায় যায় তাই নিয়ে ...নেক সময় মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারিনি।

আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একখানা ইউরোপীয় ধরণের বড় গ্রাম ...খতে পেলাম। এ গ্রামে ইণ্ডিয়ান নেই তা আমার জানা ছিল। ...বিশ্রামের পর গ্রামে যেতে মন আপনি নেচে ওঠে, কিন্তু এ গ্রামে ...য়ে আমি কোথায় থাকব? আমাকে এ গ্রামের লোক মানুষ বলে ...বে না একথা আমি জানতাম। সেজন্যই গ্রামে না গিয়ে বাইরে ...থাও থাকতে পারি কি না তার চেষ্টা করতে লাগলাম।

তখনও গ্রামে পৌঁছিনি। পথটা দুভাগে বিভাগ হয়ে গেছে। এক পাশে একটা পেট্রোল পাম্প। পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক। লোকটি আমাকে দেখেই ডাকল। সে যে ইংরেজি ভাষা বলল, সেরূপ ইংরেজি ভাষা মধ্য ইউরোপের লোক বলে থাকে তা আমার জানা ছিল। আমি তার কাছে দাঁড়ালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইউরোপ হতে এসেছেন?

নিশ্চয়ই বন্ধু, নতুবা ডাকতাম না; আপনি যাবেন কোথায়? এই ত কাছেই গ্রামে।

সেখানে ত আপনাকে কেউ থাকতে দেবে না।

তা আমি জানি।

আজ এখানেই থাকুন না?

আচ্ছা তাই হবে।

(ক্রমশ)

লটারি

(৩৪৬ পৃষ্ঠার পর)

...মূর্তির বর্ণনা শুনিয়াছিল, এ মূর্তিও ঠিক সেইরূপ। মহাদেব ...স্থির, ধীর ও গম্ভীর। মোক্ষদা ক্ষমা চাহিতেই মহাদেব গর্জন ...করিয়া উঠিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর ঠিক মেঘের ডাকের মত, তেমনি ...গম্ভীর এবং তেমনি ভীতিপ্রদ। তাঁহার কপালের চোখ দিয়া ...যেন আগুন বাহির হইতেছিল। মহাদেব মোক্ষদাকে লক্ষ্য করিয়া ...তাঁহার ত্রিশূল উদ্যত করিলেন। মোক্ষদার চোখের সামনে সহস্র ...বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ভয়ে মোক্ষদা চোখ বুজিল।

মোক্ষদার চীৎকারে সকলে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে ভৈরবকে বলিল, তাহার যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার আর কিছু প্রয়োজন নাই এখন একবার মাত্র জমিদারবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করিতে পারে। ভৈরব ভবতারণবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া মোক্ষদার শেষ অনুরোধ জানাইল। ভবতারণবাবু তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, ভৈরবের ভাঙা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোক্ষদা তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, তাঁহার দয়াতেই মোক্ষদা লটারির অত টাকা পাইয়াছে এবং তাঁহার দয়াতেই আজ সে অত সুখী। তাহার একটি অনুরোধ যেন জমিদারবাবু রাখেন। ভবতারণবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবুও মোক্ষদাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহার অনুরোধ রাখিবেন। মোক্ষদা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, তিনি যেন তাহার টাকা হইতেই মহাদেবের পূজা দেন, খরচের জন্য কিছু ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তাহার তো টাকার অভাব নাই। ভবতারণবাবুর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কোনমতে বলিলেন, পূজার ব্যবস্থা তিনি সবই করিবেন, মোক্ষদার চিন্তার কোন কারণ নাই।

মৃত ব্যক্তিকে নূতন কাপড় পরাইয়া দিতে হয়। কিন্তু ভৈরবের ঘরে নূতন কাপড় নাই, বাজার হইতে কিনিবে, সে সংস্থানও নাই। ভবতারণবাবু দুইটি টাকা ও খানিকটা তেল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রক্ষা নতুবা ভৈরবের পক্ষে মোক্ষদার সৎকার করা খুব কঠিন হইত। মোক্ষদার গায়ে ঢাকা দিবার জন্য কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি ছেঁড়া পাওয়া গেল। তাহার এক প্রান্তে বাঁধা কি যেন একটা ভৈরবের হাতে ঠেকিল। ভৈরব খুলিয়া দেখিল, গোটা কয়েক শুষ্ক ফুল ও বেলপাতার সঙ্গে একখানি ছোট কাগজ সযত্নে ভাঁজ করা রহিয়াছে। আলোর কাছে ধরিতেই ভৈরব বুঝিতে পারিল, কাগজখানি সেই লটারির টাকার রসিদ; বহুদিনের নাড়াচাড়ায় ভাঁজের জায়গাগুলি ছিঁড়িয়া আসিয়াছে এবং গোটা কাগজখানি হাতের ময়লায় মলিন ও বিবর্ণ। ভৈরব রসিদখানি হাতে করিয়া শ্মশানে আসিল।

মোক্ষদার দেহ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন পূর্বদিগন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ভৈরব ধীরে ধীরে মোক্ষদার ভাগ্যবিপর্যয়ের নিষ্ঠুর পত্রখানি তাহারই চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিল।

৫

"সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ"

[শ্রীযুক্ত অমল হোমের প্রতিবাদ-উত্তরে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর প্রত্যুত্তর]

মাননীয় 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীযুক্ত অমল হোম-এর অপরিমেয় নীচাশয়তার দুইখানি নমুনা-মাত্র তাঁহার প্রতিবাদের উত্তরে 'দেশ' পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছিলাম; হোম মহাশয় গত সংখ্যার "দেশে" প্রকাশিত তাঁহার প্রত্যুত্তরে আরও নমুনা দিয়াছেন। একেবারে 'খেউড়ে' নামিয়াছেন। আমি দিয়াছিলাম যুক্তি-তর্ক, হোম মহাশয় তদুত্তরে যাহা দিয়াছেন তাহাতে মেছোহাটার মেছুনীরাও লজ্জা পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, আমি বঙ্গবাসী কলেজের "আধা অধ্যাপক", কারণ দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা পড়াই না। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' 'অপদস্থ এডিটর' ও শ্রমিক আন্দোলনের 'পেশাদার'। হোম মহাশয় খিস্তী করিবার সময় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রকারে আমাকে বর্ণনা করিয়া তিনি অজ্ঞাতসারে আমার বহু প্রসারিণী কর্মশক্তিরই প্রশংসা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জঘন্য মনোবৃত্তিরও সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার 'অপদস্থ এডিটর' কেমন করিয়া হইলাম তাহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বভাবসুলভ মিথ্যাতে অনুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বহু লোকে জানে এবং তিনিও জানেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার ঘোষিত সম্পাদকের পদ আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কিশোরীলাল ঘোষও একই কারণে আমার সহিত পদত্যাগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক আহূত হইয়া 'ফরওয়ার্ডের' সম্পাদকের ভার গ্রহণ করি। যে কারণে পত্রিকার সম্পাদকের পদ ছাড়িয়াছিলাম, অনুরূপ কারণেই এক বছর পরে 'ফরওয়ার্ডের' সম্পাদকের কাজ পরিত্যাগ করি। হোম মহাশয় সে কারণের মর্যাদা না বুঝিতে পারেন, কারণ ৯৫জন কাউন্সিলার ও অলডারম্যানের পদে বহু বৎসর যাবৎ তৈল মর্দন করিয়া আত্মসম্মান বলিয়া কোন বালাই তাঁহার চরিত্রে নাই। তাহা যে আর কাহারও থাকিতে পারে, বিশেষত সাংবাদিকের, সে জ্ঞান তাঁহার থাকিলে তিনি আমাকে অপদস্থ এডিটর বলিতেন না, প্রখর আত্মসম্মান বিশিষ্ট সাংবাদিক বলিতেন। বঙ্গবাসী কলেজে আধা-অধ্যাপক কেন, ঘণ্টার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন যাবৎ "সিকি অধ্যাপক" ছিলাম। তাহাতে অগৌরবের কিছু দেখি না। গত ২৫ বৎসর যাবৎ শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। বহু শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছি। শুধু বাঙলায়ই নহে, বাঙলার বাহিরেও সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছি। হোম মহাশয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন; অবশ্য 'Grapes are sour', তাঁহার সে ক্ষমতা নাই তাহা বলিয়া, না শুধু শ্রমিকের হিতার্থে!

হোম মহাশয়ের আমার উপর বহু দিন যাবৎ আক্রোশ আছে জানি। তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনে এবং অধুনা 'দেশ'এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের" প্রত্যুত্তর পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাংবাদিক মহলে, বিশ্ব-ভারতীতে ও রবিবাসরের সভ্যদের সকাশে প্রেরণে। হোম মহাশয় ইহার কোনটাই অযথার্থ বলেন নাই। বরং আক্রোশের আরও পরিচয় দিয়াছেন, যাহার বিষয় আমিও জানিতাম না। তিনি নাকি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার মধ্যে ভোটযুদ্ধে সুরেশবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার মত 'পেশাদার' শ্রমিক নেতা না হইয়াও তিনি শ্রমিক ভোট-যুদ্ধে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে 'ক্যানভাস' করিয়াছিলেন (বা দালালী করিয়া-ছিলেন)। হোম মহাশয়ের লেখনী মুখে আমার প্রতি তাঁহার গভীর "অনুরাগের" এই আর একটি পরিচয় পাইয়া বাধিত হইলাম। এই অনুরাগ আমি কি করিয়া অর্জন করিয়াছি, তাহা জানি না। কবে তাঁহার 'পাকা ধানে মই' দিয়াছি মনে পড়িতেছে না। মনে করাইয়া দিলে বাধিত হইব।

কলিকাতায় নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনে আমার উদ্যোগে সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণীয় বিষয় করিবার জন্য যে প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল, তাহা 'দুই ভোটে' (এ কথাটি হোম মহাশয় চাপিয়া গিয়াছেন) পরিত্যক্ত হয়। হোম মহাশয় তাঁহার এই কীর্তির জন্য গর্ব অনুভব করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইলে আমি অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত হইতাম তাহাতে হোম মহাশয়ের সন্দেহ নাই এবং আমার সে মনোরথ তিনি ব্যর্থ করিতে পারিয়াছেন এ জন্য তিনি পুলকিত। কতকগুলি বিষয় এই প্রসঙ্গে তিনি চাপিয়া গিয়াছেন, তাহা 'দেশের' পাঠকদের স্মৃতিপথে আনিতেছি। সম্মেলনের সভাপতি সাংবাদিক শিরোমণি মিঃ চিন্তামণি (তখন তিনি স্যার হন নাই) তাঁহার অভি-ভাষণে সাংবাদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরেও ভারতের অন্যান্য স্থানে বক্তৃতায় তাঁহার এই অভিমতের পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। যে রবীন্দ্র-নাথের নাম ভাঙ্গাইয়া হোম মহাশয় চিরকাল খাইয়াছেন, কবির পরম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রস্তাবের একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং কলিকাতা অধিবেশনের পরে সাংবাদিক সভায় ও সাধারণ সভায়, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউতে' তাঁহার ঐ অভিমত সবিস্তারে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হোম মহাশয় তাহাতে গালি পাড়িতেছেন না কেন? ধর্মে বাধিতেছে নাকি? 'Bombay Chronicle'এর ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং 'Bombay Sentinel'এর বর্তমান সম্পাদক মিঃ হর্নিম্যানও আমার প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে 'Press and Arts Club of India'র অধিবেশনে মিঃ হর্নিম্যান বলিয়াছিলেন:

"The training for those seeking to enter the profession of Journalism must be provided by the universities in the country." আরও বলিয়াছিলেন: "Training in the university would give a status to the profession and improve the efficiency of Journalism from an intellectual point of view."

১৯৩৬ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে 'South Arcot Journalists' Association-এর এক অধিবেশনে আন্নামালাই ইউনিভার্সিটীর তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত তৎসাপক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সাংবাদিক জগতে যাঁহাদের কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই (অবশ্য শ্রীযুক্ত অমল হোম ছাড়া) সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। হোম মহাশয় ভোটের কথা তুলিয়াছেন ভোটের লিস্ট আমার কাছে আছে, যদি একবার আসেন দেখাইতে পারি। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন প্রধান প্রধান সাংবাদিক সকলেই বিপক্ষে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা কোনদিন সাংবাদিকতার ধার ধারেন নাই।

হোম মহাশয় লিখিয়াছেন আমি একটি চতুষ্পদ জন্তু রবীন্দ্রনাথের শালীনতার উপাসক হোম মহাশয় ছাড়া এমন সুরুচি

...য়া আর কে দিতে পারিত? কিষ্কিন্ধ্যার জীব বিশেষের মতো দন্ত ... বিকাশ করিয়া আমাকে অজস্র গালাগালি দিয়া হোম মহাশয়ের ক্রোধ মিটে নাই। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার পাঠকদের উপরও ... লইয়াছেন। তাঁহারা কেন মিউনিসিপ্যাল গেজেট না ... প্রত্যহ আমার লেখা পড়েন? তাঁহারা কি বঙ্গবাসী কলেজের ... হোম মহাশয়ের ক্রোধের কারণ আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই "শ্বেত হস্তী" পুষিতে মাসে মাসে তিন হাজার টাকা ... করিয়া থাকেন। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাদের সাহায্য... লাইব্রেরীগুলিকে বাৎসরিক ৪৲ চার টাকা চাঁদা দিয়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট কিনিতে বাধ্য করান। যদি মিউনিসিপ্যাল গেজেট লোকে পয়সা দিয়া কিনিত, তাহা হইলে কি হোম মহাশয়ের ৯৫×২=১৯০টি পদে তৈল সিক্ত করিতে হইত? আজ কলিকাতা কর্পোরেশন ধাঙগড়দিগের মাগ্গীভাতা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের দ্বারে ভিক্ষার্থী। কলিকাতার করদাতারা শহরের আবর্জনা ... আর ভিখারী কর্পোরেশনের ভাতায় পরিপুষ্ট ... গিরিডির "হোম ভিলা" হইতে পূতিগন্ধ বিকিরণ ... শহরবাসীকে মিউনিসিপ্যাল গেজেট মারফৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা ...রেছেন!

হোম মহাশয় সম্পাদিত মিউনিসিপ্যাল গেজেট হইতেই উদ্ধৃত ... তাহার উক্তি খণ্ডন করিয়াছি বলিয়া তিনি বেসামাল হইয়া ... হইবারই কথা। "তোর শিল, তোরই নোড়া; তোরই ... দাঁতের গোড়া।" এইরকমভাবে তাঁহার "দাঁতের গোড়া" ... তিনি ভাবেন নাই। আবার ধরা পড়িয়াছেন যে, নিজের ... কাগজে কি বাহির হয় জানেন না। মনিবেরা বলিবে কি?

হোম মহাশয়ের প্রত্যুত্তর ইতরজনোচিত গালাগালিতে ভরপুর। ... প্রবন্ধ "সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের" সহিত তাঁহার এই গালি... প্রাসঙ্গিকতা কি তাহা দেশের পাঠকগণই বিচার করিবেন। ... ও চন্দ্রনাথ বসুর যে কাহিনী আমি সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে হোম মহাশয় লিখিয়াছেন ... "স্মৃতি ভ্রংশ" হইয়াছে এবং কিছুদিন পাগল লইয়া ... "স্মৃতি ভ্রংশ" হইয়াছে এবং কিছুদিন পাগল লইয়া "...." করিয়াছিলেন এ কারণ "হয়ত মৃণালবাবুকে ক্ষেপাইয়া ... দেখিতেছেন।" এই ধৃষ্টতার উত্তর কি দিব? ইহার উত্তর ভাষায় হয় না। হয় তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম করিয়া। এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অমলচন্দ্র হোম হরনাথ বসুর জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য লোক নহেন।

সাংবাদিক মসীযুদ্ধে বা Journalistic Controversyতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতার উল্লেখ করিতে যাইয়া স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'সবুজ পত্র' ও 'নারায়ণের' মারফতে যে মসীযুদ্ধ হইয়াছিল আমার প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। অমল হোম মহাশয় 'নারায়ণে' প্রকাশিত বিপিন বাবুর 'মৃণালের পত্র' ও 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ "বাস্তব" ও "লোকহিতের" পরস্পর সম্বন্ধ নাই জোর গলায় বলায় আমি হোম মহাশয়ের সম্পাদিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাই যে উহাদের সম্বন্ধ আছে। হোম মহাশয় মিউনিসিপ্যাল গেজেট হইতে আরও খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, সম্বন্ধ নাই। তিনি বোধ হয় স্থির করিয়াছেন, "দেশের" পাঠকদের ইংরেজী জ্ঞান নাই, সাধারণ বুদ্ধিও নাই। তাঁহারাই দেখিবেন যে, হোম মহাশয়ের সমগ্র উদ্ধৃত অংশ হইতে আমারই কথার যথার্থতা প্রমাণ হয়। বাহাদুরী করিয়া যে কয়েকটি পংক্তির নীচেয় তিনি লাইন টানিয়াছেন তাহাতেই আছে, "It (স্ত্রীর পত্র) creates a furore and Bepin Chandra Pal caricatures the story by writing in the Narayan (মৃণালের পত্র)।" "মৃণালের পত্র" বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকেন নাই। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ 'বাস্তব' ও 'লোকহিতে' তিনি উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন।

হোম মহাশয়ের মতো সাংবাদিকের সহিত মসীযুদ্ধ করিয়া জয়লাভে আমার কোনো গৌরব নাই ইহা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি। এই মসীযুদ্ধ আমি আরম্ভ করি নাই। এতদূর পর্যন্ত ইহা চালাইতে হইয়াছে তাহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ইহার পর তাঁহার সহিত আর বাদানুবাদ চালাইতে ইচ্ছা করি না। আমার সে সময় নাই, প্রবৃত্তিও নাই। ইতি—

৪৬ সাউদার্ন পার্ক
বালীগঞ্জ
২৩শে পৌষ, ১৩৮৯

ভবদীয়
শ্রীমৃণালকান্তি বসু

সম্পাদকের মন্তব্য

সংবাদপত্রে বাকবিতণ্ডা প্রকাশের প্রচলিত রীতি অনুসারে, আমরা মৃণালবাবুর এই পত্র অমলহোম মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম,—যদি তাঁহার কোন বক্তব্য থাকে তবে তাহা লিখিয়া দিয়া এই বিতর্কের অবসান করিবার জন্য। অমলবাবু মৃণালবাবুর এই পত্রের কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া আমাদের জানাইয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা তিনি তাঁহার শেষ পত্রেই বলিয়া শেষ করিয়াছেন, তাহার অধিক তাঁহার আর কিছু বলিবার নাই।

অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন পত্র ছাপা হইবে না।

—সম্পাদক, "দেশ"

জাগৃহি

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

হে বৃহন্নলা, আর কতো রাত চলবে নাচ ?
আর কতো বলো নপুংস বেশে কাটাবে কাল ?
গাণ্ডবী তুমি কতোকাল রবে মুরলীধর ?
বিরাট রাজার অনায়াস-পাওয়া অন্ন-পান
আর কবে হবে বিষাক্ত বিষ ?—জাগৃহি।

কান পেতে শোনো বহু দূরে বাজে তূর্যনাদ।
সারা গো-গৃহে কুরু সৈন্যের হুহুংকার।
আশ্রয়দাতা করে হাহাকার। সর্বনাশ।
হে জিষ্ণু, খোলো পায়ের নূপুর। দাও সাড়া।
দূরে ফেলো হীন নপুংস বেশ।—জাগৃহি।

তবুও নীরব ? আরাম শয্যা ? নাচের বেশ ?
ভাঙবে নূপুর—হুঁসিয়ার হও—কাটবে তাল—
দুষ্ট কীচক আছে এর পরে—কৃষ্ণা কই ?
ধর্মরাজের ললাট-রক্তে অন্ন-ঋণ
শুধ্‌তে কি চাও গাণ্ডীবধারী ?—জাগৃহি।

শমী বৃক্ষের কোটরে ঘুমায় দিব্যায়ুধ।
পাশুপত আজো নীরবে ফেলিছে অশ্রুজল।
গাণ্ডীব কাঁদে শমীশাখে ঃ কোথা ধনঞ্জয় ?
সাড়া দাও আজ। পরো নববেশ পার্থবীর।
বৃহন্নলার হোক অবসান।—জাগৃহি।

অরণ্য রোদন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

কোথায় মোদের মিলন যে হবে চাও যদি তুমি জানতেই,
এর পরে কবে মিলব ?
নয়ক লেকের, নয় শহরের নির্জন কোনো প্রান্তেই—
ফের পরে যবে মিলব।
কোথায় মিলব ? ধরো যদি মিলি হাওড়া ব্রিজের মাঝটায়
ঘন জনতার স্রোতে ?
কিম্বা যেখানে হাজার হাজার মিনিটে মিনিটে আসে যায়—
হাওড়া শেয়ালদাতে ?
জনারণ্যের মতন এমন জনহীন আর ঠাঁই কই ?
কার চোখে আর পড়বে ?
হাজার মুখের ঢেউয়ের ওপরে ভাস্‌বে ও মুখ-পদ্মই—
শুধু মোর চোখ ভরবে।
হাজার মুখের মুখর ঢেউয়ের ওপরে দুল্‌বে ওই মুখ—
আর তার দোলা লেগে হায়,
হাজার মনের গহন স্রোতের তলায় দুল্‌বে এই বুক
কোন্ তরঙ্গ-দোল্‌নায় !
তুমি কি জানো যে এই লোকালয় এম্‌নিই হয় জনবিরল
তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে ?
এত ট্রাম্ বাস্—ঊর্ধশ্বাস ঘর্ঘর আর কোলাহল,
কোথায় পালায় আড়ালে।
জনারণ্যের মতন বল না এমন কী আর নির্জন ?
কার চোখ আর টান্‌বো ?
কানে কানে কথা বলার ছলায় করো যদি ভুলে চুম্বন,
তুমি আর আমি জানবো।

অব্যক্ত

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার

নির্বাক রহিলে তুমি রহস্যের মত
তোমাকে লইয়া তাই কথা এত শত;
সে বাকালহরী পুন মিলাইয়া যায়
তোমার গভীর মহাভাষাহীনতায়।
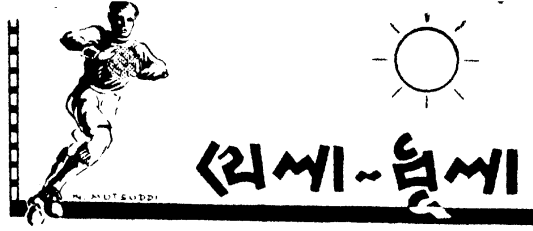
রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কোন্ দুইটি দল ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে প্রতিযোগিতায় যে কয়েকটি দল বর্তমান আছে, তাহাদের বিভিন্ন খেলার ফলাফল দেখিয়া যতদূর অনুমান হয়, তাহাতে বলা চলে যে, হোলকার ও বরোদা দলের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই দুইটি দলই বিভিন্ন খেলায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের খেলা

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলা শেষ হইয়াছে। এই অঞ্চলে হায়দরাবাদ দল বিজয়ী হইয়াছে। এই বিজয়ী দল প্রতিযোগিতার তাহারা খুবই খুসী হইবে। গত সোমবার বাঙলার ক্রিকেট বোর্ডের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সাব-কমিটি এই পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা বাঙলা দলকে ইন্দোরে পাঠাইতে পারেন, যদি হোলকার দল বাঙলা দলের যাতায়াতের খরচা বহন করেন। এই সামান্য বিষয়টি হোলকার দলকে বিব্রত করিবে মনে হয় না। ইন্দোরের মহারাজা যখন ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁহারা অনায়াসে এই সামান্য খরচ বহনে রাজি হইবেন। তাহা ছাড়া বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ সকল সময়ই বাহিরের দলের যাতায়াতের খরচ বহন করিয়াছেন। সুতরাং বাঙলা দলকে যাঁহারা লইবার জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহারা নিশ্চয়ই খরচ বহন করিতে আপত্তি করিতে পারেন না।

উত্তরাঞ্চলের মাত্র একটি খেলাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ খেলায় রাজপুতানা দল বিজয়ী হইয়াছে। উত্তর ভারত রাজ্য দল যদি শেষ পর্যন্ত না খেলে, তবে রাজপুতানা দল রণজি প্রতিযোগিতার সেমি-

বাটা স্পোর্টসে প্রদর্শিত "লোকাল" ড্রিলের দৃশ্য
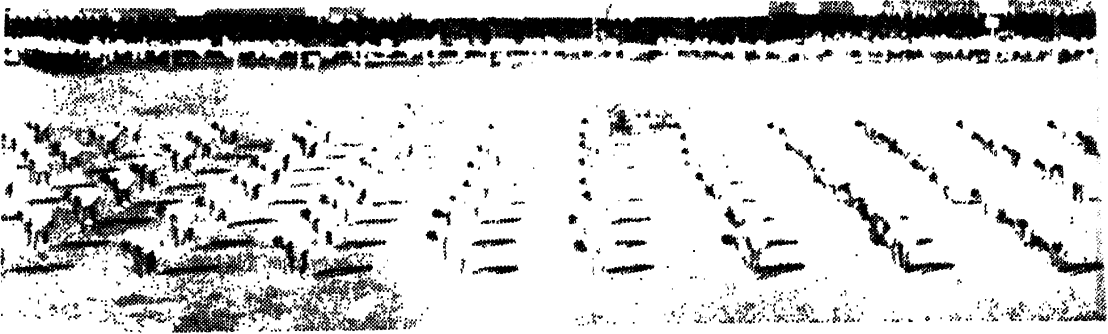
সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালের বাঙলা ও হোলকার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। পশ্চিমাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলা দুইটিই শেষ হইয়াছে। এই দুইটি খেলার একটি পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ও অপরটিতে বরোদা রাজ্য দল বিজয়ী হইয়াছে। এই দুইটি দল শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা অবশিষ্ট আছে। এই খেলায় বাঙলা ও হোলকারের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই খেলাটি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। বাঙলায় ক্রিকেট পরিচালকগণের ইচ্ছা ছিল, খেলাটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হোলকার দল সেমি-ফাইনালে যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার পূর্বে বাঙলার পরিচালকগণের নিকট আবেদন করে যে, তাহারা যদি খেলায় বিজয়ী হয় তবে পরবর্তী খেলায় তাহাদের বাঙলার দলের সহিত খেলিতে হইবে। হোলকার দল কয়েকবার মধ্য ভারত দল নামে কলিকাতায় বাঙলার বিরুদ্ধে খেলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এইবার বাঙলা দল ইন্দোরে খেলিলে ফাইনালে বরোদা ও পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিজয়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

বাঙলার খেলোয়াড়গণ

বাঙলার ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ কেন জানি না বিহার দলকে পরাজিত করিবার পর হইতে পরবর্তী খেলার জন্য বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন না। নিয়মিতভাবে "নেট্ প্র্যাক্টিস্" করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মাঠে খেলোয়াড়গণকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বাঙলা দলের ম্যানেজার শ্রীযুত বি সর্বাধিকারী সংবাদপত্র মারফৎ খেলোয়াড়গণকে নিয়মিতভাবে অনুশীলনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি খেলোয়াড়গণকে এইরূপ মনোভাবাপন্ন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রায়ই দেখা যায়, বাঙলার বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ নিজ নিজ ক্লাবের খেলায় যোগদান করিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন,—"এইজন্য দায়ী

পরিচালকগণ। তাঁহারা নাকি পরবর্তী খেলায় বাঙলার পক্ষে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় যোগদান করিবে, তাহার তালিকা প্রকাশিত করেন নাই।" এই উক্তির সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিবার সুযোগ থাকিলেও আমরা এই কথা জোরের সঙ্গেই বলিব যে, বাঙলা দলে বিহার দলের বিরুদ্ধে যাঁহারা খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পরবর্তী খেলায় যোগদানের অধিকার লাভ করিবেন। দলে যে পরিবর্তন হইবে, তাহাতে সকলের মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিবে না। বিহার দলকে সহজে পরাজিত করিয়া বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণের মনে যদি অহমিকা দেখা দিয়া থাকে ও তাঁহারা যদি ধারণা করিয়া থাকেন যে পরবর্তী খেলায় সহজেই বিজয়ী হইবেন, তাহা হইলে খুবই অন্যায় করিবেন। পরবর্তী খেলায় তাঁহাদের হোলকার দলের সহিত খেলিতে হইবে। এই দল বিহার দলের ন্যায় শক্তিহীন নহে। এই দলের অধিনায়ক নাইড়ু। প্রবীণ হইলেও এখনও উপযুক্ত ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যাটিং ও বোলিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম, যুক্তপ্রদেশ দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই দলে খেলিবেন মুস্তাক আলী, জগদ্দেল, জে এন ভায়া প্রভৃতি। ইঁহারাও প্রত্যেকে ভাল ব্যাটস্‌ম্যান। বিশেষ করিয়া মুস্তাক আলীকে বিব্রত করিতে পারেন এইরূপ বোলার বর্তমানে বাঙলা দলে নাই। বাঙলা দলের সুনাম রক্ষা করিতে হইলে এই সব স্মরণ রাখা বাঙলার প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উচিত। পূর্বে ঐ দলকে পরাজিত করা যত সহজ হইয়াছে, বর্তমানে সেইরূপ হইবে না। ইন্দোরে বাঙলার খেলোয়াড়গণকে ম্যাটিংয়ে খেলিতে হইবে। ম্যাটিংয়ে খেলা অভ্যাস না করিলে বিব্রত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের সুনাম বৃদ্ধি হউক—ইহাই আমাদের কামনা এবং সেইজন্যই বর্তমানে আমাদিগকে এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

হোলকার দলের কৃতিত্ব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় হোলকার দল যুক্তপ্রদেশ দলকে শোচনীয়ভাবে ৭ উইকেটে পরাজিত করিয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংসের বিরুদ্ধে মাত্র ১০৯ রানে হোলকার দলের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ায় কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই যে, পরবর্তী ইনিংসে হোলকার দল প্রথম ইনিংসের সকল গ্লানি দূর করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবেন। যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৮ রান করিলে হোলকার দল মোট ২৮০ রান পশ্চাতে পড়ে। ইহাতে হোলকার দলের জয়লাভের আশা সকলকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ধন্য হোলকার দলের খেলোয়াড়গণ ও ধন্য এই দলের অধিনায়কের দৃঢ়তা যে, এই শোচনীয় অবস্থা হইতে খেলার অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া এক রানে প্রথম উইকেট হারাইয়া কোনরূপ বিচলিত হইলেন না। হোলকার দলের মুস্তাক খেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযোগী একজন তরুণ খেলোয়াড় নাম ইয়াডে। মুস্তাক এই খেলোয়াড়কে লইয়া ৪৫ মিনিট খেলিয়া নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করিলেন। ৭৫ রানের সময় ইয়াডে আউট হইলেন। জাগদ্দেল খেলায় যোগদান করিলেন। খেলায় অদ্ভুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল। মধ্যাহ্নের সময় ২ উইকেটে ১৩১ রান হইল। ইহার পর খেলা আরম্ভ করিয়া মুস্তাক নিজস্ব শতাধিক রান পূর্ণ করিয়া আউট হইলেন। হোলকার দলের তৃতীয় উইকেটের পতন হইল ১৬৪ রানের সময়। মুস্তাক আউট হওয়ায় সকলেই হোলকার দলের পরাজয় কল্পনা করিতে লাগিলেন। দলের অধিনায়ক খেলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল হোলকার দলের ২০০ রান পূর্ণ হইয়াছে। চা-পানের সময় দেখা গেল যুক্তপ্রদেশ দলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সি কে নাইডু ও জাগদ্দেল হোলকার দলকে বিজয়ের পথে লইয়া চলিয়াছেন। হোলকার দলের ৩ উইকেটে ২৬৮ রান হইয়াছে। ইহার পর খেলা আরম্ভ করিয়া নাইডু ও জাগদ্দেলের পক্ষে ২৮২ রান পূর্ণ করিতে কষ্ট পাইতে হইল না। হোলকার দল ৭ উইকেটে বিজয়ী হইল। হোলকার দলের এই জয়লাভ মুস্তাক আলী, সি কে নাইডু ও জাগদ্দেলের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই পরিলক্ষিত হইয়াছে। হোলকার দলের এই সাফল্য প্রকৃতই প্রশংসনীয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

যুক্তপ্রদেশ প্রথম ইনিংসঃ—২১২ রান

(কিয়ামৎ হোসেন ৬৭, ফানসালকার ২৮, খাজা ৪১, হামিদ ২২; জাগদ্দেল ৪৭ রানে ৩টি, সি কে নাইডু ৬৮ রানে ৪টি সলিম খাঁ ৫২ রানে ২টি উইকেট পান)

হোলকার দলের প্রথম ইনিংসঃ—১০৯ রান

(কালে ২১, মুস্তাক আলী নট আউট ৬৬; আলেকজাণ্ডার ৫৫ রানে ৬টি, রামচন্দ্র ১৫ রানে ২টি, কিয়ামৎ হোসেন ২২ রানে ১টি ও পালিয়া ১৫ রানে ১টি উইকেট পান)

যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৭৮ রান

(ফানসালকার ৫০, খাজা ২০, ওয়াহেদুল্লা ৩২, হামিদ ৩৬; জাগদ্দেল ৬৫ রানে ৭টি, সি কে নাইডু ৫৯ রানে ১টি ও সলিম ৩৬ রানে ১টি উইকেট পান)

হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২৮২ রান

(মুস্তাক আলী ১১৩, জাগদ্দেল নট আউট ৭০, সি কে নাইডু নট আউট ৮১; আলেকজাণ্ডার ১৪ রানে ১টি, পালিয়া ৮২ রানে ২টি উইকেট পান)

হায়দরাবাদ দলের সাফল্য

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় হায়দরাবাদ দল ১৬২ রানে মহীশূর দলকে পরাজিত করিয়াছে। হায়দরাবাদ দলের নাইডু ব্যাটিং ও বোলিং এবং মহীশূর দলের গুরুদাচার ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

হায়দরাবাদ—প্রথম ইনিংসঃ—২৬০ রান

(মেটা ৪৮ রান, ভরতচাঁদ ৭৮; গুরুদাচার ৬৯ রানে ৬টি, দারাশা ৬১ রানে ১টি, বিজয়সারথী ৪৭ রানে ১টি উইকেট পান)

মহীশূর—প্রথম ইনিংসঃ—১৮৩ রান

(নাইডু ৬৮, গুরুদাচার ৫৬; গোলাম মহম্মদ ৪৫ রানে ৫টি, ভূপৎ ৭০ রানে ৩টি ও মেটা ২৪ রানে ২টি উইকেট পান)

হায়দরাবাদ—দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৫৩ রান

(আলঘর ২২, এম হোসেন ২৩; দারাশা ৪৪ রানে ৫টি, রমারাও ২২ রানে ৩টি, গুরুদাচার ৫৩ রানে ২টি উইকেট পান)

মহীশূর—দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৬৮ রান

(মেটা ১৮ রানে ৪টি, ভূপৎ ১৮ রানে ৪টি উইকেট পান)

৭ই জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, মধ্য ডন এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যেরা কয়েকটি জনপদ অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ ডন এলাকায় রুশ বাহিনী গতকল্য ত্রিশ হইতে ৫০ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এক স্থানে উহারা রোষ্টভ হইতে ৭৫ মাইল দূরে আছে। উত্তর ককেশাস অঞ্চলে রুশ অভিযান দ্রুত পরিচালিত হইতেছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—ফরাসী হেড কোয়ার্টার্স হইতে এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, আবহাওয়া ভাল হওয়ায় ফরাসী সৈন্যেরা দক্ষিণ লিবিয়ায় আবার অগ্রসর হইতেছে। স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ জেনারেল নেহারিং-এর স্থলে জেনারেল ফন আর্নিম টিউনিসিয়ার জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম—নয়াদিল্লীর এক সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, ৬ই জানুয়ারী বৃটিশ বিমান বহর রথিডং ও আকিয়াব অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে।

৮ই জানুয়ারী

মিত্রপক্ষীয় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নিউগিনির উপকূলবর্তী দরিয়ায় দুইখানি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ এবং ১৩খানি জঙ্গী বিমান ধ্বংস হইয়াছে। পাপুয়াস্থিত জাপ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

মেলবোর্নে সরকারীভাবে বলা হয় যে, নিউ-বৃটেন দ্বীপে নিউগিনি ও সলোমনের মধ্যে রাবাউলের উপর বিমান পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, সেখানে বিরাট জাপ নৌ-বহরে আরও জাহাজ আসিয়া যোগ দিয়াছে। রাবাউলে এত বেশী বাণিজ্যপোত আর কখনও সমবেত হয় নাই।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—গতকল্য এক্সিস বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ দাজাগ হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ফরাসী সৈন্যেরা এলারানেব দখল করিয়াছে।

৯ই জানুয়ারী

'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা বলেন যে, নিউ-বৃটেনের রাবাউলে জাপ নৌ-বহরের যে বিরাট সমাবেশ হইয়াছে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এরূপ বিরাট নৌ-সমাবেশ ইতিপূর্বে আর হয় নাই। প্রকাশ যে, রাবাউলে বিরাট জাপ নৌ-বহরের সমাবেশ হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ত্বরায় জাহাজ ও বিমান প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য মিঃ কার্টিনের বিমানযোগে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন যাত্রা করা উচিত। গত তিন মাস ধরিয়া সলোমন ও পাপুয়ায় উপর্যুপরি পরাজিত হওয়ার ফলে জাপান পুনরায় বিপুল উদ্যমে যুদ্ধ চালাইবার চেষ্টায় রতী হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ৮ই জানুয়ারী এক ভয়ানক যুদ্ধের পর সোভিয়েট সৈন্যেরা 'জিমভনিকি' শহর ও রেল স্টেশন দখল করে। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যেরা লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। এক স্থানে উহারা ৪০টি পরিখা দখল করে। উত্তর ককেশাস অঞ্চলে জার্মানগণ দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

ব্রহ্ম—ভারতীয় সমর বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়ঃ—আরাকান জেলায় কর্মতৎপর আমাদের সেনাবাহিনীর সহিত মায়ু নদীর উভয় তীরে মায়ু উপদ্বীপে ও রথিডং-এর নিকটে শত্রু বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। বৃটিশ বিমানবহর রথিডং, আকিয়াব প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক হানা দেয়।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—দক্ষিণ টিউনিসিয়া অঞ্চলে ফন্দুকের দক্ষিণে অবস্থিত ফরাসী ব্যূহ পরিবেষ্টনের জন্য ট্যাঙ্ক-বহরের সাহায্যপুষ্ট যে এক্সিস বাহিনী যত্নবান ছিল, ফরাসীরা তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে। জার্মানদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

১০ই জানুয়ারী

নিউগিনিস্থিত মিত্রপক্ষের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা একটি বিশেষ কনভয়যোগে সৈন্য আমদানী করিয়া লায়েস্থিত জাপ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। ফলে তাহাদের ১৩৩ খানি বিমান খোয়া যায়। নিউগিনি অভিযানের সমগ্র ইতিহাসে মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনীর হস্তে জাপানীদের এই পরাজয় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন ও অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী এ পর্যন্ত যত আকাশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর। এই যুদ্ধে জাপানীদের ১৪ হাজার টনের একটি সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার বহিঃসচিব ডাঃ ইভাট এক বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, জাপান অষ্ট্রেলিয়ার উপর নিশ্চয়ই প্রচণ্ডভাবে হানা দিবে; এই উদ্দেশ্যেই জাপান অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে বিরাট সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থার উন্নতি বিধান না করিয়া বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে মারাত্মক হইবে। জাপান কখনও নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, তাহার কর্মতৎপরতা বজায় থাকিবেই।

রুশ রণাঙ্গন—রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, ডন রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে ডনেৎস নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অংশে মালিনোভস্কির সম্মুখ সৈন্য এখন রোষ্টভ হইতে ষাট মাইলের কম দূরে রহিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর ককেশাস অভিযান এখন প্রায় ১০ মাইল স্থান জুড়িয়া চলিতেছে।

১১ই জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ডন এলাকায় রুশ অগ্রগতি কতকটা শ্লথ হইয়াছে। জার্মানরা এই অঞ্চলে প্রাণপণ বাধাদান করিতেছে। উত্তর ককেশাস অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—টিউনিসিয়ায় জার্মান অধিকৃত দুইটি পাহাড় দখলের জন্য বৃটিশ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলের সহিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একদল জার্মান সৈন্যের সংঘর্ষ হয় এবং মিত্রপক্ষীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। বৃটিশ বাহিনী টিউনিসিয়া ও ত্রিপোলীতানিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে হানা দেয়।

ব্রহ্ম—ভারতীয় সমর বিভাগের ইস্তাহারে বলা হয়, আরাকান জেলার মায়ু নদীর উভয় তীরে যুদ্ধ চলিতেছে। ১০ই জানুয়ারী বৃটিশ বিমানবহর আকিয়াবের শত্রু-অধিকৃত গ্রামসমূহে বোমা বর্ষণ করে।

৭ই জানুয়ারী

অদ্য রাত্রি সাড়ে আটটায় বি এন্ড এ রেলওয়ের দমদম জংশন স্টেশনে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস স্টেশন হইতে ছাড়িবার সময় দত্তপুকুর প্যাসেঞ্জার পিছন হইতে ধাক্কা দেয়। ফলে একটি হিন্দু বালক নিহত এবং প্রায় ৪০ জন আহত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস করাচী পৌঁছিয়াছেন।

মাদ্রাজের যে সকল সংবাদপত্র নববর্ষের উপাধি তালিকা প্রকাশ করেন নাই, তাহাদিগকে সরকারী বিজ্ঞাপন না দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ সরকার বিভিন্ন বিভাগের কর্তা এবং অন্য কর্মচারীদের নিকট সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, হুর নেতা পীর পাগারোর ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮০ খানি রূপার ইট পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। এক স্থানে মাটির নীচে ইটগুলি পোতা ছিল। মাটি খুঁড়িয়া পুলিশ ঐগুলি উদ্ধার করে।

৮ই জানুয়ারী

গতকল্য রাত্রে দমদম জংশন স্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত আপ নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের গার্ড শ্রীযুত কালীপদ চক্রবর্তী (৫৩) হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রে স্থানীয় একটি সিনেমা গৃহের সম্মুখে বিস্ফোরণের ফলে ৫ জন আহত হইয়াছে।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই টেলিফোন কোম্পানীর বাড়ির নিকট একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। কোন ক্ষতি হয় নাই।

বাঙলা সরকার ভারতীয় শ্রমিক দলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, এম এল এ'কে পনের দিনের মধ্যে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হইবার জন্য যে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে একটি মামলা চলিতেছিল। ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী শ্রীযুত দত্ত মজুমদারকে জেলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, তাহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

কটকের এক খবরে প্রকাশ, কোরাপুট জেলার অন্তর্গত মৈথিলীতে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে এবং গত ২১শে আগস্ট তারিখে বন বিভাগের জনৈক প্রহরীকে হত্যা করিবার অপরাধে কোরাপুটের অতিরিক্ত দায়রা জজ এক ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড এবং ৪৯ জন লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণে হতাহতদের আত্মীয়স্বজনকে দ্রুত খবর দিবার জন্য বাঙলা সরকার সকলকে পরিচয় চাকতি রাখিবার আবশ্যকতার প্রতি অবহিত হইতে সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এক আনা মূল্যে কলিকাতা, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বড় বড় ডাকঘরে, থানায় ও কলিকাতা পোলক স্ট্রীটের পোলক হাউসে বিমান আক্রমণ তথ্য বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিসে তাহা কিনিতে পাওয়া যায়।

৯ই জানুয়ারী

ভগবানগোলার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে ডিসেম্বর রাণীনগর থানার অন্তর্গত পদ্মা নদীর তীরবর্তী লালনাদিয়ার গ্রামের সন্নিকটবর্তী খরচাকা খেয়াঘাটের পারাপারের নৌকাখানি অনুমান দুইশত নরনারীসহ খরস্রোতা নদীর ঘূর্ণপাকে পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৬ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ২৩টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাত্রীদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, আজ ১২।১৩টি স্থানে ইটপাটকেল বর্ষিত হয়। ফলে পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়। আনুমানিক ১২টি গুলী বর্ষণ করা হইয়াছিল। একজন লোক মারা গিয়াছে এবং একজন আহত হইয়াছে। একজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গতকল্য শিলংয়ে সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারী এই মর্মে এক বিবৃতি দেন যে, আসামে সাম্প্রতিক হাঙ্গামা সম্পর্কে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আসামে ৬০০ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতায় যে সমস্ত উড়িয়া চাকুরী করে ও যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সাম্প্রতিক বিমান আক্রমণের ফলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে, উড়িষ্যা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদিগকে অবিলম্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১০ই জানুয়ারী

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য খাদিয়াচর রাস্তায় জনতা কর্তৃক ইটপাটকেল নিক্ষেপের সময় পুলিশ গুলী চালায়। গুলীতে আহত এক ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত ৯ই জানুয়ারী ভারত গভর্নমেন্ট একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শত্রুর এজেন্ট বা সাহায্যকারী অথবা যে ব্যক্তি বৃটিশ বাহিনীর অভিযান ব্যাহত হইবার মত কোন কার্য করিবে বা চেষ্টা করিবে বা ঐ উদ্দেশ্যে অপরের সহিত ষড়যন্ত্র করিবে, এই অর্ডিন্যান্সে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১১ই জানুয়ারী

নয়াদিল্লীর এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, খুচরা রেজগীর বর্তমান কমতির প্রধান কারণ এই যে, কাহারও কাহারও প্রয়োজনাতিরিক্ত রেজগী মজুত করা এবং পরে তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত অথবা কারবারের প্রয়োজনে যতটা আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত খুচরা রেজগী সংগ্রহ বা মজুত করা এবং তাহা টাকার বা নোটের নীট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় অথবা বিনিময় করা ভারতরক্ষা বিধানের ধারা অনুসারে অপরাধমূলক। এই সকল অপরাধে অপরাধীকে কাল বিলম্ব না করিয়া দণ্ডদানের সুযোগ দিবার জন্য সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ম বর্ষ] শনিবার, ৯ই মাঘ ১৩৪৯ সাল। Saturday, 23rd January, 1943 [১১শ সংখ্যা
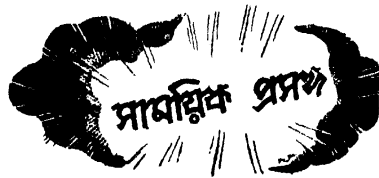
খাদ্য সমস্যার তীব্রতা

ভারতের খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রও দেখিতেছি, এজন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। 'টাইমস' ভারত গভর্নমেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এতৎ সম্পর্কিত ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে,—'ইহাতে সঞ্চয়ী এবং লাভখোরেরা সংযত হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহাদের কর্মতৎপরতার ফলে বাহির ও ভিতরে শত্রুর দল সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বড়লাটের যে ক্ষমতা আছে তাহার কঠোর প্রয়োগই ইহার সমাধানের পথ বলিয়া মনে হয়। 'টাইমস' যে সমস্যার কথা তুলিয়াছেন বর্তমানে তাহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের প্রতি আমরা গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি অবিরতভাবে আকৃষ্ট করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে সরকার যত ব্যবস্থা করিতেছেন, জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি কিছুই কাজে আসিতেছে না। সরকারী ব্যবস্থা লোভীকে সংযত করিতে সক্ষম হইতেছে না কিংবা ঐ শ্রেণীর লোকের পাপ ব্যবসা বন্ধ করিবার উপযুক্ত কার্যকর হইতেছে না। চট্টগ্রামের একটি মামলায় দেখা গিয়াছে যে, কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মুদীর দোকান খুলিয়া এই দুর্দিনে দেশের লোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিছু অর্জন করিবার মতলবে ছিলেন। বিচারক আসামীকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং রায়ে এই মন্তব্য করিয়াছেন, "সমাজের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করিবার কাজে যদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সহায় না হন, তবে বর্তমান অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ স্ব স্ব এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। এরূপ ব্যক্তিরা যদি আইন ও শৃঙ্খলা না মানিয়া দরিদ্রদিগকে অন্যায়ভাবে শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হন তবে আদর্শ দণ্ডবিধানেরই একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে এরূপ অনাচার বন্ধ হইবে না।" চট্টগ্রামের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিতে কাহাদিগকে বুঝিয়াছেন, আমরা জানি না। আমাদের মতে জনসেবা ও ত্যাগের পথে প্রকৃতপক্ষে যাহারা নেতৃত্বের সম্মান লাভের অধিকারী তাঁহারা অনেকেই কংগ্রেস-কর্মী; বর্তমানে ইঁহাদের অধিকাংশই কারাগারে আছেন। পদ মান এবং অর্থবলের দিক হইতে প্রতিষ্ঠাই যদি নেতৃত্বের নিরিখ হয়, তবে সে স্থলে জনস্বার্থ নিরাপদ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। চট্টগ্রামের কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বরাত নিতান্ত মন্দ বলিয়াই তিনি এক্ষেত্রে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারই মত নেতৃস্থানে বসিয়া দেশের দুর্দশা লইয়া কতজনে পাপ ব্যবসা চালাইতেছে কে জানে? গরীবের দুঃখের বোঝা বাড়িয়া উঠিতেছে তো এই জন্যই। গরীবের দুঃখে বেদনাবোধ আছে কয়জনের? দেখিতেছি বাঙলা সরকার সম্প্রতি তাঁহাদের কয়েকটি বিভাগের কর্মচারীদিগকে বিনা খরচে খাদ্য সরবরাহ করিবার একটি ব্যাপক কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করিয়াছেন। যে সব

কর্মচারীর বেতন ৭৫ টাকার অনধিক তাঁহারাই এই সুবিধা লাভ করিবেন। পুলিশ এবং এ আর পি ও দমকল বিভাগের কর্মচারীরা এই সুবিধা পাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষকেও তাঁহাদের কর্মচারীদের জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কিত ব্যয়ভার বহনে তাঁহারা সাহায্য করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। গভর্নমেন্টের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কয়েকটি বণিক সমিতিও নিজেদের কর্মচারীদের সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই সব বিশিষ্ট কর্মপন্থার মূলে দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য মানবতার দিক হইতে আগ্রহ মুখ্য বস্তু বলিয়া আমরা মনে করি না। নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ চালাইয়া লইবার আগ্রহই এক্ষেত্রে প্রধান; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এতদ্দ্বারা কার্যত গরীবের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হইবে। এই দিক হইতে ইহা প্রশংসনীয়; কিন্তু জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার ব্যাপক নীতি অবলম্বন না করিয়া শ্রেণী স্বার্থমূলক এমন নীতি লইয়া অগ্রসর হইলে জনসাধারণের স্বার্থের হানি ঘটিবারও আশঙ্কা রহিয়াছে। সমরবিভাগের রসদ সরবরাহের চাপ যেভাবে জনসাধারণের উপর পড়িতেছে, সেইভাবে সরকারের কতকগুলি বিভাগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের খাদ্য সরবরাহের চাপ যদি গরীব জনসাধারণের উপর পড়ে, তবে সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে। জনসাধারণ হিসাবে সকলের সমস্যার যাহাতে সমাধান হয়, এমন কর্মপ্রণালী অবলম্বন করাই এমন ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের কর্তব্য। তাঁহাদের এখনও উপলব্ধি করা উচিত যে, দেশে খাদ্য আছে, শস্য আছে এই সব মামুলী কথায় কোন কাজই হইতেছে না। শহরে ও মফঃস্বলে অন্নাভাব একান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রধানত এই কারণে দুঃসাহসিক রকমের চুরি ডাকাতি প্রভৃতি মফঃস্বল অঞ্চলে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙলা দেশ বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। স্থানে স্থানে শত্রুর বোমা বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শুধু কথায় তাহা সম্ভব নয়, অন্নচিন্তা দূর করিলেই জনসাধারণের মধ্যে আস্থার ভাব দৃঢ় হইতে পারে।

কয়লার দর

ব্যাপক খাদ্য সমস্যার জটিলতা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যে সব সমস্যার জটিলতা তেমন নহে, সেগুলির কোনটিরও আমরা সমাধান হইতে দেখিতেছি না; সর্বত্র কর্তৃপক্ষের যেন একটা উদাসীন; কলিকাতা শহরের কয়লার সমস্যা সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে। কয়লার মণ যখন দুই টাকায় উঠিল, তখন হইতেই আমরা এই কথা শুনিতেছি যে, কয়লার কোন অভাব নাই; মালগাড়ি জোগাড় করিতে যে কয়েকদিন বিলম্ব; কিন্তু কয়লার দাম কমিল না; ক্রমে তিন টাকা ছাড়াইয়া কয়লার মূল্য মণ-করা চার টাকার উপরে উঠে। এতদিন পরে দেখিতেছি, কয়লার এই সমস্যার সমাধানে বাঙলা সরকার সচেতন হইয়াছেন এবং কয়লা-ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিতে থাকায় যে সকলেরই অসুবিধা হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা কয়লার দর পাইকারী প্রতি মণ পাঁচ সিকা এবং খুচরা দর এক টাকা ছয় আনা হিসাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন যে সরকারী বাঁধা দরের অপেক্ষা যদি কেহ বেশী দর চাহে, তবে যেন পুলিসে খবর দেওয়া হয়। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের গত ১৯শে তারিখ দিল্লী যাওয়ার কথা ছিল; তিনি কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজে আটকাইয়া পড়ায় তাঁহার দিল্লী যাওয়া হয় নাই; শুনিতেছি শহরের কয়লা সমস্যা ইহার অন্যতম। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টায় যদি এই সমস্যার সত্যকার সমাধান হয়, তবে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। কিন্তু কথায় আছে না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই। সরকার দরই বাঁধিয়া দিউন, কর্পোরেসন বাজারে বাজারে কয়লার গুদামই খুলুন, আর দেড়শত মালগাড়ী কয়লা বোঝাই হইয়া শহরেই আসুক, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা যে তাহাতে মিটিবে, ইহা তো ভরসা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; কারণ এ পর্যন্ত সরকারী কোন ব্যবস্থাতেই আমাদের অভাব মিটাইবার সুযোগ ঘটে নাই, বরং দুর্যোগই বাড়িয়াছে; এক্ষেত্রে যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং লাভখোরদের অসতর্ক শোষণনীতির প্রয়োগ-নৈপুণ্যের প্রলোভন-জাল অতিক্রম করিয়া গরীবদের কিছু সম্বল জুটে, তবে আমাদের নেহাৎ বরাত জোর বলিয়াই আমরা মনে করিব।

ভাঁসালীর সাধু ব্রত

মধ্যপ্রদেশের চিমুর গ্রামের অশান্তি দমনের জন্য গভর্নমেন্ট যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে নারী-নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়াতে সেবাগ্রামের অধ্যাপক ভাঁসালী অনশনব্রত অবলম্বন করেন। অধ্যাপক ভাঁসালী উক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের দাবী করেন; কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সরকার তাঁহার সেই দাবী তো গ্রাহ্য করেনই না, পক্ষান্তরে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটারই সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। সরকারী বিবৃতিতে অভিযোগকারিণী নারীদের অভিযোগ লঘু করিবার চেষ্টা করা হয় এবং অশান্তি অভিযোগে জড়িত ও দণ্ডিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে উক্ত নারীদের সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া তাহাদের উপর উদ্দেশ্য আরোপের চেষ্টাও হইয়াছিল। নারীর প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একতরফা এইরূপ অনুচিত ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। অধ্যাপক ভাঁসালীও তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই; প্রতিকারার্থ তিনি জীবন পণ করিয়া অনশন ব্রত আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, "আমি ধর্ম-জীবনের অনুরাগী। আমার কাছে যদি একজন নারীর সম্বন্ধেও কোনরূপ উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহা সমাজের পক্ষেই শুধু অপরাধ নয়, ভগবানের বিরুদ্ধেই অপরাধ।" সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ এই দুইয়ের মধ্যে অধ্যাপক ভাঁসালী যে পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছেন,

আমরা সকলে হয়ত তাহার সূক্ষ্মতা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। মোটামুটি এইটুকু আমরা বুঝি যে নারীর বিরুদ্ধে যে অপরাধ তাহা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাহাতে মানুষের সকল উচ্চ আদর্শেরই অবমাননার পাপ লুক্কায়িত থাকে। মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট এতদিন পরে এই সোজা সত্যটি উপলব্ধি করিলেন। মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারী ডাক্তার খারে আজ অধ্যাপক ভাঁসালীর সংকল্পের অন্তর্নিহিত সাধু উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া বলিয়াছেন,—'আপনার আত্মত্যাগ অপরিসীম।' তাঁহারা আজ বলিতেছেন,—'চিমুরের নারীদের উপর উদ্দেশ্য আরোপ করিতে কোন অভিপ্রায় গভর্নমেণ্টের ছিল না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিযুক্ত পুলিশ ও মিলিটারীরা যাহাতে সংযত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে, তৎপ্রতি গভর্নমেণ্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। গভর্নমেণ্টের বিবেচনায় সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন হইল নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নারীদিগকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করা।' মধ্যপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট এই মনোভাব যদি পূর্বে অবলম্বন করিতেন তবে অধ্যাপক ভাঁসালীকে নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে হইত না এবং ভারতরক্ষা আইনের বেড়া জালের কৌশলে অধ্যাপকের অনশন সম্পর্কিত সকল সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করার অসংগত ব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ৬ই জানুয়ারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় একশত সংবাদপত্র বন্ধও হইত না। তাঁহারা পুলিশ ও মিলিটারীর কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন সভ্য সমাজের সর্বত্র তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য রীতি এবং নীতি, উহার জন্য এতটা আন্দোলনের যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। অধ্যাপক ভাঁসালীর আত্মত্যাগের ফলে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্নে জাতির বিবেকবুদ্ধিতে সাড়া জাগিয়াছে, অধিকন্তু গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন হইয়াছেন, এ জন্য সমগ্র দেশ অধ্যাপকের এই পবিত্র ব্রতকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষা পাইয়াছে, এজন্য সমগ্র ভারতবর্ষ আনন্দিত।

ব্রিটিশ শাসনের মহিমা

নুন খাইলে গুণ গাহিতে হয়, এই রীতি আছে। অধ্যাপক ফিন্ডলে সিরাস ভারতের কিছু নুন গলাধঃকরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সেদিন অক্সফোর্ড শহরের এক সভায় ভারতের বর্তমান সমস্যার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা দান করিবার জনাই ব্যগ্র, শুধু আত্মকলহপরায়ণ ভারতবাসীদের জন্যই তাহা সম্ভব হইতেছে না। অধ্যাপক সাহেব অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কারণ তাহাতে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল ভারতে ব্রিটিশের স্বার্থকে কায়েম করা এবং কংগ্রেসকে খাটো করিতে না পারিলে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তিনি এই উপলক্ষে আসল সে লক্ষ্যটি বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের মূল্য কি আছে? কংগ্রেস ভারতের সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীর প্রতিনিধি স্থানীয় নহে, এমন কি, তাঁহাদের অধিকাংশের প্রতিনিধিত্বের দাবীও কংগ্রেস করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ফিন্ডলে এক্ষেত্রে চার্চিল-আমেরীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; কিন্তু সত্য তাহাতে মিথ্যা হইয়া যায় না। কেবলমাত্র কংগ্রেসই নয়, কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার যে দাবী করিয়াছে, ভারতের সকল রাজনীতিক দলেরই তাহা সমর্থন লাভ করিয়াছে; সুতরাং এক্ষেত্রে মতবিরোধের প্রশ্ন নেহাৎ গায়ের জোরেই টানিয়া আনা হইতেছে। এইরূপ অলৌকিক মতিগতির ক্ষেত্রে তর্ক চলে না এবং আমরা এই ধরণের উক্তির কোনরূপ গুরুত্ব দিতেও ইচ্ছা করি না। কিন্তু দেখিতেছি অধ্যাপক ফিন্ডলে সিরাসের মত ভাড়াটিয়া বক্তার দলই শুধু নহেন ইংরেজ জাতির যে যেখানে ছিল সকলেই আজ সমস্বরে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির গুণগানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মিঃ ভার্নন বার্টলেট কেবল রাজনীতিক নহেন, তিনি একজন সাংবাদিক। মার্কিন দেশের সাংবাদিকদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছেন,—'আপনারা জানেন না, ভারতবর্ষে আমরা কি করিয়াছি? পৃথিবীর আর কোথায় গত শতাব্দীকাল ভারতের মত এত কম রক্তপাত হইয়াছে? ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় না যে, ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিশ শাসনের নীতি ন্যায় ও ভদ্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত!' কিছুদিন পূর্বে ইংলন্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্বার্ট মরিসন কিছু ঘুরাইয়া এই কথাটাই বলিয়াছেন। ডানকার্কে ব্রিটিশের বিপর্যয়কালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ঐ সময় ব্রিটিশের অধীন জাতিগুলি ইচ্ছা করিলেই স্বাধীন হইতে পারিত; কিন্তু তাহারা তাহা চাহে নাই। ভারতের কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে এবং ইঁহাদের উক্তির নির্গলিতার্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, পরাধীন ভারত স্বাধীনতার অপেক্ষা ব্রিটিশের শাসনে শান্তিই সমধিক কামনা করে; কিন্তু দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, এমন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ভারতের এই যে শান্তি, ইহা কি গর্বের বিষয়? মন্টেগু সাহেব এই শান্তিকে নির্জীবের শান্তি বলিয়াছেন এবং এজন্য দুঃখ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রভুত্ব পরিচালনার দিক হইতে ভারতের এই শান্তির জন্য গর্ব করিতে পারেন, কিন্তু এই শান্তির জন্য গর্ব করাতে মনুষ্যত্বকেই অবমাননা করা হয়। মানুষের প্রাথমিক অধিকার হইল স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত পশুর জীবনের শান্তির মোহ ভারতবাসীদের ভাঙিয়া গিয়াছে।

আদর্শের বিরোধ

আমেরিকার 'লাইফ' পত্রের সম্পাদকমন্ডলী কিছু দিন পূর্বে ব্রিটিশ জাতিকে উদ্দেশ করিয়া একখানা খোলা চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তাঁহারা বলেন যে, আমেরিকার জনসাধারণ মানব জাতির স্বাধীনতাকে তাহদের সমরাদর্শ বলিয়া বুঝে।

ইংরেজেরও কি ইহাই মত? যদি তাহাই হয়, তবে সে কথাটা তাঁহারা খোলাখুলি বলুন। ব্রিটিশ পক্ষ হইতে মিঃ ভার্ণন বার্টলেট এই চিঠির জবাব দিয়াছেন; কিন্তু জবাবে আসল প্রশ্নটি কৌশলে এড়াইয়া গিয়া ব্রিটিশ শাসনের মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে। 'লাইফ' পত্রের তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সম্পাদক-মণ্ডলীর চোখে ধূলা দেওয়া তত সহজ নহে। তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মিঃ বার্টলেটের জবাবের উপর টিপ্পনী করিয়া 'লাইফ' পত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন,—মিঃ বার্টলেট অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মার্কিন জাতির সঙ্গে আদর্শের দিক হইতে তাঁহাদের যে ঐক্য ঘটিয়াছে, তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। মিঃ বার্টলেটের একটি কথা হইতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে একটা বড় লাভ হইয়াছে এই যে, ইংরেজ এবং মার্কিন এই দুই জাতির মধ্যে ঐক্য ঘটিয়াছে; তবে কি আমরা বুঝিব যে, হিটলারের সঙ্গে বিরোধই ইংরেজ এবং মার্কিনের মধ্যে মিলনের সূত্র; তদতিরিক্ত অন্য কোন আদর্শ নাই এবং হিটলারের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটিলেই ইংরেজ মার্কিনের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিবে? 'লাইফ' পত্রের সম্পাদক এতদ্দ্বারা ইহাই বলিয়াছেন যে, মিঃ বার্টলেটের উক্তি হইতে বুঝা যায়, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া বর্তমান সংগ্রামের মূলে ইংরেজের কোন বৃহত্তর আদর্শ নাই। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উক্তি এবং বিবৃতি হইতে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের পক্ষে এ সত্যটি ধরিতে অবশ্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইংরেজ তাঁহাদের সমরাদর্শ সম্বন্ধে যত কথা বলিতেছেন, নিজেদের প্রভুত্বের ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য সে প্রভুত্ব পাকা রাখিবার প্রয়োজনীয়তাকেই তাঁহারা বড় করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিন জাতি যুদ্ধোত্তর জগতে মানব স্বাধীনতার কথা বলিতেছে; ইংরেজ বলিতেছে, যুদ্ধোত্তর জগতে অধীন জাতিগুলা যদি ইংরেজের অভিভাবকত্ব না পায়, অর্থাৎ মার্কিনের যুদ্ধোত্তর আদর্শ অনুসারে তাহারা স্বাধীন হয় তবে তাহারা বর্বর থাকিয়া যাইবে। ইংরেজ এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিবে না; তাহারা যুদ্ধের পরও অধীন জাতিগুলাকে মানুষ করিতেই থাকিবে। ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ ষ্ট্যানলী কিছু দিন পূর্বে ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের অধীনস্থ দেশগুলির দায়িত্ব আমাদিগকে বহন করিতেই হইবে এবং সেগুলিকে উন্নত করিবার জন্য আমাদিগকে ত্যাগ স্বীকারের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা যদি আমাদের কর্তব্য লঙ্ঘন করি এবং ঐসব রাজ্য ছাড়িয়া আসি, তবে অন্তত সেগুলির ভিতর কতকগুলি স্থান অবিলম্বে বর্বরতার যুগের মধ্যে গিয়া পতিত হইবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে থাকি এবং সেগুলি আমাদের অভিভাবকত্বে থাকিবার সুবিধা লাভ করে, তবে তাহারা স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে সাহায্য পাইবে।" মিঃ ষ্ট্যানলীর সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, ইংরেজের অধীনস্থ দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে যোগ্যতা ইংরেজেরই শুধু আছে; কারণ তৎসম্বন্ধে অপর কাহারও বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই। কিছু দিন হইল ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে সালিশী করিতে অনুরোধ করিয়া মার্কিন জনসাধারণের পক্ষ হইতে কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। মার্কিন গভর্নমেণ্টের ওড্রো উইলসন প্রোফেসার মিঃ ফ্রেডারিক সুমান সম্প্রতি 'টাইম' পত্রে ইহার গুরুত্বের উপর জোর দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, এই আন্দোলনকে শিথিল করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ মোলায়েম কথার কৌশলে নিজেদের শাসন মহিমার ব্যাখ্যা ও ভাষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইহার ফলে মানব মর্যাদা উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের স্বার্থগৃধ্নু অনুদারতার স্বরূপই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে; তাঁহারা চাপা রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ফল হইতেছে বিপরীত।

ভারতীয় সমস্যা ও গান্ধী

'ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক এইচ জি উড বিলাতের 'স্পেক্টেটর' পত্রে লিখিয়াছেন,—"অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী নেতারূপে গান্ধীজীই ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করিতে একমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি।" অধ্যাপকের এমন কথার প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনে আধ্যাত্মিক শক্তির কোন স্থান আছে কি? যদি তাহা না থাকে তবে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নেতারও সেক্ষেত্রে কোন স্থান নাই। ভারতের ভাগ্যচক্র পরিবর্তনে বর্তমানে যাঁহারা নিজেদিগকে অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কাছে আধ্যাত্মিক শক্তির কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; পক্ষান্তরে তাঁহারা সে শক্তিকে অনেকটা উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলই একদিন মহাত্মা গান্ধীকে নগ্ন ফকির বলিয়া অভিহিত করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন; সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমা ইঁহাদিগকে শুনাইতে গিয়া কোন লভ আছে এ বিশ্বাস আমাদের নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যদি মাহাত্মাজীর প্রস্তাবে রাজী হইতেন, তবে তাঁহাদের দৃষ্টিতে যে বল বড় বল, সেই সমরসঙ্গতি এবং শস্ত্রবল এই দিক হইতেও সমগ্র ভারতবর্ষ এক হইয়া তাহাদের শক্তিকে সুদৃঢ় করিতে দণ্ডায়মান হইত। যাহারা যে বস্তুর মূল্য বুঝিবে না, তাহাদিগকে যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহা বুঝাইতে যাওয়া বৃথা; আমরা তেমন চেষ্টা করিতেও চাই না। ভারতবর্ষের স্বার্থ যে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ বড় করিয়া দেখিবেন, এমন আশাও আমাদের নাই; কিন্তু মহাত্মাজীর প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলে ইংরেজের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থই সিদ্ধ হইত। সংকীর্ণ স্বার্থের দায়ে বৃহত্তর স্বার্থকে বিপন্ন করিবার অন্ধতা জগতের সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিহাসে নূতন নয়, অতীতের অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সে শিক্ষা এখনও হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

অপ্রকাশিত

[শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বিজয়ার প্রণামপত্রে আমার টেবিল ভারাক্রান্ত অতএব অতি সংক্ষেপে তোমাকে আর তোমার ভাইকে আশীর্বাদ জানাচ্চি। ভাই-দ্বিতীয়ার দিনে আশীর্বাদ পূরণ করে দেব। ইতি ২৭।১০।৩৬

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ভাইফোঁটার স্মৃতিক্ষেত্র ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে আমার নতুন বাড়িতে ফিরে এসেছি। সেখানকার অবারিত আকাশের মধ্যে মনের যে রকম অবাধ ছুটি ছিল এখানে তা নেই। মনে হচ্চে উর্দ্ধলোক থেকে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছি। এখানে নানা লোক নানা চিন্তা নানা কাজ। আবার একবার মুক্তির উপায় কল্পনা করচি। ভাবচি ৭ই পৌষ উত্তীর্ণ করে যাব চলে বোটে পদ্মায় শিলাইদহের চরে। আজ সন্ধেবেলায় রাণী এখানে আসবে খবর পাওয়া গেল—বোধকরি কালই ফিরে যাবে। ইতি ২৬।১১।৩৬

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

অন্নপূর্ণার কাছে ভোজ্যপদার্থের দাবী করিনে বলে আক্ষেপ করেচ। কিন্তু মনে মনে স্থায়ী ভাবেই দাবী রয়েছে সেটা তোমার কানে পৌঁছনো উচিত ছিল। বড়ি জিনিষটা উপাদেয় সন্দেহ নেই, আর আর যে কয়েকটি জিনিষের আভাস দিয়েছ সেগুলি সময়ে অসময়ে যদি জোটে তবে সমাদর পাবে তাতে সন্দেহ কর কেন?—শীতের সময়ে আমাদের নদীর চরে যেমন বিদেশী হাঁসের ভিড় হয় আমার এখানেও এই সময়টাতেই সমুদ্রপারের অতিথির সমাগম ঘটে। তাই ব্যস্ত আছি। ৭ই পৌষের উৎসবের আয়োজনেও ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। জ্বরটা ছেড়েছে, দুর্ব্বলতাটা ছাড়তে চায় না। ইচ্ছা করচি ৭ই পৌষের পরে দূরে কোথাও দৌড় মারব। কিন্তু দেহটা যেহেতু সচল অবস্থায় নেই সেইজন্য দ্বিধা হচ্চে। ইতি ১৪।১২।৩৬

দাদু

ওঁ

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

বাংলাদেশের সমস্ত দিদি জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয়নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন? দেবীর কোপ দূর হোক—প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান স্বরূপে বড়ি দান করুন এই আমার প্রত্যাশা।—শীত পড়েছে সন্দেহ নেই—দেহতাপ রক্ষার উপায় উপকরণ জমা করচি—বাসা বদল হয়েছে! উদয়নের তিনতলার ঘরে রোদ পোয়াচ্চি। এ ঘর তোমার অপরিচিত। এখানে বসে সন্ধ্যাবেলায় জ্যোতিষ্ক লোকের সামীপ্য অনুভব করি—দিনের বেলায় সূর্য্যদেব বাতায়ন পথে আমার তত্ত্ব নিয়ে থাকেন। ইতি ১৪।১।৩৭

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

রবি ঠাকুরের জটাপ্রান্ত থেকে আশীর্বাদ যদি কুণ্ডলী আকারে তোমার পত্রপুটে স্থান নিয়ে থাকে তবে তার কারণ এই জেনো যে, যখন উক্ত ঠাকুরের লীলা সমাধা শেষে তাঁর তিরোধান ঘটবে তখন এই চিহ্নটি ক্ষণে ক্ষণে তোমার স্মরণের সহায়তা করবে।

বড়ি সম্ভোগের যুগ এখনো চলচে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হচ্চে তোমার স্বহস্তরচিত টম্যাটোর মুখরোচনিকা। মিষ্টির সঙ্গে অল্প একটু ঝাল থাকাতে ওতে তোমার স্বভাবের স্বাদ পাওয়া যাচ্চে—সেটাতে ওর উপাদেয়তায় একটু তেজঃসঞ্চার করেছে। তুমি যে মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ করো সেই বার্তাটা যদি এই অম্লমধুর ভাষায় ক্ষণে ক্ষণে আমার কাছে এসে পৌঁছয় তাহলে বলব

সখি হে, কে মোরে পাঠাল এই দান—
রসনার পথ দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিয়া দিল প্রাণ।

আগামী ১০ই অথবা ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার কলিকাতায় আবির্ভাব হবে। ইতি ১৬ মাঘ ১৩৪৩। দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় পড়ে আছি। কর্মজালে জড়িত। আজ সায়াহ্নে একটা বক্তৃতা আছে। তার পরে ৬ই অর্থাৎ আগামী শনিবার পর্যন্ত একটা না একটা উপদ্রবে আমাকে অতিষ্ঠ করে রাখবে। তার পরে ছুটি পাবামাত্র স্বস্থানে দৌড় দেব। শরীর পীড়িত, মন ক্লান্ত, দিনটা জনতাগ্রস্ত। তোমার উপহৃত মিষ্টান্ন দৈবযোগে নষ্ট হয়েছে কিন্তু তার মিষ্টতা নষ্ট হয়নি—অতএব এই বাহ্য ক্ষতি নিয়ে অনুশোচনা কোরো না। তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২।৩।৩৭

দাদু

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

দূর থেকে তোমার আবিরবর্ষণ পৌঁছল আমার পায়ে। তার বদলে আমার আশীর্বাদ পাঠাই। আমাদের এখানে কাল বসন্ত উৎসব হয়ে গেল। আজ সন্ধ্যাবেলায় পরিশোধ নৃত্যনাট্যের অভিনয় হবে। কলকাতায় যখন হয়েছিল তখন বোধ হয় তুমি দেখেছিলে। কিন্তু এটাতে তার থেকে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। জিনিষটা উপাদেয় হয়েছে বলেই আন্দাজ করচি। এই ব্যাপার নিয়ে এবং অতিথি অভ্যাগতের অক্ষৌহিনী নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।
অতএব ইতি ২৬।৩।৩৭

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

গিরিনদী প্রান্তর লঙ্ঘন করে তোমার চিঠি এই দূর শৈলশৃঙ্গে আমার হাতে এসে পড়ল। প্রত্যাশা করিনি বলে বিস্মিত হলুম।

উষার মেয়ে হয়েচে শুনে খুশি হলুম, তাদের আমার আশীর্বাদ জানিয়ো, ওর নাম দিতে পারো, কমলিকা, ভোরের কোলেই তার বিকাশ।

এখানে আসবার পথের দুঃখটা ছিল সুদীর্ঘ এবং সুদুঃসহ—শৈলশ্রীর শুশ্রূষায় সেটা ভুলে গেছি। ভালো আছি এবং লো লাগচে। জলে স্থলে আকাশে নিরাময় আতিথ্য, সামনে তুষার কিরীটী গিরিশিখর, সানুদেশে নির্মল সূর্যকিরণে ভিষেক হচ্চে বনস্পতিদলের। প্রশস্ত বারান্দায় বসে সামনে চেয়ে চেয়ে বেলা কেটে যায়।

কাল গেছে আমার জন্মদিন। এখানকার কয়েকজন নূতন পরিচিত এবং পূর্ব পরিচিত অতিথি এসে জুটলেন পরাহ্নে. তাঁদের মধ্যে ছিলেন তোমার হাতের সেবা-লোলুপ বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী—কোন্ আনন্দ উপাধিধারী ন পড়চে না। দেশে থাকলে অভ্যর্থনার আবর্তে যে রকম তলিয়ে যেতে হোতো এ সে রকম নয়। ফাঁড়া অল্পের পর দিয়ে কেটেচে। ফিরে গিয়ে তোমার পাদ্য অর্ঘ্যের দাবী করা যাবে। বর্ষামঙ্গলের কবি বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে বতীর্ণ হবেন নিম্নভূতলে—জয়দেবের সেই জন্মভূমিতে যেখানে মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

দাদু

ওঁ

"St. Marks"
Almora, U. P.

ল্যাণীয়াসু,

এই কুঁড়ে মানুষটাকে তোমরা পেট ভ.. কুঁড়েমি করতে দিলে না দেখচি। যদি সদাচার পালন করে সাধারণ ভদ্রলোকের েই কর্তব্য সাধনের প্রয়াসে এমন দুর্লভ অবকাশ নষ্টই করব তাহলে এই গিরিমালা বেষ্টিত এত ঊর্ধ্বে চড়ে বসবার দরকার া ছিল। তোমার পরিচিত তোমার শ্রীহস্তের পরিপক্ক ভোজ্যান্ন-সম্ভোগ বিমুগ্ধ তোমাদের বেলুড়ের সেই সন্ন্যাসীকে াই দেখি, নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ববিহীন কর্মবিহীন আপনার বা পরের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনহীন অবসর যাপন করে নসাধারণের প্রণতি অর্জনে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্যে আমার মন উৎসুক। কিন্তু অভ্যাস াপ হয়ে গেছে, লোকালয় থেকে সুদূরে ছুটি নিয়েও খাটুনি। না হলেম সংসারী, না হলুম সন্ন্যাসী,—আশ্রম একটা আছে টে সেটা শ্রমেরই আড্ডা, ঘরের দায় লাঘব করেছি, পরের দায় দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে হুড়মুড় করে। ছুটিও আমার ক্ষে নিছুটি। এমন দোটানা কারো ঘটে না, মন হয়েছে কর্মবিমুখ, অবস্থা হয়েছে কর্মসঙ্কুল। নাৎনীরা মিলে যদি একটা দবাশ্রম খুলতে যেখানে মিষ্টান্ন এবং মিষ্টাচারের দ্বারা পরিপূর্ণ আলস্য নিষ্কণ্টকে উপভোগ্য হতে পারত, তাহলে ন্ম জন্ম হাতা বেড়ি এবং জুঁতা শেলাইয়ের সূচিকা চালনায় তোমাদের নারীজীবন সার্থক হোত। ইতি ২৯ মে ১৯৩৭

দাদু

ল্যাণীয়াসু,

অনেকদিন নিরুত্তরে আছ। এখান থেকে আমাদের নামবার দিন নিকটবর্তী হোলো। ২৭শে তারিখ যাত্রা করব। ৩০শে রিখে রাজধানীতে আমাদের শুভাগমন হবে। সেখানে চম্পাপুরীর চম্পকরাজের সঙ্গে পারুল দিদির যদি সাক্ষাৎ হয় তো লোই—না হয় যদি, তবে উদ্দেশে আশীর্বাদ করে শান্তিনিকেতন প্রয়াণের উদ্যোগ করব। মেঘদূতের মন্দাক্রান্ত ন্দের তালেই এখানে বর্ষা নেমেছে। ইতি ৮ই আষাঢ় ১৩৪৪

দাদু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

ল্যাণীয়াসু,

পারুল শরীরের উপর যমদূতের আক্রমণ নিরস্ত হয়েছে। এখন কর্তব্য হচ্চে চুপচাপ থাকা, যাতে ভূমিকম্পলাগা শরীরটা নিজের মেরামতের কাজ নিজে অব্যাঘাতে করতে পারে। অতএব কলমের চাঞ্চল্য এখন সংযত থাকবে।
ইতি ২৮।৯।৩৭

দাদু

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কঠিন রোগের ভিতর থেকে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, এ খবর আমি পাইনি। বস্তুত অনেকদিন ধরে সকল খবর থেকে আমি রে আছি। চিঠিপত্রের দেনাপাওনা বন্ধ ছিল। চণ্ডালিকা নাটিকাটিকে আগাগোড়া সুরে বসিয়ে তার অভিনয় অভ্যাস করানোর কাজে কিছুকাল থেকেই নিরন্তর ব্যাপৃত আছি। ভুলে আছি আর সব কিছু। সৃষ্টি কাজের নেশা অত্যন্ত প্রবল। এই জন্যে নিরাসক্ত বলে আমাদের নামে অভিযোগ আসে। বস্তুলোক থেকে কল্পলোকে মনটাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে আসতে না পারতুম, যদি বাহিরকে ভুলে থাকতে না পারতুম অন্তরের দিকের আহ্বানে তাহলে আমাদের কাজ চলত না। তাই আমরা অন্য-

মনস্ক। তাছাড়া শরীর মনও শিথিল হয়ে গেছে—একটু অবকাশ পেলেই জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ করে থাকি—সামনে আমগাছে বোল ধরেছে—বেড়ার কাছে বাতাবি লেবুর ডালে ফুল ধরেছে, গাছের ছায়ায় শালিকরা কলরব করচে—রৌদ্র ঝিলমিল করচে সোনাঝুরি গাছের পাতায় পাতায়—বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে যে রাস্তা গেছে বোলপুরের দিকে, তার উপর দিয়ে মন্থরগতিতে চলেছে গোরুর গাড়ি—মাঝে মাঝে শোনা যায় চাকার আর্তধ্বনি এবং গাড়োয়ানের তারস্বরে বিরহগান।

অনেকদিন কলকাতার দিকে যাইনি। শীতের রোদ পোহানো প্রান্তরের ধারের বাসা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করে না। হয়তো আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যেতে হবে চিকিৎসার জন্যে। রাণীদের ওখানে বেলঘরিয়াতেই আশ্রয় নেব। বরনগরের সেই পাড়াগেঁয়ে বাগানবাড়ি আমার যে-রকম ভালো লাগত, বেলঘরিয়া তেমন ভালো লাগে না। কিন্তু কলকাতার গোলমালে মন টেঁকে না, তাই পালিয়ে থাকতে চাই। যদি সেখানে আমার যাওয়া হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হতে পারবে। ইতি—১৪।২।৩৮।

দাদু

ওঁ

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

দাদুকে মনে পড়েছে যখন তখন সময় হলে ভাইফোঁটা দিয়ে যেয়ো। আমি এখানে আছি সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। ভালো করে প্রস্তুত হবার যথেষ্ট সময় পাবে। নানান কাজে ব্যস্ত আছি। সাধারণের কাছে কিছুদিন হোলো ছুটির নোটিশ দিয়েছি। কেউ সেটা কানে নিচ্চে না। কিন্তু আর ভদ্রতা করা আমার শরীরে কুলচ্চে না। ক্লান্ত হয়ে আছি। ইতি—১।৯।৩৮।

দাদু

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

পাঁজিকায় কোন্ মাসের কোন্ তিথিতে আমাকে কোথায় চালনা করবে, সে আমার অগোচর। অতএব ঠিক সময়ে ভাইফোঁটা আমার ললাট পর্যন্ত পৌঁছবে কি না, তা এখন থেকে বলা আমার সাধ্যের অতীত। আমার বিশ্বাস ঐ ফোঁটা আমার কুষ্ঠির গ্রহ-তারকার পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে অজানা দিগন্তে বিলীন হয়ে যাবে। আপাতত আবর্তিত হচ্ছে আমার দিন ব্যস্ততার পাকে। আমার মালেক আমাকে ছুটি দিতে নিতান্তই নারাজ। ইতি ৮।৯।১৯৩৮

দাদু

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

আমি সব কিছু থেকে যেন দূরে পড়ে গেছি। শরীরটা যেন পারের নদীর ধারের কাছে সরে পড়েছে। তার উপর কাজের ভিড়ে আমার সময়কে আচ্ছন্ন করেছে। মনটা কেবল পালাই পালাই করে। মাঝে কিছুদিন তিনটে নাট্য নিয়ে গান বানাতে হয়েছিল, তখন মনটা দিনরাত্রি ছিল কলগুঞ্জরিত—গানের সুরে নিয়ে যায় কল্পলোকের প্রাঙ্গণে। সংসার থেকে সে অনেক দূরে—সেখান থেকে যে রঙের আলো বিচ্ছুরিত হয়, তারি ভিতর দিয়ে চেনা জগৎকে মনে হয় অচেনায় দ্বীপান্তরি। কর্তব্য যাই ভুলে। কিছুদিন এমনি করে কাটল সুদূরের সকল ভোলা নেশায়। এখন আবার ফিরেছি কাজের মধ্যে কিন্তু মন লাগচে না—এটা ওটা নিয়ে হেলাফেলা করচি। তোমার শরীর এত খারাপ তা জানতুম না। তোমাকে দেখতে যাব মতো আমার চলৎশক্তি নেই—আর একটু তুমি ভালো হয়ে উঠলে হয়তো দেখা হতে পারবে। তুমি সুস্থ হও, এই কামনা ক[illegible] আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—২৬।২।৩৯

দাদু

চন্দ্রালোকে　　　শিল্পী—শান্তি বসু, শান্তিনিকেতন

(১২)

মায়া শুনলো, অজন্তা ওর নতুন সংসার সাজাতে যে বাড়িটি পছন্দ ক'রেছে, সেটা বেশী দূরে নয়,—এই বাঙালী পাড়ারই মধ্যে, মাত্র কয়েক হাত তফাতের ফুলবাগান-ঘেরা ঐ গোলাপী রঙের বাড়িটা।...

বাড়িটা বেশ সৌখীন হিসেবেই তৈরী! কোন ইঞ্জিনীয়ারের নাকি হাওয়া বদল করার আবাস, মাঝে মাঝে ভাড়া দেয়,—ভাড়া নিচ্ছে উপস্থিত পার্থই...।

মায়া তাকালো বাড়িটার দিকে।..

বেশ বড় বড় ঘর, দরোজা, জানালা; এই বাড়ি থেকে স্পষ্টই দেখা যায় ও বাড়ির বেশীর ভাগ জায়গা, লতাকুঞ্জ, ফুলগাছ ঘেরা বাগান।...

একটা স্বস্তির নিশ্বাসই যেন বার হ'য়ে এলো অজানিতে। মনে হ'লো, অজন্তা এসে তাকে দিয়েছে অনেকখানিই,—পূর্ণ ক'রেছে তারও জীবনের অনেকটা জায়গা; এই নিয়মানুবর্তী সংসারের অনেক নিয়ম-কানুন সে শিথিল করেছে, ভেঙেছে হাসিতে, গানে আর গল্প দিয়েই বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যথা একটু অস্বস্তি মায়াকে মনে করিয়ে দিত তার সঙ্গে নিজের অযোগ্যতা—; যেন তুলনা জিনিসটা যেমন সুলভ তেমনি বেদনাময় করে তুলছিল দিন রাত্রির প্রতি মুহূর্তগুলি; এবার কিন্তু মায়া তা থেকে মুক্তি পাবে, ছুটি পাবে এই নিয়ম ভাঙার বিশৃঙ্খলতা থেকে।......

একটা স্বস্তি অনুভব করে মনের মধ্যে।......কিন্তু তবু কোথায় যেন কি একটা সামান্য অপূর্ণতা......মনের মধ্যে খোঁচা দেয়, মায়া চোখ বুজে কল্পনায় দেখে আবার তার আগের সেই সাজানো সংসার, সেই অনুশাসন! —তেল মাখার বাটি থেকে আর পান রাখবার কৌটাটির পর্যন্ত কোথাও নড়চড় নেই; বিশেষ সৌম্যের প্রত্যেক জিনিস !...

প্রতিদিন ঝেড়ে মুছে সযত্নে সাজিয়ে রাখা—!

পড়ার টেবিল থেকে স্নানের ঘর পর্যন্ত—! কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলতা, নিয়ম না মানার বিদ্রোহ নেই।—শান্ত,—সব শান্ত......সকলেই মানে ওর শাসন, সস্নেহ তিরস্কার।...

কিন্তু এরই মধ্যে বিশৃঙ্খলতা, এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে ক'রে ফেলেছিল অজন্তা; মায়ার তিরস্কার ভরা দৃষ্টি সে দেখেও দেখতো না; কেমন একটা উপেক্ষায় সৌম্যও ওকে যেন এড়িয়ে চলেছিল দিনের পর দিন; এ উপেক্ষা মায়ার মনের কোথায় বাজতো, তা সৌম্য জানতো না, চাইতও না জানতে; কিন্তু আজ অজন্তা আর পার্থকে বাড়ি থেকে বিদায় দিয়ে সেই সৌম্যই এসে দাঁড়ালো একেবারে রান্না ঘরের দরোজায়, যেদিকে পিছন ফিরে ব'সে মায়া রান্না করছে।

মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল মায়াঃ—

"তুমি যে এখানে?"

"এলুম একটু, তোমার ঘরকন্নার খবর জানতে, কেন? আসতে নেই?

উত্তরে মায়ার ইচ্ছে হলো বলে—

নেই কেন, আসাই তো দাবী তোমার; কিন্তু সে অধিকার যে তুমি ইচ্ছে করেই ত্যাগ করছো—সেটা তো তুচ্ছ কথার নয়! কিন্তু মুখে এলেও মায়া সে কথা প্রকাশ করলে না; বল্‌লে,—ও আবার কি কথা! নিত্য তোমার নতুন নতুন কথার ভাবার্থ বুঝতে আমার এদিকে প্রাণান্ত উপস্থিত হয়,—সে কথা বুঝেও যে তুমি না বোঝার ভাণ করো—এইটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ! যাক সে কথা,—আজ এমন সন্ধ্যায় কোথাও বেড়াতে গেলে না?

সৌম্য বল্‌লে,

কোথায় যাব?—

"কেন এতবড় দেশটা,—বেড়াবারই তো উপযুক্ত জায়গা; কত পথ, কত প্রান্তর, কত ছোট বড় পাথরের ঢিপি দিনরাত ইঙ্গিতে পথিকদের ডাকছে দূরে থেকে; সারা দিন রাতের আলো বাতাস, কিছুই কি তোমাকে সাহায্য করলে না ঘর ছাড়তে? আমি কিন্তু তোমার মত হলে নিশ্চয় যেতুম—।"

"যাও না, বারণ কেউ করবে না।—"

"করবে না যে তা আমিও জানি, কিন্তু তার আগেই নিজের মনে বারণ জাগে—; মনে হয়, যে শান্তি, যে সান্ত্বনা আমার হাতে গড়া ঐ ভাঁড়ার, ঐ রান্নাঘরের সঙ্গে সমস্ত সংসারটা সযত্নে ঘিরে রেখেছে তার চেয়ে আকর্ষণ বুঝি এ জগতে আমার আর কিছু নেই।......তাই ওদের ডাক আমার কানে পৌঁছায় না, মনও সাড়া দেয় না ওদের স্পর্শে।......

সে চুপ করলো; সৌম্যও চুপ করে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে, যেদিকে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের ফাঁক দিয়ে শুক্লা তিথির আধখানা চাঁদ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

মায়া ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকালো—।......

সৌম্য জিজ্ঞাসা করলেঃ—

কি তিথি আজ, মায়া?—

একটু ভেবে নিয়ে মায়া বল্‌লেঃ

বোধহয় দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে!—

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ!......ওপাশের ঘর থেকে ঠাকুর চাকরের কথাবার্তার স্বর ভেসে আসছিল, সেই সঙ্গে কানে আসছিল ইউক্যালিপ্‌টাস পাতার শির শির মৃদু শব্দ।......

সময় কেটে চল্‌লো।—

এক সময় চমকে উঠে সৌম্য ডাকলেঃ—

"মায়া!—"

মায়া পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল; পাশাপাশি দুখানা বেতের মোড়ায় বসলো দুজনে। সৌম্য বল্‌লেঃ—

"অনেক দিন পরে আজ হঠাৎ দেশের কথা, গ্রামের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়ছে নতুন করে।......এমনি কত জ্যোৎস্না রাত, কত নিভৃত অবসর সে স্মৃতিতে মাখামাখি, কত ভুলে যাওয়া কথা, হারানো রামপ্রসদী সুর, আর পাড়া প্রতিবাসীদের নিয়ে আনন্দ আর অশ্রুমাখা সে দিনগুলো পেছনে ফেলে চলে এসেছি মায়া! আজ আবার তাদের নতুন করে মনে পড়ছে।......

ক্ষণিকের জন্য মায়ার চোখের দৃষ্টিতে সংশয়ের একটা ম্লান ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল; ক্ষীণ হেসে বল্‌লেঃ—

"মানুষ তো সবাই এক প্রকৃতি নিয়ে তৈরী হয়নি, হয়ও না কখোনো; তাই কেউ অতীতের সূত্রে বর্তমানটাকে বেঁধে নিয়ে সব দিকে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে, আবার কেউ বা পারে না। যে পারে না, তারই মনের অন্তরালে ধীরে ধীরে যত গ্লানি জমে ওঠে সেটা ঢেকে রাখারও নয়, ভোলারও নয়; তাই হঠাৎ সামান্য কারণে যখন তার ধার করা আনন্দের আবরণ খসে পড়ে, তখনই সে তার সঞ্চয় দেখে চমকে ওঠে, ভেঙ্গে পড়ে। মনে জানে, এতবড় অপরাধ সামলে রাখবার ঠাঁই তার নাই—।"

সৌম্য নির্বাক।...

মায়া বল্‌লে—

মানুষের প্রকৃতির নিয়মই এই, এ ছাড়া চলার যে তার পথ নেই, তাই এ দোষ তো তোমার নয়! অনুভূতির যে বেদনা একদিন বাজবেই, তাকে তুমি ঢাকবে কেমন করে?"—

সৌম্য কথা বল্‌লে না তবুও, নির্বাকে মায়ার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে হাত বুলাতে লাগলো ওর করতলে, ওর আঙুলে।...মায়া বুঝলে সে হাত যেন কাঁপছে, আশ্রয় প্রত্যাশী ভীরু কপোতের মত।......

মায়া বুঝেছিল, সৌম্যের এ চিত্তচাঞ্চল্যের মূল কোথায়! তবু সে অভিমান করতে পারলে না, রাগও হলো না সৌম্যের ওপরে; বরঞ্চ পরম সান্ত্বনা ভরা স্বরে বল্‌লেঃ—

"তবু আজ বিগতের জন্যে যত বেদনাই মনের মধ্যে জমা থাক, তাকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে হবে এই বলে যে, একদিন যা পাওয়া যায়, চিরদিন তা থাকে না; তারই স্মৃতি নিয়ে স্বপ্ন রচনাও যেমন মিথ্যে, নিরন্তর কান্নাও তাই ক্লান্তিকর। তাতে শক্তিহারা প্রাণ নির্জীবই হয়ে পড়ে, নতুনকে আসবার অবকাশ দেয় না।

সৌম্য চমকে তাকালো মায়ার মুখের দিকে।

চাঁদটা এতক্ষণ গাছের আড়াল থেকে উন্মুক্ত আকাশে উঠে এসেছে, ওর অকৃপণ আলোয় দেখা যাচ্ছে মায়ার মুখ চোখ, সমস্ত অবয়ব।......শান্ত, শিষ্টতায় ভরা—!...যেন মূর্তিমান স্থৈর্য!

কিন্তু এ স্থৈর্য সৌম্যের অসহ্য।...কিছুক্ষণ আগে সে যার কাছে উদারতার আশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছিল, এখন মনে হচ্ছে তাতে কোনও আকর্ষণ নাই; আছে নিবেদন, প্রাণঢালা সমর্পণ! কিন্তু সে তা চায় না। সে চায় অধিকার;—কেড়ে নেবার দাবী, উত্তেজনা, উন্মাদনা। যে দাবী তাকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসবে আকর্ষণের রাশ ধরে—কর্তব্যের পথ-রাশ দেবে আলগা, নিষ্ঠার মোহ থেকে দেবে মুক্তি।......

হাতখানা ওর হাতের মুঠো থেকে টেনে নিয়ে সৌম্য উঠে দাঁড়ালো। মায়া সচকিত হয়ে উঠলো; যেন সৌম্যকে বিদায় দেবার পর্বটা এত তাড়াতাড়ি সারতে হবে বলে সে প্রস্তুত হয়নি; তাই হাঁপিয়ে উঠে প্রশ্ন করলেঃ—

"চল্‌লে?"......

বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে সৌম্য জবাব দিলেঃ—

"হ্যাঁ, কাজ আছে।—"

এর ওপরে আর আপীল চলে না।

জবাব দিয়ে সৌম্য চলে গেল, ওর দীর্ঘকান্তি ঢেকে গেল বরান্দার অন্তরালে, মায়া তবু সেইখানে বসে রইল তেমনি আড়ষ্টভাবে।....

সামনের আকাশে হাসছে আধখানা চাঁদ, ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে ঠাকুর চাকরের কথোপকথন আর জিনিসপত্র নাড়ানাড়ির মৃদু টুন্‌ টুন্‌ শব্দ;

হাওয়া এসে দোলা দিয়ে গেল মায়ার মুখের চারপাশের আলগা চুলে,—শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে।......

একবার ইচ্ছে হলো উঠে পড়ে এ সমস্ত অবসন্নতা ঝেড়ে, ছুটে যায় সৌম্যের কাছে, তারপর টেবিলের ওপোর থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় ওর কাগজপত্র, ওর কাজ কর্ম।......

কিন্তু না,—কোথায় যেন বাধে। সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ এক হয়ে ওর হাত দুখানা জোর করে চেপে ধরে; সমস্ত চেতনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দৃঢ়স্বরে,—অন্যায়! এ তার ঘোর

(শেষাংশ ৩৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্বন্ধ

অমূল্য পাল

দুজনে ঠোকাঠুকি লেগেই আছে।

সোনার বালাটা টানাটানি করে হাত থেকে খুলে সজোরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মণিমালা বললে, নাও তোমার বালা। আমি চাই না, চাই না। এত নীচ তুমি! আমার বালা বন্ধক দিয়ে টাকা আনবে? কেন আনবে? কি দরকার তোমার টাকার?

জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে প্রিয়তোষ উত্তর দিলে, না টাকার আর দরকার নেই। একজনের দরকার হয়েছিল তাই। বিপদে পড়েই আমার কাছে চেয়েছিলেন কিনা!

পৃথিবীর সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করি আর কি! কিন্তু বালাজোড়া যখন মহাজনের সিন্ধুক থেকে আর আমাদের ঘরে আসবে না তখন আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন কোন্ মহাপুরুষ?

মণিমালার সব কথা প্রিয়তোষের কানে পৌঁছল না, কারণ তার কথা শেষ হবার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মণিমালা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খাটের উপর। তারপর আরম্ভ হল দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা বৈ কি! এ সব বাজে কথা ভাববার তার কি প্রয়োজন! তবু সে ভাবতে বসল। কে সেই 'একজন' যাকে পঞ্চাশটি টাকা না দিলে কিছুতেই চলে না! আর সে লোকটাই বা কি রকম, মাসের শেষে এতগুলো টাকা চেয়ে বসেছে। তাছাড়া অন্যকে ধার দিলে তাদের চলে কি করে? হোক তার বিপদ। তাই বলে সাধের বালাজোড়া খোয়াতে যাবে নাকি? সংসারের কত খরচ বাঁচিয়ে চার মাস চেষ্টা করে সে এ গয়না গড়াতে পেরেছে।

আশ্চর্য তার স্বামী! কিছুতেই নামটি প্রকাশ করলে না। এর মধ্যে কোন মেয়েমানুষ নেই তো! ছাত্রজীবনে যে মেয়েটিকে সে ভালবাসত তার নাকি ভালো ঘরে বিয়ে হয় নি। এ টাকাগুলো তাকে দেবার জন্যে নয় তো? কিন্তু তাদের খোঁজ-খবর তো প্রিয়তোষ রাখে না। মেয়েমানুষের কি বিশ্বাস আছে, বিশেষ করে যারা অভাবে থাকে! কিন্তু তা কি করে সম্ভব। সে মেয়েটি তো বিয়েতে অমত করেছিল। বিয়ের আগে এসব জানলে প্রিয়তোষের সঙ্গে মণিমালার বিয়ে কিছুতেই মণিমালা ঘটতে দিত না।

দুবছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। যৌতুকের মেহগিনি কাঠের খাট-চেয়ার-টেবিল-আলনা এখনও আগের মত উজ্জ্বল রয়েছে। কিন্তু তার রূপ কি আর আগের মত নেই? প্রতিদিন সে আসবাবপত্র ঝেড়েমুছে উজ্জ্বল করে রাখে।—তার নিজের চেহারার দীপ্তি কি সে ঘসেমেজে ঠিক রাখতে পারছে না? তবে কি প্রিয়তোষ তাকে আর ভালোবাসে না? নইলে, তার কাছে সব কথা সে গোপন করে কেন? তাকে এড়িয়েই বা কেন চলে? দুই বছর আগে যে-খ্যাতি মণিমালা পেয়েছিল সে হচ্ছে রূপের জন্য। আজ আয়নার দিকে তাকালে তার কিছু দৈন্য চোখে পড়ে বটে। কিন্তু তাই বলে এত নগণ্য নয়।

আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মণিমালার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। সে নাকি কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার না সেক্রেটারী। মোটা টাকা মাইনে পায়। তা হলে মণিমালাকে সব সময় ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে চেঁচামিচি করতে হত না। আর এ গেঁয়ো শহরেও বাস করতে হত না। তার দাদা কি ভুলই না করলেন প্রিয়তোষের বাবার কথার ফাঁদে পড়ে গেলেন। মণিমালার যত রাগ তার শ্বশুর মশায়ের উপর। গাঁয়ের বাড়িতে থেকে যত কু-মতলব নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি টাকা চেয়ে পাঠান নি তো? তাঁর আবার টাকার কি দরকার। জমির আয় দিয়েই তো বেশ চলে।

আর ভাববার অবসর মণিমালা পেলে না। সান্ধ্যনিদ্রার পর শিশুপুত্রটি জেগে উঠেছে। তাকে এখন দুধ খাওয়াতে হবে।

ছেলেকে দুধ খাইয়ে এসে সে দেখতে পেলে, টেবিলের উপর চা সমেত কাপটি পড়ে আছে। হাত দিয়ে বুঝতে পারলে, চা হয়ে গেছে ঠাণ্ডা জল। না, তার দোষেই আজ প্রিয়তোষ চাটুকু পর্যন্ত খেতে পারলে না। কিন্তু প্রিয়তোষের দোষই বা কম কিসে? স্কুল থেকে এসেই কথাটা না পাড়লে কি হত না। সে তো জানেই যে, রাগ হলে মণিমালা কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না।......না-হয় প্রিয়তোষ বলেছেই। তাই বলে সে স্বামীকে এভাবে গালিগালাজ করবে নাকি? না, এ তার মস্ত বড় অন্যায়। ঝাড়া সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে চেঁচানোর পর কিছু মুখে না দিয়েই গেছে টুইশনি করতে। তাদের সুখে রাখবার জন্যেই তো প্রিয়তোষ এত পরিশ্রম করে। আর সে কিনা তাকেই রাগের মাথায় এমন সব কটু কথা বলে ফেললে যার জন্যে তার চা খাওয়া পর্যন্ত হল না। মণিমালার অনুশোচনার অন্ত নেই। তার হাতের উপর দু ফোঁটা উষ্ণ জল পড়ল। সে কাঁদছে।

পাশের বাড়ির গিন্নী রোজ সন্ধ্যায় এসে কিছুক্ষণ গল্প করে যান। সেদিনও তিনি এসে উঠন থেকে ডাকলেন, কিগো বৌ ঘুমিয়েছ নাকি?

ঘরের দরজায় এগিয়ে এসে মণিমালা উত্তর দিলে, না, আসুন কাকিমা। কাকিমা এলেন এবং যথারীতি নাতিটিকে আদর করবার জন্যে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কয়েকবার স্থূল দেহের সুপুষ্ট হাত নাড়লেন ও হাতির মত ছোট চোখদুটি ঘোরালেন এবং জিহ্বা ও তালু সহযোগে নানাপ্রকার শব্দ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু নিদ্রাতুর শিশুর কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে মণিমালার পাশে বসে বললেন, রমা (কাকিমার মেয়ে) বলে, তার চাইতে তোমার বালাজোড়ার গড়ন নাকি ভালো। আমি বলি, তা হতে পারে না। দেখি ছোট বৌ তোমার বালাজোড়া। মণিমালা বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিলে। কাকিমা বললেন, খোল তো দেখি। মণিমালা বাঁ হাতের বালাখানি খুলে কাকিমার হাতে দিলে। তিনি চোখদুটো কুঁচকিয়ে এ বালাখানির সঙ্গে কল্পিত বালাখানির গড়নের তফাৎ নিরীক্ষণ করে বললেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! দেখি ডান হাতের খানি।

ইত্যবসরে মণিমালার বিস্তৃত চক্ষু ছুঁড়ে ফেলা বালাখানির অনুসন্ধানেই ঘুরছিল। সে হঠাৎ বলে উঠলে, তাইতো কাকিমা খোকন ওখানি কোথায় যে ফেললে। আঃ ও যা দুষ্ট হয়েছে কাকিমা, কি আর বলব। উনি স্কুল থেকে এসে দেখলেন। দেখে রাখলেন এইখানে খাটের উপর। সুবিধে বুঝে শ্রীমান যে কোথায় ফেললে।

অল্প আলোতেও সোনা জ্বল জ্বল করে। সুতরাং মণিমালার চোখে বালাখানি পড়তে বেশি দেরি হল না। তা ছাড়া কোন্ দিকে ঐখানি গেছে সে খেয়াল তো মণিমালার ছিল।

খুঁজে-আনা বালাখানি মণিমাসার হাত থেকে নিয়ে দেখে কাকিমা বললেন, আহা হা ফেটে গেছে। যাক, ভালোই হয়েছে। এ জোড়া তো তোমায় ভেঙে গড়াতে হবে। এবার ঠিক আমাদের রমার মত করে গড়িয়ে নিও।

এর পর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কাকিমা প্রস্থান করলেন। প্রিয়তোষ বাড়ি ফিরল রাত দশটার পরে। ভৃত্যটি তার ঘরে·

বসে বইর উপর দুলে দুলে পয়ারের সুর ঠিক রেখে মহাভারত পড়ছিল।

খোকার পাশে মণিমালা শুয়েছিল, কিন্তু তার চোখে ঘুম ছিল না। প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে জামা ছেড়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মণিমালা উঠে ধীরে ধীরে তার কাছে গেল এবং বললে, কি গো, শুয়ে পড়লে যে! ওঠ, খাবে এস।

হেসে প্রিয়তোষ বললে, আজ আর খাব না, মালা। ছাত্রের ওখানেই খেতে হল। কিছুতেই ছাড়লে না। ওর আজ জন্ম-বার্ষিকী ছিল কিনা।

মণিমালা ঠিক করেছিল, স্বামীর রাগ ভাঙবার জন্যে এক সঙ্গেই বসে খাবে, কিন্তু তাতে বাধা পড়ল দেখে রুষ্ট মনেই বললে, আমিও খাব না, আমারও খিদে নেই। ভৃত্যটিকে উদ্দেশ্য করে বললে, হরি, খেয়ে-দেয়ে রান্নাঘরের শিকল তুলে এস।

চেষ্টা করেও প্রিয়তোষ ঘুমতে পারলে না। একে মণিমালার উপর রাগ, ফলে অনশন; তার উপর পঞ্চাশটি টাকা যোগাড়ের ভবনা কেবলই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। অনেক সময় সত্য কথা বলায় বিপদ আছে। তাই স্ত্রীকে এড়াবার জন্যে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। ছাত্রের বাড়িতে সে খায় নি, সেখানে কোন উৎসবও হয়নি। তাছাড়া আজ তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন দমে গেছে।

টাকা কয়টা চেয়েছেন তার বাবা। তাঁর উপর মণিমালার অকারণ রোষ আছে। তাই প্রিয়তোষ তার মন গলাবার জন্যে একজন দুঃস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি বলে একটা ফিকির এ'টেছিল, কিন্তু ধোপে টিকল না। পারতপক্ষে বাবা কখনও টাকা চান না। তিনি বেশ ভরসা করেই লিখে জানিয়েছেন, পঞ্চাশটি টাকা পেলে প্রিয়তোষের ছোট ভাই আশুতোষকে দিয়ে একটা ছোটখাট মুদিখানা খোলান সম্ভব। ম্যাট্রিক ফেল করে সে পড়াশুনো ছেড়ে সারাদিন এ-বাড়ি, সে বাড়ি আড্ডা জমিয়ে, তাস খেলে আর সন্ধ্যে বেলা শখের থিয়েটার করে দিনকে দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। একটা কাজে মন বসাতে পারলে তবুও সংশোধন হয়, সংসারের আয়ও কিছু বাড়ে। এ ছাড়া বড় ভাই হিসেবে প্রিয়তোষের কর্তব্য তো আছেই।

বড় ভাই হিসেবে কর্তব্য যেমন আছে স্বামী হিসেবেও তেমনি রয়েছে। স্বামীর কর্তব্যে চ্যুতি ঘটলে মিটিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু বাবা কিংবা ভায়ের সম্পর্কে শৈথিল্য ঘটলে পরিবর্তে মিলবে অপযশ, অবজ্ঞা এমন কি অপমান। বাবা এই প্রথম তার কাছে টাকা চেয়েছেন এবং ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই চেয়েছেন। অতএব যে কোন প্রকারে তাঁকে এ টাকা কয়টা যোগাড় করে দিতে হবে। মাস শেষ হতে আরও দুদিন বাকি। এ দুদিন আসতে কত দেরি মনে হচ্ছে। মণিমালার জন্যে অল্প বিস্তর বিলাস দ্রব্যের দরুণ যে টাকাগুলো খরচ হয়েছে, তা আজ হাতে থাকলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না। তার উপর দোষারোপ করে লাভ নেই। সে সুন্দরী। ছেলেবেলা থেকে মনটি বিলাস-মুখী করে গড়া। বিলাসচর্চা করে তৃপ্তি সে পায় সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকেও দিতে চেষ্টা করে। প্রিয়তোষ যতবার বোঝাতে শুরু করেছে বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে মনের সৌন্দর্য আসল, ততবার তাকে খণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

নিদ্রাহীন বিছানা ছেড়ে মণিমালা বাইরে এসে বসল। তারপর উঠে জানালা খুলে দেখলে, শীতের মরা জ্যোৎস্নায় সারা শহর ভরে গেছে। কুয়াসায় ঢাকা পৃথিবীর রূপ তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হল। খানিকক্ষণ দেখলে অপলক দৃষ্টিতে। শীতের ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস তার উষ্ণ কপালে শীতল স্পর্শ দিয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই তার ইচ্ছে হল প্রিয়তোষকে পাশে রেখে এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করে। কিন্তু সে বেরসিকের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। মণিমালা তার স্বামীর বিছানার কাছে এল এবং তার কপালে নরম-ঠাণ্ডা হাত-খানি রাখলে। পাতলা কম্বলটা গা থেকে সরে গেছে। সেটা টেনে ঠিক করে দিয়ে সে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লে।

পরদিন ভোরবেলা প্রিয়তোষ আশ্চর্য রকমের ভালোমানুষ হয়ে গেল। মণিমালা এত মিষ্ট ব্যবহার আশা করেনি। প্রতি ভোরে সে টুকরা-টাকরা কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। ভৃত্যটি শক্ত হাতে যখন প্রিয়তোষের সামনে চা দিয়ে যায়, তখন মণিমালার নরম আঙুল হয়তো কপালে চন্দনের টিপ আঁকতে থাকে ব্যস্ত।

সেদিন চা-হস্তে ভৃত্য হাজির হবার আগেই প্রিয়তোষ হাসি-মুখে ভণিতা করে মণিমালাকে বললে, নিজ হাতে চা তৈরী করে আনতে। আর এও জানালে যে, মণিমালার হাতে-দেওয়া আহার্য না পেয়ে কাল রাতে এক রকম তাকে উপোসে কাটাতে হয়েছে।

গম্ভীরমুখে হাসি ছড়িয়ে মণিমালা বললে, জানি, অন্যের বাড়িতে খেলে তোমার পেট ভরে না। তুমি যা লাজুক।

পূর্ণ যুবককে লাজুক বলার অপমানেও প্রিয়তোষ অপ্রিয় ব্যবহার করলে না। পনের মিনিটের মধ্যে মণিমালা চা নিয়ে এল, সঙ্গে কিছু জল খাবারও। প্রিয়তোষ ভাবল, এ ক্ষুদ্র সংসারের সব কাজে যদি তার স্ত্রী এত মনোযোগী হত, আর এমন ক্ষিপ্র হত তবে ভৃত্যটিকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হত। মাসে কয়েকটা টাকা অন্তত বাঁচত।

মণিমালা বললে, দেখ এখানে অনেকদিন ধরে আছি। বলছিলাম কি, তোমার বড়দিনের ছুটিতে যদি কোথাও বায়ু পরিবর্তন—

তাকে শেষ করতে না দিয়েই প্রিয়তোষ বললে, তা বেশ, ভালো কথা। তুমি গেলে সবাই খুব খুশি হবেন। বাবা খুশি হবেন মা খুশি হবেন, বাড়ির সবাই খুশি হবে।

তুমি দেখছি খুশির ঝড় বইয়ে দিলে। আয়ত চক্ষু বাঁকিয়ে মণিমালা বললে, কোথায় যাব বললে? তোমাদের গাঁয়ের বাড়ি?

হাঁ, হাঁ সেখানে গেলেই ভালো হয়। চমৎকার জায়গা। দুদিনে তোমার স্বাস্থ্য ফিরে যাবে দেখো।

বাঃ, তবেই হয়েছে। গাঁয়ে গিয়ে রোগ বয়ে আনি আর কি! জুতো পায় দিতে পারব না, ভালো জামা-শাড়ি পরতে পারব না। পরেছি কি ডাক পড়েছে। একটু আরাম করতে যেয়ে নিন্দে কুড়োতে পারব না বাপু। তা ছাড়া দুদণ্ড বসে কথা কইবার লোক নেই। সন্ধ্যে হতে না হতেই চারদিক নিঝুম। আমার রীতিমত ভয় করে। ও আমি পারব না।

তা বটে। আমি ভেবেছিলাম, গাঁয়ের হাওয়া তোমার বেশ ভালো লাগবে। তবে কি জান, দুদিনে সব সয়ে যায়।

যাদের সয় তাদের কথা আলাদা। দয়া করে ওখানে যাবার নামটি করো না।

এবার প্রিয়তোষ রুক্ষ না হয়ে আর পারলে না। তাই ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, এত দেমাক কিসের। গাঁয়ে কি মানুষ বাস করে না। তুমিই বা কোথাকার শহুরে মেয়ে? তুমি গাঁয়ে বড় হওনি? দুদিন শহরে বাস করে এত গর্ব! আর এটা শহর না ব্যাঙ। রাতে শেয়াল ডাকে, শহর! তোমার দাদা এখানে এসে বাস না করলে তো গাঁয়েই থাকতে হত।

মণিমালা রাগে লাল হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো থেকে আগুন ছুটছে যেন। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। চা খেয়ে কথায় কথায় শাড়ির আঁচলের এক কোণে রেখেছিল খালি কাপটা। খাটের উপর ছড়িয়ে পড়া শাড়ির আঁচল গুছাবার জন্যে টান দিতেই ওটা পড়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘরটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঝন ঝন শব্দে মুখরিত হল মাত্র।

দিন দুই পরে একদিন হঠাৎ প্রিয়তোষ বললে, একটু মুস্কিলে পড়লাম, মালা। কদিনের জন্যে হোস্টেলে গিয়ে থাকতে হচ্ছে।

গম্ভীর মুখেই মণিমালা জিজ্ঞেস করলে, কেন?

প্রিয়তোষ জবাব দিলে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সতীশবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাকেই তাঁর স্থানে দেখাশোনা করতে হবে।

আমি খোকনকে নিয়ে একলা থাকব নাকি?

তা কেন? তুমি এ ক'দিন তোমার দাদার বাসায় গিয়ে থাক। তুমি তো পরিবর্তন চেয়েছিলে! হাওয়া না হোক, স্থান পরিবর্তন হবে তো!

দাদার বাসায় যেতে হবে শুনে মণিমালা খুশিই হল। তাই মুখ টিপে হেসে বললে, ভাগ্যিস গাঁয়ের বাড়ির দিকে ঠেলতে চাও নি! ওখানে গিয়ে থাকতে হলে আমি কিন্তু মরেই যেতাম।

হেসে প্রিয়তোষ বললে, পাগল! স্ত্রী-হত্যার অপরাধ করতে যাই আর কি!

মণিমালা খিল খিল করে হেসে প্রিয়তোষকে একেবারে অবাক করে দিলে। সে প্রায় ভুলতে বসেছিল যে, তার স্ত্রী এমন সুন্দরভাবে হাসতে পারে।

কোমলকণ্ঠে মণিমালা জিজ্ঞেস করলে, তোমায় ওখানে ক'দিন থাকতে হবে গো?

বেশি দিন নয়। এই ধর মাসখানেক। তা আর বেশি কি! দেখতে-না-দেখতেই কেটে যাবে।

এতদিন দাদার বাসায় থাকব একেবারে খালি হাতে?

না, তা কেন? তোমায় দিচ্ছি কুড়ি টাকা। হোস্টেলে আমার একটা মাস দশ টাকায় চলে যাবে। বাকি টাকা কয়টা জমা থাক। কি বল? কত বিশেষ প্রয়োজন এসে দেখা দিবে।

হাঁ, হাঁ, তাই থাক। এবার বেশ শীত পড়বে মনে হচ্ছে। কার্তিকেই তার আভাস পাচ্ছি। গরম জামারও কিছু দরকার হবে। তাছাড়া বালা জোড়া যদি নতুন করে গড়ানো যায়।

মাইনে ও টুইশনিতে মিলে প্রাপ্ত আশি টাকার জমা-খরচের খসড়া এক মুহূর্তে হয়ে গেল।

পরদিন রবিবার। অতএব সেদিনই দুজনের সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হবার জন্যে প্রশস্ত। যাবার সময় মণিমালার মনটা খচ খচ করতে লাগল। প্রিয়তোষের হাত দুখানি চেপে ধরে সে বললে, ছুটকো-ছাটকা ছুটিতে এসে দেখা করবে ত!

কয়েকদিন পরে প্রিয়তোষের বাবা পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্তি-সংবাদের সঙ্গে পুত্রকে আশীর্বাদ জানিয়ে এক চিঠি লিখলেন। এবং এও জানালেন যে, বাড়ির সামনে রাস্তার উপর ছোট একটা মুদিখানা খুলে সেখানে আশুতোষকে বসিয়ে দিয়েছেন। চিঠিখানা লিখতে লিখতে বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত হয়েই উঠেছিলেন। তাই লিখেছেন, প্রিয়তোষকে দিয়ে সংসারের নানাবিধ উপকার হবে ভেবেই তিনি বছরের পর বছর অর্থকষ্ট সহ্য করে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। তিনি এও আশা করেন যে, বড় হয়ে খোকন তার পিতার আদর্শই অনুসরণ করবে। অনেক কথার পর সর্বশেষে প্রিয়তোষ ও বৌমাকে কোন ছুটি উপলক্ষ্য করে একবার যেতে লিখেছেন মুদি-খানা দেখে আসবার জন্যে।

কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে একদিনের ছুটিতে প্রিয়তোষ গাঁয়ে গেল। বৃদ্ধ বৌমা ও খোকনের না আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই গাঁ সম্বন্ধে স্ত্রীর মনোভাব চেপে যাওয়ার ইচ্ছেয় প্রিয়তোষ কোন কিছু না ভেবে ফস করে বলে ফেললে, খোকনের শরীরটা ভালো নয়। তাই এল না।

চোখ কপালে তুলে বৃদ্ধ বললেন, তোরা বুঝি আমার দাদুর তেমন যত্ন নিসনে। বৌমা একেবারে ছেলেমানুষ, কি করেই-বা হবে! অবহেলা করে দাদুকে ভোগাস নে। বলে তিনি চিন্তান্বিত হলেন।

বস্তুত 'খোকনের শরীর ভালো নয়' কথাটা প্রিয়তোষের তৈরি। সে হোস্টেলে চলে আসার পর একদিনও মণিমালার সঙ্গে দেখা করতে যেতে সময় পায়নি, আর সময় পেলেও যায়নি। কিন্তু কথাটাকে বাবা এত ভীষণভাবে গ্রহণ করেছেন দেখে সে বললে, না, না, এতে ভাববার কিছু নেই। কার্তিক মাস ঋতু পরিবর্তনের সময় কি না, তাই বোধ হয় শরীরটা ভালো নয়। ও দুদিনেই সেরে যাবে।

পরদিন হোস্টেলে ফিরে আসবামাত্র সতীশবাবুর সঙ্গে প্রিয়তোষের দেখা হল। তিনি খোলা মাঠে বসে ভোরের কাঁচা রৌদ্র উপভোগ করছিলেন। অসুস্থ হলেও তিনি এখন আর শয্যাশায়ী নন, যদিও প্রিয়তোষ তাঁর স্থলাভিষিক্ত। তিনি রসিকতা করে বললেন কি মশাই ব্যাপার কি? কাল যে আপনার কনিষ্ঠ গালাগালি করে (মানে শালা, সতীশবাবু তাই বলেন) চার-চারবার খোঁজ করে গেল। ওদিকে উনি বুঝি বিরহ-তাপে গলে গলে দিন কাটাচ্ছেন। যান যান দেখে আসুন।

সতীশবাবুর মুখে শোনা এমন একটা হালকা কথায় প্রিয়তোষ তেমন গুরুত্ব আরোপ করলে না।

বিকেল বেলা কনিষ্ঠ শ্যালকটি সশরীরে হাজির। সে জানালে যে, খোকনের হঠাৎ জ্বর হয়েছে; প্রিয়তোষকে এখনই যেতে হবে। প্রিয়তোষ কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না। অতিবড় প্রিয়জনের অশুভ সংবাদ বিশ্বাস করতেও সময় লাগে। কাল যে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়েছিল, তা কি আজ নির্মম সত্যরূপে দেখা দিল! না এটা মণিমালার চালাকি? তাকে ওখানে টেনে নেবার জন্যে কি এরূপ সংবাদ পাঠিয়েছে? যাক, তবু সে গেল।

মণিমালা গম্ভীরই বটে, কিন্তু সেদিনকার গাম্ভীর্য তার মুখে যেন অস্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। জ্বরে অচৈতন্য খোকনের পাশে বসে আছে সে। প্রিয়তোষকে দেখে একটা কথাও বললে না, একটা শব্দও করলে না। কিন্তু সন্ধ্যার পর একটা নিরালা ঘরে স্বামীকে ডেকে এনে মণিমালা বললে, জানি গাঁয়ের বাড়ি গিয়েছিলে। সেখানে যাবার সময় হয় আর এ কদিনের মধ্যে এখানে আসতে সময় পেলে না। আমাদের কোন খবর নেবার প্রয়োজন মনে করলে না। কিন্তু হঠাৎ সেখানে যাওয়া হয়েছিল কেন জানতে পারি কি?

হাঁ। বাবার একটা দরকারে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু দরকারটা কি সেটাই মশায়কে জিজ্ঞাসা করছি।

বাবা আশুতোষকে দিয়ে একটা মুদিখানা খুলিয়েছেন। গিয়েছিলাম সেটা দেখতে।

মুদিখানা? বেশ কথা। এখন জামা ছেড়ে ফতুয়া পরে দুভায়ে কাজে লেগে যাও। কথাটা বলতে একটু লজ্জা হল না!

লজ্জার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তোমার রুচিতে বাধতে পারে। কিন্তু তাই বলে যাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তাদের আমি ভাসিয়ে দিতে পারি না।

সম্বন্ধটা বুঝি শুধু তাদেরই সঙ্গে। আর আমরা হলুম পর। আমরা বুঝি নদীর জলে ভেসে এসেছি।

না, তা নয়। তারা একদিক আর তুমিও খোকন একদিক, মাঝখানে আমি। তোমাদের ভাবনাও ভাবতে হবে আমাকেই।

কিন্তু খোকনের চিকিৎসার ভাবনা কি ভেবেছ? ওর জ্বর তো কিছুতেই নাবছে না। আমায় যে টাকা কটা দিয়েছিলে তা ফুরিয়ে গেছে। দাদার কাছে আমি হাত পাততে পারব না। তোমার হাতে নিশ্চয় এখনও টাকা আছে।

না নেই। যা ছিল বাবাকে দিয়েছি।

ও।

এর বেশি মণিমালার বলবার প্রবৃত্তি হল না। সে খোকনের ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

প্রিয়তোষ বললে, তা বলে ভেব না মালা, খোকনের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে না। তা হবে। খোকন শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে।

চিকিৎসা চলতে লাগল কিন্তু জ্বর কমলো না। এর মধ্যে প্রিয়তোষের ধার করে পাওয়া টাকা ফুরিয়ে গেল। বেগতিক দেখে সে

তার বাবাকে চিঠি লিখে সব জানালে। চিঠি পেয়ে বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন।

শ্বশুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মণিমালা অশোভন ব্যবহার করে ফেললে। এর জন্যে সে তৈরী ছিল না, আবেগের বশে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে, তা সে নিজেও ভাবে নি। শ্বশুর পুত্রবধূর কাছ থেকে এমন তাচ্ছিল্য আশাই করেননি। মণিমালা শ্বশুরকে যথারীতি একটা প্রণাম করলে না, কুশল জিজ্ঞাসাও করলে না। গুমট মুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পুত্রবধূর কাছ থেকে এরূপ অবজ্ঞা পেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন।

এ কদিনের জ্বরে নাদুস-নুদুস খোকন পাঁকাটির মত শুকিয়ে গেছে। তার জীবনীশক্তি যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। এ কদিনের মাটির ঋণ শোধ করবার জন্যে যেন সে তার ক্ষুদ্র ক্ষমতা উজাড় করে দিচ্ছে। নিস্তব্ধ ঘরটায় শুধু শোনা যায়, তার কাতরানি আর হাঁস ফাঁস। মৃদু অথচ তীক্ষ্ম, হৃদয়ে কাঁটার মত বেঁধে। বৃদ্ধের কালো মুখ বিষাদে আরও কালো হল।

নিভৃতে তিনি প্রিয়তোষকে ডেকে বললেন, আমি ভেবে অবাক হচ্ছি প্রিয়, তুই কি করে এত পরে আমায় সংবাদ দিলি। আমায় জানালি তখন যখন দাদু আমাদের ফাঁকি দিতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু প্রিয়, ওকে যে বাঁচাতে হবে। আমার বংশের সলতে নিবতে দিতে পারি না রে। জানিস, ওকে ঘিরে আমার কত কল্পনা জেগে থাকে। দেখ, তোরা এ যুগের মানুষ ভগবান মানতে চাসনে, কিন্তু আমি মানি। ভগবান আমায় নিরাশ করবেন না, আমার কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে দেবেন না। এখনও সময় আছে। নতুন ডাক্তার ডাক, বেশি টাকা দিয়ে বড় ডাক্তার আন।

প্রিয়তোষ চুপ করে রইল। তার টাকার যে অভাব তা আর বাবাকে জানায়নি। এখানেই তার সংকোচ। ছেলের ভাবখানা বুঝতে পেরে বাবা বললেন, দেখ প্রিয় আমার সঙ্গে দুটো জিনিস আছে, পঠন না মোগল আমলের মোহর। সাবেকি জিনিস, বড় দামি। তবে কি করে আমাদের ঘরে এল তা বলতে পারব না। আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। সাবেক আমলের কর্তাদের হাত ঘুরে ঘুরে এসে আমার হাতে রয়েছে। এ দুটো নে। বন্ধক দিয়ে হোক, বেচে হোক টাকার যোগাড় কর। আমার দাদুকে বাঁচাতে হবে। বংশের আলো যেন না নেভে।

এ পুরাণো জিনিস দুটো থাক বাবা, হাত ছাড়া করবেন না। টাকার ব্যবস্থা আমি করছি।

ধার করবি তো! বুঝতে পারি রে এরি মধ্যে তোকে অনেক ধার করতে হয়েছে। আর ধারই বা কত পাবি। আমার এ দুটো হল বিপদের সম্বল। আপাতত বন্ধক দিয়ে টাকা আন। তারপর সুবিধে মত আবার আমাদের হাতে ফিরে আসবে।

এবার দ্বিরুক্তি না করে মোহর দুটো নিয়ে প্রিয়তোষ ঘর থেকে বেরল, কিন্তু উঠানে পা না দিতেই দেখতে পেলে মণিমালা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের জল গালের দু পাশ বেয়ে পড়ছে। প্রিয়তোষ শান্ত কণ্ঠে বললে, মালা, তুমি কাঁদছ। এখনও আশা রাখ। এবার শেষ চেষ্টা। খোকনকে শহরের সেরা ডাক্তার এনে দেখাব। আজই।

এত অল্প সময়ের মধ্যেই মণিমালার মন বদলে গেছে। শ্বশুরের প্রতি রুদ্ধ অভিমান এক আঘাতেই টুটে গেছে, ভোরবেলার নতুন সূর্যরশ্মি যেমন এক আঘাতেই ঊষার আবরণ টুটে ফেলে। সে বললে, তোমাদের কথাবার্তা বাইরে থেকে সব শুনেছি এবং দেখেছি শ্বশুর মশায় লক্ষ্মীর ঝাঁপির মোহর দুখানা তোমার হাতে দিয়েছেন বন্ধক দেবার জন্যে। এ দুটো আমি চিনি। বিয়ের সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ এ দুটো আমার কপালে ঠেকিয়ে আমায় বরণ করেছিলেন। এ আমি অন্যের হাতে যেতে দেব না। আমি সংসারের অকল্যাণ ডেকে আনব না। দাও, আমায় দাও, আমি শ্বশুর মশায়ের হাতে ফিরিয়ে দেব। জাননা, আজ আমি কতখানি আঘাত পেয়েছি। আর চেয়ে আমি তোমায় যা দিচ্ছি তা নাও। এদিয়ে টাকার যোগাড় কর। আমার খোকনকে বাঁচাও।

বিমূঢ় প্রিয়তোষ দেখলে, মণিমালা তার হাতে সাধের বালা-জোড়া ও বিয়ের সরু হারটি গুঁজে দিয়েছে।

নতুন ডাক্তার এসে খোকনকে নতুনভাবে পরীক্ষা করে জানালেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। ভুল চিকিৎসা না চললে অনেক আগেই রোগ সেরে যেত।

চক্রবাল

(৩৬৭ পৃষ্ঠার পর)

অন্যায়! যা তার প্রাপ্য, সেটুকু সৌম্য তাকে দিয়েছে, অনেক আগেই মিটিয়ে দিয়েছে তার সে প্রাপ্যগণ্ডা, আর তার সীমানা ছাড়িয়ে হাতপাতা তার পক্ষে অনধিকার অত্যাচার। এত অত্যাচার হয়তো সৌম্য সইবে না। শাসকের কঠিন সঙ্কেতে ফিরিয়ে দেবে তাকে,—বুঝিয়ে দেবে তার অধিকার—ঐ সংসার রচনায়; ঐ বাক্স-পেট্‌রা আর ডেক-ডেক্‌চির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ওর বেশী নয়। ওর বেশী যেন আর সে পা না বাড়ায়, হাত দুখানাও মেলে যেন না ধরে সম্মুখে, ধরলেও পাবে না; ভিক্ষা দেওয়ার মত মনোবৃত্তি আর যার থাকে থাক, সৌম্যের নেই।—

মায়া যেন একবার সন্ত্রাসে শিউরে উঠলো, তারপর উঠে এলো রান্নাঘরের মধ্যে।—

রান্নার এটা ওটা ঢাকা দিয়ে যথাস্থানে তুলে গুছিয়ে খাবার আয়োজন করতে করতে মন্ত্রোচ্চারণের মত বারম্বার নিজের মনেই আবৃত্তি করতে লাগলো:—

এই ভালো,—আমার পক্ষে এই ভালো, এই ভালো; পাওয়ার মধ্যে এইটুকুই আমার যথেষ্ট,—এর বেশী আমি চাইনে—।—

ক্রমশ

লোকাপসরণের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া

শ্রীঅনিলকুমার বসু, এম এ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক সমস্যাগুলি ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। আসল মানুষটাকে বাদ দিয়া তার রাশীকৃত ধনরাজি কেবল ধন-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। বস্তুত মানুষকে প্রতিদিনকার লেনদেনের ভিতর দিয়া জানিবার একটি নির্দেশ আমরা অর্থনীতি শাস্ত্র হইতে পাই। একদিক দিয়া এই শাস্ত্রটাকে মানুষের আর্থিক সুখ দুঃখের একটি বিবরণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এইখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল সুখ দুঃখ ও সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধ করিলেই আমাদের কাজ ফুরাইল না। ইহার মধ্য হইতে ঐ সকল সমস্যার সমাধানও আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রকৃত অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠের সার্থকতাই ঐখানে। বর্তমান জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধে আমাদের দেশের বিপজ্জনক এলাকা হইতে লোকাপসরণের ফলে কত যে সমস্যার উদয় হইয়াছে তাহাও আমরা অর্থনীতিশাস্ত্রেরই বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্যাগুলি বিবেচনা করিবার অনেক কিছুই আছে। আমরা তাহা বর্তমান প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রথমেই দেখিতে হইবে যে স্থান হইতে লোকসংখ্যা অপসৃত হইল সেইখানে কি কি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল এবং যেখানে ঐ সকল লোক একত্রিত হইল বা ছড়াইয়া পড়িল, সেই সকল স্থানে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হইল। তাহা হইলেই আমরা গোটা বিষয়টার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব। এই সকল ব্যাপার লইয়া ইংরেজীতে "migration problems"-এর উৎপত্তি। এই সমস্যা জগতের অন্যান্য জাতিরও সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার প্রতিলোককল্পে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিপক্ষে কত সব নূতন নূতন আইন পাশ হইল, কত প্রতিবাদ-সভা মুখর হইয়া উঠিল ! শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশেও Indo-Burma Immigration Bill পাশ হইল। সিংহলে ইয়া লইয়া ভারতীয়দের সঙ্গে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে। বিহারে এই লইয়া বাঙালীদের মাঝে বিরাট বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে "migration"-এর এই ব্যাপক বিষয়গুলি আমাদের আলোচ্য নয়। কয়েকটি সমস্যা লইয়াই আমরা আলোচনা শুরু করিব। প্রথমেই বলিয়াছি, কোন এলাকার আর্থিক জীবনের উপর লোকাপসরণের কি প্রতিক্রিয়া হইল তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই অপসরণকারী লোকের মধ্যে যদি শ্রমিক সংখ্যাই প্রবল হয়, তবে ফ্যাক্টরী, ডক্ ইত্যাদি স্থায়ী বস্তু উৎপাদনকারী কারখানাগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই সব কারখানার কার্যপ্রণালী আয়ত্ত করা বহুদিনের শ্রম ও শিক্ষা সাপেক্ষ। রাম শ্যাম যে-কেহই ইচ্ছা করিলেই এই সব কাজে পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে না। কাজেই কারখানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক সকল চলিয়া গেলে তাহাদের স্থানে কাজ করিবার মত উপযুক্ত অন্য শ্রমিক সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাইবে না। ফলে কারখানার কাজ অনেকখানি ব্যাহত হইবে এবং তাহাদের উৎপাদনও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে। বর্তমান অবস্থায় জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে অনেক শ্রমিক কলিকাতা পরিত্যাগ করায় কারখানাগুলির কাজের পরিধি বহুলাংশে সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছে। অপরপক্ষে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঐ সকল উপকরণের চাহিদাও এখন অনেক বেশী। ফলে চাহিদা অনুপাতে জোগান কম হইতেছে বলিয়া ঐ সকল উপকরণের দরও বাড়িয়া যাইবে। যে পর্যন্ত না এই সকল কারখানায় কাজ করিবার মত উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া যাইতেছে, সে পর্যন্ত কারখানাজাত জিনিসের জোগান সীমাবদ্ধ আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, উপরোক্ত অবস্থায় ইচ্ছানুসারে জোগান বৃদ্ধি করিতে পারা যাইতেছে না। ফলে যে বর্ধিত মূল্য ঐ সকল কারখানার মালিকগণ এই অল্প সময়ের জন্য পাইতেছেন, তাহাকে অধ্যাপক মার্শেলের ভাষায় "Quasi-rent" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে আবার দেখিতে হইবে, ঐ সকল শ্রমিক যে স্থানে আসিয়া ভিড় করিল সেখানে কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। সাধারণতঃ শ্রমিক শ্রেণীর সঞ্চয়বৃত্তি অত্যন্ত কম। কাজ না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকার মত অর্থসংস্থান তাহাদের নাই। তাহাদিগকে শ্রমের বিনিময়েই অর্থোপার্জন করিতে হয়। বিনা শ্রমে থাকা মানে বিনা আয়ে দিন কাটান। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া আবার কাজের সন্ধান ঐ স্থানেই করিতে হইবে। এই সকল স্থানে যদি তাহাদের শিক্ষা উপযোগী কোন কাজ না জোটে, তবে তাহাদিগকে পেটের দায়ে অন্য যে কোন কাজে ভর্তি হইতে হইবে। এই দিক দিয়া দেশের পক্ষ হইতে ইহাকে ক্ষতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যে কাজে তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা, সেই কাজে যোগদান করিয়া তাহারা জাতীয় আয় যেভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিত, সেই তুলনায় অন্য সব কাজে তাহারা আশানুরূপ কিছুই করিতে আপাতত সক্ষম হইবে না। কিন্তু ঐ সকল স্থানে যদি তাহাদের শিক্ষা উপযোগী কাজ থাকে, তবে দেশের দিক দিয়া কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। কারণ, পূর্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া কাজের যতটা ক্ষতি হইবে, আবার নূতন স্থানে অনুরূপ কাজ করিয়া ততটা ক্ষতির পূরণ হইবে। কিন্তু শ্রমিকের দিক হইতে তাহার আয় কমিয়া যাইবে। কারণ যে স্থানে আসিয়া সে নূতন কাজে ঢুকিল, সেখানে শ্রমিকসংখ্যা পূর্ববৎ আছে। নূতন শ্রমিক আসিয়া সেখানে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিল তাহাতে তাহাদের মাথাপিছু আয় কমিয়া গেল। অপরদিকে বিপজ্জনক এলাকা-স্থিত কারখানার মালিকগণ অধিক বেতন দিয়া নূতন শ্রমিক আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইবেন। ফলে সেই সকল এলাকায় শ্রমিকের ভাতা অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে কলিকাতায় এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত লোকাপসরণের ফলে বিপজ্জনক এলাকার জায়গা-জমির দরও পড়িয়া যাইবে। কেহই ঐ সকল স্থানে নূতন জমি বা বাড়ি কিনিবার উদ্যোগ করিবে না। জমি ক্রয়ে কেহ কেহ ইচ্ছুক থাকিলেও বাড়িক্রয়ে অনেকেই অগ্রসর হইবেন না। অবশ্য ধুরন্ধর ব্যবসায়ীদের কথা আলাদা। কারণ, তাহারা এই সুযোগে ভবিষ্যৎ লাভের আশায় কম দরে অনেক জায়গা জমি কিনিতে পারেন। বিপজ্জনক এলাকা পরিত্যাগের দরুণ ঐ সকল স্থানের বাড়িভাড়াও পড়িয়া যাইতে বাধ্য। বাড়ি অনুপাতে ভাড়াটিয়ার সংখ্যা কমিয়া গেলেই ভাড়াও কমিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বাড়ির মালিকগণ তাঁহাদের বাড়ি শূন্য না রাখিয়া কম ভাড়ায় ভাড়াটিয়া রাখিতে রাজি হইবেন। এই দিকে বাড়িওলাদের ভাড়া বাবদ মাসিক আয় কমিয়া যাইবে। কিন্তু কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি তাহাদিগকে ঠিক মতই পুরোপুরি দিতে হইবে। এমতাবস্থায় তাহাদিগের ট্যাক্স কিছু কমাইয়া দেওয়া বা ট্যাক্স হইতে সাময়িক রেহাই দেওয়া কর্পোরেশনের বিধেয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে, যেখানে আশ্রয়প্রার্থীরা আসিয়া ভিড় করিবে সেখানে কিন্তু বাড়ি ভাড়া বাড়িয়া যাইবে। বর্তমান অবস্থায় মফঃস্বল অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া যে কিভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে তাহা অপসরণকারী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

তৃতীয়ত মফঃস্বল অঞ্চলে অধিক লোকের আগমনের ফলে স্থানীয় বাজারে অর্থের প্রাচুর্য দেখা দিবে। এই দিক দিয়া লোকাপসরণের একটি সুফল দৃষ্ট হয়। সাধারণ সময়ে মফঃস্বল অঞ্চলে অর্থের চলাচল শহরের তুলনায় সামান্য থাকে। সেখানে অর্থের ক্রিয়াশীলতা কম থাকায় অর্থকৃচ্ছ্রতাই বেশী করিয়া অনুভূত হয়; ফলে সুদের হার অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায়। শহর অঞ্চলে অল্প সুদে অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু মফঃস্বলে চড়া সুদেও ধার পাওয়া দুষ্কর। অর্থের চলাচলে এরূপ অসমতা জাতির পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। ফলে নগরগুলিতে ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু পল্লী অঞ্চলগুলি টাকার অভাবে শীর্ণতর হইয়া পড়িতেছে। Goldimthএর 'Wealth accumulates and war decay' কথাটি যে কত সত্য তাহা একবার আমাদের দেশের দিকে তাকাইলেই সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। সে কথা যাক্, এখন কথা হইতেছে এই যে, অত্যধিক টাকা চলাচলের ফলে মফঃস্বল অঞ্চলে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং স্থানীয় ব্যবসায় বাণিজ্য কতকটা জাঁকিয়া বসে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু চাষীদের হাতেও অল্পবিস্তর অর্থ জমা হয় এবং অন্যান্য সময়ের তুলনায় তাহাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি দেখা দেয়; তবে এই সাচ্ছল্য যে সাময়িক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। ঐ সকল অঞ্চলে বিপজ্জনক এলাকা প্রত্যাগত ব্যবসায়ীরা যদি তাহাদের গুটান ব্যবসায় আবার নূতন করিয়া পাতিয়া বসেন, তবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে হয়ত জিনিস-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা প্রশমিত হইতে পারে। ব্যবসায়ী মহলে এইরূপ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইলে তাহাদের গড়পড়তা লাভের অঙ্কটাও কিঞ্চিৎ কম হইতে পারে। বিশেষত যে সকল পুরাতন ব্যবসায়ী ঐ সব স্থানে নির্বিবাদে এতদিন একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেন, তাহাদের লাভের অংশ নিশ্চয়ই ন্যূনতর হইবে। যদি কোন কুশলী ব্যবসায়ী ঐ সকল অঞ্চলের শিল্পসম্পদ পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থানোপযোগী কোন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন তবেই দেশের ও দশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। বর্তমান নাগরিক সভ্যতার ইহাই একটি কুলক্ষণ যে সকল শিল্প-কারখানাই নগরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন শিল্প একস্থানে কেন্দ্রীভূত (localized) হওয়ায় নানারূপে সুবিধা আছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে নগরের সম্পদই বাড়িতেছে আর বাহির অঞ্চলের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বর্তমান সুযোগে মফঃস্বল অঞ্চলে নূতন নূতন শিল্প গঠিত হইলে উপরোক্ত কুফল চিরকালের মত দূরীভূত হইবে এবং দেশের সমষ্টিগত সমৃদ্ধি সকল দিক দিয়াই বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং এই সময়েই শিল্পকেন্দ্র একস্থানে না করিয়া স্থানে স্থানে ছড়াইয়া রাখা উচিত। ইংরেজীতে ইহাকেই বলে— decentralization of industries as opposed to localization. এ বিষয়ে শিল্পকুশলিগণ মনোনিবেশ করিতে পারেন। এই ত গেল মফঃস্বল অঞ্চলের কথা। পরিত্যক্ত এলাকায় মূল্যের গতি কোন মুখী হইবে তাহাই এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয়। প্রথম হিড়িকে অনেকেই তাহাদের হস্তস্থিত মজুদ মাল যে কোন দরে বাজারে ছাড়িয়া দিবেন। অতএব সাময়িকভাবে মূল্যের গতি নিম্নগামী হইবে। কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলেই বাজার দর আবার ঊর্ধগতি হইবে। কারণ অনেক বিক্রেতা স্থান ত্যাগ করায় চাহিদা অনুপাতে সাধারণভোগ্য বা আহার্য দ্রব্যের জোগান সেরূপ মিলিবে না। কাজেই জিনিসের দরও স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবে। কলিকাতার লোকাপসরণের দরুণ প্রথমদিকে জিনিসের দরটা একটু কমিয়াছিল। আবার এক্ষণে ঐ সব পণ্য-মূল্যের বৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিতেছে।

এই হিড়িকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দুইস্থানে বসতি থাকায় আয় হইতে ব্যয়াধিক্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। ঋণ না হইলেও অনেকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও পরিমাণ ব্যয়াধিক্যবশত ক্ষীণতর হইতে বাধ্য. সঙ্গে সঙ্গে চলতি টাকার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া বাজার দর বাড়িয়া যাইবে। এই বাজারে সব-চেয়ে লাভবান হইবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাহারা বিভিন্ন উপায়ে টাকা খাটাইয়া নূতন নূতন আয়ের পন্থা উদ্ভাবন করিবে। ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স ইত্যাদি ব্যবসায়ের পক্ষেও বর্তমান সময় অনুকূল। ব্যাঙ্কগুলির আমানত কিভাবে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবেই পরিস্ফুট। পরিত্যক্ত এলাকা হইতে যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকেই তাহাদের ব্যাঙ্কস্থিত সঞ্চিত অর্থ কিছু কিছু তুলিবেন। তাই প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ব্যাঙ্কগুলিকে লোকের চাহিদা অনেকখানি মিটাইতে হইবে বলিয়া সাময়িকভাবে তাহাদের আমানতের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ব্যাঙ্কের টাকা তুলিয়া নেন। কিন্তু কয়েক মাস বাদেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে বিপুল অর্থ জমা হয়। পরিত্যক্ত

এলাকাস্থ ব্যাঙ্কগুলির আমানত সাময়িকভাবে কিছু হ্রাস পাইলেও নিরাপদ অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলির লোকাগমনের ফলে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই মোট হিসাবে ব্যাঙ্কের আমানত কমিবার কোন কারণ নাই। অপরদিকে লোকাপসরণের ফলে রেল, স্টিমার, যানবাহনাদির আয় অস্বাভাবিক বাড়িয়া যাইবে। গত বৎসর রেল কোম্পানীর সকল ব্যয় চুকাইয়াও সর্বসাকুল্যে ১৪·৮৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসেই রেল কোম্পানীগুলি যে আয় করিয়াছিল ১৯২৪ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গত ষোল বৎসরের মধ্যে পুরাপুরি ১২ মাস কাজ করিয়াও তাহারা সেইরূপ আয় করিতে পারে নাই। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে রেল কোম্পানীগুলির মোট লাভ শতকরা ১২৬% বর্ধিত হইয়াছে। কাজেই বর্তমান দুর্যোগ রেল কোম্পানীগুলির একরকম সুসময়। এই জন্যই কথায় বলে 'কাহারও পৌষ মাস কাহারও সর্বনাশ।' তবে বর্তমান সময়ে বাজারে speculation বড় জোর চলিতেছে; কাজেই জিনিসপত্রের দর কতটুকু উঠিবে বা পড়িবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ব্যবসায় বাণিজ্যের গতিও কোন দিকে ধাবিত হইবে তাহা নির্দিষ্টভাবে জানার উপায় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মবৎসর

(প্রতিবাদ)

মাননীয় 'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

১৭ই পৌষের 'দেশ'এ (১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাঙলার জাতীয় জীবন ও জাতীয় সংগীত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' অংশে যোগেনবাবু লিখিয়াছেন,—'ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এবং বাঙলা ১২১৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন ... জন্মগ্রহণ করেন।—পৃঃ ২৬৬। গুপ্ত কবির বাঙলা জন্ম-তারিখ ঠিকই লেখা হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে (পৃঃ ৯৮), শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকে (পৃ ৮) এবং বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে (পৃঃ ২৭১) উহাই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকেই নিঃসন্দেহে গুপ্ত কবির যথার্থ জন্ম-তারিখ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮১১ খৃষ্টাব্দে না হইয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হইবে। কারণ ঐ বৎসর পৌষ মাসের মাঝামাঝি ইং ১৮১২ অব্দ আরম্ভ হইয়াছে—ইহা গাণিতিক হিসাব, ইহাতে ভুল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা, সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের বৎসরঃ—কোন বৎসর ইহা প্রকাশিত হয়, ১৮৩০ না ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে? যোগেনবাবু প্রথমে ১৮৩১ লিখিলেও পরে Rev. J. Long-এর লেখা উধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, উহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি মতের মধ্যে কোনটা ঠিক তাহার বিচার তিনি করেন নাই—মাত্র বলিয়াছেন, ঐ সম্পর্কে একটা মতভেদ আছে। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই দেখা যাইবে Rev. J. Long-এর এই উক্তি ভুল। সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত হয়, ২৮ জানুয়ারী, ১৮৩১ (১৬ মাঘ, ১২৩৭)। উপরের যে তিনখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক পুস্তকেই উহা ১৬ই মাঘ, ১২৩৭ বলিয়া লেখা হইয়াছে। ইহা বাদে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাঙলা সাহিত্যের কথা (১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২২) পুস্তকেও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকেই প্রভাকর প্রকাশের প্রমাণ-সিদ্ধ তারিখ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে প্রভাকর প্রকাশের ইংরেজী অব্দ ১৮৩০ না হইয়া ১৮৩১ হইবে। বাঙলা ১২৩৭ সালের পৌষের মাঝামাঝি ইংরেজী ১৮৩১ অব্দ শুরু হইয়াছিল। সম্ভবত লং সাহেব বাঙলা সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিয়া ইংরেজী সাল বাহির করিয়াছিলেন—মাসের হিসাব তিনি করেন বলিয়া এই ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে।

যোগেনবাবু একটু চেষ্টা করিলেই দুইটি ভুলই দেখিতে পাইতেন।

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর,
ইসলামকাটি পোঃ,
খুলনা।

যা ঘটে তাই

মালবিকা রায়

...গলা, বৈকুণ্ঠে
মনে রেখে
...দার।"
...না

সুধীরার চোখে আজ শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরারও। সকাল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই বোনের চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়। আজ সুধীরাকে দেখিতে আসিবে। দুই বোনের অবিশ্রান্ত কান্নার কারণ তাহাই। সুধীরার বয়স তেরো, ইন্দিরার বয়স নয়। আজ পাঁচ বৎসর ইহারা মাতৃহারা। তখন হইতে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে লতার মত বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। পিতা সুরদাস আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্যমনস্ক গম্ভীর প্রকৃতি প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পর এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার মধ্যে এই মাতৃহারা বালিকা দুটি কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই। তাই ইহাদের পরস্পরের জীবন পরস্পরকে ঘিরিয়া। আজ সেই পরস্পর-সম্বন্ধ জীবন হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের অমূলক ভীতির আর একটি কারণ আছে। ইহাদের পাশের বাড়ির মেয়ে বীণার আজ এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠায় নাই। উপরন্তু, মারধোর প্রভৃতি নানা অত্যাচারের কাহিনী শোনা গিয়াছে। সেই কাহিনী শোনা হইতে ইন্দিরা সুধীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা কখনো বিবাহ করিবে না। শ্বশুরবাড়ি তাহাদের নিকট দৈত্যপুরী অপেক্ষাও বিপদসঙ্কুল স্থানে পরিণত হইয়াছে। ইতি-মধ্যে এই দুর্বিপাক আসিয়া হাজির। উদাসীন সুরদাসের সুধীরার বিবাহ সম্বন্ধে কোন হুঁসই ছিল না। একজন হিতৈষী আত্মীয় বার বার এ বিষয়ে তাঁহাকে সচেতন করিয়া নিজে এই সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিয়াছেন।

সকাল হইতে দুই বোনের এজন্য চিন্তা ও কান্নার আর বিরাম নাই। কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়?

অনেকক্ষণ কান্নার পর ইন্দিরা চোখ মুছিয়া বলিল, "আচ্ছা, দিদি, তুই ত সেদিন গল্প পড়লি শিবাজী কেমন করে সন্দেশের চাঙারির মধ্যে পালিয়ে এসেছিল, তুই তেমন করে পারবি না?"

সুধীরার মুখে হাসি ফুটিল, "দূর পাগলী, তাই কখনো হয়!" সে ইন্দিরার মত অত ছেলেমানুষ নয়। শ্বশুরবাড়ি হইতে যে সন্দেশের চাঙারির মধ্যে পালাইয়া আসা যায় না, সে তা জানে।

সুধীরার কথা শুনিয়া ইন্দিরা আবার কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তাহলে কি হবে দিদি?"

সুধীরা বোধ হয় কোন উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছিল, বলিল "দাঁড়া না, সব ঠিক হয়ে যাবে। পছন্দ না হলে ত বিয়ে হবে না। আমি এই এমনি ঝুঁটি করে চুল বাঁধবো, আর একটা ময়লা চিরকুট কাপড় পরবো, তখন ত আর পছন্দ হবে না, তখন—" সুধীরা ইন্দিরা দুইজনের মুখে হাসি ফুটিল।

কিন্তু সুধীরা কোন সংকল্পই কার্যে পরিণত করিতে পারিল না। বিকাল বেলা সুধীরাদের দু-তিনজন প্রতিবেশিনী তাহাকে সাজাইতে আসিলেন। সুরদাসই অবশ্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ বাধ্যতাবশে সুধীরা কাহারো কার্যে প্রতিবাদ করিতে পারিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের কথামত সাজ-গোজ করিয়া ধীর অনিচ্ছুক পদে অভ্যাগতমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

পিতার আদেশ অনুসারে সকলকে প্রণাম করা হইলে, পিতার সমবয়সী একজন ভদ্রলোক তাহাকে হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। তাহার পর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, "থাম মা থাক, আর প্রণাম করতে হবে না। তোমার নামটি কি একবার বল ত মা শুনি!"

সুধীরার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না সেই ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, "লজ্জা কি মা, কিছু লজ্জা নে নাম বলো।"

সুধীরা কোন মতে আস্তে অস্তে বলিল "সুধীরা।"

"'সুধীরা', বাঃ বাঃ বেশ নাম। মা নিজেও যেমন ধীর, নামটি তেমনি। এই ত চাই। আচ্ছা মা, তুমি এবার উঠতে পারো।"

সুরদাস বলিলেন, "লেখাপড়ার কথাটা একবার জিজ্ঞাসা—"

"আরে না না, আমাদের হিন্দু ঘরে অত লেখাপড়া গা বাজনা নিয়ে কি হবে বলুন! ঘরের কাজকর্ম জানলেই হলো মায়ের আমার বয়সই বা কত, আস্তে আস্তে সব শিখে নেবে এখন।"

সুরদাস বলিলেন, "কিন্তু এই বয়সেই ও প্রায় সব কাজকর্ম জানে। ওর ত মা নেই, একটা ছোট বোন আছে, তাকে দেখাশোন সব কিছু ওকেই করতে হয়। ঠাকুর আছে বটে, কিন্তু মোটামু রান্নাবান্না সবই জানে।"

"বাঃ বাঃ তাহলে ত মায়ের আমার গুণের শেষ নেই। সুরদা বাবু, আপনার মেয়েটিকে যে কি পছন্দ হয়েছে, তা কি বলবো। এ আপনার অনুমতি হলেই —"

"আমার অনুমতি আর কি! ধীরা, মা, তুমি ভেতরে যাও।"

একে 'মা নেই', এই কথায় সুধীরার চোখে জল আসি পড়িয়াছিল, তাহার উপর পছন্দ হইয়াছে শুনিয়া চোখের জল রো করা কঠিন হইয়া উঠিল। পিতার আদেশ পাওয়া মাত্র সুধীরা অশ্রু সজল চক্ষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরদার পিছনে ইন্দি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার আহ্বান সত্ত্বেও ভিত প্রবেশ করে নাই। বিদ্বেষ-ভরা চক্ষে এই লোকগুলিকে নিরী করিয়া দেখিতেছিল। সুধীরা বাহিরে আসামাত্র দুই হাতে তাহ গলা জড়াইয়া ধরিল। সুধীরা চোখের জলে কিছু দেখিতে পাইতেছি না। ইন্দিরাকে কোন রকমে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠি গেল। উপরে আসিয়া সুধীরার কাপড় ছাড়া হইল না। দুই বো গলা জড়াজড়ি করিয়া বিছানায় শুইয়া চোখের জলে বুক ভাসাই লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা কে বুঝিতে পারিল না। সুরদাস যখন উপরে আসিলেন, তখ তাহাদের অশ্রুচিহ্নগুলি শুকাইয়া যায় নাই।

সুধীরার বিবাহ হইয়া গেল। সুধীরা কাঁদিতে কাঁদি শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, ফিরিয়া আসিল কিন্তু হাসি-ভরা ম লইয়া।

ইন্দিরা দিদিকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া যত আনন্দ হইল, বিস্মিতও হইল ততখানি। দিদিকে এ জন্মে যে কোন দেখিতে পাইবে সে আশা তাহার ছিল না। তাহার উপর দি এমন হাসিমুখ, এ যে কল্পনারও অতীত। বিস্মিতকণ্ঠে সে প্র করিল, "হ্যাঁ, দিদি, তোকে সেখানে মারতো সবাই?"

সুধীরা ইন্দিরাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, " পাগলী, শ্বশুরবাড়িতে কি কেউ মারে? সেখানে সব কত ভালবা কত আদর করে।"

ভালবাসা এবং আদরের কথায় যাহার ব্যবহারে সবচেয়ে বে ভালবাসা এবং আদরের আতিশয্য প্রকাশ পাইত, তাহার কথাই পড়িয়া গেল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ম একটু বিমনা হইয়া গেল বুঝি! সম্মুখে বি এ পরীক্ষা ব সোমনাথ শ্বশুরবাড়ি আসিবার অনুমতি পায় নাই।

ইন্দিরার চোখে আরও বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শ্বশুরে

১

বেরোলে আর কখনই বেরোতে পারবে না। আমার মত যদি ওকে বাবার সামনে বেরোতে মানা করেন তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "না, না, মানা করবো কেন! আমরা নিজেরা কখনো শ্বশুরের সামনে বেরোই নি, তাছাড়া মাও বারণ করলেন, সেইজন্যই তোমাকে মানা করেছিলাম। চিরকালই কি সেকেলে চাল চলবে? তাছাড়া ও লজ্জা করবে কাকে? ভাসুর ত ভগ্নিপতি, কত কোলে পিঠে চেপেছে, তার সামনে কি আর লজ্জা করতে পারে? আর শ্বশুর ত বাপের মত! বেরোবে বই কি, নিশ্চয় বেরোবে।"

শ্বশুরের পদশব্দ শুনিয়া সুধীরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো। শ্বশুর আসিয়া দাঁড়াইলে ইন্দিরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভবতোষ বলিলেন, "থাক মা থাক হয়েছে, বোসো," ইন্দিরা বসিল।

ভবতোষ পুনরায় ইন্দিরার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা শুনলাম কি সব বাজনা নিয়ে এসেছো, তোমার সেই ছেলেটিকেই সোনালে ত হবে না।, এই বুড়ো ছেলেটাকেও একবার শোনাতে হবে।"

শাশুড়ী বলিলেন, "শোনাবে বৈকি, যাও মা নিয়ে এসে শোনাও।"

সুধীরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। শ্বশুরের কথা শোনামাত্র বাজনা পাঠাইয়া দিল। ইন্দিরার গুণ সকলের কাছে জাহির করিতে তাহার আগ্রহের সীমা ছিল না।

ইন্দিরা উঠিবার পূর্বেই একজন চাকর একটি সেতার লইয়া আসিয়া বলিল, "বৌ-রাণী পাঠিয়ে দিলেন।"

সকলের অনুরোধে ইন্দিরা বাজাইতে বসিল,—ইমনকল্যাণ, পূরিয়া, অবশেষে ভীমপলশ্রী। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে কাহারো কোন ধারণা ছিল না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য ও ইন্দিরার বাজাইবার নিপুণতায় সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলো। বাহিরের বারান্দায় দাসী চাকর ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তেতালা হইতে সোমনাথ নামিয়া আসিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া বাজনা শুনিতে লাগিল। শঙ্কর ভিতরে ঢুকিতে পারিল না, পাশের ঘরে খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরিয়া পড়িবার অছিলায় চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। বাজনা শেষ হইলে প্রশংসার ভারে ইন্দিরার মাথা নীচু হইয়া গেলো। বাহিরে দাঁড়াইয়া সুধীরার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে গর্বিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি যেন সকলকে বলিতে লাগিল, "দেখো তোমরা আমার বোনের কত গুণ।"

রাত্রিবেলা স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সুধীরা তেমনি গর্বিত ভাবে বলিল, "ইন্দুর বাজনা শুনলে?"

সোমনাথ উত্তর করিল, "শুনলাম বইকি, চমৎকার। ঐ বোনের বোন হয়েও কিন্তু তোমার দ্বারা কিছুই হোল না।"

কথাটা শুনিবামাত্র সহসা সুধীরা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দিরাকে প্রথম দেখিয়া এ বাড়িতে তাহার সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছিল সব কথাগুলি একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেলো। সমস্ত রাগটা পড়িল সোমনাথের উপর। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার দ্বারা ও সব যদি হবে ত ১৪ বছর বয়স থেকে তোমাদের সংসারে চাকা ঘোরাবে কে? মানুষ ত আর দশভূজা হতে পারে না।" কথাটা শেষ করিয়া সে আপাদ মস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে জলখাবারের পালা সাঙ্গ করিয়া সুধীরা উপরে আসিয়া দেখিল ইন্দিরা সেতারের তার বাঁধিতেছে, শাশুড়ী, দিদি-শাশুড়ী শুনিবার জন্য বসিয়া আছেন। ও পাশের বারান্দায় সোমনাথ দাড়ী কামাইতেছে সেও বাজনা শুনিবার জন্যই দোতালায় নামিয়া আসিয়াছে তাহা বুঝা গেলো।

সুধীরা সকলের মুখের দিকে একবার তাকাইল, তাহার পর মাথার অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করিয়া টানিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ইন্দিরার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ইন্দু, রাতদিন বাজনা বাজার না। আমার সঙ্গে নীচে আয়, কাজকর্ম সব আস্তে আস্তে শিখতে হবে ত!"

ইন্দিরা সেতার রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী বলিলেন, "কেন, বৌমা, ওকে আবার টানাটানি করছো। ছেলেমানুষ, দুদিন বাদেই না হয় কাজকর্ম শিখবে।"

সুধীরা বলিল, "সেতার বাজানো পালিয়ে যাবে না, মা। পরেও বাজাতে পারবে। কিন্তু এখন থেকে কাজকর্ম না শিখলে পরে কিছুই পারবে না। তাছাড়া ওর চেয়ে ছেলে-বয়সে আমি সংসারের ভার নিয়েছি।"

"তা নিয়েছো বটে, কিন্তু তুমি রয়েছ, ওর কাজকর্ম অত দেখবারই বা কি দরকার। তুমি বসো, ছোট বৌমা বাজাও। তোমার শ্বশুরেও এখুনি আসবেন। এসব শুনলে মন ভালো থাকে।"

ইন্দিরা বিপদে পড়িল। সেতার বাজাইবে না দিদির সঙ্গে যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সুধীরা কাহাকেও কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো। শাশুড়ীর কথায় তাহার সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। সংসারের কাজ করিবার ভার শুধু তাহারই কারণ সে সেতার এস্রাজ বাজাইতে পারে না তাই। কিন্তু যে সময় সে আসিয়াছিল, সে সময় বাড়ির বধূ সেতার এস্রাজ বাজাইলে কেহই খুশি হইতে পারিত না। আজ হাওয়া বদলাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলাইয়াছে। শাশুড়ী হয়ত কথাটা সহজভাবেই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীরা কিছুতেই তাহার সহজ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না।

আর একদিন ইন্দিরার ঘরে কৌতুকপরবশে আড়ি পাতিতে গিয়া শুনিল, শঙ্কর বলিতেছে, "তুমি রাতদিন কেন বাজাও না? যত বাজাবে ততই ত হাত খুলবে। সংসারের কাজের জন্য তোমার কি ভাবনা! সে বৌদি আছে বৌদি করবে, যার যা কাজ! তুমি যা জানো তারই চর্চা করো। সে যা জানে সে তাই করুক।"

সুধীরা স্তব্ধ হইয়া গেলো। সকলেরই এমনি মত পরিবর্তন হইয়াছে। সে দাসী বাঁদী, সংসারের কাজ করিবার জন্যই তাহার প্রয়োজন, সে শুধু তাহাই করিতে থাকিবে। যে সংসারে সে রাজ-রাণী ছিল, সেখান হইতে তাহাকে এত নীচে নামিয়া আসিতে হইল! অবশেষে তাহার নিজে হাতে মানুষ করা ইন্দিরার নিকট তাহার এমন করিয়া পরাজয় ঘটিল।

কিন্তু ইন্দিরার নিকট সে যে কতখানি পরাজিত তাহা আর কিছুদিন বাদে সুধীরা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিল যেদিন প্রকাশ পাইল যে ইন্দিরা অন্তস্বত্বা। সুধীরার আট বৎসরের ভিতর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। এজন্য সকলের ক্ষোভ ও দুঃখের অন্ত ছিল না। ইন্দিরা আজ সকলের সে দুঃখ মোচন করিল। শ্বশুর শাশুড়ী দিদি শাশুড়ী, এমনকি সোমনাথ পর্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। চাকর দাসী আসিয়া হাসিমুখে বকসিশের দাবী করিল সকলেই আনন্দিত, সকলেই খুশি। কিন্তু যাহার সর্বাপেক্ষা খুশি হওয়ার কথা ছিল সেই সুধীরার মুখে হাসি ফুটিল না।

দিদি শাশুড়ী সোনার সাতনর বাহির করিয়া ইন্দিরার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "বড়দিদি, তুমি কিন্তু রাগ করতে পারবে না। এ আমার দিদি শাশুড়ীর জিনিস। তোমার শ্বশুর যখন হন তখন আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার দাদুভাইয়ের মুখ যে

আগে দেখাতে পারবে, তাকেই এটী দেবো। তুমি ত বাছা পারলে না, তখন ছোটদিদিকেই দি।"

ইন্দিরার কণ্ঠে সাতনর চকচক করিতে লাগিল। সুধীরার সমস্ত মুখ কালো হইয়া উঠিল। অপমান ও পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ইন্দিরার বিপদ হইল। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল দিদি তাহার উপর আর তেমন সন্তুষ্ট নয়। আজন্মের সঙ্গিনী স্নেহময়ী দিদির এই ব্যবহারে তাহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, অথচ দিদিকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতেও বাধিতেছিল। সে বুদ্ধিমতী সে আরো বুঝিতেছিল যে, শ্বশুরবাড়ির সকলের তাহার উপর পক্ষপাতিত্বই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু কি উপায়ে ইহাকে নিবারণ করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

এদিকে সুধীরাও কম বিপদে পড়ে নাই। যাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে, যাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে তাহার উপর আজ বিদ্বেষভাব আসায় সে আপনার অন্তরে অন্তরে লজ্জিতই হইতেছিল। এবং সে ভাব যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে তাহার চেষ্টাই করিতেছিল। কিন্তু কোনমতে বিদ্বেষ দমন করিতে সমর্থ হইতেছিল না। তাই ইন্দিরার সম্মুখে বেশী যাইতে বেশী কথা বলিতে তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে কিছু প্রকাশ হইয়া যায়। সে ইন্দিরাকে এড়াইয়া চলিতেছিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে এই লুকোচুরী তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সেদিন সে সোজাসুজি শাশুড়ীকে বলিয়া ফেলিল, "মা, আমি কিছুদিন শ্রীরামপুরে গিয়ে থাকবো।"

শাশুড়ী বিস্মিত হইলেন,—"সে কি বৌমা, ছোট বৌমা পোয়াতী, তার উপর ঘর সংসার সব ফেলে এখন কি করতে যাবে?"

সুধীরা উত্তর করিল, "ঘর সংসার আগলাবার জন্য আমাকে কি চিরকাল বসে থাকতে হবে! আমি অনেকদিন কোথাও যাইনি, কিছুদিন ঘুরে আসবো।"

এমন জেদের সহিত এমন উগ্রভাবে কথা বলিতে সুধীরাকে কেহ কখনো দেখে নাই। শাশুড়ী আর আপত্তি করিলেন না। সুধীরা শ্রীরামপুর রওনা হইল।

ইন্দিরাকে রাখিয়া একা সুধীরা আসাতে সুরদাস খুবেই বিস্মিত হইলেন; কিন্তু অল্পভাষী লোক, বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

এখানে আসিয়াও সুধীরা টিকিতে পারিতেছিল না। একে প্রকাণ্ড সংসারের গৃহিণীপনা করা অভ্যাস, এখানে কাজ কিছুই নাই, তাহার পর যেদিকে চায় সেইদিকই ইন্দিরার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এখানে আসিয়া এক মুহূর্তের জন্যও ইন্দিরাকে ভুলিবার উপায় নাই। ইন্দিরা ও সুধীরার নিবিড় ভালবাসার সহস্র পরিচয় এই বাড়ির আসবাবপত্রে, ঘরের প্রতি কোণে যেন গাঁথা হইয়া আছে। তাহারা বিদ্রূপভরা চোখে সুধীরার দিকে তাকাইয়া থাকে। সুধীরার চোখে জল আসিয়া পড়িল। ইন্দিরাকে এত কাছে লইয়া যাইবার, এত কাছে পাইবার তাহার কেন এ দুর্মতি হইয়াছিল! অতি নিকটে আনিলে যে অতি নিকটের মানুষটী অতি দূরে চলিয়া যায়, এমন করিয়া যে তাহাকে হারাইতে হয়, এ ত তাহার জানা ছিল না। তাহার জা না হইয়া ইন্দিরা যদি অন্য কোন বাড়ির বউ হইত, নাই বা সর্বসময়ে চোখে দেখিতে পাইত, দু-মাস ছ'মাস ছাড়া আদরে সম্মানে ইন্দিরাকে নিজগৃহে লইয়া যাইয়া স্নেহযত্নে ভরিয় দিত, তাহার মধ্যে শান্তি থাকিত, সুখ থাকিত, কল্যাণ থাকিত। কিন্তু একী অভিশাপ, একী বিড়ম্বনা আজ জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সব চিন্তা করিতে করিতে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যাইত।

এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন বাড়ির পুরানো ঝি ও পাড়ার বর্ষীয়সীরা মত প্রকাশ করিলেন যে, সুধীরা অন্তঃস্বত্ত্বা। সুধীরা বিস্মিত হইল। সে বার বার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। আট বৎসর পরে সে যে সন্তানের জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সুরদাসের কানেও কথা উঠিল। তিনি একজন লেডী ডাক্তারকে সংবাদ দিলেন। লেডী ডাক্তারও নিঃসন্দেহে ছয় মাসের অন্তস্বত্ত্বা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

সুরদাস কলিকাতায় সুধীরার শ্বশুরবাড়ীতে সংবাদ দিতে চাহিলে কি জানি কি কারণে সুধীরা বার বার আপত্তি প্রকাশ করিল। সোমনাথ বৈষয়িক কাজে কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদ গিয়াছিল তাহাকেও সে কোন সংবাদ দিল না।

যথাসময়ে নির্বিঘ্নে সুধীরার একটি সুস্থ সবল শিশু সন্তান ভূমিষ্ট হইল। সেইদিনই ইন্দিরার ব্যথা উঠিয়াছে বলিয়া সুধীরাকে পাঠাইবার জন্য পত্র আসিল। সুধীরাকে তখন পাঠানো অসম্ভব। সুরদাস সেখানে সংবাদ দিলেন। সকলে বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল। কারণ সুধীরার অন্তস্বত্ত্বা হওয়ার সংবাদই কেহ পায় নাই। তবে এখন বেশী আনন্দ বা বিস্ময় প্রকাশ করিবার সময় কারণ ইন্দিরাকে লইয়া সকলেই ব্যস্ত।

তিনদিন অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর ডাক্তারেরা যন্ত্রের সাহায্যে একটি নির্জীব প্রায় শিশু সন্তান প্রসব করাইলেন এবং একবাক্যে মত প্রকাশ করিলেন যে ভবিষ্যতে ইন্দিরার মা হইবার আর কোন আশা রহিল না। এই নিদারুণ সংবাদে বাড়িশুদ্ধ সকলেই মর্মাহত হইলেন। শুধু ইন্দিরার মা হইবার আশাই নয়, শিশুটীরো যে জীবনের কোন আশা নাই তাহাও শীঘ্র বুঝিতে পারা গেলো। ছয় দিন ঔষধপত্রের সাহায্যে কোন রকমে ধরিয়া রাখা হইল। ৭ দিনের দিন সল্প আয়ুকে আর বাড়াইতে পারা গেলো না। শিশুটি নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস পূর্বেই আসিয়াছিল।

ইন্দিরার দুর্বল স্বাস্থ্য শিশু-মৃত্যুর পর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, ঘন ঘন কেবলি ফিট হইতে লাগিল। কেমন যেন উন্মাদের মত ভাব। সকলে ইন্দিরার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিল।

সুধীরার আর থাকা চলিল না। যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া মোটরে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া যা দেখিল, ততটা খারাপ দেখিবে তাহা সে আশা করে নাই। ইন্দিরার মৃত্যুপান্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সুধীরা পলক ফেলিতে পারিল না। সহসা তাহার মনে হইল তাহার ভিতরের কালো ঈর্ষা রূপ ধরিয়া ইন্দিরার মুখে এমনি কালী ঢালিয়া দিয়াছে। অন্তরের অন্তঃস্থলে বার বার মোচড়াইয়া উঠিতে লাগিল। খোকাকে বুকে পাইয়া সুধীরা মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়াছিল, সেই স্বাদ পাইয়াও যে চিরতরে বঞ্চিত হইল সেই তাহার পরম স্নেহের অভাগিনী বোনটির দিকে তাকাইয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল। বারবার মনে হইতে লাগিল তাহার বিদ্বেষের জ্বালাময়ী অগ্নি লেলিহান শিখা মেলিয়া ইন্দিরা জীবনকে ধ্বংস ভ্রংশ কয়িা দিল। সুধীরা শিহরিয়া উঠিল।

ইন্দিরা এই সময় চোখ খুলিয়া চাহিল। সুধীরার মুখের দিকে খানিক ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দিদি, তুই আমার উপর রাগ করে চলে গেলি, তাই ত খোকাও রাগ করে চলে গেছে।"

ইন্দিরার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সুধীরা বলিল, "দূরে পাগলী, তোর উপর কি আমি রাগ করতে পারি।"

(শেষাংশ ৩৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিল্পগুরু নন্দলাল ও কলাভবন

নন্দলালের নূতন ছাত্রদের মধ্য দিয়ে চিত্রের প্রথম পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ-পরবর্তী চিত্রকর সাহিত্যকেই অবলম্বন করে প্রধানত ছবি এঁকে ছিলেন। নূতন চিত্রকরদের মধ্য দিয়ে আমাদের রূপকলা সাহিত্যের বন্ধন কাটিয়ে পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা তথা বস্তু-জগতের ক্ষেত্রে প্রথম উত্তীর্ণ হল। চিত্রকলার এই রূপান্তর ঘটেছিল কোন আন্দোলন বা বাইরের বিশেষ চেষ্টার অপেক্ষা না করেই। এই পরিবর্তনের কারণ অতি স্বাভাবিক। নন্দলালের আদর্শ এই সময় শিক্ষার্থীদের সামনে ছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ, সাধারণ জীবনের সঙ্গে যোগসাধন, চিন্তার চেয়ে অনুভবের মধ্যে আনন্দ লাভ করা ছিল শিক্ষার্থীদের মূল প্রেরণা এবং তার চেয়েও বেশী ছিল কৌতূহলী মন নিয়ে অভিনব কিছু করবার ইচ্ছা। প্রচুর অবকাশ এবং আদর্শমূলক কোন মতবাদের চাপ না থাকায় মনের স্বাধীনতাই নূতন বিষয়কে অবলম্বন করবার প্রেরণা এইসব শিল্পীদের মধ্যে এনেছিল।

কিন্তু এ পর্যন্ত মূলত প্রভেদ ছিল বিষয়বস্তুর। অঙ্কনভঙ্গীর পরিবর্তন দেখা দিল সম্পূর্ণ নন্দলালের প্রভাবে। নন্দলালের আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ-পরবর্তী ছবির atmosphere গুণ প্রকাশের চেষ্টা থেকে ছবির আলংকারিক সজ্জার দিকে নূতন চিত্রকররা আকৃষ্ট হলেন। দেশী ছবির অনুলেখন (Copy) এবং করণ-কৌশলের অভ্যাস রীতিমতভাবে এইসব ছাত্ররা শুরু করলেন। অবনীন্দ্রনাথের আদর্শের মধ্যে নন্দলালের ব্যক্তিত্ব আরও স্পষ্ট করে দেখা দিল। ক্রমে চিত্রকরদের মনে নূতন করণ-কৌশল ও নূতন উপকরণের ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ দেখা দিল। অন্য দিকে নূতন ছাত্রদের কেবল মাত্র বিষয় নির্বাচনই নন্দলালকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন করল। এ পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে দৃশ্য-চিত্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় নি। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল অঙ্কিত দৃশ্য-চিত্র বা দৃশ্যপ্রধান চিত্রের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ ভারতীয় রসিক সমাজের মধ্যেও দেখা যায় নি। নূতন চিত্রকরদের ছবিতে বিষয়ের মধ্যে ক্রমে দৃশ্য এবং দৃশ্যপ্রধান চিত্রের প্রকাশ প্রথম দেখা দিল। বলা বাহুল্য বিষয়ের নূতনত্ব ছাড়া প্রকাশভঙ্গীর কোন বৈশিষ্ট্য এই সময়ের চিত্রের মধ্যে ছিল না। দৃশ্য-চিত্রের আদর্শ রূপে নন্দলাল চীন, জাপান রাজপুত এবং বিলাতি ছবি ছাত্রদের সামনে ধরলেন। অর্থাৎ নানা দেশের রূপকলার সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়ের সুযোগ দিলেন

আলোচনারত রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল

ছাত্র রূপে যে স্বাধীনতা অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ছাত্রেরা পেয়েছিলেন, কোন কলা-কেন্দ্রে সে স্বাধীনতা কল্পনাতীত। এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রের এবং নন্দলালের এই সব ছাত্রদের মধ্যে অবস্থার কোনই পার্থক্য নেই। কেবল নন্দলালের এই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনুকূল অবস্থা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন চিত্রকরের সৃজনী শক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্র দেওয়া। কোন বিশেষ পদ্ধতি কোন নির্দিষ্ট সংস্কার অপেক্ষা ব্যাপকতর রস সৃষ্টির আদর্শকে প্রধান করে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করেন,—নির্দিষ্ট পথে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে নয়। * হ্যাভেল যখন অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে এনেছিলেন, তাঁর মনে এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল যে, ছাত্ররা বিলাতী

* কিন্তু নানাকারণে পরবর্তী কালে এই আদর্শের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

ছবির বিকৃত অনুকরণ না করে ভারতীয় পদ্ধতিতে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেবে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও নানাভাবে এই চেষ্টাই করেছিলেন। শান্তিনিকেতন কলাভবন-এ নন্দলালের এবং তাঁর ছাত্রদের পক্ষে এই Cultural আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসার অতি সহজ সুযোগ ঘটেছিল। একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ তেমনি অন্য দিকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যর পরিবেশ, এই সময়ের ছাত্রদের খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের বৈশিষ্ট্যের মূলে আমরা নূতন অবস্থার প্রভাব ক্রমেই লক্ষ্য করব। ছবিতে বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য যেমনই হোক, নূতন ছাত্রদের মধ্য দিয়ে প্রথম দেখা দিল বস্তু-রূপকে অনুকরণের চেষ্টা, অর্থাৎ Realistic Tendency। অবনীন্দ্রনাথ-পরবর্তী কালের ভারতীয় চিত্রে এই ঝোঁক সম্পূর্ণ নূতন। বলা বাহুল্য একদিন এই Realistic মনোভাবই প্রতিক্রিয়া রূপে অবনীন্দ্রনাথের আন্দোলন শুরু হয়েছিল; নন্দলালের এ প্রভাব এই নূতন মনোভাবকে কিভাবে পরিচালিত করেছিল, সেই আলোচনার মধ্যেই আমরা নন্দলাল-পরবর্তী চিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং নূতন পরিবর্তনের নানা কারণ বুঝতে পারব।

প্রথমেই দেখা যায় নন্দলালের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রদের ক্লাসিক ভারতীয় চিত্রের গুণ (Quality)র সঙ্গে পরিচিত করেছিল। এই সময়ে আর একটি নূতন আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাপানী এবং বিশেষভাবে চীনের সংস্কৃতির প্রভাব। এই প্রভাব কেবলমাত্র করণ-কৌশলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, আরও ব্যাপকভাবে সমগ্র প্রাচ্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে বোঝবার চেষ্টাই এই প্রভাব এনেছিল। শান্তিনিকেতন কলা-ভবনের প্রথম দিকের ছাত্রদের জীবনযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কত গভীর, এইখানে একটি উদাহরণ দিই। যেমন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তেমনি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় জাপানী সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল নিয়মিত পাঠ করেছিলেন, সেই সঙ্গে জাপানের সংস্কৃতি ও তার aesthetic আদর্শ ইত্যাদির আলোচনা ছাত্রদের মনকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল।

বিশেষভাবে দৃশ্য-চিত্রের মধ্যে জাপানী প্রভাব এক সময়ে আমরা খুবই দেখতে পাই। আরও বিশদভাবে বলা চলে—প্রাচ্য সংস্কৃতির দৃষ্টি ভঙ্গীতে প্রকৃতিকে দেখবার মনোভাব জেগেছিল। এ পর্যন্ত আমরা দেখছি—পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কতদূর প্রবল নূতন ছাত্রদের মধ্যে। কিন্তু এই প্রভাবকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন নন্দলাল। নানা দেশের নানা চিত্র-সংস্কৃতির মধ্যে আমরা সর্বদাই দুই ভিন্ন মনোভাব দেখি। ব্যবহারিক উপকরণের মূল্য বিচারে এই মনোভাবের পার্থক্য। এক জাতীয় স্রষ্টা উপকরণের সহায়তায় অনুভূতি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তাঁদের কাছে চিত্রের প্রধান অবলম্বন (কাগজ, কাপড়, দেয়াল ইত্যাদি) ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের সহায়। দ্বিতীয় মনোভাবের উপকরণ বাধার স্বরূপ। বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা থেকেই Perspective-এর প্রচলন হয়েছে। ছবিতে উপকরণের স্বভাব অতিক্রম করা সাধ্যাতীত বলেই তার অস্তিত্ব; এই মনোভাবকেই Realistic মনোবৃত্তি বলা হয়। Realistic মনোভাবের সঙ্গে আলংকারিক মনোভাবের পার্থক্য এইখানে। ছাত্রদের উপর নন্দলালের সর্বপ্রধান প্রভাব হল উপকরণের মূল্য দেওয়ার আদর্শই নূতন চিত্রকরদের Realistic মনোভাবকে পরিবর্তিত করা। এই আদর্শ যেমন Realism থেকে আলংকারিক গুণের দিকে ফিরিয়েছিল, তেমনি বিচিত্র ভঙ্গী (Style)কে অনুসরণ করবার চেষ্টা দেখা দিল। বিভিন্ন ভঙ্গীকে অনুসরণ করবার চেষ্টার মধ্যে একটা আদর্শ স্থির ছিল; সে আদর্শ হচ্ছে আলংকারিক গুণের আদর্শ—বস্তুর রূপের চেয়ে বস্তুর গুণ (Qulity)। ইতিমধ্যে ছাত্রদের আরও ব্যাপকভাবে রূপ কলার সংস্কৃতিকে জানবার সুযোগ ঘটল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেলা ক্রামরিশের সাহায্যে আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের নূতন ভাবধারার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়। ইউরোপীয় চিত্রের বিচিত্র পরিবর্তন, আধুনিক আদর্শ এবং সব চেয়ে Analytic Study-র সাহায্যে চিত্র-বিচারের নূতন রকমের আদর্শ পাওয়া গেল। বিস্তারিত ভাবধারার সংস্পর্শে চিত্র প্রভাবান্বিত না হলেও এই সময়ের আলোচনা নূতন কেন্দ্রের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। নানা দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব কিভাবে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে আমরা দেখতে পাই, একই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় সত্বেও মূল আলংকারিক আদর্শ সর্বত্রই বিচারের প্রধান অঙ্গ ছিল। সেই জন্য বিভিন্ন প্রভাব থেকে একই গুণ চিত্রকররা পেতে চেয়েছিলেন। অঙ্কনভঙ্গীর দিক দিয়ে নন্দলালের প্রভাবে আলংকারিক গুণই যে প্রধান হয়ে উঠেছিল একথা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

নন্দলালের এই মনোভাব তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নূতন আদর্শ কিভাবে এনেছে এখন দেখা যাবে। এপর্যন্ত আমাদের চিত্রকরদের প্রকাশ করবার এক পথ ছিল চিত্র। নন্দলালের আদর্শ বিচিত্র উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশের পথ করবার আগ্রহ জাগিয়েছিল। এই মনোভাবের পরবর্তী প্রকাশ দেখবার পূর্বেই নন্দলাল ও তাঁর প্রভাবের পরবর্তী রূপ কী, আরও একটু অগ্রসর হয়ে দেখা যাক্।

নন্দলালের নিজের জীবনে পারিপার্শ্বিক প্রভাব তার আদর্শকে পরিবর্তিত করেছে, কিন্তু চিত্রকরের ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নূতন পরিবর্তন ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকেন্দ্র নানা প্রয়োজনে নন্দলালের বহুমুখী প্রতিভা প্রকাশিত হবার সুযোগ এনেছে। চিত্রকর নন্দলালের প্রভাব আধুনিক চিত্রে কি বৈশিষ্ট্য এনেছে, ইতিপূর্বে আমরা তার আলোচনা করেছি। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে নন্দলালের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত আমাদের রুচীর পরিবর্তন এনেছে, কতদূর ঐশ্বর্যশালী করেছে, আমরা তা অবগত। এক সময়ে হ্যাভেল ভারতীয় কারুশিল্পের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, রুচী এবং প্রয়োজনের পার্থক্যবশত সে আন্দোলন তখন ব্যর্থ হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে এই দিক দিয়ে চেষ্টা উপযুক্ত ক্ষেত্রের

অভাবে প্রাণ পায়নি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথই প্রথম লোক-শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁর রচিত আল্‌পনার বই সেই চেষ্টারই নিদর্শন। সাক্ষাৎ প্রয়োজনের তাগিদে কারু-কলার জন্ম, এই তাগিদ বা চাহিদা আমাদের চিত্রকরদের সামনে ইতিপূর্বে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের নানা প্রয়োজনের মধ্যে আধুনিক কারু-কলার জন্ম। নানা উৎসব-অভিনয়ের বিচিত্র প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে অলংকারের নূতন আদর্শ দেখা দিয়েছে। এই আলংকারিক মনোভাব তাঁর প্রথম ছাত্রদের চেয়ে তাঁর পরবর্তী ছাত্রদের মধ্যে সার্থক হয়েছে। যেমন অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ তাঁর ছাত্র পরম্পরায় প্রবর্তিত হয়েছে, তেমনি নন্দলালের পরবর্তী

স্কেচ্ অঙ্কনরত নন্দলাল

ভারতীয় শিল্প রুচীর পরিবর্তন নন্দলালের পরবর্তী ছাত্রদের দ্বারা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছে। আলংকারিক শিল্পে (Ornamental Art) নন্দলালের সঙ্গে তাঁর ছাত্রী এবং পরে তাঁর সহকারী পরলোকগত সুকুমারী দেবীর দান অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। আল্‌পনা নামে অলংকরণের যে রূপান্তর আজ আমরা দেখি, সুকুমারী দেবীর প্রতিভার দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে।

এইবার নন্দলালের ব্যক্তিগত জীবনে নূতন পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কতখানি তা দেখাতে পারলে আমাদের এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। ১৯০৫-১৯২৮ পর্যন্ত নন্দলালের চিত্র রচনা এক বিশেষ আদর্শ নিয়ে চলেছে। এই দীর্ঘকালের রচনার মধ্যে অংকন-ভঙ্গীর এত বিচিত্র পরিবর্তন অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের কোন সতীর্থের মধ্যে দেখা যায় না। দেশী পটের ভঙ্গী থেকে আরম্ভ করে অজন্তা, নেপালী, রাজপুত এবং চীনে তুলির বিভিন্ন ভঙ্গীতে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে একইভাবে অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতি কতদিন পর্যন্ত তিনি অনুসরণ করেছিলেন দেখানো সহজ নয়। কারণ তাঁর শিল্প-সৃষ্টির কাজে একদিকে তিনি যেমন অবনীন্দ্র-পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র পথ ধরেছিলেন, আবার অন্যদিকে কোন কোন সময়ে অবনীন্দ্রনাথের অনুকরণও তিনি করেছেন। তাঁর ছবির বিষয়-বস্তুর অঙ্কন-ভঙ্গী যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বৈচিত্র্যবহুল। অঙ্কন-ভঙ্গীতে ও বিচার-বিস্তৃতির মধ্যে এমন একটা সূত্র আমরা এ পর্যন্ত পাই—যার বৈশিষ্ট্য ভঙ্গীর দিক দিয়ে, আলংকারিক ভাবের দিক দিয়ে, dramatic গুণের দিক দিয়ে মূর্তিধর্মী। বলা বাহুল্য, Dramatic রসপ্রধান হলেও সকল ক্ষেত্রে তাঁর ছবিতে এই রসই প্রাধান্য পেয়েছে—বলা চলে না। তথাপি নন্দলালের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এই দিক দিয়ে।

১৯১৮ সাল থেকে ছাত্রদের নির্দেশ দিতে গিয়ে নন্দলালের অঙ্কন-ভঙ্গী ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল. এই সময় থেকে ধীরে ধীরে প্রকৃতির অনুভূতি তাঁর চিত্রাঙ্কনে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য নন্দলালকে কখনও প্রভাবান্বিত করেনি পূর্বেই সে কথা বলেছি, তার কারণও উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব পরবর্তী জীবনে নন্দলাল স্বীকার করেন, কিন্তু প্রথম দিকে কাব্য-বিষয় অপেক্ষা প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর জেগেছিল রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। এই সঙ্গে Chinese aesthetics নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নন্দলালের মনের পরিবর্তন চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ধীরে ধীরে, কিন্তু নন্দলালের ছবির বিষয়-বস্তু অপেক্ষা বর্ণের রুচীর দ্রুত পরিবর্তন এই সময় হতে দেখা যায়। সর্বপ্রথম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শান্তিনিকেতনে পরবর্তীকালে নন্দলালের ছবিতে আলংকারিক রূপ থাকলেও অলংকরণ ধীরে ধীরে লোপ পায়। নন্দলালের 'অগ্নি,' 'শারদশ্রী' জাতীয় ছবি শান্তিনিকেতনে আসার অনতিকাল মধ্যে দেখা যায় না। সম্ভবত অলংকরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকায় চিত্রের মধ্যে তাঁর প্রভাব কমে এসেছিল। নন্দলালের মনের পরিবর্তন সাক্ষাৎভাবে আমরা পাই তাঁর Landscape-এর ছবিতে। নন্দলালের পূর্ববর্তী পরিচিত কোন ছবিতেই এই রূপ বা এই রস প্রকাশ করবার চেষ্টা হয়নি। নন্দলালের Realistic মনোভাবকে পরিবর্তিত করেছিল তাঁর আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গী। নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রকৃতির রূপের দিকে মন যতই আকৃষ্ট হয়েছে, নন্দলালের আলংকারিক মনোভাবের ততই রূপান্তর হয়েছে। উপরি-উল্লিখিত ছবিগুলি নন্দলালের সেই সংযোগকালের পরিচয় দেয়।

কবির প্রেম ও অন্যান্য গল্পঃ—আবুল হায়াৎ প্রণীত। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৮০ আনা।

গল্পের বই। পুস্তকখানাতে ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলি প্রবাসী, বিচিত্রা, দীপালি প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের হাত বেশ পাকা। গল্পগুলির আখ্যানভাগ ভাল লাগিয়াছে। বড় গল্পের মধ্যে 'মেমো অব্ থ্যাংকস্' বেশ জমিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামেশ্বর দে, চন্দননগর।

হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্য মানুষকে স্তব্ধ করে, সেই সঙ্গে নগাধিরাজের সৌন্দর্য-প্রাচুর্য আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র এইভাবে একদিক হইতে যেমন বিরাট এবং বৈষ্ণব দার্শনিকের ভাষায় বিদূর, অন্যদিকে তেমনই মধুর ও আত্মলগ্ন সত্য সম্পর্কে আমাদের পক্ষে আপনার। সুপণ্ডিত এবং সুসাহিত্যিক নলিনীবাবু রবীন্দ্র-চরিত্রের অন্তর্নিহিত এই রহস্যকে আলোচ্য পুস্তকখানাতে তাঁহার প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞানঘন স্বরূপটি আমাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং নলিনীকান্তের সত্যসন্ধানী সে সাধনা এক্ষেত্রে সার্থকতালাভ করিয়াছে। নলিনীবাবু কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে চাহিয়াছেন। এই রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা। দেশকে, জাতিকে, শুধু দেশকে এবং জাতিকেই নয়, সমগ্র বিশ্বকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু দিয়াছেন এবং তাঁহার সে দানের পরিমাণ এত অধিক যে, এক্ষেত্রে বর্তমান জগতে অন্য কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। নলিনীবাবু রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা নামে দুইটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের অবদানের সে অসামান্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা', 'দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ,' 'রবীন্দ্র প্রতিভার ধারা' ও 'অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সেই অবদানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার বহু বিস্তারের দিকে গ্রন্থকার যান নাই; সে পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে গ্রন্থের কলেবর অনেক বাড়িয়া যাইত এবং এরূপ একখানি গ্রন্থ কেন, কয়েকখানা গ্রন্থে বা গ্রন্থরাজীতেও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলা শেষ হইত না। গ্রন্থকার সারজ্ঞ; গভীরভাবে মূল বস্তুকে ধরিবার মত কৌশল তাঁহার জানা আছে, এজন্য তিনি অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিতে পারিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই পুস্তকখানার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের মহিমাকে বেশ পর্যাপ্তভাবেই আস্বাদ করিতে সমর্থ হই। আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অবদান উপনিষদের অধ্যাত্ম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীকে ধূলা বালি বলিয়া উপেক্ষা করাই সে অধ্যাত্ম সত্যের স্বরূপ নয়। পক্ষান্তরে পার্থিব রজঃকে মধুমৎরূপে উপলব্ধি করাতেই সে সত্য সম্যকরূপে নিহিত। বৈরাগ্যের নামে পার্থিবতাকে পরিত্যাগ করাই পরম সত্য নহে, পৃথিবীর রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে আনন্দ স্বরূপের প্রীতিময় প্রকাশকে সর্বতোভাবে অনুভব করাতেই পরুষার্থতা। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে ঋষিদের নির্দেশিত এই সত্যেরই সন্ধান দিয়াছেন। আধুনিক সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নির্দেশিত সেই সত্যকে ইউরোপীয় ঐহিকতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বা অনুবিদ্ধ স্বরূপ দেখাইয়াছেন, এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা। কিন্তু এ বস্তু নূতন নয়। ভারতের তত্ত্বদর্শী সাধকগণের পুরাতনী বাণীর ভিতরে এ সত্য বিধৃত রহিয়াছে এবং সে সত্য বাঙলায় বৈষ্ণব সাধনার পথে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নলিনীবাবু সে কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ভক্তের, প্রেমিকের, উন্মুখী মর্ত্য মানুষের। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে, জীবনকে, লীলাকে সমর্থন করিতেছেন সাঙ্গোপাঙ্গে কায়মনোবাক্যে'। নলিনীবাবুর মতে, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য এই যে, "বৈষ্ণব ভাবের মর্ম হল ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটা একান্ত ব্যক্তিগত ভাবা-থরতার রসময়তার সম্বন্ধ—ভক্তের চেতনায় দৃষ্টিতে ভগবানের প্রেমময় মূর্তিটি ছাড়া আর কিছু নাই—বিশ্ব হারিয়ে গেছে, লোপ পেয়েছে—ভগবানের আর কোন আকার বা রূপের সংবাদ তিনি রাখেন না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এতখানি আত্মভোলা হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নাই, এতখানি মূর্তিপূজারী অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী মূর্তিপূজারীও তিনি হতে পারেন নাই। খাঁটি বৈষ্ণবের যে অব্যভিচারী অনন্যমুখী একরসসার তন্ময়তা তা ঠিক রবীন্দ্রনাথে নাই। ভগবানের মধুর মূর্তিরূপটি অপেক্ষা প্রভুরূপে ঈশ্বররূপটি তাঁর চিত্তকে বেশী দোলা দিয়াছে।" "তিনি করেছেন নির্গুন বা নিরাকার পুরুষের উপর প্রেমরূপ আরোপ—তাঁহার ভগবান পুরুষ যদি হয়, তবে তা ব্যক্তি পুরুষ নয়, বিশ্বপুরুষ।" নলিনীবাবু বলেন,—"রবীন্দ্র চিত্তকে অধিকার করে আচ্ছন্ন করে রয়েছে প্রকৃতির প্রেম।" আমাদের মনে হয়, নলিনীবাবু যাহাকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম বলিয়াছেন, তাহার মূলেও রহিয়াছে আত্মার অব্যবহিত বা অতর্কিত আনন্দঘন-রস-স্পর্শেরই পরম বল বা উপচয়; বাহিরের সঙ্গে অন্তর-রসধারার অজস্র সংযোগে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে কবির ঘটিয়াছে প্রেম-পরিচয়। এই দুই বস্তু ব্যবহিত নয় বা বিতর্কণীয়ও নহে। "আত্মনং অত্র পুরুষং অব্যবহিতং একং অন্বীক্ষতে" এই জিনিস। বাঙলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হইতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যে যাঁহারা রসাভাসের পরিচয় পান, তাঁহাদের বিচার অনেকটা ব্যক্তিগত সংস্কারযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যে রস-মাধুর্য-লীলার প্রত্যক্ষতার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। উপসংহারে নলিনীবাবু বলিয়াছেন—"বাঙলার যা বিশেষ গুণ, তার অন্তরাত্মার যে সুর ও ছন্দ—অন্তরাত্মার, ভাবময় পুরুষেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, হৃদ্য তন্ময়তা—যার প্রথম মুখ খুলেছে চণ্ডীদাসে এবং বঙ্কিমও যে ধারাকে প্রস্যারিত করেছেন—রবীন্দ্রনাথে তাই পরিণত বিচিত্র তীব্র পূর্ণ প্রকট হয়েছে। বাঙলার স্বাভাবিক শ্রীর দিক—বৃন্দাবনীর পর্যায় পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথে।" আধুনিক বিশ্বের সুরের সঙ্গে বাঙলার অন্তরের সুরে সংযোগ সাধনার সার্থকতা রবীন্দ্রনাথের অবদানে আমরা একান্তভাবেই উপলব্ধি করি। এক্ষেত্রে তিনি এক এবং অদ্বিতীয় সকলেই নলিনীবাবুর একথা স্বীকার করিবেন। সমালোচক হিসাবে নলিনীবাবুর সব সিদ্ধান্ত স্পষ্ট এবং বিচারদৃঢ়। বাঙলার সুধী এবং মনীষী-সমাজে নলিনীবাবুর 'রবীন্দ্রনাথ' সর্বত্র সমাদৃত হইবে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এমন সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত আলোচনা আমরা খুব কমই পাঠ করিয়াছি।

চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাঁচ বৎসরঃ—প্রকাশক, চীন পাবলিশিং কোম্পানী, চুংকিং, চীন।

বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া জগতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চীন এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিয়াছে। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাহার দীর্ঘকালব্যাপী দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। একদিকে জাপান—ক্ষাত্রবীর্যের চরমত্বে উন্নীত। অপরদিকে মহাচীন—অসহায় বিহঙ্গের মত পক্ষপুট সংকুচিত করিয়া অবস্থিত কি করিয়া এই অসহায় বিহঙ্গ আক্রমণরত শ্যেন পক্ষীর আক্রমণ ব্যাহত করিয়াছে, কি করিয়া অঘটনও সংঘটিত হইয়াছে, তাহাই এই পুস্তকে প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে চীনকে লইয়া ভাগ্যবিধাতা ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, তাহার পূর্ব সম্পদ প্রায় সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেশের উদ্যম ও অধ্যবসায় শৈথিল্য ঘটে নাই। জাতির আত্মা আজিও সতেজ, নববলে বলীয়ান। তাই চীন আজ আঘাতের পর আঘাত খাইয়াও অচল রহিয়াছে, সে আজ নূতন করিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র সংগঠন করিতেছে।

যে রাষ্ট্র অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে, তাহার বিষয়ে সকলে জানিতে চায়। এই পুস্তক চীন সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল মিটাইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যুদ্ধকালে চীন কি উপায়ে তাহার শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছে, তাহার অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা তাহারা করিয়াছে, তাহার জাতীয় জীবনে যে সর্বাঙ্গ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সুলিখিত প্রামাণ্য বিবরণ পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

হরিবংশ

(উপন্যাস)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৪

অগত্যা যেন বাধ্য হয়েই মঙ্গলা মুরলীকে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। মনে মনে নিজের সাহসকে নিজেই ধন্যবাদ দিল মঙ্গলা। যে লোক কাল রাত্রে এমন একটা কেলেঙ্কারি করেছে, কেউ বাড়ি নেই, ঘরে নেই, মঙ্গলা একা, তাকে ডেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে নির্ভয়ে মুখোমুখি বসে গল্প-গুজব করছে তার সঙ্গে। এ কি কম সাহসের কথা। হোলই-বা মুরলী সম্পর্কে তার দেবর, ছেলেবেলা থেকে তাকে দেখে আসছে, কথাবার্তা বলছে, তবু মুরলী যে কি ধরণের লোক, তা তো সবাই জানে। আর হোলই-বা পাড়ার অন্যান্য বউদের চেয়ে মঙ্গলা বয়সে কিছু বড়, তাহলে এরই মধ্যে বুড়ি তো আর সত্যিসত্যিই সে হয়ে পড়েনি। দিন-দুপুর হোলেও কাছে ধারে কেউ কোথাও নেই, মুরলী যদি হঠাৎ কিছু করে বসে, তাহলে কি করবে মঙ্গলা। তার বুকটা একবার যেন একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু মুরলীর হাবে-ভাবে তেমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। নিতান্ত শান্ত ভাল-মানুষের মতই সে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে। কিন্তু সাধুতার এই ভড়ং বুঝতে বাকি নেই মঙ্গলার। কিছু বিশ্বাস নেই মুরলীকে দিয়ে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন অভদ্রতা করে ফেলা ওর পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু করেই দেখুক না একবার। এ কি যার-তার মত সস্তা মেয়েমানুষ পেয়েছে নাকি মঙ্গলাকে। মঙ্গলা তাহলে আস্ত রাখবে নাকি মুরলীকে, সমুচিৎ শিক্ষা দিয়ে দেবে না?

মুরলী একটা পিঁড়ি টেনে ততক্ষণে বেশ ভালো করে বসেছে।

"তারপর সবিস্তারে বলুন দেখি সব। সুবলদার বিচারে কি রায় বেরুল শেষ পর্যন্ত। জেল না ফাঁসি। পাড়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো আজকাল আমাদের সুবলদাই।"

মঙ্গলা বলল, 'তোমার তাই হওয়া উচিত ঠাকুরপো। ছি-ছি-ছি, আর কেউ হলে মুখ দেখাতে লজ্জা করত। বুড়ো হয়ে গেলে—'

মুরলী হাসল, 'জোর করে বুড়ো বানালেই কি বুড়ো হয়ে যাব বৌদি। তাছাড়া আমি বুড়ো হলে সুবলদার কি দশা হয় বল দেখি? সে তো আমার চেয়েও দু-তিন বছরের বড়। আর যেই বুড়ো হোক, আমি কোনদিন বুড়ো হব না—দেখে নিও।'

মঙ্গলাও হাসল, 'গায়ের জোরে না কি? আমার তো মনে হয়, বুড়ো তুমি এরই মধ্যে হয়ে পড়েছ। আর হয়ে পড়েছ বলেই এমন জোর করে বলছ—বুড়ো হইনি, বুড়ো হইনি।'

মুরলী যেন একটা ঘা খেল! মঙ্গলা যা বলেছে সত্যিই কি তাই? ভিতরে ভিতরে বার্ধক্য এসেছে বলেই বাইরের উত্তেজনার তার এত বেশি প্রয়োজন?

'যাক্, এতক্ষণে ঝগড়াটা জমে উঠছে বউদি। এই জন্যই আসতে ভালো লাগে আপনার কাছে। প্রাণের আনন্দে এমন ঝগড়া আর কারো সঙ্গে করা যায় না।'

মঙ্গলা বলল, 'আমাকে কি শেষ পর্যন্ত এমন ঝগড়াটে মেয়েমানুষ বলেই ঠিক করলে? কেন, ললিতার মা কি ঝগড়া কম করে নাকি?'

মুরলী জবাব দিল, 'করে, কিন্তু আপনার মত তার কথায় অত ধারও নেই, ভারও নেই।'

মঙ্গলা খুশি হয়ে বলল, 'যাক্, আমি নিজে ভাবি এইটাই যা তোমাদের অপছন্দ, কথার ভার থাকাটা পছন্দই করো তাহলে।'

মুরলী হেসে জবাব দিল, 'শুধু কথার ভারই বা হবে কেন, অন্য কোন ভারও যে পছন্দ করি না, তাই-বা আপনাকে কে বলল।'

মঙ্গলা একবার তাকালো মুরলীর দিকে। না তার চোখের দৃষ্টিতে কোন মোহের আভাস নেই কোন চাঞ্চল্য কি উত্তেজনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মুরলী মুচকি মুচকি হাসছে। নিশ্চয়ই পরিহাস করছে মুরলী। মেয়েমানুষের মন রেখে মিথ্যা তোষামোদ করা তার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে। এ নিছক তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়। মঙ্গলা আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু অতখানি আশ্বস্ত না হতে হলেই যেন ভালো লাগতো।

মঙ্গলা বলল, 'আমি যদি ঝগড়াটে হয়ে থাকি, তুমি একটি পরম মিথ্যুক ঠাকুরপো। যা বলো তার একটাও তোমার মনের কথা নয়, তা আমি জানি।'

মুরলী বলল, 'আশ্চর্য, যা আমিও জানিনে, তাও দেখছি আপনি জানেন। আমার মনের কথা এত জানলেন কি করে? অন্যের মনের কথা আপনি জানেন কেবল আপনার মনের কথাই কেউ জানতে পারে না, তাই ভাবেন বুঝি?'

মন্দ লাগে না এমন কথার মারপ্যাঁচ খেলতে। তাছাড়া মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। কথার নিগূঢ় অর্থ মঙ্গলা বোঝে, কথার জবাবও সে দিতে পারে। বেশ বুদ্ধি আছে মঙ্গলার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের বুদ্ধি সবারই হয়। এই জন্য একটু বয়স্কা মেয়েদের ভালো লাগে মুরলীর। কিশোরী কি তরুণীদের সেই তুলনায় অনেক খেলো, অনেক হাল্কা বলে মনে হয়। বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় ওরা যেন শিশু মুরলীর কাছে। আশ্চর্য, তবু মুরলী কি করে নিজেকে নামিয়ে আনে, সেই হাল্কা অপরিণতবুদ্ধি মেয়েদের কাছে নিজেকে নামিয়ে আনতে তার তবু এত ভালো লাগে, একটা তীব্র উত্তেজনার স্বাদ পায়, যা শতগুণ পরিণতবুদ্ধি এই বয়স্কা বউটির চাতুর্যপূর্ণ কথা-

বার্তায়ও পাওয়া যায় না। সেই ধরণের কোন রকম আকর্ষণই তো এখন আর বোধ করছে না মুরলী। যত খুশি মাত্রাহীন হাস্যপরিহাস সে মঙ্গলার সঙ্গে করে যেতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যি অসংযত হয়ে পড়বার ভয় আর তার নেই।

কার সঙ্গে গল্প করছ বউদি, আলতা একেবারে সরাসরি চৌকাঠের গোড়ায় এসে হঠাৎ থমকে যায়। মঙ্গলাও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে ভাব সামলে নিয়ে সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'কি জানি, দেখ্ দেখি চিনতে পারিস কি না।'

মুরলী বলে, 'আয় আলতা।'

কিন্তু আলতা ঘরেও ঢুকল না, মুরলীর আমন্ত্রণেও সাড়া দিল না, মঙ্গলাকে উদ্দেশ করেই বলল, 'না বউদি, এখন যাই, অন্য সময় বরং আসব।'

মঙ্গলা বলল, 'কেন, কী হোল, আরে শোন্ শোন্—

কিন্তু আলতা আর দাঁড়ালে না।

আলতা চলে যাওয়ার পর মুরলী মঙ্গলার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসল, 'মেয়েটা ভারি হিংসুটে না বউদি?'

মঙ্গলার গাল একটু আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, 'কিন্তু এখানে ও হিংসা করলে কাকে?'

মুরলী নিতান্ত নিরীহভাবে বলল, 'তা ঠিক, হিংসা আর এখানে কাকে করবে? তবে ও ভারি বানিয়ে কথা বলতে পারে। তিলকে তাল করতে ওর মত ওস্তাদ আর নেই।'

মঙ্গলা সতেজে বলল, 'আর যার সম্বন্ধেই যে যা খুশি বানিয়ে বলুক আমার সম্বন্ধে কেউ তা সাহস করে না, আর কেউ বিশ্বাসও করবে না। অত ভয় দেখায়ো না আমাকে। অনেকে অনেক কথাই বলেছে আমার বিরুদ্ধে—আমি ঝগড়াটে, আমি হিংসেবী, আমি কৃপণ, কিন্তু আমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কোন দিন কিছু বলতে সাহস পেয়েছে শুনেছ? অত নরম মানুষ আমাকে ভেব না।'

মুরলী হেসে বলল, 'পাগল আপনাকে নরম ভাববো এতো শক্ত শক্ত কথা শুনবার পরও, আমাকে কি আপনি এতই বোকা মনে করেন না কি? আচ্ছা, ওঠা যাক এখন, আপনার রান্নাবাড়ার অনেক দেরি ক'রে দিলাম।' মুরলী উঠে পড়ল।

না মুরলীকে মোটেই বোকা মনে করা যায় না। কেন যে এসেছিল তার একটা কথাও বের করা গেল না, বরং মঙ্গলাই বোকার মত সারাক্ষণ ধরে যত বাজে বকর বকর করল বসে বসে। নিজের ওপর ভারি রাগ ধরে গেল মঙ্গলার। আর যাই হোক, মুরলী মোটেই সহজ মানুষ নয়! ও না ক'রতে পারে এমন কিছু নেই। আচ্ছা রকমের শিক্ষা ওকে কেউ দিয়ে দেয়, তবে ভালো হয়। মঙ্গলা নিজেই ওকে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তেমন কোন সুযোগই দেয় না মুরলী। কি ক'রে দেবে? মুরলীর কি ভয় নেই প্রাণে? মুখে যতই হাসি তামাসা করুক মনে মনে মুরলী তাকে বাঘের মতই ভয় করে। কিন্তু তাকে দেখে সত্যিই অত ভয় পায় কেন মুরলী? মঙ্গলা কি' দেখতে এতই ভয়ানক, এতই খারাপ? কিন্তু মুরলীর মত একজন লোকের চোখে সে দেখতে ভালোই হোক আর খারাপই হোক তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন মঙ্গলার? বরং তাকে যে মুরলী ভয় ক'রে চলে, কেবল মৌখিক হাস্য পরিহাসেই ক্ষান্ত থাকে সেই তো ভালো; আর কিছুর জন্য নয়, মুরলীকে শিক্ষা দেবার কোন ছল মঙ্গল পায় না বলেই তার এই ক্ষোভ। মুরলীর মত লোকও নির্ভয়ে হেসে খেলে বেড়ায়, বউ ঝির সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে, মঙ্গলার গায়ে জ্বালা ধ'রে তো সেইজন্যই। কিন্তু নিতান্ত গায়ে পড়ে তো একজন লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না, কিংবা বাড়ির ওপর পেয়ে ঝাঁটা মারাও যায় না। না হ'লে এ ধরণের লোককে মঙ্গলা দুচোখে দেখতে পারে না, ভালো লাগা তো দূরের কথা।

১৫

সুবলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুরলী পথে নেমে পড়ল। দু ধারে উঁচু উঁচু ভিটে। পথের ধার থেকে যে যার সাধ্যমত বাড়িতে মাটি তুলে উঠান উঁচু ক'রে নিয়েছে। ভিটের কোলে লম্বা লম্বা খাদ। বর্ষায়, বৃষ্টিতে বাড়ির মাটি ধুয়ে এই খাদ আবার ভরে উঠবে। শুকনোর সময় আবার চলবে মাটি তোলার পালা।

যেতে যেতে মঙ্গলার কথাটা বার বার করে কানে বাজতে লাগলো, 'তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।' কেন বলল মঙ্গলা একথা। বুড়োমির সে কি দেখল তার মধ্যে। সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর তার বয়স। এই বয়সে কেউ বুড়ো হয়, আর সে যদি বুড়ো হয়, তা হোলে তার বাবাকে কি বলবে মঙ্গলা। আসলে মঙ্গলার মনের ভাব মুরলীর জানতে বাকি নেই। বুড়ো ব'লে তাকে সে ক্ষেপাতে চায়, উত্তেজিত হয়ে যাতে সে ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা ক'রে বসে তাই চায় মঙ্গলা। তার কথায় বার্তায় এমন আরো অনেক ইঙ্গিত মঙ্গলা দিয়েছে। মনে মনে মুরলী হাসল। একটু যদি চেষ্টা করে মুরলী, একটু যদি মন দেয়, তাহ'লে এখানেও আর বেশি দিন লাগে না। এমন সে অনেক দেখেছে। কারো দুদিন, কারো বা দু বছর। কারো জন্য মুখের আদরই যথেষ্ট, কারো জন্য কিছু অর্থ খরচ করতে হয়। অধ্যবসায়ী হয়ে একটু লেগে থাকলেই হোল। এমন কত দেখেছে মুরলী। কেবল লজ্জা আর ভয়। সেই দুটো ভাঙতে যতক্ষণ। আর তা ভাঙবার জন্য যেন তৈরী হয়েই আছে কেবল আর একজনের হাত ছোঁয়াবার অপেক্ষা।

কিন্তু লজ্জা আর ভয় কি সকলের একেবারেই ভেঙে দিতে পেরেছে মুরলী? আবার কি সব জোড়া লেগে ওঠেনি, সেই ভাঙনের দাগ মিলিয়ে যায়নি আবার? কার জীবনে কতটুকু দাগ রাখতে পেরেছে মুরলী? কার কতটুকু ক্ষতি হয়েছে? প্রায় সবাই তো সুখে ঘর সংসার করছে আবার স্বামী পুত্র নিয়ে। কেউ কি একবার ভুলেও ভেবে দেখে মুরলীর কথা? যে শারীরিক আনন্দ তারা প্রতি রাত্রে উপভোগ করছে সেই ধরণের আনন্দ তারা এক সময় মুরলীর কাছ থেকেও পেয়েছিল এ কথা কি এমন মনে ক'রে রাখবার মত? একদিনের সঙ্গে আর এক-দিনের প্রভেদ কি তারা মনে ক'রে রাখে? মুরলীর আত্মপ্রসাদ যেন হঠাৎ চিড় খেয়ে গেল। সারাজীবন ভরে এই কৃতিত্বই কি তাহ'লে সে সঞ্চয় ক'রেছে যা লোকের চোখে তো পড়েই না

তার নিজের চোখের সামনে থেকেও অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার চোখে তার বাবা নবদ্বীপই তো তাহ'লে বেশি চালাক। তার সঞ্চয় এমন কাল্পনিক নয়, ধোঁয়ার মত হাওয়ায় তা মিলিয়ে যায়নি। তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থকে সে হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রতে পারছে উপভোগ করতে পারছে। তার শ্রমের ঘাম ঝরে ঝরে মাটিতে প'ড়ে শুকিয়ে যায়নি। তার শ্রমের ফল সে প্রত্যক্ষ ক'রছে তার নিজের হাতে গড়া বাড়ি ঘরের জমি জমায়, তার অভিজ্ঞতার দাম আছে, ত'র বিষয় বুদ্ধিকে লোকে শ্রদ্ধা করে। উপকার কি অপকার যে সব মানুষের নবদ্বীপ ক'রেছে তা অত সহজে তারা ভুলে যায়নি। যাদের বৈষয়িক লাভ হয়েছে তাহা আরও লাভের আশায় এখনও নবদ্বীপের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়, তার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে। যাদের ঠকিয়েছে, যাদের ক্ষতি ক'রেছে নবদ্বীপ, তারা আক্রোশে আজও ছট ফট করছে। কারও মন থেকেই নবদ্বীপ এমন করে মিলিয়ে যায়নি।

হঠাৎ মুরলীর মনে পড়ল নবদ্বীপ তাকে তামাকের গুলি নিয়ে যেতে বলেছিল রঙ্গীদের বাড়িতে। মুরলী তাতে কান না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে। মাঝে মাঝে নবদ্বীপের ধরণ ধারণ তার কাছে ভারি অদ্ভুত মনে হয়। তার ব্যবহারের যেন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা ক'রেই কি নবদ্বীপ এমন দুর্বোধ হয়ে ওঠে, হেঁয়ালী করতে সে ভালবাসে? না, মুরলীরই ভাল লাগে তার বাবাকে জটিল আর রহস্যময় বলে ভাবতে? মধুর বাড়িতে তামাক দিয়ে আসতে বলায় গূঢ় কোন উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে নবদ্বীপের। মুরলী একবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করল। হয়তো ওরা যাতে আর হৈ চৈ না করে সেজন্য আপোষই ক'রতে চেয়েছে নবদ্বীপ। তামাক দিয়ে খাতিরটা একটু বাড়াতে চেয়েছে। এতে মুরলীর এমন আপত্তি করবারই বা কি আছে, আশ্চর্য হবারই বা কি আছে। নবদ্বীপের কথা এবং ব্যবহার এখন বেশ যুক্তিযুক্তই মনে হ'তে লাগল মুরলীর। বেশ বোঝা গেল সুবল একটা জোট পাকাবার চেষ্টায় আছে। যাতে সে তেমন সুযোগ না পায় সে জন্য মধুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজেদের হাতে রাখা তো ভালোই। নবদ্বীপ যা বলেছে তাই করবে মুরলী। এখনই তামাকের গুলি নিয়ে দিয়ে আসবে মধুদের বাড়ি। যত চেঁচামেচি রাগারাগিই করুক নবদ্বীপ, সে যা করতে বলে তা হিসাব ক'রে বুদ্ধিমানের মতই বলে, তাতে শেষ পর্যন্ত মুরলীর ভালোই হয়।

এই এক স্বভাব মুরলীর। প্রথমে ঘটা ক'রে বাপের কোন আদেশ উপদেশ সে অমান্য করে, কিন্তু খানিক পরে নবদ্বীপের সব কিছুই তার কাছে আবার যুক্তিযুক্ত মনে হয় নির্বিচারে যে কোন পরামর্শই তখন মেনে নেয় মুরলী। বিদ্রোহ সে করে যেন নতুন ক'রে বশ্যতা স্বীকারের জন্যই।

'আরে মুরলী যে, তুমি এদিকে, আমি তো তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।'

মুরলী মাথা উঁচু ক'রে চেয়ে দেখল বিনোদ। 'আমার ওখানে, কেন?'

বিনোদ সলজ্জ হেসে বলল, 'এই ভাই, কিছু কথা ছিল তোমার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে! কি ব্যাপার, আবার কি কীর্তনের আয়োজন ক'রতে চাও নাকি?

বিনোদ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, শীগগির আর ন যে হাঙ্গাম।'

কিন্তু মুরলীর মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল, 'তা ঠিক কিন্তু তোমার মত সাধু মহান্তের আমার সঙ্গে এমন আর কি কথা থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

"ওই দেখ, তোমার কেবলই ঠাট্টা। সাধু মহান্তের পায়ে ধুলোর যোগ্যও না কি আমরা?"

মুরলী বলল, 'যাক গে, কথাটা কি, বলেই ফেল না।'

বিনোদ বলল, 'পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন। চল তামা খেয়ে যাবে আমাদের বাড়ি থেকে।'

এত সমাদর কেন। নিশ্চয়ই টাকার দরকার হয়েছে বিনোদের। মুরলী মনে মনে হাসল। কিন্তু কোথায় যে একটু আকর্ষণ আছে বিনোদের মধ্যে। তার ধরণ ধারণকে মুরলী যতই ব্যঙ্গ করুক, যতই অবহেলা করুক, খানিকটা কৌতূহল যেন তার আছে বিনোদের সম্বন্ধে। বিনোদ যেন অন্য কে রহস্যময় জগতের মানুষ, যার সঙ্গে মুরলীর কোন মিল নেই কিন্তু এই বিভেদ আর বৈপরীত্যের জন্যই বোধ হয় সে এ ক'রে মুরলীকে আকর্ষণ করে। একটু মিশে দেখতে ইচ্ছা হ নেড়ে চেড়ে খানিকটা কৌতুক করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু অত্য উদাসীনভাবে ওকে যেন তুচ্ছ ক'রে ছেড়ে চলে আসা যায় না।

কি ভেবে মুরলী বলে, 'আচ্ছা চল।'

(ক্রমশ

যা ঘটে তাই

(৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

তোর খোকা ত তোর পাশেই শুয়ে আছে, তুই বুঝি কিছু চোখ চেয়ে দেখিস না?"

"খোকা, কই খোকা?" ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি ফিরাইতে ইন্দিরা দেখিল ঠিক তাহার পাশেই সুধীরার খোকা শুইয়া আছে। "খোকা, আমার খোকা", বলিয়া দুর্বল হাতের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়া ইন্দি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজস্র চুম্বনে অস্থির করি তুলিল। দুই বোনের মিলিত অশ্রুজল খোকার মাথার উ আশীর্বাদের মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিমান আক্রমণে শিশু-মনে প্রতিক্রিয়া

বিমান আক্রমণ ও নিরাপত্তার নিমিত্ত লোক অপসারণের ফলে মানব মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সে সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের মনে ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, তাঁরা তা বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। ও দেশে শিশুদের অনেককেই নিরাপদ স্থানে অপসারিত করা হয়েছে—সুতরাং বিমান আক্রমণ কিংবা অপসারণের ফলে তাদের মন যেভাবে প্রভাবিত হয়েছে, গবেষণায় তাহাই প্রকাশ পেয়েছে অধিক। বর্তমানে আমাদের দেশেও যুদ্ধের ঢেউ এসে পৌঁছেছে : কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফেণী প্রভৃতি অঞ্চলে বিমান আক্রমণ হওয়াতে বহুলোক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছেন। বিমান আক্রমণ ও লোকাপসরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো তাই এদেশেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণা তাই এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে সমস্ত পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী এ বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন তাঁদের অভিমত এই যে, বিমান আক্রমণে শিশুদের মন এমনভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে যে, আপাতদৃষ্টিতে নির্ভীক ও 'নির্দোষ' বহু বালকবালিকার মনেও ভয়ানক আলোড়ন উপস্থিত হয়। বিমান আক্রমণের হুড়োহুড়িতে বহু বুদ্ধিমান শিশুরাও এমনভাবে ঘাবড়ে যায়, যে নিরাপদ স্থানে অপসারিত হওয়ার পরেও দেখা গিয়েছে, তাদের পূর্বের ন্যায় কোন কাজে মনসংযোগ আসে না। সহসা তারা হয় অলস হয়ে পড়ে, নয়তো এমন দুষ্টু, স্কুলপালানো ও ডানপিটে হয়ে উঠে যে, তাদের বাগমানানো কষ্ট হয়। সচরাচর দেখা গিয়েছে বিমান আক্রমণে অভিভূত ছেলেদের যেন খেলাধূলায় তেমন উৎসাহ থাকে না; কি কাজ কিভাবে করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। বিশ্রাম সময় উপভোগ করার মত প্রবৃত্তি যেন হারিয়ে ফেলে। বিমান আক্রমণের বিপদ থেকে তাদের যদি অন্যত্র অপসারিত করা হয়, তবে সেই অপসারণের ফলে তাদের মানসিক ভাবপ্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বহুক্ষেত্রে তাদের মনে নানা দুর্ভাবনা জাগে. ফলে 'নার্ভাসনেস' দেখা দেয়। ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠা বা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যাওয়া প্রভৃতি মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে বালকবালিকারা পিতামাতা হতে বা অভ্যস্থ পারিপার্শ্বিক থেকে অপসারিত হয়, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, বিমান আক্রমণের চেয়েও তা শিশু-মনের উপর অধিকতর অস্বস্তিকর প্রভাব বিস্তার করে। তবে যাদের অন্য রকম মানসিক ব্যাধির বালাই নাই, তাদের পক্ষে অপসারণের ফল খুব খারাপ হতে পারে না; বরং দেখা যায়, হোস্টেল বা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে এসে তাদের মধ্যে অনেকে পূর্বের চেয়েও ভালো হয়ে উঠে। বাঁধাধরা চালচলন এবং অনেক ছেলেপেলের সংস্পর্শে এসে তারা যে নূতন জীবনের সন্ধান পায়, তাতে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই মনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হয়।

ইংলণ্ডে ৫ হতে ১৫ বছর বয়স্ক ছেলেদের অধিকতর নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করার ফলে ওদেশে বিমান আক্রমণে এরূপ বয়সের বালকবালিকাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যন্ত কমই হয়েছে। বিমান আক্রমণের ফলে বধিরতা, তোতলামি প্রভৃতি বিকলতা যা সচরাচর ছোট ছেলেদের ঘটতে পারে, ওদেশের কর্তৃপক্ষ বিমান আক্রমণের পূর্বে ওদের স্থানান্তরিত করায় সে সবের সংখ্যাও খুব বেশী হয়নি। এদেশে যখন বিমান আক্রমণের হিড়িক শুরু হয়েছে—ও দেশের অভিজ্ঞতা হতে আমাদের দেশেও ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেই মনে হয়।

যুদ্ধ ও খনিজ পদার্থ

আধুনিক যুদ্ধে খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। শিল্প বাণিজ্যে উহার যেরূপ প্রয়োজন, বিভিন্ন মারণাস্ত্র নির্মাণেও বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যের আদর কম নহে। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধের পিছনে শক্তি বৃদ্ধির জন্য খনিজ সম্পদ অধিক পরিমাণে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যও যে না আছে তা নয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়া আন্তর্জাতিকতার দিক হতে তাই পৃথিবীর খনিজ সম্পদগুলোর আলোচনা করেন। আধুনিক যুদ্ধে খনিজ পদার্থ যেরূপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তার উল্লেখ করে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিবারণ করতে হলে এই পদার্থগুলোর এরূপ বিলি ব্যবস্থা হওয়া দরকার, যাতে এক জাতি অপর জাতির চেয়ে এ সম্পদের সুযোগ সুবিধে বেশী না পেয়ে বসে। প্রকৃতি অবশ্য বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন রকমের খনিজ সম্পদ দিয়েছেন, কোন দেশকেই সকল প্রকার খনিজ পদার্থে পূর্ণ করে দেন নাই। সুতরাং সব জাতিরই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত খনিজ সম্পদে সমান অধিকার থাকবে—এ আদর্শে যদি কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তবেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। মিঃ ওয়াদিয়া বলেন, এজন্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে এমন অর্থনীতিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে পৃথিবীর জাতিসমূহ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়, কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের কারণ না ঘটে। খনিজ পদার্থে লোভ থাকা সাম্রাজ্যলোলুপ জাতিগুলোর পক্ষে স্বাভাবিক পৃথিবীর শান্তি রক্ষার্থে যদি এ সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই যুদ্ধবিগ্রহরূপ অশান্তির পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। বিগত ১২৫ বছরে যে পরিমাণ খনিজ পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছে—বিশেষ করে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্তও যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সময়ে পূর্বে আর পাওয়া যায় না। খনিজ পদার্থের পরিমাণ যেমন কমে আসছে, তেমনি অনেক খনিজ পদার্থ এখনও অনেক জায়গায় অনাবিষ্কৃত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদগুলোর তথ্যানুসন্ধান করে, তার নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা যদি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংগঠনে গৃহীত হয়, তবে বর্তমানের হানাহানি কাটাকাটির সমাপ্তি ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু এ কখনও সম্ভব হবে কি! অবশ্য ইতিমধ্যেই স্যার টমাস হল্যাণ্ডের অধিনায়কত্বে সুবিখ্যাত ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদগণকে নিয়ে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে

তথ্য অনুসন্ধান করে আন্তর্জাতিক ভাবে তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইঁহারা এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের নিকট দাখিল করবেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংগঠনে এদের পরিকল্পনানুযায়ী কতদূর কাজ হবে ভবিষ্যতই তা বলতে পারে।

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের খাদ্যসমস্যা

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের কৃষি কিভাবে সংগঠিত হবে তার উপায় নির্ধারণে ব্রিটিশ এসোসিয়েশান মনোযোগী হয়েছেন এবং সুবিখ্যাত কৃষি-বিজ্ঞানবিদ স্যার জন রাসেলের নেতৃত্বে এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নানাবিধ সমস্যার আলোচনা শুরু হয়েছে। মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণও এসব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ শস্যের ভাল ও সতেজ বীজের ব্যবস্থা করে য়ুরোপের বিভিন্ন ফসলগুলোকে অধিকতর অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভবপর হতে পারে এসব বিষয়ে উপরোক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সারা বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হবে বলে অনেকে ধারণা করেন। যাতে য়ুরোপে সেরূপ অবস্থার উদ্ভব না ঘটে, তজ্জন্য পূর্ব হতেই বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে একদিকে ফসলের সুব্যবস্থা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহাতে সুস্থ গরু মহিষ ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর চাষের উন্নতি হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় দুধ মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সহজে সরবরাহ হয় তৎপ্রতি উক্ত কমিটি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছেন। য়ুরোপীয় আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা আমেরিকাতে নাকি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই উহা য়ুরোপে আমদানী করে চাষের যাতে সুব্যবস্থা হতে পারে এখন হতেই তার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের সংগঠন সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা কিরূপ সচেতন এবং এখন হতেই ভবিষ্যতের সংস্থান ও সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কিভাবে কাজ শুরু হয়েছে তা দেখে আমাদের বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। ওসব দেশের সঙ্গে যখন আমাদের দেশের কথা মনে হয়, তখন আমাদের অসহায় অবস্থা আরও বেশী অনুভব করি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান করবার সঙ্গতি থাকায় যুদ্ধের কঠিন সময়েও তারা খাদ্যদ্রব্যে আমাদের দেশের লোকদের মত অসুবিধা ভোগ করে না, বর্তমানের সমস্যা মিটিয়ে ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে পারে। ভারতবর্ষে খাদ্যসমস্যা আজ যে আকার ধারণ করেছে, তাতে যুদ্ধোত্তরকালের ভাবনা ভাববার আমাদের অবসর নেই। বর্তমানের ভাবনাই যথেষ্ট। অথচ এ দেশের রাজপুরুষগণ তাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে পাচ্ছেন না। ফলে অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বণ্টনে পূর্ব হতে, বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হলে আজ দেশময় এরূপ হাহাকারের উদ্ভব হত না।

ভারতের খনিজ সম্পদ

বিগত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিজ্ঞান শাখার সভাপতি জিওলোজিক্যাল সার্ভে বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং জিওলোজিষ্ট ডাঃ জে এ ডান তাঁর অভিভাষণে বিশেষ করে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিভাষণ হতে আমরা জানতে পারি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষ খনিজ সম্পদে অধিক অর্থ আহরণ না করতে পারলেও, ভারতবর্ষ পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে সমপর্যায় দাবী করতে পারে। শুধু তাই নয়, 'অভ্র ও ইলমেনাইটে' কোন দেশই ভারতের সমকক্ষ নহে। অধিক পরিমাণে লৌহযুক্ত খনিজ পদার্থ ও ভারতের মত অন্য দেশে কমই পাওয়া যায়। 'মাঙ্গানিজের' আকর হিসাবে রাশিয়ার সমান অংশীদার রূপেই পৃথিবীতে ভারতের স্থান। কোন দেশেই অবশ্য সকলপ্রকার খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয় না। ভারতে এ সবের মধ্যে বেশী অভাব অনুভূত হয় মাত্র, 'টীন,' 'নিকেল' ও 'মলিবডেনামে'র। দুঃখের বিষয়, ভারতের এইসব খনিজ সম্পদ শুধু কাঁচামাল হিসাবেই রপ্তানি হয়ে যায়; ভারত যদি শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত হত, তা হলে উহার যথাযোগ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা এদেশে যে না হতে পারত তা নয়। তবু বর্তমানে এসব পদার্থ বিদেশে যে অবস্থায় রপ্তানি হচ্ছে ডাঃ ডান বলেন, তা ঠিক সন্তোষজনক নহে। রপ্তানির পূর্বে খনিজ পদার্থগুলোকে আরও শোধন করে নেবার ব্যবস্থা যাতে প্রচলিত হয় ডাঃ ডান তৎপ্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ দেশের খনিজ শিল্পপ্রসারণ সম্পর্কে গবেষণাদির জন্য 'মিনারেলস রিসার্চ ব্যুরো' গঠন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে এবারকার অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি। বিজ্ঞান কংগ্রেস সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আগামী অধিবেশনের জন্যও তাঁকে সভাপতির পদে বৃত রাখেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ত্রিভানদ্রামে আগামী বৎসর জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। যদি পণ্ডিত জওহরলালকে আগামী অধিবেশনের সভাপতি রূপেও পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাধারণ সভাপতির কাজ পরিচালনা করবেন। আগামী অধিবেশনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণ নির্বাচিত হয়েছেনঃ—

১। গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান—অধ্যাপক বি এম সেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

২। পদার্থ বিজ্ঞান—ডাঃ ডি এস কোঠারি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। রসায়ন—ডাঃ আর সি রায়, পাটনা সায়েন্স কলেজ।

৪। ভূতত্ত্ব ও ভূগোলবিজ্ঞান—ডাঃ এ এস কালাপেশী, বোম্বাই সেণ্ট জেভিয়র্স কলেজ।

৫। উদ্ভিদ বিজ্ঞান—যুক্তপ্রদেশের ইকোনোমিক বোটানিষ্ট টি এস সর্বানিস্।

৬। প্রাণী ও কীট বিজ্ঞান—ডাঃ বিশ্বনাথ, গভর্নমেণ্ট কলেজ, লাহোর।

৭। নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—মান্দলা জগদলপুর ষ্টেট এথনোগ্রাফার মিঃ ভেরিয়র এলউইন।

৮। চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান—ডাঃ কে ভি কৃষ্ণণ, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হেলথ এণ্ড হাইজিন, কলিকাতা।

৯। কৃষি বিজ্ঞান—মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্নমেণ্টের এগ্রিকালচারেল কেমিষ্ট রাও বাহাদুর ডি বি বল।

১০। প্রাণতত্ত্ব—ডাঃ এস এন মাথুর, কিং জর্জ মেডিক্যাল কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

১১। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান—ভারত গভর্নমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের কমিশনার মিঃ জে সার্জেণ্ট।

১২। পূর্ত ও ধাতুবিজ্ঞান—টাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে জে গান্ধী।
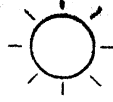
রণজি ক্রিকেটে বাঙলার দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় বাঙলা দলকে ইন্দোরে হোলকার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলাটি আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। বিহার দলের বিরুদ্ধে বাঙলার পক্ষে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এই খেলায় খেলিবেন। দলের মধ্যে সামান্য পরিবর্তনই হইবে। তবে সেই পরিবর্তনের ফলে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় দলভুক্ত হইবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। ২৫শে জানুয়ারী চূড়ান্ত নির্বাচন হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ইতিমধ্যে বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটি ২৫ জন খেলোয়াড়কে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। এই ২৫ জন খেলোয়াড়কে লইয়া নিয়মিতভাবে 'নেট প্র্যাকটিশ' করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমনকি, কয়েকটি ট্রায়াল বা বাছাই খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিনের 'নেট প্র্যাকটিশ' ও বিভিন্ন বাছাই খেলায় যে সকল খেলোয়াড় উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদেরই হোলকার দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সৌভাগ্য হইবে।

হোলকার দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হোলকার দলের নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। এই বৎসর সর্বপ্রথম হোলকার দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেখা যাইতেছে। তবে এই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ইতিপূর্বে মধ্য ভারত দল হিসাবে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন।

ইতিপূর্বের খেলায় হোলকার দলের খেলোয়াড়গণ যুক্তপ্রদেশ দলের বিরুদ্ধে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাঙলার বিরুদ্ধে সেইরূপ পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ হোলকার দলের খেলোয়াড়গণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যাটিংয়ে মুস্তাক আলী, সি কে নাইডু ও জাগন্দেল এবং বোলিংয়ে জাগন্দেল ও সি কে নাইডু ব্যতীত অন্য কোন খেলোয়াড়ই যুক্তপ্রদেশ দলের বিরুদ্ধে সুবিধা করিতে পারেন নাই। বাঙলার দলের বিরুদ্ধে এই তিনজন খেলোয়াড়ই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইঁহারা সকলেই কলিকাতার মাঠে বহুবার খেলিয়াছেন। ইঁহাদের খেলার সহিত বাঙলার খেলোয়াড়গণ বিশেষভাবেই পরিচিত। সুতরাং হোলকার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে বলিয়া বাঙলার খেলোয়াড়গণের ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবার কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। বাঙলার দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় এই তিনজন খেলোয়াড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া খেলিলেই ভাল ফল প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত প্রতি বৎসর মধ্য ভারত দলকে পরাজিত করিয়া বাঙলা দল যে গৌরব অর্জন করিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বাঙলা দলের খেলোয়াড়গণের বিশেষ চেষ্টা থাকিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বাঙলার দল

হোলকার দলের বিরুদ্ধে বাঙলার দল কোন্ কোন্ খেলোয়াড় লইয়া গঠিত হইবে বলা কঠিন। তবে ঐ দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণও স্থান পাইবেন বলিয়া মনে হয়।—

কার্তিক বসু (অধিনায়ক); কুচবিহারের মহারাজা, নির্মল চ্যাটার্জি, কে ভট্টাচার্য, এস গাঙ্গুলী, ধ্রুব দাস, এ দেব, এ হার্ভে জনস্টন, এম সেন, এস দত্ত জে ম্যাডান।

অতিরিক্ত—এস দেব, এস মিত্র ও এস এস রায়।

উপরোক্ত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ধ্রুব দাস, এম সেন, এ দেব ও জে ম্যাডান বিহার দলের বিরুদ্ধে খেলেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের দলভুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ দেব একজন বিশিষ্ট উইকেটরক্ষক। ইহা ছাড়া ব্যাটিংয়েও ইনি বিশেষ পারদর্শী। ইতিপূর্বে বিহার দলের বিরুদ্ধে যাঁহাকে বাঙলা দলে উইকেটরক্ষক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহার অপেক্ষা এ দেব যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ক্রীড়ামোদী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাঙলা দলের অভাব ছিল ফাস্ট বোলারের। এই স্থান মোহনবাগান ক্লাবের এম সেন পূরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। ইনি কি ট্রায়াল খেলা, কি ক্লাবের খেলায় সর্বত্র ফাস্ট বোলার হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ফিল্ডিং ও ব্যাটিং ইঁহার নিম্নস্তরের নহে। ইঁহাকে খেলিবার সুযোগ দিলে ভালই ফল প্রদর্শন করিবেন। জে ম্যাডান ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই বিশেষ পারদর্শী। সম্প্রতি পার্শী দলের হইয়া ইনি তিন তিনবার শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে ইনি এস গাঙ্গুলীর সহিত ভালই খেলিবেন। ধ্রুব দাস একজন তরুণ উৎসাহী ব্যাটসম্যান। ইনি এই বৎসর সর্বপ্রথম ব্যাটিংয়ে সহস্র রাণ পূর্ণ করিয়াছেন। বিভিন্ন খেলায় যোগদান করিয়া এই পর্যন্ত ছয়বার শতাধিক রাণ করিয়াছেন। এই বৎসর ইঁহার সমতুল্য ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে বাঙলার অপর কোন খেলোয়াড়কেই দেখা যায় নাই। দলের চেঞ্জ বোলার হিসাবেও ইঁহাকে ব্যবহৃত করা চলে। ফিল্ডিং ইনি ভালই করেন। এস দেব ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহাকে বাঙলা দলে লইলে দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এস মিত্র ফাস্ট বোলার হিসাবে দলভুক্ত হইতে পারেন। তবে ইঁহার অপেক্ষা এম সেন অনেক বিষয় ভাল। যে কয়েকজন খেলোয়াড়কে বাঙলা দলে লইলে দলের শক্তিবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহাদের বিষয়ই আমরা উল্লেখ করিলাম। দলভুক্ত করা না করা সমস্তই বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের উপর নির্ভর করিতেছে।
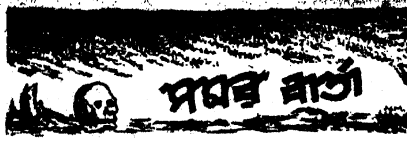
১২ই জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ককেশাস অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী জর্জিওভস্ক শহর ও কয়েকটি রেলওয়ে জংশন দখল করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে সোভিয়েট সৈনাদল দশদিনে শতাধিক মাইল অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ককেশাস হইতে রুশ বাহিনী বুদেনোভস্ক-এর পূর্ব দিকে কালমুক প্রান্তরের সৈন্য বাহিনীর সহিত মিলিত হইতেছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—জার্মান নিয়ন্ত্রিত প্যারিস বেতারে বলা হইয়াছে যে, তিউনিসিয়া রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী দুই দিক হইতে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। মেজেজ-এল-বারের দশ মাইল দক্ষিণে গোবেল্লা ও বো-আরদা'র মধ্যবর্তী সিমু নামক স্থানে প্রথম আক্রমণ শুরু হয়। দ্বিতীয় আক্রমণ চালান হয় পিসনের উত্তর দিক হইতে।

১৪ই জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—স্টকহলমে এক সংবাদে প্রকাশ, বার্লিন এই প্রথম স্বীকার করিল যে, স্ট্যালিনগ্রাদের নিকট বিচ্ছিন্ন ২২'টি জার্মান ডিভিসন পরিবেষ্টিত হইয়াছে। জার্মান হাইকম্যাণ্ডের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনী এক প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং স্থানীয় জার্মান ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, তিউনিসিয়া রণাঙ্গনে কাইরায়ানের উত্তর-পশ্চিমে আক্রমণকারী ফরাসী বাহিনী দুইটি গুরুত্বপূর্ণ টিলা অধিকার করিয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—অদ্য কলিকাতা অঞ্চলে পুনরায় জাপ বিমান হানা হয়। কলিকাতা নাগরিক রক্ষা বিভাগের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত প্রথম সরকারী রিপোর্টে বলা হয় যে, অদ্য রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার মধ্যে শত্রুপক্ষের ছোট এক ঝাঁক বোমারু বিমান কলিকাতা এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। বৃটিশ জঙ্গীবিমানসমূহ এই সমস্ত বোমারু বিমানের সম্মুখীন হইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়; ফলে শত্রুবিমানসমূহ লক্ষ্যস্থলের বাহিরে বোমা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বৃটিশ জঙ্গীবিমানসমূহ গুলীবর্ষণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমানগুলিকে জ্বলন্ত অবস্থায় ভূপাতিত করে। একখানি বৃটিশ নৈশ জঙ্গীবিমান গুলীবর্ষণ করিয়া ৩খানি জাপ বোমারু বিমানকে ভূপাতিত করিয়াছে। বার্ক হ্যামস্টেডের ফ্লাইট সার্জেণ্ট প্রিং জঙ্গীবিমানখানি পরিচালনা করিতেছিলেন।

রুশ রণাঙ্গন—সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী বর্তমানে রোস্টভ এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। রোস্টভ এলাকার "জাভেতোনি" গ্রামটি সম্প্রতি শত্রুকবলমুক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম—গতকল্য বৃটিশ বোমারু বিমানবহর আকিয়াব এলাকায় চারটি জাপঅধিকৃত গ্রামে আক্রমণ চালায়।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—ফেজ্জান অঞ্চলে ৭০০ এক্সিস সৈন্য বন্দী হইয়াছে। জেনারেল লেকলার্ক ফেজ্জান দখলের পর উত্তরাভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছেন। লিবিয়ায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—গতকল্য রাত্রে কলিকাতা অঞ্চলে জাপ বিমানের হানা সম্পর্কে বাঙলা সরকার এক প্রেস নোটে জানান যে, জাপ বিমানসমূহ ভার লাঘবের জন্য কলিকতা অঞ্চলের [illegible]রে এক স্থানে তাহাদের বোমাগুলি ফেলিয়া দেয়। প্রায় সবগুলি[illegible] বোমাই ফাঁকা মাঠে পড়ে; কিন্তু দুইটি বোমা কুলিদের এক বস্তিতে পড়ায় অতি অল্প কয়েকজন হতাহত হয়।

ব্রহ্ম—গতকল্য ব্লেনহিম বিমানসমূহ আকিয়াব এলাকায় জাপ ঘাঁটিসমূহের উপর যথাপূর্ব আক্রমণ চালায়। জনৈক ভারতীয় সমর-পর্যবেক্ষক গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মদেশ হইতে জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ মায়ু নদীতীরস্থ রথিডংয়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। তিন দিন পূর্বে একদল ভারতীয় সৈনা সুকৌশলে এক আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষের অন্যতম প্রতিরোধ ঘাঁটি 'টেম্পল হিল' দখল করিয়াছে। অতঃপর একদল বৃটিশ সৈন্য অপর এক গুরুত্বপূর্ণ টিলা দখল করিয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সমরবিভাগের যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অদ্য প্রাতে জঙ্গী বিমানের পাহারায় শত্রুর একদল বোমারু বিমান চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফেণী বিমানঘাঁটিতে হানা দেয়। এই সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, অল্পসংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমাণও সামান্য। আমাদের জঙ্গী বিমান শত্রুর বিমানগুলিকে বাধা দেয়। ফলে একখানি শত্রুবিমান বিনষ্ট ও কয়েকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের একখানি বিমান খোয়া গিয়াছে।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোতে এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের দক্ষিণে তিন দিক হইতে সোভিয়েট সৈন্যেরা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ছয়শত জনপদ পুনরধিকার করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রসোশ শহর অন্যতম। তিনদিনে শত্রুর ১৭,০০০ সৈন্য বন্দী এবং ১৫,০০০ সৈন্য নিহত করা হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাদ পরিবেষ্টিত জার্মান সৈনাদের উচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এই স্থানে দুই লক্ষ জার্মান সৈন্য ক্ষয় পাইয়া এখন ৭০ হইতে ৮০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, এক্সিস বাহিনী গতকল্য সমগ্র বুয়েরাত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

গত রাত্রে বৃটিশ বিমানবহর বার্লিনের উপর বহু অতি-বিস্ফোরক ও অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষণ করে।

১৮ই জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সমরবিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয় যে, গতকল্য রাত্রিতে কতিপয় শত্রুবিমান চট্টগ্রাম এলাকায় অল্পক্ষণের জন্য হানা দেয়। সামান্য ক্ষতি হয়, তবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম—গতকল্য বৃটিশ বিমান বাহিনী প্রধানত রথিডংস্থিত জাপ ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হয় যে রুশ সৈন্যগণ মিলেরোভো অধিকার করিয়াছে। ভরোনেজের দক্ষিণে রুশ সৈন্যেরা আলেকজেইভস্কা বেল স্টেশন ও কোরোটোইয়াক ও পোড়গোরনিয়া শহর দখল করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ—কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, অষ্টম আর্মি বুয়েরাত হইতে ৮০ মাইল আগাইয়া গিয়াছে। অষ্টম আর্মি সেদাদা ও বীরতালা দখল করিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাবাউলের নিকট বিমানহানায় আরও পাঁচটি জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত বা গুরুতরভাবে জখম করা হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী

মধ্য প্রদেশ গভর্নরের চীফ সেক্রেটারী ঘোষণা করেন যে, অধ্যাপক ভাঁসালী এবং মধ্য প্রদেশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে অধ্যাপক ভাঁসালী অদ্য অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। চীফ সেক্রেটারী বলেন যে, অধ্যাপক ভাঁসালী সম্পর্কে সর্বপ্রকার সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া ভারত-রক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইতেছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, মধ্যপ্রদেশের চিমুর ও অস্থির ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের দাবী করিয়া অধ্যাপক ভাঁসালী গত ১০ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যু পণ করিয়া অনশন আরম্ভ করেন।

১৩ই জানুয়ারী

কলিকাতায় ক্লাইভ স্ট্রীটে এক বিস্ফোরণের ফলে এক ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিশোরগঞ্জের বনগাইন গ্রামে ডাকাতের গুলীতে একজন নিহত হইয়াছে। মাণিকগঞ্জের সানবাঁধা গ্রামে ডাকাতদিগকে বাধা দিতে গিয়া এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। বর্ধমানের হরিপুর গ্রামে একজন যুবকের আক্রমণে ১৫ জন ডাকাত ঘায়েল হইয়াছে; তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জের লৌহজঙ্গ থানার পিঙ্গরাইল গ্রামে ডাকাতের গুলীতে ২ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী

জোড়হাটের খবরে প্রকাশ, মেলাং হাটখোলা এবং একখানা বাংলো ভস্মীভূত হইয়াছে। সুরচরাই মদের দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বাঙলায় ১৯৪০-৪১ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, ১৯৪৩-৪৪ সালে উহার এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষ হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পাট চাষের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্ধারিত হইয়াছে, গত বৎসর উহার দ্বিগুণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল।

১৫ই জানুয়ারী

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট লাহোর ইলেকট্রিক কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন—বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, কলবাদেবী পোস্ট অফিসে অদ্য বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, ধানসুভার স্ট্রীটে এক পুলিশ বাহিনীর নিকট অদ্য রাত্রে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। কোলাপুরের সংবাদে প্রকাশ, ইচল করণজীতে কারভারী অফিসের সম্মুখে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। রাজারাম কলেজে এক বিস্ফোরণের ফলে দুইজন ছাত্র জখম হইয়াছে। সাঁতারার খবরে প্রকাশ, বহু সংখ্যক সশস্ত্র লোক সেচ বিভাগের সেনোলীস্থিত বাংলো আক্রমণ করে। তাহারা প্রহরীদিগকে কাবু করিয়া উহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়।

সুরাটের খবরে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রে মিঃ রঙিগলদাস খান্দওয়ালা নামক স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

বালুরঘাটের খবরে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী একদল [illegible] জিরণপুর বলদাহার হাট লুঠ করিয়াছে।

শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে অদ্য বাঙালোর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়; তাঁহার মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্টেট কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অনতিবিলম্বে রাজ্যের সীমানার বাহিরে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া তাঁহার উপর এক আদেশ জারী করেন। পরে তিনি ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাকে ভেলোরে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৬ই জানুয়ারী

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, এই সপ্তাহে তিন স্থানে তল্লাসের ফলে সিটি পুলিশ কয়েক পাত্র সালফিউরিক এসিড সমেত প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা তৈয়ারীর অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম হস্তগত করিয়াছে। তল্লাসীর একটি স্থান মালাবার হিলে অবস্থিত এবং তাহাকে একটি ছোটখাটো অস্ত্রাগার বলা চলে; তথা হইতে পুলিশ কতিপয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও অগ্নিপ্রজ্জ্বালক বোমা প্রাপ্ত হয়। এই সম্পর্কে যে ১২।১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন আইনজীবী, একজন দন্তচিকিৎসক ও কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং ছাত্র আছে। গত কয়েক মাসে শহরে যে বোমা বিস্ফোরণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এই স্থানটি তাহার উৎপত্তি-স্থল বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পুনার সংবাদে প্রকাশ, বেলগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি স্কুল, সরকারী অফিস ও পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী

নাসিকের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় কুড়িখানা খাদ্যশস্য ও কাপড়ের দোকান লুঠ হওয়ায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অদ্য সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, দুপুর বেলা হইতেই বহু লোক দাঙ্গা করিতে থাকে এবং খাদ্যশস্য ও কাপড়ের দোকানে হানা দিয়া দোকানের মালপত্র ও টাকা-পয়সা লুঠ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিল। তাহারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ফলে কয়েকজন পুলিশ হতাহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে লুণ্ঠনকারীদিগকে সাবধান না করিয়াই গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কয়েকজন স্ত্রীলোকসমেত প্রায় পঞ্চাশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমেদনগরের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় টেলিফোন অফিস, স্কুল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিস্ফোরণ হইয়াছে। বিস্ফোরণের ফলে দুইজন আহত হইয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী

বোম্বাই গভর্নমেণ্টের সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুযায়ী বাচ্ছরাজ এণ্ড কোম্পানীর উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আদেশে তাঁহাদিগকে জানান হইয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশের শীতলপুর জেলার হিন্দুস্থান সুগার মিলস লিমিটেডের নামে উক্ত কোম্পানীর যে ৭০ হাজার টাকা জমা আছে, উহা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির টাকা বলিয়া অনুমিত হওয়ায় গভর্নমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাচ্ছরাজ কোম্পানী উপরোক্ত সুগার মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট বলিয়া তাঁহাদের উপর এই আদেশ জারী হইয়াছে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রে শহরের একটি সিনেমা হলের বাহিরের দেওয়ালে একটি পটকা নিক্ষিপ্ত হয়; উহা শব্দে বিদীর্ণ হয়, তবে কোন ক্ষতি হয় নাই।
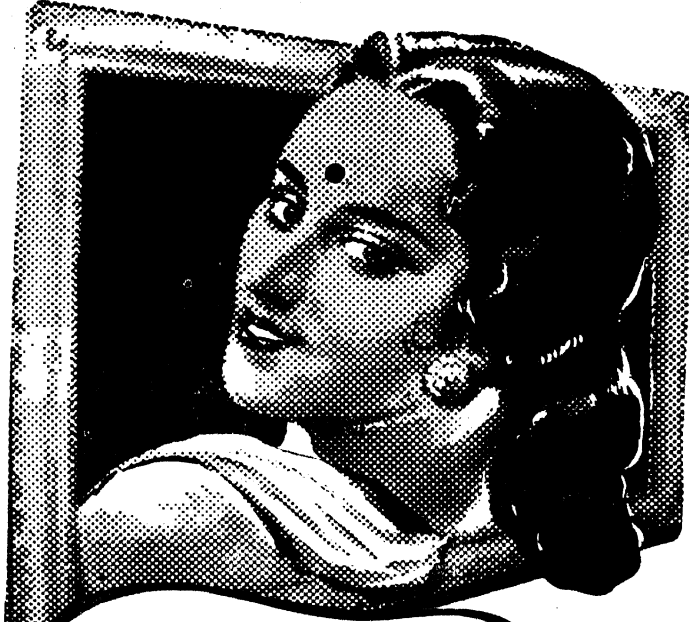
আজকাল আমি বড় শিশি কিনছি

বড় শিশিতে জবাকুসুম শুধু যে খরচ বাঁচায় তা নয় অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই থাকে। আমাদের বাড়িতে জবাকুসুম না হ'লে কারোরই চলেনা। আমি তো বিনা জবাকুসুমে স্নানের কথা ভাবতেই পারি না—আমাব এই ঘন চুল তো জবাকুসুমের জন্যই। আমার স্বামী—একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক রাখবার জন্য তাঁরও নিত্য জবাকুসুম প্রয়োজন। আমার ছোট্ট মেয়ে টুলটুলের অমন কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুল তো জবাকুসুম ব্যবহার করেই হয়েছে।

জবাকুসুম

IK 4

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

১০ বর্ষ] শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৪৯ সাল। Saturday, 30th January, 1943 [১২শ সংখ্যা

আমাদের নিবেদন

কাগজ উত্তরোত্তর দুর্মূল্য হইয়া পড়িতেছে; শুধু দুর্মূল্যই নয়, প্রকৃতপক্ষে অনেকক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছে বলা চলে। কাগজের অভাবজনিত এই সংকটে পড়িয়া আমরা ইতিপূর্বে 'দেশে'র আয়তন পূর্বাপেক্ষা কিছু হ্রাস করিতে এবং মূল্য সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হই; কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য সব দিক হইতে আমরা 'দেশে'র উন্নতিসাধনের জন্যও দৃষ্টি রাখি। এইভাবে 'দেশে'র আয়তনের কিঞ্চিৎ হ্রাস এবং মূল্য বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও 'দেশে'র প্রচার সংখ্যা হ্রাস পায় নাই বরং আশাতীত ভাবে উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, দেশবাসী আমাদের অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং অন্য দিক হইতে তাঁহাদের সেবার জন্য আমরা যেভাবে চেষ্টা করিতেছি, তাহা তাঁহাদের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে আশা এবং আনন্দের কথা অন্য কিছুই নাই। কিন্তু সমস্যার দিন ইহাতেও কাটে নাই; কাগজের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা সমধিক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই অবস্থার চাপে পড়িয়া 'দেশে'র মূল্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আরও কিছু বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। দেশবাসীর সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা সকল দিক হইতে সেই সেবার উপচারের উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিব। প্রতিবন্ধকতা আমাদের পদে পদে, পরাধীন এই দেশের সাংবাদিক জীবনের সে প্রতিবন্ধকতা দেশবাসী সম্যকরূপেই অবগত আছেন। আমরা আশা করি, বর্তমানে আমরা তাঁহাদের যেরূপ সহানুভূতি লাভ করিতেছি, তাহা ভবিষ্যতের সংকট সমস্যাময় অন্ধকার পথেও আমাদের পক্ষে আলোকবর্তিকাস্বরূপ রহিবে।

স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাঁহারা পুরোভাগে ছিলেন; আজ তাঁহারা অনেকেই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ। মানুষকে অবরুদ্ধ করা যায়, কিন্তু মানবের মহাপ্রাণতার যে ভাব বা আদর্শ তাহাকে অবরুদ্ধ করা সম্ভব নহে; প্রতিকূলতায় তাহা পিষ্ট হয় না বরং পরিব্যাপ্তিই লাভ করিয়া থাকে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারলাভের অগ্নিময় প্রেরণা যে জাতির ভিতর একবার জ্বলে, পীড়নে এবং পেষণে তাহা নির্বাপিত হয় না, বরং সমধিক উদ্দীপিত হইয়াই উঠে, এক্ষেত্রে প্রতিকূল সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; পক্ষান্তরে প্রতিকূলতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা মানবধর্মের স্বাভাবিক বিকাশে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা চাহে। ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমিত করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না, এইরূপ মনোভাব লইয়া ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতাদিগকে যদি অবরুদ্ধ করা হইয়া থাকে, তবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

কারণ, ভারতের স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষা, আজ আর ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, ইহার পশ্চাতে সমগ্র ভারতের জনগণের সমর্থন রহিয়াছে এবং ৪০ কোটি লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার মত শক্তি কোন জাতিরই নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং তাঁহাদের বর্তমান কর্ণধার চার্চিল পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডল এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বাঁধাবুলি আওড়াইবেন। তাঁহারা বলিবেন, না ভারতবাসীদের স্বাধীনতার তো আমরা বিরোধী নহি ; আমরা ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াই রহিয়াছি ; কিন্তু কংগ্রেসকর্মীরা যে পথে স্বাধীনতা চাহিতেছে, ভারতের স্বাধীনতার পথ—সে পথ নয়। ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে এমন তর্কের উত্তর এই যে, পথ লইয়া কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই ; সে সব তত্ত্বকথা আমরা শুনিতেও চাহি না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এতটাই গরজ হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা এখনই সে জিনিসটা দিয়া দিউন না; তারপর ভারতবাসীদের নিজেদের ভিতরকার ভেদ-বিভেদের ব্যাপার তাহারাই বুঝিয়া লইবে। কিন্তু কূটকৌশলী ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিবার জন্য ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভারতবাসীদের ভেদ-বিভেদের কৃত্রিম বাধার কথার বাচালতা জাহির করিতেছেন এবং সেই পথে নির্লজ্জ রকমে সত্যের অপলাপ করিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে জগতের লোককে ধাপ্পা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের এই ধাপ্পাবাজীর খেলা মার্কিনমুলুকে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধিবাসীরাই নির্বাহ করিতেছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রচারকেরা উৎসাহে কোমর বাঁধিয়াছেন। আমেরিকার কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া ক্রীপস্ সাহেব বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতের কয়েক লক্ষ সরকারী কর্মচারীর মধ্যে ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা অতি নগণ্য। 'ভারত সম্বন্ধে ৫০টি তথ্য' এই নাম দিয়া আমেরিকায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচার-বিভাগ হইতে একখানা পুস্তিকা প্রচার করা হইতেছে, ইহাতেও কৌশলে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভারতে এখন ভারতবাসীদের কর্তৃত্ব চলিতেছে। আমেরিকার লোকেরা এই ধাপ্পাবাজীতে ভুলিবে কিনা আমরা জানি না; ভুলিলেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দিক হইতে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে, ইহা মনে করা ভুল। এইরূপ প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য দেশের লোকের সহানুভূতি লাভে ভারতবাসীদিগকে তাঁহারা বঞ্চিত করিতে পারেন ; শুধু তাহাই নহে ; সেক্ষেত্রে নিজেদের নীতি চালাইবার পক্ষে পরিপোষকতা লাভ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নয় ; কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি ভারতবাসীদের মধ্যেই জাগিয়াছে ; সেই শক্তির প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে গেলে ব্রিটিশের বৃহত্তর স্বার্থহানির সম্ভাবনাই রহিয়াছে। তাঁহারা যত সত্বর ইহা উপলব্ধি করেন ততই মঙ্গল। তাঁহারা ইহা জানিয়া রাখুন, মানুষকে অবরুদ্ধ করিয়া ভাব বা আদর্শকে নষ্ট করা যায় না। কারণ, ভাব ও আদর্শই মানুষ গড়ে। কংগ্রেস-নেতৃবর্গ আজ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে হ অপসৃত হন, এমন কি তাঁহাদের এই অপসৃতি যদি সুদী কালের জন্য, এমন কি তাঁহাদের জীবদ্দশা পর্যন্তও চলে ; ত তাঁহাদের অভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শিথিল হইবে ন ভাব ও আদর্শের অনুপ্রেরণা তাহাদের স্থানে নূতন মানুষ গড়ি তুলিবে। ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা ভারতের স্বাধীন বিরোধীদের কঠোর হস্ত প্রয়োগে অবনমিত হইবার নহে।

দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধা

খাদ্যসমস্যা ছাড়া, অন্যান্য সমস্যাও দৈনন্দিন জীবনে ক জুটে নাই। ইহার মধ্যে ভাঙ্গানীর সমস্যা একটি প্রধা গভর্নমেণ্ট নূতন রকমের পয়সার প্রচলন করিতেছেন, এ সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি; কিন্তু কিছু দিন পূর্বে য তাঁহারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, কিংবা করিতেছেন এ কথাও নির্দিষ্ট রকমে ঘোষণা করিতেন, তবে দেশের লোক ভাঙ্গানী সমস্যার জন্য এই দুর্ভোগ পোহাইতে হইত না। যা হউক, এখনও যদি এই দিককার ঝঞ্ঝাট কাটে, তবে সু বিষয়। শহরের কয়লার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করি ছিল ; মাল গাড়ির ব্যবস্থা করাতে সে সমস্যা অনেকটা হ্র পাইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। শহরে কয়লা আমদা হইয়াছে, কিন্তু গরীবের সমস্যা এখনও কাটে নাই। সরক দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, প্রতিমণ এক টাকা ছয় আনা এবং সে সঙ্গে বেশী দরে বিক্রয় করিলে পুলিসের ভয়ও দেখাইয়াছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই গাড়ি ভাড়া পোষায় না বলিয়া ব্যবসায়ী অবলীলাক্রমে সরকারী আদেশের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদশ করিতেছে। আমদানী আরও একটু বাড়িলে এবং সে সঙ্গে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে এমন ফাট বাজী চলিবে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, কর্তৃপক্ষ যদি এ অবহিত হন, তাহা হইলে আমাদের অধিকাংশ সমস্যার এখন সমাধান হইতে পারে। বর্তমানে কলিকাতার জন্য কয়ে খানা কয়লার গাড়ির ব্যবস্থা করাতে সরকারের অ দিকে কর্মব্যবস্থার যে বিশেষ কিছু বিপর্যয় ঘটিয়া ইহাও নয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি, কলিকা কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য গাড়ি যখন জুটিতেছিল না; সে সময় ঝরিয়া হইতে দিল্লীতে কয়লা সরবরাহের জন্য মাল গাড়ি ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষ নিজদিগকে বিব্রত বোধ করেন নাই কলিকাতার সমস্যা দিল্লীর সমস্যার অপেক্ষা কম কিছু নয় ব সামরিক পরিস্থিতির দিক হইতে কলিকাতার সমস্যারই সমধি গুরুত্ব রহিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলের উপর জাপানীদের বিমা আক্রমণ মাঝে মাঝে চলিতেছে, এক্ষেত্রে এই শহরের অধিবাসীদে মনোবল অক্ষুণ্ন রাখিবার দিকে দৃষ্টি রাখাই অধিক প্রয়োজ আমরা আশা করি, তাঁহারা এ গুরুত্বের কথা বিস্মৃত হইবেন ন

স্বাগত

তুরস্কের সাংবাদিক প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে, তাঁহারা দিল্লী, পেশোয়ার প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতা শহরেও কয়েক দিনের মধ্যে পদার্পণ করিবেন। কলিকাতার সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিবার আয়োজন হইয়াছে। সেদিন দিল্লীর সাংবাদিকদের প্রীতি-সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের মুখপাত্রস্বরূপে মসিয়ে আতে প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের সৌহার্দের সম্পর্ক নূতন নহে। একথা সম্পূর্ণ সত্য; কামালের নেতৃত্বে নব্যতুর্কী-দল জাতীয় জীবন গঠনের সাধনার ত্যাগময় পথে যেদিন আত্ম-নিয়োগে প্রবৃত্ত হয়, সেই দিন হইতে স্বাধীনতাকামী ভারতের সঙ্গে তুরস্কের আত্মীয়তার সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠে। ভারতের স্বাধীনতার সাধকগণ কামালকে তাঁহাদের আদর্শ নেতাস্বরূপেই গ্রহণ করেন। তুরস্কের সাংবাদিকগণ ভারত গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে এ দেশে আসিয়াছেন; এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসন-নীতির সঙ্গে যেসব প্রশ্ন জড়িত, আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সেসব প্রশ্ন তাঁহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে হইতেছে, ইহা বুঝা যায়। তবু তাঁহাদের এই ভারত-ভ্রমণে আমাদের বড় একটা লাভ আছে। ইহার ফলে স্বাধীন এবং পরাধীনের মধ্যে প্রভেদ কত, ভারতবর্ষ তাহা বুঝিবে। ধর্মের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহারা আজও মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জাতীয় ঐক্যের প্রতি-কূলতা করিবার জন্য ফন্দী আঁটিতেছে, তাহারা কয়েকটা স্পষ্ট কথা শুনিবে এবং তাহাদের স্বরূপ জগতের স্বাধীন ইসলাম রাষ্ট্রের মুখপাত্রদের কথায় উন্মুক্ত হইবে। ইতিমধ্যেই এই কাজটা হইয়াছে। দিল্লীর মুসলিম লীগ ইঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে গিয়া পাকিস্থানের প্রশ্ন তুলিয়া মুখের মত জবাব পাইয়াছেন। প্রতিনিধি দল অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের কর্মনীতির মধ্যে যাহা ভারতের ঐক্যমূলক এবং প্রগতির অনুকূলে তাঁহারা তাহারই সমর্থন করেন। তাঁহারা সঙ্কীর্ণতামূলক কুসংস্কারকে বর্জন করিয়া নূতনের জন্যই আগ্রহশীল। স্বাধীনতার উপাসক এবং নব জাতীয়তার পথে মানব-মহিমার প্রতিষ্ঠাতা কামালের দেশের এই সাংবাদিক দলকে আমরা আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

খাদ্যসমস্যা ও গভর্নমেণ্ট

ভারতের খাদ্যসমস্যার প্রশ্ন বিলাত পর্যন্ত পেঁছিয়াছে। "নিউ স্টেটসম্যান ও নেশন" পত্র এই সম্পর্কে সম্প্রতি একটি কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে বর্তমানে কংগ্রেসের চেয়ে একটি সমধিক পরাক্রমশালী শত্রুর সম্মুখে পড়িয়াছেন, এই শত্রু হইল দুর্ভিক্ষ। উক্ত পত্র বলেন, 'গত ছয় মাস ধরিয়া ভারতের খাদ্যসংকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু সেদিন পর্যন্তও ভারতের আমলাতন্ত্র ইহার প্রতিকারের জন্য কিছুই করেন নাই। বর্তমানে তাঁহারা এই কৈফিয়ৎ দিতেছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই; কারণ বিষয়টি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের হাতে। এই যুক্তি একেবারেই বাজে।' "নিউ স্টেটসম্যান" যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা আমরাও স্বীকার করি। একথা সত্য যে, সমস্যাটি প্রাদেশিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মূলে কোন যুক্তিই নাই: কারণ সকলেই ইহা বুঝেন যে, প্রাদেশিক এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যাপক-ভাবে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রদেশে তাহা যথোপযুক্ত ভাবে বণ্টন এবং তদুপযোগী যানের ব্যবস্থার উপর। ভারত গভর্ন-মেণ্ট এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যত চেষ্টা করিয়াছেন, সকলই ফাঁকার উপর; তাঁহারা এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ধরাবাঁধা নীতি অবলম্বন করিয়া আন্তরিকতার সঙ্গে কার্যকর উদ্যমে অবতীর্ণ হন নাই। আমাদের বাঙলা দেশে এই সমস্যা কিরূপে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও যে তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, আমাদের ইহা মনে হয় না। শুনিতেছি, ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মহোদয় এই সমস্যায় দেশবাসীর প্রতি অনুরাগের বশে ভোজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে গরীবের বিশেষ কোন সান্ত্বনা নাই। আটার মূল্য কলিকাতা শহরে এখন এক টাকারও উপরে দাঁড়াইয়াছে। শহরে গম মিলিতেছে না। বাঙলা সরকার নিজেরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন ব্যবস্থাই অন্তত গরীবের অন্ন-সমস্যা সমাধানে কোন কাজে আসিতেছে না; ঐসব ব্যবস্থা অবশ্য কাহার কোন কোন পথে কাজে আসিতে পারে, আমরা ইহা অস্বীকার করিব না। সম্প্রতি বাঙলা সরকার এ সম্বন্ধে একটি ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়া-ছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্থানীয় ব্যবস্থার ফল যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সত্য কথা বলিতে গেলে ব্যাপক ব্যবস্থার কথা শুনিয়া আমাদের ভরসা তো বাড়েই না বরং ভয়ই বৃদ্ধি পায়। সরকারের প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা কাগজপত্রে দেখিতে মন্দ নয়; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহার সাফল্য নির্ভর করে এতৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সততা, যোগ্যতা এবং আন্তরিকতার উপর; নহিলে এই ব্যাপক পরিকল্পনায় হিতের অপেক্ষা অহিত ঘটিবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাঙলার যেসব জেলায় চাউল উদ্বৃত্ত আছে, বাঙলা সরকার সেই সব জেলা হইতে চাউল ক্রয় করিয়া অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টনের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন। লাভখোরদের গোপন ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্যই তাঁহাদের এই উদ্যম; কিন্তু স্থানীয় ভাবে তাঁহাদের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি কোন সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই; ইহা চোখের উপর দিনরাতই দেখিতেছি। তেলের মূল্য, চিনির মূল্য তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন; কিন্তু ব্যবসায়ক্ষেত্রে সে মূল্যকে কয়জনে মূল্য দিতেছে? এবং সেই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে জিনিস বিক্রয় করিবার জন্য কয়জনে দণ্ড পায়? গভর্ন-মেণ্টের অবলম্বিত নীতির মর্যাদা যাহাতে এমন লঘুভাবে লঙ্ঘন করা সম্ভব না হইতে পারে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা প্রথম প্রয়োজন। আমাদিগকে এই কথাটা আজ স্পষ্টভাবে বলিতে

হইতেছে যে, যাহাদের উপর তাঁহারা তাহাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ভার দিবেন, তাঁহারা সকলেই সিজারের পত্নীর ন্যায় সততার প্রশ্ন সম্পর্কে সমালোচনার অতীত, এমন ধারণা যেন সরকারের মনে না থাকে। বাঙলা সরকার এইসব ঝানু ধড়িবাজের উপর বেশী দৃষ্টি রাখুন। আমরা দেখিতেছি, গরীব ছোট ছোট দোকানদার বা ব্যবসায়ীদের চেয়ে ইহাদের অপকৌশলের জন্যই সরকারের জনস্বার্থমূলক নীতির সফলতার পথে সমধিক বিঘ্ন ঘটিতেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন

আমেরিকাবাসীদিগকে ভারত-শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতির মহিমা উপলব্ধি করাইবার মহদুদ্দেশ্য লইয়া 'ভারত সম্বন্ধে পঞ্চাশটি তথ্য শীর্ষক যে পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে, আমরা সম্প্রতি তাহার অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এই পঞ্চাশটি তথ্যের মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন, ইহার মধ্যে সত্য কতখানি আছে এবং তাঁহাদের এমন প্রচারের অন্তর্নিহিত মূলনীতিরও পরিচয় পাইবেন--

(১) "কংগ্রেস একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের নাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ন্যায় ইহা কোন আইনসভার নাম নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহত্তম এবং সুপরিচালিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহার সদস্য-সংখ্যা ১৯৪১ সালে হ্রাস পাইয়া মাত্র ১,৫০০,০০০তে, অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রতি ২৫৯ জনে একজন হিসাবে দাঁড়াইয়াছে। ১৮৮৫ সালে প্রধানত বড়লাট লর্ড ডাফরিণের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।"

(২) "বড়লাট শাসন সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে তাঁহার শাসন-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যগণের মত মানিয়া চলিতে বাধ্য। যদিও কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে শাসন-পরিষদের সদস্যগণের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে, তথাপি ১৮৭৯ সালের পর সেই অধিকার একবারও প্রযুক্ত হয় নাই। নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারেও এমনকি, পররাষ্ট্র ব্যাপার সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহও ক্রমেই উত্তরোত্তর অধিকরূপে শাসন পরিষদের সদস্যদের পরামর্শের জন্য উপস্থিত করা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তারের এবং তাঁহার আন্দোলন দমন করিবার বিষয়টির কথা বলা যাইতে পারে। এই প্রশ্নটির সিদ্ধান্তও শাসন-পরিষদের দ্বারা হয়; পরিষদের উক্ত অধিবেশনে বড়লাট ছাড়া একজন মাত্র ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন, অপর এগারজন ছিলেন ভারতীয়।"

পাঠকগণও কৌশলটি বুঝিতে পারিবেন। কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা যে কমিয়াছে এবং লোক-সংখ্যার অনুপাতে কংগ্রেসের প্রভাব যে সামান্য, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, বড়লাটের হাতে ন্যস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা, শুধু একটা কথায় মাত্র আছে; কাজ চালাইতেছেন শাসন-পরিষদের সদস্যেরাই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম চালাইবার ধর্ম যাঁহাদের, তাঁহাদিগকে লইয়াই যেখানে শাসন-পরিষদের গঠন, সেখানে পরিষদের সদস্যদের স্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্যই যে থাকে না, কৌশলে এই সত্যটি চাপা দেওয়া হইয়াছে অথচ শাসন-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কেহ যে স্বীকারই করেন যে, নিজেদের মত-স্বাতন্ত্র্য লইয়া তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নহে—শাসন-পরিষদের এমনই গঠন বিশেষত, তাঁহাদের কাছে যে বিষয় উত্থাপন করা হয়, তাঁহারা শুধু তৎসম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত দান করিতে পারেন, নিজেদের কো বিষয় উত্থাপন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দাবী করিবার কোন অধিকার বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যদের নাই। তাঁহারা চাকুরিয়া মাত্র। এমন লোকেরা মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত এবং তৎসম্পর্কিত নীতি ভারতবাসীর সমর্থন করে এইরূপ বুঝাইবার অপকৌশলের মধ্যে সত্যের যে নির্লজ্জ অপলাপ রহিয়াছে, মার্কিন জনসাধারণের কাছে তাহা চাপা থাকিবে না বলিয়াই আশা করা যায়; কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির সম্বন্ধে তাহাদের অতীতের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।
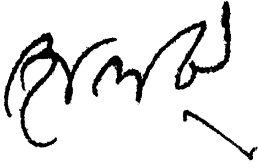
অযোগ্যতা ও যোগ্যতা

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ পাওয়েল প্রাইস শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন। অতঃপর কাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে, ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে স্বাভাবিক নিয়মে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের প্রবীণতম কর্মচারী হিসাবে ডক্টর নীলরতন ধরেরই এই পদ পাইবার কথা ডাক্তার ধরের যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের পক্ষে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তিনি বৈজ্ঞানিকরূপে শুধু ভারতে কেন, ভারতের বাহিরেও সুপরিচিত। শিক্ষাব্রতীস্বরূপেও তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এইরূপে একজন অভিজ্ঞ এবং সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাব্রতীকে ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত না করিয়া এই পদে একজন ব্রহ্মপ্রত্যাগত ইউরোপীয়ান নিযুক্ত করা হইবে, এই কথা আমরা শুনিতেছি। ব্রহ্মপ্রত্যাগত ইউরোপীয়ানদের পোষণের ভার ভারত গভর্নমেণ্টের উপর আসিয়া চাপিয়াছে এবং তাঁহারা সেই কর্তব্য প্রতিপালনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা আমরা জানি; আমরা ইহাও জানি যে, ইউরোপীয় পোষণের এই ব্যগ্রতায় তাঁহাদের কাছে ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবীও অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হইতেছে; কিন্তু স্যার নীলরতন ধরের ন্যায় একজন খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিৎ যেখানে রহিয়াছেন, সেখানে বাহির হইতে ভারতের শিক্ষাব্যাপার সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ একজন নূতন লোক নিয়োগের কথা যে উঠিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। যুক্তপ্রদেশে কর্তাদের যে কোন প্রকারে ইউরোপীয় পোষণই যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে শিক্ষা-বিভাগের উপর অন্তত সে ভার তাঁহারা চাপাইবেন না, সেজন্য অন্য জায়গা দেখুন। আমরা আপাততঃ শুধু এইটুকুই বলিয়া রাখিলাম।

অপ্রকাশিত

[শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত]

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

কাজের চাপে অবকাশ পিষে গিয়েছিল দেহমনের শক্তি সুদ্ধ। একটু সময় পেয়েছি। আগামী ১লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসব সমাপন করে কলকাতায় যাব। সেখানে বিশ্বভারতী সম্মেলন বলে একটা বৈঠক বসবার কথা, পাইকপাড়া রাজবাড়িতে, ৩রা তারিখে। তার পরদিন যাব পুরীতে। সেখানে যদি তোমারও যাওয়া স্থির হয়ে থাকে, তাহলে দেখা হতে পারবে—খুশি হব—আমাদের জায়গা দেওয়া হবে সার্কিট হৌসে। আরোগ্য কামনা করি। ইতি—১১।৪।৩৯।

তোমার দাদু

ওঁ

Mungpoo,
Darjeeling.

কল্যাণীয়াসু,

পুরীতে বেশ ছিলেম ভাল, আরামে কেটেছিল। রণজিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার শরীর বোধ হয় ভালো ছিল না—তুমি আসতে পার নি। তারপরে এসেছি মংপু পাহাড়ে। জানিনে কেন এখানে শরীর ভালো চলচে না—চুপচাপ পড়ে আছি। আসলে শরীরটার কল খারাপ হয়ে গেছে—এর সম্বন্ধে নালিশ করা মিথ্যে—একে সম্পূর্ণ ছুটি দিয়ে চুপ করে থাকলেই আরো কিছুদিন কাটবে। ইতি—২৯।৫।৩৯।

দাদু

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

পারুল, প্রত্যক্ষ তোমার সঙ্গে দেখা হোলো না, কিন্তু তোমার সুরচিত অর্ঘ্য তোমার সমাদর বহন করে আমার পায়ের কাছে এসে পৌঁচেছে, আনন্দিত হয়েছি। কিছুকাল পাহাড়ে কাটিয়ে এসেছি—অসহ্য বৈশাখী অত্যাচারের আক্রমণ থেকে গিরিরাজ আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হবে—কিন্তু আমি সমভূতলের মানুষ, মুক্ত আকাশের অবারিত দাক্ষিণ্যে লালিত—উদ্ধত পাহাড়গুলোর পাহারার মধ্যে নজরবন্দী হয়ে থাকতে ভালো লাগে না। এবার সেখানে শরীরও যথোচিত ভালো ছিল না।

বাঙলা দেশ অনেকদিন তৃষিত ছিল, এবার তার শ্যামল উৎসব বেদীতে বর্ষা উৎসবের আয়োজন সমারোহের সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে। নবধারা জলের সঙ্গে আমারও নবগান বর্ষণের ধারা প্রতি বৎসরই মুক্ত হয়ে এসেছে—এবারে কী হ জানিনে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বের উৎস ভিতরে ভিতরে বোধ হয় শুকিয়ে আসচে। চোখেরও দৃষ্টিশ ম্লান হয়ে এসেছে—সেই অভাবটাই মনকে সব চেয়ে পীড়িত করে। আমার দেহে তো যথাসময়ে জীর্ণতার দিন এসেছে- কিন্তু তোমার নবীন বয়সে কেন ভাঙনের পালা এলো—ভিতর থেকে আরোগ্যের শক্তি জেগে উঠে জয়যুক্ত হবে এই আশীর্বা করি। ইতি ২৪।৬।৩৯

দাদু

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় টিঁকতে পারি নে, গিয়েই পালিয়ে এসেছি, তাই আমার দেখা পাবার সুযোগ ঘটে নি। আমার শরীরটা এ পৃথিবীতে পলাতকাভাবেই আছে।

শরৎকালের ভাপসা গরম তাড়া লাগিয়েছে। অবসাদগ্রস্ত হয়েছে দেহ, কাজ করতে মন যায় না। তবু চিরকালের অভ্যা কিনা—কলম এখনো চলছে—তেমন উৎসাহ নেই, তবু কাজ চলে যাচ্চে। আগে ছিল ছুটির একটা জায়গা, শিলাইদ পদ্মার ধারে—সেটা এখন পরহস্তগত, বিশ্রামের একটা ভালোরকম নীড় জুটচে না।

হয়তো সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে হিমালয়ে যাত্রা করব। পথের মধ্যে কলকাতায় দু-চার দিন কাটাতে হবে—চোখে চিকিৎসা দরকার। তখন হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারবে। কিন্তু রুগ্ন শরীরকে ক্লিষ্ট করে দেখতে আসা সেটা ইচ্ছা করিনে। ইতি—২৬।৮।৩৯।

দাদু

ওঁ

"Uttarayan,"
Santiniketan, Bengal
১২।৫।৪১

কল্যাণীয়াসু,

তোমার কোলের শিশুকে তুমি পেয়েই হারিয়েছ, তোমার এই নিষ্ঠুর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার বাণী কোথাও নাই। প দুঃখের প্রতিকার অন্তরের মধ্যে আপনার সান্ত্বনা আপনি সৃষ্টি করতে পারে, এ ছাড়া মানবাত্মার অন্য কোনো আশ্বাস না আমি কিছুকাল থেকে জরার অন্তিম সীমায় অবরুদ্ধ হয়ে আছি—সংসারের ছোট বড়ো সকল কর্তব্য আজ আমার আয়ত্তে অতীত। চক্ষু আমার আদেশ গ্রহণ করে না, কর্ণ আমার বার্তা বহন করে না। এইরূপে তার ইন্দ্রিয় পারিষদ কর্তৃক প্র পরিত্যক্ত হয়েই আমার মন নিঃসহায়, আপন কর্ম কোনোমতে চালনা করে। তোমাদের কথা প্রায় মনে আসে। কিন্তু অ তোমাদের সঙ্গে স্নেহের আদানপ্রদান অসম্ভব হয়ে উঠেছে—এই আমার পরম দুঃখ, তৎসত্ত্বেও তোমরা যে এই অকর্মণ্য এখনো স্মরণ করো, এই আমার গৌরবের বিষয়। যদি কখনো সাক্ষাৎ পাই, তবে সম্বন্ধসূত্রগুলিকে আর একবার দৃঢ় ক নিতে পারব। রোগশয্যায় আমার যে দু-একখানি বই লিখতে পেরেছি, সে তোমাকে পাঠালুম।

আমার অন্তরের আশীর্বাদ জানবে। ইতি—১২।৫।৪১।

শুভাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

সমাপ্ত

ইঁদুর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বড় রাস্তার ঠাসা বড় বড় বাড়িগুলির মধ্যে সরু চারতলা বাড়িটি কফির এবং ছাতার ফ্যাক্টরীর ঠিক মাঝখানে। বাড়ির সিঁড়িগুলি পুরানো, কেউ উঠলে শব্দ হয়। সেই সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে গেলে শুকনো আপেল আর ইঁদুরের গন্ধভরা একটি ছোট ঘর পাওয়া যায়। সেখানে মাঝবয়সী একটি লোক। রুশ উপন্যাস অনেকক্ষণ ধরে পড়তে পড়তে এক সময় তার মনে হোলো সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে! অনেক রাত হয়ে গেছে; রাত্রি যেমন হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা তেমনি অন্ধকার; পথে তখন লোক চলাচল বন্ধ, কিছুই চেনা যায় না। বই বন্ধ করে সে স্থির হয়ে জ্বলন্ত আগুনের সামনে বসে রইলো। সে আগুনে কোনো শিখা ছিলো না। লোকটি খুব ক্লান্তি বোধ করলো, অথচ বিশ্রাম করতে পারলো না। দেয়ালের একটি ছবির দিকে অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইলো। চাইতে চাইতে তার কান্না পেলো। ছবিটি স্তন্যপানরত একটি শিশুর, সে তার মায়ের স্তনদুটিকে আদর করছে আর তার মা কালো ফ্রেমে বাঁধানো একটি আয়নার সামনে বসে রয়েছে। ছবিটি উটামারোর ছবির একটি রঙীন প্রতিলিপি। অদ্ভুত এ্যানাটমি সত্ত্বেও ছবিটি খুব সুন্দর। ফাঁকা দৃষ্টিতে লোকটি চেয়ে রইলো, কিন্তু মন তার ফাঁকা নয়। শেষে এক সময়ে গ্যাসের আলোর দীর্ঘনিঃশ্বেস তাকে প্রায় পাগল করে তুললো। আলোটা নিভিয়ে আগুনের সামনে অন্ধকারে বসে নিজের বিচলিত মনকে স্থির করতে সে চেষ্টা করলো। লোকটি নিজের সঙ্গে ঠিক যখন কথা কইতে যাবে এমন সময় একটি ইঁদুর ফায়ারপ্লেসের কাছের গর্ত থেকে খস-খস শব্দ করে বেরিয়ে এলো। এই ধরণের চতুর রাত্রিচর জীবের প্রতি লোকটির আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিলো, কিন্তু ইঁদুরটি এতো ছোটো আর এতো সুন্দর যে সন্তর্পণে পা-দুটো সরিয়ে এনে সে দেখতে লাগলো। ইঁদুরটি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আগুনের সামনে এলো তারপর পরিপাটি করে উত্তাপে স্নান করতে করতে সামনের দুটি পা দিয়ে নিজের মুখ, কান আর ছোট্ট পেট ঘষতে লাগলো। অকস্মাৎ শব্দ করে আগুনটা নেমে গেল, জ্বলন্ত একটা কাঠ গেল পড়ে, আর বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র গতিতে ইঁদুরটি গর্তে ঢুকে গেল।

লোকটি ম্যাণ্টেলপিসের কাছে গিয়ে ছোটো একটি আলো জ্বালালো তারপর ফায়ারপ্লেসের পাশের খাবার আলমারিটি খুললো। তার একটি তাকে ছিলো পনীরের টোপ দেয়া ছোটো একটি ফাঁদ। ফাঁদটি তার দিয়ে এমনভাবে তৈরি যাতে ইঁদুরের পিঠ ভেঙে দিতে পারে।

ফিস ফিস করে সে বললো, "খাবার লোভ দেখিয়ে একটি জন্তুকে হত্যা করা কি ভীষণ নীচতা!"

খালি ফাঁদটি যেন আগুনে ফেলে দেবার জন্যেই সে তুলে নিলো, তারপর নিজের মনেই বললো, "এটাকে রাখাই বোধ হয় ভালো; এখানে ইঁদুর তো কিলবিল করছে।" লোকটি তবু ইতস্তত করতে লাগলো আর বললো, "আশা করি ওই ছোট্ট জন্তুটি এখানে কোন রকম বোকামি করতে আসবে না।" ফাঁদটিকে সাবধানে খাবারের আলমারির মধ্যে রেখে সে দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর আলো নিভিয়ে আবার এসে বসলো।

এই সব বিষয়ে তার মতো বোকা কি কেউ কখনো দেখেছে! এমন কি মা-ও তার এই সব ছেলেমানুষী ভয় দেখে হাসতেন। তার মনে পড়লো তার বোন ইয়োসিন জন্মাবার কিছু-দিনের মধ্যেই রাত্রের ভোজের জন্যে কতকগুলো মৃত লার্ক পাখীকে পায়ের দিকে একসঙ্গে বেঁধে এক প্রতিবেশী তাকে বাড়ি পাঠিয়েছিলো। মৃত পাখীগুলো দেখে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিলো। কাঁদতে কাঁদতে এক দৌড়ে সে বাড়ির রান্নাঘরে হাজির হয়েছিলো আর সেইখানেই সেই অদ্ভুত দৃশ্য সে দেখেছিলো। তখন গোধূলি। মা আগুনের সামনে নতজানু হয়ে বসে। পাখীগুলোকে সে কোল দিলো।

মৃদুস্বরে সে ডাকলো, "মা!"

তার কান্নাভরা মুখের দিকে মা চাইলেন।

"কী হয়েছে ফিলিপ?" মা জিগ্‌গেস করলেন, তারপর তার বিস্ময় দেখে হেসে ফেললেন।

"মা! কী করছো তুমি?

তাঁর বডিসটি খোলা, নিজের স্তন দুটি তিনি টিপ-ছিলেন। আর সরু দীর্ঘ দুধের স্রোত আগুনে শব্দ করে পড়-ছিলো।

মা হেসে বললেন, "তোমার বোনটিকে বুকের দুধ খাওয়া ছাড়তে শেখাচ্ছি।" তার বিস্মিত মুখটিকে তিনি নিজের উষ্ণ কোমল বুকের ওপর এনে চেপে ধরলেন আর পেছনের মৃত পাখীগুলির কথা সে ভুলে গেল।

সে বললে, "মা, আমি ও-রকম করবো," আর সে-রকম করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো তার মায়ের বুকের স্পন্দন। এই অভিজ্ঞতা তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর।

"কেন এ রকম হয় মা?"

"এ রকম না হলে খোকোন আমি মারা যাবো আর ভগবান তাঁর কাছে আমাকে ফিরিয়ে নেবেন।"

"ভগবান?"

তিনি মাথা হেলিয়ে বললেন, হ্যাঁ। নিজের বুকে সে হাত রাখলো। আর চেঁচিয়ে উঠলো, "দেখো মা, দেখো!" জামার বোতাম খুলে তার মা নিজের উষ্ণ হাত তার বুকের ওপর আস্তে আস্তে রেখে ধুক-ধুক শব্দ শুনলেন।

"ভারি সুন্দর! তিনি বললেন।

"এটা কি ভালো শব্দ, মা?"

তার হাসিভরা ঠোঁটে মা চুম্বন করে বললেন, "যদি ঠিক-

ভাবে শব্দ হয় তা' হলেই ভালো। চিরকালই যেন ঠিকভাবে বাজে, ফিলিপ, চিরকালই যেন ঠিকভাবে বাজে।"

তাঁর স্বরে দীর্ঘনিশ্বাসের প্রতিধ্বনি সে পেয়েছিলো; আর বুঝেছিলো কি যেন দুঃখের সুর এতে আছে। সে বুঝতে পেরেছিলো কারণ সে ছিলো খুব বুদ্ধিমান। মা'র স্তনে চুম্বন করে খুশি হয়ে সে বলতে লাগলো, "মা-মণি, আমার ছোট্ট মা!" সেই আনন্দের মাঝে মৃত পাখীর বিভীষিকা সে ভুলে গেল। এমন কি পাখীগুলোর পালক ছাড়াতে পর্যন্ত তার মা'কে সে সাহায্য করলো।

পরের দিন ঘটলো সেই দারুণ দুর্ঘটনা। একটা বিরাট ঘোড়া গলির মধ্যে তার মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলো এবং তাঁর দু'টো হাত ভেঙে তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিলো ভারি একটা গাড়ি। যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে সার্জেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সার্জেন হাত দুটো কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। মার মৃত্যু হয় রাত্রে। এর পর বহু বছর ধরে সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে দুটি কাটা হাতের শেষ-হীন রক্ত ক্ষরণের। যদিও সত্যিই সে রকম কিছু সে দেখতে পায়নি। কারণ মার যখন মৃত্যু হয় সে তখন ঘুমুচ্ছিলো।

এই পুরোনো দুঃখ যখন তার কাছে আবার নতুন হয়ে উঠলো এমন সময় আবার সে ইঁদুরটিকে দেখতে পেলো। ইঁদুরটা সত্যিই ভারি মজার। নানা ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো মুখটা চুলকাচ্ছে, কখনো কান দুটো নাড়াচ্ছে। কখনো সে বেড়ালের মতো উবু হয়ে বসছে, কখনো আগুন পোয়াতে পোয়াতে মিটমিট করে চাইছে, কখনো যেন নাচছে আর গড়িয়ে পড়ছে আর থাবা দিয়ে মুখটা মুছে নিচ্ছে। শেষে সে স্থির হয়ে বিশ্রাম করতে বসলো, মুখে তার দার্শনিকের গাম্ভীর্য। তারপর আবার শব্দ করে আগুনটা পড়ে গেল আর ইঁদুরটাও গেল পালিয়ে।

লোকটি স্থির হয়ে বসে রইলো। অকারণেই মন তার খারাপ হয়ে গেল।

ইঁদুরটা আবার যখন খাবারের আলমারিতে খুট-খুট করে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তার ক্যাসিয়ার কথা মনে পড়লো। তার জীবনের একটি সুন্দর স্মৃতিঃ ক্যাসিয়া, যার সঙ্গে বলতে গেলে মাত্র একটি বারই তার ভালো করে আলাপ হয়েছিলো। ক্যাসিয়া, লালচে যার চুল আর চোখ দুটি যার তারার ঝিকি-মিকির মতো—হ্যাঁ, অনেকটা ইঁদুরের চোখের মতই। এতোদিন আগেকার সে-ঘটনা যে এখন তার ভালো করে মনেই পড়ে না গ্রামের সেই নাচগানে ভরা উৎসবের রাত্রে কেমন করে সে এসে পড়েছিলো! কিন্তু সেই রাত্রে বিরাট হলঘরে ক্যাসিয়ার সঙ্গে সে নেচেছিলো। ক্যাসিয়া যেন বাতাসে ভাসা গোলাপের গন্ধের মতো এসেছিলো আর তার মনে ঝড় তুলেছিলো।

সে তাকে বললো, "পৃথিবীতে তুমি সবচেয়ে কী ভালোবাসো বলা খুব সহজ।"

মেয়েটি হেসে বললো, "নাচতে তো? হ্যাঁ, তাই। —আর তুমি ... ?"

"বন্ধু পেতে।"

"আমি জানি, আমি জানি", মেয়েটি তাকে আদর করলো আর বললো, "মাঝে মাঝে বন্ধুদের আমি তো প্রায় ভালোবেসেই ফেলি যতক্ষণ না বুঝতে পারি তারা কতটা আমাকে 'ঘৃণা' করছে।"

সেই মুহূর্তে ক্যাসিয়ার ঠাণ্ডা ফ্যাকাসে মুখ, তার অপর্যাপ্ত আশ্চর্য চুল আর হালকা পোষাক আর তার চারদিকের লিলিফুলের মাধুর্যকে সে ভালোবেসে ফেললো। ক্ষিদে আর অসুখ সম্বন্ধে দুটি বুড়ো চাষাকে আলোচনা করতে শুনে তারা কি ভীষণ হেসেছিলো সে রাত্রে!...

"চল, আমরা বাইরে যাই", ক্যাশিয়া এক সময় ফিলিপকে বললো, আর তারা মধ্যরাত্রির অন্ধকারভরা বাগানে এলো বেরিয়ে।

মেয়েটি বললো, "চমৎকার ঠাণ্ডা এখানে, আর কি শান্ত নির্জন! কিন্তু কি দারুণ অন্ধকার। তোমার মুখ দেখবার মতো আলোও নেই। তুমি কি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছো?"

সে শুধু বললো, "সকালের আগে চাঁদও উঠবে না!"

তারা কথা না বলে অন্ধকারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এক সময় অনুভব করলো রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া। দেয়াল চুঁইয়ে অস্পষ্ট বাজনা শোনা যাচ্ছে। বাজনা থামলো আর তারা দূর অরণ্যে শেয়ালের ডাক শুনতে পেলো।

"তোমার ঠাণ্ডা লাগছে", মেয়েটির নগ্ন গলায় তার ভিরু আঙুলগুলো বুলিয়ে অস্ফুটস্বরে সে বললো, "খুব, খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছো", অতি মৃদুভাবে তার মুখের আর গালের বাঁকে বাঁকে সে হাত বোলাতে লাগলো। শেষে বললো, "চল, ভেতরে যাওয়া যাক।"

ক্যাসিয়া বললো, "আমরা কিন্তু আবার ফিরে আসবো।"

ভেতরে কিন্তু নাচ তখন সবে শেষ হয়েছে। যারা বাজাচ্ছিলো তারা যন্ত্রপাতিগুলো বন্ধ করে ফেলেছে। যারা নাচছিলো কেউ বা বাড়ি ফিরছে, কেউ বা ঘরের এক পাশের উঁচু প্ল্যাটফর্মে, যেখানে অতিথিদের মদ সরবরাহ করা হচ্ছিল, সেদিকে যাচ্ছে।

ফিলিপ আর ক্যাসিয়াও সেখানে গেল। কিন্তু সেখানে এতো লোকের ভিড় যে ফিলিপকে প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে নামতে হোলো। সেখানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ক্যাসিয়ার দিকে চেয়ে রইলো। ক্যাসিয়া তার দেহকে তখন লাল ক্লোক দিয়ে ঢেকেছে।

"ফিলিপ, ফিলিপ, ফিলিপ, তোমার জন্যে," মেয়েটি এক গেলাস মদ তার হাতে তুলে দিলো। ঢক-ঢক করে খালি করে গেলাসটা সে দেয়ালে ছুঁড়ে মারলে তারপর প্ল্যাটফর্মের ওপরকার ক্যাসিয়াকে নীচে থেকেই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো, "তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। সমস্ত পথটাই তোমাকে নিয়ে যাবো এইভাবে।"

মেয়েটি হাসতে লাগলো আর তার লালচে চুলেভরা মাথা নানা ভঙ্গীতে চারদিকে হেলিয়ে চীৎকার করতে লাগলো, "আমাকে নামিয়ে দাও; তুমি কি পাগল হলে! নামিয়ে দাও।" আর তারা ভিড় ঠেলে এলো বেরিয়ে।

বাইরের পথ অন্ধকার, অন্ধকার রাত। সেইভাবেই টকে তুলে সে এগিয়ে চলতে লাগলো। মেয়েটি তার গলা য় ধরেছে আর পথ বলে দিচ্ছে।

"ফিলিপ, আমাকে হারিও না! আমাকে হারাবে না তো? কে হারিও না", মেয়েটি বললো আর তার ঠোঁট দুটো চেপে া তার কপালে।

মনে হোলো তার মাথাটা বুঝি ফেটে যাবে, তার বুকটা ধক্ করতে লাগলো। আর তার বুকের মধ্যে মেয়েটির পুষ্ট কে নানাভাবে সে অনুভব করতে লাগলো। "এই যে, এই ,," মেয়েটি খুব আস্তে বললো আর তাকে নিয়ে সে এলো টির বাড়ির বাগানে, সেখানের বাতাসে পাকা আপেলের লাল গোলাপের গন্ধ ভেসে রয়েছে। গোলাপ আর আপেল! লাপ আর আপেল! গাড়ি-বারান্দার তলায় মেয়েটিকে সে ালো, তখনো মেয়েটির হাত তার কাঁধের ওপর। এবারে ভালো করে নিঃশ্বেস নিতে পারছে। চুপ করে সে ড়িয়ে রইলো আর আকাশের দিকে চাইলো, সেখানে অজস্র রা কিন্তু চাঁদ নেই।

"তোমাকে দেখে যা মনে হয় তার চেয়ে তোমার অনেক শি জোর। সত্যিই তোমার গায়ে খুব জোর।" মেয়েটি চাপা য় বললো তারপর তার কোটের বোতাম খুলে বুকে হাত খলো।

"ওঃ, কি দারুণ তোমার বুক ধক্‌ধক্ করছে! ঠিক দ হচ্ছে তো? কার জন্য ধক্‌ধক্ করছে তোমার বুক?"

তার হাত দুটো ধরে উত্তেজিত ধরা গলায় সে শুধু তে পারলো, "ছোট্ট মা! ছোট্ট মা!"

"কী বলছো তুমি?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো; কিন্তু কোন উত্তর দেবার আগেই দরজার পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া ল, আর তার পরেই শোনা গেল ছিট্‌কি খোলার শব্দ ঃ ক্লিক...

কিন্তু কিসের ও-শব্দ? ওটা কি সত্যিই ছিট্‌কি খোলার দ, না—ইঁদুরধরা কলের আওয়াজ?......লোকটি সোজা হয়ে স একাগ্র মনে শুনতে লাগলো। তার স্নায়ু কাঁপতে গলো, আর সে অপেক্ষা করতে লাগলো ফাঁদে পড়ে ইঁদুরটির ত্যুর জন্যে। যখন তার মনে হলো সব শেষ হয়ে গেছে, তখন আলো জ্বালিয়ে আলমারি খুললো। কিন্তু আশ্চর্য, ঁদুরটি মরে নি। কলের সামনে বসে রয়েছে। তার মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল। তাকে দেখে ইঁদুরটি পালালো না, মিট্‌মিট করে চাইতে লাগলো।

"শ্যু-উ-উ-শ্-শ" সে বললো। কিন্তু ইঁদুরটি নড়লো না।

"যায় না কেন—শ্যু-উ-উ-শ্-শ!" আবার সে বললো, আর হঠাৎ সে ইঁদুরটির আশ্চর্য ব্যবহারের কারণ জানতে পারলো। ফাঁদে তার সামনের পা দুটো কাটা গেছে, আর প্রায় মানুষের মতই সে তার রক্তাক্ত কাটা পা দুটো তুলে বসে রয়েছে।

বিভীষিকায় লোকটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ক্ষিপ্র হাতে ইঁদুরের গলাটা ধরে সে তুলে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরটা কামড়ে ধরলো তার আঙুল। কী সে করবে একে নিয়ে? হাতটা সে পেছনে নিয়ে গেল, চাইতে সাহস হোলো না। কিন্তু শীঘ্র তাকে হত্যা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। একবার সে আগুনের কাছে ঝুঁকে পড়লো, মনে হোলো ইঁদুরটাকে বুঝি সে জ্বলন্ত আগুনেই ফেলে দেবে। কিন্তু সে থামলো, আর শিউরে উঠলো; তা' হলে এর চীৎকার তাকে শুনতে হবে। আঙুল দিয়ে টিপে সে কি মেরে ফেল্‌বে? জানলার দিকে চেয়ে সে মন স্থির করে ফেল্‌লো। জানলা খুলে আহত ইঁদুরটাকে অন্ধকার পথে সে ছুঁড়ে ফেল্‌লো। তারপর সশব্দে জানলা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়লো। ব্যথায় সে অবশ হয়ে পড়েছে; কাঁদতেও পারলো না।

সেই রকম করে সে বসে রইলোঃ দু মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। উত্তেজনায় আর লজ্জায় তার মন ভরে উঠ্‌লো। আবার সে জানলা খুল্‌লো,আর কনকনে বাতাস এসে তাকে অনেকটা শান্ত করলো। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে শব্দ করে সে পথে নেমে এলো। অন্ধকার, শূন্য পথ। অনেকক্ষণ সে খুঁজলো, শেষে ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরলো, তখন ঠাণ্ডায় তার হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে।

ঘরে এসে খানিক গরম হবার পর শেল্ফ থেকে ফাঁদটা সে তুলে নিলো। কাটা পা-দুটো তার হাতে পড়লো। সেগুলো আগুনে ফেলে দিলো সে। তারপর সে আবার ফাঁদটা ইঁদুর মারার উপযুক্ত করে ভেতরে রেখে সাবধানে খাবারের আলমারির দরজা বন্ধ করে দিলো। *

* A. E. Coppard-এর Arabesque ঃ The mouse গল্পের স্বাধীন অনুবাদ।

ভারতের অর্থনীতি

গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল এম-এ

প্রচুর ধনসম্পদের মধ্যে শোচনীয় দারিদ্র্য—ইহাই হইল ভারতীয় **অর্থনীতির মূল কথা। সর্বজন পরিচিত** এই সমস্যাটা আমরা **বহুদিন হইতে উপলব্ধি করিতেছি।** এই সমস্যাটা যথাযথরূপে **জানিয়া উহার সমাধানের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে** ভারতের অর্থ-**নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় থাকা প্রয়োজন। যে কোনো দেশের বা জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর** পরিচয় দিতে **গেলে যে বিষয়গুলির আলোচনা** অত্যাবশ্যকীয়, তাহা হইতেছে এই ঃ— **(১) উৎপাদন, (২) ধন-বণ্টন,** (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য, (৪) রাষ্ট্রনীতি। **ভারতের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলি** আমাদের মোটামুটি বিশ্লেষণ **করিয়া দেখিতে হইবে।**

উৎপাদন—

ভারতীয় উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া আমরা প্রথমেই **এবং** অতি **সহজেই** দেখিতে পাই-- কৃষিপণ্য, অরণ্যজাত দ্রব্যসম্ভার, গাভীজাত **খাদ্য ইত্যাদি** মৌলিক (Primary) প্রয়োজনের দ্রব্যগুলিই **ভারতীয়** উৎপন্নের **বৈশিষ্ট্য।** সমগ্র ভারতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫২ ভাগ হইল **মৌলিক** দ্রব্য। ইহার মধ্যে আবার কৃষিপণ্যই অর্ধেকের উপর। **গাভীজাত** খাদ্যদ্রব্যের অনুপাতও কম নহে। **ইহা** সমগ্র মৌলিক পণ্যের **এক**-তৃতীয়াংশেরও অধিক।

ভারতের **প্রাকৃতিক সম্পদের** কথা বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু এই স্বাভাবিক সম্পদকে আমরা **কতটুকু** কাজে লাগাইয়াছি। অন্যান্য **দেশের** উৎপাদনের হারের সহিত **আমাদের** দেশের উৎপাদনের হারের **তুলনা করিলে লজ্জায়** মাথা নোয়াইতে হয়। আমাদের দেশ **কৃষিপ্রধান**--সুতরাং কৃষি উৎপাদনই হিসাব করিয়া দেখা যাক, **দেখিব** আমরা পৃথিবীর কত পশ্চাতে, যদিও উৎপাদিকা শক্তির দিক দিয়া এদেশের মাটি অন্যান্য দেশের মাটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ত' নয়ই বরং শ্রেষ্ঠ। যে পরিমাণ জমিতে জার্মানী গম উৎপাদন করে ২২৬০ পাউন্ড, গ্রেট ব্রিটেন করে ২০০০ পাউন্ড, ঠিক সেই পরিমাণ **জমিতে** ভারতবর্ষের উৎপাদন মাত্র ৭০০ পাউন্ড। জাভায় প্রতি একর **জমিতে** ৪০ টন করিয়া **ইক্ষু** উৎপন্ন হয়, অথচ ভারতবর্ষে হয় মাত্র ১০ টন। আর তুলা? আমেরিকার উৎপাদন যেখানে একর প্রতি ২০০ পাউন্ড, মিশরের ৪৫০ পাউন্ড, সেখানে ভারতবর্ষের উৎপাদন **মাত্র** ৯৮ পাউন্ড।

আজকে যুদ্ধ যখন ভারতের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত, তখন **অন্ন**-বস্ত্রের নিদারুণ সমস্যার গুরুভারে সে ভাঙিয়া পড়িতেছে, **বৈদেশিক** আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ সে কী শক্তি লইয়া দাঁড়াইবে, তাহা **ভাবিবার** বিষয়। এদেশ কৃষিপ্রধান। সমগ্র দেশে কৃষির উপযোগী **জমির** এক-তৃতীয়াংশ কি এক-চতুর্থাংশ এখনও অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। তবু এদেশে আজ খাদ্যের অভাব হয় কেন? বিদেশ হইতে **আমদানী** বন্ধ হওয়ার দরুণ সুতার অভাবে বস্ত্রের অনটন হয় কেন? **হিসাব** করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র উন্নত প্রকারের সার সংযোগেই এদেশের শস্য উৎপাদন তিনগুণ এবং তুলার উৎপাদন **চারিগুণ** বৃদ্ধি করা যায়, ইহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে **জল** সরবরাহ ও ভূমি কর্ষণের ব্যবস্থা হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের এ-হেন দুরবস্থা কেন? উত্তর অতি সুস্পষ্ট ও সহজ। উন্নত উপায়ে কৃষিকার্যের জন্য যে সমবেত উদ্যম ও মূলধনের প্রয়োজন, তাহা জোগাইবে কে? কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়নের জন্য যে উদ্যম ও শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমরা রাষ্ট্রের কাছেই প্রত্যাশা করিতে পারি। রাষ্ট্র যদি অকর্মণ্য এবং উদাসীন হয়, তাহা হইলে কি করিয়া এদেশে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করিতে পারি? এদেশের জমি-বন্দোবস্তও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবল অন্তরায়। এদেশের জমি-ব্যবস্থার দৌলতে বহু অকৃষকশ্রেণীভুক্ত লোক জমির উপর খাজনারূপে স্বত্ব ভোগ করিতেছে। এদেশের মধ্যবিত্তেরা **অধিকাংশই খাজনাভোগী,** জমির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ কোনো **সম্বন্ধ নাই। বসিয়া বসিয়া** তাহারা খাজনা ভোগ করে—উন্নত উপায়ে চাষের **কথা তাহারা** চিন্তা করে না। যাহারা চিন্তা করে, তাহারা **নিরক্ষর দরিদ্র চাষী,** তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে মূলধন। **সুতরাং কেবলমাত্র তাহাদের** উদ্যমে উৎপাদন বিস্তারের কোনো **প্রশ্নই উঠে না।** তাহা ছাড়া আমাদের জমি-বন্দোবস্ত উত্তরাধিকার আইনগুলির **সহিত যুক্ত হইয়া** জমিকে এমন খণ্ডবিখণ্ড এবং এখানে ওখানে **এমনভাবে বিক্ষিপ্ত** করিয়াছে যে, উহা একত্রিকভাবে বৃহৎ উদ্যমে **চাষ করিবার** অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এদেশের জমি-বন্দোবস্ত **গভর্নমেণ্টের বহু** খাজনাভোগী তাঁবেদার সৃষ্টি করিয়াছে এবং **শিল্প-প্রগতির প্রতিবন্ধকতা** করিয়া ইংলণ্ডজাত শিল্প-পণ্যের বাজার এদেশে **যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ** রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাই আবার বর্তমান দিনের **প্রয়োজন** মিটাইবার মস্ত বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধায়োজনের দরুণ প্রচুর টাকাকড়ি ভারতীয় জনগণের হাতে আসিতেছে। মুদ্রা-সম্প্রসারণ প্রায় অবাধে চলিয়াছে। মুদ্রা এবং জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে জানা যায়— ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালের মার্চের মধ্যে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ২১৩ কোটি টাকা অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে যাহা ছিল, তাহার উপর শতকরা ১২০ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। গভর্নমেণ্টের যুদ্ধায়োজন সম্পর্কীয় প্রভূত অর্থ ব্যয়ের দরুণ লোকের হাতে অজস্র টাকাকড়ি আসিতেছে; কিন্তু টাকা-কড়ি চিবাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। ঐ টাকাকড়ি দিয়া যদি সে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং ব্যবহার্য সামগ্রী উপভোগ করিতে পারে, তবেই তাহাকে সমৃদ্ধিশালী হিসাবে মনে করিতে পারি। যুদ্ধ সম্পর্কীয় উৎপাদনের দরুণ টাকাকড়ি বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অনুপাতে দেশের খাদ্য ও ব্যবহার্য-সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে ব্যবহার্য এবং খাদ্যবস্তুসমূহের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বাড়িতেছে। ইহার উপর **মূল্য** বৃদ্ধির সহিত পাল্লা দিয়া পণ্যসমূহকে গুদামবন্দী করিবার **স্বার্থান্ধ** আয়োজনের ফলে উহার ঊর্ধ্বগতি তীব্রতরই হইয়াছে। ১৯৪১ **সালের** নভেম্বরে কলিকাতার বাজারে মূল্য-গড় ছিল ১৫৭, ১৯৪২ সালে উহা ১৬৯এ আসিয়া দাঁড়ায়। বোম্বাই-এর বাজারে উক্ত সময়ের **মধ্যেই** মূল্য-গড় ১৬২ হইতে ১৯৬এ আসিয়া হাজির হয়। যুদ্ধ **সম্পর্কীয়** উৎপাদনের সহিত আনুপাতিক সঙ্গতি বজায় রাখিয়া ব্যবহার্য এবং খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন যথোচিত বৃদ্ধি না পাওয়াতেই দেশের **মধ্যে** একটা আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আমরা দেশের **উৎ**পাদনের সঙ্গে আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করিতে সমর্থ **হই**তাম, তাহা হইলে প্রাকৃতিক সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান এমন **একটি** দেশে এই বিপর্যয়ের বাস্তবিক কোনো কারণ থাকিত না।

শিল্পক্ষেত্রেও সেই একই দুরবস্থা। ভারতীয় **শিল্প**সম্পদের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষই পৃথিবীর লৌহ সম্পদের বৃহত্তম আকর। গুণের দিক দিয়াও ইহা পৃথিবীর কোনো দেশের লৌহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু এদেশ কতটুকু লৌহই বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে: কতটুকু লৌহ এদেশ শিল্পোপযোগী করিয়া উৎপন্ন করিতেছে: **যে-ক্ষেত্রে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর লৌহ সরবরাহের শতকরা** ৪৯ ভাগ পূরণ করে, রুশ করে ১৯ ভাগ, ফ্রান্স ১৩ ভাগ, সুইডেন ১১ ভাগ, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের **লৌহ সরবরাহের পরিমাণ** শতকরা ২ ভাগ মাত্র। গত **যুদ্ধের পর** হইতে সংরক্ষণ **শুল্কের প্রবর্তনের** ফলে ভারতে অনেকগুলি **শিল্পই গাড়িয়া উঠিয়াছে** এবং **বর্তমান**

তাহারা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে জাত দ্রব্যের বাজার, ভারতীয় কাঁচা মালের রপ্তানি এবং য় মূলধন ও শ্রমশক্তির বহর দেখিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে যে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের সামান্য অংশই শিল্প সংগঠনে জিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত এমন কতকগুলি ক শিল্প-সম্পদের অভাব আছে, যাহা ব্যতীত কোনো দেশেরই য় অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গতা বা দৃঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। রাসায়নিক দ্রব্য, যানবাহন, মোটর এঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ- ও অন্যান্য ধনোৎপাদক যন্ত্রপাতির জন্য এখনও আমাদিগকে শী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান মহাযুদ্ধের য় আমরা যে অভাব, যে দৈন্য, যে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন াছি, তাহার একটি প্রধান কারণ হইতেছে, এদেশে ধনোৎপাদক পাতি, যানবাহন এবং রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব। গত যুদ্ধের হইতেই যদি আমরা এদেশে রসায়ন, যানবাহন এবং শিল্প য়া তুলিতাম, তাহা হইলে বর্তমানের আর্থিক সমস্যা এত কঠোর গ্রহণ করিত না। তাহা ত হয়ই নাই, পরন্তু বর্তমান সময়েও সকল বিষয়ে গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দেশে যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলা তো দূরের কথা, গভর্নমেণ্ট ঐ ল জিনিস বিদেশ হইতে আমদানী করারও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি রতেছে।

যুদ্ধকালে রপ্তানি বাণিজ্যের যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি হওয়ার ণে আজ লণ্ডনে ভারতবর্ষের প্রভূত স্টার্লিং সম্পদ সঞ্চিত য়াছে। ঐ সকল স্টার্লিং-এর বিনিময়ে গভর্নমেণ্ট ভারতে যথেষ্ট রিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানীর কার্যে সহায়তা করিতে পারিত। ন্তু তাহা না করিয়া গভর্নমেণ্ট এদেশের স্টার্লিং তহবিলসমূহ াহার সাবেকী ইংলণ্ডীয় দেনার (হোম্ চার্জ) পরিশোধকার্যে ব্যয় রিতেছে, অথচ এই দেনাকে ভারতীয় জনসাধারণের দায়িত্ব হিসাবে াখ্যাত করিবার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আমরা যতদূর জানি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন এবং সংগঠনই এই দেনার কারণ এবং উহার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রধানত দায়ী। যাহাই হউক, ভারতের স্টার্লিং-সঞ্চয় তাহার উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত ঋণভারের অপসারণে ব্যয়িত না হইয়া ভারতের শিল্প-সংগঠনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিতে নিশ্চয়ই পারিত। বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব নাই এবং উহা জড়ত্ব (shyness) দোষে দুষ্টও নয়। এ-বিষয়ে মিঃ কে, টি, সাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্যঃ

"The experience of more than one new or expanded industry, the operations on more than one stock-exchange, the presence of crores of deposits in the Reserve, Imperial, the Postal savings and other banks, and the spectacle of accumulating sterling balances—all go to prove that there is absolutely no lack of the necessary capital, if only a determined policy of industrial development is pursued."

অর্থাৎ "নূতন নূতন একাধিক ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস, একাধিক স্টক্ কারবার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বহু ব্যাঙ্কের তহবিল এবং স্টার্লিং সঞ্চয়ের সহিত পরিচয় হইতে আমরা নিশ্চিত জানিতে পারি, যদি জাতীয় অর্থনীতির সংগঠনে সুদৃঢ় সংকল্পের অভাব না হয়, তাহা হইলে শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের অভাবও এদেশে হইবে না।" বস্তুত উদ্যমশীল এবং সুদৃঢ় রাষ্ট্রিক নেতৃত্বের অভাবই এদেশে শিল্প-সংগঠনের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধন-বণ্টন

শিল্প সম্পদের অভাবই ভারতীয় দারিদ্র্যের মূল কারণ এবং আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশসমূহের শিল্প প্রাধান্যই হইল তাহাদের সমৃদ্ধির উৎস। কারণ, স্পষ্টই দেখা যায় ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশের কৃষকেরা কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া যে পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে—গ্রেট ব্রিটেনের মত শিল্প প্রধান দেশ উক্ত কাঁচামাল-সমূহকে শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া উহার বহু গুণ অধিক লাভ করিয়া থাকে। কাঁচামালকে শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াতে বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে।

সুতরাং কাঁচামাল যদি এ দেশের শিল্পে না লাগাইয়া আমরা বিদেশে রপ্তানী করি তাহার অর্থ এই যে, আমরা এ দেশের বহু লোককে শিল্প কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবিকার্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত করি। শিল্প সম্পদের অভাবের দরুণই আমাদের মাথা পিছু আয় এত কম। ডাঃ ভি কে আর ভি রাও অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর মাথা পিছু গড় আয় বাৎসরিক ৬২, টাকা মাত্র। শ্রীযুক্ত কুমারপ্পা গুজরাটের একটি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলের ৫০টি গ্রাম হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, গ্রামবাসীদের মাথা পিছু আয় বাৎসরিক ১৪, টাকা মাত্র। যাহা হউক,—ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় যেরূপ তাহার দ্বারা উচ্চ চালে জীবন যাপন ত দূরের কথা কোনো মতে গ্রাসাচ্ছাদনও সম্ভব হয় না।

ভারতবর্ষে ধন-বণ্টনের রূপ হইতেছে এইঃ এখানে সমগ্র জন-সাধারণের ⅔ অংশ লোকের মাথা পিছু আয়—মাথা পিছু জাতীয় গড় আয়ের অর্ধেক মাত্র। এদিকে শতকরা একজন মাত্র লোক জাতীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী পরিমাণ উপভোগ করে। সুতরাং দেখিতে পাই এ দেশের অধিকাংশ লোকই জীবন ধারণের সম্বল হইতেও বঞ্চিত। বন্য পশুর জীবন ধারণের প্রণালী হইতে তাহা-দের জীবনযাত্রা কোনো অংশে উন্নত নহে। এই নিদারুণ সমস্যার দায়িত্ব কেবলমাত্র জন বৃদ্ধির উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না।

কৃষি এবং শিল্পের অবনত অবস্থাই এই সমস্যার মূলে। দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার একান্তই প্রয়োজন; কিন্তু শুধু এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। এখানকার ধন-বণ্টনের যে চিত্র দিলাম তাহার সহিত সামাজিক ন্যায়ের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং উহা কায়েম থাকিলে ভারতীয় দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। সুতরাং জাতীয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এ নূতন ধন-বণ্টনের প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য

ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়াই দেশের ধন সম্পদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মিঃ কে টি সাহা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য বাবদ বৎসরে প্রায় ১০,০০০ কোটী টাকার লেন দেন হয়। কিন্তু যাহাই হউক—ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্য তাহার প্রয়োজনীয় সংগঠন ও সুযোগ সুবিধা হইতে চিরকালই বঞ্চিত। এ দেশের মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কনীতি, যানবাহননীতি সমস্তই বহিঃ-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ণীত এবং তাহারা সমস্তই অন্ত-র্বাণিজ্যের প্রতিকূল। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে মাল সরা-সরির অত্যধিক্য এবং তজ্জনিত ব্যয়-বাহুল্য আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া বহু মধ্যবর্তী কারবারীর হস্ত ফিরি করিয়া এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় বহু করভার বহন করিয়া খরিদ্দারের হাতে আসিয়া মাল পৌঁছানও এ দেশের ব্যবসার একটি মস্ত বড় অসুবিধা। ইহা পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যবহারের মধ্যস্থিত ব্যবধান অনর্থক বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

(শেষাংশ ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৩

হঠাৎ একদিন অজন্তা এসে উপস্থিত;—

ফাল্গুনে হাওয়ায় দোদুল কৃষ্ণচূড়া ফুলের মত ওর চলার ছন্দ বাসন্তী রঙের শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠছে যেন।

ঘাড়ের কাছে এলোচুলের শিথিল কবরী ঘিরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, কানে দুল, হাতে চুড়ী, পায়ে হাল্কা চটি।......

অজন্তা ডাকলোঃ—

"মায়াদি"—

বিকেল বেলা। মায়া তখন সবেমাত্র গা-ধোওয়া কাপড়-কাচা শেষ ক'রে বাথরুমের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে; ওর এক হাতে ভিজে কাপড়ের স্তূপ, অন্য হাতে ভিজে গামছা। সমস্ত গা থেকে সাবানের বেশ একটা স্নিগ্ধ সুগন্ধ বার হ'চ্ছে হাওয়ায়। পরনের শুকনো সেমিজ শাড়িতেও ওর স্পর্শ, জায়গায় জায়গায় জলের ছোঁওয়ায় ভিজে।......

মায়া দেখছিল অজন্তাকে।......

বেশ মানিয়েছে ওকে এই বাসন্তীকার বেশে।......

অজন্তা বললেঃ—

"মায়াদি, তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলুম।"

"কেন ভাই, নতুন ঘর সংসার দেখবার জন্যে?"

অজন্তা হাসলোঃ—

"শুধু তাই নয় দিদি, এ আমাদের বিবাহোৎসবের সমাবর্তনের দিন!—মনে রাখবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা।"

মায়ার মনে হলো কথার শেষে মায়ার গলায় যে সুরের ঝঙ্কার শোনা গেল ক্ষণিকের জন্য, এ সুর যেন সে আগে শোনেনি আর। অজন্তার ঐ হাসি, ওর ভেতর থেকেও যেন একটা অজানা বিষাদমাখা মুখ উঁকি মেরে গেল মায়ার দৃষ্টিতে।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে অজন্তাই নিজে থেকে ব'লে চললোঃ—"আয়োজন কিছুই করতে পারিনি, পারবো বলেও আশা করো না মায়াদি, জানো তো সে ভার নেবার উপযুক্ত আমি নই, অতএব সে দায়িত্ব তোমার। তুমি সকাল সকাল গিয়ে নিজে থেকে দেখে শুনে নেবে সব করবে যা করবার, আমাকে যেন না জবাবদিহি করতে হয় কিছুর জন্যে।"......

সলজ্জ একটা হাসির পর্দায় ঢেকে ফেললে যেন ও ওর মনের অব্যক্ত ভাষাটা।......

মায়া যেন ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলো না এ জবাবদিহিতে। প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি ওর মুখের ওপোর মেলে ধরে বললেঃ—

"চা খাবে? জল চড়ানো হয়েছ উনুনে, বেশী দেরী নেই হ'তে।"

"বেশ দাও; ততক্ষণ সৌম্যদার অভ্যর্থনার পাটটা সেরে ফেলি, কি বল!"

সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই অজন্তা গিয়ে দাঁড়ালো সৌম্যর ঘরের দরজায়, যেখানে টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে সৌম্য টেবিলভরা কাগজপত্র আর খাতা পেন্সিলে লেখালেখি—কাটাকাটি ক'রে চলছিল বিরামহীন গতিতে।......

অজন্তা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে সৌম্যর ফিরে তাকাবার; কিন্তু কাজে তার কী অখন্ড মনোযোগ! মুখ ফিরাতেও অবকাশ নেই বুঝি?—

বিদ্রূপের হাসি ভেসে উঠলো অজন্তার অধরোষ্ঠে! ডাকলেঃ "সৌম্যদা"।......

মুখ ফিরিয়ে তাকালো সৌম্যঃ

অজন্তা।......

হ্যাঁ আমিই, আপাতত ধ্যান ভঙ্গ ক'রে অনুরোধ জানাতে এলাম—আগামীকাল আমাদের বিবাহের সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করবার নিমিত্ত। নিশ্চয় আপত্তি নেই!—....

সৌম্য উঠে দাঁড়িয়েছিল নিজের চেয়ার ছেড়ে; সহাস্যেই জবাব দিলেঃ—"আপত্তি যে থাকবে না—এটা জেনেই যখন আমন্ত্রণে এসেছো অজন্তা, তখন মতামতের অপেক্ষা নাই-বা করলে!"......

"ভদ্রতা—! সুজনতা!"

"তোমাদের এই ধারকরা ভদ্রতা আর ভদ্রতার মুখোস আমার আর সহ্য করা দুষ্কর হয়ে উঠছে দিন দিন! মনে হ'চ্ছে এর চেয়ে......"

"বলুন, বলুন....."

'এর চেয়েতে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
পায়ের তলে আচীন মরু দিগন্তে বিলীন;
ছুটেছে ঘোড়, উড়েছে বালি, জীবন স্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।'

কেমন এই তো আপনার বক্তব্য?—'

"কতকটা বটে, আবার কতকটার সঙ্গে ঠিক খাপও খায়না তোমার কথায়।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ সত্যিই ক্লান্তি এসেছে এই সব পালিশের কাজগুলোয়; কাঠামো যার যা, সেইটাকেই ঘসে মেজে পালিশ আর রং চঙ্গে বিকৃত বেহিসাবী ক'রে তোলা যেন সব সময়েই ঘাড় হেঁট করে মেনে নেবার মত ক্ষমতার অভাব হয়ে পড়ছে" অজন্তা,

টুনেটুনেও তাকে ঠিক জোড়া তাড়া দিয়ে রাখতে পারছিনে স্যর।"

ওর সমস্ত কথায় সত্যিই যেন ক্লান্তি ঝ'রে পড়ছে।

অজন্তা মুখ তুলে তাকালো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে।......

কি ওর দৃষ্টিতে ছিল কে জানে, কিন্তু সৌম্য মাথা উঁচু করে তাকাতে পারলো না, ধীরে ধীর মাথাটা ঝুঁকে পড়লো বুকের ওপোর।......

ওর এই অপ্রস্তুত ভাব ঢাকা দেবার জন্যেই অজন্তা যেন একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। হাসি মুখে বললেঃ— "মানুষ মানুষের কাছে আসে কি শুধু দাঁড়িয়ে থাকতেই, বসতে বলার আপ্যায়নটুকুরও কি বিধি বিধান আছে?"

সৌম্য জবাব দিল না এ কথার; এই সময়ে দেখা গেল মায়াকে, দুই হাতে দুই কাপ চা নিয়ে সে এই দিকেই আসছে। হাতের কাপ দুটির একটি অজন্তা আর একটি সৌম্যর দিকে প্রসারিত ক'রে দিলে সে।......

অজন্তা জিজ্ঞাসা করলেঃ—

"তুমি?"

"আমি তো চা খাইনে!......"

"সুতরাং আমাদের গন্ডি থেকে বাতিল।"

সৌম্য হাসলো!

মায়া জবাব দিলেঃ—

"কিন্তু তার জন্যে দুঃখ আমার এক ফোঁটাও নেই। যে গন্ডি তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে জোর ক'রে প্রবেশের অধিকার দাবী করলেও হয়তো করা যায় জানি, কিন্তু তাতে মাধুর্য কোথায়? আমি চাই সেই মধু; যে মধু—ফুল ঝরে পড়ে শুকিয়ে গেলেও নষ্ট হয় না, লুপ্ত হয় না।......বরঞ্চ বাঁচিয়ে তোলে খিদে তেষ্টার খোরাক যুগিয়ে। তাই আমার দাবী এই চায়ের কাপ, আর চিনির কোটোতেই চিরদিন বদ্ধ হ'য়ে থাক, তাতে আমার আপত্তি নেই, নালিশও নেই কিছু!......"

অজন্তা হাসছিলঃ—

"অর্থাৎ তুমি জানাতে চাও—সোনা-দানা যতই আসুক আর থাক না কেন তার চাবিটি বাঁধা থাক তোমারই আঁচলে,— তুমি যাকে যা ইচ্ছে ক'রে দেবে, হাত পেতে সেইটুকুই নেওয়া হবে তার প্রাপ্য; ন্যায্য হোক আর অন্যায্যই হোক তার ওপোরে আর আপীল চলবে না, এই তো? ....."

"অনেকটা বটে।"

এবার মুখ খুললো সৌম্য;—

সহজ, সারল্য ভরা কৌতুকে বললেঃ—

"মানেটা এই যে চা দেব আমি, চায়ের গন্ধ পাও, বর্ণ দেখ এবং আস্বাদ করো তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু দেখতে চেওনা চায়ের কোটো! জানতে চেও না ক'পাউন্ড আছে—আর কত দাম দিয়ে কেনা সেই চায়ের পাউন্ডঃ—সোজা কথা।......"

নিজের রসিকতায় ও নিজেই যেন টেনে টেনে হাসতে লাগলো; মায়া বা অজন্তা কেউ বিশেষ ক'রে তাতে যোগ দিলে

হাতের কাপটা চা শূন্য ক'রে অজন্তা নামিয়ে রাখলে সামনে, বললেঃ—

"এবার তাহলে যাই, কথা রইল কালকের।—

মায়া জবাব দিলেঃ—

"আমার মতামত তো জানোই, তবে ওঁর.....

"ওঁকে রাজী করাবার ভার আমার ওপোর।—"

উচ্ছ্বসিত হাসিতে চারিদিক মুখরিত ক'রে অজন্তা বিদায় নিলে; বাড়ি এসে দেখলে পার্থ ওর পোষাকের আলমারী খুলে তার সামনে চুপ করে ব'সে আছে তার দিকে তাকিয়ে। অজন্তার প্রবেশ সে জানতেও পারলে না।

পা টিপে টিপে পেছনে এসে দাঁড়ালো অজন্তা, তারপর শিশুর মত কলকণ্ঠে উঠলো খিল খিলিয়ে হেসে। চমকে ফিরে তাকালো পার্থ...অজন্তা জিজ্ঞাসা করলেঃ—

"এ আবার কি,—কাপড়-জামার আলমারী খুলে কি ভাবছো বলো তো?"

"ভাবছি সেদিন তোমাকে কোন্ রঙের কাপড় প'রে মানিয়েছিল, আর আজ কি শাড়ী পরলে ঠিক মানাবে!"

"যদি বলি কালো!"

"না।"

"ধূপছায়া!"

সংশয়ের দোলায় দুলে দুলে এতাবৎ কালের উপমায় ওটা পচা-পুরানো হয়ে গেছে অজন্তা, তার চেয়ে পরো গেরুয়া রং;—আজ তোমার নিজেকে চিনবার দিন এসেছে।......

অজন্তা বসে পড়লো পাশের চেয়ারখানায়; পাংশুল মুখে পার্থর দিকে তাকিয়ে আবৃত্তির মত ভাব লেশহীন কণ্ঠ-স্বরে প্রশ্ন করলেঃ—

"আজ কি তোমার শরীরটা ঠিক নেই?"

"একথা কেন?"

"তোমার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে।"

"ভুল। তোমার দৃষ্টির দোষ। অবশ্য জাগতিক ইতিহাসে এ ভুল নিষিদ্ধ নয়, এবং করেও থাকে সকলেই, কিন্তু এর পরেই আসে অনুতাপ!......"

একটু থেমে বললেঃ—

"শরীর আমার যেমন চিরদিনই ভালো ছিল, আজও তার চেয়ে খারাপ নেই কিছু,—আর তার জন্যে চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও দরকার নেই অজন্তা। তার চেয়ে ছাদে চলো, খোলা ছাদে; দেখিগে—আকাশে ফুটে উঠেছে দিনান্তের কত রং বেরঙের ইসারা, আভাস!......

পার্থ উঠলো, অজন্তাও নির্বাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত সঙ্গে সঙ্গে চললো ওর।

সিঁড়ির সীমা শেষ ক'রে দু'জনেই এসে দাঁড়ালো খোলা ছাদে।...... চারপাশে তাকিয়ে দেখা গেল দূরের ধূমায়িত পাহাড়ের শ্রেণী, নিকটের লোকজনের বসতি, ছোট খাটো গাছ-গাছড়া, আর মাথার ওপরে বিশাল—বিস্তীর্ণ আকাশ!......

প্রসারতায় ও অনন্ত, বিস্তীর্ণতায় ওর সীমা নাই, শেষও নাই কোনও দিকে!......

হৃদয়ের সন্ধান যদি সে আজ পেত তাহ'লে তাকে হয়তো আবরণ টানতে হতো না কোনও কিছুর ওপোরে, ভাঙ্গা, জোড়া-তালির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে হতো না এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে। প্রথম একদিন, যেদিনের সমাবর্তনের উৎসবের জন্য সে কালকের দিন ঠিক করেছে, আনন্দ-অনুষ্ঠানেরও যথাসাধ্য কামাই করতে চায় না সেই প্রথম দিনটিতে পার্থর হাতের মধ্যে নিজের হাত দু'খানা ছেড়ে দিয়ে সে ভেবেছিল—এই বুঝি তার নিবেদন, তার সমর্পণ!...কিন্তু আজ মনে হচ্ছেনা—সেদিন সে যতখানিই নিজেকে নিবেদন করুক, সমর্পণ করুক, নিঃশেষ করতে পারেনি সে দেওয়ায়। সেই দেওয়ার ফাঁকটুকু হয়তো কোথাও জড়িয়ে ছিল লুকিয়ে,—আজ সে তাই জায়গা ক'রে নিয়েছে সবখানি জুড়ে; সবখানি জুড়ে সে বজ্রকণ্ঠে জারি করছে তার আদেশ বাণী—দেওয়া তার অসম্পূর্ণ, সাধনা তার সিদ্ধিহীন! তাই সে চায় এবার একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে, একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে।...এ ব'য়ে ব'য়ে বেড়াবার শক্তি আর তার নেই, অক্ষম হৃদয় তাই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে চায় আকাশের মত বিরাটের মধ্যে, বিশালের কোলে।......

একটা দীর্ঘশ্বাস যেন জোর ক'রেই চেপে গেল ও।

পার্থ বসেছিল একপাশে, ওর কোলের ওপোর মাথাটা রেখে অজন্তা তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে, পার্থর দৃষ্টি সেদিকে ছিল না।

ম্লান হাসি হেসে ও ডাকলোঃ—

"অজন্তা"

"কেন ?"

"তুমি ভাবছো এত দিনে ও আমাকে চিনতে পারেনি কেন, নয় কি ?"

অজন্তা উত্তর দিল না। পার্থ ব'ললেঃ—

"হয়তো সে শক্তি তোমার নেই, কিন্তু আমারও যে সে শক্তির অভাব নেই, একথা তোমায় বোঝাব কেমন ক'রে? কোন্ যুক্তি দিয়ে? আমি জানি তোমার কর্তব্যে তুমি ত্রুটি রাখোনি এক ফোঁটাও, কিন্তু রেখেছি আমি। কেমন ক'রে যে রেখেছি, কেমন ক'রে যে রাখছি, তা বুঝতে পারি না। যখন বুঝি তখন আর উপায় থাকে না শোধরাবার।......আমি জানি, সময় সময় আমার ব্যবহার তোমায় উত্তেজিত, উত্তপ্ত ক'রে তোলে, তবু তুমি সহ্য ক'রে যাও সব। কিন্তু আমিই সহ্য করতে পারি না তোমার এই স'য়ে যাওয়াটাকে; মনের মধ্যে নিরন্তর খোঁচা দেয়, আমি অপরাধী, আমি অপরাধ করছি তোমার কাছে, অথচ তুমি তার কৈফিয়ৎ চাও না আমার কাছ থেকে। এর চেয়ে যদি তুমি আমার কাজের জবাব চাইতে, আমাকে আমার অন্যায় বুঝিয়ে দিতে, শাস্তি দিতে আমি ঢের আরাম পেতুম, স্বস্তি পেতুম জীবনে।.....

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, দূরে আকাশের কোলে বিলীয়মান দুই একটি লাল রেখায় আঁকা ওরই বিদায়লিপির একটু আলো এসে পড়েছিল হয়তো অজন্তার মুখের ওপোর; পার্থ ওর কপালের ওপোর এসে-পড়া চুলের গোছাগুলো সরিয়ে দিল একবার তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজতে লাগলো ওর মুখে চোখের ভাষায়।

অজন্তা সে দৃষ্টি সহ্য ক'রতে পারলো না, চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা জল।

পার্থ তা জানতে পারলে না। ক্রমশ

ভারতের অর্থনীতি

(৪০৩ পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য। ভারতবর্ষ শিল্পোপযোগী কাঁচামাল এবং খাদ্য-সম্ভার রপ্তানি করিয়া শিল্পপণ্য আমদানী করে। ভারতীয় বাণিজ্যে ব্রিটেনই সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবর্ষ ব্রিটেনকেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া উহার নিকট হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিল্পপণ্য খরিদ করিয়া থাকে। এখন আমদানীর উপর রপ্তানির যে উদ্বৃত্ত ভারতবর্ষ নিয়মিতভাবে লাভ করিয়া থাকে, তাহা কোন্ শুভ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়? রপ্তানির উদ্বৃত্ত বাবদ বিলাতে ভারতের যে স্টার্লিং সঞ্চিত হয়, তাহা ভারত গভর্নমেণ্ট তাহার সাবেকী ইংলণ্ডীয় দেনার পরিশোধকার্যে ব্যয় করে। এই কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের কাছে এই দেনার দিকে লক্ষ্য করিয়াই ভারত গভর্নমেণ্ট মুদ্রানীতি নির্ণয় করে। ফলে ভারতীয় মুদ্রানীতি ভারতের বহির্বাণিজ্যের এবং গভর্নমেণ্টের আর্থিক প্রয়োজনের যতটুকু পরিপূরক, জাতীয় অর্থনীতির সংগঠনে ইহা তত সহায়ক নয়। বস্তুত দেশের অর্থ-নৈতিক সংগঠনের সহিত ভারতীয় মুদ্রানীতির বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই। এদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক দেনার পরিবর্তে দেশের শিল্প সংগঠনের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের মুদ্রানীতি এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত

রাষ্ট্রনীতি

সর্বোপরি একটা সুদৃঢ় এবং সর্বপ্রকার ন্যস্ত স্বার্থ হইতে বিমুক্ত একটা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উপর ভারতের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। দেশের অর্থনীতিকে আমরা তাহার রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না; কারণ বর্তমান কেন্দ্রী-করণের যুগে রাষ্ট্রকেই আমরা সমগ্র জাতীয় কল্যাণের অভিব্যক্তি হিসাবে মনে করি। জাতির সমস্ত শক্তি রাষ্ট্রের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত বলিয়া জাতি-সংগঠনের সমস্ত দিক আজ তাহারই উপর নির্ভর করে। অতএব যে-দেশের রাষ্ট্রনীতি শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে-দেশের জাতীয় সমৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা ভাবিতে পারি না। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র আজ কী করিতেছে? তাহার একমাত্র কাজ হইল কর সংগ্রহ করিয়া দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। জাতি-সংগঠনের গুরুদায়িত্ব বহন করিতে সে অস্বীকার করিয়াছে। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতি ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এ-দেশের অর্থনীতির সহিত তাহার সহানুভূতি নাই।

সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রথম ধাপই হইল—ভারতের রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন। জাতীয় কল্যাণের কামনায় অনুপ্রাণিত সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও সংকল্প এবং সুচিন্তিত পরি-

বর্তমান বিপর্যয় ও ভারতের ভবিষ্যৎ

শ্রীশক্তিব্রত সিংহ রায়, এম্ এস্-সি

সভ্যতার বিপর্যয় মানুষের ইতিহাসে ঘটেছে বারবার। বিপর্যয় ...য়েকে তার চলার পথে কোনও বার অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছে, আবার ...ন্তবার অনেক দূরে পেছনে ঠেলেছে। সভ্যতার এই আগুপিছু খেলা ...াসুর লড়াইয়ের মত। কারণ খুঁজতে গেলে বলতে হয়—এ সৃষ্টির ...লা। জানিনা কেন মানুষের বিচারশক্তি দেখা দিয়েছিল অন্য প্রাণীদের ...েয় একটু বেশী। অন্তত আমরা, মানুষরা, তাই মনে করি। বিচার-...বুর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার জীবনের কতকগুলি মূল ...দর্শের সৃষ্টি করলে বা সন্ধান পেলে। সে আদর্শ পালনে যে আনন্দ, ...তে মানুষ উপলব্ধি করলে তার আপন মহিমা। আদর্শের জন্য সর্বস্বপণ ...ত্বের মহিমার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এর উপরই গড়ে উঠেছে মানুষের ...ন্নতম ইতিহাস। বিভিন্ন সংঘাতে পরস্পরের বিনাশে মানুষের ...্যুদ্ধের কাহিনীই রচিত হয়েছে, কোন গ্লানি তাকে স্পর্শ করতে ...রেনি। গ্লানি এসেছে আদর্শহীনতার এবং আদর্শচ্যুতিতে। আদর্শের ...্ন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে মানুষের ...্যতার পরিমাপ। বিপর্যয়ের পর মানুষ তার আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার ...ে বেশী কি কম রাজী এই দিয়েই মাপা যায় যে, কোনও বিপর্যয়ে ...্যের সভ্যতা এগিয়ে গেল কি পিছিয়ে গেল। আমাদের দেশে সভ্যতা ...উঠল চরম শিখরে, যখন স্বীয় আদর্শের জন্য ভারতীয় ঋষিগণ ...স্বপণ করে দুঃখকে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন। সেই সর্বত্যাগী ...গণ দুর্গম পাহাড় পর্বত, নদী-গিরি সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে ...কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ছুটে গিয়েছিলেন, আর সেই সর্বত্যাগী ...গণই রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বেদ, উপনিষদ, আজও যা মানব-...ত্যের প্রতীক। ত্যাগের বহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত সেই সভ্যতার গৌরবে ...মাদের দেশ এই চরম দুর্দিনেও মহিমান্বিত। আধুনিক পাশ্চাত্য ...ত্যতার মূলেও রয়েছে শত শত মহামানবের আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জনের ...হাস। ইউরোপীয় সভ্যতার কাহিনী পাঠাগারে, গবেষণাগারে, ...িরিশিখরে, মহাসাগরে, আকাশে, মেরুপ্রদেশে—নানাদিকে আদর্শের জন্য ...মানবদের আত্মবলিদানের কাহিনী।

আদর্শের জন্য ত্যাগের ভিত্তিতে মানুষ একদিকে যেমন বিজয়-রথ ...েয়ে চলেছে, আদর্শচ্যুতিতে ও আদর্শহীনতায় আদিম পাশবিক প্রকৃতি ...ে লোভ তাকে তেমনি পেছন দিকে টানছে। একদা কোন সুযোগে ...ভ এসে দুর্বাররূপে দেখা দিল মানবসমাজে, সভ্যতার খোলস্ প'রে ...ণিকবৃত্তিরূপে। মানুষের সমাজ সৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার ...রলে শ্রম-বিভাগের ও পরস্পর আদানপ্রদানের সার্থকতা। একজনের শ্রমের ...ল আর একজনকে পৌঁছে দেবার জন্যে আর এক শ্রেণীর লোকের সমাজে ...য়োজন হ'ল। এদের মিলল সুযোগ অন্যের তুলনায় কম পরিশ্রমে ...পেক্ষাকৃত বেশি পারিশ্রমিক নেবার। সমাজে বুদ্ধিমানদের মধ্যে যারা ...দর্শহীন অথচ অর্থলোভী, স্বভাবত তারাই এসে বেশি ভীড় করলে এই ...ৃত্তিতে। কম পরিশ্রমে বেশি অর্থোপার্জন; সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বেশি ...তিপত্তি। এই লোভের ভিত্তিতে সৃষ্ট বণিক-বৃত্তি অচিরে প্রসার লাভ ...রল। পৃথিবীর আজ যা কিছু দুঃখ দৈন্য গ্লানি; বণিকবৃত্তিনিহিত ...োভই হয়ত তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই পুঞ্জীভূত পাপই এনেছে ...জ পৃথিবীতে বিপর্যয়। লক্ষ লক্ষ সাধক প্রাণপাত সাধনায় মানুষের ...ান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যা কিছু ধন সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছিলেন, মানুষের ...ুর্ভাগ্য যে, আজ তা সব এই শ্রেণীর লোকের স্বার্থসাধনে ভৃত্যের মত ...নিয়োজিত। এই শ্রেণীর হাতে এই প্রতিপত্তি মানুষের কলঙ্ক, এই ...লঙ্ক মোচন যতদিন না হয়, ততদিন মানুষের দুঃখদৈন্যের অবসান হওয়া ...অসম্ভব।

আধুনিককালে জাতিগতভাবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ...সোভিয়েট রাশিয়া। পৃথিবীর অন্যতম নিপীড়িত জাতি রাশিয়া এই পন্থা ...অবলম্বন ক'রে রাশিয়ানদের দুঃখ দৈন্যের লাঘব করতে কতটা সক্ষম হয়েছিল, ...তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান যুদ্ধে, রাশিয়ানদের ব্যক্তিগত ও ...জাতিগতভাবে অসীম সাহসের সহিত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়। নিঃস্বার্থ-...পরায়ণ সোভিয়েটকর্মীর আদর্শ পালনে অপরিসীম নিষ্ঠা আজ জগৎকে ...চমৎকৃত করেছে। ইউরোপে ও আমেরিকায় কৃষ্টির পরিপালক আদর্শহীন ...বণিক সম্প্রদায়। রাশিয়ার এই উত্থান তারা স্বভাবতই ভাল চোখে দেখে ...নাই। কিন্তু তাদেরও এর প্রভাব এড়ান সম্ভব হয় নাই। কি ইউরোপ, ...কি আমেরিকা,—যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক দেশেই "সর্বপ্রকার ধন জাতীয় ...সম্পত্তি এবং প্রত্যেক প্রজার তাতে সমান অধিকার"—এই সাম্যবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। ব্রিটিশ পৃথিবীব্যাপী রাজ্য স্থাপন করেছে, কোটি কোটি নরনারীর উপর প্রভুত্ব ক'রে বিভিন্ন উপায়ে তাদের শ্রমলব্ধ আয়ের মোটা অংশ গ্রহণ করেছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের মাত্র ৪ কোটি লোকের অন্নবস্ত্র সমস্যারও সমাধান করতে পারে নি,—পুরানো প্রণালীর ব্যর্থতার এটাই চরম দৃষ্টান্ত। বর্তমান মহাসমরের ঠিক পূর্বে পৃথিবী ছিল এই ব্যর্থতার পীড়ায় জর্জরিত। পরিবর্তন দরকার,—মানুষ তা বুঝেছিল। এরূপ অবস্থায় একটা অছিলা করে সমরানল প্রজ্বলিত করা মোটেই কঠিন হয় নাই। তাই আজ দেখি, জ্ঞানে বিজ্ঞানে যাঁরা শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করেছিলেন, তাঁরাও দস্যুসুলভ হিংস্রভাবাপন্ন হয়ে নিজেদের সৃষ্টি বিনাশে উদ্যত হয়েছেন। ব্যর্থতার প্রজ্বলিত দাবানলে আজ দেশের পর দেশ ছাই হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সভ্যতা, মানুষের বিচারশক্তির ধারা যে বিপথ-গামী হয়েছে ইহা আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের মত।

সভ্যতার গতির মোড় ফিরিয়ে নূতনভাবে মনুষ্যসমাজ পরিকল্পনা করার কথা আজ পৃথিবীর সকল নেতার মুখেই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজেদের রুচি অনুযায়ী দেশের শাসনপদ্ধতি স্থাপনা করে হাতেকলমে নানাবিধ গবেষণা দ্বারা নিজেদের সভ্যতা বিকাশের চেষ্টার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আমাদের দেশ সেরূপ সুযোগ থেকে অনেকদিন বঞ্চিত। নূতন পরিকল্পনার কথা উঠলে আমাদের নেতাদের মধ্যে প্রচুর মতের অনৈক্য দেখা যায়। কেউ বা চান একটু পরিবর্তিত আকারে ব্রিটিশ বা আমেরিকান পদ্ধতি, কেউ চান সোভিয়েট পদ্ধতি, কেউ চান খাস ভারতীয় পদ্ধতি।

ব্রিটিশ বা আমেরিকান পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান অভিযোগ এই যে, ইহা বণিকবৃত্তিসুলভ লোভের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর পরিচালনা স্বভাবতই কতকগুলি আদর্শহীন স্বার্থপর লোকের হাতে গিয়ে পড়ে। সুতরাং একদিকে যেমন থাকে সমৃদ্ধি, অন্যদিকে থাকে নিদারুণ দৈন্য। এই পদ্ধতির পরিপোষকতায় মানবসমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে অশেষ কল্যাণ সাধন হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে সেরূপ সম্ভব হবে না—এরূপ সন্দেহেরও কোন হেতু নাই। সোভিয়েট পদ্ধতি অজস্র বাধা সত্ত্বেও এ কয়দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যা দিয়েছে কোন দেশের তুলনায় তা হেয় নয়। আমেরিকাতে ব্রিটিশ পন্থা অনুসরণে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির সমৃদ্ধি খুব বেড়েছে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট নীতির প্রভাবও হয়ত বা এর জন্যে খানিকটা দায়ী। আমেরিকার মত এই যে, সামান্য পরিবর্তন ক'রে নিলে তাদের নীতিই হবে জগতে শ্রেষ্ঠ। আমেরিকাতে রাষ্ট্রের এবং প্রজার সমৃদ্ধি অন্য দেশের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সোভিয়েট নীতি অনুসারে এই সমৃদ্ধির বণ্টন প্রজাদের মধ্যে আরও সমভাবে হলে রাষ্ট্রের ও প্রজার উন্নতি আরও বেশী হ'ত। তাছাড়া আমেরিকার পক্ষে এত সমৃদ্ধ হওয়া হয়ত সম্ভব হ'ত না, যদি-না পৃথিবীর চারিভাগের তিনভাগ লোক পরাধীনতায় বা অর্ধ-পরাধীনতায় নির্যাতিত থাকত। আমেরিকার সমৃদ্ধির মূলে শিল্প ও কৃষি। সোভিয়েট রুশিয়া এ কয়দিনে তার শিল্পে ও কৃষিতে যে আশ্চর্য রকম অগ্রসর হয়েছিল, সময় এবং সুযোগ পেলে আমেরিকার মত রুশিয়ারও সমৃদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর হ'ত না এরূপ মনে করবার কোন যুক্তি নেই। আমেরিকান ও ব্রিটিশ পদ্ধতিতে যা কিছু মানবের কল্যাণকর, সোভিয়েট পদ্ধতিতে তাতে কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটবে বলে মনে হয় না। অথচ ব্রিটিশ ও আমেরিকার বণিকবৃত্তিনিহিত পূর্বউল্লিখিত পাপ থেকে পৃথিবীর মুক্তি পাবার আশা সোভিয়েট পদ্ধতিতে আছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা বলি,—বস্তুতান্ত্রিক। বাইরের বস্তুতে মানুষকে এত ব্যস্ত রাখে যে, অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় বা প্রবৃত্তি বিশেষ হয় না। যদিও এই সভ্যতার মূলে আছে ইউরোপীয় মনীষীদের আদর্শের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনী, কিন্তু এই ত্যাগে সর্বসাধারণকে তেমনভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। বরঞ্চ বণিকবৃত্তির লোভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; সর্বসাধারণের উপর তার প্রভাব বিস্তারের ত কথাই নাই। মানুষ সেখানে ব্যস্ত এবং অতিরিক্ত ব্যস্ত। প্রাচ্যসভ্যতায় ব্যস্ততার বালাই ছিল না। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দান রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে রাস্তার ভিখারী পর্যন্ত গ্রহণ করবার সময় পেত। তাই দেখি মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা—যা হাজার হাজার বছর আগে তপোবনে আর্য ঋষিদের হাতে বিকাশলাভ করেছিল, প্রাচ্যের সাধারণ নরনারীর মনে আজও তার প্রতিষ্ঠা। সময় তার মাধুর্য হরণ করতে পেরেছে খুব কমই। শিক্ষা বিস্তারের অমানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতীচ্য সভ্যতায় এরূপ সম্ভব

হয়ে উঠে নাই। ঋষিগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে একনিষ্ঠ মনে যে সুন্দরের সাধনা করেছেন, প্রাচ্যে তাহাই প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, স্থাপত্যে। সেই সাহিত্যের, শিল্পের, স্থাপত্যের ও সংগীতের নিদর্শন এখনও সগৌরবে বর্তমান। এহেন সক্রিয় সভ্যতাকে জোর করে মিউজিয়মে রেখে ব্রিটিশ-আমেরিকান বা সোভিয়েট সভ্যতাকে ভারতবর্ষে চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

ভারতবর্ষে যেমন কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের একান্ত সাধনা চরম উৎকর্ষলাভ করে এবং তাহাদের সেই সাধনার ফল সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য বিস্তৃতি লাভ করে, পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও সেরূপ ঋষিগণ একান্ত মনে নিজের প্রেরণায় যা সৃষ্টি করেন, কিছুদিন পরে তাহাই সর্বসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রেরণা স্বীয় চেষ্টাবলে চরম উৎকর্ষলাভ এবং তাহাদের সাধনার ফল সর্বসাধারণের পাওয়ার সুবিধা এই দিকে ভারতবর্ষের পদ্ধতি ও ব্রিটিশ আমেরিকান পদ্ধতিতে খানিকটা মিল আছে। সোভিয়েট পদ্ধতিতে সেরূপ কোনও ব্যক্তির চরম উৎকর্ষলাভ সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও অনেক সন্দেহ আছে। রাশিয়ার বারোয়ারি সাধনায় আমাদের অন্যভাবে অভ্যস্ত মন সহজে সায় দিতে চায় না।

বণিকবৃত্তিজনিত লোভের তাড়নায় পাশ্চাত্য দেশে বস্তুসাধনা চলেছে ক্ষিপ্রগতিতে। মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির বেগও তদনুরূপ। বেগের মোহে পৃথিবীর এক একটা শ্রেষ্ঠ জাতি কি অদ্ভুত অন্যায় নীতি অবলম্বন করতে পারে তার সাক্ষ্য দেয় বর্তমান যুদ্ধ। সোভিয়েট পদ্ধতিতে বণিকবৃত্তির লোভের তাড়না নেই। কিন্তু বস্তু-সাধনার বেগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষ এই ব্যস্ততায় অনভ্যস্ত। হয়ত বা ধ্যানমগ্ন হিমালয় ভারতবর্ষে কোনওদিন বস্তুসাধনাকে আত্মিক সাধনা থেকে ক্ষিপ্রতর বেগে চল্‌তে দেয় নাই। বস্তুসাধনার ফল ক্ষণস্থায়ী। নানাবিধ বিপর্যয়ে ভারতবর্ষ আজ তার বস্তুসাধনার ফল থেকে বঞ্চিত। পূর্বেকার সাধনার পরিচয় পেতে হলে আজ মাটি খুঁড়ে দেখতে হয়। অনেক কাল হ'ল সেই সাধনার ধারা ছিন্ন হয়ে গেছে, আর নূতন করে কিছু হয় নি। তাই নিষ্ক্রিয় তামসিকতার ভারে আজ আমরা আচ্ছন্ন।

পাশ্চাত্যসভ্যতাপন্থিগণ দাবী করেন, বস্তুসাধনার বেগ আরও বাড়লে মানুষের অবসর মিলবে আরও বেশী এবং সেই অবসর সে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কাজে লাগিয়ে নিজের এবং দেশের উন্নতিবিধান করতে পারে। আদিম মানুষের খাদ্য আহরণেই সারাদিন কাটত। যন্ত্রপাতি সাহায্যে সে যখন সেই কাজটা সহজ ক'রে নিলে, তখনই সে সময় পেল আত্মিক উন্নতি করবার। বিশাল যন্ত্রপাতি সাহায্যে ইউরোপ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করবার কাজটা অনেক সহজ ক'রে নিয়েছে। আমেরিকাতে তা আরও বিশালতর ভাবে করা হয়েছে; আর সোভিয়েট রাশিয়াতে চেষ্টা চলছিল বিশালতম উপায়ে করবার। উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে আমেরিকায় আজ একজন লোকের পক্ষে ছয় সাতশত একর জমি চাষ আবাদ করা সম্ভব। আমেরিকাতে লোকের অবসর পাওয়া উচিত ছিল প্রচুর এবং বস্তুতন্ত্রের দিকে অন্য দেশকে আমেরিকা যতটা ছাড়িয়ে গিয়েছে, আত্মিক সাধনা করে সাহিত্য এবং চারুশিল্পেও ততটা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই। বস্তুতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সাধক আমেরিকা। তারা বলে মানুষের অবসর যেমন বাড়বে, প্রয়োজনও বাড়বে সেরূপ। সেই প্রয়োজন মিটাবার জন্যে সেই অবসর তখন কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন সৃষ্টি করা আর প্রয়োজন মিটান এই আনন্দেই আজ আমেরিকা মশগুল। তাই আটলাণ্টিক চার্টারে ভারতবর্ষের নাম উঠল কি না উঠল, কোন নিগ্রোকে কে লিঞ্চ করল কি না করল সে খবর রাখবার আমেরিকার সময় নেই। অর্থাৎ কর্মহীনতায় আজ ভারতবর্ষ যেরূপ তামসিকতার অন্ধকারে, কর্মবাহুল্যে আজ আমেরিকার অবস্থাও তদ্রূপ।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে ব্রিটিশ-আমেরিকান পদ্ধতির কতকটা মিল আছে। বণিকবৃত্তির অবাধ প্রতিযোগিতা নতুন সভ্যতারই অঙ্গ। কিন্তু আত্মিক সাধনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্তরের লোকের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বণিকবৃত্তিসুলভ লোভের নগ্নমূর্তি উৎকট ভাবে কোনদিন দেখা দিতে পারে নাই। পাশ্চাত্যে আত্মিক সাধনার প্রভাব ততটা হয় নাই। তাই এই ব্যাধি সেখানে বিস্তার লাভ করে সমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে আত্মিক সাধনা বণিগ্‌বৃত্তির লোভকে পূর্বের ন্যায় এতটা সংযত করে রাখবে বলে মনে হয় না। আর এতটা এর উপর নির্ভর করবারও এখন প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বণিকবৃত্তির উচ্ছেদসাধন সম্ভব সোভিয়েট রাশিয়া তা প্রমাণ করেছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের সভ্যতার এক বিশিষ্ট ধাপ। সমাজতন্ত্রবাদ বাদ দিয়ে কোনও দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি গড়বার উন্নততর উপায় মানুষ এখনও আবিষ্কার করে নাই। ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনপদ্ধতি গঠন করতে সমাজতন্ত্রবাদকে বাদ দেওয়া চল্‌বে না—এই সত্যকে অস্বীকার করে কিছু লাভ নেই। কিন্তু ভারতের সভ্যতার বিশিষ্ট ধারা—বস্তুতান্ত্রিক সাধনা ও আত্মিক সাধনার সমবিকাশ ও সমন্বয়—তাকে যে প্রকারেই হউক অক্ষুন্ন রাখতে হবে। বিশাল যন্ত্রপাতি আনবে স্বাচ্ছন্দ্য ও অবকাশ; মানুষ সেই অবকাশ কাজে লাগাবে তার পূর্ণ আত্মিক বিকাশে। আত্মিক বিকাশ হয় ব্যক্তিগত সাধনায়। সুতরাং যে সভ্যতায় সমষ্টিগত সাধনা ব্যক্তিগত সাধনার ও ব্যক্তিগত বিকাশের অন্তরায়, তা যতই জাঁকাল হউক না কেন বেশীদিন টিকতে পারে না। যে ব্যক্তিগত সাধনার ফলে ভারতের অসংখ্য শিল্পী মন্দির নির্মাণে, প্রস্তর খোদনে, শিল্পে, চিত্রে, সংগীতে, নৃত্যে—নানা দিকে প্রাণবান সুন্দরের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, যে ব্যক্তিগত সাধনার ফলে ভারতীয় ঋষি একান্তে নির্জন উপবনে বেদ উপনিষদ ইত্যাদি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে ব্যাঘাত ঘটলে বুঝতে হবে ভারতের সভ্যতা বিপদাপন্ন। সেই একান্ত সাধনার ধারা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও লোপ পায় নি। তাই সেদিনও সাধক চৈতন্যের, সাধক নানকের, সাধক রামকৃষ্ণের, সাধক দয়ানন্দের নির্জনে একান্ত উপাসনা ভারতের আদ্যোপ্রান্ত আলোড়িত করেছে। আজও দেখি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী, শ্রীঅরবিন্দ ইত্যাদি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আপন সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতের সেই আদিম আশ্রম উপবনকেই সাধনার কেন্দ্র করেন। বারোয়ারি সাধনায় ভারতের প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করে না। সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে, কি দর্শন বিভাগে রবীন্দ্রনাথ কিম্বা শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্ট হয় না, কিম্বা সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদপ্তরেও গান্ধীজী সৃষ্ট হয় না। তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয় ভারতের সেই সনাতন আশ্রমে সেই সনাতন সাধনা। বিরাট যন্ত্রাদির সাহায্যে সমষ্টিগত সাধনা ভারতের এইরূপ বিকাশের অন্তরায় হতে পারে, অনেকেই এই সংশয় পোষণ করেন। এই দুই সাধনা একে অপরের বিরুদ্ধধর্মী সন্দেহ নাই। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে এক সাধনা চলে তীব্রবেগে পূর্ণতার অপেক্ষা না রেখে, অপরের লক্ষ্য পূর্ণতায়। তার প্রয়োজনের তাগিদ নাই। গতি মন্থর। একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুয়ের সামঞ্জস্য রাখা অতীব দুরূহ। শিল্পী দিনের কিছুভাগ বিরাট যন্ত্রাদির সঙ্গে নিজেকে জুড়ে একদিকে তৈরি করবে বস্তুর সংখ্যা, সমাজের তাগিদে আর বাকিটা নিয়োগ করবে স্বপ্রকাশে, যাতে থাক্‌বে না সমাজের কোন প্রয়োজনীয় বালাই, সংখ্যা গণনার হিসাব। শিল্পীর সেই স্বপ্রকাশের প্রেরণা জোগাবেন তাঁরা, যাঁরা সঙ্গোপনে আশ্রমে উপবনে আজীবন সাধনায় নিমগ্ন থেকে সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেন। ব্যষ্টির ও সমষ্টির এরূপ বিকাশেই মানুষ অগ্রসর হতে পারে তার কৃষ্টির পথে। লোভের ভিত্তির উচ্ছেদ সাধন করতে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের সাহায্য নিতে হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু নূতন পদ্ধতি গড়বার সময় ভারতের সেই চিরন্তন সাধনার ধারাকে ছিন্ন করা যুক্তিসংগত হবে বলে মনে হয় না।

অন্তরাগ

পরিমল মুখোপাধ্যায়

এ বাড়িটার এই বারান্দাটুকুই লোভনীয়। গলিটা প্রশস্ত বলে, চারপাশে বাড়ি থাকলেও, আকাশ দেখতে ছাদে যেতে হয় না। এইরকম একটি ছোটখাটো বারান্দাওয়ালা বাড়ির জন্যে লতার বড় লোভ ছিল। প্রায়ই হেসে বলত, এখন ভাড়াটে বাড়িতে একটিমাত্র ঘর নিয়ে সে বাস করছে বটে, কিন্তু আভাসের মাইনে বাড়লে একটি আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকবে। তারপর? তারপর যা করবার তা লতার মনেই আছে। চুপ করে যেত লতা। কিন্তু কথাটা না বলে সে থাকতে পারত না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলত, জীবনে একটি বাড়ি সে করে যাবেই, বারান্দাওলা বাড়ি। বেশ আকাশ দেখা যাবে, আশেপাশের বাড়ির মেয়েদের সাথে গল্পগুজব করা যাবে, রাস্তায় কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাও দেখা যাবে। খুশিতে ছোট্ট মেয়েটির মত হাততালি দিয়ে উঠত লতা। বেচারী তখনো জানত না আভাসের প্রাক-বৈবাহিক ইতিহাস। জানবেই বা কি করে। দাম্পত্য জীবনের মাত্র পাঁচটি বৎসর সে কাটিয়ে গেছে আভাসের সাথে। তাই সে জানতে পারে নি যে, আনুষঙ্গিক আর একটি কারণে তত বেশি না হলেও রেসের ঘোড়াদের পেটে আভাস টাকা ঢেলেছিলেন অজস্র এবং সেই জন্যে তিনি প্রতি মাসে মাইনের অর্ধেকও পেতেন না। এখন লতার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হয় তাঁর। কী দিয়ে তিনি সুখী করতে পেরেছিলেন তাকে? অর্থ দিয়ে নয়, বয়স দিয়ে ত নয়ই। কুড়ি বৎসরের বড় এক বৃদ্ধের হাতে একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে কি করে তুলে দিতে পেরেছিল তার বাপ-মা। নিজের বিশৃঙ্খল ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মর্মমূলে ছিল ব্যর্থতা, লতাকে দিয়েও দিয়েছিলেন তিনি তাই। দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এখন আর তার মুখখানা ভাল করে মনেও পড়ে না। একটা ফটোও যে—

বাবা, কখন এসেছ তুমি?—'শিখি' (সংক্ষিপ্ত 'শিখিনী') এসে বললে, এই দেখ বাবা, এ বাড়িতে এসে একদিনেই একটি বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছি। কই ভাই, ভেতরে এস না। আহা, ওকি লজ্জা!

'শিখি' গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এল, বলল, শিখা, ওই সামনের বাড়িতে থাকে। নামে নামে কি চমৎকার মিল বল ত আমাদের। ওকি, তুমি যে কথাই বলছ না।

মুখখানা যেন চেনা-চেনা, লতার মুখের আদল আছে কি! শিখার দিকে চেয়ে অতীত দিনের স্মৃতির গহনে ফিরে যাচ্ছিলেন আভাস। সচকিত হলেন মেয়ের কথায়, বললেন, কি বলব, বল?

কি আর বলবে, আমাদের সঙ্গে গল্প-টল্প—তোমার খাবার দিয়ে যায় নি বাবা? রাধুদি'টা যে কী!—বলতে বলতে বেরিয়ে গেল 'শিখি'।

বস।—আভাস বললেন।

শিখা একটি চেয়ার গ্রহণ করল।

আকাশের দিকে চেয়ে আভাস প্রশ্ন করলেন, তোমরা ওই বাড়িতেই থাক বুঝি?

হাঁ।—মৃদু উত্তর হল।

কিছুক্ষণ নিরবতা।

বাড়িতে তোমাদের আর কে কে—

দু-দুবার উনুনে আঁচ দিয়েই রাধুদি'র আজ মেজাজ গরম হয়ে গেছে, প্রথমবার ধরেনি। —হাসতে হাসতে এসে 'শিখি' আরাম-কেদারার হাতলের ওপর রেকাবিটা রাখল—পরোটা আর হালুয়া।

তোর বন্ধুকে দিলি নে?—বলে আভাস বোধ হয় খাবারটা শিখারই দিকে এগিয়ে দেবার উদ্যোগ করছিলেন।

'শিখি' হাত তুলে স্নেহ-তিরস্কার করল, আমার অতিথি, আমি সৎকার করব এখন। তুমি খাও ত।

আর দ্বিরুক্তি না করে আভাস আহারে প্রবৃত্ত হলেন।

এস ভাই। বলে বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল 'শিখি'।

বড় বাচাল হয়েছে ত 'শিখি'টা। লতার ঠিক বিপরীত। শিখা মেয়েটি কিন্তু বেশ। একটু ব্রীড়াময়ী না হলে মেয়েদের যেন মানায় না।

নিজের জন্যে জুতো আর এক জোড়া কাপড় এবং 'শিখি'র জন্যে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে এলেন আভাস। কাপড় তাঁর অনেকদিন থেকেই ছিল না, জুতোজোড়াও জীর্ণ হয়ে এসেছিল। 'শিখি' কতদিন তাঁকে তিরস্কার করেছে, তিনি তাঁর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সচেতন ও আগ্রহশীল নন্ বলে। 'শিখি' আজ তাঁর কাপড়-জুতো দেখে আনন্দিত হবে। একটু বেশি দাম দিয়েই আভাস তাঁর প্রসাধন কিনে এনেছেন আজ—অনেকদিন পরে। লতার মৃত্যুর পর বিচ্ছেদ-যাতনা যখন ফিকে হয়ে এসেছিল, তখন আভাস কয়েক বৎসর একটু সৌখীন বেশ-বিন্যাস করেছিলেন। বহু দিন পরে আজ আবার তিনি—'শিখি' খুশিই হবে। এখন ত তাঁর সংসারের অবস্থা সচ্ছলই বলতে হবে। কিন্তু 'শিখি' না বকুনি দেয়—এই সেদিনও ত আভাস তার জন্যে একখানা ভাল শাড়ি কিনে এনেছেন।

নীচে কলরব শোনা গেল। 'শিখি', শিখা আর সম্ভবত তার ভাইয়ের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর।

বাবা, এসেছ তুমি?—এক ঝলক দমকা হাওয়ার মত 'শিখি' এসে ঘরে ঢুকল।

একটা জিনিস কিনে এনেছি আজ, কি বল ত?—রহস্যের হাসি হাসলেন আভাস।

কোথায়?—'শিখি' চঞ্চল।

ওই যে দেখ 'তাকে'।

জুতো আর কাপড়ের বাক্স দুটো নামিয়ে নিয়ে এল 'শিখি'। শিশুর মত খুশি সে।

বাঃ, অতি চমৎকার হয়েছে বাবা কাপড় আর জুতো তোমার। তা নয়, তুমি কেবল খোট্টাই জুতো আর থলে কিনবে।

আরও একটা ভারি মজার জিনিস এনেছি। আভাসের মুখে হাসির আভাস, ওই যে ওই 'তাকে' দেখ।

'শিখি' বাক্সটা নামিয়ে নিয়ে এসে খুলতেই দেখে শাড়ি। একটু গম্ভীর হয়ে উঠল সে।

পরক্ষণেই কলস্বরে বলে উঠল, আচ্ছা, তুমি কী বল ত! এই সেদিন কিনে আনলে একখানা, আবার আজই--

এখন গেছলে কোথায় বল? এত দেরি?—প্রশ্ন করলেন আভাস।

একটু সিনেমা দেখতে গেছলুম বাবা। আভাসের চুলে সস্নেহে আঙুল চালিয়ে দিল 'শিখি'।

কার সঙ্গে গেছলে?

কেন? আমরা আমরাই।

না—না, এ ভাল কথা নয়। আজকাল চোর বদমায়েসদের আড্ডা হয়েছে রাস্তায়, দেখতে পাও ত খবরের কাগজে। একজন বড় কাউকে সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল।

বেশ যা হোক! তুমিই ত বল—গট্‌মট্ করে ট্রামে-বাসে উঠবে, একা একা স্কুল-কলেজে যাবে, সারা কলকাতা—

খবরের কাগজটা সকালে পড়া হয় নি, 'শিখি'কে আনতে বললেন আভাস। এনে দিয়ে 'শিখি' বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে সতর্ক স্বরে বলল, তুমি কী বল ত বাবা! ওদের সামনে ওগুলো দেখাতে আছে? কি রকম ভাবে তাকিয়ে দেখছিল ওরা—আহা, বড় মায়া হচ্ছিল আমার।

কিছু বলতে পারলেন না আভাস, তাকিয়ে রইলেন এক-দৃষ্টে, নিজেকে নিজেই যেন বুঝতে পারছিলেন না তখন।

বাবা যদি অনুমতি দেন—প্রকাশ করল 'শিখি', তাহলে শাড়িটা শিখাকে দান করা যায়।

তা দিক না 'শিখি', আপত্তি নেই। তবে একটা উপলক্ষ্য থাকা চাই ত, নইলে ওরা অপমান বোধ করে অপমান ফিরিয়ে দিতে পারে দান গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে।

'শিখি'র জন্মদিন সামনে। পাওয়া গেল উপলক্ষ্য। 'শিখি' তার মনের পেখম তুলে নিঃশেষে আত্মদান করতে চায় বন্ধুকে। 'শিখি' চঞ্চল। মার গাম্ভীর্য সে পায় নি। শিখা মেয়েটি কিন্তু বেশ গম্ভীর। বাক্‌সংযম ভালবাসে আভাস। কিন্তু শিখার বয়স একটু বেশি হলে গাম্ভীর্য মানাত ভাল।

ট্রাম হতে নামতে দুজনে দেখা। নমস্কার-বিনিময় হল।

শিখার বাবা মৃদু হেসে বললেন, আরে, আমরা এক গাড়িতেই ছিলুম!

এক গাড়িতে, কিন্তু বিভিন্ন কামরায়। আভাসও হাসলেন একটু।

বয়স অনুপাতে অবশ্য আমারই আগে আগে যাওয়া উচিত ছিল। তবে হরিজন আমরা—

কত বয়স আপনার?—আভাস প্রশ্ন করলেন।

তা, তিপ্পান্ন পেরিয়েছি বোধ হয়। আপনার?

এর জন্যে আভাস প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমে একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সামলে নিলেন পরক্ষণেই। একান্ন আর জানাতে পারলেন না, বললেন, সাতচল্লিশ হবে বোধ হয়।

কিন্তু চুল ত আপনার এর মধ্যেই বেশ পেকে গেছে দেখছি।

আভাস নিরুত্তর।

কোথায় বেরিয়েছিলেন?—আবার প্রশ্ন করলেন সুধীর।

এমনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলুম, রবিবারের বাজার। আপনি?

একটি পাত্র দেখতে গেছলুম।—বললেন সুধীর, লেখা-পড়া ত শেখাতে পারলুম না মেয়েটাকে। তা পাত্রটি পাওয়া গেছে ভালই। আই-এ পাশ করেছে, সামান্য একটু চাকরিও করছে, বয়েসও বেশি নয়। দেখি, এখন কি হয়।

বাড়ির কাছে এসে ওঁরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলেন।

তিপ্পান্ন বছর বয়সেও সুধীরবাবুর একটিও চুল পাকে নি, আর আভাসের মাথা সাদা হয়ে গেছে বললেই হয়। 'শিখি'র দোষ কি— চুলে কলপ্ লাগাতে বা অন্য কোন উপায়ে চুল কালো করতে বলে বলে সে হয়রান হয়ে গেছে। এখন আর বলে না। সত্যি, বড় বিশ্রীই দেখায় চুল পাকলে।

দশটা বাজল ঘড়িতে।

আহার সেরে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে 'শিখি' বললে, বাবা, বড় দুষ্টু হয়েছ তুমি আজকাল। রবিবার হলেই তোমার ফিরতে দেরি হয়।.....আচ্ছা বাবা, 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ' কথাটার মানে কি? এক জায়গায় পড়তে পড়তে পেলুম আজ।

মানে,—শ্রান্ত কণ্ঠ আভাসের, পঞ্চাশ পেরোলেই বনে যাবে।

তার মানে, সন্ন্যাসী হতে বলেছে?

হ্যাঁ। আমার খাবার দিয়েছে রাধুদি'?

দিয়েছে—

আভাস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে, এমন কি এই সেদিনকার মুসলমান আমলেও রূপচর্চার সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া-জর্জরিত দরিদ্র বাঙলা দেশে এখন আর সে সুযোগ কই? ভালই করেছেন, প্রসাধনের সঙ্গে মনেরও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে, কলপে আর চুল ক'দিন কালো থাকবে—বড় জোর, চার পাঁচ দিন। শুনতে পাই, কবিরাজী তেলটেল পাওয়া যায় ভাল। দেখুন না খোঁজ করে।

কি যেন বলতে গিয়েও আভাস বলতে পারলেন না।

তবে কি জানেন,—সুধীর হেসে উঠলেন সরবে, আমাদের ত সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে। আর ক'দিনই বা। নাঃ,

আপনি কথা বলছেন না একটাও। বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে—বেশ লোক ত আপনি।

উন্মনা আভাস সচেতন হলেন, ম্লান হেসে বললেন, কি বলব বলুন। দেখি আবার ওদিকে কদ্দুর হ'ল।—বলে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় স-কলরবে 'শিখি' এসে প্রবেশ করল শিখার হাত ধরে টানতে টানতে। পিছনে শিখার ভাই।

শিখাকে কাপড়টা কেমন মানিয়েছে বলত ত বাবা? ও আমার চেয়ে অনেক সুন্দর, নয়? আর, মাসিমা আমাকে এই উপহার দিয়েছেন, দেখ।

বুকে আটকানো মিনে-করা ছোরা সেফ্‌টি পিনটা দেখাল 'শিখি'।

আমি কিছুতেই নোব না, মাসিমা বললেন, 'জন্মদিনে নিতে হয়'। আমিও বললুম, 'তাহলে ওই বা আমার কাপড় পরবে না কেন'? তখন মিটমাট হল।

শিখা, কাকাকে প্রণাম কর্ পায়ে হাত দিয়ে। সুধীরবাবুর স্বর কি একটু গম্ভীর? আভাস সচকিত হলেন। 'মাসিমা' ও 'কাকা' সম্বোধনও আজ এই প্রথম শুনলেন তিনি।

শিখা এসে প্রণাম করল। যন্ত্রচালিতের মত আভাস তাঁর দক্ষিণ হাতটি শিখার মাথায় স্পর্শ করালেন।

আর থাকতে পারলেন না আভাস, একদিন শুধালেন দুষ্টী মেয়েকে, শিখা আর আসে না রে? দেখতে পাই না ত অনেকদিন।

না বাবা,—কন্যা বলল, আমার জন্মদিন উৎসবের পর আর আসে নি। তা ছাড়া, ওর একটু জ্বরও হয়েছে দু-তিনদিন হল।

ব্যাপার কি?—ভাবতে লাগলেন আভাস।

অবশেষে অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাজিত হলেন তিনি। হাতে একরাশ আঙুর-বেদানা দিয়ে সকন্যা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ডাকলেন, শিখা মা, কই গো?

সুধীর বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন।

ঘরে ঢুকে শিখার শয্যার অনতিদূরে একটি মাদুরের উপর ওঁরা বসলেন। 'শিখি' গিয়ে বসল বন্ধুর পাশে। গৃহকোণের ক্ষীণ প্রদীপটির মতই স্তিমিতভাভা শিখা। শিখার মা বেরিয়ে গেলেন ও ভাইটি পড়া বন্ধ করল।

আজ সকালে শুনলুম 'শিখি'র মুখে যে, শিখা-মার অসুখ। ওরা দুটিতে একসঙ্গে না থাকলে বাড়ি যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ফাঁকা বাড়িতে থাকতে না পেরে আজ চলে এলুম।

অসুখ এমন বিশেষ কিছু নয়। সুধীর বললেন, সর্দিজ্বর বলেই মনে হয়। তবে ও-ও ত আমার সংসারের অনেকখানিই। ও একদিনও পড়ে থাকলে আমাদের অসুবিধে হয়। তা, এসব আবার আনতে গেলেন কেন।

সামান্য কিছু ফল। এটাকে কর্তব্য বলতে যদি নাও রাজী হন, লৌকিকতা নিশ্চয়ই বললেন। লৌকিকতা করার অধিকার সকলেরই আছে এবং তাতে আমায় বাধা দেবেন না নিশ্চয়?

কিছুক্ষণ চুপচপ।

সেই সম্বন্ধটির কি হল, শিখার বিয়ের?—আভাস জিজ্ঞাসা করলেন।

নাঃ, সে হবে না। বড় খাঁকতি ওদের। আমার সাধ্যে কুলোবে না।

যদি কিছু না মনে করেন,—আভাস সসংকোচে বললেন, (সুধীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে), আমি কিছু সাহায্য করতে পারি ধরুন, শ' তিন-চার। তারপর আপনার সময়মত—

আর বলতে হ'ল না। সুধীর মুচকে হাসলেন শুধু। আভাসের মাথা নুয়ে পড়ল।

দিন দশেক পরে।

অফিস থেকে ফিরে এসে আভাস ঘরের মধ্যে ইজি-চেয়ারটিতে গা এলিয়ে দিতেই কোথা হতে ছুটে এল 'শিখি'—ক্রন্দসী 'শিখি'।

আভাসের কোলে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল সে, কাল পর্যন্ত মুখপুড়ী আমায় কিছু বলে নি। আর আজ ইস্কুল থেকে এসে দেখি, নেই। কোথায় গেছে, কেউ কিছু বলতে পারল না। ওরা কেন উঠে গেল বাবা, কেন গেল?

মুখ তুলে তাকাল 'শিখি' আভাসের দিকে। তার দুটি চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল তখন।

নিষ্পন্দ নিমীলিত আঁখি, আভাস একটি হাত শুধু রাখতে পারলেন মেয়ের মাথায়। মেয়েটা মায়ের মতই হয়েছে। লতার একটা ফটো আছে না তার দিদির কাছে?

বেতার আলোক স্তম্ভ

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

অনেকদিন থেকেই আলোকস্তম্ভ (Light house) দিয়ে আমরা দিক নির্ণয়ের কাজ করে থাকি। নির্দিষ্ট জায়গায় খুব উঁচু মাস্তুলের ওপর বাতি জ্বালিয়ে জাহাজদের এবং এরোপ্লেনদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা কোথায় আছে। এই বাতি আবার কখন জ্বলে, কখন নেভে—জ্বলা-নেভাটা নিয়ন্ত্রিত করে জায়গাটার অবস্থান বৈমানিকদের এবং নাবিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সাধারণ বাতির আলোকস্তম্ভের গোটাকতক অসুবিধা রয়েছে। খুব দূর থেকে এই আলোকস্তম্ভ হয়ত দেখা যাবে না, সমুদ্রের ওপর আলোকস্তম্ভ খাড়া করা সম্ভব নয়, তাই শুধু তীরের খুব কাছাকাছিই এই আলোকস্তম্ভ দিক নির্ণয়ের কাজ দেবে। এ ছাড়া বৃষ্টি কুয়াসায় আলো হয়ত অস্পষ্ট হয়ে গেছে—হারিয়ে যাওয়া বৈমানিকের বা নাবিকের অবস্থার কথা ভাবতেই গা শিহরিয়া ওঠে।

প্রত্যেক বেতার গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে একটা করে আকাশ-তার (aerial) লাগান থাকে। বেতার ঢেউ যখন এই আকাশ-তারের ওপর এসে পড়ে, তখন এই আকাশতারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাফেরা করতে থাকে। গ্রাহকযন্ত্রের সুর মিলিয়ে এই যাতায়াতি বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে গানবাজনা বা খবরাখবর ধরে নেওয়া হয়। আকাশতারে কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ না থাকলে, গ্রাহকযন্ত্রের লাউডস্পীকার বা হেডফোনেও কোন শব্দ শোনা যাবে না। বেতার দিক নির্ণয় গ্রাহকযন্ত্রে সাধারণ আকাশতার না রেখে একটা ফ্রেম (frame) বা লুপ্ (Loop) আকাশতার রাখা হয়। এর মস্ত একটা সুবিধা এই যে, এটার দিক নির্ণয় করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু প্রত্যেক জাহাজে এবং এরোপ্লেনে দামী বেতার দিক নির্ণয় গ্রাহকযন্ত্র না রেখে কোন জায়গায় যদি একটা বেতার আলোকস্তম্ভ রাখা যায়—অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। এই বেতার আলোকস্তম্ভ থেকে নাবিকরা এবং বৈমানিকেরা শুধু সাধারণ বেতার গ্রাহকযন্ত্র দিয়েই নিজেদের অবস্থান কি করে ঠিক করে নিতে পারে, সেই ব্যাপারটাই দু'চার কথায় এই পরিচ্ছেদে বলছি।

এর আগে Loop আকাশতারের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যেদিক থেকে বেতার ঢেউ আসছে, Loop আকাশ-তারটি সেই দিকে মুখ (Perpendicular to the direction of propagation of Radio waves) করে রাখলে, Loop আকাশ-তারটি কোন-রকম বৈদ্যুতিক শক্তি বেতার গ্রাহক যন্ত্রে দিতে পারে না। তাই কোন শব্দই গ্রাহকযন্ত্র থেকে শোনা যায় না। ঠিক এর উল্টা ফল হবে যদি Loop আকাশতারটাকে ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়ে ধরা যায়, অর্থাৎ যেদিক থেকে বেতার ঢেউ আসছে, Loopটিকে তার সাথে সমান্তরাল (Parallel) করে রাখলে, গ্রাহকযন্ত্র থেকে রাখলে Loop আকাশতারও মাঝামাঝি বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে দেবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, Loop আকাশতারটা ঘোরালে গ্রাহকযন্ত্রের শব্দও আস্তে জোরে হবে, আর Loop-টিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি, কোন দিক থেকে বেতার ঢেউটি আসছে। বেতারের সাহায্যে দিক নির্ণয় করার মোটামুটি তথ্য হল এই।

Loop বা Frame আকাশতারটা ঘোরালে যেমন বেতার গ্রাহকযন্ত্রে শব্দ কখন জোর হয় কখন আবার আস্তে হয়, প্রেরক যন্ত্র (Transmitter) থেকেও সেইরকম আকাশতার ঠিক মত ব্যবহার করে কোন নির্দিষ্ট দিকে জোরাল বেতার ঢেউ কিম্বা খুব ক্ষীণ বেতার ঢেউ পাঠান সম্ভব। প্রেরকযন্ত্রের আকাশতার এমনভাবে সাজান যেতে পারে যাতে করে হয়ত কোন নির্দিষ্ট দিকেই বেতার ঢেউ চলতে থাকবে—ঠিক তার উল্টা দিকে কোন
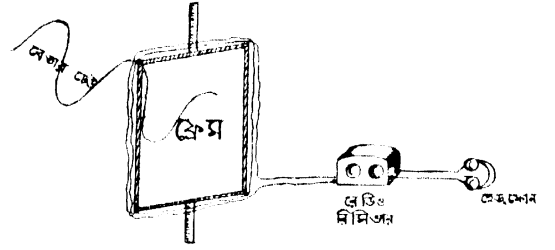
ঢেউই যাবে না। কলিকাতা থেকে বেতারে হয়ত আমরা দিল্লীর সঙ্গে কাজ করবো—আমরা চাই না যে রেঙ্গুনে এসব খবর শুনুক। কলিকাতায় তাহলে প্রেরকযন্ত্রের আকাশতার এমন-ভাবে সাজাতে হবে যাতে কলিকাতার প্রেরিত কোন বেতার ঢেউই রেঙ্গুনের দিকে এগুবে না—সবগুলিই পাড়ি দেবে দিল্লীর দিকে। সাধারণ আলো যেমন প্রতিফলিত করিয়ে একদিকে ফোকাস করান যায়, এও অনেকটা সেইরকম। এখন কলিকাতার আকাশতারের সরঞ্জামটা যদি আস্তে আস্তে ঘোরান যায়, জোরাল বেতার ঢেউগুলোও আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে। দিল্লী থেকে সরে গিয়ে ক্রমে হয়ত বম্বের ওপর দিয়ে, মাদ্রাজের ওপর দিয়ে রেঙ্গুনে এসে পড়বে। তারপর আরও ঘুরিয়ে গেলে, ঢেউগুলো হয়ত চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে, দার্জিলিংএর ওপর দিয়ে আবার আস্তে আস্তে দিল্লীতে ফিরে আসবে। এর ঠিক উল্টা ফলটা সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে—যেখানে কিছু শোনা যায় না, এরকম জায়গাটাও যেন ঘুরতে থাকবে অর্থাৎ কিনা কখন রেঙ্গুনে কিছু শোনা যাবে না, কখনও চট্টগ্রামে আবার কখন দিল্লীতে।

প্রেরক যন্ত্রের আকাশ-তার থেকে একটানা (Continuous) ঢেউ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে চারিদিকেই, তবে সব-দিকের ঢেউ সমান শক্তিশালী নয়—একদিকের ঢেউ সবচেয়ে
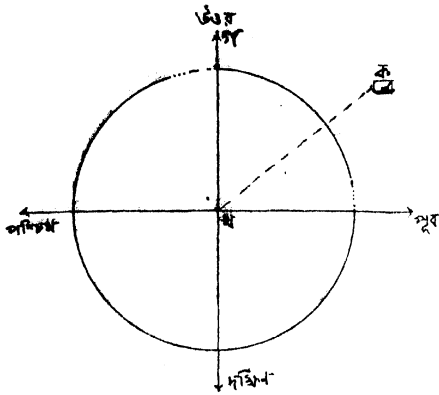
হয় বলে এই কম জোরাল বেতার ঢেউও ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে এই কম জোরাল বেতার ঢেউ ঠিক যখন উত্তর দিকের ওপর এসে পড়ে তখন প্রেরক যন্ত্র থেকে একটা সংকেত করে' সব নাবিকদের এবং বৈমানিকদের জানিয়ে দেওয়া হয় সেই মুহূর্তটা। কম জোরাল বেতার ঢেউ যখন আবার ঘুরে ঠিক কোন জাহাজ বা এরোপ্লেনের ওপর এসে পড়ে, সে মুহূর্তটা সে ত জানতেই পারবে কারণ তার গ্রাহকযন্ত্রে যে একটা একটানা শব্দ হচ্ছে সেটা কমতে কমতে ঠিক ওই মুহূর্তে সবচেয়ে কমে গিয়ে আবার বাড়তে থাকবে। কাজের মধ্যে তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে শুধু সময়টা দেখা—কতক্ষণে কম জোরাল বেতার ঢেউটা ঠিক উত্তর দিক থেকে জাহাজটার বা এরোপ্লেনটার ওপর এসে পড়ছে। প্রেরকযন্ত্রের আকাশতারের সরঞ্জামটা হয়ত ঘোরান হয় মিনিটে একবার, এ ছাড়া প্রেরক-যন্ত্রটা ঠিক কোথায় অবস্থিত, এটা ম্যাপে দেখান থাকলে, নাবিকদের বা বৈমানিকদের নিজের অবস্থান বুঝে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না।

উদাহরণ দিয়ে জিনিসটাকে আরও সহজ করে বলি। সাফোক্ (Suffock)এর অরফড্‌নিস্ (Orfordness) জায়গায় এই রকম ঘুরন্ত আকাশতারওয়ালা একটা বেতার আলোকস্তম্ভ রয়েছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই বেতারস্তম্ভটা তৈরী করা হয়েছে—নির্দিষ্ট ঢেউ-দৈর্ঘ্য ১০৪০ মিটারে এর প্রেরকযন্ত্র একটানা ঢেউ ছাড়ে। আকাশতারের সরঞ্জামটা ঘুরছে ঠিক মিনিটে একবার করে' আর যখন সবচেয়ে কম শক্তিশালী বেতার-ঢেউ উত্তর দিকে আসে তখন মোরস্ (Morse) সাংকেত—টরে টরে টক্কা টরে টরে..............পাঠান হয় আবার এই কম শক্তিশালী বেতার-ঢেউ যখন ঠিক পুব দিকে আসে তখন.................... এই সংকেত করা হয়। শেষ টরেটা পাঠান হয় যখন কম জোরাল ঢেউটা একেবারে ঠিক উত্তর কিম্বা পুব দিকের সংগে এক 'লাইনে' এসে যায়। ছবিতে দেখান হয়েছে 'ক' যেন একটা জাহাজ সমুদ্রের ওপর, 'খ' হচ্ছে এই বেতার আলোকস্তম্ভ। 'খগ' লাইনটা যদি উত্তরদিক দেখায় তবে 'খক' লাইনটা 'খগ'র সংগে যে কোণ (angle) করবে, সেটাই হচ্ছে জাহাজটার আপেক্ষিক স্থিতি (Bearing). মনে করা যাক, উত্তর-দিকের সংকেত হবার পর, ১০ সেকেণ্ড লাগল জাহাজের গ্রাহকযন্ত্রে সবচেয়ে কম শক্তিশালী বেতার ঢেউটা এসে পৌঁছুতে। এই সময়টা জানা কিছুই শক্ত নয়। একটা স্টপ্‌ওয়াচ (Stop-watch) টিপে চালিয়ে দেওয়া হয় যে-মুহূর্তে উত্তরদিকের সংকেতের শেষ 'টরেটা' শোনা যায়। তারপর গ্রাহকযন্ত্রে শোনা হয়,—শব্দটা আস্তে আস্তে কমছে! ঠিক যে মুহূর্তে শব্দটা সবচেয়ে কমে গিয়ে আবার জোর হতে থাকে সেই মুহূর্তে স্টপ্‌ওয়াচটা থামিয়ে দেওয়া হয়, কতক্ষণ স্টপ্‌ওয়াচটা চলেছে, সেই সময়টুকুই এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে ১০ সেকেণ্ড। এখন কোন জিনিস পুরো একবার ঘোরা মানে হচ্ছে—৩৬০ ডিগ্রী ঘোরা, আর এটা এই বেতার আলোকস্তম্ভ ঘুরছে এক মিনিটে বা ৬০ সেকেণ্ডে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—১০ সেকেণ্ডে প্রেরকযন্ত্রের আকাশতার নিশ্চয়ই ৬০ ডিগ্রী ঘুরেছে আর এই ৬০ ডিগ্রীই হচ্ছে জাহাজটার আপেক্ষিক স্থিতি (Bearing)। এই যে আপেক্ষিক স্থিতি বের করা হল, এতে জাহাজে কোন বেতার দিক নির্ণয় গ্রাহক-যন্ত্রের (Wireless Direction Finding Receiver) দরকার হল না। শুধু ঘড়ি এবং সাধারণ গ্রাহকযন্ত্র
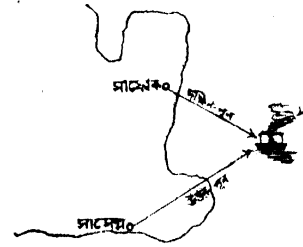
দিয়েই অবস্থান জেনে নেওয়া হল! পুবে যখন কম শক্তিশালী বেতার ঢেউটা আসে তখন যে সংকেত করা হয়, তার দরকার হল এইজন্যে যে, জাহাজটা যদি বেতার-আলোকস্তম্ভের উত্তর দিকের খুব কাছাকাছি থাকে, উত্তর দিকের সংকেত সে ভালভাবে শুনতে পাবে না—পুবের সংকেত ধরেই সে তখন তার অবস্থান ঠিক করে নেবে।

সাফোক (Suffolk)এ এই রকম চার মিনিট বেতার আলোকস্তম্ভ 'জ্বালিয়ে' রেখে, আট মিনিট 'নিভিয়ে' দেওয়া হয়—অর্থাৎ চার মিনিট সংকেত করে আট মিনিট কোন কিছু পাঠান হয় না। এই আট মিনিট বিরতির সময় ট্যাঙ্গমের (Tangmere), সাসেক্স (Sussex) থেকে এই রকম একই বেতার ঢেউ এবং সংকেত পাঠাতে থাকা হয়। জাহাজরা এই বেতার আলোকস্তম্ভ থেকে ও নিজেদের অবস্থান জেনে নিতে পারে। এইরকম বেতার আলোকস্তম্ভ থেকে, দেখা গেছে, ২৫০ মাইল পর্যন্ত জাহাজরা বেশ ভালভাবেই দিক্ নির্ণয় করে নিতে পারে।

নাবিকেরা কম্পাস দিয়েও দিক নির্ণয় করে থাকে। দিনে সূর্য এবং রাত্রে ধ্রুবতারা—এইসব দেখেও তারা তাদের দিক ঠিক রাখে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা খুব বেশী কুয়াসা

(শেষাংশ ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
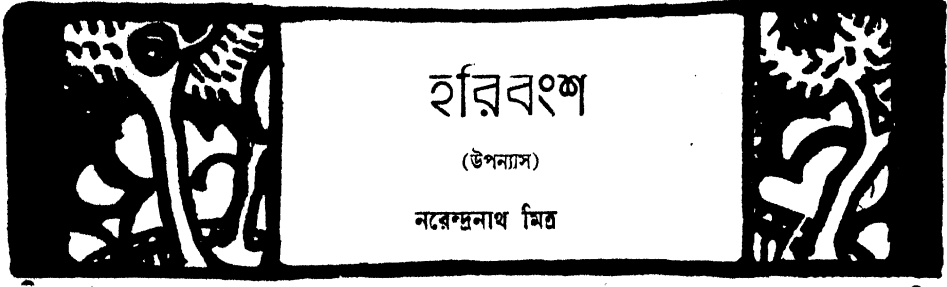
১৬

পথ থেকেই চোখে পড়ল অত বেলাতেও বিনোদের মা তাদের বারবাড়ির উঠানে বসে বসে ঘুঁটে দিচ্ছে। মুরলী পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় ওকি করছেন খুড়িমা, পাকসাক করবেন কখন এর পরে?'

বিনোদের মা মুখ তুলে তাকাল, 'কে বাবা মুরলী, তাই তো ভাবি এমন প্রাণ-কাড়া ডাক আর কর। যাও বস গিয়ে। এই দুপুর বেলায় তোমাকে বুঝি ও পথ থেকে ধরে নিয়ে এলো। ওই ওর এক স্বভাব। পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই হোল, তাকে হাত ধরে টেনে আনবে বাড়িতে। তার সময়ও নেই, অসময়ও নেই। এদিকে বাড়ির তো এই ছিরি।'

ঘরদোরের অবস্থায় বিনোদের দারিদ্র্য নগ্নভাবেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবও পীড়া দেয় চোখকে। মনে হয় বিনোদের যেন এসব দিকে লক্ষ্যই নেই মোটে। এত ঔদাসীন্য কেন বিনোদের? স্ত্রী মারা গেছে বলে? কিন্তু জীবদ্দশায় স্ত্রীর ওপর তার যে খুব বেশি আকর্ষণ ছিল তেমন তো কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি কিংবা স্ত্রী মরে যাওয়ার পরও বেশি দিন বিনোদ শোকে অভিভূত থাকে নি। আর একটু এগুতে মুরলী দেখতে পেল বারান্দায় একটা জীর্ণ মাদুরের ওপর কাত হয়ে শুয়ে নন্দকিশোর কি একটা মোটা বইর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। ভারি অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ তাঁর কাত হয়ে থাকবার ভঙ্গিটি। বিনোদের এই বারান্দাটুকুর মত এমন আরাম আর শান্তিপ্রদ জায়গা যেন পৃথিবীতে আর নেই। মুরলীর পায়ের শব্দে নন্দকিশোর চোখ তুলে তাকালেন। তারপর স্নিগ্ধ অমায়িকভাবে একটু হেসে বললেন, 'এসো।'

মুরলী বলল, 'আসছি প্রভু, বিনোদের কি কথা আছে সেরে আসি।'

ঘরের পশ্চিম কানাচে বড় একটা আম গাছ, চালের ওপর বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। তার ছায়ায় একটা জলচৌকিতে মুরলীকে বসতে দিয়ে বিনোদ সযত্নে তামাক সাজতে লাগল। যেন নিতান্ত তামাক খাওয়াবার জন্যই মুরলীকে সে ডেকে এনেছে। তা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। হুঁকোটা মুরলীর হাতে দিয়ে বিনোদ বলল, 'না, ভাবছি নতুন করে আবার একটা দোকান টোকানই দেব বাজারে।' কথার ভঙ্গিতে মনে হয় বিনোদ যেন আর কাউকে আশ্বাস দিচ্ছে কিংবা আর কারো ওপর অনুগ্রহ করছে।

মুরলী মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো, যাই করো, কিছু একটা করাই তো দরকার।'

বিনোদ তার প্রস্তাবের অসম্ভতায় নিজেই এবার একটু হাসল, 'যদিও জানি, দুচার দিনের মধ্যেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাড়ি আসতে হবে। তা ছাড়া টাকাই বা কই। ঘরে থাকবার মধ্যে তো আছে খোল আর করতাল।'

সর্বনাশ, বিনোদ কি তার দোকানের মূলধন চাইবে নাকি মুরলীর কাছে। তারই এই ভণিতা।

বিনোদ বলে চলল, 'কিন্তু আমাদের দ্বারা চলবে কারবার! আমার বাবাও কি কম চেষ্টা করেছিলেন তোমার বাবার মত। কিন্তু সে লোকই আলাদা। ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম, থাকিও ব্যবসায়ীদের মধ্যে; কিন্তু ব্যবসা জিনিসটা কোনদিন ভাই মাথায় ঢুকল না, ঢুকবেও না কোনদিন।'

মুরলীর মনে হোল অক্ষমতা নিয়ে বিনোদ যেন খানিকটা গর্বই বোধ করছে কিংবা অন্য কারো অভাবে নিজেই সস্নেহ অনুকম্পায় নিজের পিঠে হাত বুলাচ্ছে।

'তুমিও যেমন, দোকান খুলব আমি। নেড়া ফের যায় আবার বেলতলায়। ওসব হাঙ্গামা মোটেই সহ্য হয় না আমার। ঠিক তোমার মত ধাত। তার চেয়ে এই বেশ আছি খোল বাজিয়ে বেড়াই দেশে দেশে। এক বেলার খোরাক জোগাড় হলে আর এক বেলার জন্য ভাবি না। দু'এক বেলা না জুটলেও বেশি কিছু যায় আসে না। কিন্তু মুসকিল হয়েছে এই গোঁসাই গোবিন্দর জন্য। ওঁকে তো আর উপবাসী রাখতে পারি না। আর গোঁসাইও যেমন, এই ভিখারির বাড়ির মাটি কামড়ে থাকবেন আমি বলি, গোঁসাই উপোষ ক'রে মরতে হবে যে। গোঁসাই বলেন, তাই সই। তোর রাধামাধবের দোরে উপোষ ক'রে মরেও সুখ আছে।'

সেই বোকা বিনোদ। কিন্তু এত কায়দা ক'রে কথা বলতে শিখল কবে। যাক, মুরলী আশ্বস্ত হোল। ব্যবসার মূলধন বিনোদ তার কাছে চাইবে না। অবশ্য চাইলেই যে সে দিয়ে দিত তা নয়। কিন্তু এমন অসম্ভব প্রস্তাব আছে যা শুনলেও খারাপ লাগে।

মুরলী বলল, 'বেশ তো দু' একদিন উপোস রাখলেই

পারো গোঁসাইকে, কেমন সুখ তা বুঝতে পারবেন'। বিনোদ জিভ কাটল, 'ছি ছি গোঁসাই গোবিন্দকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে নেই মুরলী। ভাবলাম, এ বেলার সেবার জোগাড়টা তোমাদের বাড়ি থেকেই ক'রে নিয়ে আসি, আর ভাবা মাত্রই দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। একেই বলে 'গুরুর ইচ্ছা'।

না বিনোদ বেশি কিছু কোন দিন চায় না। কিন্তু যেটুকু চায় সেটুকু চাইবার যেন তার বেশ অধিকার আছে এমনই ভাবেই চায়। কারণ সে তো তার নিজের জন্য চাচ্ছে না, চাচ্ছে তার রাধা-মাধব, গোঁসাই গোবিন্দ অতিথি সজ্জনের সেবার জন্য। পাড়া-পড়শীরা তা দেবে না কেন। কিন্তু বিনোদ কি একথা একবারও ভাবে না যে তার বাড়ি গোঁসাইগোবিন্দ এসেছে তাতে অন্যের কি, অন্যে কেন সে খরচ বইতে যাবে? কিন্তু যেহেতু পাড়া-পড়শীরা দু' একবার দয়া ক'রে এমন চালিয়েছে, সেইজন্যই বিনোদ যেন একথা ধরে নিয়েছে চিরকালই তারা এমন চালাতে বাধ্য। কেন তারা চালাবে না? ভক্ত এবং উচ্চাঙ্গের কীর্তনীয়া বলে যে বিনোদের নাম আছে, দেশবিদেশে সেই যশ কি তার পাড়াপড়শীরাও ভোগ করে না, তার জন্য তার পাড়াপড়শীরাও কি ধন্য মনে করে না? সে যদি দাড়িপাল্লা হাতে নিয়ে দোকান-দারি ক'রতে বসত তাতে পাড়ারই কি অপমান হ'ত না? দারিদ্র্যের জন্য আর্থিক অক্ষমতার জন্য বিনোদ যেন তেমন আর সঙ্কোচ বোধ করে না আজকাল, এ যেন তার লীলা। অন্যের কাছে সে যেন তার প্রাপ্য জিনিসই চেয়ে নেয়, চাইবার যেন তার অধিকার আছে। আর সে তো টাকা পয়সা কিচ্ছু চাচ্ছে না, গোঁসাই গোবিন্দের সেবার জন্য দু' এক বেলার সিধাই কেবল সে চেয়ে নিচ্ছে। তাতে লজ্জা সঙ্কোচের কি আছে।

মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও মুখে মুরলী বলল, 'এই কথা। ঘটা দেখে আমি ভেবেছিলাম, কত গোপন কথাই না যেন তোমার আছে। তা এর জন্য পথ থেকে আমাকে বাড়িতে ডেকে আনবার কি দরকার ছিল। ললিতার মার কাছে গিয়ে চাইলেই পারতে, চাল ডাল যা দরকার হোত।'

বিনোদ বলল, 'হয়তো ভাবতে লোকটা নিজের জন্যই বুঝি চাচ্ছে। কিন্তু নিজের জন্য মোটেই আমি কাতর নই। কেবল বাড়ির ওপর গোঁসাই আছেন এই জন্য। আর তা তো স্বচক্ষেই দেখে গেলে।'

মুরলী মনে মনে হাসল। গোঁসাইর সেবার সঙ্গে প্রসাদ পাবার আশাটাও যদি জুড়ে না থাকত তা হ'লে কি গুরু সেবার এত গরজ থাকত বিনোদের? কিন্তু বিনোদকে যে তার কাছে হাত পাততে হচ্ছে এতে মুরলী যেন খুশিই হ'ল মনে মনে। নাস্তিক, লম্পট বলে আড়ালে আবডালে গাল দিক বিনোদ, মুরলীর চাল ডালে কোন দোষ নেই। চাল ডালের প্রয়োজন যদি বিনোদ বোধ না ক'রত তা হ'লে কি কালকের ব্যাপারের পরও বিনোদ তার সঙ্গে এমন সহজভাবে কথা বলতে পারত। কিন্তু আর একটা কথা ভেবে মুরলী বেশ স্বস্তি বোধ করল। বিনোদ যখন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে তখন কাল রাতের কাণ্ডটাকে অনেকেই হয়তো সত্যি সত্যি ঠাট্টা ব'লে মনে করবে। না হ'লে বিনোদের মত সাধু লোক আজই কি তার সঙ্গে কথা বলত? সত্যি সত্যি বিনোদ কি ঠাট্টা বলেই মনে করেছে জিনিসটাকে? করতেও পারে। মুরলীর মনে হোল লোক হিসাবে বিনোদ বেশ সরলই। আর আশ্চর্য, মুরলীর নিজেরই যেন ব্যাপারটাকে এখন নিতান্তই ঠাট্টা কৌতুকের বলে মনে হচ্ছে। আর সত্যি সত্যি, নবদ্বীপ যা বলেছে, রঙ্গীর সঙ্গে তো তার ঠাট্টারই সম্পর্ক।

১৭

পুকুর ঘাট থেকে স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিল মঙ্গলা। খাটো ঘোমটার ভিতর থেকেই তার চোখে পড়ল হন হন করে বিনোদ যাচ্ছে তাদের বাড়ির দিকে। একটা বড় রকমের পুঁটলিতে কি যেন বাঁধা। আর একটু আসতেই লম্বা বেগুনের একটা বোঁটা সেই পুঁটলির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যে মঙ্গলার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। বিনোদ আজ আবার 'সিধা' আদায় করতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ ঘৃণায় আর বিতৃষ্ণায় মঙ্গলার সমস্ত শরীর যেন রি-রি করে উঠল। কাল তার ওখানে গিয়ে বিনোদ যেমন দাঁড়িয়েছিল এক সের চালের জন্য, আজ হয় তো তেমনি আর একজনের সামনে গিয়েও বিনোদ তার রূপগুণের প্রশংসা করছিল। বিনোদের চেহারা ভালো, তার কণ্ঠ মধুর। তাছাড়া ভক্ত কীর্তনীয়া হিসাবে তার নামও বেশ আছে। তার মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভালো লাগে। নিজের চেহারা আর সুকণ্ঠকে এমন ক'রে ভাঙিয়ে খাচ্ছে বিনোদ। সাধু আর অসাধু সমস্ত পুরুষ কি একই। মুরলী আর বিনোদের মধ্যে এই শুধু প্রভেদ, মুরলী তোষামোদ করে রক্তমাংসের শরীরটার জন্য আর বিনোদ কেবল নিরামিষ চাল ডালেই সন্তুষ্ট থাকে।

মঙ্গলার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় বিনোদ নিজেও যেন একটু থমকে গিয়েছিল। একটু থেমে আবার চলতে শুরু করায় মঙ্গলা হঠাৎ যেন সামনের গাছটাকে লক্ষ্য ক'রে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'শুনুন'। জায়গাটা বেশ নির্জন। লোকের যাতায়াতের পথ থেকে একটু দূরে। বিনোদ যেন রোমাঞ্চ অনুভব করল সর্বদেহে। এমন চমৎকার গলা মঙ্গলার। গান গাইতে জানলে ভারি সুন্দর হোত। অথচ পাড়াপড়শীর কাছে কর্কশ ভাষিণী ঝগড়াটে বলে মঙ্গলার বেশ অপবাদ আছে। বিনোদ নিজেও যে তো কতদিন শুনেছে তার উচ্চকণ্ঠঃ শুনেছে আড়াল থেকে। সময় সময় তা যে এমন মিষ্টি লাগতে পারে তাতো সে ভেবে দেখেনি। এই নির্জনে মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিনোদের বুকটা যেন কেঁপে উঠল। একবার ভাবল না শুনেই চলে যায়। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

মঙ্গলা যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আরো অস্ফুট কণ্ঠে নিজের মনেই যেন বলল, 'ওমা, বিনোদ ঠাকুরপো, আমি ভেবেছিলাম ও পাড়ার বৈরাগী ঠাকুর।'

জবাব শুনবার জন্য মঙ্গলা একটু দাঁড়ালো। তারপর একটু দ্রুত পায়েই যেন চলে গেল। বিনোদ চট ক'রে শ্লেষটা ঠিক

ধরতে পারেনি, যখন বুঝতে পারল তখন মঙ্গলা বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। বিনোদ একবার সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

বৈরাগীর মত বিনোদ যদি এ বাড়ি ও বাড়ি চেয়ে চিন্তেই বেড়ায় তাতে মঙ্গলার কি? বিনোদ তো নিজের জন্য চায় না। আর অন্য বাড়ি না গিয়ে বিনোদ যদি আজও মঙ্গলার কাছে গিয়েই চাইত, কিছু কি গলত মঙ্গলার হাত দিয়ে? কিন্তু মঙ্গলার বিরুদ্ধে নিজের মনটাকে এমন উগ্র করতে গিয়েও যেন বিনোদ পেরে উঠল না। শ্লেষ সত্ত্বেও মঙ্গলার মিষ্টি কণ্ঠই বিনোদের কানে বাজতে লাগল। মঙ্গলার আঘাতের মধ্যেও কোথায় যেন আনন্দ আছে, কেমন একটু আত্মীয়তার স্পর্শ আছে যেন। বিনোদ যে কাজকর্ম না ক'রে, নিজে সেইভাবে রোজগার না ক'রে বৈরাগীর মত অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে নেয়, আত্মসম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখে না এটা একমাত্র মঙ্গলার মনেই লাগে ব'লে সে অমন শ্লেষ ক'রতে পারে। শ্লেষের তীক্ষ্ন খোঁচাটা যেন তেমন ক'রে কিছুতেই আর গায়ে বিঁধল না বিনোদের, বরং তার সরস মাধুর্যটুকুই ভারি উপভোগ্য লাগতে লাগলো। না, সত্যিই এবার কাজকর্মের দিকে মন দেবে বিনোদ, নিজে রোজগার করবে, এমন ক'রে আত্মসম্মান আর ক্ষুণ্ণ করবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে এই যে গুরুগোবিন্দের সেবার জন্য পাড়াপড়শীর বাড়ি থেকে চাল ডাল তরিতরকারি বিনোদ আনে এ কি তারা একেবারে অমনিই দেয়? বিনা পয়সায় যে তারা বিনোদের গান শোনে সে কি একেবারে কিছুই না? তার যদি উচিত দাম বিনোদ আদায় ক'রতে যায় তা'হলে কি তাদের এই এক আধ মুটো চাল ডালে কুলোয়? আর বিনোদ কি কেবল মানুষের বাড়ি থেকে নেয়ই, কতজনকে কি দানও করে না? এবারকার কীর্তনের সমস্ত বায়নাটাই তো তার এক ভক্ত বন্ধুর বাড়ি থেকে খরচ ক'রে এলো। না-হ'লে কি এমন নিঃস্ব খালি হাতে ফিরতে হয় বিনোদকে? কতবার যে কত বড়লোকের বাড়িতেও বায়না বিনোদ ছেড়ে দিয়ে এসেছে, সে খবর এরা একেবারেই জানে না, "হরিনামের আবার দাম কি কর্তা", বিনোদ অবশ্য বিনয় ক'রে সে সব জায়গায় বলেছে। কিন্তু হরিনাম অমূল্য হোক, তার গলার তো একটা দাম আছে, তার পরিশ্রমের তো মূল্য আছে একটা। কিন্তু লোকে কেবল চাল ডালের হিসাবটাই দেখে, বিনা পয়সায় কত জায়গায় সে যে গান গেয়ে বেড়ায় তা দেখে না। এবার থেকে যেখানেই সে গলা ছাড়বে, কোনখান থেকেই গুণে গুণে পয়সা আদায় না ক'রে ছাড়বে না।

বাড়িতে উঠতেই নন্দকিশোর তাকে দেখে বললেন, 'কি আবার কতগুলি জুটিয়ে এনেছ কোত্থেকে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন আমার জন্য। না হয় একদিন হরিবাসরই করা যেত সবাই মিলে।'

বিনোদ জিভ কেটে বলল, 'ছি ছি কি যে বলেন', তারপর একটু ম্লান হাসল বিনোদ, 'আনলুম জুটিয়ে টুটিয়ে', বৈরাগীর আবার ভিক্ষায় লজ্জার কি।'

নন্দকিশোর সোৎসাহে উঠে বললেন, 'ঠিক বলেছ বিনোদ, ঠিক বলেছ, আমরা তো বৈরাগীই। কেবল ভেখ নেওয়াটাই বাকি, লজ্জা! লজ্জা যে একটা বড় বাধা বিনোদ। কিন্তু 'ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

(ক্রমশ)

বেতার আলোক স্তম্ভ

(৪১৩ পৃষ্ঠার পর)

থাকলে সূর্য এবং ধ্রুবতারা এরা কোন সাহায্যেই আসে না। কম্পাসের মস্ত একটা অসুবিধা এই যে, দিক নির্ণয়ের কাজে সে শুধু পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এই কথাই বলতে পারে, কিন্তু জায়গাটার অবস্থান সে কখনই বলে দিতে পারে না। বেতার আলোকস্তম্ভে এসব কোন অসুবিধাই নেই। সমুদ্রের ওপর একটা জাহাজ জানতে পারলে, সাফোক (Suffolk) এর বেতার আলোকস্তম্ভ থেকে সে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে, তারপরই আবার যদি সে তার দিক নির্ণয় করে সাসেক্সের (Sussex) বেতার আলোকস্তম্ভ থেকে জানতে পারে সে এই বেতার অলোকস্তম্ভের ঠিক উত্তর-পূর্ব কোণে আছে তবে ম্যাপে তার ঠিক অবস্থান সে অনায়াসে জেনে নিতে পারে।

'হারিয়ে যাওয়া' এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা বেতার বিজ্ঞান এক রকম মুছে ফেলেছেই বলা যেতে পারে—বিমান চালনায় বেতার দিক-নির্ণয় যন্ত্র এত বেশী প্রয়োজনীয় জিনিস যে, একে বাদ দিয়ে বিমান চালনার কথা ভাবাই যায় না।

জার্মানীর যুদ্ধ

ভানু গুপ্ত

মহাযুদ্ধের বর্তমান অধ্যায়ে নাৎসী জার্মানীর সংগ্রামকে মূলত আত্মরক্ষামূলক বলা যায়। তার আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের এই প্রারম্ভ। এ কথা থেকে নানারকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'তে পারে, সেজন্যে বিষয়টা কিছু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার।

অনেকে সহজ কল্পনায় একেবারে ধরে নিয়েছেন যে, জার্মানী আক্রমণ ক্ষমতা হারিয়েছে এবং ভবিষ্যতে সে ক্রমাগতই পেছনে হট্‌তে থাক্‌বে ও মার খেতে থাক্‌বে। অনেকে আবার বিপরীত মতাবলম্বী। তাঁরা শীতকালের দোহাই দিয়ে বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা আশা করছেন, বসন্ত সমাগমে আবার জার্মান জয়বার্তায় আগের মতোই দিক মুখরিত হবে। এই দুই অভিমতই অত্যন্ত সরল বুদ্ধি প্রণোদিত। যুদ্ধের মতো জটিল বিষয়ের অত সরল বিচার চলে না।

জার্মানীর আক্রমণ ক্ষমতা এখনো বিলুপ্ত হয় নি। আগামী বসন্তে বা গ্রীষ্মে সে এক বা একাধিক স্থানে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু সে আক্রমণগুলির প্রকৃতি কি হবে তাই বিচার্য। মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত গত বছর অক্টোবর পর্যন্ত যা ছিল এখন তা বদ্‌লে গেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জার্মাণ স্ট্র্যাটিজি বদ্‌লাতে বাধ্য। যে স্ট্র্যাটিজি ছিল আক্রমণমূলক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার গভীর পরিবর্তনে তার রূপান্তর হয়েছে আত্মরক্ষায়। সমস্ত রণক্ষেত্রের ইঙ্গিত তাই। ভবিষ্যতে জার্মানী যে আক্রমণ করবে, সমগ্র স্ট্র্যাটিজির পরিপ্রেক্ষিতে তা হ'বে আত্মরক্ষামূলক। কবে জয়-পরাজয় হবে বা যুদ্ধের অবসানকালে কোন্‌ পক্ষের কি অবস্থা হবে সে কথা স্বতন্ত্র।

জার্মানীর পক্ষে অবস্থা পরিবর্তনের প্রধান কারণ, লাল-ফৌজের বিস্ময়কর সামর্থ্য ও সোভিয়েট রণাঙ্গনে তাদের মারাত্মক পাল্টা আঘাত। দ্বিতীয় কারণ ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রের বর্ধমান সামরিক শক্তি ও ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় তাদের অবতরণ ও মিশর-লিবিয়ায় সাংঘাতিক পাণ্টা আক্রমণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে জার্মান স্ট্র্যাটিজির হিসেবের যে গরমিল হয়েছে তার তুলনা নেই। জার্মানী তার প্রায় সমগ্র সমর শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে। লালফৌজের বিরুদ্ধে এ যাবৎ লড়াই চালিয়ে এসেছে ১৭৯ ডিভিসন জার্মান সৈন্য এবং হাঙ্গারীয়ান, রুমানিয়ান, স্লোভাক, ফিনিশ ও স্প্যানিশ সৈন্যের ৬১ ডিভিসন। জগতের ইতিহাসে কোনো দেশ কখনো এই রকম বিপুল শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। সুতরাং জার্মানরা স্বভাবতই আশা করেছিল যে, খুব শীগ্গিরই সোভিয়েট শক্তি ধ্বংস হ'য়ে যাবে, এমন কি তারা সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল—দশ সপ্তাহ। কিন্তু দশ সপ্তাহ কেন, দশ মাসের দ্বিগুণ সময়েও লালফৌজ ধ্বংস হ'ল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তার আপেক্ষিক সামরিক ক্ষমতা হ্রাস তো পেলই না, আরো বাড়ল। পক্ষান্তরে জার্মান শক্তি (আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়তই) কমতে থাক্‌ল। প্রথম বছরে লাল ফৌজ দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীকে মস্কো
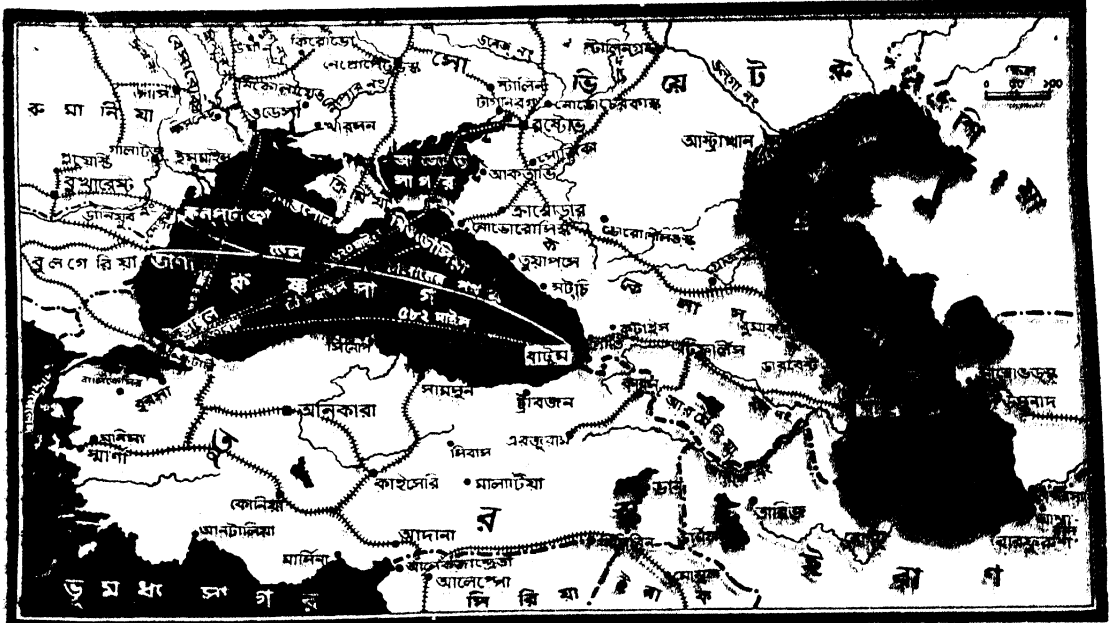
ও লেনিনগ্রাডে ঢুকতে দিল না, তারপর শীতকালে পাল্টা আক্রমণ করে' মধ্য রণাঙ্গনে জার্মানদের খানিকটা হটিয়ে দিল। দ্বিতীয় বছরে লাল ফৌজ স্ট্যালিনগ্রাড শহরের উপর দশ লক্ষ ফাশিস্ট সৈন্যের আক্রমণ তিন মাস ধরে রুখে রাখল এবং শীতকালে আবার যে পাল্টা আক্রমণ করল তা ব্যাপকতায়, তীব্রতায় ও কৌশলে প্রথম বছরের পাল্টা আক্রমণকে ছাড়িয়ে গেল। এই পাল্টা আক্রমণ এখনও চলছে। স্টালিনগ্রাড ও ককেশাস অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ জার্মান ও জার্মান-সহযোগী সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং সমগ্র জার্মান বাহিনী অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। মধ্য রণাঙ্গনেও লাল ফৌজ ভেলিকি লুকি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নাৎসী বাহিনীকে বিপদগ্রস্ত করেছে। উত্তরে লাল ফৌজ এবার ১৬ মাস পরে লেনিনগ্রাদকে অবরোধমুক্ত করেছে।

আকাশ হইতে ত্রিপোলী শহরের দৃশ্য

জার্মান বাহিনী প্রথম বছরে প্রায় দুই হাজার মাইল জুড়ে যুগপৎ আক্রমণ চালায় এবং রুশিয়ার মধ্যে শ' পাঁচেক মাইল ঢুকে যায়। দ্বিতীয় বছরে তারা শুধু দক্ষিণ সোভিয়েট রণাঙ্গনে আক্রমণ চালায় এবং সমস্ত বসন্তে ও গ্রীষ্মে তারা মোট বড় জোর শ' তিনেক মাইল অগ্রসর হয়। গত শীতে লাল ফৌজ যে সব জায়গা পুনরধিকার করেছিল, সেগুলোর মধ্যে এক রস্টভ ছাড়া আর কোনো জায়গা জার্মানরা ছিনিয়ে নিতে পারেনি। আর এখনকার অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় বছরে জার্মানদের এই অভিযান মরীচিকারই পশ্চাদনুসরণ করেছে। কারণ তারা যে কুরস্ক খারকভ থেকে অভিযান আরম্ভ করেছিল, লাল ফৌজ ইতিমধ্যেই তার কাছে পৌঁছে গেছে। তার উপর ফল হয়েছে এই যে, জার্মানদের লক্ষ লক্ষ শ্রেষ্ঠ সৈন্য খোয়া গেছে, বিপুল পরিমাণ সমরোপকরণ সোভিয়েট সৈন্যের দখলে গেছে এবং বিরাট জার্মান ককেশাস বাহিনী ঘেরাও হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, বসন্ত ও গ্রীষ্মের চোখ-ধাঁধানো জয় আসলে পরাজয়েরই নামান্তর হতে পারে। আগামী গ্রীষ্ম-বসন্তের সম্ভাব্য জার্মান জয় সম্বন্ধে সেজন্যে কিছু সতর্ক হওয়া উচিত।

স্টালিনগ্রাডের উপর জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণের সমসাময়িক ঘটনা মিশরে নাৎসী বাহিনীর অভিযান। একদিকে স্ট্যালিনগ্রাড-ককেশাস, অন্যদিকে সুয়েজ। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের উপর তখন বিরাট জার্মান সাঁড়াশি-ব্যূহ উদ্যত। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার ৭০ মাইল পশ্চিমে জেনারেল রোমেল প্রতিহত হলেন। তারপর সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণের প্রায় সংগে সংগে আরম্ভ হ'ল বৃটিশ পাল্টা আক্রমণ। রোমেল দ্রুতগতিতে পিছনে হটতে থাকেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি ১৪০০ মাইল পশ্চাদপসরণ করে' আজ লিবিয়া থেকেও বিদায় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করে। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ইওরোপে মিত্রপক্ষের অভিযান করবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মানী সেই বিপদ ঠেকাবার জন্যে তিউনিসিয়ায় সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হয়। সেখানে জার্মানরা ইংগ-মার্কিন বাহিনীকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করছে। রোমেলও তাঁর সৈন্য নিয়ে তিউনিসিয়ায় চলে গেছেন। পৃথক্‌ভাবে লিবিয়ার শক্তি নিয়োগ করা অসমীচীন মনে করেই তিনি নিশ্চয়ই এই কাজ করেছেন! তিউনিসিয়া হাতছাড়া হ'লে হিটলার-শাসিত ইওরোপে প্রত্যক্ষ অভিযানের যে বিপদ দেখা দেবে, সেটা আগে ঠেকানোই বড় কথা।

সামরিক পরিস্থিতির সমগ্র চিত্রটা বদলে গেছে। আঘাত করার চেয়ে আঘাত সামলানোর প্রশ্নই এখন জার্মানীর পক্ষে বৃহত্তর। নতুন আঘাতে চমক লাগাবার সুযোগ জার্মানীর আর বিশেষ কিছু নেই। হয় তাকে সেই সোভিয়েট রণাঙ্গনেই আবার আক্রমণ করতে হবে, নয় আফ্রিকায়। কিন্তু দুই জায়গাতেই তারা তাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে দেখেছে। আবার নতুন ক'রে, বিশেষত সোভিয়েট রণাঙ্গনে নতুন আক্রমণের জন্যে আগের মত শক্তি নিয়োগ করা জার্মানদের পক্ষে সম্ভব বা সমীচীন হবে কি না, সন্দেহের বিষয়। পক্ষান্তরে, লালফৌজ জার্মান বাহিনীকে বিপদজালে জড়িয়ে ফেলেছে এবং জার্মানীর

পক্ষে অন্যান্য রণাঙ্গনে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এদিকে বৃটেনের উপর জার্মান অভিযান-সম্ভাবনার বদলে ইওরোপের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ সমগ্র উপকূলের যে কোনো স্থানে মিত্রপক্ষের অভিযান-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, আক্রমণের "আকস্মিকতা" এখন মিত্রপক্ষের হাতে। আক্রমণোদ্যোগী হ'য়ে (যেমন তিউনিসিয়ায় করছে) ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে বিব্রত রাখতে পারে কিংবা খাস ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উদ্যম থেকে মিত্রশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে তুরস্ককে আক্রমণ ক'রে বস্‌তে পারে। কিন্তু এসব আক্রমণ সমগ্রের বিচারে আত্মরক্ষারই উপায়। অবশ্য মরিয়া হ'য়ে নাৎসী

নাৎসীদের তীব্র বিমান আক্রমণের মধ্যে আর্কটিক সমুদ্র দিয়া ব্রিটিশ কনভয় রাশিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে

বিমান আক্রমণে বৃটেনের পতন হবে, নাৎসীদের এই ভুল হিসেব থেকে কালক্রমে এই রকম উল্টো অবস্থার সৃষ্টি এক্ষেত্রেও হয়েছে।

কিন্তু জার্মানীর চরম আত্মরক্ষার অবস্থা ততদিন আস্‌তে পারে না, যতদিন খাস ইওরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি না হয়। সেই অবস্থাটাই জার্মানী ঠেকাবে। সেই উদ্দেশ্যে সে সোভিয়েট রণাঙ্গনে ভবিষ্যতে কোনরকম আক্রমণ দ্বারা প্রতিপক্ষকে ব্যাপৃত রাখবার চেষ্টা করতে পারে কিংবা আফ্রিকায় জার্মানী ভবিষ্যতে অতীতের চেয়ে আরও অনেক বেশী ভুল চাল দিতে পারে। ইতিমধ্যে তার হাতে সব চেয়ে ভালো অস্ত্র হ'ল ইউ-বোট। মিত্রশক্তির বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাট সমুদ্র-ব্যবধান এবং সমুদ্র-সংযোগের উপর তাদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে। এই সংযোগ নষ্ট করবার জন্যে জার্মানী তার সাবমেরিন-শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে। সর্বপ্রকারে এই বিপদ দমনে অগ্রোদ্যোগী না হ'য়ে বৃটেন ও আমেরিকার উপায় নেই।

পিচ্ছিল
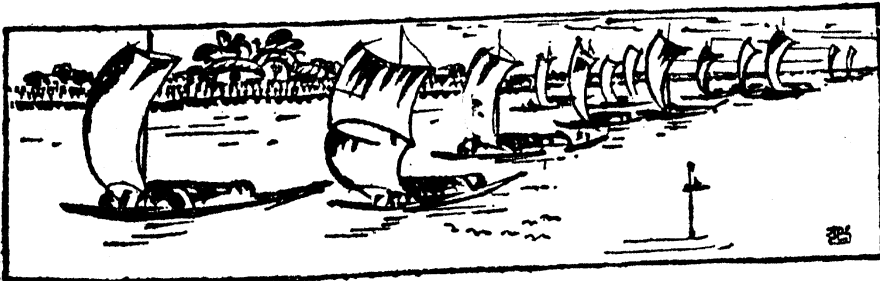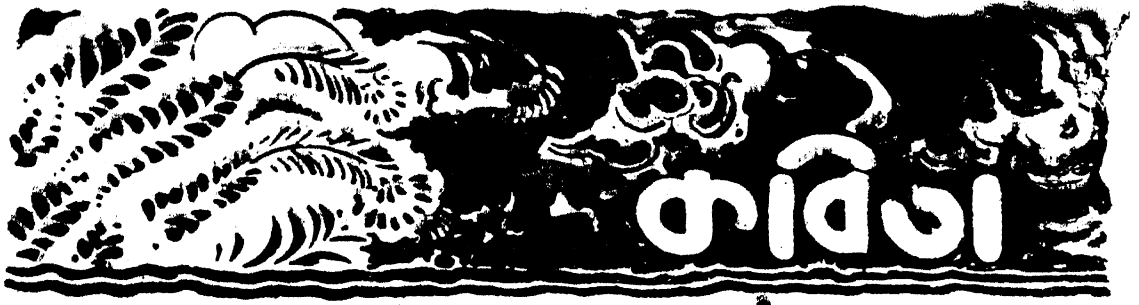
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-পিছল পথে কারা চলে তাদের চেন'?
অন্ধ আকাশে মানুষের ভাষা কোথায় পাবে?
চিলের পাখায় অস্ফুটতম বেদনা মাখা;
সবল পেশীরা সমতা জানেনা নয়নে আলো।

বল্গারা যত শ্লথ হ'য়ে গেছে—বাঁধন খোলা;
ইস্পাতে আর ইপ্সিতে চলে দ্বন্দ্ব কত।
ধানের শীষেরা মানুষের মনে জাগায় নেশা!
মূকেরা মুখর ধূসর আকাশে কি হবে আর।

চিমনিরা কত মাথার উপরে ধোঁয়ায় ভরা;
নিম্নে হাজার ভ্যাম্পায়ারেরা রক্ত চোখে।
হাতুড়ি হাতেরা হতাশা জানে না মৃত্যু মিছে;
স্টীলেরা গলেছে হাড়ের আগুন আরো কি চায়।

কতো মজা নদী খাল বিলে ভরা ঘোলাটে কাদা,
দুপাশে সুদূর ধূ ধূ করে শুধু চাহিছে প্রাণ।
মৃত্যু-পিছল পথে ভগীরথ চলেছে কতোঃ
বাঁজা আকাশেতে মানুষের ভাষা মিলবে নাতো।

মৃত্যু

শ্রীঅরূপ ভট্টাচার্য

দেখেছ কি কেও অন্ধ তামসী রাতে
স্তব্ধ আকাশে মৃত্যুর কালো ছায়া?
অশরীরি প্রেত তাণ্ডব নাচে মাতে
শ্লথ হয়ে আসে ভীরু দানবের কায়া।

নিদাঘের বুকে নগ্ন নিলাজ রবি
ঢালে অবিরাম মৃত্যুকাতর জ্বালা
মূর্তি তাহার আঁকে নাই কোন কবি
ভাঙিয়াছে শুধু কল্পতরুর ডালা।

কামনা-লোলুপ ফল্গুর বালুচরে
তপ্ত মেরুর হাহাকার বাঁধে বাসা
বাস্তবতার পৃথিবীর খেলাঘরে
হার মানে বুঝি শকুনির শঠ পাশা।

ভাগ্যের চিরশত্রুর হাতে পড়ে
খঞ্জের আঁখি অন্ধ হয়েছে জলে
'ফক্‌সটেরিয়ার' 'বুলডগ্‌' কেঁদে মরে
কাঁচা মাংসেতে রক্ত নাহিক বলে।

নন্দন বনে মন্দারে কাঁটা জাগে
কিন্নরীদের চোখে নাকি ব্যথা হানে
কামধেনু শুনি কোন কাজে নাহি লাগে
মন্দাকিনী যে শুকায়েছে অভিমানে।

স্বর্গে আজিকে শুনি কেন হাহাকার?
তেত্রিশ কোটি দেবতা কি উপবাসী?
ইন্দ্রের বুঝি ফুরায়েছে ভাণ্ডার
নারদ ঋষির ওষ্ঠে কাঁদিছে হাসি।

বন্দী বীরের অসি নহে উদ্ধত
ভাঙা তলোয়ার বেঁচে আছে কোনমতে
মুক্তি মাগিছে ভীরু কুমারীর মত
মৎস্যলোলুপ মার্জার কাঁদে পথে।

ধনতন্ত্রের বিজয় পতাকা ওড়ে
সাম্যবাদীরা করে তবু হাহাকার
জীর্ণ কন্থা লয়ে ভিক্ষুক ঘোরে
মৃত্যুর ছায়া পদে পদে ঘোরে তার।

বধির দেবতা! কভু কি শোননি তুমি?
গতিশীল এই পৃথিবীর স্তরে স্তরে
যুগ যুগ ধরি' আকাশ বাতাস চুমি'
কাঁদিল কাহারা বজ্র-কঠিন স্বরে।

কালো আকাশের সুপ্ত হৃদয় চিড়ে
ডানা ঝাপ্‌টিয়া মরিছে প্রলাপী পাখী
আহারের লাগি নিশাচর বৃথা ফিরে
পৃথিবীর আয়ু শেষ হতে কত বাকি?

বিমান আক্রমণ ও কলিকাতা

জার্মান বেতার বার্তার ঘাঁটি হইতে কলিকাতায় জাপ-বিমানের আক্রমণ ও ক্ষতির সম্বন্ধে নানারূপ অসত্য সংবাদ প্রচার করা হইতেছে। একটি সংবাদে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে যে, ৪ঠা তারিখে কলিকাতা অঞ্চলের উপর জাপানীরা প্রচণ্ডভাবে বিমান আক্রমণ চালায়; তাহারা হাওড়া স্টেশনে বোমা ফেলে, আশেপাশের গ্রামপ্রধান অঞ্চল আগুনে ধ্বংস হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব খবর কতদূর মিথ্যা শহরবাসীরা এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহা জানেন। বর্তমান যুদ্ধের প্রচারকার্যে মিথ্যাকে কতখানি প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ইহা তাহারই প্রমাণ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের উপর বিমান আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন—সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে বোমা পড়িলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। কারণ, দেশবাসীর কোনই ইহাতে হইবে। তাঁহার উক্তির সত্যতা ইতিমধ্যেই কতকটা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বোমা পড়িবার আগে কলিকাতা-উপর সত্যের জাপানীদের বিমান আক্রমণের পর তাহা অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আর শহরের লোকে সে সম্বন্ধে তেমন মাথা ঘামায় না। প্রথম কয়েকবারের আক্রমণে জাপানী বিমানচারীরা অক্ষতভাবে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু পরে কলিকাতা অঞ্চলের রক্ষা-ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ১৫ই এবং ১৯শে জানুয়ারীর রাত্রিতে আক্রমণকারীদিগকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলা যায়। ১৫ই তারিখে তিনখানা জাপ বিমান ভূপাতিত হয়, ১৯শে জানুয়ারীর রাত্রিতে আক্রমণে দুইখানা ধ্বংস হইয়াছে এবং এ দুইখানার ধ্বংসাবশেষের খোঁজও মিলিয়াছে, আর একখানাও ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সামরিকগণের বিশ্বাস। রক্ষা-ব্যবস্থার দিক হইতে ইহাতে সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানীদের আক্রমণের ধারা দেখিয়া বোধ হয় যে, তিন শত কি সাড়ে তিনশত মাইল দূর হইতে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালাইতে হইলে যেমন তোড়জোড় থাকা আবশ্যক, তাহা তাহাদের নাই। অল্পসংখ্যক উড়োজাহাজ লইয়া তাহারা হানা দেয় এবং তাহাদের সঙ্গে কোন ফাইটার বা লড়ুয়ে উড়োজাহাজ থাকে না। শুধু বোমারু উড়োজাহাজ লইয়া সুনির্দিষ্ট সামরিক ক্ষতিসাধন করা সম্ভব নয়; কিন্তু জাপানীরা যে কয়েকবার কলিকাতা অঞ্চলের উপর আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে লড়ুয়ে উড়োজাহাজ আনিতে পারে নাই; সম্ভবত অন্যত্র গুরুতর সামরিক প্রয়োজনের জন্য তাহারা এদিকে লড়ুয়ে উড়োজাহাজ পাঠাইতে পারিতেছে না। যেখানে সেখানে কয়েকটি বোমা ফেলিয়া লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই এক্ষেত্রে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। চট্টগ্রাম এবং ফেণীতে জাপানীরা উড়োজাহাজযোগে আক্রমণের সময় লড়ুয়ে জাহাজ সঙ্গে আনিতেছে দেখা যায়; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে তাহারা তাহা করিতে সমর্থ হইতেছে না; সেই সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, তাহারা বিশেষরূপ ধ্বংসকর ভারী বোমাও ব্যবহার করিতেছে না; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ভারী বোমা লইয়া আক্রমণ চালাইতে হইলে উড়োজাহাজের ঘাঁটি যতটা নিকটে থাকা দরকার, কলিকাতা অঞ্চল হইতে জাপানীদের উড়োজাহাজের ঘাঁটি ততটা নিকটে নয়; আকিয়াব কিংবা ব্রহ্মের অভ্যন্তরবর্তী জাপানীদের উড়োজাহাজের ঘাঁটির দূরত্ব কলিকাতা হইতে তিন শত মাইলের কম নয়। এতদূর হইতে ভারী বোমা বহন করিয়া লইয়া আসা এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া সেগুলি ফেলিয়া নিরাপদে ফিরিয়া
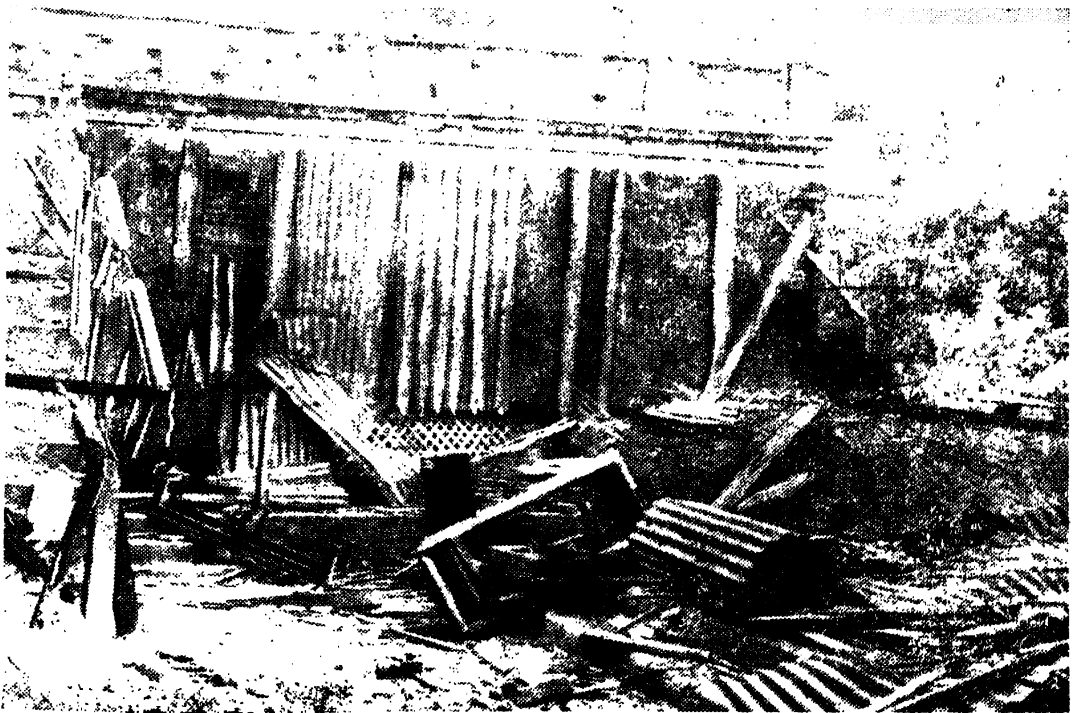
চট্টগ্রাম এলাকায় জাপ বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে একটি দ্বিতল গৃহের ক্ষতির দৃশ্য

যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। জার্মানেরাও এমন কৃতিত্ব খুব কমই দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে; তাহারা ইংলণ্ডের উপর ভারি বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের সমুদ্রোপকূলবর্তী বিমানের ঘাঁটির দূরত্ব কলিকাতা অঞ্চল হইতে জাপানীদের বিমানঘাঁটির দূরত্বের মত এত বেশী ছিল না। ইহার উপর জাপানীদের নিজেদের আত্মরক্ষার প্রশ্নও রহিয়াছে এবং সেই প্রয়োজনের চাপ সকলের উপর। প্রশান্ত মহাসাগরের লড়াইতে জাপানীদের বিশেষ সুবিধা ঘটে নাই; কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত হইয়াছে। রাবাউল এখনও তাহাদের দখলে রহিয়াছে, ইহা ঠিক; কিন্তু নিউগিনির দক্ষিণ অঞ্চল এবং অপর কয়েকটি দ্বীপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাহারা হারাইয়াছে; ইহার উপর ব্রহ্মের অভ্যন্তরভাগে ব্রিটিশ এবং মার্কিন বিমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের শক্তিপ্রয়োগ করিতে হইতেছে। গত বৎসরের অপেক্ষা ভারতের পূর্ব সীমান্তে সম্মিলিত পক্ষের বিমানবল যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে ব্রিটিশের আরাকান অঞ্চলে অভিযানের কথাও উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই আক্রমণ খুব ব্যাপক আক্রমণ নয়, আরাকানের পথে ব্রহ্মের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া জাপানীদের কেন্দ্র ঘাঁটিগুলি বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া সহজ নহে; পথের দুর্গমতা এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়াছে; এই প্রতিবন্ধকতার জন্যই আরাকানের দিকে ব্রিটিশ অভিযানের গতি দ্রুত হইতে পারিতেছে না। আকিয়াব বন্দর এখনও জাপানীদের দখলেই রহিয়াছে এবং মনে হইতেছে যে, এই বন্দর রক্ষা করিবার জন্যও তাহারা শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পার্বত্য জঙ্গল এবং জলাভূমির ভিতর দিয়া পথ করিয়া ব্রিটিশ বাহিনীকে আকিয়াবের দিকে অগ্রসর হইতে হইতেছে। ছোট ছোট সাম্পানই এই নদীনালা পূর্ণ অঞ্চলের প্রধান যান। রথিডংয়ের জাপানীদের ঘাঁটি হইতে এই বাহিনীর গতি প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। মনে হয়, এই অভিযানের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে। জাপানীরা বাঙলা দেশে বিমান হানা দিতেছে; অন্ততঃপক্ষে ইহা যে অন্যতম কারণ এ কথা বলা চলে। বন্দর হিসাবে আকিয়াবের গুরুত্ব কম নয়; বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এই বন্দরটি যদি জাপানীদের হস্তচ্যুত হয় এবং ব্রিটিশ পক্ষ হইতে সেখানে বিমানের ও নৌবহরের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রেঙ্গুনের উপর বিমান এবং নৌবহর এই উভয় দিক হইতে আক্রমণ চালাইবার সুবিধা সম্মিলিত পক্ষ লাভ করিবে। রেঙ্গুন শহরটিকে ব্রহ্মদেশের প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে; রেঙ্গুন শত্রু আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত হইলে জাপানীদিগকে উত্তর এবং পশ্চিমের রক্ষা-ব্যবস্থা শিথিল করিয়া সেই দিকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে; তাহার ফলে পূর্ব হইতে ব্রিটিশ এবং উত্তর হইতে চীনাদের অভিযানের পক্ষে ব্রহ্মদেশের বিস্তৃত অঞ্চল উন্মুক্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে, রেঙ্গুন বন্দর এবং তন্নিকটবর্তী জাপানীদের ঘাঁটিগুলি সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের পক্ষে উন্মুক্ত হইলে কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গে উপদ্রব সৃষ্টি করাও জাপানীদের পক্ষে সহজ হইবে না। জাপানীরা ইহা না বুঝিতেছে এমন নয়; এই জন্যই কলিকাতা অঞ্চল আক্রমণের জন্য বড় ঝুঁকি লইতে তাহারা সাহসী হইতেছে না। তাহাদের আচমকা কয়েকটা আক্রমণে কলিকাতার জন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে এবং সেই দিক দিয়া তাহাদের সুবিধা হইবে, তাহারা ইহাই আশা করিয়াছিল; কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ শহর ছাড়ে নাই; শ্রমিকেরা, বিশেষভাবে উড়িয়া শ্রমিকদের কতক অংশ শহর ত্যাগ করিয়াছে বটে; কিন্তু শহরের শৃঙ্খলা তাহাতে নষ্ট হয় নাই। শ্রমিক সমস্যা কিছু কিছু ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার সমাধান ক্রমেই হইয়া যাইতেছে; এখনও এই দিকে শহরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে এবং পৌরকার্য সম্পর্কে কিছু অসুবিধা না ঘটিতেছে এমন নয়, কিন্তু তাহা বিপর্যয়কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। মোটামুটি জাপানীদের কয়েকটি আক্রমণে শহরবাসীদের ভয় বাড়ে নাই, বরং ভয় ভাঙ্গিয়াছে, এই কথাই বলা যায়। সেদিন নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের জনরক্ষা পরিষদের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কলিকাতা অঞ্চলে জাপ-বিমান আক্রমণের কথা উঠিয়াছিল। জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব আমাদিগকে চুংকিংয়ের বিমান আক্রমণের কথা শুনাইয়া উৎসাহ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সেখানে জাপানীরা বোমা ফেলিয়া সব ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তথাকার লোকে উহাকে একটা নিত্যনৈমিত্তিক উপদ্রব স্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছে এবং কাজকর্মে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সেখানে ঘটে নাই; ভারতবাসীরা এই সব বিমান আক্রমণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; শত্রুপক্ষ সত্বরই বুঝিতে পারিবে যে, ভারতবর্ষ রাজপুত, মারহাট্টা এবং মুসলমানদের বাসভূমি। তাহারা এই সব বোমার লড়াইকে গ্রাহ্য করে না। সরকারী দপ্তরখানায় থাকিয়া এই সব উপদেশ দেওয়াতে অসুবিধা কিছু নাই। এদেশের লোকও খুবই সাহসী আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু মনোবল শুধু কথায় বাড়ে না; পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে; কলিকাতাবাসীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জনসাধারণের জীবন-যাত্রার গতি যাহাতে সহজ থাকে, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অন্যান্য অভাবের চিন্তায় তাহাদের মনের উপর চাপ না পড়ে এদিকে লক্ষ্য রাখা আগে দরকার; কিন্তু এ সবও অনেকটা বাহ্য, প্রকৃত মনোবলের উৎস কোথায় রহিয়াছে মিঃ পি এন সপ্রু এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুত সপ্রু বলেন, প্রত্যেক রুশ এবং চীনা দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বুঝিয়া প্রাণ দিতে যায় এবং সেজন্য তাহাদের মনোবল ভারতবাসীদের চেয়ে বেশী হইবেই। পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন, আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, ইংরেজদের মত আমরা স্বাধীন তবে দায়িত্ববোধ আমাদের ভিতর প্রবল হয় এবং মনোবলও অন্তরে দৃঢ় হইয়া উঠে। এই দিক হইতে দেশের বর্তমান রাজনীতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন সাধন করা উচিত। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক জনসাধারণের সহিত এই সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন এবং সিভিলিয়ানী ভ্রান্ত মর্যাদা বোধ এবং এদেশের লোকের উপর মাতব্বরী করিবার চাল কেমনভাবে জনরক্ষার কার্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন; ঐ সব সরকারী কর্মচারী যাহাতে ভ্রান্ত মর্যাদা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ইহাদিগকে উপদেশ দিতে বলিয়াছেন। এসম্পর্কে শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি উপলব্ধি করিতেন, তবে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত, এখনও তাঁহাদের দৃষ্টি সেদিকে উন্মুক্ত হইবে কি?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দেশ পত্রিকার গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গকে এতদ্দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, বর্তমানে কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ আগামী সংখ্যা (৬ই ফেব্রুয়ারী) হইতে দেশ পত্রিকার মূল্য নিম্নলিখিতরূপ বৃদ্ধি করা হইলঃ—

প্রতি সংখ্যা	তিন আনা
বার্ষিক	দশ টাকা
ষণ্মাসিক	পাঁচ টাকা

ম্যানেজার—'দেশ'

রবীন্দ্র-সংগীত

[শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সুর-সাধনা সম্বন্ধে তথ্যবহুল সমালোচনা পুস্তকাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার ইতিপূর্বে বহু সাময়িক পত্রিকায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে কয়েকটি নূতনতর আলোচনাসহ উক্ত নিবন্ধাবলীকে বিস্তৃতভাবে সমাবেশ করিয়াছেন। কবি, দার্শনিক শিক্ষক, রাজনীতিক, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার ও সাঙ্গীতিক রবীন্দ্রনাথ —তাঁহার এই বিচিত্র ও বহুধাপ্রসারিত প্রতিভার এক-একটি অধ্যায় সম্পর্কে সমালোচনা ও সাংস্কৃতিক মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা ইতিপূর্বে অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু সুরসাধক সাঙ্গীতিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণী আলোচনা সুর-বিজ্ঞানের বিচারদৃষ্টি লইয়া এতাবৎ বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত'কে তাই আমরা সানন্দে অভ্যর্থনা জানাইতেছি। ইহা আধুনিক বাঙলার শ্রেষ্ঠ সুরগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের মনে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগাইবে; ইহা বহুবিধ প্রচলিত সংশয় ও ধারণাপ্রমাদ ভঞ্জন করিবে এবং বাঙলার সাংস্কৃতিক সাধনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কীর্তি ও কৃতিত্বের পরিমাপটুকু প্রমাণ করিয়া দিবে।

ষোলটি পরিচ্ছেদে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের' আলোচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুর ও সঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মিক সাধনার কত বড় আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের পাতায় পাতায় তাহার বর্ণনা উৎসাহী পাঠককে মোহিত করিবে। ভারতীয় শুদ্ধ মার্গ-সঙ্গীত, হিন্দুস্থানী ও দাক্ষিণী সঙ্গীত, বাঙলার লোক-সঙ্গীত ও য়ুরোপীয় সঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ পদ্ধতির গ্রহণীয় অংশগুলিকে বাঙলা গানের স্বধর্মের সহিত অপূর্ব শৈল্পিক নিষ্ঠার সহিত সমন্বয় এবং অভিনব রূপান্তর, সুরকার রবীন্দ্রনাথের সেই সুকঠোর সাধনার ইতিহাস গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গান যে শুধু খেয়ালী মনের উৎস হইতে বাহির হইয়া আসে নাই, গানের পিছনে ছিল জীবনের তাগিদ, বহু বিচিত্র আখ্যায়িকা ও ঘটনার সেই চমকপ্রদ ইতিহাস এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত প্রভৃতি রচনার পিছনে যে আদর্শবাদের প্রেরণা ছিল, তাহাতে যুগোচিত যে আশা আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা সুররূপে বিমূর্ত হইয়াছে, লেখকপ্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

পুস্তকের অন্যতম প্রসঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য ও যন্ত্রসঙ্গীতের বিচারও বাদ যায় নাই। নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষা ও অনুশীলন বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রগল্ভ প্রশংসার উচ্ছ্বাস দ্বারা পুস্তকটির সাহিত্যিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয় নাই। লেখক তথ্য ও তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া প্রধানত বিষয়টির পরিবেশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও আপত্তিগুলিকেও সহানুভূতির সহিত বিচার করিয়া তাহার ভ্রান্ততা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে উৎসাহী প্রত্যেকের এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত অনুশীলনে অগ্রসর, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য।

লেখকের ভাষা অতীব প্রাঞ্জল এবং অনাড়ম্বর। পুস্তকের ছাপা ও বাহ্যসৌষ্ঠব সুরুচিশীল হইয়াছে। শিল্পীপ্রবর শ্রীযুত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত প্রচ্ছদপট এবং সন্নিবিষ্ট 'রবি-বাউল' ছবি দুইটি পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সোণার হরিণঃ—শ্রীরসময় দাস প্রণীত। দাম দেড়টাকা। প্রাপ্তিস্থান মডার্ন বুক ডিপো, শ্রীহট্ট।

কবি রসময় দাসের 'অন্তঃশীলা'র পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বে পাঠকদিগকে দিয়াছি। তাঁহার 'সোণার হরিণ' পাঠ করিয়াও আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভাবঘন দৃষ্টি সুন্দরের রসমাধুর্যে নিমগ্ন করিয়া সমাহিত চিত্তে সুনিবিড় যে একান্ত সুখের উপলব্ধি হয়, 'সোণার হরিণে' কবি তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে একটা অনাবিল এবং অনন্ত্র শুচিতার আপ্যায়ন রহিয়াছে, প্রগলভতায় কোথায়ও তাহা ক্ষুন্ন হয় নাই। অনপেক্ষ এবং অনাড়ম্বর আত্মনিবেদনের যে ত্যাগময় ছন্দে কবি রসময় দাসের কবিতাগুলি সুমধুর, তাহার মূলে বিশ্বভুবনের অন্তর্নিহিত শ্রীর সঙ্গে কবিচিত্তের সত্যকার সংযোগেরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং এদেশের সাধকদের মতে কবিত্বের তাহাই মান বা নিরিখ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভান্ড (১ম ভাগ, ৩য় সংস্করণ)ঃ—মৌমাছি। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক—মধুচক্র, ১।১, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা।

মৌমাছির লেখা সরল এবং সরস। বিষয়বস্তুকে অনর্থক রূঢ় ভাষার আবেষ্টনে ভারাক্রান্ত করতে তাঁর লেখনির এতটুকু প্রয়াস নেই বলেই বিষয়বস্তু এত সহজভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর লেখা যে ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করতে পেরেছে—তার আর একটি প্রমাণ দিয়েছে আলোচ্য বইখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে। মাত্র এক বছর পূর্বে এই বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, "বইখানি বাঙলা দেশের শিশুসাহিত্যের একটি মস্ত অভাব দূর করিবে এবং এই ধরণের বইয়ের প্রচার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।" আমরা পুনরায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। তৃতীয় সংস্করণে একটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত ক'রে বইখানিকে পরিবর্ধিত করা হয়েছে। বইয়ের আঙ্গিক সৌষ্ঠব, ছাপা এবং বাঁধাই মনোরম।

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—সাত সিকা।

অল্প যে কয়খানি বই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন দখল করিতে পারিয়াছে—আলোচ্য বইখানি তাহাদের মধ্যেই অন্যতম। ডস্টয়ভস্কী রুশ-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক—এই বইখানি তাঁহারই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। একটি দরিদ্র ছাত্রের মর্মন্তুদ আত্মগ্লানির ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসটি রচিত হইলেও তাহার পটভূমিকায় আমরা সমসাময়িক রুশ-সমাজের যে চিত্রটি দেখিতে পাই, তাহা অসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিপীড়িত নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুঃখ-বেদনা আনন্দ আশা নৈরাশ্যের এই কাহিনী সর্বদেশের এবং সর্বকালের কাহিনী, কোন বিশেষ ভাষার গণ্ডীতে ইহাকে বদ্ধ রাখা অন্যায়। এতদিন এই বইটির অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত না হইয়া আমাদের লজ্জারই কারণ হইয়াছিল—লেখক এতদিন পরে সেই লজ্জা দূর করিলেন। অনুবাদের ভাষা ভাল। প্রকাশভঙ্গী আরও ভাল। লেখক বাধ্য হইয়াই স্থানে স্থানে কিছু সংক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এই শ্রেণীর অনুবাদ আমরা আরও দেখিতে চাই।

সোভিয়েট নারী—অনিলকুমার সিংহ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ৭২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সমানাধিকারের ভিত্তিতে রুশিয়ায় যে নূতন নারীসমাজের গঠ হইয়াছে, পুস্তিকাখানাতে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় আছে মোটামুটিভবে এ কথাগুলি আজকাল অনেকেরই জানা দরকার। এ ধরণের শিক্ষামূলক ছোট ছোট বইয়ের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

বাঙলার বিখ্যাত পরিচালক নীতিন বসুর বম্বাই গমনের সংবাদ এখন চিত্রামোদীদের কারুরই অজানা নয়। নীতিন বসু গিয়েছেন বম্বাই-গত আরও বহু বাঙলার কলাকুশলী ও শিল্পীর মতই এখানকার চেয়ে বেশী অর্থের লোভে ; তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষা জয়যুক্ত হোক, এই কামনাই করি। একদিক থেকে তাঁদের যাওয়া বাঙালীমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। কারণ, এইভাবে প্রদেশে প্রদেশে কৃষ্টির আদান-প্রদান হ'তে পারবে ; কিন্তু হিসেবে ক্ষতির দিকটা যখন বেশী দেখা যাচ্ছে, তখন তাঁদের যাওয়াটা, বিশেষ ক'রে নীতিন বসুর মত প্রতিভাবান কর্মীর বাঙলা চিত্রজগতকে এইভাবে অবহেলা ক'রে চলে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি, ব্যক্তিগত লাভের দিকে যত কিছুই থাক।

* * * *

নীতিন বসুর আগে অনেকে বম্বেতে আসর জেঁকে বসে আছেন, তাঁর পরে আরও অনেকে যাবার জন্যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সমকীর্তিসম্পন্ন রয়েছেন (প্রমথেশ বড়ুয়া?), অর্থাৎ বাঙলা চিত্রশিল্পে সত্যিই বাতি দেবার লোকটিও না থাকার অবস্থা আসছে। বোমার আতঙ্ক যদি এই নিষ্ক্রমণের কারণ হতো, তাহলে ভবিষ্যতে শান্তির দিনে আবার বাঙলাদেশে সবাইয়ের প্রত্যাগমন আশা করা যেতো ; কিন্তু কারণ তা' বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁরাই গিয়েছেন বা চলেছেন, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত লাভের খাতিরেই। কিন্তু তা বলে সমষ্টির কথাটা একেবারে উড়িয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত নীচু মনের পরিচয় দেয় না কি? এখানে সমষ্টি হচ্ছে সমগ্রভাবে বাঙলার চিত্রশিল্প সবাই তাকে উপেক্ষা করে চলে গেলে, তার অস্তিত্ব আর থাকে কি করে? একথাটা বম্বাইগত গুণী ব্যক্তিদের কারুরই মনে জাগলো না? আশ্চর্য! তাই মনে হয়, এদের অনেকেই যখন আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন হয়তো বাঙলা ছবি বলতে কিছু নাও থাকতে পারে। আর বাইরের সবাই বলবে, বাঙলাদেশের কৃষ্টি আছে না ছাই। বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যা কোথায় বেশী? বাঙলাদেশের গুণীর আদর নেই! তখন এই সব অতিমিথ্যাগুলোকেও নির্বিবাদে মেনে চলতে হবে আর সেই সঙ্গে চিত্রায় দেখবো 'টপেঁডোওয়ালী'; রূপবাণী দেখাবে 'আঁখ-কী-সরম'; বাঙলার আসরে বাসরে তার নিজস্ব সম্পদ রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কি কীর্তন, ভাটিয়ালী, বাউল, ভাওয়াইয়া ঝুমুরের জায়গায় চলবে হিন্দী-উর্দুর হর-রা!

নাট্যভারতী—'পথের ডাক'

বাঙলা নাট্য সাহিত্যে সম্প্রতি এক নবযুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা একঘেয়ে সামাজিক নাটক ও জরাজীর্ণ পৌরাণিক কাহিনীসম্বলিত চমকপ্রদ নাটক পাঠে অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের ঘুণধরা বিচারবুদ্ধি বাঙলা নাটকের তাহাই সত্যকার রূপ বলে ধরে নিয়েছিল। তাই আজ আমরা নতুন ভাবের পরিবেশনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। এ ভাবের সাড়া জেগেছে বাঙলা নাটকের নতুন রূপের মধ্যে। নাট্যশিল্পী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের মধ্যে এনে দিয়েছেন এই রূপের রঙীন ছটা।

'পথের ডাক' তারাশঙ্করবাবুর নাট্যকার হিসাবে তৃত[illegible] উদ্যম। 'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ'এ তিনি যে সুনাম অ[illegible] করেছেন, 'পথের ডাক'এ তাহা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই আমা[illegible] বিশ্বাস। গ্রন্থকার বাস্তবদর্শী। বর্তমান জগতে যে বি[illegible] পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে, যে অদম্য মনোবল আমাদের দেশের ন[illegible] নারীকে নতুন পথের সন্ধান বলে দিচ্ছে, 'পথে ডাক' তাহা[illegible] প্রতীক।

নাটকটি চার অঙ্কে সমাপ্ত। প্লটে অভিনবত্ব আ[illegible] নাটকের স্ত্রী-পুরুষেরাও সকলেই বলিষ্ঠ চরিত্রের নরনার[illegible] প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এগি[illegible] চলেছে। তিনটি চরিত্র আমাদের খুবই ভাল লেগেছে নিখিলেশের মা, অতুল ও রায় বাহাদুর তিনজনই অপূর্ব সৃষ্টি লেখকের রচনায় শেষ পর্যন্ত নিখলেশ ও রমা প্রাধান্য [illegible] করলেও অতুল ও রায় বাহাদুরও তাদের জীবনের পথ [illegible] বিচ্যুত হয় নি। পথের ডাক একভাবে এসেছিল রমা নিখিলেশের কাছে। সে ডাক মানবত্বের ডাক। পথের আহবান [illegible] একভাবে এসেছিল অতুলের কাছে। তার পথ যান্ত্রিক মানু[illegible] পথ। সে পথ মানুষের হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিসমূহকে উ[illegible] করে' সাফল্য অর্জন করে। অবশেষে নিখিলেশের মুখ দি[illegible] স্বীকার করেছেন—বর্তমান সভ্যতার দান উপেক্ষণীয় নয়।

প্লটের দু'একটি অংশ একটু খাপছাড়া হয়েছে। প্র[illegible] অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, সেবাধর্মে দীক্ষা গ্রহণকালে রমার বক্তৃ[illegible] কুড়োরামের মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা, কয়লাখাদের দৃশ্য প্রভৃতি অনে[illegible] স্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও বাহুল্যদোষে দুষ্ট হয়েছে। অবশ্য সম[illegible] ভাবে নাটকটির তাতে কোন সৌন্দর্যহানি ঘটেনি। নাটকের শে[illegible] দৃশ্যটি ভাব ও গাম্ভীর্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যে ভ[illegible] অবলম্বনে নাটকটি লেখা হয়েছে, সে ভাবের প্রাধান্য বাঙ[illegible] উপন্যাসে থাকলেও নাটকের মধ্যে তাকে প্রথম রূপ দিলে[illegible] শ্রীতারাশঙ্কর। এ ভাবকে বলা যেতে পারে—সোসিও-ইকনমিক্যা[illegible] (socio-economical)—অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে[illegible] সংমিশ্রণ। বর্তমান অর্থনীতির স্বরূপ কিরূপে আমাদে[illegible] সামাজিক মতবাদকে প্রভাবান্বিত করছে তার প্রমাণ রায়বাহাদ[illegible] ও অতুলের চরিত্রে ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। লেখকের রচন[illegible] কোথাও রোমান্সের নাম গন্ধ নেই। কতকগুলি ঘটনার সমা[illegible] তিনি ধরে দিয়েছেন আমাদের সম্মুখে। সেগুলি মূর্ত হ[illegible] উঠেছে ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে।

বস্তুত সমগ্র প্লটটিতে লেখকের বলিষ্ঠ কল্পনা উন্ম[illegible] হয়ে উঠেছে। কি টেকনিকে, কি ভাবে ও কি ভাষায় 'পথে[illegible] ডাক' বাঙলা নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।
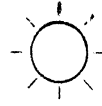
রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় বাঙলা দলকে হোলকার দলের সহিত ইন্দোরে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনদিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিতে হইবে। বাঙলা দলের পক্ষে এই খেলায় কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ২৫শে জানুয়ারী নির্বাচন কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু সকল খেলোয়াড়ের ইন্দোরে যাওয়া সম্ভব হইবে কিনা তাহা স্থির না হওয়ায় খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটি তালিকা প্রকাশ করেন নাই। কর্মস্থল হইতে ছুটি পাওয়া অনেক খেলোয়াড়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে সকল খেলোয়াড় যাইতে পারেন তাহার জন্য বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিবে কি না বলা কঠিন। শোনা যাইতেছে, এস দত্ত ও এন চ্যাটার্জির কর্তারা ছুটি দিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। যতদূর মনে হইতেছে তাহাতে ইঁহাদের যাওয়া শেষ পর্যন্ত না হইতে পারে। এইরূপ দুইজন বোলার ও ব্যাটসম্যান বাঙলা দল হইতে বাদ পড়ায় দলের শক্তি যে কমিয়া যাইবে ইহা বলাই বাহুল্য। নির্বাচনমণ্ডলী যে সকল খেলোয়াড় লইয়া বাঙলা দল গঠন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহার যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এইটুকু বলা চলে যে দল গঠন ভালই হইয়াছে। সকল খেলোয়াড় নিজ নিজ কর্মস্থল হইতে ছুটি পান ও বাঙলা দল শক্তিশালী হইয়া ইন্দোরে হোলকার দলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হউন ইহাই আমাদের কামনা।

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

ইন্দোরে সম্প্রতি নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা যশোবন্ত টেনিস প্রতিযোগিতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সকল বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়ই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এম এল আর সোহানী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই। দিলীপ বসু যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সিঙ্গলস সেমি-ফাইন্যালে ইফতিকার আমেদের নিকট স্ট্রেট সেটে পরাজিত হইয়াছেন। গউস মহম্মদ সিঙ্গলসের ফাইন্যাল খেলায় ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করিয়া নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইতিপূর্বের এক প্রতিযোগিতায় ইফতিকার আমেদের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি যে অখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এই জয়লাভে তাহার কতকাংশ বিদূরিত হইল। ইফতিকার আমেদ সহজে পরাজিত হন নাই। এই খেলার মীমাংসা হইতে ৪টি গেম খেলিতে হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ডাবলসের ফলাফলই দর্শকগণকে বিশেষভাবে

সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের মহিলাদের দৈর্ঘ্য লম্ফনের প্রথম স্থান অধিকারিণী মিস এস লীল

চমৎকৃত করিয়াছে। এই খেলায় কাউল ও ইন্দুলকার গ মহম্মদ ও বরোদার মহারাজাকে পরাজিত করিয়াছেন। গ খেলার শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযে বরোদার মহারাজা উপযুক্ত সমর্থন করিতে পারেন ন মিক্সড ডাবলসেও গউস মহম্মদকে ডুবাসের সহিত খেে ইফতিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজের নিকট পরাজয় বরণ কর হইয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস লীলা রাও ৬-০, ৬-১ গেমে মিস ডুবাসকে পর করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

গউস মহম্মদ ৬-২, ৭-৫, ৪-৬, ৬-৩ গেমে ইফ আমেদকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

জে কে কাউল ও ক্যাপ্টেন ইন্দ্রলেকার ২-৬, ৬-৪, ৬-১, ৪-৬, ৬-৪ গেমে গউস মহম্মদ ও বরোদার মহারাজাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

ইফ্তিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজ ৭-৫, ৭-৫ গেমে গউস মহম্মদ ও মিস ডুবাসকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডাবলস ফাইন্যাল

রাও ও দাস ৭-৫, ৬-৩ গেমে সি কে নাইডু ও দেশাইকে পরাজিত করিয়াছেন।

বাঙলায় এ্যাথলেটিক স্পোর্টস

এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের মরশুম আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলা দেশ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এই মরশুম ব্যর্থ হইতে দেয় নাই। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অল্প সংখ্যক স্পোর্টস অনুষ্ঠান পরিচালিত হইলেও বাঙলার এ্যাথলীটগণ খুব নিম্নস্তরের ফলাফল প্রদর্শন করিতেছেন না। বাঙলার দুইটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি অনুষ্ঠান অবলোকণ করিয়া এই ধারণা করিতে বাধ্য হইতেছে হইয়াছে যে নিয়মিত অনুশীলন করিলে বাঙলার এ্যাথলীটগণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের এ্যাথলীটগণের বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না। নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা নাই। নতুবা আমাদের এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক নহে তাহা প্রমাণিত হইত।

দীর্ঘ দূর ভ্রমণে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ

তবে এই কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে আমাদের কোনরূপে দ্বিধা হইতেছে না যে, বাঙলার অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ঠিক নিয়মমত অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে পরিচালিত হয় সেই বিষয় একটু শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের এই উপেক্ষা বা শৈথিল্য প্রকাশ যদি কোন মারাত্মক স্বাস্থ্য-হানিকর কার্যের সহায়তা করিতেছে বলিয়া আমরা দেখিতে না পাইতাম, তবে আমরা এই বিষয় উল্লেখ করিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি আমরা সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের উপস্থিতিতে মহিলাদের ১৫০০ মিটার ভ্রমণে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের যোগদান করিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমাদের যতদূর জ্ঞান আছে, তাহাতে আমরা জানি যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণকে এত দীর্ঘদূর প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। একমাত্র সুস্থ যুবতীগণকেই সাধারণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হয়। এই নিয়ম এতদিন অনুসরণ করিয়া বর্তমানে হঠাৎ তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্পোর্টসের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধারণের কর্মক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু এইরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের ১৫০০ মিটার ভ্রমণে যোগদান করিতে দিলে সেই উদ্দেশ্য কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের যদি অভিমত নেওয়া হয়, তবে আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদের উক্তিই সমর্থন করিবেন। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত নহে। তাঁহাদের কর্মের ও ব্যবস্থার উপর বাঙলার ভবিষ্যৎ বালক-বালিকাদের জীবন নির্ভর করিতেছে এই কথা তাঁহারা যেন সকল সময়েই স্মরণ রাখেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এইরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমরা একবার "বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনে"র কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তাঁহারা তখন ঐ অনুষ্ঠানের পরিচালকগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেন। এমন কি উক্ত পরিচালকগণকে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন, তাঁহারা যদি ঐভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, তবে অন্তর্ভুক্ত অনুষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই সময়ের সেই সকল সভ্যগণ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও এইরূপ একটি অনিষ্টকারী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল! আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এইরূপ অনুষ্ঠান আর দেখিতে হইবে না।

সাইকেল প্রতিযোগিতায় "নো রেসের" হিড়িক

সাইকেল প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না হইলে অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ-সীমানায় পেঁছিতে না পারে, তবে ঐ প্রতিযোগিতাটিকে "নো রেস" বলা হয়। এই "নো রেস" প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্য—প্রতিযোগিতার বিষয়টির উন্নতির জন্য যোগদানকারিগণকে বাধ্য করা। কিন্তু আমাদের দেশের সাইকেল চালনায় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা পুরস্কার লাভের জন্য এতই ব্যস্ত যে, প্রতিযোগিতা কম সময়ে শেষ হইল—কি বেশী সময়ে শেষ হইল, সেইদিকে তাঁহাদের কোনরূপ লক্ষ্য নাই। "দ্রুত চালাইব—ফলাফল যাহাই হউক" এই মনোবৃত্তির অভাব এই সকল যোগদানকারিগণের মধ্যে বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। গত দুই বৎসর পূর্বে "নো রেসের" হিড়িক লাগিয়াছিল। তখন প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই সাইকেল প্রতিযোগিতাটি "নো রেস" বলিয়া বাতিল হইয়াছে—শুনিতে হইত। ইহার পর অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ চিন্তা করিতে থাকেন যে, কিরূপে ইহা হইতে উদ্ধার পাইবেন। তাঁহাদের শেষ-সিদ্ধান্ত একরূপ হইয়া যায় যে, সাইকেল প্রতিযোগিতা বিষয়টি সমস্ত স্পোর্টস অনুষ্ঠান হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, পরবর্তী অনুষ্ঠান সময়ে সাইকেল প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই শেষ হইতেছে। এই বৎসর পুনরায় সেই "নো রেসের" হিড়িক দেখা দিয়াছে। এই পর্যন্ত মাত্র দুইটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং এই দুইটিতেই সাইকেল-প্রতিযোগিতা বিষয়গুলি "নো-রেস" বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—বঙ্গীয় জনরক্ষা বিভাগের হেড কোয়ার্টার্সের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকার মধ্যে শত্রুপক্ষীয় বিমানের ক্ষুদ্র একটি দল কলিকাতা এলাকা আক্রমণ করে। বৃটিশ বিমান বাহিনী বাধাদান করায় উহারা বোমাগুলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য—দুই এক স্থানে আগুন লাগিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই উহা আয়ত্তে আনা হয়। কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া এতাবৎ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রবিবার (১৭ই জানুয়ারী) রাত্রে শত্রুপক্ষের তিনখানি কিংবা চারিখানি বিমান দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার অগ্রবর্তী সামরিক এলাকায় কতকগুলি বোমা নিক্ষেপ করে। জিনিসপত্রের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে, তবে লোকজন হতাহত হয় নাই।

আসাম এলাকায় গত কয়েকদিন যাবৎ চীন পাহাড়ে শত্রুপক্ষের সহিত মিত্রপক্ষের সৈন্য বাহিনীর মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইয়াছিল। গত ১৭ই জানুয়ারী মিত্রপক্ষের সৈন্যগণ বুথিডংয়ের ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে স্থিত কালাদান নদীর তীরস্থিত আরাকান জেলার চাউকট নামক একটি গ্রাম দখল করে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েটের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাদের অবরোধ অবস্থার অবসান হইয়াছে। রুশ সৈন্যগণ শ্লুয়েসেলবুর্গ অধিকার করিয়াছে। শ্লুয়েসেলবুর্গ লেনিনগ্রাদের ২৫ মাইল পূর্বে ল্যাডোগা হ্রদের তীরে অবস্থিত। সোভিয়েট সৈন্যেরা নেভা নদীর পশ্চিম ও পূর্ব হইতে যুগপৎ দুই আক্রমণে ৯ মাইল বিস্তৃত জার্মান ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে।

জেনারেল জুকভ সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্শাল পদে উন্নীত হইয়াছেন। তিনি রুশিয়ার সমগ্র দক্ষিণ-রণাঙ্গনে সোভিয়েট সেনার অধিনায়ক রহিয়াছেন।

নিউগিনি—মিত্রপক্ষের স্থল সৈন্যেরা সনন্দা ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

২০শে জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—অতিরিক্ত যুক্ত সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত রাত্রে কলিকাতা এলাকায় যে বিমান হানা হইয়াছে, সেই সময় রাজকীয় জঙ্গী বিমানসমূহ বাধা দিলে দুইখানি জাপ বোমারু বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় ফেনীতে ৪র্থ বার বিমান হানা হয়। হতাহতের পরিমাণ সামান্য।

ব্রহ্ম—গতকল্য বৃটিশ ও মার্কিন বিমানসমূহ ব্রহ্মে জাপ ঘাঁটিসমূহের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়।

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রুশ সৈন্য ভালুইকি ও কামেনস্কা দখল করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা—মস্কো বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, অষ্টম আর্মি হোমস্ বন্দরে পৌঁছিয়াছে। অষ্টম আর্মি এখন ত্রিপোলী হইতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে রহিয়াছে।

আজ লণ্ডনে বিমান হানায় ২৪ জন লোক মারা গিয়াছে।

২১শে জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোতে এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে, দক্ষিণাঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী অস্ট্রোগোরস্ক দখল করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকা—মধ্য প্রাচ্যের ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অষ্টম বাহিনী হোমস এবং তার-হুনা দখল করিয়াছে।

২২শে জানুয়ারী

এয়ার ভাইস মার্শাল টি এম উইলিয়মস বাঙলার এয়ার অফিসার কম্যাণ্ডিং নিযুক্ত হইয়াছেন।

রুশ রণাঙ্গন- গতকল্য লেনিন-স্মৃতিসভায় মস্কো সোভিয়েটের চেয়ারম্যান মঃ সেরবাকোভ বলেন যে, গত ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনীর দুই মাসের অভিযানে পাঁচ লক্ষাধিক জার্মান অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং তাহাদের দুই লক্ষাধিক সৈন্য বন্দী হইয়াছে। গতকল্য ট্রান্স-ককেসিয়ান রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী ভরোশিলভস্ক দখল করে। সোভিয়েট সৈন্যেরা রস্টভের পূর্বে উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে তিনটি প্রধান রেলজংশনে চাপিয়া আসিতেছে; ইহার ফলে রস্টভের বিপদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সমর বিভাগের যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গতকল্য রাত্রিতে (২২শে জানুয়ারী) অল্প সংখ্যক শত্রু বিমান দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় বোমা বর্ষণ করে। সামান্য ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অদ্য অনুমান দ্বিপ্রহরে জাপ বিমানের একটি দল চট্টগ্রাম এলাকায় আক্রমণ চালায়, কিন্তু এ পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।"

উত্তর আফ্রিকা—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ অষ্টম আর্মির অগ্রগামী সৈন্যদল ভোর পাঁচ ঘটিকার সময় ত্রিপোলীতে প্রবেশ করিয়াছে। এক্সিস বাহিনী যতশীঘ্র সম্ভব ত্রিপোলী হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে।

রুশ রণাঙ্গন—সোভিয়েট ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে, দক্ষিণ-রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র সালস্ক সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। আরমাভির গতকল্য পুনরধিকৃত হইয়াছে। আরমাভির পুনরধিকৃত হওয়ার ফলে কৃষ্ণসাগরোপকূলে তুয়াপসে এলাকা ও মাইকপ তৈল ক্ষেত্রের সহিত জার্মানদের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল।

২৪শে জানুয়ারী

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সমর বিভাগের যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য (২৩শে জানুয়ারী) মধ্যাহ্নে চট্টগ্রামের উপর যে স্বল্পকালস্থায়ী বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, বোমা বর্ষণের ফলে শহরের এক অংশে কতিপয় অট্টালিকার ক্ষতি এবং কিছু লোক হতাহত হইয়াছে। বৃটিশ বিমান-ধ্বংসী কামান ও জঙ্গী বিমানসমূহের সম্মিলিত আক্রমণে অন্যূন দুইখানি জাপ বিমান ধ্বংস এবং অন্যান্য কয়েকখানি ঘায়েল হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব নিউগিনিতে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পাপুয়াতে স্থল যুদ্ধ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। মিত্রপক্ষের বিমান গতকল্য রাবাউলে জাপ নৌ সমাবেশের উপর আবার আক্রমণ করে। আরও ৪টি জাহাজ জলমগ্ন হয়।

২৫শে জানুয়ারী

রুশ রণাঙ্গন—মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশ বাহিনী ভরোনেজ পুনরধিকার করিয়াছে। আরও ১১ হাজার এক্সিস সৈন্য বন্দী হইয়াছে। রুশ সৈন্যগণ স্টারোবেলস্ক শহর ও রেলওয়ে স্টেশন, পোলুকা ও বখমুটোভকা নামক দুইটী সুবৃহৎ লোকালয় ও ক্রাসনোমেজভোভকা নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন দখল করে। ট্রান্স ককেসিয়ান রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী চানোকোপসকা ও [illegible] এবং আরও কয়েকটি সুবৃহৎ লোকালয় দখল করে। তদুপরি পিয়েসিনোকোপকা নামক রে স্টেশনও দখল করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯শে জানুয়ারী

বাঙলা সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের অবস্থার উন্নতি বিধানকল্পে বাঙলা সরকার কর্তৃক জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে; ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে। প্রতি মণ কয়লার পাইকারী দর পাঁচসিকা এবং খুচরা দর এক টাকা ছয় আনা ধার্য করা হইয়াছে।

তুর্কী সাংবাদিক দল ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

২০শে জানুয়ারী

বাঙলার ভূতপূর্ব অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রণীত "এ ফেজ অব দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" নামক ইংরেজি পুস্তিকার পুন প্রকাশ, বিক্রয় বা বণ্টন বাঙলার গভর্নর কর্তৃক ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকার সমস্ত কপি এবং পুস্তিকা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

হাজি আদুল ওসমানের মৃত্যুতে কর্পোরেশনে ডেপুটি মেয়রের পদ শূন্য হওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অদ্যকার সভায় মিঃ হামুদুর রহমানকে উক্ত পদে নির্বাচিত করা হয়।

বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব ঘোষণা করেন যে, ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বাঙলার সর্বত্র অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্তাবেই সরবরাহের জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট নির্বাচিত আমদানীকারক এবং বিক্রেতাদিগকে লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন। এই সঙ্গে পক্ষপাতিত্বহীনভাবে নির্বাচিত ব্যবসায়ী এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যাহাতে লেনদেন হয় এবং আস্থার ভাব বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি ট্রেড ট্রাইবিউন্যালও গঠিত হইয়াছে।

ঢাকার নবাব আরও ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের যে সমস্ত জেলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল মজুদ আছে, সেই সমস্ত জেলা হইতে বাঙলা সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙলা সরকার এই সমস্ত চাউল কলিকাতায় এবং বাঙলা দেশের যে সমস্ত জেলায় চাউলের অভাব আছে, সেই সমস্ত জেলায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

কুমিল্লায় কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী দেবেন সেন, এম সিদ্দিক, রহমৎ আলী, ডাঃ দুর্গেশ রায়, ডাঃ রাধারমণ দেব ও নৃপেন্দ্র ভৌমিক এবং আরও ৬জনকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২১শে জানুয়ারী

গৌহাটির সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ এইচ কে দাশের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাস, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অমলপ্রভা দাস এবং শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা দাস গৌহাটি শহরে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে অন্তরীণ হইয়াছেন।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর পাঁচ সহস্রাধিক লোক বালুরঘাটের দেওয়ানী আদালত এবং অন্যান্য সরকারী অফিসে হানা দিয়াছিল। এই সম্পর্কে ৫৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করা হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক।

বাঙলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদান সম্পর্কে অদ্য কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যের বিবরণ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এখনও আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে এবং তাহাতে গভর্নমেণ্টের কাজের বিঘ্ন ঘটিতেছে।"

আরামবাগের এক সংবাদে প্রকাশ, খানাকুল থানার পুলিশ সার্দা গ্রামে গত ২৯শে জানুয়ারী রাত্রে ফেরারী ধরিতে যাইলে এক দল লোকের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ হয়। গুলী চালায়; ফলে মহাদেব মণ্ডল নামে একটি বালকের মৃত্যু হয়। পুলিশ উক্ত মহাদেব মণ্ডলের মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পাঠাইয়াছে।

২২শে জানুয়ারী

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি এম এল এ মহাশয়কে গতকল্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অদ্য তাঁহাকে পুনরায় ভারতর নুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের এক ডাঃ আর আমেদ কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হই

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, মিউনিসিপ্যালিটি এব বোর্ডের ইমারতে কংগ্রেস "জাতীয় পতাকা" উত্তোলন অ রাখা নিষিদ্ধ করিয়া মাদ্রাজ সরকার একটি আদেশ জারী

শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্ট মিউনিসিপ্যালিটি ও উকীল মৌলবী এ এন এম মোবারক, শ্রীযুত হরনারায় শ্রীযুত হরিদাস দাস গত ৩১শে আগস্টের হাঙ্গামা সম্প হইয়াছিলেন। আসাম সরকারের আদেশে তাঁহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী

যশোহরের সংবাদে প্রকাশ, মাগুড়া মহকুমার বিনো বাবু সীতানাথ সাহার বাড়িতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অলঙ্কার পত্রাদিতে ডাকাত দল প্রায় ৪০ হাজার টাকার লইয়া গিয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী

পুণার সংবাদে প্রকাশ, অদ্য রাত্রে ক্যাণ্টনমেণ্ট অ রঙ্গালয়ে বিস্ফোরণের ফলে ৬।৭ জন আহত হইয়াছে। একখানি হাত বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল। আহতে এক জন পরে মারা গিয়াছে।

শ্রমিক দল হইতে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের ভূত মিঃ জন বার্ণস লণ্ডনে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বৎসর হইয়াছিল। শ্রমিক দলের মধ্য হইতে তিনিই প্র মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সন্ধ্যায় এক বিস্ফো এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ইহা দেশী বোমা বলিয় হইয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন মজুদ রেজগী উদ্ধার করা যাইতে পারে, যাহারা এরূপ স পারিবে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

২৫শে জানুয়ারী

করাচীর "সিন্ধু অবজার্ভারের" সম্পাদক মিঃ আদালত অবমাননার অভিযোগে পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড, ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আমেদাবাদের খবরে প্রকাশ, অদ্য একদল পুলি এসিড ও প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে একজন নবগা আহত হয়। আর এক স্থানে এসিড নিক্ষেপের ফলে মি বাজারের জনৈক ইন্সপেক্টর আহত হয়।

অদ্য পুলিশ কলিকাতার ১৮টি স্থানে খানাতল্লা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ১৪ জনকে গোয়েন্দা অফিসে কয়েক স্থানে পুলিশ আপত্তিকর কাগজপত্র পাইয়াছে